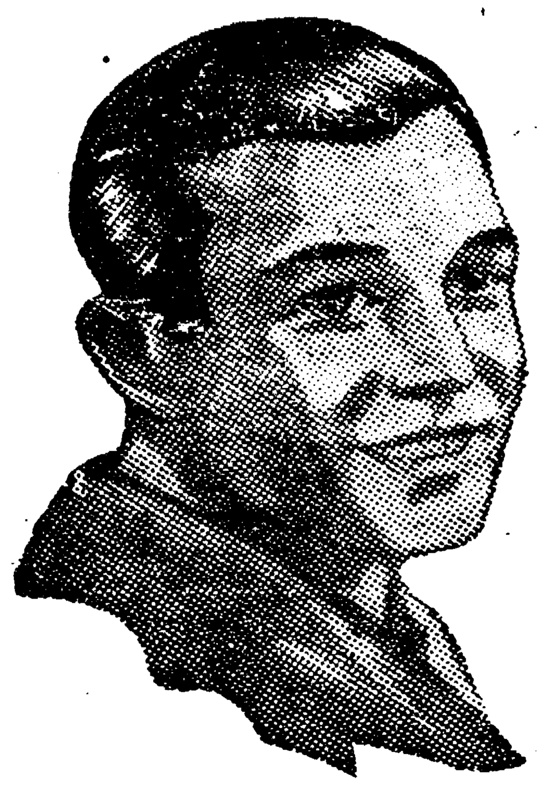

লাইমজুস অ্যাণ্ড গ্লিসারিন

কেশ পরিচর্য্যা ও প্রসাধনের উপযোগী সুস্নিগ্ধ ক্রীম

স্নানের পূর্ব্বে অথবা পরে নিত্য ব্যবহার করিলে নিতান্ত অবাধ্য কেশও বশে আসে এবং রুক্ষ কেশ মসৃণ হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান পছন্দ করিবেন।

চার আউন্স ও ছয় আউন্স শিশি

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

ষোড়শ বর্ষ (বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৫০)

কার্য্যালয় :—১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সূচীপত্র

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা।
অঙ্গুলিমালের উদ্ধার (গল্প) …	শ্রীরাধারাণী দেবী …	৬৮
অভিযাত্রীর পত্র (ভ্রমণ-কাহিনী) …	শ্রীবিশ্বপতি দাশগুপ্ত …	২৯৬
অযোগ্য (গল্প) …	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি.এ …	১২
অসহ (কবিতা) …	শ্রীগিরিজাকুমার বসু …	১৪৪
আকাশের মত বড় (সচিত্র প্রবন্ধ) …	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি…	১৯
আচার্য্য নলিনীমোহন, (জীবনী) …	ঐ …	২২২
আমরা খাসা আছি (চিত্র) …	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায় …	১০২
আমাদের অজানা বন্ধু (প্রবন্ধ) …	শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি …	২৪৭
আমাদের ছেলেবেলা (কবিতা) ..	শ্রীসুনির্ম্মল বসু …	১২১
আমার গেরিলা দলে যোগদানের কাহিনী	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় …	৫৭
আমার পূজার উপহার (গল্প) …	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী …	১২৮
উইল (গল্প) …	শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ …	৩০১
কচি মুখ (কবিতা) …	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী …	১৮
কণ্ট্রোল(কবিতা) …	শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা …	২০৬
কবিতা-কণা …	…	১৪৯, ১৬৭, ২৪১, ২৪৫, ২৯৫.
কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (কবিতা) …	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় …	২৭১
কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্যাল, এম্.এ …	২৪৬
কলকাতার চোর (গল্প) …	শ্রীশামুক …	১২৩
কলির শেষ (গল্প) …	শ্রীসুবোধ বসু, এম্.এ …	১৩৮
কুড়ান পাতা (সংগ্রহ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ,বি.এস্-সি	২০২
কুড়ানো গল্প (গল্প-সংগ্রহ) …	ঐ	১৭৯, ৩০৪
কুমারজীবের চীন যাত্রা (ইতিহাসের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি,	২৪৮
ক্যামেরার নূতন ব্যবহার (সচিত্র প্রবন্ধ)	ঐ …	১৪৫
ক্রমবিবর্ত্তনের 'ক খ' (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি	২৮৬

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
ক্রমশঃ (গল্প)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ	৮৩
গঙ্গার জন্মকথা (গল্প)	শ্রীগৌরী দেবী	২৬৬
চাকরী করা হয়রানি (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি	৯০
চাকরী কা ওয়াস্তে (গল্প)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ	৩২
চিঠিপত্র	...	২৪, ১১৮, ১৮০, ২০৮, ২৩০, ৩১০
চিড়িয়াখানা	...	৪৭
চিত্রশালা	...	৯৫, ১৮৩, ২৫৫
চিন্তামণি সর্দ্দার (গল্প)	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৫
চীনের শিল্প (প্রবন্ধ)	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী	১৫২
চোর, ডাকাত, সাবধান ! (প্রবন্ধ)	শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্.-সি	২৬৩
জাতকের গল্প (গল্প)	শ্রীকালিদাস রায়, বি.এ, কবিশেখর	৮৪
জোনাক্ পরী ডাক দিয়ে যায় কা'রে (কবিতা)	শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়	৯৭
টুব্‌লু (কবিতা)	শ্রীঅজিত দত্ত, এম্.এ	৮
তিন সাধুর কাহিনী (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ,বি.এস্-সি	২৫০
তিনসুকিয়া ভ্রমণ (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ,বি টি	২৩৩
তূলোর জন্ম (গল্প)	শ্রীগৌরী দেবী	১৭৬
দুর্ভিক্ষে খাদ্যসমস্যা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্,এ,বি.এস্-সি	৩৩
দুর্ভিক্ষের দিনে (গল্প)	শ্রীহেমলতা দেবী	৩০৬
দ্বিজেন্দ্রলাল (জীবন-কথা)	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	১৮৭
ধান কই (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ	১৩৩
ধাঁধা	শ্রী অ. সে	২০৪
ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম		৪৮, ৭২, ৯৬, ১২০, ১৬০, ১৮৪, ২০৮, ২৩২, ২৫৬, ২৮০, ৩১২
নদীর জন্মকথা (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্.এস্-সি	২৩৯
নানা কথা (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	১৭৭
নানা প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	ঐ	১৯৯, ২৭২, ৩০৭
নিরুদ্দিষ্টের দল (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্.এ, বি.এল্	১০, ৪৩, ৬৫, ৭৯, ১০৬, ১৬৪
নীল নৌকার মাঝি (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯
নীলমণির ভুল (গল্প)	কুঞ্জনাথ	১৯১, ২১০
নূতন ধাঁধা		৪৮, ৭২, ৯৬, ১২০, ১৬০, ১৮৪, ২০৮, ২৩২, ২৫৬, ২৮০, ৩১২
নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা	...	৭০
পরেশ (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ	২৫
পাগল (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	১৭১

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
পাহাড়ের ভ্রমণ-কাহিনী (গল্প)	শ্রীমানসী বসু, এম্.এ	৬১
পুরস্কার প্রতিযোগিতা	...	৭০, ১৩৫, ৩০৫
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল	...	২০৫
প্যারাসুট-বাহিনী (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৪১
প্রতারণার ব্যথা (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ	১৬১
প্রশ্ন (কবিতা)	শ্রীকানাই দীর্ঘাঙ্গী	৩০৯
প্রাচীন গ্রীস (ইতিহাসের কথা)	শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ	১৯৬
ফসল আরো ফলাও (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২৩৫
ফাঁসির পর (গল্প)	শ্রীশামুক	২
বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	১০১
বুদ্ধির্যন্ত্র (কৌতুক-নাটিকা)	শ্রীসুবোধ বসু, এম্.এ	১৬, ৩৮, ৫৪, ৭৬, ৯৮
বেতালের প্রশ্ন	...	৭১, ১৮৪
বেশী সাহস ভাল নয় (গল্প)	শ্রীশামুক	২৫৮
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক		৪৫, ৯৩, ২৫২, ২৮০, ৩১০
মনোরঞ্জন (কবিতা)	শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	২২০
মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা	...	৩০৫
মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল	...	৭১
মনোরঞ্জন-স্মৃতি (জীবনী)	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ	৮৬
মহারাজ প্রতাপাদিত্য (ইতিহাসের কথা)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্	১৫
মহীয়সী মহিলা কস্তুরবাঈ (জীবন-কথা)	শ্রীরাধারাণী দেবী	৩০০
মামা-ভাগ্নে (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি	১৫৪
মায়ের মায়া (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ	২০৯
মালতী (কবিতা)	ঐ	১১৩
মিষ্টুর কোকিল (কবিতা)	ঐ	৭৩
যুদ্ধকালের শুষ্ক খাদ্য (প্রবন্ধ)	শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ.	২১৭
যুদ্ধপাগল জার্মানী (প্রবন্ধ)	ঐ	১৩৬
রজত-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল	...	১১৮
রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি.এ	২২৫, ২৪২, ২৬৭, ২৯১
রাঘবেন্দ্রের রূপান্তর (গল্প)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ	২৭৫
রাজা ও রাঁধুনী (গল্প)	শ্রীসীতা দেবী	৪৬
রাতের বাহার (কবিতা)	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	১৮২
রামধনু (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ	১
লাল করবীর গাছ (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮১

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
শিবুর কথা (গল্প) ...	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ ...	২৮২
শিশুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ (জীবনী) ...	শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাহিত্যভূষণ ...	৩৬
শিশুসাহিত্য-সংবাদ (সমালোচনা) ...	...	১৫৮, ২৩২, ২৫৪
সতী জয়মতী (ইতিহাসের কথা) ...	শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ ...	১৬৮
সন্দেশ		২২, ৪৮, ৭১, ৯৪, ১১৯, ১৫৯, ১৮১, ২০৭, ২৩১, ২৫৫, ২৭৯, ৩১১
সর্ব্বভুক্ সৈন্যদল (প্রবন্ধ) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ ...	৭৪
সাধ (কবিতা) ...	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৮৫
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন ...	... ...	৭২
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর ...	— ...	৯৫
সাম্যবাদ (নাটিকা) ...	বন্দে আলি মিয়া ...	২০৭
সিসিলি (দেশবিদেশের কথা) ...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ,বি.এল ...	১৫০
সুমেরের কথা (ইতিহাসের কথা) ...	শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ ...	১১০
সূর্য্যকিরণ (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ ...	২৫৭
হর্ষবর্দ্ধনের পথের দাবী (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	২৬
হারানো ছেলে (গল্প) ...	শ্রীমানবেন্দ্র পাল ...	২৫৩
হারানো জাহাজের সন্ধানে (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৫০

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যার সহিত রামধনুর ১৬শ বর্ষ শেষ হইল। আগামী বৈশাখ হইতে রামধনুর ১৭শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া রামধনুর আগামী বর্ষের বার্ষিক (তিন টাকা) বা ষন্মাসিক (১৷৵০) চাঁদা আগামী ২০শে চৈত্রের মধ্যে মনি অর্ডারে আমাদের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া সুখী করিবেন। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে আমাদের কার্য্যালয়ে (১৬, টাউনসেণ্ড রোড) বা শাখা কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) চাঁদা জমা দিতে পারেন। কোন কারণে মনি অর্ডার করা অসুবিধাজনক হইলে অনুগ্রহ করিয়া ভি. পি. করিবার নির্দ্দেশ দিয়া পত্র দিলে ভাল হয়। কারণ কাগজের অপ্রাচুর্য্যের জন্য বর্ত্তমানে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রামধনু ছাপা হয়, উহা যে কোন সময়ে নিঃশেষিত হইয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে পত্র দিলে যাঁহারা রামধনু লইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের উহা পাইতে কোনও অসুবিধা হইবে না। ভি.পি.তে অতিরিক্ত।৵০ লাগিবে।

আমরা আশা করি এ বৎসর যাঁহারা গ্রাহক আছেন তাঁহারা আগামী বৎসরও গ্রাহক থাকিবেন। কোনও বিশেষ কারণে কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে আগামী ২০শে চৈত্রের মধ্যে আমাদের জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

২০শে চৈত্রের মধ্যে কাহারও চাঁদা বা নিষেধসূচক পত্র না পাইলে আমরা উদ্বৃত্ত বৈশাখ সংখ্যাগুলি তাঁহাদের নিকট (ক্রমিক গ্রাঃ নং অনুসারে) ভি. পি.তে পাঠাইব। আশা করি উহা ফেরৎ দিয়া এই দুর্দ্দিনে কেহই আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করাইবেন না। ইতি—

নিঃ কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

আমাদের সর্ব্বজনসমাদৃত পূজাবার্ষিকী

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

মধু মেলা

মূল্য মাত্র দুই টাকা

এই দুর্ব্বৎসরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত প্রবন্ধে ও চিত্রে সমৃদ্ধ বিশাল গ্রন্থ

[দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল]

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী
ছোঃ চয়নিকা
গল্প সঞ্চয়ন
ঝলমল
আজব বই
শিশু-গল্পিকা
প্রত্যেকখানি
২৲

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী
সোনার কাঠি
যাদুঘর
চিত্রদীপ
মায়া মুকুর
সোনালী ফসল
প্রত্যেকখানা
২৲

পুরস্কার বিতরণে দিবার ভাল ভাল বই

হারানো দিন ১৲ দুই ভাই	১৲	তাতারের বন্দী	৸০
দেড়শো খোকার কাণ্ড	১৲	আধুনিক রবিনহুড	৸০
পাল্কী বুড়ো	।৵০	সাহারার আতঙ্ক	॥৵০
ছানা বড়া	।/০	স্বর্গে থিয়েটার	॥৵০
অন্ধকূপের বন্দী	৸০	ছেলেধরা সার্কাস্	॥৵০
ছোটদের শাহনামা	৸০	রোমাঞ্চকর কাহিনী	॥০
উড়োজাহাজে কয়েদী	॥০	কম্যাণ্ডার কবুতর	৸০
বোম্বেটে দ্বীপ	৸০	আকাশ গঙ্গা	৸০
তেপান্তরের মাঠ	॥০	দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন	॥০
নিশির ডাক	৸০	ঋষি অরবিন্দ	॥০
বিষের তীর	॥০	দানবীর কার্ণেগী	॥০

বিস্তারিত পুস্তকের তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের দ্বিতীয় বর্ষের ২৩ সংখ্যা অবধি প্রকাশিত হইয়াছে

"নব প্রকাশিত"

ওপারের দূত-প্রবোধ সান্যাল, দ্বাদশ সূর্য্য (জীবনীকথা)-নৃপেন চট্টোপাধ্যায়
২৪নং কাঞ্চনজঙ্ঘা 'জয় পতাকা'—শৈলবালা ঘোষজায়া
জ্যৈষ্ঠ মাসে বাহির হইবে।

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি. ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি।"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

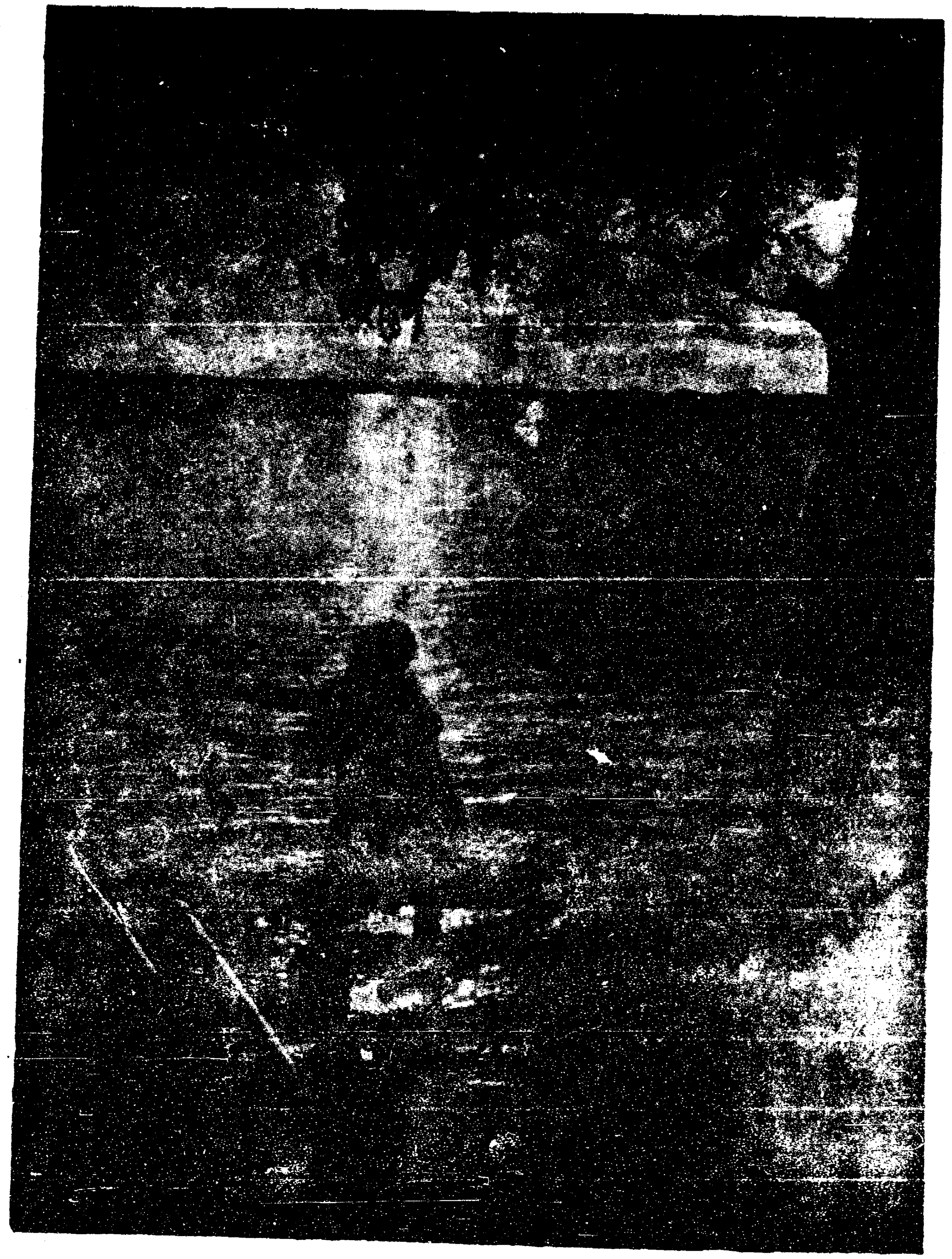

নূতন প্রভাত

আলোকচিত্র—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৫০ { ১ম সংখ্যা

রামধনু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

উঠ্‌লো আবার রামধনু ভাই,
ওই যে দেখ নূতন হয়ে,
সাত রঙা রঙ উপ্‌ছে ওঠে—
সুধার ধারা যায় বয়ে।
এক দিকে তার আলোর খেলা,
অন্য দিকে মেঘের মেলা,
আবার এলো অশ্রু-হাসির
ফুলের সাজি ওই লয়ে।

সবাই করো উৎসব আজ
আনন্দের আর ওর নাহি,
ছুটে বেড়ায় কিশোর হিয়া
জগদীশের জয় গাহি।
সাতটি রঙের ঝিলমিলি ভাই,
এই লাবণ্য আর কোথা পাই ?
অনাগত গৌরবেরি
বার্ত্তা যেন যায় ক'য়ে।

ফাঁসির পর

শ্রীশামুক

প্রিয়সুখবাবু মতিহারির সাবজজ্ থেকে পাটনার ছোট আদালতের বড় জজ্ হয়ে এলেন। বেশীদিনের জন্য নয়, মাত্র দু'মাসের জন্য। এর পর চাকরীর মিয়াদ ফুরিয়ে গেল, অবসর নিতে হ'ল।

এই শেষের দু'মাসে একটা শক্ত কেস্ তিনি চালালেন খুব সুন্দর ভাবে। এক প্রসিদ্ধ ডাকাতের মামলা। দাগী আসামী পালিয়ে বেড়িয়ে বহু দিন বাদে ধরা পড়েছে। এর নামে সতেরোটা খুন-জখমের কেস্, আর চুরি-ডাকাতি যে কত তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। ডাকাত মশায়ের নামটি বেশ, রঘুনন্দন আনন্দপ্রসাদ! কলিযুগের এই রঘুনন্দনটি ঘরে ঘরে যে কি রকমের আনন্দের প্রসাদ বিলিয়ে বেড়িয়েছেন, সে আর বলে কাজ নেই।

রঘুর ফাঁসির হুকুম হ'ল। প্রিয়সুখবাবু কলম দিয়ে নাম সই করে কলম ছুঁড়ে ফেলে এজলাস থেকে বেরিয়ে এলেন। এই ছিল তাঁর কাজের শেষ দিন। সকলে বলাবলি করতে লাগলো যে আসছে নতুন বছরে 'রায় সাহেব' উপাধি পাবেনই পাবেন, 'রায় বাহাদুর' হ'লেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

এর পর কিছুদিন বিদায় অভিনন্দন ও নিমন্ত্রণ খেতে ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রিয়সুখবাবু ঠিক

করেন যে এসব চুকলেই কলকাতায় ফিরে যাবেন। কলকাতায় ওঁর নিজের বাড়ি, একমাত্র ছেলে ঐখানে থেকে কলেজে পড়ে। স্ত্রী বহুদিন আগে মারা গেছেন।

পাটনায় থাকার শেষের ক'দিন প্রিয়সুখবাবুকে বড় বিষণ্ণ দেখা গেল, যেন একটা কিছু ভয়ানক দুর্ভাবনা তাঁর মনকে তোলপাড় করে বিপন্ন করছে। সকলে বলে, তিরিশ বছর চাকরী করে চলে যাচ্ছেন—সেজন্য দুঃখিত। আসলে ব্যাপার অন্য।

কলকাতায় ফিরবার দু'দিন আগে তাঁর ছেলে অশোক বাবার কাছ থেকে এক শিলমোহর করা রেজিষ্টারি চিঠি পেল। তাতে লেখা—"বাবা অশোক, আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। দেখা হলে সব বলবো। তুমি পাড়ার সকলকে জানিয়ে দাও যে আমি এখন কলকাতায় ফিরবো না, মুসৌরী পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি এবং তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। এই কথা রটিয়ে সামনের দরজায় একটা তালা লাগিয়ে তুমি খিড়কি দিয়ে আনাগোনা করবে সাবধানে, কেউ দেখতে না পায়। চাকর বিষ্টুকে মাহিনা চুকিয়ে ছুটি দিয়ে দাও। ষ্টেশনে আমায় নিতে এস।"

অদ্ভুত এ চিঠি! মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু বাবা যখন বলেছেন, করতে হবে বৈকী। বিপদ্ কি হতে পারে ভেবে ভেবে অশোকের ঘুম হ'ল না দু'রাত্তির।

ষ্টেশনে বাবার পায়ের ধূলো নিয়ে যেই জিজ্ঞাসা করেছে, 'বাবা কি বিপদ্?' অমনি প্রিয়সুখবাবু উত্তেজিত ভাবে চাপা গলায় বলে উঠেন, 'চুপ! চেঁচিয়ো না। আমার চিঠি আর কেউ পড়েছে? পুড়িয়ে ফেলেছ? ফেল নি? তুমিও আমার বিপক্ষে যাচ্ছ অশোক?'

অশোকের মাথার ভিতরটা ঘুরে উঠে। বাবা এসব বলেন কি! বিপদ্ যে খুবই ভীষণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না কোন। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয় সাবধান হয়ে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেনি বলে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে অনেক রাস্তা এলোমেলো ঘুরে তারা বাড়ির দিকে চললো। ড্রাইভারকে বলা হ'ল না কোথায় যেতে হবে। শুধু 'ডাইনে যাও, বাঁয়ে, এবার সিধ্ধা—' প্রিয়সুখবাবু এরকম বলতে থাকলেন। অশোকের বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপানি থামতে চায় না।

প্রিয়সুখবাবুর বাড়ি এক নির্জ্জন পাড়ায়। খিড়কির দিক্‌টায় লোক চলাচল প্রায় থাকে না। একটু দূরে ট্যাক্সি থামিয়ে, রাস্তার উপর জিনিষপত্র নামিয়ে, ভাড়া চুকিয়ে তাকে বিদায় করা হ'ল। তারপর বাপ ছেলে মিলে বাক্স পেঁটরা হাতাহাতি করে বারে বারে বাড়িতে নিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে চারিদিক্ ভাল করে দেখে প্রিয়সুখবাবু নিজের ঘরে গিয়ে বসেন। ডাকেন 'শোন অশোক, বলি ব্যাপার সব।'

অশোক বাবার সামনে এসে ভয়ে ভয়ে বসে পড়ে। 'পেন্সন নেবার আগে শেষ কেস্‌টা করলাম সে এক ভয়ানক খুনে ডাকাতের মামলা। দারুণ ডাকাত, নাম রঘুনন্দন। মানুষ মানুষকে

ফাঁসি দিয়ে কিছু আনন্দ পায় না। কিন্তু বিচারক হয়ে আইন ত' দেখতে হবে। আমি তাকে ফাঁসির হুকুম দিলাম।'

এবারে গলা খাটো করে মুখ কাছে নিয়ে এসে বলেন,—'কলকাতায় আসবার তোড়জোড় করছি, শুনলাম কি জানো? শুনলাম সে জেল থেকে পালিয়েছে আর জেল-কর্ত্তারা মিছামিছি রটিয়েছেন যে তার ফাঁসি হয়ে গেছে—নিজেদের চাকরী যাবার ভয়ে। বুঝলে এবার? বুঝলে ব্যাপার?'

অশোক ঘাড় নেড়ে জানায় যে এখনো ভাল বোঝা গেল না। 'এও বুঝতে পারো না! রঘুর যত আক্রোশ কার উপর? কে তাকে ফাঁসির হুকুম দিল। বুঝেছ? সে সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে, এক কোপে আমাকে নিঃশেষ করে দেবে। বিপদ্ নয়? এর চেয়ে বড় বিপদ্, ভীষণ অবস্থা আর মানুষের কি হতে পারে? এখন আমায় লুকিয়ে থাকতে হবে, নিঃশ্বাসটুকুও জোরে ফেললে চলবে না—হঠাৎ ধাই করে ঘাড়ে এসে পড়বে কোপ। পাটনাতেও সকলকে বলে এসেছি মুসৌরী যাচ্ছি, মাঝের একটা ষ্টেশনে নেমে গাড়ি বদলে এখানে চলে এসেছি। বুঝলে অশোক, বুঝলে বাবা, বিপদ্ কত বড়? ভারী সাবধানে থাকতে হবে। বাপের জীবনের জন্য তোমাকেও কষ্ট সহ্য করতে হবে।'

অশোক হাঁ না কিচ্ছু বলতে পারলো না চট করে। কত রকমের ভয় ভাবনা এসে জুটলো মাথার ভিতর; চুপ করে বসে তাদের পিছনে ছুটে ছুটে দিশেহারা হয়ে যায়।

ফোঁস্ করে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে,—'আপনি যে রকম বলেন সে রকম করবো বাবা। আর একথা বলে রাখছি, আমি যতক্ষণ আপনার পাশে আছি, সে ডাকাতই হোক বা খুনীই হোক, আপনার মাথার চুলটুকুও ছুঁতে পারবে না।'

প্রিয়সুখবাবুর চোখ ছলছল করে ওঠে। এরপর থেকে সত্যি অতি সাবধানে কাটাতে হয়। এক একটা দিন যায় না ক্ষণ যায়। কাল্‌কে কি হতে পারে ভাবতে গেলে বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে ওঠে।

বাড়ির দরজা জানালা সব সময়ে বন্ধ। বিশেষ দরকারে খিড়কি দিয়ে যাওয়া আসা। পা টিপে টিপে চলা। শব্দ না করে মুখে কাপড় চেপে হাঁচা, কাসা, আর সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাইরের দিকে—কেউ এসে পড়ে কিনা হঠাৎ—না জানিয়ে।

রাত্রে শুতে যাবার সময় প্রিয়সুখবাবুর ঘরের দরজায় একটা বড় তালা লাগিয়ে অশোক জানলা গলিয়ে চাবি বাবার হাতে দিয়ে দেয়। প্রিয়সুখবাবু ভিতর থেকে বলেন,—'এবার সব ঠিক আছে, তুমি শোওগে। আমি আরেকটা তালা এদিকে লাগিয়ে দিলাম।'

অশোক বলে,—'কিন্তু বাবা, তোমার ঘরের সিঁড়ির দিকের ছোট দরজাটা?'—'ও আমি ভিতর থেকে ভাল করে বন্ধ করেছি। তা ছাড়া বন্দুক সঙ্গে তৈরী থাকবে।'

এ ভাবে মানুষের কতদিন চলে? কিন্তু কেটে যায় কষ্টেস্থষ্টে ক'টা দিন রাত্রি। অশোকের যখনই মনে একটু সাহস হয়, ভাবে এত বাড়াবাড়ির মানে নেই কোন। আসুক না দেখি। বাবার মুখের দিকে তাকালে কিন্তু মনটা মুসড়ে যায়।

প্রিয়সুখবাবু বলেন,—'বুঝলে বাবা, এবার আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর ক'টা দিন মাত্র এই বাতাসে নিশ্বাস নেবো। আমি বেশ জানতে পারছি তারা তৈরী হয়ে আসছে, ঝপ্ করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।'

এ কথা শুনে কার সাহস থাকে? অশোক উত্তর দেবে কি, বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠে।

অশোকের রাত্রে ঘুম হয় না ভাল। কত সময় জেগে শুয়ে থাকে। কত ধরণের আওয়াজ শুনতে পায়। কে যেন দরজায় টোকা মারলো, দৌড়ে চলে যায় কারা, সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়লো কি, ঘরের মেঝেতে চেপে ধরলো কাকে—এমনি কত রকম! কান পেতে শোনে, উঁকি মেরে দেখে, সমস্ত মন দিয়ে ভাবে—হদিস পায় না কোন। শব্দগুলি যে সত্যি সে বিষয়ে সন্দেহ কিছু নেই, কিন্তু কিসের এ শব্দ, কারা করছে এমন আওয়াজ, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হিসাব মেলে না।

সেদিন দুপুরে কয়েকটা জিনিষ কিনতে বাইরে গিয়েছিল। ফিরে খিড়কির দরজা দিয়ে যেই ভিতরে ঢুকেছে, উপর থেকে বাবা ইসারা করে ডাকলেন।

অশোক সটান বাবার কাছে গেল।

প্রিয়সুখবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন, কাছে এসে বলেন—'তুমি আমার নিজের ছেলে হয়েও বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছো?'

অবাক্ অশোক। বাবা বলেন কি!

প্রিয়সুখবাবু হঠাৎ ধমকে ব'লে উঠেন,—'রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছিলে? কা'কে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে খিড়কির দরজা? আমি সমস্ত দেখেছি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে। বল, রঘুর দলের লোককে সন্ধান কেন দিলে আমার? জবাব দাও—ছেলে হয়ে তুমি বাপের এত বড় সর্ব্বনাশ করলে কেন? বেশ, ওরা এসে পড়বার আগে এই তোমার সামনে আমি বন্দুকের গুলিতে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্ছি। তা'হলে শান্তি পাবে ত'?'

কাগজে মোড়া জিনিষগুলি অশোকের হাত থেকে ধপাধপ্ পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। গলা থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুলো কিন্তু কথা ফুটলো না। চোখে জল এসে যায়। নিজেকে জোর করে সামলে নিয়ে থেমে থেমে বলে,—'উনি যে কালিকাকা—আপনার কতদিনের বন্ধু—আজ রাত্রে চলে যাচ্ছেন তীর্থ ভ্রমণে—অনেক দিনের জন্য। অনেক করে আপনার কথা

জিজ্ঞাসা করলেন, একটি বার দেখা করতে চান। শেষে বলতে বাধ্য হলাম বাবা এখানে আছেন, শরীর খারাপ, কারুর সঙ্গে দেখা করা বারণ;—তা আপনি আসবেন আজ সন্ধ্যার সময় খিড়কির দরজা দিয়ে।'

কিছু শান্ত হয়ে মাথা নেড়ে প্রিয়সুখবাবু বলেন,—'উচিত কাজ হয়নি। বিপদের সময় শত্রু কে বন্ধু কে বোঝা ভীষণ ব্যাপার। ওকে যে রঘু একটা মতলবে পাঠাচ্ছে না তা কে বলতে পারে? তা দেখ, তুমি একটু সতর্ক থাকবে, আমরা কথা বলবো, তুমি পিছনে দাঁড়িয়ে থেকো।'

কালিকাকা সন্ধ্যার সময় এলেন। মোটাসোটা হাসিখুসি মানুষ। কারণে অকারণে হেসেই খুন। বলেন,—'ও প্রিয়, বলি ব্যাপার কি তোমার! দরজা-জানলা বন্ধ করে কয়েদীর মতন রয়েছ কেন? বড় মজার লোক তুমি,—এমন মুখ করেছ যেন যত রজ্যের ভাবনা তোমার মাথায়—হা হা হা।'

এ হাসি অনেকক্ষণ চলে। ঘরে এসে বসেন। প্রিয়সুখবাবুর সামনাসামনি। পিছনে দাঁড়িয়ে অশোক দেখে, বড় তাকিয়ার পিছনে কি যেন একটা লুকানো আছে, বাবা মাঝে মাঝে হাত দিয়ে দেখছেন।

কালিকাকা বলেন,—'কি চমৎকার রায় দিয়েছ ভাই রঘুনন্দনের কেস্‌টায়। হাকিম একেই বলে। কাগজে সব পড়েছি। নিশ্চয় এবার রায় বাহাদুর হবে। হা হা হা।'

প্রিয়সুখবাবু অশোককে চোখের ইঙ্গিত করেন—দেখেছ, কথার মোড় ফিরাচ্ছে, আসল জিনিষে এসে পড়ছে, বলেছিলাম কিনা।

কালিকাকা বলেন,—'আচ্ছা, তোমার ভয় করতো না এই সব খুনে ডাকাতের মামলা করতে? আমি হ'লে ত' বাপু—উঁহু, কে জানে কখন কে এসে—হাহাহা হিহিহি—'

প্রিয়সুখবাবু কট্‌মট্‌ করে অশোকের দিকে তাকান—দেখলে, কি সর্ব্বনাশ করলে তুমি একে ঘরে ডেকে এনে, নিশ্চয় দলবল বাইরে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে।

কালিকাকা পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে যাবেন, একটা ছোট হুইস্‌ল্‌ কোলে পড়ে গেল।

—'আমার নাতিটা এমন দুষ্টু, রাজ্যের তার খেলার জিনিষ আমার পকেটে রেখে দেবে, দেখি কি রকম বাজে—'

'খবরদার, চোপ রও'—প্রিয়সুখবাবু চীৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠেন। এক ধাক্কায় তাকিয়া ঠেলে ফেলে বন্দুক বার করে তাগ করেন—থরথর করে কাঁপছে তাঁর সারা দেহ।

কালিকাকার মুখ শুখিয়ে গেল, অত হাসির ছিটেফোঁটাও বাকি রইলো না।

প্রিয়সুখবাবু হুকুম করেন,—নড়বে না, চেঁচাবে না। দাও হুইস্‌ল্‌ আমার হাতে। অশোক, এর পকেটে কি সমস্ত কাগজপত্র আছে বার কর—বার করে নাও, আমি বলছি।'

ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে অশোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও পকেট থেকে বার করে—একটা নস্যির ডিবে, কয়েকটা চীনাবাদামের খোলা, পকেট টাইমটেবল, ছ' আনা পয়সা, ও একটা পিতলের সিংহের ভাঙ্গা মুখ।

—'আর কিছু নেই? ভাল করে দেখেছ? আচ্ছা, যাও কালি, সিধে বাড়ি চলে যাও। আর এদিকে তুমি বা তোমার দলের কেউ পা দিয়েছ ত' দুড়ুম্‌। আমি সব বুঝি। রঘু ভারী হুঁসিয়ার, তোমায় দলে ভিড়িয়েছে, বন্ধু সেজে পাঠিয়েছে—হুইস্‌ল্‌ বাজালেই ছুটে আসবে—না?'

কালিকাকা চোখ কপালে তুলে দু'পা যান আর ফিরে বন্ধুর দিকে একবার তাকান। চোখ দুটি যেন স্থির হয়ে গেছে, চোখের পাতা যেন আর পড়বে না।

কালিকাকা চলে গেলেন। ভাল করে দরজা বন্ধ করা হ'ল। প্রিয়সুখবাবু অনেকক্ষণ বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন, যদি বাঁশীর আওয়াজ হয়—যদি কেউ আসে। কিন্তু কেউ এল না।

সেইদিনই রাত্রে। গভীর রাতে অশোকের কানে এল সেই সব পরিচিত শব্দ। কে যেন দরজায় টোকা মারলো, সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়ে গেল কি, দৌড়ে চলে যায় কারা, ঘরের মেঝেতে চেপে ধরলো কাকে যেন!

একবার মনে হয় মিছে মনের ভয়ের অনাসৃষ্টি যত সব—আবার মনে হ'ল সত্যি, নিছক সত্যি, ভুল নেই কোন!

ধীরে ধীরে উঠে জানলার সামনে গেল। এখান থেকে খিড়কির দিক্‌ ও ছোট গলির একটা অংশ দেখা যায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ,—মিছে নয়, সত্যি! দেখে একটা আবছা ছায়ামূর্ত্তি দেওয়াল ঘেঁসে চলে যায়! আগাগোড়া সাদা কাপড়ে ঢাকা, কাঁধের উপর উঁচু মতন কি। কাঁধে যেন আরেকটা হাত ফুঁড়ে বেরিয়েছে, আঙ্গুল উঁচু করে দেখাচ্ছে। অশোক দু'পা পিছিয়ে আসে, আবার এগিয়ে যায়। ঐ মূর্ত্তিটি ফিরে এল, খিড়কির দরজা খুট করে খুলে ভিতরে ঢুকলো!

অশোকের সারা দেহে থরথর ক'রে যেন ভূমিকম্প হয়ে যায়। মাটিতে বসে পড়ে। বাস্‌, এই শেষ, এইবার এসেছে তারা!

কিন্তু বসে থাকা চলে কি? বাবার জীবন বিপন্ন, নিজের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। অশোক মাথার শিয়র থেকে মোটা লাঠি দু'হাতে শক্ত করে ধরে দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে আসে। দু'জনে মুখোমুখি বারান্দায়, বাবার তালাবন্ধ ঘরের ঠিক সামনে! অশোক লাঠি তুলে ধরে কোপ দেবার মত। কিন্তু তার আগেই সেই কাপড়ে ঢাকা মানুষ তার কাঁধের সেই উঁচু করা

জিনিষটি দিয়ে সশব্দে আঘাত করে দেয়। মাথায় টিপ ছিলু, লাগলো ডান হাতের গোড়ায়। লাঠি পড়ে গেল, অশোকও পড়ে গেল, টাল সামলাতে না পেরে।

অশোকের বুকের উপর চেপে বসলো সে, কপালের উপর চেপে ধরে কাঁধের সেই উঁচু করা জিনিষটা। অশোক ভয়ে বিহ্বল হয়ে দেখে সেটা বন্দুকের নল, দেখে সে মানুষটির মুখ থেকে ঢাকা কাপড় সরে গেছে—সে তার বাবা! 'বাবা, বাবা, আমি অশোক, অশোক'—প্রাণপণে চীৎকার করে।

প্রিয়সুখবাবু একটা ঘুমভাঙ্গা মানুষের মত জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন,—'অ-শো-ক, অশোক তুই—' তার পর মূর্চ্ছিত হয়ে ছেলের বুকের উপর লুটিয়ে পড়েন।

* * * *

ডাক্তার বললো,—ভয়ে ভয়ে প্রিয়সুখবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে একেবারে, বিলকুল। রাত্রে ভাবনায় ঘুমোতে না পেরে বন্ধ ঘরের অন্য দরজা খুলে সারারাত সম্ভবতঃ এই রকম টহল দিয়ে বেড়াতেন।

পুলিশ খবর দিল রঘুর ফাঁসি বহুদিন হ'য়ে গেছে। তার পালানোর খবরটা সত্যি বটে কিন্তু ধরা পড়তে বেশী দেরী হয় নি।

অশোকের কিন্তু এখনো মনে একটা সন্দেহ জাগে। রাত্রে যে সব শব্দ শোনা যেত সে কি শুধু তার বাবার? যেন অনেক লোক আসত, যেত, ঘুরে বেড়াত! বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে এর সমাধান হয় কিন্তু জিজ্ঞাসা করে কাকে? বাবা কোন কথা শোনেন না, বোঝেন না, কেবল একই কথা বার বার বলেন। বলেন,—'ঐ রঘু এসেছে, চট্ করে ফাঁসি দিয়ে দাও!'

প্রিয়সুখবাবু এখন রাঁচীতে—পাগলা-গারদে।

টুব্লু

শ্রীঅজিত দত্ত

আব্দারে টুব্লুর নেই কোনো জুড়ি,
উড়োগাড়ি দেখে চায় ওড়াতে ও-ঘুড়ি,
কাছি মেজে মাঞ্জায়
আমাদের প্রাণ যায়,

বাঁশবেড়ে ছুটে যাই আন্তে লাটাই,
তিন দিন-রাত্তির বেঘোরে কাটাই।

ভোর থেকে টুব্লুর সুরু বায়না,
যেটা চায়, এনে দিলে সেটা চায় না।
কখনো বা চাই তার
পাঞ্জাবী চুড়িদার,
কখনো বা চটি চাই, কভু নাগ্রি,
চাই তার তলোয়ার, চাই পাগ্ড়ি।

যদিও সে চেনে নাকো অ-আ-হ্রস্বই,
আব্দারী-বুদ্ধিতে জুড়ি ওর কই?
খেলনা সে নেয় না,
এমনি সে স্যায়না,
ফাঁক খুঁজে তাগ ক'রে ক'রে বসে রাগ,
কোনো কথা শোনে না সে, মানে না সে বাগ।

হনুমান দিয়েছিলো কত বড় লাফ
হঠাৎ সে চায় তার নির্ভুল মাপ;
চুল চেরা তর্কে
যায় না সে ভড়্কে,
হেরে গেলে শেষটায় ধরে কান্না,
কান্না সে নিতান্ত মিঠে গান না।

আব্দারে টুব্লুর জুড়ি কেউ নয়,
বাঘ থেকে টুব্লুকে বেশি করি ভয়।

পড়ো যদি পাল্লায়
নিয়ে আলখাল্লায়
সন্ন্যেসী হয়ে যেতে চাইবে শেষে,
টুবলুকে চেনো না? ভীষণ ছেলে সে।

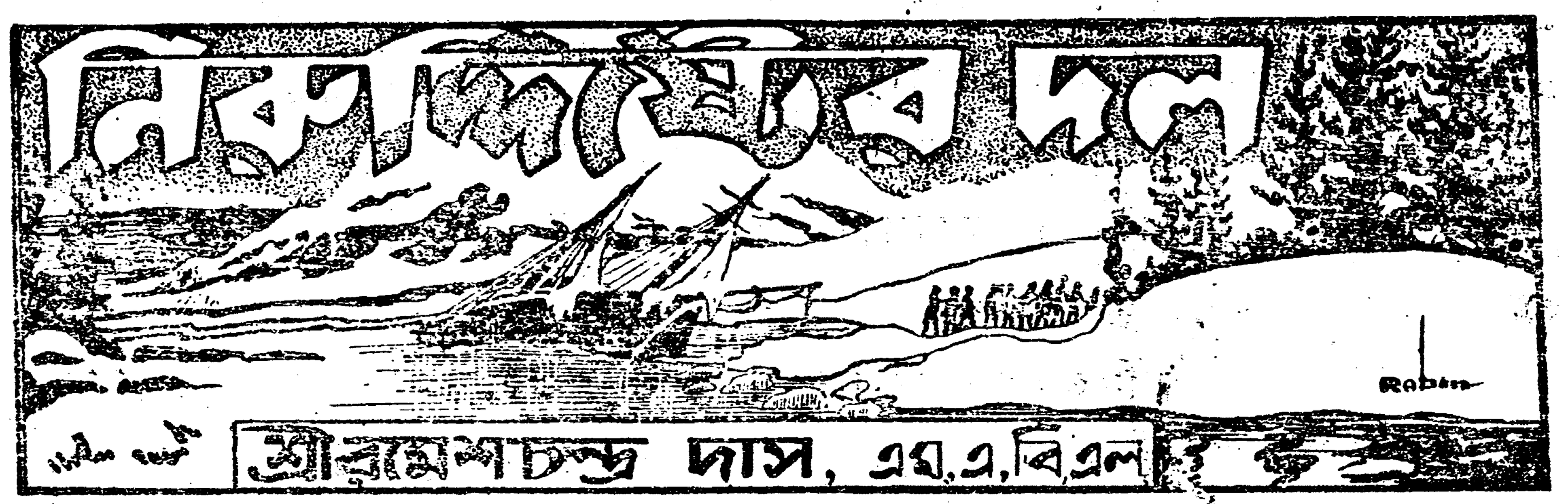

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক ঃ— ১৪টি ভারতীয় বালক ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ড আসে। দ্বীপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য একটি জাহাজ ভাড়া করা হয় এবং ছেলেরা আগেই তাহাতে চড়িয়া বসে। রাত্রে প্রবল ঝড় ওঠে এবং কেহ টের পাইবার আগে কখন দড়ি ছিঁড়িয়া সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে জাহাজ এক জনহীন অজানা দ্বীপে গিয়া পড়ে। ছেলেরা এবং মাওরী বালক-ভৃত্য বুনো নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সেই দ্বীপেই বসবাসের ব্যবস্থা করে এবং ক্রমে নানা কৌশলে নিজেদের সমস্ত অভাব-অসুবিধা মিটাইতে থাকে। ছেলেদের মধ্যে ২টি দল হয়। একদলের নেতা সুশান্ত—বর্ত্তমানে অধিকাংশের ভোটে সে-ই দলপতি। অপর দলের নেতা রঞ্জিৎ। রঞ্জিৎ তার ৩টি অনুচর সহ পৃথক্ হয়। ইতিমধ্যে এক প্রবল ঝড় উঠে, এবং বিদ্যুতের আলোয় রঞ্জিৎরা সমুদ্রের তীরে একটা ভাঙ্গা নৌকা ও ২টি মানুষের মৃতদেহ দেখিতে পায়।

২৭

পিছন ফিরিতেই আকাশ যেন সশব্দে মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভয়ার্ত্ত বালকেরা হাত ধরাধরি করিয়া দারুণ বেগে ছুটিতে লাগিল। সারা রাত যে কি ভাবে কাটিল তা যেন তাদের হুঁশই নাই; ক্রমে বৃষ্টি থামিল এবং শেষে ক্রমশঃ ভোরের মেঘলা আলো দেখা দিল। এইবার তাহাদের আস্তানার দিকে যাওয়া উচিত। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে সেই লোক দুটির একটা গতি করা দরকার। অনেক কষ্টে ঝড়ের ঝাপ্টা এড়াইয়া শেষে তাহারা সেই নৌকার নিকটে

গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড! নৌকাটা ঠিক রহিয়াছে, কিন্তু সেই মৃতদেহ দুটি গেল কোথায়? তাহারা চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু মড়া দুটির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রোহিতাশ্ব কহিল, "তবে কি লোক দুটি বেঁচে ছিল, এখন উঠে চলে গেছে?" রঞ্জিৎ গম্ভীর মুখে কহিল—"উঠে চলে যায় নি, রোহিতাশ্ব, ঐ সমুদ্রের ঢেউএ তারা ভেসে গেছে।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে দূরবীণ বাহির করিয়া ভোরের আবছা আলোয় সমুদ্রের চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিল কিন্তু মৃতদেহগুলিকে কোথাও ভাসিতে দেখিল না। তখন তাহারা বিষণ্ণ মনে নৌকার কাছে ফিরিয়া আসিল। নৌকার মধ্যেও কোন মৃতদেহ নাই। নৌকাটা প্রায় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ, মজবুত ধরণের জাহাজের নৌকা, কিন্তু সেটা আর ব্যবহারযোগ্য ছিল না, কারণ নৌকার এক পাশ জলমগ্ন পাথরের উপর ধাক্কা খাইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নৌকার মধ্যে কেবল আছে কিছু ছেঁড়া পাল ও কয়েকগাছা মোটা দড়ি। নৌকার একপার্শ্বে একটা পিতলের ফলকের উপর কেবল নিম্নলিখিত কথাগুলি ইংরাজীতে খোদিত রহিয়াছে—'সেভার্ন—সান্ ফ্রান্সিসকো'। সান্-ফ্রান্সিসকো! ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের সেই বিখ্যাত বন্দর সান্-ফ্রান্সিসকো! তাহা হইলে যে জাহাজ হইতে এই নৌকা ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা আমেরিকার!

রঞ্জিতের দল চলিয়া আসিবার পর ফরাসীগুহার বাকি ছেলেগুলি কিরূপে দিন কাটাইতেছিল তাহা আমরা অনেক দিন শুনি নাই। দলভাঙ্গা হওয়াতে সুশান্তর মন এখন বড়ই খারাপ। অশোক সান্ত্বনাচ্ছলে তাহাকে প্রায়ই বলিত, "অত মন খারাপ কেন করছ, সুশান্ত? আমি বল্‌ছি তারা শীঘ্রই ফিরে আস্‌বে। বর্ষা একবার নামুক না, তখন তারা কালো মুখ ভোঁতা করে আবার আমাদের ফরাসীগুহায় এসে উঠবে।" দ্বীপ হইতে উদ্ধারের চিন্তায় সুশান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। সে এবার ভাবিল, শূন্যে যেখানে তাহারা বেলুন উড়াইয়া রাখিয়াছে সেখানে একটি অতিকায় ঘুড়ি উড়াইয়া রাখিতে পারিলে কেমন হয়! সমুদ্রের ধারে সব সময়েই বাতাস থাকিবে, দড়িরও অভাব নাই, তেমন উচুঁতে টাঙ্গাইতে পারিলে ৫০।৬০ মাইল্ দূর হইতেও উহা দেখা যাইতে পারে। বনের বেত আর ক্যান্‌ভাস্ কাপড় দিয়া দেখিতে দেখিতে এক বিরাট্ ঘুড়ি তৈরী হইল। ঠিক হইল পরদিন বৈকালে ঘুড়ি ওড়ানো হইবে। কিন্তু পরদিন সকাল হইতেই আকাশের অবস্থা ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইল। যে ঝড় রঞ্জিৎদের মাথার উপর দিয়া বহিয়াছিল, ইহা সেই ঝড়। কাজেই ঘুড়িকে আর সেদিন ফরাসীগুহা হইতে বাহির করা গেল না। তার পরদিনও ঝড় সমান বেগে চলিতে লাগিল; শুক্রবার ঝড় থামিল। সুশান্ত ঠিক করিল সেই দিন দুপুরেই সে ঘুড়ি উড়াইবে। রোদ উঠিলেও, বাতাসে আজ খুব টান আছে,

রাক্ষুসে ঘুড়ি সহজেই উড়িবে। তার পর সন্ধ্যায় ঘুড়ি নামাইয়া তাহার লেজে একটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঝুলাইয়া দিবে। তাহা হইলে রাত্রিতেও বহুদূর হইতে সেই আলো দেখা যাইবে।

বেলা তখন একটা। শঙ্খচূড় ও অশোক দুইজনে সেই রাক্ষুসে ঘুড়িটাকে তুলিয়া ধরিল। জাহাজের একটা চরকি-কলের সঙ্গে ঘুড়ির সূতা জড়াইয়া, কলটিকে মাটাতে আঁটিয়া লওয়া হইয়াছিল। সুশান্ত সেই কলের পাশে সূতা হাতে দাঁড়াইল। সুশান্তর হুকুম পাইলেই শঙ্খচূড় ও অশোক ঘুড়ি ছাড়িয়া দিবে। সমস্ত ছেলে দুই পাশে রুদ্ধ কৌতূহলে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সুশান্তর আর হুকুম দেওয়া হইল না। বিয়্যার্ কুকুরটাও তাহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ নয়নে তাহাদের কাণ্ড দেখিতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে তীরের মত ছুটিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

অযোগ্য

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বন্ বন্ বন্ বন্—

পঁয়তাল্লিশখানি বোমারুর একটি স্কোয়াড্রন শত্রুর সীমান্ত অতিক্রম করলো।

নীচে সাইরেন বাজলো, তার রেশ বাতাসে ঢেউ তুলে আকাশও ধ্বনিত করলো। কয়েকটি বিমান-ধ্বংসী কামানের গুলি ছিটকে গেল নীচে দিয়ে। স্কোয়াড্রন এগিয়ে চললো।

নীচে মখ্‌মলের মত বিছানো ক্ষেত, সূতোর মত খালের রেখা, ইটপাথরের টুকরোর মত এক একখানি বাড়ী। গাঁয়ের পর গাঁ পার হয়ে স্কোয়াড্রন এগিয়ে যায়।

নীচে এবার শহর দেখা যায়, নদীর রূপালী পাড়ের ধারে কারখানার সব চিমনী চোখে পড়ে।

স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডারের নির্দ্দেশ শোনা যায়—নীচে নামো—

লড়িয়ে-বিমানগুলো দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ে, বোমারুগুলো নামে নীচে। ফট্ ফট্ করে হাউইয়ের মত গোলা ছোটে, বোমারুগুলোও টুপ টুপ করে বোমা ছাড়ে। নীচের শান্ত শহরটীর বুকে বিস্ফোরণের শব্দ আর আগুনের খেলা সুরু হয়ে যায়।

প্লেনগুলো নেমে আসে শহরের ছাদের উপর, বিমান-ধ্বংসী কামান আর ঠিকমত গোলা চালাতে পারে না, শত্রুপক্ষের খান কয় লড়িয়ে ওঠে আকাশে, পরস্পর রোখারুখির মাঝে চলতে থাকে কলের কামান, শুধু শোনা যেতে থাকে একটানা শব্দ—পা পা পাপ্ পা পা……

প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে চঞ্চল, অপরকে আঘাত করতে উৎসুক।

মৃত্যুর খেলা সুরু হয়ে গেল আকাশে।

একটি বোমা বোধ হয় কোন আশ্রয়কেন্দ্রের উপর পড়েছিল। ভীত ত্রস্ত একপাল ছেলেমেয়ে গল্ গল্ করে পথে বেরিয়ে পড়লো। মেশিন্ গান্ করার এমন সুবিধা আর হয় না। যদি ওদের সবাইকে রক্তাক্ত করা যায় তাহ'লে সমগ্র নগরে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবার সুবিধা হবে। যত নিরীহ লোক মরবে লড়াইয়ের মাল মশলা তৈরীর হবে তত অসুবিধা।

স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার নেমে এলো তাদের মাথার উপর। এইভাবে তাদের কত জনকে শত্রুরা খুন করেছে, এখন সে তার শোধ নেবে। তার গান্ গর্জ্জে চললো—পা পা পাপ্ পা পা পা—

নীচে আর্ত্তনাদ উঠলো। এলোমেলো জনতা রক্তাক্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো পথের উপর।

কমাণ্ডার আরো নীচে নেমে এলো। ভীড়ের একজনকেও সে বাদ দেবে না।

হঠাৎ চোখে পড়লো একটি মেয়ে,—হন্যে হয়ে ছুটছে একটি ছেলেকে কোলে নিয়ে। দপ্ করে ভেসে উঠলো তার বোনের মুখখানা, ছোট্ট ভাইটিকে কোলে নিয়ে তারা দু'জনে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে ছিল পথের উপর। সেদিন শত্রুরা তাদের আক্রমণ করেছিল আর আজ তারা আক্রমণ করেছে। ঠিক যে জন্য শত্রুকে তারা পশু বলেছিল আজ নিজেরাই তার পুনরভিনয় করছে। ওই মেয়েটিকে সে এখুনি ধরাশায়ী করবে, আর তার ওই ছোট্ট ভাইটিকে। কেন? ওরা কি দোষ করেছে?

সহসা কমাণ্ডার ইঙ্গিত করলো—ফিরে চলো।

সঙ্গীরা অবাক্ হয়ে গেল। শত্রুর এই শহরটীকে মাঠ করে দেবার এমন সুযোগ এইভাবে ছেড়ে চলে যেতে হবে! কিন্তু নায়ককে প্রশ্ন করার অধিকার সৈনিকের নেই। ফিরতে হ'ল।

বোমা থাকতে বোমারুরা নীচে নামতে পারে না, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তারা খালি করতে করতে চললো।

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেনাপতিমণ্ডলী কৈফিয়ৎ তলব করলো।

সোভিয়েট সৈনিক, যা মনে ভাবে তাই মুখে বলে, এই তাদের শিক্ষা। স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার লুকালো না কিছুই গর্‌গর্ করে বলে গেল তার অনুভূতির কথা।

সেনাপতির চোখে ভ্রূকুটি ফুটে উঠলো ; বললে—এমন হ'লে তো তুমি শত্রুকে আঘাত হানতে পারবে না। সোভিয়েট চায় প্রত্যেকটি রুষের মন ইস্পাতে তৈরী হবে।

—কিন্তু মেয়ে আর শিশুর উপর আমি গুলি চালাতে পারবো না।

—কেন শুনি? ওরা ছেড়ে দিয়েছে? স্তালিনগ্রাদে? মাস্‌কৌতে? তবে?

—তারা অসভ্য বর্ব্বর হতে পারে, কিন্তু আমি তা পারবো না।

—তার মানে তুমি দেশের শত্রু...

—কখনো নয় কমরেড। সোভিয়েটের জন্য আমি সব করতে পারি কিন্তু শিশু ও বালিকাকে খুন করতে পারবো না। আমার ভাইবোনের মৃত্যুদৃশ্য আমি আজও ভুলতে পারিনি, নিজের হাতে আমি আর তার পুনরভিনয় করতে চাই না।—আমি অধ্যাপক, সোভিয়েট রাষ্ট্র আমাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার দিয়েছে, আমাকে শিখিয়েছে মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে। সেইজন্যই আমি শিশুদের উপর গুলি চালাতে পারবো না। রুষ শিশু আর জার্ম্মান্ শিশুর মধ্যে আমি কোন তফাৎ দেখি না। তারা নিষ্পাপ।

—বটে! এই সব দুর্ব্বলতার জন্য শত্রুর কত সুবিধা হ'ল তা জানো?

—জানি। আর এও জানি, যে তাদের আজ যত সুবিধাই হোক, আমরা হারবো না। আমাদের আদর্শ-বাদ আজকের মানুষকে এমন সত্যে পৌছে দিয়েছে যার মৃত্যু নেই। পৃথিবীর জনগণ একদিন এই আদর্শের কাছে মাথা নোয়াবে, জার্ম্মান্‌রাও বাদ যাবে না। সেদিন আমরা এমন জিতবো যার দাম এই লড়াই করে জেতার চেয়েও ঢের বেশী বেশী স্থায়ী। এমনিভাবেই জিতেছিল ভারতবর্ষ তার ধর্ম্মের মধ্যে। হিন্দুরা আজ মরে গেছে কিন্তু তার বৌদ্ধ আদর্শ আজ সমস্ত পূর্ব্ব এশিয়াকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সেনাপতি মণ্ডলী আর কিছু বললো না ; নিজেদের মধ্যে দু'একটা কি কথাবার্ত্তা বলে নিলে, তার পর আদেশ হ'ল—আমরা আলোচনা করে দেখলাম কমরেড, তুমি স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার হবার অযোগ্য, তোমাকে সেজন্য আজ থেকে সাধারণ পাইলটের পদে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। বোমারু বা লড়াইয়ে বিমান চালাবার অধিকার থেকে তোমাকে আমরা বঞ্চিত করলাম। লড়াইয়ে করুণা বা সহানুভূতি প্রকাশের অবসর নেই।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম.এ,বি.এল,

দিল্লীর মোগল বাদশাহ আকবর যখন বাংলাদেশ জয় করেন, তখন বাংলার পাঠান রাজা দাউদ তাঁর দুই কর্ম্মচারী রাজা বিক্রমাদিত্য আর রাজা বসন্তরায়কে তাঁর ধনরত্ন রক্ষার ভার দিয়ে পালিয়ে যান। দাউদ পরে ধরা পড়েন এবং মারা যান। বাংলাদেশ মোগল বাদশাহের অধীন হয়। তখন বিক্রমাদিত্য আর বসন্তরায় তাঁদের হাতে যে টাকা থাকে তাই দিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে এক সহর তৈরী ক'রে সেখানে রাজত্ব স্থাপন করেন। এই সহরের নাম ছিল যশোহর।

বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য। তিনি বড় হ'লে বাপের রাজ্য কেড়ে নেবেন, গণৎকারেরা এই কথা বলায় তাঁর বাবা তাঁকে পাঠিয়ে দেন আগ্রায় বাদশাহের দরবারে, যাতে তিনি সেইখানেই থাকেন, আর ফিরে এসে কোনও অনিষ্ট না করতে পারেন। প্রতাপ কিন্তু বাদশাহ আকবরকে খুসী ক'রে যশোহর রাজ্যের রাজত্ব নিজের নামে করে নেন, তাঁর বাবা আর বসন্তরায় তখনও বেঁচে।

রাজা হ'য়েই তিনি তাঁর রাজধানী করেন ধূমঘাটে। প্রতাপ তখন সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ ক'রে বড় বড় কেল্লা গ'ড়ে তাঁর রাজ্যকে সুরক্ষিত ক'রতে লাগলেন। ক্ষমতায় তিনি বাংলাদেশের অন্যান্য অংশে যে সব রাজা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠলেন। তাঁর প্রধান কাজ হ'ল ফিরিঙ্গী দস্যুদের দমন করা। তখনকার দিনে পর্ত্তুগীজ দস্যুদের জ্বালায় বাংলাদেশ অস্থির হ'য়ে উঠেছিল। তারা ডাকাতি করে মানুষ লুটে নিয়ে যেত, আর তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত'। পরে তাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রী ক'রে দিত। দেশে কোন রাজার শাসন না থাকায় তারা এতটা সাহস পেত, কিন্তু যখন প্রতাপাদিত্য রাজ্য স্থাপন করলেন তখন তাঁর দাপটে এই "হারমাদ" জলদস্যুদের অত্যাচার অনেক ক'মে গেল।

ধূমঘাট যখন তৈরী হয় তখন এক রাত্রে দেখা যায় যে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় আগুন জ্বল্‌ছে। সেই জায়গা খুঁড়ে এক দেবীমূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাঁর এক মন্দির তৈরী হয় এবং নাম দেওয়া হয় যশোরেশ্বরী। গল্প আছে যে দেবীর তেজ এত বেশী ছিল যে সেই তেজে মন্দিরের ছাদ ফেটে যেতে লাগল, তাই আবার নতুন ক'রে মন্দির হ'ল, তার ছাদে একটু ফাঁক রাখা হ'ল যাতে সেই তাপটা সেই পথে বেরিয়ে যেতে পারে। এই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুব উন্নতি হ'তে থাকে। তিনি ক্রমে এত দূর ক্ষমতাশালী হ'য়ে ওঠেন যে বাদশাহ্ আকবর তাঁকে দমন করার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হ'ন। তার একটা কারণ ঘটে যখন প্রতাপ বসন্তরায়কে হত্যা করা'ন। বসন্তরায়ের ছেলে কচুরায় তাঁদের এক কর্ম্মচারী দুর্গাদাসকে নিয়ে আগ্রায় গিয়ে নালিশ করেন। বাদশাহ্ তখন প্রতাপকে দমন করবার জন্য সৈন্য পাঠান। দেবী যশোরেশ্বরীর বরে প্রতাপ ক্রমে ক্রমে বাইশ বার বাদশাহের সৈন্যদের হারিয়ে দেন। কিন্তু তিনি একবার একটী গুরুতর অপরাধ করায় দেবী যশোরেশ্বরী নাকি রাজ্যত্যাগ ক'রে চ'লে যান।

এইবার প্রতাপের পতন সুরু হ'ল। এবার বাদশাহী সৈন্য নিয়ে এলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, মহারাজ মানসিংহ। তিনিও প্রথমবার হেরে যা'ন, কিন্তু দুর্গাদাস বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে প্রতাপের দুর্গের খাবার মানসিংহকে দিয়ে দেন, আর একটা গুপ্ত পথ দেখিয়ে বাদশাহী সৈনাদের একেবারে ধূমঘাটে এনে ফেলেন। প্রতাপ হেরে গিয়ে সন্ধি করতে মোগল শিবিরে যান। কিন্তু ইসলাম খাঁ নামে একজন সেনাপতি কোন কথা না শুনে প্রতাপকে হাতে পায়ে শিকল বেঁধে লোহার খাঁচায় পুরে আগ্রায় পাঠিয়ে দেন। প্রতাপ কিন্তু আগ্রায় পৌছান নি। পথে কাশীতে গঙ্গায় স্নান করবার জন্য অনুমতি নিয়ে তিনি জলে ডুব দেন, আর ওঠেন নি'।

রাজা মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে নিয়ে গিয়ে তাঁর রাজধানী অম্বরে স্থাপন করেন। কেউ কেউ বলেন যে তাঁর ভুল হ'য়েছিল, যশোরেশ্বরী নিজের মন্দিরেই আছেন, মানসিংহ অন্য মূর্ত্তিকে নিয়ে যান।

প্রতাপের পর যশোহরের রাজা হ'ন কচুরায়। আর দুর্গাদাস পেলেন নদীয়ার রাজত্ব বক্‌শিশ, তাঁর নতুন নাম হ'য়েছিল ভবানন্দ মজুমদার। আজও নদীয়া রাজবংশ নদীয়ায় রয়েছে, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের যশোহর আর ধূমঘাট সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মধ্যে লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

বুদ্ধির্যস্য

শ্রীসুবোধ বসু

প্রথম দৃশ্য

স্কুলের হষ্টেলের পড়ার ঘর। একটা লম্বা বেঞ্চের দুধারে কতগুলি হাতল-হীন চেয়ার। তাহাতে বসিয়া আছে, মণ্টু, কানু, পল্‌টু, হাবুল ও ছবি। দুয়েকটা চেয়ার খালি। মণ্টু গলাটা লম্বা করিয়া বাহিরটা দেখিয়া লইল।

মণ্টু : ক'টা বাজলরে, হাবলু? খাওয়ার ঘণ্টাটা পড়চে না কেন? সাড়ে আটটা আলবৎ বেজে গেছে। এতক্ষণ ধরে ঘাড় গুঁজে পড়ে যাচ্ছি, কিছু বাজবার টাজবার আর নামও নেই!

হাবুল : সাড়ে আটটা বাজলেই আর কি মণ্টু, খাওয়ার টাইম বদ্‌লে গেছে! সাড়ে আটটায় আর নয়, এবার থেকে ন'টায়। পেটে হাত বুলোতে থাক।

মণ্টু : ও সর্ব্বনাশ, তাও তো বটে। একবার শত্রুতাটা দেখেছিস্? এতটা সময় কাটাই কি করে? এতক্ষণ একটানা চেঁচিয়ে পড়তে গেলে গলা ফেটে রক্ত বেরুবে যে।

কানু : ঘড়ির কাঁটা একঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। তাই খাওয়ার টাইমটাও বদ্‌লে দেওয়া হয়েছে।

পল্‌টু : আমাদের খাওয়ার টাইম্‌টাও না হয় এক ঘণ্টা এগিয়ে দিত, তাতে ক্ষতিটা কি

হ'তো? এ আর কিছু নয়, জানিস, সব হচ্চে ভোম্বলের দুষ্টু বুদ্ধি। ড্রিল সার্ হষ্টেলের ভার পাওয়ার পর থেকে ওর প্রতাপটা কি রকম বেড়েছে দেখছিস্?

ছবি : তা আর দেখচি না? কাল আমার বাটির থেকে অর্দ্ধেকটা মাংসই নিজের পাতে ঢেলে নিলে। আমি বল্লুম—এ কি দৌরাত্ম্যি? অমনি ভোম্বল চোখ লাল ক'রে বল্লে—খবরদার, তোরের হাজিরায় লেট্ লিখে দেব।

মণ্টু : আস্ত একটা গুণ্ডা! ডাম্বেল ক'রে আর মুগুর ভেঁজে চেহারাটাও গুণ্ডার মতই তাগড়া করেছে। তার উপর ড্রিল সারের আদুরে গোপাল—ওর কথাতেই উনি ওঠেন আর বসেন। এদিকে আমরা যে শেষ হ'য়ে গেলাম তার কি কেউ খোঁজ রাখচে! বল, তুইই বল, কানু, তুই তো পড়ুয়া ছেলে, একবারে বসে এতক্ষণ ধরে সমানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া যায়?

কানু : আর তুই যা জোরে চেঁচাস। তোর চেঁচানিতে আর কারুর যদি কিছু পড়ার সাধ্যি থাকে!

মণ্টু : বেশ কথা হলো। চেঁচাই। আমিই বা কি করবো শুনি? পড়াটা না শুনলে ভোম্বলটা যে ড্রিল সারকে ডেকে এনে কানমলা খাওয়াবে, তার কি?

পল্টু : চেঁচিয়ে পড়ার নিয়মটাই তো ভোম্বলটারই পরামর্শের ফল। আমরা নাকি সবাই পড়ায় ফাঁকি দিই? কি আমার বিবেকী সুহৃদ্‌রে! ড্রিল সারও হয়েচেন যেমন। ওর কথায়ই বেদ-বাক্য মেনে নেন।

ছবি : সত্যি বলচি, ভাই, যেদিন রাত্তিরে আমি বাড়ি থেকে ফিরলাম, সেদিন দূর থেকে তোদের পড়ার শব্দ শুনে আমি তো ভাবলাম, নিশ্চয়ই সারিবন্দী হয়ে পাঠশালার ধরণে নামতা আওড়াচ্চিস।

হাবুল : নাম্‌তা নয়, নামতা নয়, ভূতের পাঠশালা। চেঁচিয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি রকম হয় জানিস? আমি পড়লুম; বাল্মীকি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। শুনলুম কানু বলচে—তাহার মাথায় বড় বড় দুটি শিং। ছবি মিহি গলায় বল্লে, তিনিই বিক্রম সম্বৎ আরম্ভ করেন; আর পল্‌টু বলচে, ইহা অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় খাইতেই সুস্বাদু ও পুষ্টিকারক। এখন কোন্‌টা বিশ্বাস করি বল?

মণ্টু : মোট কথা, ভোম্বলকে জব্দ করতে না পারলে এখানে আর কিছুতেই টেঁকা যাবে না। নিত্যি নিত্যি ওর দৌরাত্ম্যি বাড়তে থাকবে।

কানু : ওর যা গায়ের জোর, একাই আমাদের পাঁচ-সাত জনকে কাৎ করে ফেলতে পারে, সেটা মনে রেখো।

পল্টু: ঐ জন্যই তো ও ড্রিল সারের প্রিয় পাত্র। তিনি দেখছেন, সারাক্ষণ ও জিমন্যাসিয়ামে পড়ে পড়ে, হয় ডন, নয় বৈঠক, নয় মুগুর, নয় প্যারালেল বার এসব করে' যাচ্ছে, ড্রিল সার তো খুসিতে আটখানা। পড়া বলতে তো উনি ঐ বোঝেন! আয়, আমরাও সব বইপত্র ছেড়ে ডাম্বেল আর মুগুরে ভজে যাই। একটা আঁক কষার চাইতে এক গণ্ডা মুগুর ভাঁজা ঢের ঢের সোজা!

ছবি: সর্ব্বনাশ, জিমনাসিয়ামে আমি যেতে পারবো না। সন্ধ্যাবেলা ও ঘরটার কাছ দিয়ে আসতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ তো যে সে মরা নয়, একদম ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা।

পল্টু: হলেই বা আত্মহত্যা। আজকালকার যুগে ভূত ফুত বাতিল হয়ে গেছে। ভোম্বল যদি সারাটা সন্ধ্যা একা একা সেখানে ডন-বৈঠক করতে পারে, তবে আমরা এতগুলি একসঙ্গে গিয়েই বুঝি পারব না? আমরা গেলেই বুঝি অতুল অসুর আমাদের কাঁধে চেপে বসবে?

কানু: ভূতের জন্যে নয়। মানে, এক সঙ্গে এতজন মিলে গেলে ভূত থাকলেও পালিয়ে বাঁচবে। কিন্তু আমরা তো লেখাপড়া শিখতে এখানে এসেছি, জিমন্যাষ্টিক শিখতে এখানে আসিনি। আমার আঁক কষতেই ভাল লাগে।

হাবুল: ভালো লাগে বলেই তো এমন নাকালটা হচ্চিস্। জিয়োগ্রাফি সার যখন হষ্টেলের চার্জ্জে ছিলেন, তখন আমরা দিন-রাত্তির বন্দর, পর্ব্বতশ্রেণী আর আগ্নেয় গিরির নাম মুখস্থ করতুম। তারপর এলেন হিষ্ট্রির সার। বন্দরাদি চুলোয় গেল, আমরা জানি শুধু লোদী বংশ, খিলিজী, পেশোয়া আর ভোঁসলা। পরে যখন হাইজিনের সার্ এলেন তখন শুধু জারক রস, ভাইটামিন, বিশুদ্ধ বায়ু আর দন্তধাবন। তা হলেই দেখছ, ড্রিল সার আর ছাড়বেন কেন? উনিও লেগে গেছেন।

[ভোম্বলের প্রবেশ। মোটা সোটা দেখতে। মুখে একটু ভারিক্কি ভাব। তাহাকে দেখিয়া ছেলেরা তাড়াতাড়ি বই টানিয়া লইবার উপক্রম করিল।] * (ক্রমশঃ)

কচি মুখ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সূর্য্য কোথায় পায়
ওর ওই আলো?
কোথ্ থেকে পায়?
অনন্ত কালে হায়
দু'হাতে ছড়ালো;
তবু না ফুরায়।

মাধুরী অত অঝোর
পায় কোথ্ থেকে
ওই কচি মুখ?
ফুরায় না চাওয়া মোর
দেখে আর দেখে,
জুড়ায় না বুক।

* শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু বড়দের জন্য গল্প ও নাটক লিখে যশস্বী হ'য়েছেন। আমাদের অনুরোধে ক' বছর আগে উনি ছেলেদের জন্য রামধনুতে' ক'য়েকটা গল্প লেখেন। এবারেও এই কৌতুক-নাটিকাটি লিখেছেন —রাঃ সঃ

"আকাশের মত বড়"

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

দিদিমা গল্প বলিতেছেন—রাক্ষসের গল্প। রাক্ষসের ছেলের অন্নপ্রাশন। প্রকাণ্ড এক কড়াইতে করিয়া হাতীর ঝোল চাপান হইয়াছে। ঝোলও যেমন ঘন হইতেছে, গল্পও তেমনি জমিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্য হইতে লব প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, দিদিমা, রাক্ষসদের কড়াইটা বুঝি খু-ব বড়? আমাদের এই উঠোনটার মত বড়?" দিদিমা উত্তর দিলেন—"ওঃ, আরও বড়।" "তবে কি বুঝি আমাদের আম-বাগানটার মত বড়?" "না, আরও বড়।" কুশ সংশোধন করিয়া দিল, "তবে আমাদের এই সহরটার মত বড় হবে। না দিদিমা?" "না, না, তার চাইতেও বড়," দিদিমা জবাব দিলেন,—"ঐ আকাশের মত বড়।" লব শান্ত হইল, কড়াইএর আয়তন এবার সে ঠিক বুঝিয়া নিয়াছে।

'আকাশের মত বড়' বলিতে অবশ্য দিদিমা, আমাদের মাথার উপর যে বিরাট নীল চাঁদোয়ার মত জিনিষটি (?) দেখা যায় তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আসলে এই 'আকাশ' যে কি তা তোমরা সবাই জান। এ আকাশ সত্যি সত্যি কত বড় তা অনুমান করাও অসম্ভব। কত বড় বড় পণ্ডিত—জ্যোতির্ব্বিদ্ বছরের পর বছর ধরিয়া কত উপায়ে এর আয়তন মাপিতে গিয়া হিমসিম খাইয়া গিয়াছেন। কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী করা হইতেছে, কত রকম হিসাবপত্র, কত বিচিত্র অঙ্ক কষা চলিতেছে। কিন্তু আকাশের সীমানার সন্ধান আজও মেলে নাই।

তবে সন্ধান মিলুক আর নাই মিলুক, এই রহস্যের খোঁজে গিয়া বৈজ্ঞানিকেরা যে সব বিচিত্র, অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাও বড় কম কথা নয়। অন্ততঃ মহাকাশের বিশালতার কিছুটা আভাস তা হইতে পাওয়া যাইতে পারে!

সূর্য্যকে ঘিরিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ তাদের নিজের নিজের উপগ্রহ লইয়া ঘুরিতেছে। সূর্য্যের অধীন এই সমস্ত রাজত্ব মিলিয়া হইল সৌরজগৎ। পৃথিবীটাই আমাদের কাছে কত বড় বলিয়া মনে হয়, সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর তের লক্ষগুণ; তা হইলে সৌরজগৎটা না জানি কত বড়! আবার মহাকাশের তুলনায় এই সৌরজগৎ নাকি কিছুই না। আকাশকে যদি সাহারা মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে সৌরজগৎ তার এক কণা বালির সমানও হইবে কিনা সন্দেহ।

সৌরজগতের বাহিরে যে বিশাল মহাকাশ, তার ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে অগণিত তারা।

খালি চোখে আমরা সাধারণতঃ হাজার তিনেক তারা দেখিতে পাই, কিন্তু খুব শক্তিশালী দূরবীণ দিয়া পণ্ডিতেরা কম করিয়া ১৫০ কোটি তারার সন্ধান পাইয়াছেন। আসল তারার সংখ্যা হয়তো এর চাইতেও অনেক গুণ। এই সব তারা এক-একটা আকারে কত বড় শুনিলেও বিশ্বাস হইতে চায় না। আমাদের সূর্য্যের চেয়ে অনেক বড়—কোন কোনটা লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি গুণ বড়। মীরা নামে একটা তারা আছে, তার মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মত ৯০০ কোটি পৃথিবী ভরিয়া রাখা যায়। কালপুরুষ নামে তারাপুঞ্জের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এই কালপুরুষের মাঝখানে একটি তারা আছে, তার মধ্যে কম করিয়া ৬৫০০০০০০০০০০০০০০ পৃথিবী ভরিয়া রাখা যায়। এই রকম সপ্তর্ষি নামে সাতটি তারা লইয়া যে তারাপুঞ্জ (এটিকেও আকাশে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ) তার মধ্যেও কম করিয়া গোটা দশেক সৌরজগৎ ঢুকাইয়া দেওয়া যায়। তারাগুলি আবার অনেক সময় চাক বাঁধিয়া থাকে। হারকিউলিস নামে হাজার পঞ্চাশেক নক্ষত্রে তৈরী এই রকম একটা চাক আছে। এই চাকের এক-একটি নক্ষত্র সূর্য্যের চেয়ে অনেক অনেক বড়। চাকের এক কোণা হইতে অপর কোনার দূরত্ব ৩৬০০০ কে ৫৮৭৬০৬৮৮৮০০০০ দিয়া গুণ করিলে যত হয় তত মাইল। হারকিউলিসের উজ্জ্বলতাও সূর্য্যের চেয়ে আড়াই কোটি গুণ বেশী।

পৃথিবী হইতে এই সব নক্ষত্রের দূরত্বের কথা শুনিলেও অবাক্ হইতে হয়। সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে কত দূরে জান তো?—৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। শুনিতে সহজ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু যে পাহাড়ের চূড়া—এভারেষ্ট, তা যদি মাত্র ৫ মাইল্ হয় তবে সূর্য্য কত উঁচুতে! আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল্। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলো পৌঁছিতে লাগে প্রায় ৮ মিনিট। আর সব চেয়ে কাছের যে নক্ষত্র সেখান হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে কত সময় লাগে জান? সওয়া চার বছর। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্য্যে ২৭২০০০ বার যাওয়া আসা করিতে হইলে যতটা পথ পার হইতে হয় এই নক্ষত্রে একবার যাইতে হইলেই ততটা পথ পার হইতে হয়। খুব দ্রুতগামী একটা এরোপ্লেন্ সেকেণ্ডে ৫০০ ফুটেরও বেশী ছুটিতে পারে। এই রকম একটি এরোপ্লেনে চড়িয়া ঐ নিকটতম তারায় পৌঁছিতে লাগিবে ৮০ লক্ষ বছর। 'নিকটতম' কথাটির উপর লক্ষ্য রাখিও। সব চেয়ে কাছের তারাটিই যদি ঐ রকম হয় তবে দূরের গুলি না জানি কি! অত দূরত্ব তো আর মাইল্ দিয়া হিসাব করা সুবিধাজনক নয়, তাই পণ্ডিতেরা ইহাদের দূরত্ব মাপেন আলোক-বর্ষ ধরিয়া। এক আলোক-বর্ষ মানে আলো সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া এক বছরে যতটা পথ যাইতে পারে ততটা পথ। মাইলের হিসাবে ধরিলে এক আলোক-বর্ষ প্রায় ৬ লক্ষ কোটি মাইলের সমান। পণ্ডিতেরা এমন তারার সন্ধানও পাইয়াছেন যেখান হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে লাগে ১০৮ ৬০০ বছর।

এক তারা হইতে অন্য তারার দূরত্বের কথাই ধর না কেন। সপ্তর্ষি মণ্ডলের ৭টি তারার কথা আগে বলিয়াছি। এদের প্রথমটি হইতে ৭মটিতে আলো যাইতে লাগে ৭ বছর। এমন অনেক তারাপুঞ্জ আছে যার একটি তারা হইতে আর একটি তারাতে আলো যাইতে শত শত—হাজার হাজার বছর কাটিয়া যায়। হারকিউলিস নামে যে নক্ষত্র-চাকের কথা বলিয়াছি তার কোন কোন নক্ষত্রে পৃথিবী হইতে আলো যাইতে লাগে ২১ হাজার বছর, আবার কোন কোনটিতে

বিখ্যাত মাউণ্ট্ উইল্‌সন্ অবজারভেটারী বা মানমন্দির। আকাশ-রাজ্য সম্বন্ধে অনেক বড় বড় তথ্য এখানেই পাওয়া গিয়াছে।

যাইতে লাগে তার দশগুণ সময়। ভাবিতে আশ্চর্য্য লাগে না—আজ যে তারার আলো আমরা দেখিতেছি আসলে সে আলো যখন ঐ তারা হইতে রওনা হইয়াছিল তখন পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই ছিল না—প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীসৃপ, টেরোডাক্‌টাইল্ বা ঐ রকম সব জানোয়ার হয়তো তখন পৃথিবীতে রাজত্ব করিত!

কিন্তু শুধু তারারাই তো আকাশের একমাত্র বাসিন্দা নয়; আরও কত জ্যোতিষ্কমণ্ডল—ধূমকেতু, নীহারিকা ইত্যাদিও তো আকাশে ঘুরিতেছে! নীহারিকা কি নিশ্চয়ই জান?—জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড—আকাশের কোটি কোটি মাইল যুড়িয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! কোনটা ডিমের মত চ্যাপ্টা, কোনটা থালার মত গোল, কোনটা বা স্ক্রুর মত প্যাঁচান, আবার কোনটার বা কোন আকারই নাই—মেঘের মত এলোমেলো। ঘূর্ণিবায়ুর মত দিবারাত্র সেগুলি ঘুরপাক খাইতেছে। য্যাণ্ড্রোমিডার মধ্যে একটা নীহারিকা আছে, সেটির মোট ওজন সূর্য্যের চেয়ে

৩০০০ কোটি গুণ। অথচ জিনিষটি আসলে এত হাল্কা যে তার এক বর্গ মাইল অংশ হয়তো তুমি-আমিও ঘাড়ে করিয়া ঘুরিতে পারি। অত হাল্কা জিনিষটার মোট ওজন যদি অত বেশী হয় তবে ভাবিয়া দেখ সেটির আয়তন কত বড়—আকাশের কতখানি জায়গা যুড়িয়া সেটা ভাসিতেছে! এর একদিক্ হইতে আর একদিকে আলো পৌঁছিতে লাগে ৪০০০০ বছর। অথচ ঐ রকম নীহারিকা হয়তো আকাশে আরও কত লক্ষ লক্ষ আছে কে জানে?

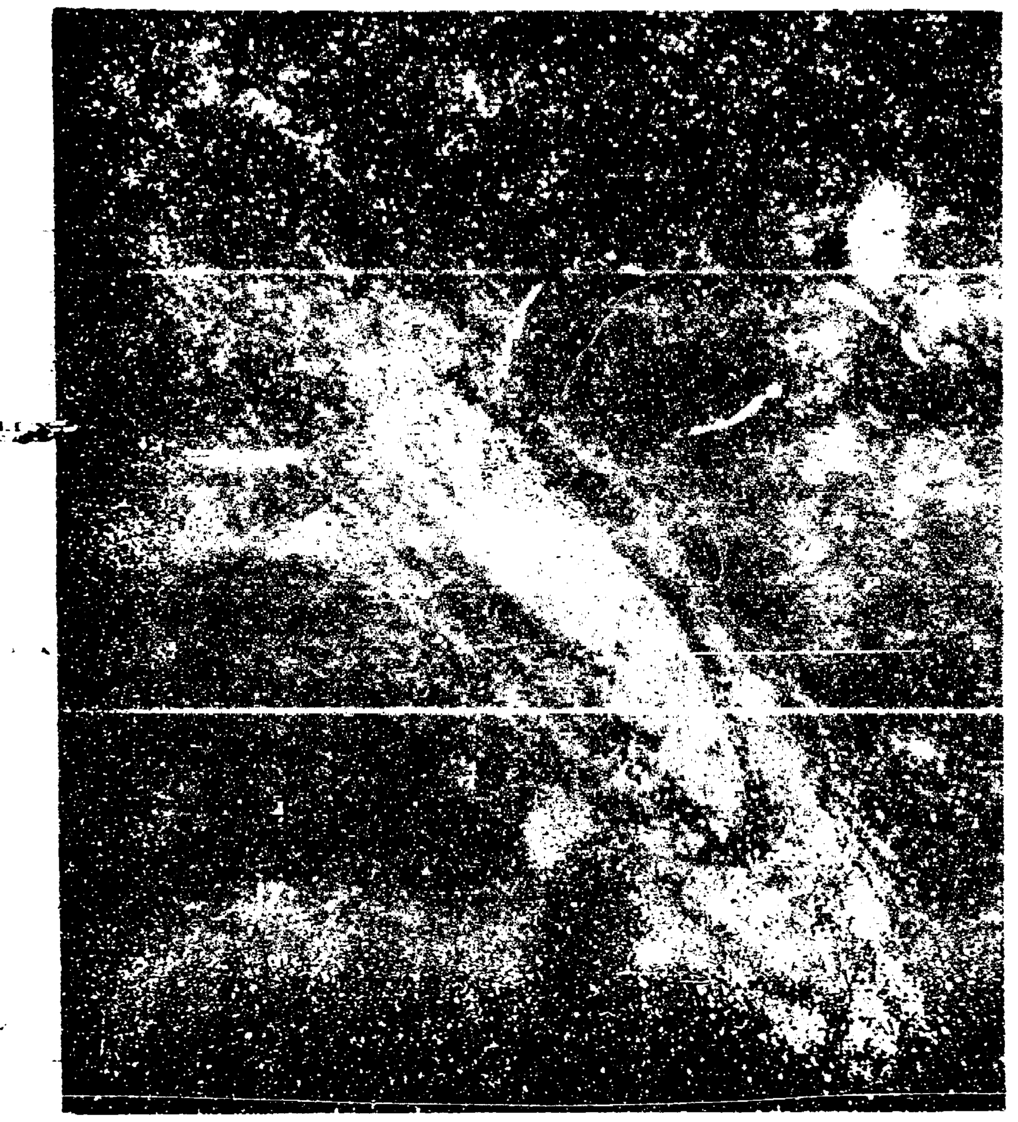

য়্যাণ্ড্রোমিডার নীহারিকা

এ পর্য্যন্ত আকাশের সব চেয়ে দূরে যে জিনিষটি দেখা গিয়াছে সেটিও একটি নীহারিকা। সেটি হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে লাগে ১৫ কোটি বছর। তারও ওদিকে মহাকাশ কতখানি জায়গা যুড়িয়া পড়িয়া আছে বৈজ্ঞানিক আজ পর্য্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া তো দূরের কথা, তা অনুমান করিতেও সমর্থ হন নাই। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ: আমাদের এই আকাশ আসলে কত বড়!

দেখিতে দেখিতে আর একবার ২৫শে বৈশাখ আসিয়া চলিয়া গেল। এই তারিখটি বাঙ্গালীর বড় আদরের। ৮৩ বছর আগে এমনই একদিনে বাংলার কোলে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল। আজ কবি নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর মনোরাজ্যে তিনি

চিরকাল অমর হইয়া আছেন। বাঙ্গালী চিরদিন তাঁর জন্মোৎসবই পালন করিবে, মৃত্যুতিথি নয়।

৺আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার

আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার আর ইহলোকে নাই—সে কথা হয়তো ইতিপূর্ব্বেই তোমরা শুনিয়াছ। সাহিত্য সাধনাই ছিল বিজয়চন্দ্রের জীবনের ব্রত। বহু বছর হইল তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন কিন্তু সেই অন্ধ অবস্থায়ও তাঁহার সাহিত্য সাধনা তিলমাত্র কমে নাই। ঐ অবস্থায়ই তিনি সুবিখ্যাত বঙ্গবাণী পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। শিশুসাহিত্যে তাঁর দানের কথা তোমরা সবাই জান। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কবিতা, ছড়ায় লেখা বিচিত্র রকমের ধাঁধা দীর্ঘকাল বাঙ্গালী শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়াছে। 'রামধনু'কে তিনি তার জন্ম হইতেই অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখিতেন। রামধনুর ১ম্ বছরের ১ম সংখ্যা তাঁরই রচনা দিয়া সুরু হয়। তারপর বছরের পর বছর কত ভাবেই না তিনি রামধনুকে লেখা দিয়া, পরামর্শ দিয়া, আপনার ভাবিয়া সাহায্য করিয়াছেন। গত কয়েক বছর ধরিয়াই তিনি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু সেই রুগ্ন শরীরেও তিনি কত বার রামধনুর ছোট্ট বন্ধুদের জন্য রচনা উপহার পাঠাইয়াছেন!

ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।

* * *

এই কয় মাসে যুদ্ধের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ইংরেজ, আমেরিকান্ এবং স্বাধীন ফরাসী বাহিনী আফ্রিকার টিউনিসিয়ায় একটা খুব বড় রকম জয়লাভ করিয়াছে। বিপক্ষ দলের বহু সৈন্য এবং সেনাধ্যক্ষ তাদের হাতে বন্দী হইয়াছে। এর ফলে ভূমধ্যসাগরে মিত্রপক্ষের অনেকখানি সুবিধা হইল এবং ইটালির বিপদাশঙ্কা আরও বাড়িল।

চিঠিপত্র

রামধনুর ছোট্ট বন্ধুরা,

তিন মাস অপেক্ষা ক'রে আবার তোমাদের হাতে নতুন বছরের 'রামধনু' তুলে দিলাম। রামধনুর ১৫ বছরের ইতিহাসে এ রকমটি আর হয় নি। কিন্তু ক্রটী যে আমাদের নয়, তা জেনে নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করবে। এই তিন মাস তোমাদের কাছ থেকে যে অসংখ্য চিঠিপত্র পেয়েছি তা থেকেই রামধনুর প্রতি তোমাদের অসীম স্নেহের পরিচয় পেয়েছি তাই পুলকে নিয়ে রামধনুর নববর্ষ সুরু হ'ল।

বহুকষ্টে অতিরিক্ত রকম মূল্য দিয়ে রামধনুর কাগজ সংগ্রহ করা হয়েছে। কাজেই পৃষ্ঠা-সংখ্যা আরও কিছু না কমিয়ে উপায় রইল না। ভবিষ্যতে সুদিন এলে যে রামধনুর কলেবর এত ক্ষীণ থাকবে না সে বিষয়ে আশ্বাস দিচ্ছি। আশা করি রামধনুর অঙ্গে কলের কাগজের সঙ্গে বাংলার কুটীরশিল্পের হাতে-তৈরী কাগজ তোমাদের অপছন্দ হবে না।

কাগজ পেতে অত্যন্ত দেরী হওয়ায় বৈশাখ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে আত্মপ্রকাশ করল। শেষ মুহূর্ত্তে আবার বাধল ছাপাখানার "যন্ত্র-অঘটন"। এই ক্রটী আমরা আস্তে আস্তে সামলে নিয়ে কয়েক সংখ্যা পরেই আবার রামধনুকে মাসের গোড়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা করব।

স্থানাভাবে এ সংখ্যায় নির্ব্বাচিত অনেক লেখাই দেওয়া গেল না, বারান্তরে আরও বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা হবে। "নিরুদ্দিষ্টের দল" শেষ হলেই নতুন একখানি ধারাবাহিক উপন্যাস সুরু হবে।

তোমরা শুনে সুখী হবে, রামধনুর গ্রাহক শ্রীমান্ রামপ্রসাদ গাঙ্গুলী অন্যান্য পরীক্ষার মত এবারে বি, সি, এস পরীক্ষায়ও প্রথম হয়েছেন। কর্ম্মজীবনে দায়িত্বশীল পদ গ্রহণ ক'রেও তিনি তাঁর ছেলেবেলার সাথী রামধনুকে ছেড়ে থাকতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ লিখেছ যে 'এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি' কিংবা 'বড় হয়ে গেছি' ব'লে আর রামধনু পড়বার বয়স নাকি তোমাদের (অর্থাৎ ঐ পত্র-লেখকদের) নেই। কথাটা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয় তা ওপরের দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারবে।

'লেখনী-বন্ধু' বিভাগের জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে আশানুরূপ সাড়া আমরা এখনও পাই নি। তোমাদের অনুরোধে "মনোরঞ্জন চির-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার" লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ আরও এক মাস বাড়িয়ে ১লা আষাঢ় করা হ'ল।

আমাদের নববর্ষের প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জেন।—রাঃ সঃ

আগামী সংখ্যায়

রামধনুর অল্পবয়সী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বিশেষ ক'রে লেখা একটি নতুন বিভাগ **"ছোটদের পাতা"** দেওয়া হবে এবং এটা প্রতি মাসেই থাকবে। তা ছাড়া "ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক", "ছোটদের চিত্রশালা", "বেতালের প্রশ্ন", "সাধারণ জ্ঞান" প্রভৃতি অন্য বিভাগগুলিরও যতটা সম্ভব দেবার চেষ্টা করা হবে।

"নূতন ধাঁধা" এবারে দেওয়া হ'ল না। আসছে বার থেকে নিয়মিত ভাবে বেরোবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ১৲

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৸০

আকাশের গল্প

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৸৵০

আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙীন মলাট. দাম ॥৵০

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—॥৶০

ধূমকেতু

(যন্ত্রস্থ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
ফোন: কলি: ৩৬৬০

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বর্ষ
সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ

আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেস ও পুস্তক সহ

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১৸৵০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

Regd. No. C—1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটি
ঘি-এর মত কিছুই নয়।

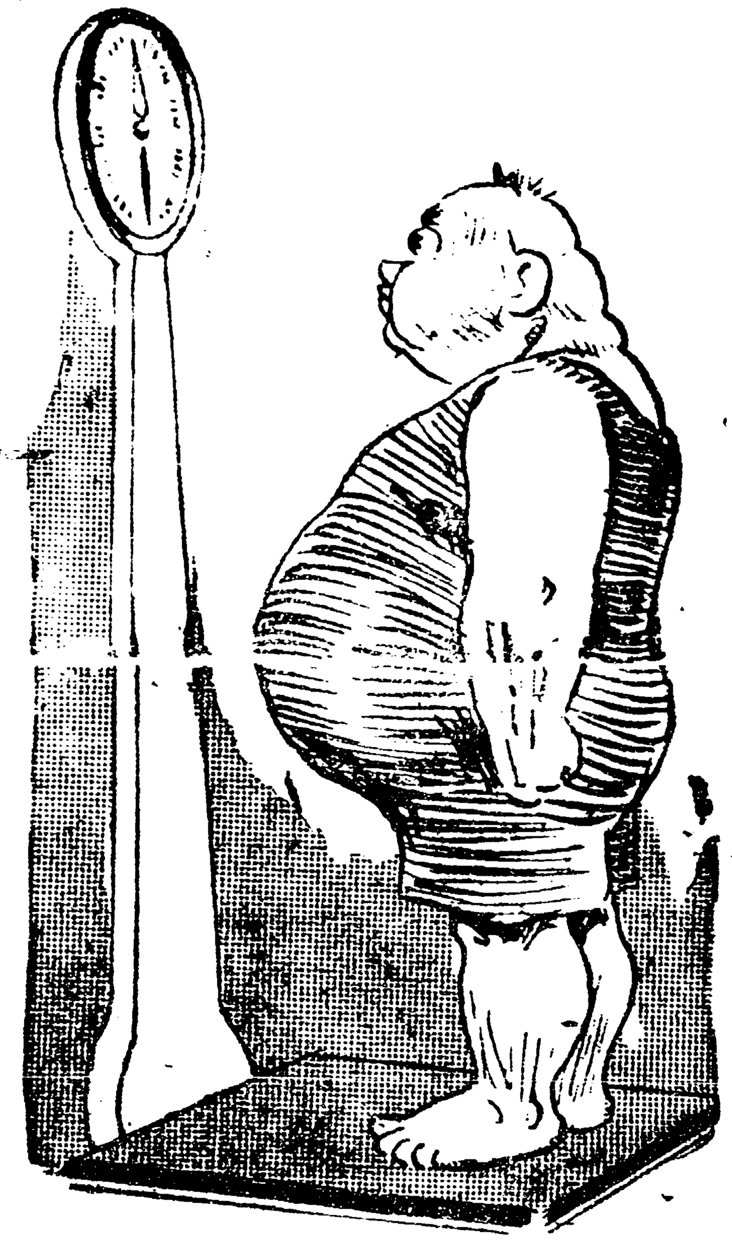

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন: কলি: ৩৬৬০

রামধনু

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

…শ বর্ষ
… সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ
১৩…

…নো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেস ও পুস্তক সহ

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১৷৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSU

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

'দেখিস, ভালো ক'রে আঁচড়ে দিস্।'

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ { ২য় সংখ্যা

পরেশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নামটী পরেশ—বহুবিধ গুণ তার,
প্রধান—আমার অতি বড় জোৎদার।
জমিতে তাহার এবার প্রচুর ধান,
ষণ্ড একটা করে দিল লোকসান!
ধরিয়া তাহারে খোঁয়াড়েই ঠিক দিত
কিন্তু পরেশ শুনিয়া হয়েছে ভীত।
জানায়ে তাহারে দিয়াছে চৌকীদার।
সেটি বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গোর ষাঁড়।
পরেশ নিরীহ, রাজভক্ত সে অতি
লাট সাহেবের কেমনে সে করে ক্ষতি?

পরেশ আমারে জানালো প্রণাম ক'রে
লাটের ষণ্ড দীর্ঘ দু'দিন ধ'রে,
ফসল খেয়েছে—কি করিব মহাশয়,
রাজার পালিত, খোঁয়াড়ে দিবার নয়।
বৃষোৎসর্গ করেছেন বড়লাট,
ভবনে তাঁহার বসুক চাঁদের হাট।
ষাঁড়ের পিছনে ত্রিশূলের দাগ নাই
প্রথমেতে আমি ভুল করেছিনু তাই;
কিন্তু জানায়ে দিয়াছে চৌকীদার
সেটি বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গোর ষাঁড়।

আমি বলিলাম, পরেশ! মনে যা পড়ে,
বৃষোৎসর্গ সাহেবেরা কমই করে।
বৃষ তাহাদের অন্য ব্যাপারে লাগে,
শ্রাদ্ধও কম, ষণ্ডও নাহি দাগে।
তবু গোজাতির হিতে সদা তাঁর মন—
ষণ্ড লাটের স্নেহের নিদর্শন।
উপকার চান, অপকারে সাধ নাহি,
তোমার ক্ষতির তিনি ন'ন জেনো দায়ী।
পরেশ বলিল, বলেছে চৌকীদার
সেটি বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গোর ষাঁড়।

পরেশ জানে যে রাজা ত' পিতার মত
তাঁর দয়া মায়া শ্রদ্ধা ও দান কত!
তাঁহার ষণ্ড যদিই বা শিঙ নাড়ে
রূঢ় আচরণ করিয়ো না কেহ তারে।
এ যুগ হইলে বিক্রমাদিত্যের
পরেশ মন্ত্রী সে পুষ্পমিত্রের।
হইত এ যদি অশোক রাজার কাল
পরেশ হইত সত্য নগরপাল।
হইলে সময় এটা আকবর শা'র
পরেশ হইত বড় মন্‌সবদার।

নীরস নিছক বিংশ শতাব্দী,
পরেশ পাইল পুরস্কারটা কি?
রামধনু-পাতে নামটী পাঠাই তার
চক্ষে পড়িবে পাঠক আর পাঠিকার।
কচি মুখে সব ফুটিয়া উঠিবে হাসি,
বাহবা দিবে যে তারে সবে ভালবাসি।

* * *

পরেশের কাছে যত দূর জানা গেল
ষাঁড়টী লাটের বাঁধিয়া রাখাই ভাল।

হর্ষবর্দ্ধনের পথের দাবী

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

পাগ্‌লা ষাঁড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার একটা নির্ঘাত উপায় প্রায়ই বাৎলাতেন সনাতন খুড়ো। উপায়টি যে ঠিক তাঁরই আবিষ্কার-করা তা নয়, আদতে তা এক সুপ্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্ত। প্রবীণ সেই দর্শনবিদ্ নাকি বলে গেছেন, ষাঁড় ক্ষেপে তাড়া ক'রে এলে পালিয়ো না, কি মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ো না। বিচলিত হবার কিছু নেই, এমন কি, উল্‌টে ষাঁড়কে

তাড়া করবারও দরকার নেই কোনো। অটলভাবে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেবল তাকে বক দেখাবে। তা'হলেই, অবশ্য কি হেতু বলা যায় না, তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হয়ে ফিরে যাবে ষাঁড়। নত নেত্রে অধোবদনে চলে যাবে।

অর্থাৎ, যদি কথোপকথনের ছলে তত্ত্বটা আমরা উদ্ঘাটিত করতে চাই তা হ'লে দাঁড়াবে এই:

"পাগ্‌লা ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচতে চাও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন, সে-উপায় তো তোমার হাতেই আছে!"

তবু সনাতন কাল থেকে, সব্বাই, ষাঁড়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে, হাতের চেয়ে পায়ের উপরেই বেশি নির্ভর ক'রে এসেছে। হর্ষবর্দ্ধনরাও। কিন্তু আজ যে কী দুর্ম্মতি হোলো শ্রীহর্ষের, শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনের প্ররোচনায় সে 'সনাতন'-মতে আস্থাবান্ হয়ে পড়ল, আর তার ফলে যে ব্যতিক্রম ঘটে গেল, ষড়দর্শনে বা ষাঁড়-দর্শনে তার কী ব্যাখ্যা দেয় জানি না, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শনে তা ভারী রোমাঞ্চকর।

গোড়া থেকেই তাহলে বলা যাক্ ব্যাপারটা:

কোথায় নাকি যাত্রা হচ্ছে বা হবার কথা হচ্ছে, তার খবর পেয়ে, সেই খবরটাই আরো ভালো করে জানবার জন্যে দু'ভাইয়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু পাঁজি দেখে বোধ হয় যাত্রা করা ছিল না, ফুটপাথে পদক্ষেপ ক'রে কয়েক পা না এগুতেই হর্ষবর্দ্ধন হঠাৎ গোবর্দ্ধনের গায়ে ঢলে পড়েছেন। আর হর্ষবর্দ্ধনের ঢল্ অনেকটা পদ্মার ঢলুনির মতোই, আশপাশের কারো তাতে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়, তলিয়ে যাবার কথা। গোবর্দ্ধনকেও রাস্তায় তলাতে হয়েছে।

"রাস্তার মাঝখানে এমন ক'রে গায়ে পড়া কি ভালো?" পিঠের ধুলো ঝেড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এই কথা সে দাদাকে সম্‌ঝাতে যাচ্ছে, হেন কালে দেখল, দাদা ততোধিক রুষ্ট হয়ে আরেকজনের ওপরে চড়াও হয়েছেন।

"একি হচ্ছে? এ সব কি হচ্ছে মশাই?" হর্ষবর্দ্ধন একেবারে সপ্তমে।

কিছুই করেনি লোকটা, কেবল সে আম খাচ্ছিল। আম খাচ্ছিল আর তার খোসাগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে এধারে ওধারে ছুড়ছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারই একটায় পিছলে গিয়ে পতনোন্মুখ হর্ষবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধনের আনুকূল্যে বা দৈবের মাহাত্ম্যে এইমাত্র নিজেকে সাম্‌লেছেন। পড়তে পড়তে অধঃপতনের হাত থেকে বেঁচেছেন কোন গতিকে।

"আম খাচ্ছি।" বল্ল লোকটা; নিশ্চিন্ত মুখে বল্‌ল। এবং তেম্‌নি নিরুদ্বেগে আঁঠি চুষতে লাগ্‌ল।

বাস্তবিক, লোকটার কি দোষ? সে তো খোস্ মেজাজে আম খাচ্ছে, দোষ কিছু হয়ে থাকে তো খোসার; গোবর্দ্ধনের মনে হোলো। আর দোষের কথাই যদি বলো, খোসাই বা এমন কি অপরাধী? তার দাদাও কিছু কম যান্ না। ন্যায্যভাবে বিচার করলে একথাও বল্‌তে হয়। গোবর্দ্ধন ন্যায়পরতার পক্ষপাতী। আর, বল্‌তে কি, তখনো তার গায়ের জ্বালা মরেনি। তখনো সে দাদার ধাক্কায় কাতর।

"আম খাচ্ছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি।" হর্ষবর্দ্ধন রুখে উঠেছেন এবার: "কিন্তু আপনি খাবেন আম, আর আমরা খাবো আছাড়—এ কি রকম?"

গোবর্দ্ধন বল্ল: "বাঃ বাঃ!"

উক্ত ব্যক্তির আম্র-লীলা বা দাদার বক্তৃতা কাকে সে বাহবা দিল বোঝা গেল না।

"আমি তো আপনাদের আছাড় খেতে বল্‌ছিনে, আম খাচ্ছি।" বল্ল সেই লোকটা।

"আম খাচ্ছেন তো আমাদের মাথা কিনেচেন আর কি!" বল্লেন হর্ষবর্দ্ধন: "আম যেন আর কেউ খায় না!"

"আম খাচ্ছেন খান্, কিন্তু আমাদের মাথা খাচ্ছেন কেন? আপনার আম খাবার ফলে আমার দাদা যদি কারুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ে সে কি আর আস্ত থাকবে? আমার দাদাকে দেখেছেন?" গোবর্দ্ধন তার দেদীপ্যমান্ দাদার দিকে ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।—"তার ঘাড়-মাথা একেবারে থেঁত্‌লে যাবে না?"

অমন বৃহদাকার হর্ষবর্দ্ধনের দৃষ্টান্তেও ভদ্রলোক বিচলিত হোলো না, আরেকটা আমের খোসা ছাড়াতে সুরু করল। আর ছড়াতে ছড়াতে বল্ল: "কি করব বলুন, আমরা তো খোসা সমেত খাই নে। আপনারা খান্ কিনা জানা নেই, তবে গোরুতে খায় জানি।"

"তা হ'লে গোরু আর আপনি এক সঙ্গে খেতে বস্‌লেই ভালো হয় না?" বল্লেন হর্ষবর্দ্ধন। "তাই বস্‌বেন এবার থেকে।"

"আপনি খাবেন আম আর আমরা খাবো আমের আছাড়—এটা কি ভালো? দেখ্‌তে একটু দৃষ্টিকটু হয় না কি?" গোবর্দ্ধন উৎসাহিত হয়ে উঠেছে এতক্ষণে: "আমের আচার হ'লেও বরং কথা ছিল!"

আম্র-নিষ্ঠকে পরিত্যাগ ক'রে কয়েক পা না বাড়াতেই আবার এক অনিষ্ট! পুনশ্চ এক ফ্যাচাং; আরেক বিসদৃশ ব্যাপার!

ফুটপাথের একটা আল্‌গা পাথরের তলায় জল জমানো ছিল, হর্ষবর্দ্ধনের পায়ের চাপে তাই কাদার আকারে তার এক ধার থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এসে গোবর্দ্ধনকে লাঞ্ছিত করেছে। তার জামা-কাপড় একশা!

"আরে, আরে! পায়ের তলা থেকে পিচ্‌কিরি মারে কে রে! আবার কি দোলের রংবাহারের দিন এল!" হর্ষবর্দ্ধন যেমন নাকি বিস্মিত তেম্‌নি পুলকিত।

"এই ভুঁইফোঁড় কাদা কোথ্‌থেকে এল দাদা?" গোবর্দ্ধন কিন্তু তত খুসি নয়: "ইস্! কাপড়-জামায় কোথ্‌থাও ফাঁক রাখে নি!"

"কাদা কিরে, হাঁদা? খাসা মানিয়েছে তোকে!" হর্ষবর্দ্ধন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।—"তোর চেহারার খোল্‌তাই হয়েছে খুব।"

বল্‌তে বল্‌তে যেই না তিনি পা তুল্‌তে গেছেন, তাঁর পায়ের চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পাথরটার অন্য ধার থেকে আরেক দফা বেরিয়ে এসে তাঁর দফা রফা করেছে; তাঁকেও এবার বেশ অপরূপ ক'রে দিয়েছে।

"বাঃ, বাঃ, তোফা! জোড় মিলেছে বটে!" গোবর্দ্ধন দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না।—"একেই বলে সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি!"—এতক্ষণে সে আরাম পায়।—"ভগবান্ আছেন বই কি!"

কাপড়ের চেহারা বদ্‌লানোর সাথে সাথে হর্ষবর্দ্ধনের মুখের চেহারাও বদ্‌লেছে, তিনি বলেছেন—"ছ্যাঃ! এত বড় ফুটপাথ্, কিন্তু কোথাও ছাই পা ফেলবার যো আছে? রাস্তায় তো গাড়ী, মোটর গিসগিস্,—নেমেছ কি খরচ হয়ে গেছ! কিন্তু ফুটপাথেই বা নিস্তার কোথায়? এমন বড় বড় রাস্তা, কিন্তু পথ কই?"

"আমি রাস্তার দোষ দেখি না; এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হলেই কি ভালো হোতো? একজন মোটর চেপে যাবে আরেকজন মোটর চাপা পড়বে তা না হলেই হোলো। হনুমানের যা, জাম্বুবানেরও যদি তাই হয় তাহলেই আমি খুসি।" বলেছে গোবর্দ্ধন।

"তা তো হোলো, এখন একটা ডাইং ক্লিনিং দেখা যাক্—এগুলো কাচাবার ব্যবস্থা করতে হয়।" দুরদৃষ্টের পরেই দাদার দূরদৃষ্টি খুলতে থাকে।

কিন্তু খুব দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হোলো না, ডাইং ক্লিনিং অদূরেই ছিল। নাকের ওপরেই একেবারে। এবং, বল্‌তে কি, ডাইং ক্লিনিংওলারাই, তাঁর মুখের কথা না খস্‌তেই তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিল: "এই যে—এই যে আপনার সাম্‌নেই আমরা আছি! চলে আসুন, কোনো দ্বিধা না করে' চলে আসুন!"

"অদ্ভুত যোগাযোগ তো! যেখানে বাঘ সেইখেনেই সন্ধ্যে! যেখানে দাঙ্গা সেইখানেই দারোগা! এমন তো দেখা যায় না!" হর্ষবর্দ্ধন আবার বিস্ময়াহত।

"যা বলেছেন মশাই! অদ্ভুত যোগাযোগ! ওই পাথরের ওপরেই আমাদের এই ডাইং ক্লিনিং নির্ভর করছে, সত্যি বল্‌তে! কত জায়গায় যে দোকান খুলেছিলাম, কিচ্ছু হয়নি।

ক'বার তো খদ্দেরের যত কাপড় চোপড় মেরে দিয়ে পাত্তাড়ি গুটোতে হোলো, তবু মশাই, এই চওড়া কপাল খুল্‌ল না। লোকে বলত, পাথর-চাপা কপাল! সে যে ঐ ফুটপাথের পাথর তা কে জান্‌ত! অবশেষে, এই পাড়ায় এসে এই পাথর পেলাম, এবং প্রাণও পেয়েছি। এখন দিনের মধ্যে কাজ কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঐ পাথরটার তলায় জল ঢালা। জল ঢেলে কাদা জমিয়ে রাখা। ব্যস্! এক রকমের পাথর পুজো, কি বলেন? এখানকার ইতর-ভদ্রেরও গুণ গাইতে হয় অবশ্যি! সবাইকারই বেশ উঁচু নজর! নীচের দিকে দৃষ্টি নেই কারো। আপনাদেরও দয়া আছে, সে কথাও বল্‌তে হয় বই কি!"

বক্তৃতা শুনে গোবর্দ্ধন তো তাজ্জব, আর হর্ষবর্দ্ধন একেবারে পাথর। আরেকখানা পাথর, বল্‌তে কি!

"ব্যবসা-বুদ্ধি কাকে বলে, বোঝ্!" অনেকক্ষণ পরে হুঁস হলে তিনি শুধু এই বাক্যটি বলেছেন গোবর্দ্ধনকে।—"ভালো ক'রে বোঝ্ গোব্‌রা!"

পাথরটাকে পেরিয়ে, আরেকটু এগুতেই, এবার এল সেই ষাঁড়। এল ঠিক বলা যায় না, সমস্ত ফুটপাথ যুড়ে তেম্‌নি সে শুয়ে থাকল,—হর্ষবর্দ্ধনরাই তার কাছাকাছি এলেন।

ফুটপাথ্ ত্যাগ ক'রে পথে নামাও দায়, ট্রাম্, বাস্, মিলিটারী ভ্যান্ ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে'—কিংবা না করেই—ছুটছে, আর এদিকে ফুটপাথে ষাঁড় বাবাজীবন এক ফুট পথও ফাঁক রাখেন নি। হর্ষবর্দ্ধন সকাতরে বল্লেন, "পথ ছাড়ো বাপু!" গোবর্দ্ধন সংস্কৃত ক'রে জানাল, "পথং দেহি।" কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! সেই বিরাট দেহে নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

অগত্যা গোবর্দ্ধন বল্ল, "ডিঙিয়েই যাওয়া যাক্।" ব'লে যেই না সে ডিঙি মেরে ষাঁড়ের ওপর দিয়ে দাদাকে পথ দেখাতে গেছে, কেন যে খট্‌কা লাগল বলা যায় না, ষাঁড়ও অম্‌নি উঠে পড়েছে এক ঝট্‌কায়। নিজের ওপরে অপর কারো লম্ফ-ঝম্প তার তেমন ভালো ঠেক্‌ল না বোধ হয়।

এদিকে, সমুদ্র লঙ্ঘনের মুখে আটকে গিয়ে আঠার মত ষাঁড়ের পিঠে লেগে থাক্‌ল গোবর্দ্ধন। ষাঁড়টা লেজের ঝাপট্ মারল, কিন্তু মাছি তো নয় যে উড়ে যাবে, এবং মাছি, এমন কি একটা দাঁড়কাকের চেয়েও বেশ ভারী ব'লে তার বোধ হ'তে লাগ্‌ল। এমন দুর্যোগে হৃষ্টপুষ্ট হর্ষবর্দ্ধনকে সে দেখতে পেল চোখের সাম্‌নে। দেখবা মাত্র তার ধারণা হোলো। তার পিঠের ওপরে যে দুর্ভোগ চেপে বসেছে সে ও ছাড়া আর কেউ নয়। গোরুর আর কত বুদ্ধি হবে? আর ষাঁড় তো গোরুরই নামান্তর!

অতএব, বোঝাকে গুঁতিয়ে পিঠ হাল্‌কা করার জন্য হেলে দুলে হর্ষবর্দ্ধনের দিকে সে এগুতে লাগ্‌ল।

ষাঁড়ের পিঠ থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল গোব্‌রা: "বক্, দাদা, বক্!"

"বক্‌ব? বক্‌ব কিরে? বক্লে কি হবে? বক্‌লে কি ও শুন্‌বে? না, বুঝতে পারবে আমার বকুনি?" বল্লেন হর্ষবর্দ্ধন: "ষাঁড়েরা বাংলা জানে কি?"

"আহা, বক্‌তে কি বলেছি? সে-বকা নয়, সনাতন খুড়োর সেই বক!—" গোবর্দ্ধন খোলসা ক'বে বল্‌তেই হর্ষবর্দ্ধনের মনে পড়ে যায়।

"ওঃ, সেই বক! বক দেখানোর বক? তাই বল্।"

হর্ষবর্দ্ধনের মন তখন বল্‌ছে, 'পালিয়ে যাও, পালাও! ষাঁড়ের সাম্‌নে দাঁড়িয়ো না।' কিন্তু মন পা লাও বল্লে কি হবে, পা নেবার তাঁর ইচ্ছেই নেই তখন। পায়ের দিকেই না, তাঁর সমস্ত মন তখন হাতের দিকে, একদম্ স্বহস্তগত; ষাঁড়টাকে এক হাত দেখে নেবার সংকল্প তাঁর।

ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়িয়ে ষণ্ডেশ্বরকে তিনি বক দেখিয়েছেন।

তিনিও বক দেখিয়েছেন আর ষাঁড়ও গুঁতো দেখিয়েছে।

কর্ণের যেমন অক্ষয় কবচ কুণ্ডল নিয়ে জন্ম, হর্ষবর্দ্ধনও তেম্‌নি ভুঁড়ি নিয়ে জন্মেছিলেন ব'লে জনশ্রুতি। ভাগ্যিস্, ষাঁড়ের গুঁতো জন্মগত সেই পেল্লায় ভুঁড়ির ওপরে পড়েছিল তাই রক্ষে, তা না হলে কী হোতো বলা যায় না। হর্ষবর্দ্ধন মারা পড়লেন না, শুধু চিৎপাৎ হয়ে পড়লেন। আর সংঘর্ষের সেই প্রবল আলোড়নে গোবর্দ্ধন ষাঁড়ের পৃষ্ঠদেশ থেকে ফুটপাথে খসে পড়ল।

বক প্রদর্শনের বিপরীত ফলের কথা সনাতন খুড়োর কাছে যখন তোলা হোলো, তিনি বল্লেন: "সাম্‌নে কেন, ষাঁড়ের পিছনে বক দেখাবে। লেজের দিকেই দেখাবে তো!"

"লেজের দিকে দেখালে কি দেখতে পাবে ষাঁড়? পেছনে কি ওর চোখ আছে?" হর্ষবর্দ্ধন অবাক্ হয়েছেন।

"লেজের দিকে শিঙ্ও নেই তো!" সনাতনের নাতি শ্রীমান্ আধুনিক দাদা মশায়ের হয়ে জবাব দিয়েছে: "সেটাও একটা 'প্রিভিলেজ্'।"

কোনো এক বাজে লেখকের গল্পের বই পড়ায় সে পোক্ত হয়েছে—তার জবাব থেকে তা টের পেতে দেরি হয় না।

‘চাকরী কা ওয়াস্তে’

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

কবি বলিয়াছেন, “মুরগী খাই না,—কেননা পাই না”।

আমাদের কিন্তু পাইয়াও মুরগী খাইবার জন্য যথেষ্ঠ কসরৎ করিতে হইয়াছে। সেই কথাই আজ বলিতেছি। আমাদের বাড়ী—অর্থাৎ বাড়ীর লোকগুলি একটু বৈষ্ণবপন্থী। বাড়ীতে ডিম বা মাংসের প্রচলন নাই। কিন্তু নাই বলিয়াই যে মাংসের মত একটা রুচিকর পদার্থ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে এই বা কেমন কথা? তাই লুকাইয়া বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে—কখনও কখনও বা রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া সে আস্বাদ মিটাইতে হয়।

সেবার এক অভাবনীয় সুযোগ জুটিয়া গেল। মাত্র দু' দিনের জন্য মা, বাবা, পিসীমা এবং আর আর গুরুজনেরা তারকেশ্বর গিয়াছিলেন। আমরা দেখিলাম, ‘প্রাণ ভরিয়া এবং স্বাধীন ভাবে নিজের ঘরে বসিয়া মাংস খাইবার ইহাই একমাত্র সুবর্ণসুযোগ। এবং খাই-ই যদি তবে পাঁঠা খাইতে যাইব কেন, মুরগী কি দোষ করিল? মাংসের মধ্যে মুরগীই যে শ্রেষ্ঠ তা কে না জানে? মুরগী কেনা হইল।

কিন্তু বাড়ীর ঠাকুর জগড়নাথো ডিম বা মাংস স্পর্শ করে না। তা না করুক্—এই লোকটির বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে আমরা নির্ভয় ছিলাম।

অতএব বাহির হইতে মাংস তৈরী করিয়া বাড়ীতে আনিয়া বলিলাম,—‘ঠাকুর, আজ কোকর মাছ—একেবারে কুটে নিয়ে এসেছি। গরম মশলা, ঘি-টি দিয়ে বেশ ভালো ক'রে রাঁধতে পারবে ত'?' জগড়নাথো কথা বলিল না।

পার্থ বলিল, ‘এই কোকর মাছ কালে ভদ্রে একটা আধটা পাওয়া যায়—তারও আবার খদ্দের কত?'

কোকর মাছের ঝোলটা ঠাকুর বেশ ভাল করিয়াই রান্না করিল।

কিন্তু জগড়নাথো কথা বলে না কেন? ওরা বাড়ীতে আসিলে কিছু ফাঁস করিয়া দিবে না ত'? তাহা হইলেই ত' সর্ব্বনাশ!

খাইতে বসিয়া বাপ্পা ঠাকুরকে এইটু আপ্যায়িত করিয়া বলিল, ‘এ মাছ কোটাও আবার হাঙ্গাম কম নয়—বুঝলে ঠাকুর?'

আমি বলিলাম, ‘এই ধর—যেমন চেতল মাছ, আঁশ ছাড়ানো কি সোজা কথা?'

ঠাকুর বলিল, ‘হাঁ বাবু।'

পার্থ উৎসাহিত হইয়া বলিল, ‘তোমাদের বালেশ্বর জেলায় চেতল মাছ আছে?'

ঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—‘হঁ্যা।'

বাপ্পা পার্থের গায়ে একটা চিমটি কাটিয়া বলিল, ‘কোকর মাছ?'

এবারও ঘাড় নাড়িয়া জগড়নাথো বলিল, ‘হ্যাঁ।'

বাপ্পা তাড়াতাড়ি বলিল, ‘তাই বলো! সেইজন্যেই এমন সুন্দর রাঁধতে পেরেছ!' পার্থের কিন্তু সন্দেহ যায় না। সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘এ মাছকে কি বলে তোমাদের দেশে? তোমাদের দেশেও ঐ নাম নাকি?'

জগড়নাথো মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিল—“আমাদের দেশে একে বলে মুরগী।”

দুর্ভিক্ষে খাদ্য সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

খাদ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত দরকারী কয়েকটা কথা আজ বলিব। কাগজের অভাব, তাই খুব সংক্ষেপে বলিব। খাদ্য সংগ্রহের সময়ে প্রথমেই খাদ্যে এই ক'টি গুণ বা মূল্যের কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রথম, তাপমূল্য বা শক্তিমূল্য—ইংরাজীতে যাকে বলে ‘এনার্জ্জি ভ্যালু' বা ‘ক্যালোরিজ ভ্যালু'। ২য়—খাদ্যের প্রটীন মূল্য। প্রটীন জাতীয় খাদ্যের পরিচয় তোমাদের আগে অনেকবার দিয়াছি। প্রটীন খাদ্যও তাপ দিতে পারে কিন্তু উহার প্রধান প্রয়োজন শরীর গঠন করিতে এবং অপচয়গ্রস্ত শরীর পুনর্গঠন করিতে। শিশু ও বালকদিগের শরীর বাড়ে এই প্রটীন খাদ্যের দ্বারা ও বয়স্কদিগের শরীরের দৈনিক অপচয় মেরামত হয় এই প্রটীন খাদ্যের দ্বারা। ৩য়—খাদ্যের জীবজ প্রটীন মূল্য। প্রটীন যেমন চাল, ডাল প্রভৃতি উদ্ভিদ্ দ্রব্যে আছে তেমনি আবার দুধ, মাংস, মাছ, ডিম প্রভৃতি জীবজ খাদ্যেও আছে। দেখা গিয়াছে জীবজ প্রটীনের কার্য্যকারিতা-শক্তি উদ্ভিদ্-প্রটীনের চেয়ে বেশী। এজন্য খাদ্যে উহাদের কিছু সামান্য মাত্রায়ও থাকা প্রয়োজন। যাঁহারা নিরামিষ খান—অর্থাৎ শুধু উদ্ভিদ্-প্রটীন খাইয়া জীবন ধারণ করেন তাঁহাদের অনেক রকম উদ্ভিদ্ খাইতে পারিলে ভাল হয়।

৪র্থ—“স্নেহ” বা তেল ও ঘির সদৃশ খাদ্যমূল্য। খাদ্যে কিছু পরিমাণ তেল ও ঘি থাকা প্রয়োজন। ঘি ও মাখনে কিছু প্রয়োজনীয় ভিটামিন থাকে।

৫ম—খাদ্যের ভিটামিন মূল্য। এগুলি খাদ্যে সামান্য মাত্রায় থাকে, কিন্তু এগুলি শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। লাল চালে, লাল আটায় ও ডালে ভিটামিন 'বি' থাকে। ঘি, মাখন, দুধ ও ডিমে ভিটামিন 'এ' থাকে। ফলে ভিটামিন 'সি' থাকে। গাছের সবুজ পাতায় প্রায় সব ভিটামিন আছে। এজন্য প্রত্যহ কিছু শাকপাতাও খাওয়া প্রয়োজন। ৬ষ্ঠ—খাদ্যের বিবিধ জাতীয় লবণ ও ক্ষার মূল্য। সকল খাদ্যেই, বিশেষতঃ শাকপাতা, ফল ও আনাজে, এই সকল লবণ আছে, এজন্য উহাদের সবগুলিই প্রয়োজন।

বাঙ্গালীদের পক্ষে সামনের পাঁচ মাস (জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত) অত্যন্ত দুঃসময়। দুঃসময়ে খাদ্যের তাপমূল্যের কথাই সব চেয়ে আগে বিচার্য্য। শরীরকে একটা মোটর গাড়ীর মত যন্ত্রের সহিত তুলনা করা হয়। তফাৎ এই,—মোটর গাড়ীটী কারখানা হইতে একেবারে পূর্ণাঙ্গ হইয়া বাহির হইয়া আসে এবং ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই উহা ক্ষয় হইতে আরম্ভ করে। কিছুকাল পরে এটা বদলাইতে হয়, ওটা সারাইতে হয়। এরূপ করিয়া কয়েক বছর চলে, তাহার পরেই উহা অচল হয় অর্থাৎ উহার মৃত্যু হয়। দেহ-যন্ত্রটা কিন্তু সম্পূর্ণ হইয়া মাতৃদেহ হইতে বাহির হয় না। উহা প্রতিদিন একটু একটু করিয়া বাড়িয়া নিজেকে সম্পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণতর করিতে থাকে। ২৫ বৎসরের সময় উহার সম্পূর্ণত্বের শেষ হয়। তার পর উহা কিছুকাল বেশ কাজ করে, কিন্তু উহার ক্ষয় ধরিয়াছে। কয়েক বৎসর পরে সেই ক্ষয়ের প্রভাব অনুভূত হয়—বার্দ্ধক্য আসে। তারপর কিছুকাল পরে দেহ-যন্ত্র অচল হয়—মৃত্যু।

মোটরকার কাজ করে অর্থাৎ মাল লইয়া দৌড়ায়—পেট্রোল পোড়াইয়া। শরীর-যন্ত্রও কাজ করে দেহের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্য পোড়াইয়া। একটু চিনি, চাল, দুধ বা মাংস পোড়াইলে একটু তাপ বাহির হয়। শুষ্ক দুধ, চিনি বা মাংস পুড়িবার সময় একটু আলো ও তাপ দুই-ই দেয়। দেহের মধ্যেও ঐ সকল দ্রব্যই পোড়ে, তবে তাহাতে কোনও আলোক উদ্ভূত হয় না, শুধু তাপ উদ্ভূত হয়। ক্যালোরিমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ জিনিস পুড়িয়া কতটা তাপ হয় বৈজ্ঞানিকেরা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। এক কিলোগ্রাম (এক সেরের কিছু বেশী) বিবিধ খাদ্যদ্রব্য পুড়িয়া কিরূপ তাপ হয় তাহা বাহির করিয়া নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রস্তুত হইয়াছে।

দ্রব্য	··· তাপমূল্য বা ক্যালোরি	দ্রব্য	··· তাপমূল্য বা ক্যালোরি
গম ···	৩৬৪০	মাখন ···	৭৯১০
যব ···	৩৬০০	তেল ও ঘি ···	৯৩০০
চাল ···	৩৫৪০	চিনি, মিছরী, শক্ত গুড় ···	৪১০০
মাংস (ভাল চর্ব্বিযুক্ত) ···	২৭৯০–৩৩৪০	আলু ···	৭০০

দ্রব্য	··· তাপমূল্য বা ক্যালোরি	দ্রব্য	··· তাপমূল্য বা ক্যালোরি
পক্ষীর মাংস	১৫০০	ডাল ···	৩৬০০
মাছ ···	৫০০—৮৫০	বাদাম ···	২৬০০
ডিম ···	১৪০০		

উপরোক্ত তালিকা হইতে কিরূপে বিপদ্‌কালে খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে তাহার উপদেশ পাওয়া যাইবে। যেমন, মাঝে কেহ কেহ বলিতেছিলেন, আলু চালের চেয়ে সস্তা, অতএব চালের বদলে আলু খাও। উপরের তালিকা হইতে জানা যায় যে এক সের চাল তাপমূল্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে পাঁচ সের আলুর সমান। অর্থাৎ সাত টাকা মণ আলু ৩৫৲ টাকা মণ চালের সমান। এক টাকা সের ময়দার রুটী খাওয়ায় আর লুচি খাওয়ায় একই খরচ পড়ে। চৌদ্দ আনা সের মুড়ির বদলে যদি ছেলেরা মিছরী খাইতে চায় তাহা হইলে তাহাতে খরচটা প্রকৃতই কম হয়। আট আনা সেরের পাটালি গুড় ২২৲ টাকা মণ চালের চেয়ে ঢের বেশী সুলভ খাদ্য। ১৭৲ বা ১৮৲ টাকা মণ ডাল চালের চেয়ে সুলভ খাদ্য।

বিপদের দিনে এখন লোককে নানা অনভ্যস্ত খাদ্যে অভ্যস্ত হইতে হইতেছে। এই বিপদ্ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে গীতার উপদেশ বড়ই প্রয়োজনীয়। "দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত হইতে হইবে; সতত সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যে অবস্থা বা দুঃখের পরিবর্ত্তন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে তাহার জন্য হা-হুতাশ করা তামসিক চিত্তের লক্ষণ।" বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ভয়, ঘৃণা, রাগ বা বিদ্বেষ মনে লইয়া কোনও বস্তু আহার করিলে পেটের ভিতর সম্যক্ পাচক রস নিঃসৃত হয় না, অপরিপাক হয়। কিন্তু সন্তুষ্ট ভাবে খাইলে সহজেই পাচক রস নির্গত হয় এবং খাদ্যবস্তু শীঘ্র পরিপাক হয়। সেই জন্য শাস্ত্রের আর একটা উপদেশ "অন্নকে নিন্দা করিবে না, তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে।" পাচক যন্ত্রাবলীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মনের শক্তি খুব বেশী।

এই বিপদের সময় আমাদিগকে দাঁতের ব্যবহার নূতন করিয়া শিখিতে হইবে। ছোলা ভাজার মত দুষ্পাচ্য খাদ্য যাহার কখনও হজম হয় না, সে যদি এক মুঠা বা দুই মুঠা ছোলা ভাজা লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সুন্দররূপে চিবাইয়া খায় তবে সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিবে যে তাহার কোনই অসুখ হইবে না।

শিশুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাহিত্যভূষণ

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমীদরী সংক্রান্ত কাজে মাঝে মাঝে সাজাদপুরে এসে থাকতেন। শিশু মাত্রেই রবীন্দ্রনাথের ছিল ভারী প্রিয়—তা যে জাতের বা যে স্তরের ছেলেই হোক না কেন।

সাজাদপুরের অর্দ্ধনগ্ন অতি সাধারণ পল্লীর ছেলেদের উপরও তাঁর সহানুভূতি কম ছিল না। ছেলেরা খালের পাড়ে আনন্দে খেলাধূলা করত, তিনি 'বোটে' বসে উপভোগ করতেন। এতে যদি কেউ বাধা দিত তিনি তা মেটেই সহ্য করতে পারতেন না।

একদিনের কথা বলি।

কুঠিবাড়ীর সামনে বিরাট বাগান, এবং বাগানের পূর্ব্বদিকে ঠিক খালের উপরেই দুটি বড় বড় ঝাউগাছ। এইখানে এসেই লাগতো রবীন্দ্রনাথের রঙচঙা বোট। দিনের বেলায়ও এই বোটে তিনি অনেক সময় ইচ্ছা করেই কাটাতেন।

তখন গ্রামের সূর্য্য অস্ত যায় যায়। পশ্চিমের কৃষ্ণচূড়া গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে রক্তায়মান সূর্য্যের অগ্নি-আলো এসে পড়েছে কুঠিবাড়ীর সামনে বিরাট ময়দানের উপর। খালের পাড়ে অতি সাধারণ জাতীয় কতকগুলি অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলে ছুটোছুটি করে হাডুডু খেলছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোটের গবাক্ষ-পথে সূর্য্যাস্তের রঙিন সমারোহের ভিতর সরল সাধারণ পল্লীবালকদের অবাধ ছুটোছুটি প্রাণ ভরে উপভোগ করছিলেন।

তোমরা সবাই জান যে হাডুডু খেলায় দু'টি দল একটি নির্দ্দিষ্ট সীমানার দু'দিকে থাকে। একদলের একটি খেলোয়াড় দম নিয়ে বিপক্ষদলের সীমানায় যায় এবং তাদের ছুঁয়ে, মেরে আসে। আবার বিপক্ষ দলের সকলে যদি তাকে ধরে ফেলে এবং সেও দম ছেড়ে দেয় তবেই সে খেলার অযোগ্য হয়ে বাইরে বসে থাকে। বিপক্ষদলের একজনকে তাদের দলের কেউ মারতে পারলে তবে সে আবার খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

এই ধরা-ছোঁয়ার ব্যাপারটা খুবই আমোদজনক; কারণ যে দম দেয় তার লক্ষ্য থাকে বিপক্ষ দলের যে কোনও খেলোয়াড়কে মেরে আসা। বিপক্ষদলের লক্ষ্য থাকে শত্রুপক্ষীয় এই একক বীরটিকে ঘের দিয়ে অভিমন্যুর মত চক্রব্যূহে আবদ্ধ করা।

যা হোক, রবীন্দ্রনাথ খুব মন দিয়ে এই খেলা দেখছিলেন। একদলের একটি ছেলে দম দিতে এসেছিল বিপক্ষ-সীমানায়। অমনি শত্রুপক্ষের একজন তাকে ধরে ফেলেছে; সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'জন, আরো দু'জন। কিন্তু কি কৌশলে যে ছেলেটি সেই ব্যূহের সকলকে মেরে বেরিয়ে এলো

কেউ বুঝতে পারল না। এ দলে তখন হাসির হল্লা, ও দলের সবাই মার-খাওয়া ঘোড়ার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আত্মভোলা কবিও জয়ের আনন্দে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

এদিকে হয়েছে কি, কবির অনুচরেরা বাইরে আরামে গল্প জুড়ে দিয়েছিল; হঠাৎ প্রভুর গলার আওয়াজ পেয়ে দাঁড়িয়ে দেখে কতকগুলি অর্দ্ধ-উলঙ্গ মাটিমাখা কালো ছেলে বোটের সামনে হল্লা করছে।

কি, মালিকের সামনে এমন বেয়াদবী! তারা হুঙ্কার দিয়ে তেড়ে এল। ছেলেগুলোকে এমন শাসাতে লাগলো যে তারা ভয় পেয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

রবীন্দ্রনাথ আর ভিতরে থাকতে পারলেন না। এমন জমাট আনন্দের ঝঙ্কার বেসুরো হয়ে যাওয়ায় তাঁর আর সহ্য হলো না। বেরিয়ে এসেই তাঁর পদাতিক সৈন্যদের উপর খুব একচোট ঝেড়ে নিলেন। তারা ছিল এতক্ষণ এক একটি সিংহ কিন্তু এখন একেবারে কেঁচোটি।

রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন মুখে ছেলেদের ডেকে বল্লেন: "তোরা কোন্ পাড়ার ছেলে রে?"

একটি ছেলে বল্লে, "আব্দাল পাড়ার।" *

রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে হেসে নানা গল্প করলেন। তারপর বল্লেন, "তোরা রোজ এখানে এসে খেলবি, কোন ভয় নেই, বুঝলি?"

তার পর দিন থেকে তারা রোজই আসত। এই খেলার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্ন পত্রের' একজায়গায় বলেছেন:—

"বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলে মিলে খেলা করে—বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদবি মনে করে... কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম।"

আজ যে গল্পটি তোমাদের কাছে বল্লাম, এমনি আর একটি গল্প রবীন্দ্রনাথ তাঁর একখানি সাজাদপুরের চিঠিতে লিখে গেছেন, সেটা সোজা ক'রে তোমাদের কাছে বলবার ইচ্ছা রইল।

*মুসলমান মৎস্য-বিক্রেতাদের 'আব্দাল' বলে।

বুদ্ধির্যস্য

শ্রীসুবোধ বসু

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ভোম্বল: এই বুঝি তোদের পড়শোনা হচ্চে ? ওরে, ঐ: ছোঁড়ারা, কিসের ঘোঁট পাকাচ্ছিস শুনি ?

মণ্টু: ঘোঁট ? কৈ, নাঃ!

পল্টু: একমনে আমরা সব পড়ে যাচ্ছিলাম। বই থেকে চোখ উঠিয়ে যে সময় নষ্ট করব, তা পর্য্যন্ত করিনি।

কানু: অশোকের রাজত্বটা একবারেই শেষ ক'রে ফেল্লাম। কলিঙ্গ বিজয়ের পর······ অশোক···

ভোম্বল: থাম্ থাম, ঢের হয়েচে। ছেলে ভোলাতে এসেছিস ? তোরা ঘুরিস ডালে ডালে, আমি ঘুরি পাতায় পাতায়। পড়ার শব্দ আর গল্পের শব্দের তফাৎটা ধরতে পারি নে ?

ছবি: অনেক সময় পড়ার শব্দকেও গপ পের শব্দের মতো মনে হয়। হয় নারে হাবুল ?

ভোম্বল: থাম্ বলছি, ছবে! বেশি বাজে বকর-বকর করবি তো গাঁট্টা খেয়ে মরবি বলে দিলুম।

হাবুল: লাট্টু ঘোরাবার সময় দেখেচি, প্রথমটায় আওয়াজটায় যত জোর থাকে, জিম ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর তেমন থাকে না। কিন্তু আওয়াজ কমলে কি হবে, ঘোরাটা বেশ নিয়মিত হয়ে আসে। পড়ার শব্দটা যখন কমে আসবে, বুঝলে ভোম্বল, তখনই বুঝবে, পড়ায় ঠিক মন বসেছে; বেশ একটু গভীর মনোযোগ···

ভোম্বল: বটে বটে ? যাই ড্রিল-সারের কাছে খবরটা জানিয়ে আসি। তিনি এসে পিঠের ওপর এই মনোযোগের পুরস্কারটা দিয়ে যান। লক্ষ্মীছাড়া, বাঁদর, কেথাকার।

(সক্রোধে সবেগে প্রস্থান)।

মণ্টু: এই রে, সেরেছে। পেটে পড়বার আগে আজ পিঠে পড়বে।

পলটু: যা বলেছিস। দেখ, এর কিছু করতেই হবে। এ যে কথায় কথায় শাসিয়ে যায়, মার খাওয়ায়, বলি আমরা কি আগেকার কালের ক্রীতদাস ? ভোম্বলটাকে জব্দ করতে না পারলে আর চলছে না।

ছবি: যতক্ষণ ড্রিল্ সার ওর হাতে আছেন, ততক্ষণ তার উপায় কোথায় ?

কানু: ড্রিল্ সারের সঙ্গে কোনও রকমে একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিতে পারা যায় না ? ওর খুঁটির জোর গেলে ও-ও কাৎ হবে, তা গায়ে ওর যতই জোর থাকুক না কেন ?

মণ্টু: ঠিক মতলব বাৎলিয়েছিস। কিন্তু ঝগড়াটা বাধান যায় কি করে ? শুনচিস হাবুল, আয়, একটু ভেবে চিন্তে দেখা যাক। এ আর সহ্য হয় না। ক্ষিধেয় আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে, অথচ ন'টার আগে খেতে যাবার উপায় নেই। [ঢং ঢং করিয়া খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল] ঐ, ঐ, যাক, বাঁচা গেল। চল, চল, আর দেরি নয়, খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। তারপর বেশ একটু ভেবে-টেবে এর একটা যা হোক বিহিত করতে হবে।

(সকলে উঠিয়া পড়িল।)

ছবি: অমি কিন্তু ভাই কোনও মতেই ভোম্বলের কাছে বসব না। হাবুল, তোকেই ভাই ও যা হোক একটু সমীহ করে। তুই-ই ওর কাছ দিয়ে বসিস। তোর পাতে হাত দিতে সাহস পাবে না।

হাবুল: কিন্তু সারকে দিয়ে মার খাওয়াতে পারবে তো। যা হোক, আমি একটা মতলব ঠিক করেছি। খেয়ে এসে তোদের বলব'খন। জানিস তো, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—অর্থাৎ কিনা বুদ্ধি যার, জোর তার। সেই জোর—

মণ্টু: চল ভাই, আর দেরি নয়! আর দেরি হ'লে ক্ষিধেয় আমি কেঁদে ফেলব।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোষ্টেলের শুইবার ঘর। দুই সারি তক্তপোষ পাতা; তাহাদের ভিতর দিয়া চলিবার পথ। রাত ১১টা ১২টা হইবে। ছেলেরা সকলেই ঘুমাইতেছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে দু' একটা মাথা দু'একবার উঠিয়া কি সামান্য ফিস ফিস করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ভোম্বলের নাসিকাটি বিরাট ও একটানা গর্জ্জন করিতেছে।

ড্রিল-সারের প্রবেশ

ড্রিল সার: [আগাইয়া আসিতে আসিতে] কি হাঙ্গামা! ছেলেদের দৌরাত্ম্যিতে তিষ্ঠান মুস্কিল হয়ে পড়েছে। কোন্ বাঁদর আবার নাকের ডাক ডাকতে সুরু করেছে। হষ্টেলের চার্জ্জ নিয়ে ঝকমারি করা হয়েছিল। সারাদিন তো ছেলে ঠেঙিয়ে কাটে, তারপর রাত্তিরেও যদি দু'দণ্ড বিশ্রাম করতে না পারি তবে জীবন বাঁচে কি করে ? দেখা যাক, এ কোন্ লক্ষ্মীছাড়ার বাঁদরামি। পিটিয়ে চামড়া খসিয়ে ছাড়ব। [অগ্রসর হইয়া কানু, মণ্টু, হাবুল প্রভৃতিকে একে একে পরীক্ষা] নাঃ, এই দুষ্টু ছোকরাগুলি নয়। ঐ কোণাটা থেকে আসচে মনে হচ্ছে। রসো, শয়তান,

তোমার বজ্জাতিটা টের পাওয়াচ্ছি [ঘুমন্ত ভোম্বলের কাছাকাছি উপস্থিত] এ কি, ভোম্বল! এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? শেষে ভোম্বল, যাকে আমি এমন ভাল ছেলে বলে জানি, তার এই কাণ্ড—রাত দুপুরে মোষের ডাক ডাকছে, যার চোটে আমাকে নীচতলা থেকে ওপর তলায় উঠে আসতে হলো! [আরও কাছে আগাইয়া গেলেন] বাঁচা গেল! মোষের ডাক নয়। ভোম্বল আমার সে ধরণের ছেলেই নয়। এটা নাকের ডাক—মাত্র নাকের ডাক। আমি ভাবলাম কি না জানি! ডন বৈঠকের দরুণ যতই ওর স্বাস্থ্যটা ভাল হচ্ছে, ততই সুনিদ্রা হচ্ছে, আর নাকের ডাকটাও বেড়ে যাচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে যে স্বাস্থ্যের এতটা উন্নতি হয়েছে তা আমি টের পাইনি। নাকের ডাকটার উচ্চতা শুনে এবার নিঃসন্দেহ হলাম। বড় আনন্দ পেলাম। [যাইতে যাইতে অন্যান্যদের লক্ষ্য করিয়া] ভোম্বল না থাকলে এগুলিকে শায়েস্তা করতে কি আমার কম হাঙ্গামা হ'তো?

[প্রস্থান]

পরপর পাঁচটি মাথা বিছানার উপর খাড়া হইয়া উঠিল।

মণ্টু: [ফিস ফিস করিয়া] হাবলু?

হাবুল: চুপ চুপ। ছবি, রঙের বাটি কোথায়? শীগ্‌গির আন। কথায় বলে, বুদ্ধির্যস্য।

ছবি: কাছেই আছে। লাগাব নাকি?

হাবুল: আয়, আয়, পা টিপে আয়।

ছবি: জেগে উঠলে আমার আর নিস্তার নেই। তা হোক গে। মরতে হয় মরব, তবু এ করা চাই।

মণ্টু: তোর ভয় নেই কিছু, দেখছিস না কি রকম নাকের গর্জ্জন? এ ঘুম সহজে ভাঙবার নয়।

হাবুল: শুভস্য শীঘ্রম্। আর দেরি নয়। যেমনটি বলেছি তেমনি করা চাই। পর পর দু'বছর ড্রইংএ ফেল করে আসচি; নিজ হাতে আর পেণ্টিং করতে চাইনে। আয় ছবি, এগিয়ে আয়। প্রথমে জিঙ্ক অক্সাইড দিয়ে মুখটা আচ্ছা করে লেপে দিবি। তাতে মুখখানা ইস্পাতের মতো চক্‌চক্ করতে থাকবে। তারপর কপালে মস্ত বড় একটা সিঁদুরের ফোঁটা বসিয়ে দিবি, আর থুৎনিটাতে আলকাতরা। চটপট সেরে ফেলতে হবে। ড্রইং পেণ্টিং-এ যে ফার্ষ্ট হয়েছিলি, আজ তার অগ্নিপরীক্ষা হবে, ছবি নাম সার্থক হবে। আয়, পা টিপে টিপে এগিয়ে আয়। কথায় বলে, বুদ্ধির্যস্য।

চার-পাঁচ জন পা টিপিয়া ভোম্বলের বিছানাটার দিকে অগ্রসর হইল। ছবি রং-এর পাত্র লইয়া ঘুমন্ত ভোম্বলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

প্যারাসুট্-বাহিনী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

এবারকার যুদ্ধে 'স্থলবাহিনী', 'নৌবাহিনী', 'বিমান-বাহিনী' প্রভৃতি সৈন্যদলের নামের সঙ্গে 'প্যারাসুট্-বাহিনী' নামে একটা নতুন নামও আমদানী হয়েছে, এবং যারা ভাল ক'রে খবরের কাগজ পড় তারা হয়তো জান যে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্ এবং বিশেষ ক'রে ক্রীটের যুদ্ধে জার্ম্মান্‌রা যে অতটা সুবিধা করতে পেরেছিল তার অনেকটা কারণ এই প্যারাসুট্-সৈন্যদের সাহায্য।

প্যারাসুট্ কাকে বলে নিশ্চয়ই জান? উঁচু আকাশ দিয়ে এরোপ্লেন চলেছে; এরোপ্লেন না নামিয়ে তখনই তা থেকে নেমে পড়তে হবে। তখন যদি পোষাকের সঙ্গে এই প্যারাসুট্ এঁটে ঐ আকাশ থেকেই ঝাঁপিয়ে পড় তবে খানিক বাদে দেখবে, পড়তে পড়তে শূন্যের মধ্যেই প্যারাসুট্ ছাতার মত খুলে গেছে এবং তুমি বাতাসে ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসছ। এই ভাবে প্যারাসুটের সাহায্যে যে সব সৈন্য শত্রুর দেশে গিয়ে নামে তাদেরই বলা হয় প্যারাসুট-সৈন্য। শত্রুর দেশে নেমে তারা অলক্ষিতে নানা রকম কাজ গুছিয়ে রাখে। গোপনে দল বেঁধে শত্রুব্যূহের পেছনে জড় হ'তে পারলে সুবিধা বড় কম হয় না। অতর্কিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল ক'রে, টেলিফোনের তার কেটে, নানা উপায়ে বিপক্ষের সৈন্য চলাচলে বাধা দিয়ে এবং বে-সামরিক অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে এই প্যারাসুট্-সৈন্যেরা অনেক কিছু কাণ্ডই ঘটিয়ে তোলে।

বলা বহুল্য যে সব সৈন্য এই প্যারাসুট-বাহিনীতে যোগ দেয় তারা খুব বাছাই-করা লোক হওয়া দরকার। কারণ কাজটি খুব সহজ নয়—শরীরের দিক্ দিয়ে তো বটেই, উপস্থিত-বুদ্ধিরও এতে ভীষণ প্রয়োজন। সম্পূর্ণ সুস্থ চেহারার লম্বা-চওড়া জোয়ান্ লোক চাই। আমেরিকায় তো ত্রিশ বছরের বেশী বয়সের লোকদের এ কাজে নেওয়াই হয় না। শরীরের ওজন খুব বেশী হ'লেও এ কাজে সুবিধা হয় না—কেননা ঝাঁপ দেবার সময় প্যারাসুট্-সৈনিককে অনেক ভারী ভারী জিনিষ নিয়ে নামতে হয়। এদের অনেক দিন ধরে শিক্ষানবীশী করতে হয়। এই সময়ে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও নানা রকম কসরৎ অভ্যাস করতে হয়,—যেমন ডিগবাজী খাওয়া, উঁচু থেকে

ঝাঁপ দেওয়া, শূন্যে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদি। বিমান থেকে ঝাঁপ খাওয়া তো আভ্যাস করতে হয়ই। কারণ আনাড়ি লোক যদি ওভাবে প্যারাসুট নিয়ে নামতে যায় তবে মাটীতে পড়ে তার হাত-পা ভাঙবার খুবই সম্ভাবনা।

এক-একটী প্যারাসুট-সৈন্যবাহী বিমানে সাধারণতঃ ত্রিশ জন ক'রে সৈন্য থাকে এবং সৈন্য নামাবার আগে বিমানগুলি মাটী থেকে মাত্র শ' তিনেক ফুট ওপরে নেমে আসে। নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বিমানগুলি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। প্রথমে দলের যিনি নায়ক তিনিই ঝাঁপ দেন। তাঁর পিছু পিছু অপর সৈন্যেরা নামে। এদের পোষাকের মধ্যেও কিছুটা কারিকুরি আছে। যেমন ধর, পায়ের বুট হয় খুব উঁচু এবং তার তলাটা পুরু রবার দিয়ে মোড়া—যাতে মাটীতে নামবার সময় চোট কম লাগে। সঙ্গে খুব বেশী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এরা নামে না—সেগুলো আলাদা বাক্সে করে পৃথক্ ভাবে প্যারাসুটে বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হয়। রিভল্‌ভার, হাত-বোমা, জলের বোতল—এই ধরণের কতকগুলি জিনিষ অবশ্যি সৈনিকের পোষাকের সঙ্গেই আঁটা থাকে।

বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় গোড়ালী দিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে ঝাঁপ দিতে হয়। প্যারাসুট্ অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে খোলে না, শূন্যে খানিকটা নেমে আসার পর তবেই খোলে। এই সময় প্যারাসুটের দড়ি ধ'রে মাঝে মাঝে হেঁচকা টান দিলে ভাল হয়। মাটীর কাছাকাছি এসেও আবার খুব সাবধান হ'তে হয়—কারণ ঠিকমত না নামতে পারলে ভীষণ চোট লেগে জখম হবার খুবই সম্ভাবনা। এজন্য দড়ি ধরে আবার হেঁচকা টান দিয়ে দিয়ে প্যারাসুটের গতি যতটা সম্ভব মন্থর ক'রে নিতে হয়। তা সত্ত্বেও একটু আধটু চোট প্রায় সব সময়েই লাগে। অনেক সময় আবার প্যারাসুটে নামবার সময় শত্রুরা দেখে ফেলে এবং গুলি ছুঁড়তে থাকে। ঐ সময় আত্মরক্ষা করা সহজ কথা নয়। এরকম ক্ষেত্রে নামতে নামতে শরীরটাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোলাতে পারলে শত্রুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা চলে। এ কসরৎ শিক্ষানবীশীর সময়েই ভাল ক'রে শিখতে হয়।

মাটীতে নেমেই প্যারাসুট্-সৈনিকরা তাড়াতাড়ি প্যারাসুট্ গুটিয়ে ফেলে। তারপর পোষাক বদলে ওপর থেকে ফেলা অস্ত্রগুলো হাত করে। এর পর নায়কের নির্দ্দেশ মত ৮।১০ জন ক'রে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিজের নিজের কাজে লেগে যায়। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রাইফেল, মেশিনগান্, হাত-বোমা এই সব থাকে।

আজকাল প্রায় সব দেশেই প্যারাসুট্-বাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। রাশিয়ায় অনেক দিন আগেই ছিল, যদিও জার্ম্মান্‌রাই এবারকার যুদ্ধের গেড়ার দিকে এদের সাহায্যে সব চেয়ে সুবিধা ক'রে নিয়েছিল।

২৮

তখনই বন্দুক লইয়া সুশান্ত, অশোক প্রভৃতি কম্পিত পদে বনের দিকে অগ্রসর হইল। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বিয়্যার্ সামনের দুই পা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর গাছের তলায় পড়িয়া আছে একটী রমণীমূর্ত্তি—পোষাক দেখিয়া ইংরাজ বলিয়াই মনে হয়।

আজ এতদিন পরে এই দ্বীপে প্রথম জীবিত মানুষ দেখিয়া ছেলেদের মনের অবস্থা কেমন হইল তাহা তো বুঝিতেই পার। অশোক ও সুশান্ত হেঁট হইয়া বসিয়া তাহার নাক ও হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল। প্রথমটা জীবনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না; শেষে অশোক উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, "এই দেখ, একটু একটু নিঃশ্বাস পড়ছে!"

সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গুহার মধ্যে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর রমণীর জ্ঞান হইল, এবং কিছু খাওয়ানোর পর সে বেশ সুস্থ বোধ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর সকলে একত্রে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে রমণী তাহার নিজের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল :

রমণী জাতিতে আমেরিকান্। তার আসল নাম ক্যাথরিন রেডি, সকলে 'কেট্' বলিয়া ডাকে। সান্-ফ্রান্‌সিসকো হইতে জাহাজে করিয়া তাহারা চিলি যাইতেছিল। তাদের জাহাজটির নাম ছিল 'সেভার্ণ'। প্রথমটা তাদের সমুদ্রযাত্রা বেশ ভাল ভাবেই সুরু হইয়াছিল কিন্তু পথের মধ্যে ঘটিল এক ভীষণ অঘটন। ঐ জাহাজের নাবিকদের মধ্যে ওয়াল্‌ষ্টন্ নামে একটা লোক ছিল, আর ছিল তার সাতটি সঙ্গী ব্র্যাণ্ড্, রক্, হেন্‌লি, কুক্, ফর্ব্‌স্, কোপ্ ও পাইক্। এই লোকগুলিকে সাক্ষাৎ শয়তান বলিলেও চলে। চেহারাও যেমন এক একটার অসুরের মত, স্বভাবও ছিল তেমনি ভয়ঙ্কর। এই আটটি নরপিশাচ হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া ক্যাপ্‌টেন্‌কে খুন করিয়া জাহাজের কর্ত্তৃত্ব দখল করিয়া বসিল। তার পর একে একে

যাত্রীদেরও সকলকে তারা হত্যা করিল। শুধু দু'জন লোককে তারা রেহাই দিল। এক—এই 'কেট্'—ফর্ব্‌স্ সর্দ্দারকে বলিয়া কহিয়া তাকে বাঁচায়; আর একজন হইতেছে ইভান্স—জাহাজের ফার্ষ্ট্ মেট্। সে না থাকিলে জাহাজ চালাইবে কে এই ভাবিয়া তাকে হত্যা করা হইল না। তবে তাকে তারা খুব সুনজরেও রাখিল না। বেশ বোঝা গেল দরকার শেষ হইলেই তারা ইভান্সকে, এবং হয়তো কেট্‌কেও, শেষ করিবে।

ওয়াল্‌ষ্টনের উদ্দেশ্য ছিল জাহাজটিকে সোজা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে লইয়া যায়। সেখানে গিয়া তাহারা জলদস্যুর মত ক্রীতদাসের ব্যবসা চালাইবে। ইভান্সকে দিয়া তারা জোর করিয়া সেই ভাবে জাহাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিল।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের সব মতলবই ফাঁসিয়া গেল। কয়েকদিন পরেই কি জানি কেমন করিয়া জাহাজে হঠাৎ ভীষণ আগুন লাগিয়া গেল। বহু চেষ্টায়ও যখন সে আগুন নিভান গেল না তখন সকলে জাহাজের আশা ত্যাগ করিয়া একটা বড় নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে নামিয়া পড়িল—সঙ্গে লইল কয়েকটা বন্দুক, কিছু খাবার-দাবার ও অন্য সরঞ্জাম। হেন্‌লি নামিতে গিয়া জলে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঙ্গর আসিয়া তাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া নৌকা ভাসিয়া চলিল কিন্তু তবু কোন দিকে কোন ডাঙ্গার চিহ্ন দেখা গেল না। তার পর হঠাৎ ১৫ই অক্টোবরের সেই ভীষণ ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের মুখে পড়িয়া নৌকা সোজা সিন্ধুদ্বীপে গিয়া ওঠে। তীরে উঠিবার আগেই নৌকার একটা পাশ একেবারে গুঁড়া হইয়া যায়। ওয়াল্‌ষ্টন্ আর তার সঙ্গীরা এ ক'দিন একটানা ঝড় জলের সঙ্গে যুঝিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। নৌকা তীরের কাছাকাছি আসিয়াই এক প্রচণ্ড ঢেউএর তোড়ে একেবারে উল্‌টাইয়া যায়। ফলে পাঁচ জন আরোহী সমুদ্রের জলে ভাসিয়া যায়, আর দু'জন বালির উপর গিয়া পড়ে। কেট্ নৌকার বিপরীত দিকে ছিট্‌কাইয়া পড়ে।

কেট্ অনেকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান হইবার পর উঠিবার চেষ্টা করে কিন্তু ক্লান্তিতে তার শরীর তখন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। ঐ অবস্থায় এক সময়ে সে শুনিতে পাইল ওয়াল্‌ষ্টনের গলা, তার সঙ্গে ব্র্যাণ্ড এবং রকও ছিল। তাহারা তবে ভাসিয়া যায় নাই, ডাঙ্গায় উঠিয়াছে এবং সঙ্গীদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছে!

ওয়াল্‌ষ্টনেরা কেট্‌কে দেখিতে পাইল না; তাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তায় কেট্ বুঝিল ইভান্স্‌ও ছাড়া পায় নাই—কোপ্ ও কুকের পাহারায় তাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বন্দুক এবং টোটাগুলিও শয়তানরা জলে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই। তারপর ফর্ব্‌স্ ও পাইককে তুলিয়া লইয়া নৌকাখানা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দস্যুরা চলিয়া গেলে কেট্ উঠিয়া সেই অসাড় দেহে পাগলের মত ছুটিতে থাকে। তার পর কি হইয়াছিল সে কিছু জানে না।

কেটের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়া ছেলেরা যেমন বিস্মিত হইল তেমনি ভীত হইয়া উঠিল। এত দিন সিন্ধুদ্বীপে তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিল, আজ সেই দ্বীপে এমন সাতজন নরাধম ব্যক্তি পদার্পণ করিয়াছে যাহারা যে কোন প্রকার নিষ্ঠুর পাপকার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। ফরাসীগুহার সন্ধান পাইলে কি আর তাহাদের ছাড়িয়া দিবে? কখনই না। গুহার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি তাহারা প্রথমেই হস্তগত করিবে।

তখন সুশান্তর মনে আর একটি আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল। তাহারা না হয় গুহার মধ্যে সাবধানে আত্মগোপন করিয়া রহিল, কিন্তু রঞ্জিতেরা যে এই ডাকাতগুলির কথা কিছুই জানে না! তাহারা হয়ত নিশ্চিন্ত মনে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে, হয়ত তাহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ডাকাতেরা তাহাদের কথা জানিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবে। তারপর? না, না, রঞ্জিৎদের ফিরাইয়া আনা চাই-ই। এখন সকলের একত্র হইয়া থাকা দরকার। সুশান্ত বলিল, "আমি বুনোকে নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ি। রাত্রির অন্ধকারে বেশ গা ঢাকা দিয়ে যাওয়া যাবে।" অশোক অবাক্ হইয়া গেল, বলিল—"এই অন্ধকার রাত্রেই বেরুবে?" সুশান্ত কহিল—"হাঁ, অশোক, কারণ তা ছাড়া এখন অন্য উপায় নেই।" (ক্রমশঃ)

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা)

সূর্য্যমুখী

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

সূর্য্যমুখী দেখ্‌ছে চেয়ে
অস্তমুখী ঐ কা'কে,
দেখ্‌ছে চেয়ে আকাশ ছেয়ে
হলুদ রংএর বান ডাকে।
হলুদ রংএর পাপ্‌ড়িগুলি
দখিন্ হাওয়ায় উঠ্‌ছে দুলি,
হাতছানিতে ডাক্‌ছে তারা
প্রজাপতি, ভোম্‌রাকে।

সূর্য্যমুখী, সূর্য্যমুখী,
রাত হ'লে কি কর্‌বে গো?
সূর্য্যদেবের সাথে সাথে
তুমিও ঢুলে পড়বে গো?
ভোরের বেলা মাঠের শেষে
উঠলে তপন, মধুর হেসে
আবার কি গো অমনি ক'রে
সোনার মুকুট গড়বে গো?

ছোটদের পাতা

রাজা আর রাঁধুনী

শ্রীসীতা দেবী

রাজা মশাই শিকারে গিয়ে একটা বক মেরে এনেছেন। রাঁধুনীকে ডেকে বল্লেন, "ওহে, খুব ভা-ল ক'রে মশলা দিয়ে রাঁধ তো। আর দেখো, আস্ত রাখবে, কেট না যেন। আমি আস্ত বক খেতে ভারী ভালবাসি। বুঝলে?"

রাঁধুনী ঘাড় নেড়ে জানাল সে বুঝেছে।

রান্না হচ্ছে—আর তার সুগন্ধে সমস্ত বাড়ী মাতোয়ারা। রাঁধুনী আর লোভ সামলাতে পারল না। দেখতে দেখতে বকের একুটি ঠ্যাং অদৃশ্য হ'ল।

খেতে বসে রাজা মশাই রেগে আগুন। বকের আর একটা ঠ্যাং কই?

"বকের তো একটাই ঠ্যাং থাকে হুজুর"—রাঁধুনী নির্ব্বিকার চিত্তে জানাল।

"বটে? আমি বক চিনি না! চল তো জলার ধারে। দেখাবে বকের ক'টা ঠ্যাং।"—রাজা মশাই তখনই রাঁধুনীকে নিয়ে চললেন জলার ধারে।

দুপুর বেলা। বকেরা খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম করছিল। ঘুমুবার সময় বক তো একটা ঠ্যাং গুটিয়েই রাখে। রাজা মশাই অবাক্ হয়ে দেখলেন, তাই তো, বকগুলোর তো একটা ক'রেই ঠ্যাং! তাঁর ভারী মজা লাগ্‌ল, তিনি উৎসাহে একেবারে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

যেই না হাততালি দেওয়া বকগুলোও অমনি ভয় পেয়ে জেগে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'পা ছড়িয়ে উড়ে গেল। রাজা মশাই আবার অবাক্ হলেন, চেঁচিয়ে বল্লেন, "আরে, ঐ তো বকের দু'টো করে পা!"

রাঁধুনী জবাব দিল, "বাঃ, হাততালি দিলে তো বকের দু'টো পা গজাবেই। আপনি তো খেতে বসে হাততালি দেন নি! অবশ্যি ভালই করেছেন, ঠ্যাং গজালেই বক অমনি ক'রে উড়ে যেত; আপনার মাংস খাওয়াই হ'ত না।" *

---

* একটি পুরানো গল্প থেকে।

চিড়িয়াখানা

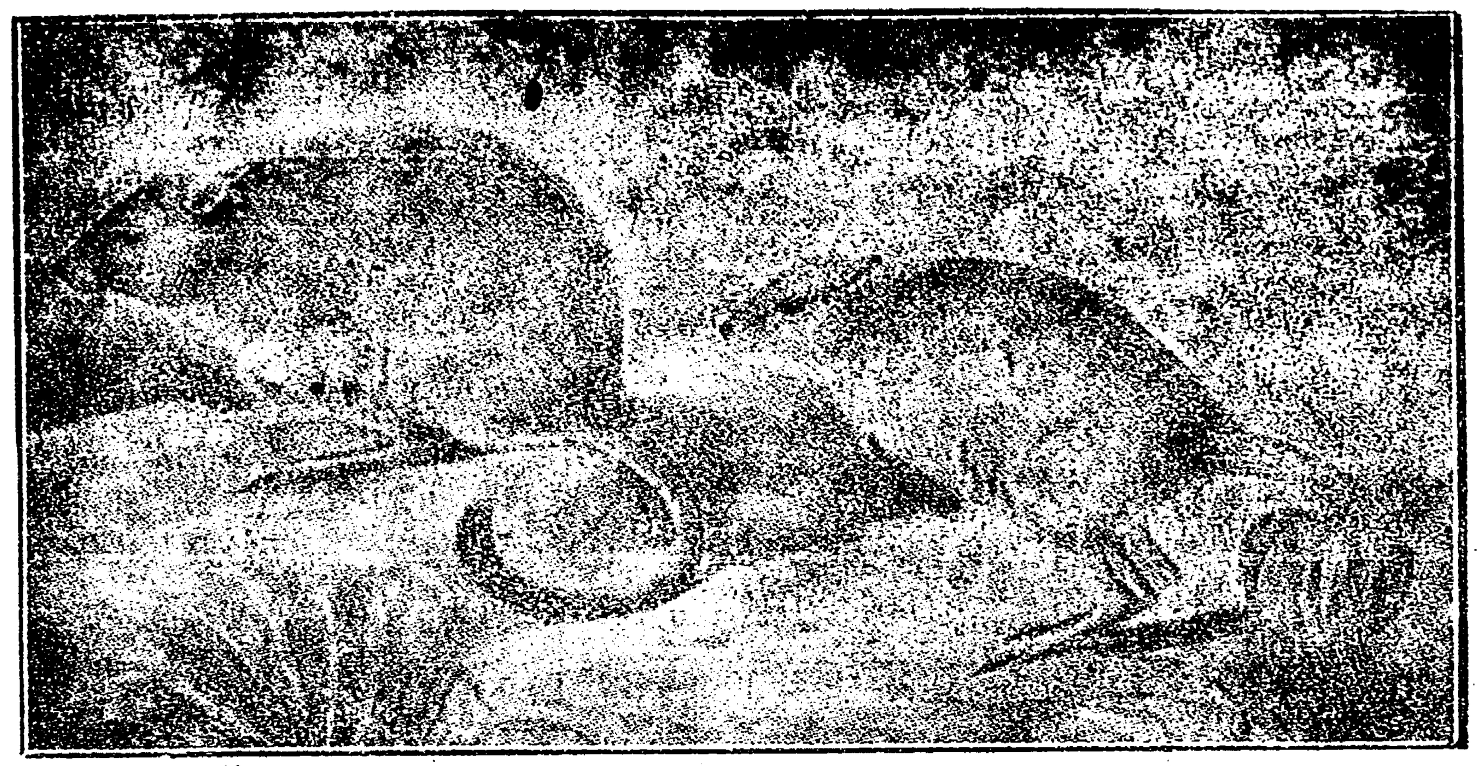

ইঁদুর-মুখো ক্যাঙ্গারু

ক্যাঙ্গারু নানা জাতের হয়। এই অদ্ভুত চেহারার জন্তুগুলিও আসলে ক্যাঙ্গারুরই জাতভাই। এদের বাড়ী অষ্ট্রেলিয়া।

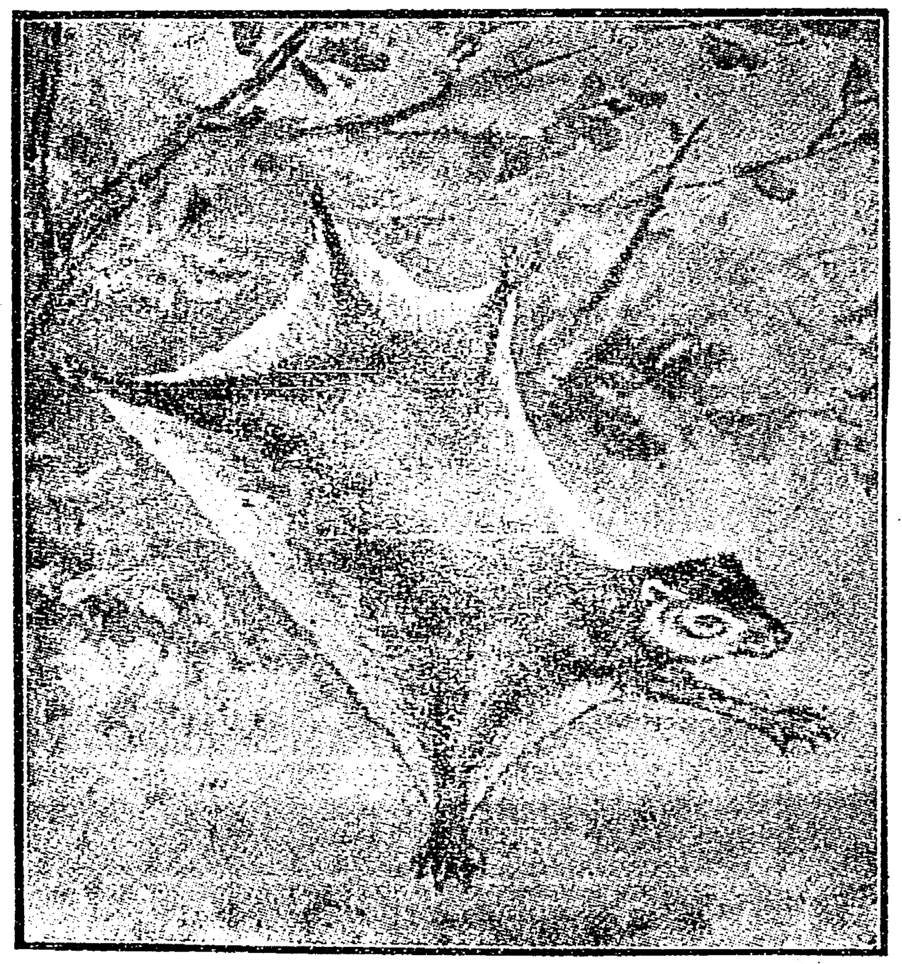

উড়ুক্কু লেমুর

পাখী না হ'লেও এরা কতকটা উড়তে পারে। এদের হাত, পা আর লেজ পাৎলা চামড়া দিয়ে যোড়া।—লাফ দিলে ঘুড়ির মত ছড়িয়ে যায়। এরা এক-এক লাফে ২০০।২৫০ ফুট্ রাস্তা পার হয়ে যেতে পারে।

কোডিয়াক ভালুক

জাতে ভালুক হ'লেও সাধারণ ভালুকের সঙ্গে এদের তফাৎ অনেক। এরা ভারী আমুদে—নানা রকম শারীরিক কসরৎ দেখাতে অদ্বিতীয়। কোডিয়াক ভালুক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য জীব।

সন্দেশ

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক স্যর্ নীলরতন সরকারের মৃত্যুতে সমস্ত ভারতের, এবং বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। অত বড় চিকিৎসক এ দেশে কমই হইয়াছেন। অনেকে বলেন, 'স্যর্ নীল্'—এই নামটি শুনিলেই রোগীর মনে এমন ভরসা হইত যে মনে হইত তার রোগ বুঝি অর্দ্ধেক সারিয়া গিয়াছে। চিকিৎসা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য নানা জনহিতকর ব্যাপারের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। ভগবান্ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।

সিন্ধুর জনপ্রিয় নেতা এবং ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী, আজাদ মুসলিম্ দলের সভাপতি আল্লাবক্স অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। আল্লাবক্স ছিলেন খাঁটী মুসলমান—স্বদেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, নির্ভীক এবং অসাম্প্রদায়িক। তাঁর এই ভাবে অকালমৃত্যুতে সমস্ত ভারত শোকার্ত্ত।

কলিকাতার হকী লীগ্ যথা সময়ে শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন্ হইবার গৌরব এবার পাইয়াছে রেঞ্জার্স্ দল। কাষ্টম্স্ দল এবার মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই। বেইটন্ কাপ্ ফাইনালে বি.এন্.আর দল রেঞ্জার্স্‌কে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছে।

কলিকাতায় এখন পূরাদমে ফুটবল্ লীগ্ চলিতেছে। লীগের প্রথমার্দ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ৬ই জুনের খবর—এখন পর্য্যন্ত গত বারের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন ইষ্ট বেঙ্গল দল তালিকায় ১ম ও মোহনবাগান দল ২য় যাই-তেছে। মহমেডান্ স্পোর্টিং আছে ৭ম স্থানে।

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর

চিনি, গজা, জিলাপি, বড়া, পুলি, পোলাও, লুচি, সর, বরফি, কচুরি, ছানা, পুরী, রুটি, পিঠে, মালপোয়া।

উত্তরদাতাদের নাম

রত্না, স্বপ্না ও জয়ন্ত (বাঁকীপুর); কল্যাণ দত্ত (দিল্লী); শিপ্রা বসু (লক্ষ্ণৌ); হিরণ ব্যানার্জ্জি (সিমলা); নীলা মৈত্র (ঢাকা); সীতা ও গীতা (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

নীচের কথাগুলির এক কথায় এমন এক একটি উত্তর দাও যার প্রত্যেকটির আগে, মাঝে বা শেষে একটী পানীয় থাকবে :—

দোর বন্ধ ক'রে কি লাগাবে? গায়ে কি দিচ্ছ? কি পেতে বসেছ? ঘুরছে কি? টক্-মিষ্টি মেশান ওটা কি? ছেলেটা অঙ্কে কি রকম? একজন বিখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিতের নাম চাই? ভারতের বেশীর ভাগ লোক কি? পাশ ক'রেই আজকাল ছেলেরা কি চায়? দোষ করলে কি হবে? (৫ই আষাঢ়ের মধ্যে জবাব পাঠাতে হবে)।

আমাদের সর্ব্বজন সমাদৃত পূজাবার্ষিকী

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

মধু মেলা

মূল্য মাত্র দুই টাকা

এই দুর্ব্বৎসরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত প্রবন্ধে, ও চিত্রে সমৃদ্ধ বিশাল গ্রন্থ

[দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল]

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী
ছোঃ চয়নিকা
গল্প সঞ্চয়ন
ঝলমল
আজব বই
শিশু-গল্পিকা
প্রত্যেকখানি ২৲

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী
সোনার কাঠি
যাদুঘর
চিত্রদীপ
মায়া মুকুর
সোনালী স্বপ্ন
প্রত্যেকখানা ২৲

পুরস্কার বিতরণে দিবার ভাল ভাল বই

হারানো দিন ১৲ দুই ভাই	১৲	তাতারের বন্দী	৸০
দেড়শো খোকার কাণ্ড	১৲	আধুনিক রবিনহুড	৸০
পাল্কী বুড়ো	।৵০	সাহারার আতঙ্ক	॥৵০
ছানা বড়া	।/০	স্বর্গে থিয়েটার	॥৵০
অন্ধকূপের বন্দী	৸০	ছেলেধরা সার্কাস্	॥৵০
ছোটদের শাহনামা	৸০	রোমাঞ্চকর কাহিনী	॥০
উড়োজাহাজে কয়েদী	॥০	কম্যাণ্ডার কবুতর	৸০
বোম্বেটে দ্বীপ	৸০	আকাশ গঙ্গা	৸০
তেপান্তরের মাঠ	॥০	দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন	॥০
নিশির ডাক	৸০	ঋষি অরবিন্দ	॥০
বিষের তীর	॥০	দানবীর কার্ণেগী	॥০

"নব প্রকাশিত"

ওপারের দূত-প্রবোধ সান্যাল, দ্বাদশ সূর্য্য (জীবনীকথা)-নৃপেন চট্টোপাধ্যায়
২৪নং কাঞ্চনজঙ্ঘা 'জয় পতাকা'—শৈলবালা ঘোষজায়া
জ্যৈষ্ঠ মাসে বাহির হইয়াছে।

বিস্তারিত পুস্তকের তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের দ্বিতীয় বর্ষের ২৩ সংখ্যা অবধি প্রকাশিত হইয়াছে

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি. ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

রামধনু

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

শ বর্ষ
সংখ্যা
াষাঢ়
৩৫০

মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪॥ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } { মূল্য ৮ টাকা

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১॥৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

Regd. No. C—1641

রামধনু

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

...শ বর্ষ
... সংখ্যা
...াষাঢ়
...৩৫০

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১৸৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

COLOUR PAPER

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

সদ্য প্রকাশিত

দ্বাদশ সূর্য্য

—কথা সহিত্যিক
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

মূল্য—১৷০

(বারজন মনীষীর জীবন-কথা)

রামকৃষ্ণ পরমহংস, টমাস এডিসন, আমুণ্ডসেন, সানইয়াৎ-সেন, হাওয়ার্ড কার্টার, বার্ণার্ড প্যালিসী, কামাল পাশা, মলেয়ার, ম্যাক্‌সিম গর্কী, রাজেন মুখোপাধ্যায়, লর্ড লিষ্টার ও জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার কথা নিয়ে সহজ সরল ভাবে লেখা।

প্রত্যেক জীবনীর সঙ্গে তাঁহাদেরই প্রত্যেকের (কার্য্যরত) একটি করিয়া বারটী হাফটোন্ ছবি দেওয়া হয়েছে। কাগজেরা বিশেষ ভাল বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

নব প্রকাশিত

১। জয়পতাকা—ডিটেকটিভ উপন্যাস—শৈলবালা ঘোষজায়া—৸০
২। উড়োজাহাজে কয়েদী—যুদ্ধ-উপন্যাস—ভূপেশ সেনগুপ্ত—৸০
৩। তেপান্তরের মাঠ—বালকের বীরত্বের গল্প—দীনেশ মুখোপাধ্যায়—॥০
৪। অন্ধকূপের বন্দী—রোমাঞ্চকর উপন্যাস—যতীন ঘোষ—৸০
৫। ওপারের দূত—কাঞ্চনজঙ্ঘা—প্রবোধ সান্যাল—৸০
৬। স্বর্গের সিঁড়ি—ডিটেকটিভ উপন্যাস—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৸০

(বিশ্বপ্রতিভা সিরিজ)

১। দানবীর কার্ণেগী—পরেশ সেনগুপ্ত—॥০
২। ঋষি অরবিন্দ—চন্দ্রকান্ত দত্ত-সরস্বতী—॥০
৩। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন—হেমেন্দ্রকুমার রায়—৸০

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল বিস্কুট ভালবাসি!"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

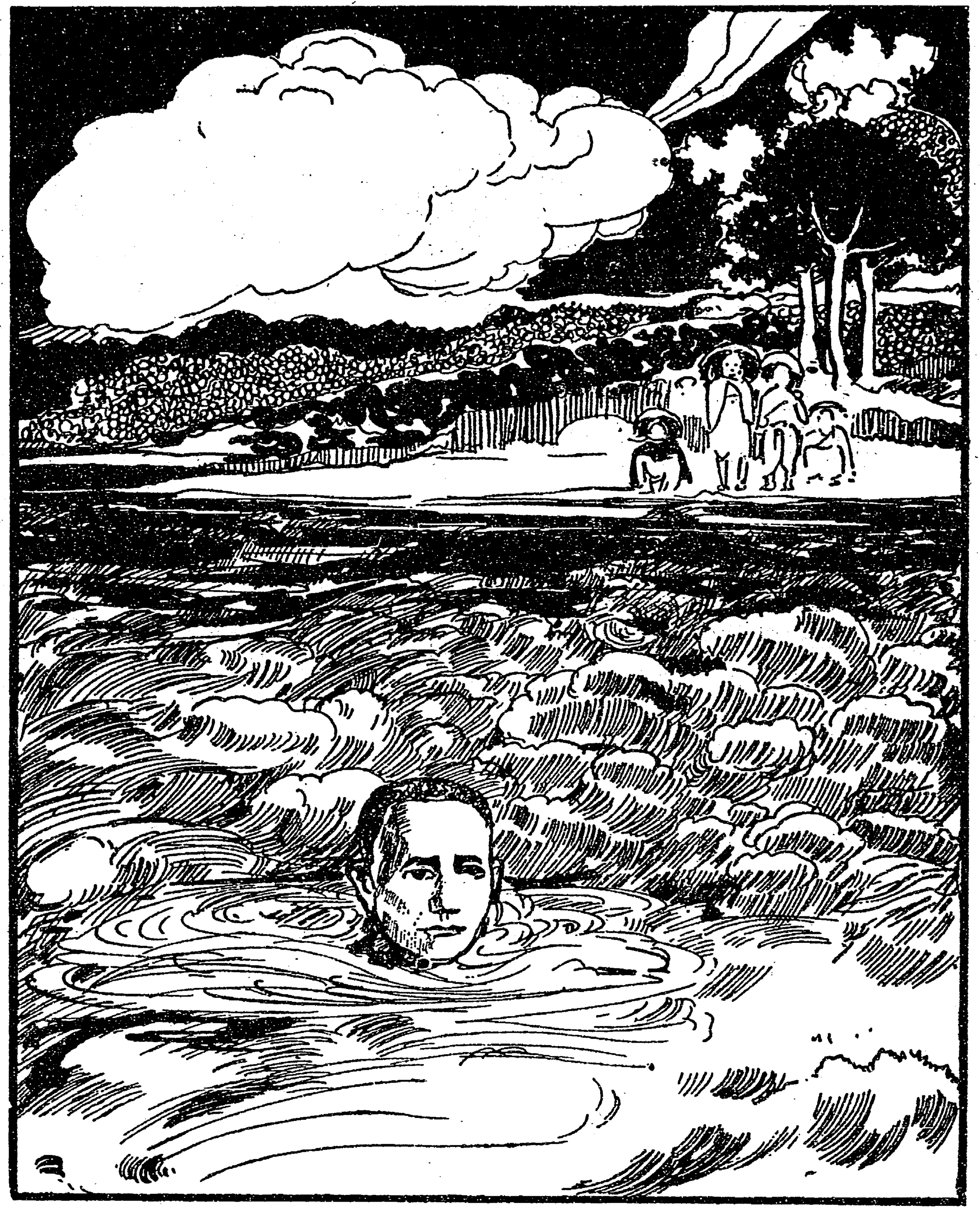

মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর

মায়ের আদেশ পালন করবার জন্য বিদ্যাসাগর মশাই সাঁতার কেটে দামোদরের ঢল পার হচ্ছেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৫০ { ৩য় সংখ্যা

নীল নৌকার মাঝি

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শোনো শোনো নীল নৌকার মাঝি!
কুশিয়ারার ভরা গাঙে কোন্ গাঁয়ে যাও আজি?
মেঘ নেমেছে নীল গগনে
অঝোর ঝরণ কাজল বনে,
গুরু গুরু মাঠের কোণে
কি গান ওঠে বাজি!
কোন্ সুদূরের ডাক শুনেছ'
ওগো নবীন মাঝি!

সোনার ভোরে সোনার বালুচরে—
বাদল বাতাস ডাক দিয়ে যায়
বিজন তোমার ঘরে।
কোন্ হাওরের অকূল কূলে
মন উঠেছে তোমার দুলে
ঘর ভোলানোর রুদ্র গানে
আষাঢ় সাঁঝের ঝড়ে?
সাধ কি তোমার হয় না মাঝি,
ফিরতে সোনার চরে?

কে তোমারে ডাক্‌ছে নিরুদ্দেশে—
আষাঢ়ের এই নীল সন্ধ্যায়
নীল পদ্মের দেশে?
পিছন পারের গাঁয়ের কোলে
সাঁঝের প্রদীপ আজ না দোলে,
উতল ঢেউয়ের কলরোলে
নৌকা চলে ভেসে;
পোহাবে কি রাত্রি তোমার
নীল পদ্মের দেশে?

ঘাটের পরে ঘাট হবে আজ পার,
আস্‌বে নেমে বৃষ্টি-মধুর সজল অন্ধকার।
নিঝুম রাতে উতল বায়ে
থম্‌বে কোথা অচিন্ গাঁয়ে,
জাগ্‌বে সাড়া ডাইনে বাঁয়ে—
নৌকা এলো কার?
আষাঢ়-সাঁঝে হবে তুমি
কতই না ঘাট পার।

হারানো জাহাজের সন্ধানে

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

যুদ্ধের সময় প্রায়ই জাহাজ ডুবির খবর শোনা যায়। সীমাহীন নীল সমুদ্রের বুক চিরিয়া জাহাজ ছুটিতেছে, হঠাৎ প্রচণ্ড একটা আওয়াজ শোনা গেল। শত্রুপক্ষের টর্পেডো আসিয়া জাহাজের গায়ে ঢুঁ মারিয়াছে; কিংবা হয়তো জলের মধ্যে "মাইন্" পাতা ছিল, তারই তারের সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া মাইন্ ফাটিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে জাহাজের খোলও ফাটাইয়াছে। একটু পরেই সমস্ত জাহাজখানি অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। জাহাজ ভর্ত্তি ছিল হয়তো কত রকম

মূল্যবান্ মালপত্র,—যুদ্ধের সময় পয়সা দিয়াও যা পাওয়ার উপায় নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় সব হারাইয়া গেল!

যুদ্ধের সময় ছাড়াও জাহাজ ডুবি নেহাৎ কম হয় না। সমুদ্রে চলিতে চলিতে ঝড়ে পড়িয়া, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া, অন্য জাহাজের সঙ্গে 'কলিশন্' অর্থাৎ সংঘর্ষ লাগিয়া বা জাহাজের ভিতরকার কলকজ্জা বিগড়াইয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া, কত ভাবে জাহাজ ডুবিয়া যায়! সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ—কেটি কোটি টাকার মালপত্রও খোয়া যায়; মানুষের জীবন তো যায়ই।

মানুষের জীবন গেলে অবশ্য তা আর ফিরিয়া পাইবার কোন উপায় নাই। 'অচেতন' অথচ মূল্যবান্ জিনিষের মধ্যে এমন অনেক আছে যা জলে ডুবিলে একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন জিনিষেরও অভাব নাই যা জল হইতে তুলিতে পারিলে গুপ্ত ধন উদ্ধারের মতই মানুষের কপাল ফিরিয়া যাইতে পারে। বড় বড় ব্যাঙ্কে মূল্যবান্ জিনিষ পত্র রাখিবার জন্য যেমন বিশেষ ভাবে তৈরী ইস্পাতের ঘর থাকে—ইংরাজীতে যাকে বলে

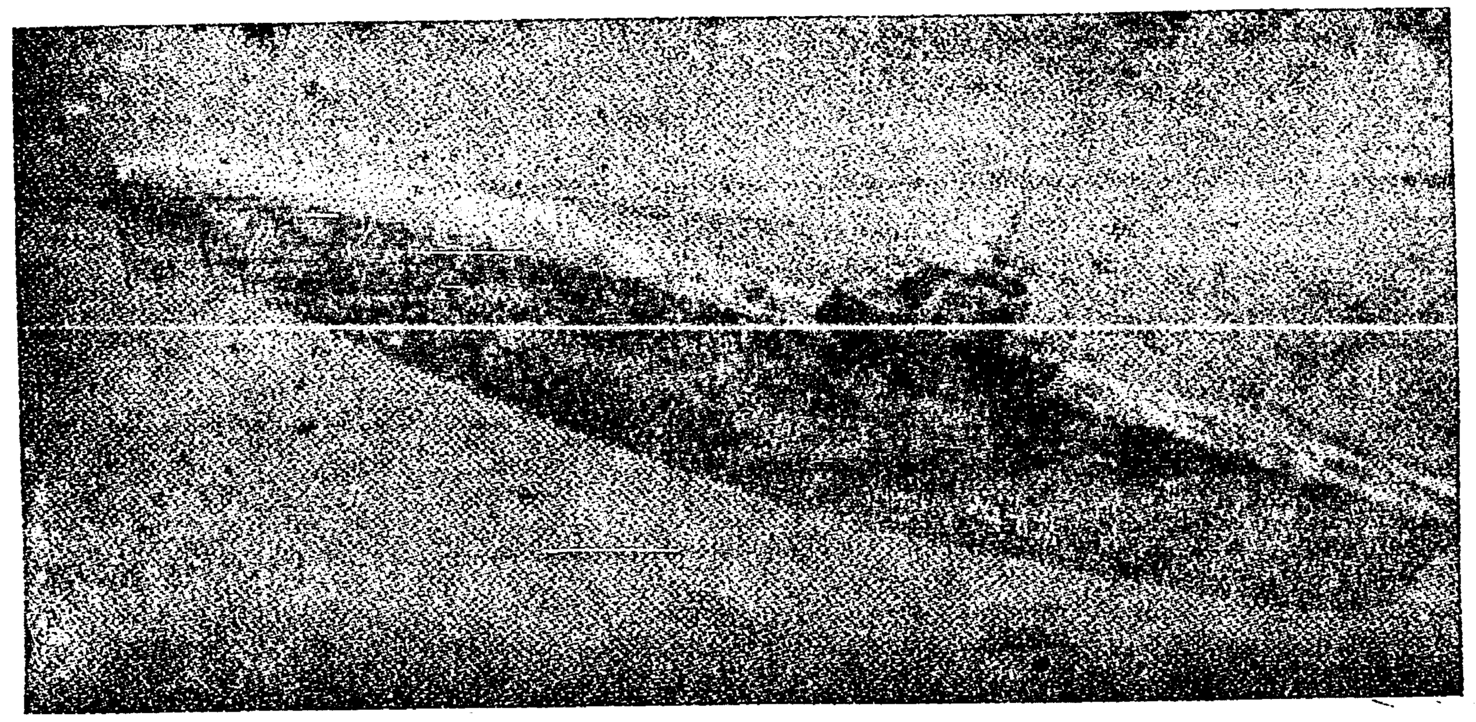

জলের তলায় সাবমেরিন্ বা ডুবো-জাহাজ;—টর্পেডো ছুঁড়িয়া শত্রু-জাহাজ ঘায়েল করিতে ইহারা খুবই পটু।

"ষ্ট্রং-রুম্", অনেক জাহাজেও সেই রকম থাকে। সমুদ্রের তলায় নামিয়া এই "ষ্ট্রং-রুম্" গালাইতে পারিলে লক্ষ লক্ষ টাকার আসবাব পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। আর যদি গোটা জাহাজকে জাহাজই তোলার ব্যবস্থা করা যায় তবে তো কথাই নাই, সেই ভাঙ্গা তোবড়ানো জাহাজ মেরামত করিয়া কাজে লাগানও হয়তো কষ্টকর হইবে না। একটা জাহাজের দাম তো বড় কম নয়!

কথাটা তো শুনিতে বেশ কিন্তু কাজে করা বড় সহজ নয়। গভীর সমুদ্রে শত শত ফুট জলের নীচে কোথায় কোন্ জাহাজ পড়িয়া আছে, সেখানে নামিয়া তাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার; সেখানে বসিয়া তার ভিতরকার হারানো মালপত্র উদ্ধার করা তো পরের কথা। কিন্তু দুঃসাধ্য হইলেও মানুষ সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নয়, সমুদ্রে ডোবা জাহাজ উদ্ধারের চেষ্টা করিতে সে কসুর করে না এবং অনেক সময় কাজ হাসিলও করে। ইয়োরোপ আমেরিকায় এই ধরণের কাজ করিবার জন্য বড় বড় কোম্পানী আছে। তাদের কাজই হইতেছে জাহাজে করিয়া

সমুদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডোবা জাহাজের সন্ধান করা এবং সন্ধান পাইলে তার ভিতরকার মালপত্র উদ্ধার করা। এই সব জাহাজে থাকে শিক্ষিত কর্ম্মচারীর দল, আর দরকার মত ছোটবড় নানা রকম সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এই কাজকে ইংরাজীতে বলে 'স্যাল্‌ভেজ্'।

'স্যাল্‌ভেজের' জন্য প্রথমেই দরকার শিক্ষিত ডুবুরীর। সিংহল প্রভৃতি অঞ্চলে মুক্তা সংগ্রহের ব্যাপারে বহু দেশী ডুবুরী কাজ করে সে কথা তোমরা রামধনুতেই পড়িয়াছ। নিতান্ত সাধাসিধা পোষাকে, নাকে একটা কাঠের বা শিংএর তৈরী গুঁজি ভরিয়া, আর আত্মরক্ষার জন্য কোমরে একটা ছোরা লইয়া, কেমন অবলীলাক্রমে তারা দড়ি ধরিয়া সমুদ্রে নামিয়া যায়! দড়ির এক দিকে বাঁধা থাকে একখানা ভারী পাথর, অপর দিক্ থাকে জলের উপর নৌকায়। ডুবুরীর সঙ্গীরা নৌকায় দড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকে, আর ২।১ মিনিট পর পরই ডুবুরীকে টানিয়া তোলে। ডুবুরী ঐ সময়-টুকুর মধ্যে ঝিনুক কুড়াইয়া ঝুড়ি ভর্ত্তি করিয়া উঠিয়া আসে। যতক্ষণ জলের নীচে থাকে—নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখে। স্যাল্‌ভেজের জন্য কিন্তু এই ধরণের ডুবুরী দিয়া কোনও কাজ হয় না। সমুদ্রের তলায় তিনশ' ফুট, চারশ' ফুট বা আরও নীচে নামিয়া যাইতে হইবে, কতক্ষণ থাকিতে হইবে তার

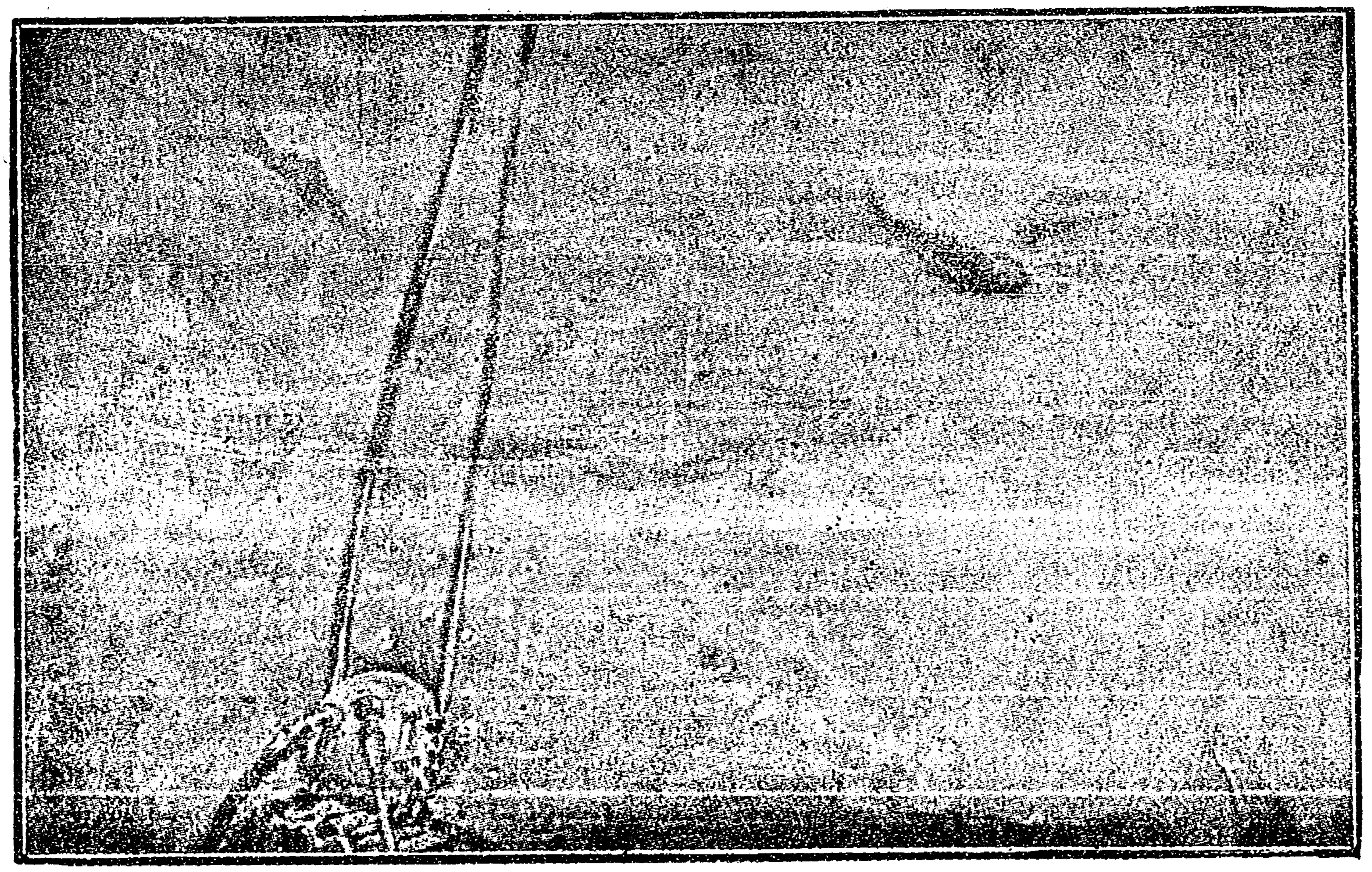

আধুনিক পোষাকে সজ্জিত ডুবুরী সমুদ্রে নামিতেছে।

ঠিক নাই। কত রকম বিপদ্-আপদের ভয় আছে; রাক্ষুসে অক্টোপাস্, মানুষ-খেকো হাঙ্গর, আরও কত দুরন্ত জলজীবের উৎপাত আছে। তা ছাড়া আছে মাথার উপর জলের প্রচণ্ড চাপ। হিসাব

করিয়া দেখা গিয়াছে ৪০০ ফুট্ নীচে নামিলে এই চাপ দাঁড়ায় কম করিয়া ৪২০০ মণ। এই চাপ সহ্য করিবার উপায় রাখা চাই।

আধুনিক ডুবুরীদের পোষাকেই এই সব ব্যবস্থা রাখিতে হয়। পোষাক বলিলাম বটে কিন্তু সেটিকে পোষাক না বলিয়া একটি ছোটখাট "ষ্ট্রং-রুম্" বা 'পোষাক-দুর্গ' বলা চলিতে পারে। যুদ্ধে যেমন বর্ম্ম-ঘেরা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয় এও প্রায় সেই জাতীয় পদার্থ।

সমস্ত পোষাক-দুর্গটি আগাগোড়া মজবুত ইস্পাতে তৈরী, আকৃতিটা দেখিতে যদিও অনেকটা মানুষেরই মত। অর্থাৎ ডুবুরী ভিতরে ঢুকিলে মনে হয় যেন কিম্ভূতকিমাকার চেহারার একটা বিরাট্ ইস্পাতের মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। তার হাত ইস্পাতের খোলে ভরা, পা ইস্পাতের খোলে ভরা, পায়ের বুট দু'টি খুব ভারী ইস্পাতে তৈরী, মাথাটাও এক বিরাট্ ইস্পাতের ঢাকনীতে ঘেরা। শুধু তার মাঝখানে ছোট গোল একটা কাচের পাত—তার ভিতর দিয়া ডুবুরীর চোখ দু'টি দেখা যাইতেছে। ঐ কাচের পাতটুকুও আবার লোহার জালি দিয়া ঢাকিয়া নিরাপদ্ করা হইয়াছে। সমস্ত পোষাক এমন ভাবে তৈরী যে তার ভিতর দিয়া একফোঁটা জল বা বাতাস ভিতরে ঢুকিবার উপায় নাই। দুই হাতে আঙ্গুলের জায়গায় রহিয়াছে দু'টি মজবুৎ সাঁড়াশী, ডান হাতে আবার একটা বৈদ্যুতিক টর্চ্ বসানো।

এই তো গেল বাহিরের চেহারা। 'পোষাকের' ভিতরের বর্ণনা শুনিলে আরও তাক্ লাগিয়া যাইবে। এত খুঁটিনাটি ব্যবস্থা তার মধ্যে করা আছে,—বিশেষ করিয়া মাথার ঢাকনী বা হেলমেট্-টিতে। ডুবুরীকে জলের তলায় কতক্ষণ থাকিতে হইবে তার ঠিক নাই, সে জন্য নিঃশ্বাস লইবার সমস্ত সরঞ্জাম তার পোষাকের মধ্যেই রাখিতে হয়। যে বাক্সের মধ্যে এই বাতাস ভরা থাকে, সেটা সাধারণতঃ থাকে ডুবুরীর পিঠের দিকে। একই বাতাস যাহাতে বার বার বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া ব্যবহার করা যায় তারও বন্দোবস্ত থাকে; সেই সঙ্গে বিপদ-আপদের সময় অতিরিক্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থাও রাখা হয়। জলের তলায় বসিয়া জলের উপরের লোকেদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য 'মাইক্রোফোন্' এবং তাদের কথা শুনিবার জন্য 'ইয়ারফোন্'ও এই পোষাকের মধ্যেই আঁটা থাকে। জলের তলায় নিজের ওজন বাড়াইয়া কমাইয়া ইচ্ছামত ওঠা-নামা বা ঘোরাফেরা করার ব্যবস্থাও থাকে। কাজ করার সুবিধার জন্য উপর হইতে একটা তীব্র বৈদ্যুতিক আলো জলের নীচে ডুবুরীর সামনে নামাইয়া দেওয়া হয়।

আগেই বলিয়াছি ডুবুরীকে অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ ব্যাপিয়া জলের নীচে থাকিতে হয়। ডোবা জাহাজের 'ষ্ট্রং-রুম্' ভাঙ্গিয়া ভিতরের জিনিষ উদ্ধারের সময় বা ঐ ধরণের কঠিন কঠিন কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও শিখিতে হয়। জাহাজকে জাহাজে তুলিয়া ফেলিতে হইলে অনেক সময় জলের

ভিতর বসিয়া বসিয়া সুদৃঢ় দেয়াল গাঁথিতে হয়। ঐ দেয়ালের বাঁধে জাহাজকে ঘিরিয়া তার পর ভিতরকার জল পাম্প করিয়া লইলেই জাহাজ ভাসিয়া উঠে। গত রুষ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানীরা এই ভাবে নাকি পোর্ট্ আর্থার্ হইতে বহু জাহাজ তুলিয়া সেগুলি মেরামত করিয়া কাজে লাগাইয়াছিল। গত বারের মহাযুদ্ধে ডোবা অনেক জাহাজও নাকি এ ভাবে উদ্ধার করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য এই সব কাজে যারা যায় তাদের খুব ভালু স্বাস্থ্য হওয়া দরকার। অতক্ষণ জলের নীচে বসিয়া কতকটা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ায় শরীরের মধ্যে ঝক্কি তো বড় কম পড়ে না! এমন কি, একবার গভীর সমুদ্রে নামিলে পর উঠিবার সময় একটু একটু করিয়া জিরাইয়া জিরাইয়া না উঠিয়া একবারেই জলের উপর উঠিয়া আসিলে চাপের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে ডুবুরী মারা পর্য্যন্ত যাইতে পারে। এই জন্য যে ডুবুরীর ২।৩শ’ ফুট নামিতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগিয়াছিল, উঠিবার সময় একটু একটু করিয়া সহিয়া সহিয়া, চাপের সামঞ্জস্য আনিয়া, উপরে উঠিতে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিতে হয়। বলা বাহুল্য অত ভারী ‘শরীর খানি’ লইয়া ডুবুরীর নিজের পক্ষে অতটা উপরে ওঠা সম্ভব নয়; জাহাজে মাল তোলার সময় যেমন ক্রেনের সাহায্য নেওয়া হয় তার বেলাও তেমনি ক্রেনেরই শরণ লইতে হয়।

এখন, যুদ্ধের সময়, এই সব জাহাজ-খোঁজা কোম্পানীর কাজ অবশ্য মোটেই নিরাপদ্ নয়; এবং হয়তো অনেককে বন্ধই রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ আর কিছু চিরকাল চলিবে না। যুদ্ধের পরেই এই সব কোম্পানীর কাজ দরুণ রকম বাড়িয়া যাইবে। এখন যে সব ব্যবসাদারেরা যুদ্ধের কল্যাণে বেশ দু’পয়সা কামাইয়া ‘লাল’ হইয়া যাইতেছেন, তখন তাঁদের অনেকেরই হয়তো ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিবে, তখন ‘লাল’ হইবার পালা এই সব কোম্পানীর।

বুদ্ধির্যস্য

শ্রীসুবোধ বসু

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

পল্টু: নীচের জিমনাসিয়ামে এই রাত দুপুরে আমি একা একা দু’ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে পারি—এ জন্যই বাজি, কেমন? আবার ভুলে না যাই।

মণ্টু: আর মনে রাখিস, বুড়ো আঙুলের কাঁচকলা উড়িয়ে বলতে হবে,—‘সারা হোষ্টেলের আর কোনও ছেলের—তা যেই যতই ডন-কুস্তি করুক না—এ মুরোদ নেই; ভয়ে দাঁত কপাটি লেগে যাবে।’ বেশ বুক ফুলিয়ে বলবি। বার বার বুড়ো আঙুলটা উঁচু করে দেখাবি।

হাবুল: [ছবিকে] ব্যস্, ব্যস, ঠিক হয়েছে। মুখখানা কি অপূর্ব্ব বিদঘুটে দেখাচ্চে! সাবাস, ছবি। রঙের বাটিটাটিগুলি এবার চটপট লুকিয়ে ফেল। [ভোম্বলের গা ঠেলিয়া] ভোম্বল, ভাই ভোম্বল, শুনচো ভাই ভোম্বল…

ভোম্বল: উঃ, আঃ, হুঃ। [হাবুল তবু ঠেলিতে লাগিল] কে, কি চাস্? ধ্যেৎ। এঃ—

হাবুল: ভাই ভোম্বল, জিমনাসিয়ামের চাবিটা একটু দিবি ভাই?

ভোম্বল: [চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া] কেন? ক’টা বাজ্‌ল। ভোর হচ্চে নাকি? তাই তো, তাই তো, উঠতে তো বড় দেরি হয়ে গেল……[তার মুখ রঙ প্রলেপের ফলে বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া হাসি চাপা দায়।]

হাবুল: তা নয় ভাই। এখন রাত দুপুর। ব্যায়ামের সময় এখনও হয় নি। আমরা বাজি ধরেছি। ঘুমিয়ে ওঠায় তোর মুখ বড় সুন্দর দেখাচ্চে, ভোম্বল; যাক্, কথা হলো, পল্টু বড় বড়াই আরম্ভ করেছে। সারা সন্ধ্যা ধরে বড়াই করছে—ভূতকে ও নাকি একটুও ভয় করে না। এমন কি, রাত দুপুরে জিমনাসিয়ামে অন্ধকারের মধ্যে একা একা দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে পারে। একবার বড়াইটা দেখলি? এ পারবে কিনা পল্টু! দারোয়ানজীই পারুক দেখি!

পল্টু: পারি না মানে? আলবৎ পারি। দশটাকা বাজি ধরলুম না। খুলে দে জিমনাসিয়াম্। এক্ষুনি যাই কিনা দেখ। তোদের মত কাপুরুষ কিনা। গায়ে হাতীর মতো জোর থাকলেই তো বীর হওয়া যায় না, বুকে সাহস থাকা চাই। সারা হোষ্টেলে সে-সাহস এক আমার আছে। [বুড়ো আঙুল উঁচাইয়া] যে যতই ডন-কুস্তি করুক না কেন, এ মুরোদ আর কারুর নেই।

ভোম্বল: [ধমকাইয়া] থাম বলচি, পল্টে।

পল্টু: থামব মানে? মিছে কথা বলছি যে থামব? বুড়ো আঙ্গুল উঁচু করিয়া] আর কারুর মুরোদ থাকে তো এগিয়ে আসুক না?

ভোম্বল: (সগর্জ্জনে) আলবৎ আসব। আমিই আসব। দু’ঘণ্টা তো দু’ঘণ্টা। ফাঁসির ঘরে সারা রাত কাটিয়ে আসতে পারি। মুরোদ আমার নেই, মুরোদ আছে ওর! থাবড়া মারতে ইচ্ছে হয়।

পল্টু: মুখে তো কত লোকই রাজা-উজীর মারে। কথায় বলে, মুখেন মারিতং জগৎ। কাজে দেখাবার সাহস আছে?

ভোম্বল: [লাফাইয়া উঠিয়া] আছে না, মানে? তোর মত কাপুরুষ নাকি আমি? ঘড়িতে দেখ ক’টা বেজেছে। [বিছানার তলা হইতে চাবি লইয়া] এই চাবি নিয়ে চললুম। দু’ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টা কাটিয়ে আসব। শোবার জন্য মাত্র একটা কম্বল নিয়ে যাব, হাতে আর তৃণ-খণ্ডটি নেব না। [কম্বল কাঁধে উঠাইল]

ছবি: কিন্তু জিমনাসিয়ামেই যাবে যে, তার প্রমাণ কি? যদি নীচে গিয়ে অন্য কোথাও শুয়ে থাক।

ভোম্বল: [ভেংচাইয়া] অন্য কোথাও শুয়ে থাক! এক গাঁট্টা মারব। আয় না সবাই তোরা, এসে দেখে যা, কেথায় ঢুকি। মুরোদ নেই! যত মুরোদ পল্টের!

হাবুল: তাই চল, ভাই! তাই চল। ভোম্বলকে নীচে রেখে আসি।—দেখো, ভাই ভোম্বল, শেষে যেন আবার ভয়টয় পেয়ো না। অনেক সাহসী লোকও স্থান কাল ভেদে…

ভোম্বল: নিজের চরকায় তেল দে হাব্‌লে। বেশী বাজে বকিস না। দু'ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টা কাটিয়ে আসি কিনা দেখিস।

প্রস্থান। পিছনে ইঙ্গিতগর্ভ হাসিয়া অন্যান্যদেরও প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জিমনাসিয়ামের অভ্যন্তর। ভোম্বল অস্থির ভাবে হাঁটিতেছে। দু'একবার বন্ধ দরজায় কিল মারিয়া, হতাশভাবে ফিরিয়া আসিতেছে এবং কথনো কথনোও একটু ভীতত্রস্ত দৃষ্টিতে জিমনাসিয়ামের অন্ধকার অংশের দিকে দৃষ্টি দিতেছে। একটি ক্ষীণ মোমবাতি ঘরের এককোণায় টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ভোম্বল: শয়তান, শয়তান, হাড় শয়তান। বেহেড লক্ষ্মীছাড়া। পা-ঝাড়া পাজি। একবার কাণ্ডখানা দেখলে? এই ফাঁসির ঘরে আমাকে সারা রাতের জন্য আটকে রাখা! কী সর্ব্বনাশ! কোন্ ফাঁকে তালা চাবি গাপ করে ফেলে দরজা ভেজিয়ে দেওয়ার নাম ক'রে বাইরে থেকে তালা বন্ধ! এখন আমি করি কি! [সভয়ে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া) ভূত ফুত মানি না। কিন্তু না মানলেও সারা রাত এই রকম একটা বিশ্রী স্মৃতি-ওয়ালা ঘরে… অন্ততঃ, মশাটা তো আর মিথ্যে নয়। এ আর কিছু নয়, ষড়যন্ত্র—কুটিল ষড়যন্ত্র। ঐ বদ্‌মাস ছেলেগুলো আমাকে জব্দ করবার জন্য ফাঁদ পেতে আমাকে তার মধ্যে ঠেলে দিয়েচে। একবার ছাড়া পাই না, তোদের হাড় গুঁড়িয়ে দাঁতের মাজন বানাব। ঠ্যাং ধরে এই শানের উপর কাপড়-কাচা করব। পেটে গাঁট্টা মেরে নাড়িভুঁড়ি বের ক'রে ছাড়ব। (সহসা একটা সানুনাসিক শব্দ শোনা গেল) ও কি? ও কি রকম শব্দ! নাকি শব্দ কেন? কি সর্ব্বনাশ! নাকি শব্দটা তো ভাল লক্ষণ নয়! (সভয়ে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দরজার কাছে আগাইয়া গেল ও দরজায় আঘাত করিল) খোল বলছি, খোল, শীগ্‌গির খোল। ভাল চাস্ যদি এখনও খুলে দে। এখন খুল্লে কিছুটি বলব না; এই শেষ সুযোগ, শুনছি, লক্ষীছাড়ারা, এই শেষ সুযোগ। (আবার নাকি শব্দ) ঘরের অন্ধকার দিক্‌টা থেকেই আসছে মনে হচ্ছে না? (ভয়ে ভয়ে) ও কিছু নয়, বেরাল টেরাল হবে। অতুল অবশ্যি ওদিক্‌টায়ই লট্‌কেছিল। কিন্তু আমি ভয় পাই না; কিছুতেই ভয় পাই না। (মোমবাতিটা

দপ্‌দপ্ করিয়া উঠিল) কি সর্ব্বনাশ, এটাও নিবে যাবে নাকি? তা হলে যে একদম অন্ধকার হয়ে যাবে! ঐ যাঃ, গেল তো! (ছুটিয়া মোমবাত্তির কাছে গেল। মোমবাতি নিবিয়া গেল; ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার হইল।) একে বাইরে থেকে দরজায় তালা বন্ধ, তারপর এই রকম বিষম অন্ধকার! মহা বিপদে পড়েছি যে! ও হতভাগারা, ও লক্ষ্মীছাড়ারা, অলপেপেয়েরা (সহসা কতগুলি নাকি সুরের অট্টহাস্য শোনা গেল] এর মানে কি? ঘরের মধ্যে শব্দ আসে কোথা থেকে? এ সব লক্ষণ তো খুব সুবিধের নয়। [সভয়ে চাহিয়া] অন্ধকারে ওটা কি? অ্যাঃ! না না, চোখের ভুল! ভূতফুত কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু নেই। শব্দফব্দগুলি সব ঐ বজ্জাত ছেলেগুলির দুষ্টুমি! এর মজাটা টের পাওয়াব না; হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াব। [অন্ধকারের মধ্যে দুইটা আগুনের চক্র আতসবাজির মত জ্বলিয়া উঠিল] ওরে সর্ব্বনাশ, এ আবার কি! এ যে পষ্ট গোলগোল দুটো চোখের মত! ওরে বাবা রে! যাই কেথায়? মলাম, মলাম। [দরজার দিকে ছুটিয়া গিয়া দরজার উপর জোর জোর আঘাত) খোল, খোল, খোল। ঘাট হয়েচে, একশোবার ঘাট হয়েছে। ক্ষমা চাইচি। ওরে হাব্‌লু, ওরে মণ্টু, ওরে কানু, ওরে…

দরজা খুলিবার শব্দ। দরজা খুলিয়া একহাতে টর্চ্চ ও অন্য হাতে লাঠি বাগাইয়া ড্রিল সারের প্রবেশ।

(ক্রমশঃ)

আমার গেরিলাদলে যোগদানের কাহিনী

(লাল ফৌজের বিখ্যাত বীর ওমেল্‌চেঙ্কোর আত্মকথা অবলম্বনে)

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

অগষ্ট্ মাসের একদিন শত্রু-এলাকায় সামরিক পর্য্যবেক্ষণ করবার সময় হঠাৎ আমি ধরা পড়ি। জার্মানরা আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে আসে সদ্য অধিকৃত একটি গ্রামে।

অফিসার আমায় পোষাক খুলে ফেল্‌বার হুকুম করলে। আমি অস্বীকার করায় সব ক'টা জার্মান আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথারি কিল, চড়, ঘুষি চালাতে লাগ্‌লো, আর আমার জামা-পাজামা ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে দিল। পরনে রইল শুধু জাঙ্গিয়াটা।

যুদ্ধ তখন খুব কাছেই চল্‌ছিল। জার্মানরা সংখ্যায় খুব কম ছিল ব'লে ভয় পেয়েছিল। অফিসার আমায় পায়ে হেঁটে চলে যেতে হুকুম দিলে একটি প্রতিবেশী গ্রামে—সেখানে জার্মান বাহিনীর হেড্-কোয়ার্টাস্ ছিল।

"তোমার সঙ্গে আর কাউকে দিয়ে বাজে কাযে সময় নষ্ট করতে পারি না;"—অফিসার বল্লে আমাকে। "এই দিগম্বর বেশে তুমি পালাতে পারবে না; আর সে-চেষ্টা করলেই গুলি ক'রে মারা হবে। এখন ভালমানুষের মতন সোজা চলে যাও হেড-কোয়ার্টার্সে, সেখানে আটক্ থাক্‌বে। তোমার বরাত ভাল যে কুকুরের মতন খুন করি নি। যাও!"

বিনা বাক্যব্যয়ে আমি রাস্তা ধরে চল্‌তে শুরু করলুম। চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাঙ্ক্ বাহিনী দ্রুতবেগে দানবের মতন আমার দিকে ছুটে আস্‌ছিল্ ধূলোর রাশি উড়িয়ে আর পথ-প্রান্তর কাঁপিয়ে। সেই ধূলোর পিঙ্গল আস্তরণ আমায় শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে দিলে। এ সুযোগ আমি ছাড়লুম না। একটা পরিখায় লাফিয়ে পড়ে' হামাগুড়ি দিয়ে তার অন্য ধারে উঠে পড়লুম আর একটা প্রচণ্ড ঝট্‌কায় পাশের ক্ষেতের মধ্যে নিজেকে ছুঁড়ে দিলুম। তারপর ধূলোর স্তর পাৎলা হয়ে মিলিয়ে আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বুকে হেঁটে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেলুম।

খানিক পরে বেশ ঘন একটা ঝোপে এসে পৌছে, কান খাড়া রেখে চারিদিক্ অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলুম। সন্ধ্যের পর থেকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়লো। না কাঁপবার জন্যে আমি চেষ্টা করতে লাগ্‌লুম, কিন্তু সেই প্রচণ্ড শীতে আমার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি অরম্ভ হয়ে গেল। সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর ঝোপে-জঙ্গলে হামগুড়ি দিয়ে আর খোলা জায়গায় বুকে ভর ক'রে সীমান্তের দিকে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলুম।

কিছুদূর এসে দেখি সামনের আকাশ আর মাঠ রাঙা হ'য়ে উঠেছে বিরাট আগুনের ঝলকে: একখানা সমগ্র গ্রাম হু-হু ক'রে জ্বল্‌ছিল। সেই আলো থেকে আমায় আড়ালে সরে যেতে হ'ল। সারারাত ধরে হিম ঠাণ্ডায় খোলা গায়ে আর অনাহারে চল্‌বার পর ভোরবেলা একটা বনের মধ্যে একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে গেলুম; আমার আর নড়বার ক্ষমতা রইল না।

কতক্ষণ পরে জানি না, ক্ষিদের জ্বালায় আমার জ্ঞান ফিরে এল। বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে যা' ষ্ট্রবেরী জোগাড় হ'ল, তাতে সে জ্বালার উপশম হ'ল না। যাই হোক, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার চল্‌তে শুরু করলুম—কিন্তু সন্ধ্যের কিছু আগে বুঝ্‌তে পারলুম আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আর কামানের গর্জ্জন বা যুদ্ধের কোনরকম আওয়াজ শোনা যায় না। মরিয়া হ'য়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করলুম; মুখ, বুক আর সর্ব্বাঙ্গ আমার বন-কাঁটায় চিরে যেতে লাগ্‌লো।

খানিকক্ষণ পরে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। ক্ষতবিক্ষত পা আর আমায় বয়ে নিয়ে যেতে পারলে না। শেওলার স্তূপ আর রাশীকৃত পাতা চাপা দিয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়লুম। এই ভাবে আমার দ্বিতীয় দিন কেটে গেল।

তৃতীয় দিন সকালে জেগে ওঠ্‌বার পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অসাড় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়াতেও পারলুম না। তারপর প্রায় বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কখনো টল্‌তে টল্‌তে হামা দিয়ে, কখনো পেটে আর হাতে ভর ক'রে—বিচারবুদ্ধির চেয়ে যেন শুধু সহজ জ্ঞানের ঝোঁকে—অবশ শরীরটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলুম। এমনি ক'রে পাঁচদিন কাট্‌লো।

তারপরের দিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে এক বৃদ্ধ কৃষককে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখ্‌লুম।

সে সাহানুভূতির সুরে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কোথা থেকে এসেছ, আর তোমার জামা জুতো এ সবই বা নেই কেন?"

আমি তাকে জানালুম যে জার্মানদের হাতে প্রথমে ধরা পড়ে তারপর পালিয়ে আস্‌ছি।

দুঃখিত ভাবে সে মাথা নাড়লে। তারপর বল্‌লে, "তোমার রক্তের দাগ ধ'রে ধ'রে এসে, এইখানে তোমায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকতে দেখলুম।"

"আমায় আমাদের সৈন্যদের কাছে পৌছে দিতে পারো?" তাকে জিজ্ঞেস করলুম।

"তোমার তো বেশীদূরে যাবার মতন অবস্থা নয়। না—বুকে হেঁটে যেতে চাইলেও তা পারবে না। জার্মানরা আমাদের গাঁ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।"

বোধ হয় সেই আগুনই আমি ক'দিন আগে দেখেছিলুম।

"আমরা তাদের ওপর এর প্রতিশোধ নিতে চাই; আমাদের ঘর জ্বালাবার, আমাদের মেয়েদের অপমান করবার, জোয়ান ছেলেদের খুন করবার উপযুক্ত শাস্তি তাদের দিতে চাই—", কঠোর মুখে সে বলতে লাগ্‌লো। "আমরা ছ'জন আছি—দুজন বুড়ো, একটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে। আমাদের দরকার একজন কমাণ্ডারের, যে নির্দ্দেশ দেবে, শেখাবে লড়াইয়ের কায়দা। আমরা কলের কামান দাগ্‌তে চাই জার্মানদের ওপর, কিন্তু কেমন ক'রে তা' চালাতে হয় জানি না। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমাদের নেতা হও, শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্য আমাদের হাতিয়ার ধরতে শেখাও।"

প্রথমে আমি স্থির করলুম তাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকি এবং তাদের শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটু শক্তি-সঞ্চয় করে নি'। তারপর সৈন্যদলে ফিরে যেতে পারবো।

বনের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায় যেখানে গেরিলারা আত্মগোপন ক'রেছিল, সেখানে যখন বৃদ্ধের সঙ্গে গিয়ে পৌছলুম, দেখি তারা ছ'জন নয়—আটজন। পরের দিন আবার বেড়ে এগারো জন দাঁড়ালো।

দলের মেয়েটি আমার ক্ষতস্থানগুলি ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলে। রাত্রে পাশের একটি গ্রাম থেকে চাষীরা আমাদের দুধ আর ডিম দিয়ে যেত, আর দিনের বেলা আমি তাদের দলটিকে একটি সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল ছোট গেরিলা-বাহিনীতে পরিণত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করতুম।

কিছুদিন পর মহড়ার পালা শেষ ক'রে আমাদের আসল কাজ শুরু হ'ল। একটা নির্জন জায়গায় খালি গোলাঘরে তিনটে গুপ্তচর রাত কাটাচ্চে খবর পেয়ে তাদের চড়াও ক'রে সাবাড় করা গেল। এরাই আমাদের প্রথম শিকার। এর আগে আমাদের সম্বল ছিল, চাষীদের মাঠ থেকে কুড়িয়ে এনে দেওয়া তুটো মাত্র রাইফেল। এখন আমাদের আরো তিনটে রাইফেল্ আর গোটা-কতক হাতবোমাও জোগাড় হ'ল।

এক হপ্তা পরে একটা মেশিন্‌গান্ দখল করলুম আমরা। এর কিছুদিন পরে আমরা শত্রুর একখানা মোটর লরী আট্‌কে ফেলেছিলুম, পরে দেখা গেল লরীখানা বিস্ফোরকে ভরা। এই বিস্ফোরক দিয়ে আমরা তু'টো পোল উড়িয়ে দিয়ে ফাসিষ্ট্‌দের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পেরেছিলুম।

এদিকে প্রত্যহ আমি স্থির করতুম যে এই দল ছেড়ে 'ফ্রণ্ট' পেরিয়ে লাল ফৌজের সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু প্রত্যেক দিনই কোন-না কোন নতুন কায এসে পড়তো, নতুন নতুন আক্রমণ চালিয়ে যেতে হ'ত। আর নয়ত নতুন নতুন গেরিলা এসে দলে যোগ দিত, আর তাদের শেখাতে হ'ত খণ্ডযুদ্ধের নানা কৌশল। কখনো বা এমন বিশেষ জরুরী খবর পেতুম যাতে তৎক্ষণাৎ মন দিতে হ'ত।

সেপ্টেম্বরের শেষে বেশ বুঝতে পারলুম যে, সে দল আমি কখনোই ছাড়তে পারব না। সেই সময় আমরা এমন প্রয়োজনীয় একটি সংবাদ পেলুম যা' তখুনি লাল ফৌজের কর্তৃপক্ষকে পৌঁছে দেওয়া দরকার। আমার দলের একজনকে সে-ভার দিয়ে পাঠালুম—আর ঠিক তার চলে যাবার পরই আমার মনে পড়লো,—তাই তো, আমি নিজেই তো যেতে পারতুম!

তিন মাসের মধ্যে আমাদের দলটি ১২০ জন গেরিলার একটি শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হ'ল। সরকারী যুদ্ধ-বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হ'তে লাগ্‌লো—"কম্‌রেড্ ও-র নেতৃত্বে একটি গেরিলাদল" অমুক সেতু উড়িয়ে দিয়েছে······এতগুলো শত্রু-বিমান জ্বালিয়ে দিয়েছে······এতগুলো মোটরলরী হস্তগত করেছে······।

লাল ফৌজের হেড কোয়ার্টাসের সঙ্গে আমি পাকা যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিলুম। আমাদের কাযের মধ্যে দিয়ে জার্মানদের অনেক গুপ্ত ও অতি প্রয়োজনীয় দলিল আমরা হাতে আন্‌তে পেরেছিলুম, আর তা'র ফলে আমাদের দেশের লোকের বহু ক্ষতি বন্ধ করা গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত জার্মানরা আমার মাথার জন্য খুব চড়া দাম হাঁকলে। কিন্তু তা' নিয়ে আমাদের কেউই বিশেষ ব্যতিব্যস্ত বোধ করলে না।

তারপর একদিন ঘটনাচক্রে আমি লাল ফৌজের মধ্যে এসে পড়লুম। হেড্‌কোয়ার্টাস্ থেকে নির্দ্দেশ এল আমায় সেখানে গিয়ে দেখা করবার জন্যে।

সেখানে গিয়ে পৌঁছলে আমায় জেনারেলের ভূমধ্যস্থ ঘাঁটিতে নিয়ে গেল। জেনারেল উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। তারপর সরকারী কাযকর্ম্মের কথা শেষ হ'য়ে গেলে তিনি আমায় বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন: "যুদ্ধের আগে তুমি কি করতে?"

"নক্‌সা আঁক্‌তুম। আর স্থাপত্য বিত্তালয়ে ঢোক্‌বার জন্যে তৈরী হ'চ্ছিলুম।"

জেনারেল একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কথাটা খানিক ভেবে নিলেন।

"এবার আমি আমার বাহিনীতে ফিরে যেতে পারি?" জিজ্ঞেস করলুম আমি।

"কেন—আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও না? তুমি তো লাল ফৌজের একজন সৈনিক। অমি তোমাকে একটা লম্বা ছুটি দেব আর তারপর আমার সেনাদলে তোমায় নিযুক্ত ক'রে নেব।"

এ বিষয়ে মনস্থির করা কঠিন। তাঁর কথা সত্য যে, হাজার হোক অমি লাল ফৌজের সৈনিক। কিন্তু তবুও···

"কম্‌রেড জেনারেল", অমি শেষে তাঁকে বল্‌লুম, "আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না···আমার কায পড়ে রয়েছে ওখানে, আমাদের গেরিলাদের সঙ্গে।"

তিনি আমার হাত ধ'রে আর একবার ঝাঁকুনি দিলেন, তারপর আমারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

পাহাড়ের ভ্রমণ-কাহিনী

(গল্প)

শ্রীমানসী বসু, এম্. এ

শুনেছি আমার চেহারা ছোটবেলায় খুব প্রকাণ্ড ছিল; দিদি সামলাতে পারত না বলে রাগ ক'রে বলত 'পাহাড়' (দিদিগুলো ঐ রকমই হয়)। সেই থেকে আমার নাম পাহাড়ই হয়ে গেছে। বড় হয়ে দেহের চর্চ্চা করে নামটা প্রায় সার্থক করে তুলেছিলাম।

সেবার কিন্তু ম্যালেরিয়ায় টানা ছ'মাস ভুগে এ হেন চেহারারও হ'ল চিঁচিঁ অবস্থা। ডাক্তার বিধান দিলেন চেঞ্জে যাও।

কোথায় যাওয়া যায় এই নিয়ে ক'দিন জোর জল্পনা চলল। মধুপুর, গিরিডি, পুরী, দর্জ্জিলীং, ড্যালহৌসী, মুসৌরী—অনেক অনেক জায়গার নাম উঠল, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন পাঞ্জাবী দা' এসে হাজির। পাঞ্জাবী দা'রা চিরকাল পাঞ্জাবেই থাকেন, কেবল ব্যবসা উপলক্ষে এধার ওধার যাতা-

রাস্ত করেন। ওঁদের আচার ব্যবহার সবই পাঞ্জাবীদের মত, ভাঙা ভাঙা বাংলা বলেন কিন্তু উর্দ্দু বলেন চোস্ত।

পাঞ্জাবী দা' এসে সব ওলট্-পালট্ ক'রে দিলেন। ওঁর মামা বর্ম্মায় ব্যারিষ্টার। (তখনো বর্ম্মা ভারত থেকে আলাদা হয় নি) পাঞ্জাবী দা' সেখানে যাচ্ছেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সমুদ্রের হাওয়ায় আমার খুব উপকার হবে। মাকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করান গেল।

দাদা তখনো কলেজ থেকে ফেরেনি। দিদির ঘরে ঢুকে দেখলাম সে কেবল মাত্র কলেজ থেকে ফিরেছে এবং চেয়ারের উপর বসে তার দেড় বিঘৎ উঁচু হাইহিল জুতোর বোতাম খুলতে ব্যস্ত। মনের খুসীতে ওর লম্বা বিনুনীতে এক টান দিয়ে বল্লাম, 'পাঞ্জাবীদা'র সঙ্গে বর্ম্মায় চল্লাম, বুঝলি ?' দিদি পিছন ফিরে আমার মাথায় এক চাঁটি ধরিয়ে দিয়ে বললে, 'দাঁড়া, বাবাকে বলে এখুনি তোর যাওয়া বার করছি।' এই সেরেছে! বললাম, 'না না ভাই, রাগ করিস না, তোর ফ্রেণ্ড্সদের চিঠি রাখবার জন্য বর্ম্মা থেকে খুব ভাল চন্দন কাঠের বাক্স আনব।' দিদি একটু খুসী হ'ল বললে, 'শুধু বাক্স নয়, খোঁপায় পরবার কাগজের ফুলও আন্‌বি।'

বর্ম্মায় আসা গেল। মামা যে শুধু বড় ব্যারিষ্টার তা নয়, বড় সাহেবও বটেন। প্রথম দিন বাঁ হাতে চামচ আর ডান হাতে কাঁটা নিয়েছিলাম, মামার ছোট মেয়ে লুসীর হাসি দেখে তাড়াতাড়ি চামচটা ফেলে ছুরী নিতেই সে হি-হি করে হেসে উঠ্‌ল, 'পাহাড় দা, হাত-পা কেটো না যেন।' পাঞ্জাবীদা'র কাছে ধমক খেয়ে তবে থামল। ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার, সাপার মুখস্ত করতে করতে হাঁপিয়ে উঠ্‌লাম। যাই হোক, সাত আট দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে শুতে গিয়ে দেখি পাঞ্জাবী দা' খুব মনোযোগ দিয়া একটা ম্যাপ দেখছে। আমায় দেখে কাছে ডেকে বললে, 'বোর্ণিও দ্বীপ দেখতে যাবি ?' আমি অবাক্ হয়ে বল্লুম, 'সে কি সেই 'ইষ্ট অব্ বোর্ণিও'র দেশে ?' পাঞ্জাবী দা' হেসে বললেন, 'শুধু ইষ্ট নয়, নর্থ, ওয়েষ্ট, সাউথ সব দেশটাই। চুপি চুপি যেতে হবে—কাকা মশাই না জানতে পারেন; তা হ'লে আমার উপর বড় বিরক্ত হবেন। মামার এক মক্কেল সেখানে থাকেন, তাঁর কাছে ব্যবসার খাতিরে আমি যাচ্ছি, যদি ইচ্ছা হয় তো তুইও যেতে পারিস্।"

অবশেষে একদিন সন্ধ্যা নাগাদ আমরা সত্যি সত্যি বোর্ণিও এসে পৌঁছলাম। আদর-যত্নের ক্রটী হ'ল না। ব্যারিষ্টার মামার মক্কেল মিঃ কাজিন্ অন্যত্র গেছেন। বাড়ীতে আছেন তাঁর ভাই, মেয়ে, চাকর ও রাঁধুনী। এঁরা সব বোর্ণিও দেশের লোক; তবে অনেক দিন সভ্যতার আলোক পেয়েছেন এবং ইউরোপেও অনেক বার গেছেন। বিশেষতঃ মামার মক্কেলের ভাই। ইনি হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটীর পি, এইচ্-ডি। যেমনি বিদ্বান্ আর তেমনি শিকারী। সমস্ত ক্ষণ নিজের পড়াশুনা নিয়ে আছেন এবং প্রত্যেক সপ্তাহে একবার ক'রে শিকারে বার হ'ন।

সকাল বেলা মিস্ কাজিন, আমি ও পাঞ্জবী দা' হৈ হৈ করে বেড়াতাম। দুপুর বেলা পাঞ্জাবী দা' নিজের কাজে বেরিয়ে যেতেন, আমরা ডাক্তার কাজিনের প্রজাপতির ঘরে ঘুরে বেড়াতাম। ডাক্তার কাজিনের একটা "হবি" ছিল প্রজাপতি সংগ্রহ করা। তাঁর কাঁচের আলমারী হাজারো রকমের ছোট বড় প্রজাপতিতে ভরা। এর কোন কোন প্রজাপতি প্রায় এক হাত চওড়া। এই প্রজাপতির জন্য তিনি অজস্র অর্থব্যয় করেন। সন্ধ্যার সময় মিস্ কাজিনের পিয়ানো বাজানো শুনতাম, আর রাত্রে খাওয়ার পরে সকলে মিলে জটলা পাকিয়ে গল্প করতাম। ৮।৯দিন বেশ কেটে গেল; কিন্তু দশ দিনের দিন সকালে রাঁধুনী মিসেস ডেভিড হাঁকাহাঁকি করে বলতে লাগল, 'সর্ব্বনাশ হয়েছে, সমুদ্রের ধারে গোয়ালাকে কে খুন করে রেখেছে!' আমরা সকলেই ছুটোছুটি করে বেরিয়ে গেলাম। সত্যিই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। দুধের বালতী পর্য্যন্ত গড়াগড়ি যাচ্ছে। কে বা কারা যেন ধারাল কোন অস্ত্রের দ্বারা গলার কাছে নিষ্ঠুর ভাবে বসিয়ে খুন করেছে। আমরা যখন এ বিষয় আলোচনা করতে ব্যস্ত, ডাক্তার কাজিন চিন্তিত মুখে তার ক্ষত মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরে পাঞ্জাবী দা'কে ডেকে সমুদ্রের ধারের বালির উপর স্পষ্ট পায়ের ছাপ পড়েছে দেখালেন। সমুদ্রের জলের কাছ অবধি পায়ের দাগ গেছে। আমরা অত্যন্ত ভারী মনে ফিরে এলাম। সেদিন কিছুই জম্‌ল না, পরের দিনও অস্বস্তিতে কেটে গেল। তৃতীয় দিনে আবার ভোর হতে না হতে মিসেস ডেভিড সকলকে সংবাদ দিল, গতকাল চাকরের ভাই এসেছিল। সম্ভব শেষ রাত্রে সে বাড়ী যাবে বলে সমুদ্রের ধার দিয়ে যচ্ছিল কিন্তু তাকে কে খুন করে রেখে গেছে,—গয়লা দুধ দিতে এসে এখুনি বলে গেল। ভয়ে মিসেস ডেভিড কাঁপছিল। আমরা আবার সকলেই ছুটে গেলাম সেই দৃশ্য দেখতে। কলকাতার ছেলে আমি, পর পর দুটো খুন দেখে একেবারে মুষড়ে গেলাম। সব সময় যেন একটা আতঙ্ক ভাব। সবাই যেন ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করছে। ডাক্তার কাজিনকে আর দেখতেই পওয়া যায় না—সব সময় নিজের ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বইএর স্তূপের ভিতর বসে আছেন। মিস্ কাজিনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম তিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণিতত্ত্বের বই পড়তে ব্যস্ত আছেন।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা, চারিদিক্ আলোয় ছেয়ে গেছে; কিন্তু আমাদের কারো মনেই সুখ নেই। খাওয়া সেরে যে যার ঘরে চলে গেলাম। ডাক্তারকে খাবার টেবিলে দেখতে পেলাম না, শুনলাম তিনি ছাদে আছেন।

পাঞ্জাবী দা' চিঠি লিখছিলেন। আমি একটু চুপ করে থেকে বল্লাম, 'আচ্ছা, ডাঃ কাজিনের কি হয়েছে বল দেখি ? অত বই খুলে কি দেখেন ? খুনীর নাম কি বইয়ে লেখা আছে ?' পাঞ্জাবী দা' গম্ভীর মুখে বললেন, 'মিস কাজিন বলছিলেন, ডাক্তারের বিশ্বাস এই হত্যা মানুষের দ্বারা হচ্ছে না, এমন কতকগুলি প্রমাণ উনি সংগ্রহ করেছেন যাতে মনে হয় কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের—'

দরজায় ঠুক ঠুক করে আওয়াজ হ'ল ও সঙ্গে সঙ্গে মিস্ কাজিন্ ঘরে ঢুকে প্রায় চুপি চুপি, কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন, 'কাকা বাড়ী নেই, মনে হয় সমুদ্রের ধারে গেছেন।' আমরা হু'জনেই চমকে উঠ্‌লাম। এই রাত্রে সমুদ্রের ধারে! মিস্ কাজিন্ বললেন, 'ক'দিন ধরেই তিনি অনেক রাত অবধি ছাদে থাকতেন, কোনদিন বা শেষ রাত্রে নামতেন; আজও তেমনি ছিলেন। এই সময়ে রোজ কফি খেতেন। কফির পেয়ালা নিয়ে ছাদে গিয়ে তাঁকে দেখতে পেলাম না। ঘরে আলো জলছে কিন্তু কাকা নেই। বাইরে যাবার দরজা ভেজান রয়েছে অথচ আমি নিজে দাঁড়িয়ে বন্ধ করিয়েছিলাম।'

আমরা সকলেই প্রথমে ডাক্তারের ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম টেবিল ল্যাম্প জলছে, ডাক্তারের নোটবুক খোলা রয়েছে—মনে হয় এইমাত্র কোন জিনিষ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পাঞ্জাবী দা' ঝুঁকে পড়ে নোটবুক থেকে চেঁচিয়ে পড়ে শোনালেন—

"টিরানোডন—বৃহৎকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের উড়ন্ত, সর্প জাতীয় জন্তু। ধারাল ছুরীর ন্যায় চঞ্চু এবং পঞ্চ অঙ্গুলিবিশিষ্ট মনুষ্যপদের ন্যায় পদযুগল। মাপ এবং গঠনও মনুষ্যপদাঙ্গুলির ন্যায়। অতিশয় হিংস্র স্বভাবের বলিয়া অনুমিত হয়। অগণিত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের বংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" আমরা বিমূঢ় ভাবে পরস্পরের দিকে একমুহূর্ত্ত চেয়ে দেখলাম। ভদ্রলোকের কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে? পাঞ্জাবী দা' আর বিলম্ব না ক'রে দেওয়ালে টাঙ্গান একটা বন্দুক টেনে নিয়ে বললেন, 'তোমরা দরজা বন্ধ করে দাও, কি জানি এতক্ষণে ডাক্তারের কি হ'ল!' তীরের বেগে পাঞ্জাবী দা' বেরিয়ে গেলেন। মিস কাজিন চুপি চুপি বললেন, 'এস পাহাড়, আমরাও যাই; ভয় থাকলেই পালাব কেন?' আমারও তখন ভয় ভাবনা কিছুই মনে ছিল না, হু'জনে তখনই ছোরা লাগান লাঠি ও হাণ্টার একটা যোগাড় ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে। দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ। একটু দূরে সমুদ্রের বালির স্তর ও পরে নীল সমুদ্র আকাশের সঙ্গে মিশে রয়েছে। আকাশের তারার প্রতিবিম্বগুলি পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপর পড়ে চিক্‌মিক্ করছে। আমরা একটা ছোট টিলার পাশে ডাক্তারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পাঞ্জাবী দা' বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ডাক্তার হস্তসঙ্কেতে চুপ করে থাকতে বলে নিজের পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

আমাদের থেকে ওঁরা প্রায় পনেরো হাত দূরে ছিলেন। ডাক্তারের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমি মিস্ কাজিনকে কিছু বলবার চেষ্টা করতেই তিনি আমার হাত ধরে সবলে টানতে টানতে ভীতস্বরে বললেন, 'পালিয়ে এস পাহাড়, ছুটে সামনের টিলার পাশে এস।' এক নিমিষে ছুটে টিলার পাশে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ধারে তাকিয়ে আমি পাথরের মত হয়ে গেলাম। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখলাম বিরাট বিপুল আকাশচুম্বী পাহাড়ের মত শরীর, প্রকাণ্ড হুটো পাখা চাঁদের আলোয়

ঝক ঝক করছে, তখনও ডানা থেকে জল ঝরছে। প্রকাণ্ড ছুরীর মত ঠোঁট,—বেয়নেটের মত ছুঁচালো। সমুদ্রের বালির উপর দিয়ে জন্তুটা মানুষের মতই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। একটু ঘুরলেই আমাদের টিলা হুটিই তার চোখে পড়বে। অবস্থা কল্পনা করে একটু নড়বার ক্ষমতাও আমাদের ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য ডাক্তারের সাহস, ধন্য তাঁর গবেষণা! তাঁর বন্দুক গুড়ুম গুড়ুম ক'রে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবী দা'ও তাঁর বন্দুক তুলে ছুঁড়লেন। টিরানোডন একবার উড়বার চেষ্টা করলে কিন্তু ডাক্তারের অব্যর্থ লক্ষ্য তার পাখা ভেদ করেছিল, হুই একবার পাখায় নাড়া দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সমুদ্রের ভিতর ডুবে গেল। সমুদ্রের জলে একটা আওয়াজ হ'ল। ব্যস্। খানিক বাদে ডাক্তার কাজিন্ ধীরে ধীরে বল্লেন, 'প্রকৃতি যে কত রহস্য আজও লুকিয়ে রেখেছেন মানবের তা ধারণার অতীত।'

* * * *

কলিকাতাগামী জাহাজে চড়ে পাঞ্জাবী দা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পাঞ্জাবী দা', টিরানোডন কি স্বপ্ন?' পাঞ্জাবী দা' মাথা নেড়ে বললেন, 'স্বপ্নই ত' বিংশ শতাব্দীর গাঁজাখুরি গল্প।' পাঞ্জাবী দা'র কঠোর সত্যে আহত হয়ে চুপ করে রইলাম।

২৯

অন্ধকারের মধ্য দিয়া একখানি নৌকা জল কাটিয়া তরতর করিয়া চলিয়াছে। ভিতরে হু'টি কিশোর—সুশান্ত ও বুনো। সুশান্তর দৃষ্টি এদিক্ ওদিক্ ফিরিতেছে। হঠাৎ সে আস্তে বুনোর হাতে একটু চাপ দিল। বুনো অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—"কি?" সুশান্ত ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—"ঐ দেখ!" দেখা গেল পূর্ব্ব নদীর তীরদেশ হইতে কয়েক শত গজ দূরে

বনের মধ্যে এক জায়গায় সামান্য আগুন জলিতেছে। কাহারা ওখানে? ডাকাতের দল নয় তো! নৌকা থামাইয়া কোমরবন্ধে রিভল্ভার আঁটিয়া সুশান্ত খড়্গ হস্তে ডাঙায় নামিল। চারিদিকে নিবিড় আগাছা ও জঙ্গল। হাতে তাহার উন্মুক্ত তরবারি, তবুও ভয়ে, সন্দেহে তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। খানিকটা গিয়া সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রায় কুড়ি হাত তফাতে একটা কালো মূর্ত্তি ছায়ার মত অন্ধকারের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। পরমুহূর্ত্তেই এক ভয়ঙ্কর গর্জ্জনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো পদার্থ তাহার সামনে লাফাইয়া পড়িল। সেই কালো মূর্ত্তি আর কিছুই নহে, একটা প্রকাণ্ড জাগুয়ার যেন কাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। আর ঠিক সেই সময়েই শোনা গেল এক করুণ আর্ত্তস্বর। সেই শব্দ শুনিয়া সুশান্ত চম্‌কাইয়া উঠিল। এ যে রঞ্জিতের গলার শব্দ! সুশান্ত আর তিলমাত্র দেরী না করিয়া তরবারি হস্তে সামনের দিকে ছুটিয়া গেল। রঞ্জিৎ তখন কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল। জাগুয়ারের আক্রমণে সে হতচকিত হইয়া চেঁচাইতেছে, বন্দুকটা কিছুতেই হাতের মধ্যে আনিতে পারিতেছে না। চোখের পলকে জাগুয়ারের মাথার উপর সুশান্তর তরবারির এক ভীষণ কোপ আসিয়া পড়িল। অব্যর্থ লক্ষ্য। জাগুয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। কম্বল জড়ানো ছিল বলিয়া রঞ্জিৎ বাঁচিয়া গেল। শুধু তার ডান কাঁধে সামান্য আঁচড় লাগিয়াছিল।

রঞ্জিতের অন্যান্য বন্ধুরাও আসিল। প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া রঞ্জিৎ সুশান্তকে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, কিন্তু সুশান্ত তাহাদের কোন কথা বলিতে দিল না—তাড়াতাড়ি টানিয়া নৌকায় আনিয়া বসাইল। বুনো নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকায় বসিয়া সুশান্ত আস্তে আস্তে রঞ্জিৎদের সকল কথা শুনাইল।

এই ঘটনার পর হইতে কেবল রঞ্জিৎ নহে, কুণাল, কমলাক্ষ এবং রোহিতাশ্ব—সকলেরই কেমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল। এখন আর দলের মধ্যে কোনও ঝগড়া বিবাদ নাই, সকলেই সকলের জন্য সমান ব্যাকুল। কেটও তাদের মন প্রাণ দিয়া ভালবাসে। ছেলেরা এই মাতৃসমা মহিলাটিকে 'আন্টি' বলিয়া ডাকে। কেটের ইচ্ছা, কোন রকমে যদি ইভান্সকে এই দলের মধ্যে আনা যায়। আহা, ইভান্স বড় ভাল লোক।

ডাকাত দলের কোন খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই কিন্তু তাদের আতঙ্কে ছেলেদের বাহিরে যাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়াছে। দ্বীপের সর্ব্বত্র ছেলেদের বসবাসের নানা চিহ্ন ছড়ান—বিশেষতঃ সেই বেলুনটি। ডাকাতেরা একবার সন্ধান পাইলে আর কি রক্ষা আছে? অবশেষে একদিন রাত্রে কয়েক জনে গিয়া চুপি চুপি বেলুনটি খুলিয়া আনিল। তারপর হইতে তারা প্রায়ই রাত্রে গিয়া চারিদিক্ পরীক্ষা করিত—কোথাও আগুন দেখা যায় কিনা। কিন্তু এ ভাবে আর ক'দিন চলে?

অবশেষে সুশান্ত এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। সেই বিরাট ঘুড়িটির কথা তোমাদের

নিশ্চয়ই মনে আছে—ঘুড়িটি উড়াইতে গিয়া তারা কি ভাবে চলিয়া আসে! সুশান্ত একখানা বইএ পড়িয়াছিল, অনেক দিন আগে কোন্ এক ইংরাজ মহিলা নাকি ঐ রকম একটা অতিকায় ঘুড়ির সঙ্গে নিজেকে বাঁধিয়া আকাশের বহু উঁচুতে উঠিয়াছিলেন। সুশান্ত ঠিক করিল, সেও ঐ রকম করিবে। আগেকার ঘুড়ির চাইতে আরও বড়—আরও বিরাট্ একটা ঘুড়ি তৈরী করা হইল। এই বিরাট ঘুড়ি উড়াইতে তেমনি মজবুত সুতার দরকার। সে কাজ হাসিল করা হইল জাহাজের লগ্‌-রীলে জড়ানো ইস্পাতের সুতা—লগ্‌-লাইন দিয়া। ঘুড়ির সঙ্গে একটা বড় ঝুড়ি (জাহাজের মাস্তুলের গায়ে যা লাগনো থাকে—এবং যার মধ্যে একজন লোক দাঁড়াইলে তার বুক পর্যন্ত ঝুড়ির ভিতর থাকে) বাঁধা হইল। প্রথমে পরীক্ষা স্বরূপ তাহাতে দেড় মণ ওজনের পাথর ভরিয়া ঘুড়ি ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘুড়ি সেই ভার সমেত ফর্‌ ফর্‌ করিয়া দূর আকাশে উঠিয়া গেল এবং সেখানে দিব্যি উড়িতে লাগিল। তখন বহু কষ্টে চরকী কলে সুতা গুটাইয়া গুটাইয়া সে ঘুড়ি নামান হইল। এইবার লোক উঠিবার পালা। কাজটি নেহাৎ সহজ নয়। প্রচুর সাহসের দরকার, —মৃত্যুর ভয় পদে পদে।

সুশান্ত কহিল—"এবার ঝুড়িতে কে উঠ্‌বে বল?" মনন পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল "দাদা, আমি উঠ্‌বো!" রঞ্জিৎ, রোহিতাশ্ব প্রভৃতি আর সকলেও "আমি উঠ্‌বো, আমি উঠ্‌বো" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

মনন দাদার দুই হাত ধরিয়া কহিল—"দাদা, তুমি হুকুম দাও, আমি উঠি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখন কর্‌তে দাও।" মননের কথায় রঞ্জিৎ, রোহিতাশ্ব প্রভৃতি সকলেই চম্‌কাইয়া উঠিল। মনন এ কি বলিতেছে!

মনন তেমনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দাদা, আজ আমাকে সমস্ত কথা বলতে দাও।" তারপর রঞ্জিতের দিকে ফিরিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "হাঁ ভাই রঞ্জিৎ, আমি একটা মহাপাপকার্য্য করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমারই সব আগে এই বিপদসঙ্কুল কাজে নামা দরকার। আজ যে তোমরা এই নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব দ্বীপের উপর নির্ব্বাসিত হয়েছ, এ কয় বৎসর এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছ, সে কার জন্য জানো? জানো, কেন আমাদের জাহাজ রাত্রির অন্ধকারে নিউজিল্যাণ্ড ছেড়ে মহাসমুদ্রে ভেসে আসে? তোমরা সকলে যখন ঘুমুচ্ছিলে, তখন আমি নির্ব্বোধের মত জাহাজের দড়ি খুলে দি। আমি খেলার ছলে যা করেছিলাম তার ফল যে শেষ পর্য্যন্ত এমন দারুণ হবে, তা বুঝ্‌তে পারিনি! যখন দেখলাম, প্রখর বাতাসের মুখে আমাদের ছোট জাহাজ বন্দর ছেড়ে ক্রমশঃ মাঝ জলে এসে পড়েছে তখন আমি ভয়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে চেঁচিয়ে তোমাদের ডাকতে পর্য্যন্ত পার্‌লাম না। অনেকক্ষণ আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে জাহাজের কাণ্ড দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, প্রাণপণে ভগবান্‌কে ডাকতে লাগলাম। শেষে যখন দেখ্‌লাম জাহাজ মহাসমুদ্রের

উপর দিয়ে হু-হু করে ভেসে চল্‌তে আরম্ভ করেছে, তখন আমি ভয়ে ভয়ে নিতান্ত ভালমানুষের মত লুকিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। সমস্ত রাত আমি ঘুমুই নি, চুপ্‌টি করে শুয়ে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জাহাজের সেই দ্রুতগতি অনুভব করছিলাম। বল, এই মহাপাপের জন্য আমার কি কোন মার্জ্জনা আছে?" বলিতে বলিতে মনন একেবারে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; সুশান্ত মহা অপরাধীর মত কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্যান্য ছেলেরাও বিস্ময়ে হতবাক্। তখন রঞ্জিৎ কহিল,—"মনন এতদিন যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেছে। অমন সদানন্দময় ছেলে এ ক'বৎছর কি রকম মনমরা হয়ে দিন কাটিয়েছে! তাতেই তার সমস্ত পাপ স্খলন হয়ে গেছে। সুশান্ত! এখন আমি বুঝ্‌তে পারছি, কেন তুমি প্রতি বিপজ্জনক কাজে সকলকে রেখে মননকে পাঠাতে?" তখন সকলে মিলিয়া মননকে শান্ত করিল। মনন মুখে হাসি চোখে জল লইয়া গিয়া ঝুড়িতে দাঁড়াইল। এইবার ঘুড়ির সুতা ছাড়া হইবে, হঠাৎ সুশান্ত ঝুড়ির নিকট অগ্রসর হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল-"মনন, তুমি নেমে এসো,—আমিই ওতে চড়বো ঠিক করেছি।"

গভীর রাত্রে সেই বিপদসঙ্কুল আকাশ-অভিযান শেষ করিয়া সুশান্ত ফিরিয়া আসিলে ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সুশান্ত শুধু কহিল, "ডাকাতের দল এখনও দ্বীপে আছে জেনো।"

(ক্রমশঃ)

ছোটদের পাতা

অঙ্গুলিমালের উদ্ধার

শ্রীরাধারাণী দেবী

(বৌদ্ধ গল্প)

কোশলের রাজপুরোহিত ভার্গব বড় ভাবনায় পড়েছেন। এত ঘটা ক'রে যে ছেলের নাম রেখেছেন অহিংসক জ্যোতিষীরা গুণে বলছে সেই ছেলেই নাকি বড় হয়ে হবে এক ভীষণ নরহন্তা দস্যু। ভার্গব ভাবলেন, এমন ছেলেকে মানুষ না ক'রে মেরে ফেলাই উচিত।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সমস্ত কথা শুনে বল্লেন, "ছি, অমন কাজও করতে নেই। বরঞ্চ এ ছেলে যাতে না বিগড়ে যায় তার ব্যবস্থা করুন। একে তক্ষশিলায় পাঠিয়ে দিন; উপযুক্ত গুরুর কাছে শাস্ত্র-চর্চ্চা শিখলে ও নিশ্চয়ই সৎ হবে।"

অহিংসককে তক্ষশিলার এক বড় পণ্ডিতের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, এবং দেখতে দেখতে সে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল। আশ্রমের অন্য ছাত্রদের এটা সহ্য হ'ল না, তারা গোপনে দিবারাত্র গুরুর কাছে অহিংসকের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা গাইতে লাগল। ফলে গুরুও অহিংসকের বিরুদ্ধে বেঁকে বসলেন। অহিংসককে তিনি আর আশ্রমে রাখতে চান না; ভাবলেন, তাকে এমন একটা অসম্ভব কাজের কথা বলবেন যা কেউ কখনও করতে পারে না। অহিংসককে কাজেই বাধ্য হয়ে আশ্রম ছেড়ে যেতে হবে। গুরু বললেন, "এখানে থাকতে হ'লে আমাকে উপযুক্ত রকম গুরুদক্ষিণা দিতে হবে। আমার দক্ষিণা আর কিছু না,—এক হাজারটি মানুষ মেরে তাদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল আমাকে এনে দিতে হবে।"

ফল হ'ল হিতে বিপরীত। অহিংসক ঠিক কর্‌ল, সে গুরুর জন্য এই অদ্ভুত, নৃশংস কাজ করতেও দ্বিধা করবে না।

বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে, সেখান দিয়ে যখন তখন নিরীহ পথিকেরা চলাফেরা করে। অহিংসক গিয়ে সেইখানে তার ঘাঁটি গাড়্‌ল, তার পর বাগে পেলেই পথচারীদের হত্যা ক'রে তাদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে নিতে সুরু কর্‌ল। কেউ তাকে রুখতে পারল না, রাজার প্রহরীরা হিমসিম খেয়ে গেল। আঙ্গুল কেটে নিত বলে তার নতুন নাম হ'ল "অঙ্গুলিমাল।"

ভার্গব বুঝলেন, এই ভীষণ দস্যু আর কেউ নয়, তাঁরই নরাধম ছেলে। রাজা প্রসেনজিৎও বিব্রত হয়ে পড়লেন; তিনি ঠিক করলেন, যে ভাবে হোক্ অঙ্গুলিমালকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। কিন্তু কিছুতেই এই দস্যুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না।

এদিকে ভার্গবের স্ত্রীর কানেও কথাটা পৌছল। ছেলের কথা ভেবে তাঁর মন উতলা হয়ে উঠ্‌ল। এই পাপিষ্ঠকে কি ফেরান একেবারেই অসম্ভব?

সেই সময় ভগবান্ বুদ্ধ জেতবনে বাস করছিলেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল আর তার মায়ের কথা তাঁরও কানে এল। তিনি কাউকে না ব'লে একাকী চললেন অঙ্গুলিমালের উদ্দেশ্যে।

পথে লোকেরা কত বারণ করল। আঙ্গুলিমাল এ পর্য্যন্ত ৯৯৯ জন লোককে হত্যা করেছে, আর একটি লোককে মারতে পারলেই তার গুরুদক্ষিণার যোগাড় হবে। অথচ এখন আর বনপথে ভুলেও কেউ ঢোকে না, অঙ্গুলিমাল এখন একেবারে ক্ষেপে গেছে—নিজের বাপ-মাকে পেলেও সে রেহাই দেবে না। কিন্তু বুদ্ধদেব কারও কথা শুনলেন না—ভিক্ষু সন্ন্যাসীর বেশে অঙ্গুলিমালের সামনে এসে হাজির হলেন।

এ সময়ে এত বড় শিকার পেয়ে অঙ্গুলিমালের আহ্লাদের আর সীমা নেই—তখনই সে ভীমবেগে বুদ্ধদেবকে আক্রমণ কর্‌ল। কিন্তু আশ্চর্য্য, বুদ্ধদেবকে সে কিছুতেই ধরতে পারল না—সে যত জোরে ছোটে বুদ্ধও যেন কি অদৃশ্য শক্তিতে ততই এগিয়ে যান! ঠিক চোখের সামনাসামনি

রেখেও দস্যু তাঁর নাগাল পায় না। ছুটতে ছুটতে দস্যু শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন সে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"থামো, আর এগিও না।" বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "তবে তুমিও ঐখানে থাম।"

বলতে বলতে অঙ্গুলিমালের চলবার শক্তি যেন কোথায় চলে গেল—সে সেইখানেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব তাকে ধর্ম্মের অমিয় বাণী শোনাতে লাগলেন।

কি ভাবে যে সময় কেটে গেল ঠিক নেই। বুদ্ধের অমৃতময় বাণী শুনে অঙ্গুলিমাল যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে! হঠাৎ বুদ্ধদেব বলে উঠলেন, "এহি ভিক্খো—ভিক্ষু, এগিয়ে এস।" পরক্ষণেই অঙ্গুলিমাল ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

নরহন্তা পাপিষ্ঠ দস্যুর মুহূর্ত্তের মধ্যে এ কি পরিবর্ত্তন!

তারপর? তারপর বুদ্ধদেব অঙ্গুলিমালকে জেতবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে এসে অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু-বৃত্তি গ্রহণ ক'রে ভগবানের আরাধনায় দিন কাটাতে লাগ্‌ল।

এদিকে রাজা প্রসেনজিৎ অঙ্গুলিমালকে ধরতে না পেরে একদিন বুদ্ধদেবের কাছে এসে হাজির হলেন তাঁর উপদেশের জন্য। সেখানে এসে, সেই আশ্রমেই অঙ্গুলিমালকে ভিক্ষুরূপে দেখে, তাঁর মুখের অবস্থা কেমন হ'ল তা তো বুঝতেই পার।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

(রজত-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা)

পাঁচ বছরের ছোট ছেলে রজত বসু গত বছর প্রায় এমনি সময়ে হঠাৎ জলে ডুবে মারা যায়। ঐটুকু বয়সেই তার নানা বিষয়ে প্রতিভা দেখে লোকে অবাক্ হ'ত। ছোট্ট রজতের স্মৃতি রক্ষার জন্য তার বাবা-মা এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যে সব কবিতা লিখে গেছেন তার মধ্যে তোমার মতে সবচেয়ে ভাল তিনটি—১ম, ২য়, ৩য়—এই ভাবে লিখে পাঠাও। সমস্ত তালিকার ভোট নিয়ে আমরা একটা তালিকা তৈরী করব এবং সেই তালিকা অনুযায়ী ৩টি পুরস্কার দেওয়া হবে। ১ম পুরস্কার ৫৲ দামের বই, ২য় পুরস্কার ৩৲ দামের বই, ৩য় পুরস্কার ২৲ দামের বই। প্রত্যেক তালিকার সঙ্গে প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও নিজের গ্রাহক নং পাঠাতে হবে। তালিকা ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পেঁছান চাই। আমাদের মতামতই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রাহক-গ্রাহিকার ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের জীবিত লেখকদের মধ্যে যাঁরা সব চেয়ে ভাল লেখেন তাঁদের নাম:—

গল্পে—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতায়—শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, কাজি নজরুল ইস্‌লাম, শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধে—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠানোয় পুরস্কার পেলেন—

শ্রীতরুণকুমার বসু (রাঁচি।)

সন্দেশ

যুদ্ধের খবর এখন মিত্রপক্ষের অনুকূলে চলেছে। টিউনিসিয়া দখলের পর তারা ভূমধ্যসাগরে ইটালিয়ানদের দু'টো দ্বীপ দখল ক'রে নিয়েছে এবং এবার খোদ ইটালিতেই মিত্রপক্ষের আক্রমণ সুরু হবার সম্ভাবনা দাঁড়িয়েছে।

কলকাতার ফুট্‌বল্ লীগ চল্‌ছে। এখন পর্য্যন্ত যা অবস্থা তা'তে মনে হয় গত বারের লীগ্ বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল দল এবারেও চ্যাম্পিয়ন্ হ'তে পারবে।

ভাওয়াল মামলা বিজয়ী বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জ্জি মহাশয় আর ইহলোকে নেই।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েরও মৃত্যু হয়েছে। তাঁর অভাবে বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং ছায়াচিত্রের বিশেষ ক্ষতি হ'ল।

সিংহল দ্বীপে 'ভেডা' নামে এক রকম জংলী জাত আছে, তাদের নাকি কেউ হাসতে দেখে নি। এমন কি অনেকে অনুমান করেন এদের হাসবার ক্ষমতাই লোপ পেয়ে গেছে। বলা বাহুল্য এরা খুব অসভ্য জাত—পেঁচা, বাদুড় প্রভৃতি জানোয়ার হচ্ছে এদের মুখরোচক খাদ্য।

বেতালের প্রশ্ন

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের দেওয়া প্রশ্ন ও তাঁদেরই দেওয়া উত্তর প্রকাশিত হয়।]

নতুন প্রশ্ন

(১) বর্ষাকালে ভিজা জামা ফেলিয়া রাখিলে অনেক সময় কালো কালো 'ছাতা'র মত দাগ পড়ে। চলতি কথায় তাকে 'মইষে ধরা' বলে। এই দাগ ধোপাবাড়ী দিলেও উঠিতে চায় না। ইহা তুলিবার উপায় কি? কাপড়ে চায়ের দাগ তুলিবার সহজ উপায়ই বা কি? —শ্রীসমীর ঘোষ।

(২) হিন্দী বা ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বাংলা ভাষা শিখিবার কোনও 'সেল্‌ফ্ টট্' গোছের বই আছে কি?

—শ্রীঅহল্যা দেশাই।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

এই প্রশ্নের উত্তরগুলি তোমাদের জানা উচিত। চেষ্টা ক'রে দেখ। আসছে মাসে এর উত্তর দেওয়া হবে। (১) অনেক সন্ন্যাসীর নামের পাশে 'পুরী', 'গিরি', 'ভারতী' প্রভৃতি থাকে, এগুলিতে কি বোঝায় ?

(২) নীচের জিনিষগুলি কোন্‌টা বলতে কি বোঝায় ?—

রয়টার, ইয়েন্, রবট্, শুক্তি, সিঙ্কোনা, কথাকলি, ক্লোরোফিল্।

(৩) নিম্নলিখিত বিখ্যাত লোকদের আসল বা সম্পূর্ণ নাম কি ?—

বিদ্যাসাগর, জর্জ্জ্ ইলিয়ট্, পরশুরাম, জি. বি. এস্, সিষ্টার নিবেদিতা, পরমহংস দেব।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

উত্তরদাতাদের নাম

শ্যামল, মণিকা, ফাল্গুনী (বক্সা দুয়ার); বেবী, রেণু করুণা, সতী মৈত্র (রাজসাহী); আব্দুল, কুদ্দুস (বর্দ্ধমান); সুশীলকুমার দাশগুপ্ত, অরুণ, সুনীল, রেখা, শেফা (কলিকাতা); অশোক, অমিয়, শীলা, অমিতাভ, প্রভাত (বাঁকুড়া); স্থানুবালা সিংহ (দেবীপুর); পি এণ্ড গৌরাঙ্গ, চৈতন্য (বালি); অমিতাভ, বেবী, টুকুন, পদ্মা, আর্য্য ও আরো অনেকে (পাবনা); তরুণ, তপন, তোজো, অশোক, বাসু (দম্‌দম্); বিশ্বজিৎ বিশ্বাস (কলিকাতা); নবেন্দু সেন (বালীগঞ্জ); সত্যনারায়ণ লাহিড়ী (বগুড়া); মলিন ও পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর); জ্ঞানময়, পতু ও শম্ভু (কাঁথি); শৈলেশ, অনিল, নিখিল, দেবু, নিরু (জলপাইগুড়ি); প্রভা, বিভা, মঞ্জু, সাধন (জলপাইগুড়ি); অজিতকুমার সেন (গুঠিয়া); কমলা রাহা (স্বর্ণঘোষ); ইন্দ্রাণী রায় (বগুড়া); জ্যোৎস্না, মীরা, সিপ্রা, শ্রীলেখা, অসিত (খুলনা); মতিলাল চৌধুরী (দুর্গাপুর); উৎপলা সরকার (পুরুলিয়া); মিঠু, টিটু, খুকু, মিণ্টু (কালীঘাট); বাচ্চু, আশীষ, পিণ্টু, দুলুমাসী (কালীঘাট); কুন্তলা মজুমদার (রায়পুর); অধীররঞ্জন দাস (বরিশাল); রামানন্দ সাহিত্য সদনের সভ্যবৃন্দ (রামচন্দ্রপুর); লীলা, বেলা, বর্ষা, বাদল, বাবলী (চাইবাসা); উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা); বিমলচন্দ্র দত্ত (শ্রীখণ্ড); রিণা রায় (টালীগঞ্জ); অমিয়, মিণ্টা, মানু, রুণু (রাউতাড়া); শ্রীপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রগণ (কাজলধারা); অরুণা দাস, রথীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বালীগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

নীচের ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যাগুলির জায়গায় ঠিক মত শব্দ বসালেই লেখাগুলি পড়া যাবে। প্রত্যেক বিশেষ সংখ্যার জন্য একই শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন "১" এই সংখ্যাটির জায়গায় একবার যা বসবে অন্যত্রও ঠিক সেই শব্দটিই বসাতে হবে ঃ—

(ক) লোক১ চালিয়াৎ, দেখ না, ধুতির সঙ্গেই ১ লাগিয়েছে। (খ) লেখার সঙ্গে ২ন ৩ একটা ৩ না থাকলে কি ২য় ? (গ) ৪ছে কে, ৪ এল কি ? (ঘ) অতটা ৫ ঠেলে দেখি ওপরে শুধু ৫এর ঝাঁক। (ঙ) ছেলে দু'টো ৬ দিয়ে গলা ৬ করে চলেছে।

লাইমজুস অ্যাণ্ড গ্লিসারিন

কেশ পরিচর্যা ও প্রসাধনের উপযোগী সুস্নিগ্ধ ক্রীম

স্নানের পূর্বে অথবা পরে নিত্য ব্যবহার করিলে নিতান্ত অবাধ্য কেশও বশে আসে এবং রুক্ষ কেশ মসৃণ হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান পছন্দ করিবেন।

চার আউন্স ও ছয় আউন্স শিশি

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি. এল্ প্রণীত

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ॥০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ॥৵০

নূতন পুরাণ

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ॥৵০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

—ন তু ন ব ই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

খুব শীঘ্র বাহির হইবে

দাম বারো আনা।

ছোটদের উপহারের আর কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
হুকাকাশির গল্প
মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির"
কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম্.এ প্রণীত
বদ্যিনাথের বড়ি
সরস মজাদার হাসির গল্প, সঙ্গে
লেখিকার আঁকা তেমনি মজার
ছবি ... ॥৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং (গল্প) ... ॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি
(গল্প) ... ॥৵০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
হাল্‌কা হাসির খাতা (গল্প)... ॥৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
আবিষ্কারের গল্প ... ॥৵০
আকাশের গল্প ... ৸৵০
জন্মদিনের উপহার (গল্প) ॥৵০
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন
(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা
(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক
দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
দিগ্বিজয়ী বীর ... ॥৵০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
১ম ও ২য় খণ্ড—প্রতি খণ্ড ... ॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

৬শ বর্ষ
সংখ্যা
শ্রাবণ
১৩৫০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪॥ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } { মূল্য ৮ টাকা
ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক কারখানা

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১৸৵০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

Regd. No. C—1641

—ন তু ন ব ই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

খুব শীঘ্র বাহির হইবে

দাম বারো আনা।

ছোটদের উপহারের আর কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
হুকাকাশির গল্প
মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির"
কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ॥৴০

শ্রীলীলা মজুমদার এম.এ প্রণীত
বদ্যিনাথের বড়ি
সরস মজাদার হাসির গল্প, সঙ্গে
লেখিকার আঁকা তেমনি মজার
ছবি ... ॥৴০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
ঢং-চং (গল্প) ... ॥৴০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি
(গল্প) ... ॥৴০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
হাল্‌কা হাসির খাতা (গল্প)... ॥৴০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
আবিষ্কারের গল্প ... ॥৴০
আকাশের গল্প ... ৸৶০
জন্মদিনের উপহার (গল্প) ॥৶০
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন
(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা
(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক
দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
দিগ্বিজয়ী বীর ... ॥৴০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
১ম ও ২য় খণ্ড—প্রতি খণ্ড ... ॥৴০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

রামধনু

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

...শ বর্ষ
... সংখ্যা
শ্রাবণ

মাত্র ৭ টী ঔষধ
মাত্র ১৪-টী ঔষধ
পকেট কেস ও পুস্তক সহ
মূল্য ৪। আনা
মূল্য ৮ টাকা

বার্ষিক ৩
ষান্মাসিক
১॥৴০
প্রতি সংখ্যা
।৴০

COLOUR PAPER

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৵৹; প্রতি সংখ্যা।৵৹, ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র ; বৎসর বৈশাখ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য পাঁচ আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়। বৈশাখ হইতে ছয় মাস বা এক বৎসরের জন্য অথবা কার্ত্তিক হইতে ৬ মাসের জন্য পত্রিকা লইতে হয়। বৎসরের মাঝামাঝি কোন মাস হইতে বার্ষিক গ্রাহক করা হয় না।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। রামধনু মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হয়।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তেল ব্যবহার করুন
২৪৩ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা। ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

সদ্য প্রকাশিত

দ্বাদশ সূর্য্য

—কথাসাহিত্যিক
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

মূল্য—১॥০

(বারজন জগদ্বিখ্যাত মনীষীর জীবন-কথা)

রামকৃষ্ণ পরমহংস, টমাস এডিসন, আমুণ্ডসেন, সানইয়াৎ-সেন, হাওয়ার্ড কার্টার, বার্ণার্ড প্যালিসী, কামাল পাশা, মলেয়ার, ম্যাক্সিম গর্কী, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লর্ড লিষ্টার ও জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষীবৃন্দের বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও কর্ম্ম-বহুল জীবনী সহজ সরল ভাবে লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক জীবনীর সহিত বিভিন্ন বয়সের বারটী হাফটোন্ ছবি দেওয়া আছে। প্রত্যেক সংবাদপত্রেই উচ্চভাবে প্রশংসিত।

নব প্রকাশিত

১। জয়পতাকা—(কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ)—শৈলবালা ঘোষজায়া—৸০
২। ওপারের দূত—(কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ)—প্রবোধ সান্যাল—৸০
৩। স্বর্গের সিঁড়ি—(কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ)—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৸০
৪। উড়োজাহাজে কয়েদী—যুদ্ধ-উপন্যাস—ভূপেশ সেনগুপ্ত—৸০
৫। তেপান্তরের মাঠ—বালকের বীরত্ব-কাহিনী—দীনেশ মুখোপাধ্যায়—॥০
৬। অন্ধকূপের বন্দী—রোমাঞ্চকর উপন্যাস—যতীন ঘোষ—৸০

(বিশ্বপ্রতিভা সিরিজ)

১। দানবীর কার্নেগী—পরেশ সেনগুপ্ত—॥০
২। ঋষি অরবিন্দ—চন্দ্রকান্ত দত্ত-সরস্বতী—॥০
৩। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন—হেমেন্দ্রকুমার রায়—১৲—(সদ্য প্রকাশিত)

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৫০ { ৪র্থ সংখ্যা

মিনুর কোকিল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ওরে খোকা, কোথা তুই শিখেছিস্ ফন্দী ?
একেবারে পিকরাজে করেছিস্ বন্দী !
ঘোরে গোটা সুরলোক এ'রে ক'রে কেন্দ্র,
যে সে নয়, এ যে বাপু দ্বিতীয় দেবেন্দ্র !
দেখ্, ওর রাঙ্গা চোখ বুঝি জলে ভাসছে,
তবু তোরে কি কারণে এত ভালবাসছে ?
সুলতান তুই নাকি ? বুক মোর কাঁপে যে,
রেখেছিস কাছে এনে মহাকবি হাফেজে !

সাথে তোর কালিদাস বাস করে নিত্য,
ছদ্মবেশেতে তুই বিক্রমাদিত্য!
মনোভাব তোর কিছু পারি নে যে বুঝতে,
আকবর ন'স, চা'স তানসেনে পুষতে!
পথ তোর ফুলে ছাওয়া, সুধা অফুরন্ত,
সাথে সাথে ফেরে তোর সুচির বসন্ত।

সর্ব্বভুক্ সৈন্যদল

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

মানুষ যে সর্ব্বভুক্ এ কথা সত্যি। আমাদের দেশের কোল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা, কুকি এবং অন্যান্য বুনো জাতিরা সাপ থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ পর্য্যন্ত কিছুই খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেয় না। আফ্রিকার কোন কোন বন্য জাতি তো মানুষ পুড়িয়ে খাওয়াটাকে পোলাও-কালিয়া খাওয়ার সামিল মনে করে। সভ্য দেশের সুসভ্য জাতিরাও যে দু'-একটা আশ্চর্য্য জিনিষ খায় না এমন নয়। যেমন চীনেদের কাছে ইঁদুর, আরসোলা, তেলাপোকা ইত্যাদি তো সুখাদ্য! ইয়োরোপ এবং আমেরিকার অনেক সুসভ্য দেশের লোকের ব্যাঙএর মাংসের নামে জিভ দিয়ে জল পড়ে। আমেরিকাতে ঘোড়া এবং বিড়ালের মাংসও আজকাল মাঝে মাঝে চেখে দেখা হচ্ছে। মোট কথা, খাদ্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম বাঁধা যায় না,—যার যা ভাল লাগে সে তাই খায়। দুর্ভিক্ষে অবশ্য লোক রসনা তৃপ্তির জন্য যে নানা রকম অখাদ্য খায় তা নয়; পেটের জ্বালায় তখন আর কোন খাদ্যকেই অখাদ্য মনে হয় না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পড়ে থাক তা হ'লে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ সেই বিখ্যাত বইএ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে বিবরণ দেওয়া আছে তা কি ভয়ানক! সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষে মানুষ মানুষকে কেটে খেয়ে ফেল্‌তেও নাকি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নি। আজকালকার দুর্ভিক্ষেও এ রকম খবর মাঝে মাঝে এক আধটা শোনা যায়।

আমি তোমাদের যে সেনাদলের কথা বলছি তারা গিয়েছিল যুদ্ধ করতে বর্ম্মার গভীর জঙ্গলময় প্রদেশে। এই সকল স্থানে এরা ভীষণ খাদ্যকষ্ট অনুভব করে; ফলে নানা রকম অদ্ভুত খাদ্য খেয়ে এদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হয়েছে। এই সৈন্যদলটি ফিরে এসে তাদের খাদ্য-তালিকার ভারি রংদার এক বিবরণ দিয়েছে। এদের ভেতর থেকে একজনকার নিজের কথাই তুলে দিচ্ছি, দেখ এ সব খাদ্যের কোনটি তোমাদের খেতে সখ হয় কিনা।

প্রাইভেট্ জর্জ্জ পেপার আটাশ বছর বয়সের একজন ইংরাজ ছোকরা; এর বাড়ি হচ্ছে ম্যান্‌চেষ্টারের কাছে ফেণ্ডেলবারি গ্রামে। আগে সে জানালা-দরজার রং-মিস্ত্রীর কাজ করত, যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়েছে। বর্ম্মার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সে যা বলেছে শোন:

"এবারকার বর্ম্মার যুদ্ধে আমাদের অনেক নতুন জিনিষ খেতে হয়েছে—যথা, গাধার মাংসের স্যুপ, ঘোড়ার যকৃৎ ভাজা, অজগর সাপের মাংসের শিক-কাবাব এবং হাতীর রোষ্ট। যাবার সময় আমরা শত শত গাধা মালপত্র বইবার জন্য আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরেছে কিন্তু একটি। কতকগুলি ডুবেছে নদী পার হতে গিয়ে, কিন্তু বেশীর ভাগই আমরা কেটে খেয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছি অন্য খাদ্যের অভাবে। ইরাবতী নদী পার হয়ে যে গভীর জঙ্গলে আমরা পড়লাম সেখানেই খাদ্যাভাব হ'তে আরম্ভ হ'ল। অন্যান্য বার রেডিও যোগে আমরা জানিয়ে দেওয়া মাত্র এরোপ্লেন এসে উপর থেকে আবশ্যক খাদ্যদ্রব্যাদি নিক্ষেপ করে যেত। কিন্তু এবার সঙ্গের রেডিও খারাপ হয়ে যাওয়াতে খবর দিতে পারলুম না; তাতেই হ'ল এই বিপত্তি। যাই হোক, এ সব খাবার সবগুলিই যে খারাপ তা নয়। কোনটি আমার কি রকম লেগেছে তা বলছি।

"গাধার স্যুপ ঘোড়ার স্যুপের চেয়ে খেতে ভাল; কিন্তু ঘোড়ার যকৃৎ ভাজা খেতে এত সুস্বাদু যে তার তুলনা মেলা ভার। সে অমৃতের কথা মনে হ'লে এখনও আমার জিভে জল আসে। নানাপ্রকার সাপের মাংসও আমরা খেয়েছিলাম; সব চেয়ে অজগরের শিক-কাবাব খেতে ভাল লেগেছিল। অজগরের মাংস অনেকটা মাছের মত খেতে। কলাপাতার স্যালাড্ তৈরী করে আমরা খেয়েছিলাম—খেতে নেহাৎ মন্দ হয় নি। ক'জন ছোকরা একদিন একটা শকুনি মেরে তার কালিয়া রেঁধে খেলে; শুনেছিলাম শকুনের মাংস খেতে ভাল নয়, তাই আমি আর তা চাখি নি।

"একদিন ভারি মজা হয়েছিল। কয়েকজন মিলে একটা মহিষ মেরে ফেলে; কিন্তু সমস্যা হ'ল মহিষের চামড়া ছাড়ান হবে কি ক'রে। উপযুক্ত অস্ত্র সঙ্গে কিছুই ছিল না। শেষকালে জর্জ্জ্ ব'লে একজন লোক খানকয়েক ব্লেড আমাদের দিল। ন' খানা ব্লেড খরচ করে তিনজন মানুষ অনবরত পরিশ্রম ক'রে মহিষটাকে বেশ ক'রে ছাড়িয়ে ফেল্‌ল। জর্জ্জের স্ত্রী স্বামীর জন্য কয়েকটা দরকারী জিনিষ একটা ছোট পার্শেলে ক'রে পাঠিয়েছিল; এরোপ্লেন সেই পার্শেলটা উপর থেকে আমাদের দলে ফেলে দিয়েছিল। আমাদের কাছে বাড়ি থেকে কোন উপহার পাঠানো হ'লে এ রকম ক'রে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে নিয়ম। যাই হোক, জর্জ্জের এই উপহার আমাদের বিশেষ উপকারে এসেছিল। মহিষটাকে যখন "রেডি" করা হচ্ছে তখন জর্জ্জ হাসতে হাসতে বল্লে—'বুড়ি যদি জান্‌ত যে তার উপহারের ব্লেড দিয়ে কি করা হচ্ছে তা হ'লে সে কি বল্‌ত বল দেখি?' আমরা সব একযোগে হেসে উঠ্‌লাম।"

বুদ্ধির্যস্য

শ্রীসুবোধ বসু

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ড্রিল্ সার্ঃ ভেতরে কে শুনি ? বাইরে থেকে তালা বন্ধ ; ভিতরে চীৎকার ! ভাগ্যিস চাবিটা সঙ্গেই ঝুলচে [চকিতে ভোম্বলের বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর মুখের দিকে চাহিয়া] ওরে সর্ব্বনাশ ! মেরেছেরে বাবা ! ফাঁসির মড়ারে বাবা, ফাঁসির মড়া…

ভোম্বল ঃ [অগ্রসর হইয়া] আমি, আমি, আমি, চিনতে পারছেন না ? আমি, আমি…

ড্রিল সার্ ঃ [দুই পা হটিয়া] হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝতে আর বাকি নেই। বাবা অতুল, আমি তোমারই পুরানো মাষ্টার মশাই। চিনতে দেরি হয়েছে বলে কিছু মনে ক'র না, বাবা। এইবারটি ক্ষমা কর…

ভোম্বল ঃ এ আপনি কি বলছেন ? এমন ভুলও লোকের হয়…

ড্রিল সার্ ঃ [পিছনে সরিতে সরিতে] অপরাধ হয়েছে; প্রকৃতই অপরাধ হয়েছে। এমনটি ভবিষ্যতে আর কখনই হবে না। এইবারটি ক্ষমা কর…

ভোম্বল ঃ [অগ্রসর হইতে হইতে] আমি ক্ষমা করব আপনাকে ! আপনি কা'কে কি বলছেন ? আমি হলাম…

ড্রিল সার্ ঃ [ভয়ে চোখ ঢাকিয়া] জানি জানি। তুমি অতুল, তুমি অতুল। চেহারার পরিবর্ত্তন হওয়াতে…

ভোম্বল ঃ অতুল ! আমি অতুল ! আত্মহত্যার…

ড্রিল সার্ ঃ [না বুঝিয়া] সব জানি। সব জানি। কিন্তু তার জন্য আমার অপরাধটা কোথায় বাবা ? আত্মহত্যাটা, বুঝেচ কি না, মানে, তুমি স্বেচ্ছায়ই করেছিলে। একটু আধটু মার ধর করেছি বটে, কিন্তু, সেটা মানে হ'ল গিয়ে তোমার ভালোর জন্যই…যেমন আর সবাইকে…

ভোম্বল ঃ আপনার ভোম্বলকে আপনি…

ড্রিল সার্ ঃ না, না। ওটা ভুল। সত্যই ভুল। আমি কারুর উপরই পার্শিয়ালিটি করি না, ওটা বদ্ লোকের রটনা। আমার কাছে ভোম্বলও যা অন্য সবাইও…

ভোম্বল ঃ এটি বলবেন না সার ! আপনার অনুগ্রহের কথা…

ড্রিল সার্ ঃ [জনান্তিকে] ওরে সর্ব্বনাশ ! আবার ব্যঙ্গ করছে। কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। (প্রকাশ্যে) আমার ঘাট হয়েছে, অতুল ! মধ্যরাত্রে তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত

করেছি। এই আমি বাইরে গিয়ে তালা বন্ধ করে দিচ্ছি। চাবি আমার কাছেই রাখব। তোর পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পারবে। [দরজা দিয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ]

ভোম্বল ঃ [সাতঙ্কে] আরে আরে, করেন কি, করেন কি ? থামুন, থামুন…

ছুটিয়া গিয়া ড্রিল সারকে জাপটাইয়া ধরিল। ড্রিল সার্ তীব্র ভীত চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে দু'জনের জাপটাজাপটি সুরু হইয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

পড়ার ঘর। হবি দুই কান ধরিয়া অবনত মুখে দাঁড়াইয়া। কানু নিল্ ডাউন ; মণ্টুর মাথায় গাধার টুপি, পিঠে বেতের জ্বালা দূর করিবার জন্য হাত বুলাইতেছে। পণ্টু চেয়ার-ডাউন বা অর্দ্ধ নিল ডাউন। ড্রিল সার্ কাছে আগাইয়া গেলেন। ড্রিল সারের পিছনে পিছনে গর্ব্বিত ভাবে ভোম্বলও আছে।

ড্রিল সার্ ঃ [হাবুলকে] তোর কি বলবার আছে শীগ্‌গির বল, লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর ! শয়তানিটা আজ টের পাওয়াচ্ছি। থাবড়িয়ে আজ নিজের নাম ভুলিয়ে দেব। যা বলবার দু'কথায় চটপট বলে ফেল। যত বেশি মিথ্যে বলবি তত বেশী বেত পিঠের উপর পড়বে। এমন সব হাড় দুষ্টু ছেলে ভূভারতে দেখা যায় না। বদ্ বুদ্ধিও মাথায় খেলে ! একেই আমার হার্ট্‌টা দুর্ব্বল, তার উপর এমন কিম্ভূতকিমাকার বেশে মধ্যরাত্রে ফাঁসির ঘরে কেউ যদি এসে জড়িয়ে ধরে, তবে তো অনায়াসেই ওটা থেমে যেতে পারত। যেমন গর্দ্দভ ভোম্বলটা, তেমন হাড় দুষ্টু এগুলো…

ভোম্বল ঃ আমার তো কোনও অপরাধ ছিল না সার্, না জেনেই না আমি…

ড্রিল সার্ ঃ [ফিরিয়া অসন্তুষ্ট কণ্ঠে] না, দোষ তোমার থাকবে কেন, যত দোষ আমার হৃৎপিণ্ডটার ? কোন্ আক্কেলে তুই গুরুজনকে এসে অন্ধকারে অমন জাপটে ধরলি ? একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই ! [বুকে হাত দিয়া] কী সর্ব্বনাশ, একটুতেই যে হাঁপাতে আরম্ভ করেছি !

ভোম্বল ঃ আমার অবস্থাটাও একবার ভেবে দেখুন সার্। আপনিও তো মানুষ ভুল করলেন। দরজাটা যদি বন্ধ ক'রে যেতেন, তবে আমার অবস্থাটা কি হ'ত ? ইতিমধ্যেই তো আমাদের অতুল…

ড্রিল সার্ ঃ মুখে অমন কালিঝুলি মেখে ব্রহ্মদত্যি সেজে থাকলে আমিই বা কি ক'রে বুঝব ? তাই ব'লে জেনে শুনে অন্ধকারে লাফিয়ে এসে অমন ক'রে গুরুজনকে জাপ্‌টে ধরা ! হৃৎপিণ্ডটার দশা একেবারে নিকেশ হয়েছে ! দেখ ভোম্বল, বেশ ভাল ছেলেটি বলেই তোমাকে জেনে এসেচি ; নইলে তুমি বল্‌লে, 'রং মাখানো আমি টেরই পাইনি, ঘুমিয়ে ছিলুম,' আর অমনি বিশ্বাস ক'রে নিলুম এটি হ'ত না। ভবিষ্যতে, অমন বহুরূপী হওয়া টের না পেলে, তোমাকেও

ভুগতে হবে। (হাবুলের দিকে বেত শাসাইয়া) কি জানিস, চট্‌পট্ বলে ফেল, হনুমান! পিটিয়ে তোর চামড়া খসাব। তোদের কারুর কথা আমি একবর্ণও বিশ্বাস করি না। (ভেংচাইয়া) নির্দ্দোষ! কিছুই জানিনে! ঘুমিয়ে ছিলাম! কেউ কিছু জানেন না অথচ ব্যাপারটা ঘটে গেল! —শুধু শুধু ঘটে গেল, কেমন? চুপ ক'রে আছিস যে? রা নেই কেন? (বেত শাসাইয়া) কিছুই জানিস নে, কেমন?

হাবুল: [গম্ভীর ভাবে] আজ্ঞে না, সবই জানি। গুরুজনের কাছে মিথ্যে বল্লে জিভ খসে আসে।

ড্রিল সার্: জানিস্? তবে বল, সব খুলে বল। একটু যদি গোপন করিস্, অমনি আমি টের পাব। সে চেষ্টা ক'র না। কি জানিস বল?

হাবুল: ভোম্বল বললে, মুখটা ভয়ঙ্কর দেখতে হয় এমন করে দে—ড্রিল সারের সাহস পরীক্ষা করব। আমি আর কি করি? রাজি না হলে ভোম্বলের মার খেয়ে মরব। তাই তূলি দিয়ে এঁকে দিলুম।

ভোম্বল: (সচীৎকারে প্রতিবাদ) আমি বল্লুম! ওরে মিথ্যেবাদী, ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ওরে জালিয়াৎ...ওর কথা শুনবেন না সার, শুনবেন না।

হাবুল: (রাগিয়া) বেশ, তবে তুমিই বল। আমি কি বলতে চাইচি? হামেশাই আমরা মার খেয়ে থাকি। চামড়া বাঁচাবার জন্য তোমার মত...

ড্রিল সার্: ড্রিল সারের সাহস পরীক্ষা করবে? ভোম্বল, এত বাড় বেড়েছ? কী ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র! জেনে শুনে আমার দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডটাকে—বুঝেচি, আমি সব বুঝেচি। সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ভোম্বল: [প্রায় কাঁদিয়া] ওর একটা কথাও বিশ্বেস করবেন না সার্; মিথ্যুক, ঘোর মিথ্যুক...

(ক্রমশঃ)

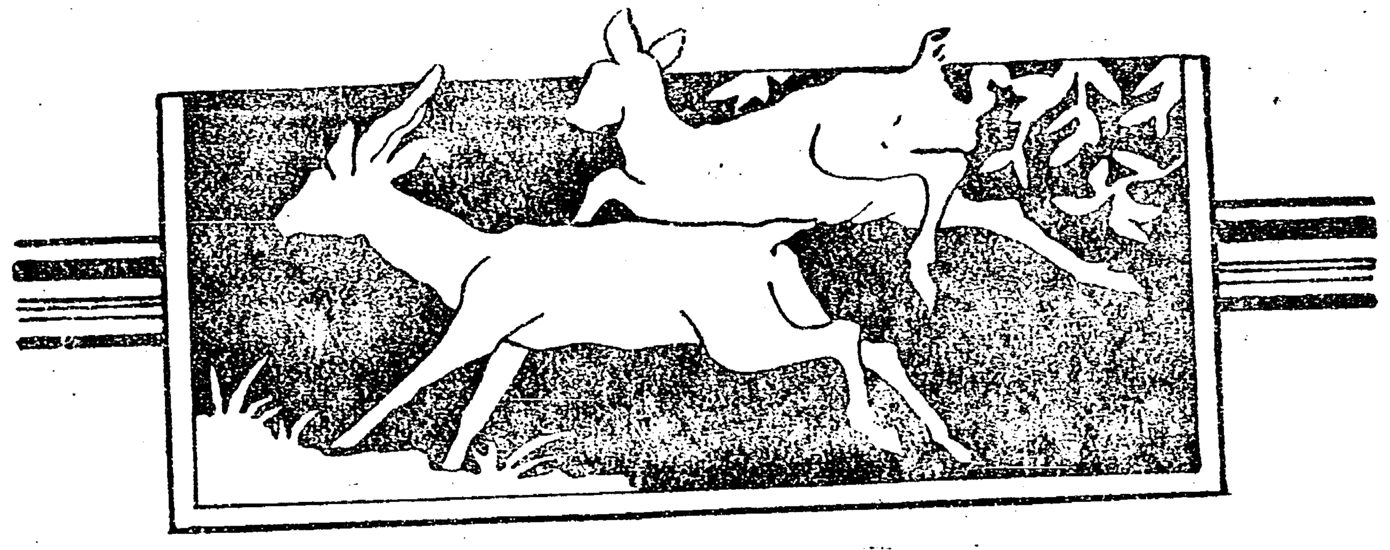

৩০

সেদিন চব্বিশে নভেম্বর। সুশান্ত ও অশোক নৌকায় চড়িয়া কঙ্কণা নদীর ওপারে গিয়াছিল, ওদিকে একটা সরু পথ আছে, সেটি কোন রকমে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিবে এই মতলবে। নদীর তীর হইতে তাহারা প্রায় তিনশত হাত দূরে গিয়াছে, হঠাৎ সুশান্তর মনে হইল জুতার তলায় কি একটা শক্ত জিনিষ মর্‌মর্ শব্দে গুঁড়া হইয়া গেল। তুলিয়া দেখে, এ যে তামাক খাইবার পাইপ! এ কোথা হইতে আসিল!

অশোক ভয়ে ভয়ে কহিল, "নিশ্চয় ডাকাতের দল এদিকে এসেছিল, তারাই ফেলে গেছে।" "বদোয়াঁ সাহেবের পাইপও তো হতে পারে?" কিন্তু সেটা যে বদোয়াঁ সাহেবের তামাক খাইবার পাইপ্ নহে তাহা শীঘ্রই বোঝা গেল। কারণ পাইপের মধ্যে আরো কিছু পোড়া তামাক গোঁজা ছিল; শুঁকিয়া তাহারা দেখিল টাট্‌কা তামাকের গন্ধ। নিশ্চয় ওয়াল্‌ষ্টনের দলের কেহ ভুলিয়া এখানে ফেলিয়া গিয়াছে। ওয়াল্‌ষ্টন্ দলবল লইয়া তাহা হইলে এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছে! আর সেখানে দেরী না করিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া ফিরিয়া আসিল।

ডাকাতগুলা এখন কোথায়? হয়ত খুব নিকটেই তাহারা লুকাইয়া আছে। হয়ত ছেলে-গুলিকে দেখিতে পাইয়াছে, হয়তো আজ রাত্রেই ফরাসী গুহা আক্রমণ করিবে!

কিন্তু এখন মিথ্যা ভয় পাইলে চলিবে না। সেই নরাধম পাপিষ্ঠগুলির হাত হইতে আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। তাহাদের গতিবিধিও লক্ষ্য করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

সাতাশে নভেম্বর। গত দু'দিন ভীষণ গরম গিয়াছে। আজ সন্ধ্যা হইতে দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড় আর সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। ছেলের দল গুহার মধ্যে দরজা আঁটিয়া বসিয়া আছে; বিয়্যার এতক্ষণ ঘরের মেঝেয় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল; হঠাৎ সে দুয়ারের নিকট ছুটিয়া গিয়া গর্জ্জন

করিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ সেই বর্ষণমুখর আঁধার রাত্রি কাঁপাইয়া একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হইল; স্পষ্ট বন্দুকের শব্দ। ফরাসী গুহার একশত হাতের মধ্যে নিশ্চয় কেহ বন্দুক ছুড়িয়াছে। সেই অতর্কিত বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ছেলেদের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। এই ঘনঘোর দারুণ দুর্যোগ উপেক্ষা করিয়াও ডাকাতের দল তাহাদের ফরাসী গুহা আক্রমণ করিতে আসিয়াছে! রঞ্জিৎ, সুশান্ত, অশোক, রোহিতাশ্ব প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ বন্দুক-রিভলভার লইয়া স্পন্দিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সহসা তাহাদের কানে আসিল এক অসহায় কণ্ঠের করুণ আর্ত্তধ্বনি—"রক্ষা কর, কে আছ, রক্ষা কর।"

সেই চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া কেট্ দুয়ারের নিকট অগ্রসর হইয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। আবার সেই কাতর কণ্ঠের করুণ আর্ত্তস্বর। সেই শব্দ শুনিয়া কেট্ কহিল—"শীঘ্র দরজা খুলে দাও, শীঘ্র দরজা খুলে দাও।" ছেলেরা দরজা খুলিয়া দিল; পরমুহূর্ত্তেই একটি পূর্ণবয়স্ক বলিষ্ঠগঠন নাবিক সম্পূর্ণ সিক্ত বেশে ফরাসী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটি আর কেহই নহে, জাহাজের সেই প্রথম মেট্ ইভান্স।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ইভান্স তাড়াতাড়ি দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরে কান পাতিয়া অনেকক্ষণ কি শুনিবার চেষ্টা করিল। তারপর মুখ ফিরাইতেই একসঙ্গে এতগুলি কিশোরবয়স্ক ছেলে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল কেটের দিকে। বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে সে কহিল, "এ কি! কেট্! তুমি এখনও বেঁচে আছ?" কেট্ হাসিতে হাসিতে কহিল—"হাঁ ভাই ইভান্স, এখনও আমি বেঁচে আছি, মরি নি! তুমিও যেমন ছেলেগুলির সাহায্যে প্রাণরক্ষা করেছ, আমিও তেমনি মর্‌তে বসেও শুধু এদের জন্যই বেঁচে গেছি।"

ইভান্স্ বহুক্ষণ অনাহারে ছিল, ছেলেরা তাহার খাওয়ার আয়োজন করিয়া দিল। খইয়া-দাইয়া সুস্থ হইলে পর সে ধীরে ধীরে ছেলেদের সমস্ত কাহিনী শুনিয়া লইল এবং নিজের কাহিনীও শুনাইল। জল হইতে উদ্ধার পাইবার পর ওয়াল্‌ষ্টনের দল ইভান্স্‌কে লইয়া দ্বীপের ভিতরে চলিয়া আসে এবং অলীক উপসাগরের তীরে ভাল্লুক পাহাড়ের একটা গুহায় আশ্রয় নেয়। তার পর ভাঙা নৌকাটাকে কোন রকমে ভাসাইয়া দড়ি বাঁধিয়া ঐ গুহার সামনে আনিয়া রাখে।

নৌকার একটা দিক একেবারে গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রপাতি থাকিলে সেটাকে মেরামত করিয়া সমুদ্রযাত্রার উপযোগী করা যাইত, কিন্তু তার অভাবে কিছুই করা যায় নাই।

রঞ্জিৎ কহিল, "আমাদের কাছে কিন্তু সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে।" ইভান্স কহিল—"তোমাদের কাছে যে যন্ত্রপাতি আছে তা ওয়াল্‌ষ্টন্ আগেই জান্‌তে পেরেছে; শুধু তাই নয়, দ্বীপে যে লোকের বাস আছে এবং লোকগুলিই বা কত বড় তাও সে অনেক আগেই জেনেছে।" অশোক ভয়বিহ্বল

কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন ক'রে জান্‌লে?" ইভান্স কহিল—"সে হচ্ছে আট দিন আগেকার কথা; ওয়াল্‌ষ্টনের সঙ্গে আমরা তখন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি; হঠাৎ হ্রদের তীরে একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখে আমরা সকলেই অবাক্ হয়ে গেলাম এবং বুঝ্‌লাম দ্বীপে লোকের বাস আছে। জিনিষটা আর কিছুই নয়, বেতের কাঠামোর উপর লাগানো…" রঞ্জিৎ ইভান্সের কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, "ও, সেটা আমাদের ঘুড়ি; ছিঁড়ে সুশান্তকে নিয়ে হ্রদের জলে গিয়ে প'ড়েছিল।" ইভান্স কহিল, "তাই নাকি? যাই হোক, সেই মুহূর্ত্ত হ'তে ওয়াল্‌ষ্টন্ জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল এই লোকগুলি কে? আর আমিও সেই মুহূর্ত্ত হ'তে মনে মনে সংকল্প কর্‌লাম, এইবার যেমন ক'রেই হোক্ পালাতে হবে। দ্বীপের বাসিন্দারা যদি জঙ্‌লী লোকও হয় তা হলেও পালিয়ে তাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌ব, ঐ খুনে ডাকাতগুলোর চেয়ে তারা আর বিশেষ কিছু খারাপ হবে না। আমার মনের কথা বোধ করি ওয়াল্‌ষ্টন্ বুঝতে পেরেছিল, কারণ সেই দিন থেকে সে আমাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখ্‌ত।

"ওয়াল্‌ষ্টন্ তখন চারিদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ ক'রে দিল। কিন্তু পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজেও কোন লোককে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। দ্বীপের কোনদিকে কোন শব্দও শুন্‌তে পেলাম না।"

সুশান্ত কহিল, "তার কারণ আমরা ফরাসী গুহা থেকে মোটে বেরুতাম না ও মোটে বন্দুক ছুঁড়তাম না।" ইভান্স্ কহিল, "কিন্তু তোমাদের অত সাবধানতা সত্ত্বেও আমরা শীঘ্রই তোমাদের কথা জান্‌তে পেরেছিলাম। তোমরা বোধ হয় একদিন রাত্রিবেলা এক মুহূর্ত্তের জন্য দুয়ার খুলেছিলে; তোমাদের হাতের লণ্ঠনের আলো আমাদের লোকগুলির চোখে পড়ে। পরদিন সকালেই ওয়াল্‌ষ্টন্ নিজে তোমাদের খোঁজ নিতে বেরোয়। কঙ্কণা নদীর ধারে একটা ঝোপের মধ্যে সে সমস্ত দিন লুকিয়ে বসে ছিল.." সুশান্ত তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "তা আমি জানি। অশোক ও আমি সেইখানে একটা তামাক খাবার পাইপ দেখ্‌তে পাই।"

ইভান্স কহিল, "ঠিক ঠিক; তামাক খাবার পাইপটা হারাতে ওয়াল্‌ষ্টনের সে কি রাগ! যাই হোক্, সেই ঝোপের মধ্যে শুয়ে থেকে সে তোমাদের সকলকেই দেখ্‌তে পায়—এক পাল ছেলে নদীর ওপারে ছুটোছুটি করছে দেখে তার খুব আনন্দ হ'ল। তাদের সাতজন লোক অক্লেশেই এ ক'টা ছেলেকে সাবাড় করতে পার্‌বে। ফিরে এসে সে তখন ব্র্যাণ্ডের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে বস্‌ল কেমন ক'রে ছেলেগুলোকে হত্যা ক'রে তাদের ঘর দখল করা যায়!"

রঞ্জিৎ তখন রাগে ফুলিতেছিল, কহিল, "মন্‌ষ্টার্‌স!"

ইভান্স কহিল, "মন্‌ষ্টার্‌স? তা নিশ্চয়ই। তা না হ'লে কি আর শুধু শুধু জাহাজের নিরপরাধ লোকগুলিকে অমন ভাবে হত্যা করে? আর দলের মধ্যে সব চেয়ে পাপিষ্ঠ হচ্ছে এই ওয়াল্‌ষ্টন্; সে

মানুষ নয়, একটা পিশাচ। এমন অমানুষিক ও নিষ্ঠুর কাজ নেই যা সে হাসিমুখে করতে পারে না। তার উপর তার শরীরে অসম্ভব শক্তি। যাক্, তারপর যা বল্‌ছিলাম। আজ সকালে ওয়াল্‌ষ্টন্ দলবল নিয়ে কোথায় তখন বেরুলো, আমাকে সে বসিয়ে রেখে গেল ফর্বস্ ও রকের পাহারায়। ফর্বস ও রক আমায় নিয়ে বনের মধ্যে শিকার করতে বেরুলো। আমায় তারা এমন চোখে চোখে রেখেছিল যে কিছুতেই আমি পালাতে পারি না। তাদের দু'জনকার হাতেই বন্দুক, আমার কোমরে শুধু একটা বড় ছুরি, ছুটে পালাবার চেষ্টা করলেই আমায় তারা গুলি করবে।

"বেলা তখন দশটা, হঠাৎ একপাল গুয়ানাকো আমাদের চোখে পড়ে। তাদের দিকে ওরা দু'জন এগুতেই আমিও বিপরীত দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুট্‌তে আরম্ভ করি। আমায় ছুটে পালাতে দেখে তারা তখনই শিকার ফেলে আমার পিছন পিছন তাড়া করে। আমিও প্রাণপণে বনের ভিতর দিয়ে ছুট্‌তে থাকি, জানি এবার ধরা পড়্‌লে আর রক্ষা নেই। অবশ্য দু' চারবার তারা গুলি করতেও ছাড়ে না, কিন্তু গুলি আমার গায়ে লাগে না। উঃ, কি ছোটাই ছুটেছি আজ সারাদিন!

"ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। ভগবান্ সদয় হলেন। ভীষণ মেঘ করল, সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ল দারুণ ঝড়। রক্ ও ফর্ব্‌স্ তখনও আমার পিছু ছাড়ে নি। আমি বেগতিক দেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, ওরা আমায় দেখতে পায় নি। সাঁতার কেটে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ চম্‌কে ওঠে। সেই আলোতে রক্ ও ফর্বস আমায় দেখতে পেয়ে গুলি ছোঁড়ে। গুলিটা আমার কাঁধ ছুঁয়ে চলে যায়, আমিও চোখের নিমেষে জলের মধ্যে ডুব-সাঁতার কেটে অন্য জায়গায় ভেসে উঠি। তখন আমি শুন্‌তে পাই দু'জনে চীৎকার ক'রে বলাবলি করছে—'বেটার গায়ে গুলি লেগেছে?' —'খুব সম্ভব, দেখ্‌লে না গুলি খেয়ে বেটা তখনই নদীর জলে ডুবে গেল।'—'যাক্ আপদ্ গেছে।" তারা নদীর তীর থেকে ফিরে যায়। আমিও নদী থেকে উঠে তোমাদের গুহার অনুসন্ধান করতে থাকি, কিন্তু যা ভীষণ ঝড়-জল ও অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। সেই সময়ে তোমাদের কুকুরের ডাক শুনতে পাওয়া গেল। সেই শব্দ অনুসরণ ক'রেই গুহার সামনে এসে পড়ি, আর ডাকতে থাকি।"

কাহিনী শেষ করিয়া ইভান্স কহিল, "আজ থেকে আমিও যেমন তোমাদের উপর নির্ভর করব তোমরাও তেমনি আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখ; তোমাদের কোন ভয় নেই।" (ক্রমশঃ)

কবিতা-কণা

আজিকার কাজ আজই কর শেষ, রাখিও না 'কাল করিব' ব'লে,
বিগত দিনের স্মৃতি শুধু জাগে অনুশোচনার অশ্রুজলে।

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

ক্রমশঃ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

সেবার দিন কয়েকের জন্য বাবার বন্ধু চারু বাবুর বাসায় গিয়া উঠিতে হইয়াছিল। নিবান্ধব অবাঙ্গালীর দেশ। তাঁদের বাসায় তখন এক ঠাকুর ছাড়া আর কেউই ছিল না। ঠাকুরের নাম লছমন পাঁড়ে। তার লম্বা টিকি ও চন্দন-তিলকের ঘটা দেখিয়া আমরা ঘাবড়াইয়া গেলাম। ঠিক এমনি ধরণের এক ঠাকুর আমাদের বাড়ীতেও কিছু দিন ছিল। তার শুচিতার ঠেলায় রান্না-ঘরের ত্রি-সীমানায়ও আমাদের যখন তখন যাইবার অধিকার ছিল না।

টাকা দিলে লছমন পাঁড়ে বাজার করিয়া আনে—কাঁচকলা, আলু, পটল, পলতা, উচ্ছে এই সব। মুখ ফুটিয়া মাছ খাইবার কথাটি পর্য্যন্ত বলিতে পারি না—কি জানি, হরিদ্বারের পাণ্ডাদের মত যদি ঠাকুর বলিয়া ফেলে—'বাঙ্গালী লোক মছলী খাতা হ্যায়, বাঙ্গালী ম্লেচ্ছ হ্যায়—'

আমাদের সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার আগের দিন সন্ধ্যায় চারু বাবুর ভাইঝি-জামাই সুধীর বাবু আসিয়া উপস্থিত। ভদ্রলোক খুব মিশুক। শুনিলাম, রান্নাবান্না সম্বন্ধেও তিনি 'এক্সপার্ট'।

নিরামিষ ডাল-তরকারীর কথা শুনিয়া তিনি খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। 'ভালোরে ভাল! ঠাকুরের রুচিমত গৃহস্থের খেতে হবে নাকি?' তারপর আমাদের কাছে ঠাকুরের টিকি ও ফোঁটার বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ, ঠাকুর না রাঁধে আমিই রাঁধব। ঠাকুর যোগাড় দিক্।'

সুধীর বাবু বাজে মাংস পছন্দ করেন না, অতএব মুরগী আসিল।

আমরা সভয়ে চিন্তা করিলাম, আমাদের আর দোষ কি? ঠাকুর যদি রাগ করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া যায়, আমরা তার কি করিব?

মুরগীর পালক ছাড়ানোটা যোগাড় দেওয়ারই একটা অঙ্গ। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করিল, "তৈরী করে দিতে পারবে তো?"

ঠাকুরের মুখ আষাঢ়ের আকাশের মত গম্ভীর। মাথা নাড়িয়া সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

আলু ছাড়ানো, বাটনা বাটা, সমস্ত তৈরী হইলে সুধীর বাবু বলিলেন, "ঠাকুর, মাংসটা উনোনে তুলে দিতে পারবে তো? তা'তে বোধ হয় দোষ নেই?"

ঠাকুর আবার মাথা নাড়িয়া জানাইল—পারিবে।

তারপর সুধীর বাবুর নির্দ্দেশ মত ঠাকুর ঘি-মশলা ইত্যাদি যথারীতি সমস্তই দিয়া মাংস রান্না করিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, “এতই যদি কর্‌লে তো নামানোয় আর দোষ কি ? নামাতে পারবে তো ঠাকুর, ঠিক সময়ে ?”

ঠাকুর জানাইল, পারিবে।

রান্না হইয়া গেল। সুধীর বাবু বলিলেন, “এইবার, ঠাকুর, চামচে দিয়ে বাটিতে বাটিতে একটু ক'রে তুলে দাও—কি বল ?”

ঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমরা একটা আতঙ্কময় ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলাম।

খাইতে বসিয়া দেখিলাম চমৎকার রান্না হইয়াছে।

বাপ্পা বরাবরই একটু বেশী কথা বলে, জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর, আর কোনদিন তুমি মাংস রান্না ক'রেছ ?”

মাথা নাড়িয়া এবার একটু বিনীত ভাবেই ঠাকুর জানাইল, “হ্যাঁ।”

সন্দেহ জাগিল। শেষে বলিয়াই ফেলিলাম, “তুমি কি মাংস খাও নাকি হে ? মানে, এই সব মাংস ?”

ঠাকুর তেমনি মাথা নাড়িয়া অম্লানবদনে জানাইল—“হ্যাঁ, খাই।”

ছোটদের পাতা

জাতকের গল্প

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

একবার কয়েকজন বণিক্ বাণিজ্যের জন্য বারাণসী হইতে যাত্রা করিল। পথে এক মহাপ্রান্তর। বণিকেরা সেখানে দিক্ হারাইয়া তিন চার দিন ধরিয়া ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে জলাভাবে তাহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইল,—খাদ্যাভাবে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। এমন সময় তাহারা দেখিল সামনে একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষ (বটগাছ); তা হইতে বিন্দু-বিন্দু জল ঝরিতেছে। দেখিয়া বণিকেরা গাছটির পূর্ব্বদিকের একটি ডাল কাটিয়া ফেলিল। অমনি তাহা হইতে নির্ম্মল জলধারা বাহির হইতে লাগিল।

প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া ও বহুদিন পরে স্নান করিয়া বণিকেরা বাঁচিল। তখন তাহারা পশ্চিম দিকের একটি ডাল কাটিয়া ফেলিল। এবার তাহা হইতে বাহির হইল নানা রকম উৎকৃষ্ট খাবার। বণিকেরা বহু দিন পরে পেট ভরিয়া খাইল।

তখন তাহারা বলিল—‘উত্তর দিকের একটি ডাল কাটিয়া ফেল।’

উত্তর দিকের ছিন্ন শাখা হইতে বাহির হইল সূক্ষ্ম কাপড়—রাজার যোগ্য বেশভূষা।

তারপর তাহারা দক্ষিণ দিকের একটি শাখাও ছেদন করিল—সেই ডাল হইতে প্রচুর ধনরত্ন পাওয়া গেল। বণিক্‌গণ সেই ধনরত্নে তাহাদের গরুর গাড়ীগুলি পূর্ণ করিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে পঁচিশখানি গাড়ী ছিল—তাহাদের মধ্যে পাঁচখানি ধনরত্নে বোঝাই হইয়া গেল। তখন তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, ‘এই গাছের যদি গোড়া কাটিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে আমাদের বাকী কুড়িখানি গাড়ীও বোধ হয় ধনরত্নে পূর্ণ হইতে পারে।’

বণিক্‌দের যিনি নেতা তিনি বলিলেন, ‘অমন কাজ করিও না। দেখিতেছ না ইহা দেববৃক্ষ ? বৃক্ষে দেবতা বা যক্ষ কেহ না থাকিলে তোমাদিগকে এত সামগ্রী কে দিল ? গোড়া কাটিয়া ফেলিলে বৃক্ষদেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কড়িয়া লইবেন।’

কে শোনে তাঁহার কথা ? সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, ‘না, গাছের গোড়া কাট।’

তাহাই করা হইল। এবার আর ধনরত্ন বাহির হইল না, গাছের গোড়ায় দুই চারিবার কুঠারাঘাত করিবা মাত্র একদল সশস্ত্র নাগ সৈন্য বাহির হইয়া পড়িল, এবং একে একে বণিক্‌দের সকলকেই বধ করিল। কেবল বণিক্‌দের নেতাকে তাহারা কিছু বলিল না, তাঁহাকে ধনরত্ন সহ বারাণসী ধামে পৌছাইয়া দিয়া আসিল।

তৃষ্ণার একটা সীমা থাকা উচিত। উহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিলে শেষে মরণ সুনিশ্চিত। তৃষ্ণাই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, সুখীও করে; মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে তৃষ্ণাই আবার রাক্ষসী মূর্ত্তি ধরিয়া বসে। মানুষও অনবরতই এই বণিক্‌দের মত আচরণ করিতেছে। তাহারা অতিরিক্ত লাভের লোভে কল্পতরুর মূলোচ্ছেদ করে। যাহা হইতে তাহারা বহু কাম্য দ্রব্য লাভ করে—অতিরিক্ত লোভের বশে শেষে তাহারই ধ্বংস সাধন করে।

এই কথাটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বুদ্ধদেব এই জাতক-কথা বিবৃত করিয়াছিলেন।

মনোরঞ্জন-স্মৃতি

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ

দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল, তাঁর সাধের রামধনুকে ফেলে মনোরঞ্জন চলে গেছেন। এ ক' বছরে মাঝে মাঝে তাঁর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু মনোরঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু বলা হয় নি। আজ তারই দু'-চারটে কাহিনী শোনাব।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি আমার মেজমামা। শুধু সেই জন্যই 'ঘনিষ্ঠ' বলছি না, ভাগ্নেদের মধ্যে বোধ হয় আমিই ছিলাম তাঁর সব চেয়ে আদরের।

রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

মনে পড়ে খুব ছেলেবেলার কথা, আমার বয়স তখন বড় জোর সাত কি আট। বিকেল বেলা অভ্যাস মত চাকরদের সঙ্গে পার্কে গেছি খেলতে, হঠাৎ মনে হ'ল হৃষ্টপুষ্ট চেহারার একটি দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক প্রায় এঞ্জিনের বেগে ছুটে আসছেন। মূর্ত্তি কাছে এলে দেখলাম, আর কেউ নয়, স্বয়ং মেজমামা—আমারই খোঁজে ছুটে বেরিয়েছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই এক রকম কাঁধে তুলে নিয়ে আবার তিনি তেমনি বেগে দৌড়ে চললেন। দেখলে কে বলবে ইনি একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সম্পাদক? হতভম্ব আমার কানে একবার শুধু ছোট্ট একটু শব্দ এল "বায়স্কোপ্"। আমাকে সঙ্গে না নিলে (বুঝি আর না বুঝি) তাঁর বায়স্কোপ্ দেখা জম্‌ত না।

তার পর মনে পড়ে ছোটবেলার জন্মদিনগুলির কথা। থাকতাম কলকাতার বাইরে রংপুরে। এই তারিখটিতে বাড়ীতে একটা ছোটখাট উৎসব হ'ত; এ উপলক্ষ্যে মামাবাড়ী থেকে ডাকযোগে কিছু (বলতে লজ্জা নেই) আশাও করতাম। ছোটমামা ছিলেন এ বিষয়ে নির্ভুল। একবার। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকালে পিয়নের হাঁকডাক শোনা গেল—ছোটমামার তরফ থেকে দু' খানি গল্পের বই ঠিক এসে গেছে, কিন্তু মেজমামা! ভুলে গেলেন নাকি? একটু অভিমান যে না হ'ল তা নয়। ঘণ্টা ২।৩ পরে এল এক টেলিগ্রাম—"বই পাঠাচ্ছি, ভুলে দেরী হয়ে গেল—মেজমামা।" বাবা বল্‌লেন, "আচ্ছা পাগল!"

এই জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাড়ীতে "সারপ্রাইজ্ প্রেজেন্ট্ (অবাক্-করা উপহার) দেবার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'ত—বিশেষ ক'রে মেজমামা আর ছোটমামার মধ্যে। যেবার কলকাতায় থাকতাম

ঠিক উৎসব সুরু হবার আগে পর্য্যন্ত কে কি দেবেন কাউকে ঘুণাক্ষরে জানান হ'ত না—ঠিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মতই তা গোপন রাখা হ'ত। মেজমামা দারুণ খরচ করতেন, ৫।৬ রকম জিনিষ এনে একটা কাগজের বাক্সে প্যাক্ ক'রে হাজির করতেন, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক বারই ঠকে যেতেন ছোটমামার কাছে। কারণ ছোটমামা জিনিষ দিতেন প্রায়ই একটি, দামেও অনেক কম, কিন্তু এমন কিছু আজব বা বিশিষ্ট ধরণের যে সকলে বাহবা দিত তাঁকেই বেশী।

প্রত্যেক বছর পূজোর সময় কলকাতা আসতাম। সারা বছর অপেক্ষার পর এটাও যেন ছিল আমাদের একটা উৎসব। প্রায় প্রত্যেক বারই ট্রেনের জানলা থেকে দেখা যেত শিয়ালদ' ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে মেজমামা দাঁড়িয়ে—হাসি ও আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ। বাড়ীতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার আগেই তাঁর চীৎকার সুরু হ'ত—"দেখি দেখি, চম্‌চমের হাঁড়িটা এদিকে!" রংপুরের চম্‌চম্ বিখ্যাত, এবং মেজমামার চম্‌চম-প্রিয়তাও ছিল বিখ্যাত।

মেজমামার এক-একটি প্রশ্ন ছিল উদ্ভট। একদিন খেতে খেতে প্রশ্ন হ'ল, "অরুণ, কি ক'রতে তোর সব চেয়ে ভাল লাগে?" একটু ভেবে বল্‌লাম, "গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে সব চেয়ে বেশী, তার পর বায়স্কোপ্, তার পর ভাল ভাল খাবার খেতে।" আমার রুচির প্রশংসা ক'রে বল্লেন, "কিন্তু খাওয়ার চেয়ে কোনটাতেই বেশী আনন্দ নেই।" পর দিনই তিনি আমার এই তিন তিনটে সাধ মিটিয়েছিলেন।

খেলাধূলায় আমার উৎসাহ ছিল ভীষণ—যদিও নিজে বড় খেলোয়াড় কোন কালেই ছিলাম না। কোন্ খেলায় কে কেমন ওস্তাদ্ এ ছিল আমার কণ্ঠস্থ। এ বিষয়ে মেজমামাই ছিলেন আমার দীক্ষাগুরু। তাঁরই সঙ্গে অতি অল্প বয়সেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে টিল্‌ডেন্, কোশে প্রভৃতি বিখ্যাত টেনিস্ খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিলেত থেকে ফুটবল খেলতে কোরিন্থিয়ান্‌স্ দল এল; টিকেট পাওয়া গেল না। কুছ পরোয়া নেই, মেজমামা ২২জন খেলোয়াড়ের নাম মুখস্থ ক'রে নিলেন, আমাকেও করালেন। তারপর রেডিওর সামনে বসে মেঝেতে খড়ি দিয়ে ছক্ কেটে খেলা শোনা চলতে লাগ্‌ল। রেডিওতে খেলার বিবরণ বলে যাচ্ছে, মেজমামা মেঝের ছকে আঙ্গুল বুলিয়ে খেলা দেখার মতই উত্তেজিত ভাবে তা উপভোগ করছেন।

অষ্ট্রেলিয়া থেকে এল ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল, মেজমামার সঙ্গে হাজির হলাম ইডেন গার্ডেন্‌এ সে খেলা দেখতে। গ্যালারীতে বসে তাঁর সে কি চীৎকার!—অক্সেনহ্যাম্‌কে Ox-hen-ham ব'লে ছেলেমানুষের মত ডাক! বিকেল চারটের সময় একটু ঠাণ্ডা পড়্‌ল, বল্লেন, "দে, আমার শালটা দে দেখি?" আমি তো চোখে অন্ধকার দেখলাম। দামী শাল, আমারই জিম্মায় সেটা এতক্ষণ ছিল, কোথায় ফেলেছি না কে তুলে নিয়েছে কে জানে! কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু দোষটা যেন আমার নয়, ওঁরই। আমাকে একটা মৃদু ধমকও দিলেন না, বল্লেন, "গেছে গেছে,

বাড়ীতে কাউকে না বল্লেই হ'ল!" বাবা সঙ্গে ছিলেন, অত লোকের মধ্যে আমার কান মলে দিলেন। মেজমামার মুখ দেখে মনে হ'ল সে লজ্জাটা যেন তাঁকেই দেওয়া হ'ল।

নতুন কলেজে উঠেছি। কাকার বাসা থেকে এক শনিবার খেলা দেখে গেলাম মামাবাড়ী। সিঁড়িতে মেজমামার সঙ্গে দেখা, বল্লেন, "খেলা দেখা হ'ল বুঝি? নতুন কলেজে উঠতে না উঠতেই এ সব বাঁদরামি আর স্বাধীনতা!" ভায়নক চটে গেলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য, পরের শনিবার আবার দেখা হ'তেই বল্লেন, "কিরে, খেলা-টেলা দেখিস তো? আজ গেলি না কেন? পয়সা জমাচ্ছিস? হুঁ, লায়েক হয়েছ!" তারপর ড্রয়ার খুলে গোটা কয়েক টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লেন, "এই নে, খেলা দেখবি, বুঝলি?" হতভম্বের মত বল্লাম, "হ্যাঁ।" মনে মনে বল্‌লাম, "বোঝা দায়!"

মেট্রো সিনেমা সবে খুলেছে। মেজমামা হন্তদন্ত হয়ে বল্লেন, "দেখ, এই ৩০পাতা টুকে দে তো, বায়স্কোপ্ দেখাব।" ঝট্‌পট্ দিলাম টুকে; কল্পনার নেত্রে ভাসতে লাগ্‌ল ভবানীপুরের কোন একটা ছোটখাট চিত্র-গৃহ। সন্ধ্যার পর মেজমামার উচ্চ চীৎকার,—"অরুণ, খেয়ে নে শীগ্‌গির।" আধঘণ্টা পরে লক্ষ্য করলাম মেজমামা ও তাঁর বন্ধু সুলেখক চারু চক্রবর্ত্তী মশায়ের পাশে মেট্রোর একটা তুলতুলে সীটের গদীর মধ্যে ঢুকে টলষ্টয়ের বই দেখছি।

ছাদের উপর মেজমামার হাতে ব্যাট্, আমার হাতে রবারের বল্। কোথায় লাগে টেষ্ট্ ম্যাচ্? একদিন কলেজে ছাত্র বনাম অধ্যাপকদের ম্যাচে অধ্যাপকদের হয়ে সেঞ্চুরি ক'রে এসে আমার হাতে এক বলে আউট্! সমস্ত গর্ব্ব যেন এক মিনিটে মুছে গেল। বাড়ীতে টেবিল্ টেনিস্ টুর্ণামেণ্ট,—ফাইনাল্ খেলা। সে কি উত্তেজনা! একদিকে বিখ্যাত অধ্যাপক ও সম্পাদক মনোরঞ্জন আর একদিকে ক্ষীণকায় আমি। অপর দুই দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছোটমামা ও রামচন্দ্র সেমিফাইনালেই কাৎ হয়েছেন। বার বার ডিউস্ হচ্ছে—গেমের পর গেম্ এগিয়ে চলেছে। অবশেষে অধ্যাপককেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। খেলায় হেরে গেলে তিনি ভীষণ গম্ভীর হয়ে যেতেন। ঠিক সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ছোট ভাই তরুণ ফেল্‌ল হেসে। হঠাৎ মেজমামার হাতের এক চড় এসে পড়্‌ল। ভ্রাতৃবরের মুখের পরিবর্ত্তন ভাল ক'রে দেখবার আগেই দেখি মেজমামা তাকে পাঁজা কোলে করে ওপরে নিয়ে যাচ্ছেন। যখন ফির্‌ল, তার মুখের ভাব একদম বদলে গেছে। মেজমামা তাকে লজেঞ্চুষের নাম করে একটি চক্‌চকে রৌপ্যখণ্ড ঘুষ দিয়েছেন। মনে মনে ভাবলাম "আহা, আমি যদি হাসতাম!" এমন লোককে রাগিয়েও সুখ।

বায়স্কোপ দেখা আমাদের বরাতে হামেশাই জুট্‌ত—কারণ মেজমামার কাছে প্রায়ই নানা কার্য্যের পুরস্কার ছিল বায়স্কোপ্ দেখান। তা ছাড়া যখন তখন অতর্কিতে এসে পেছন থেকে নাকে নস্যি গুঁজে দেওয়া তাঁর ছিল মস্ত আমোদ। বাচ্চা ছেলেরা কেউ এ নিয়ে কান্নাকাটি করলে তাও থামান হ'ত বায়স্কোপের লোভ দেখিয়ে। তবে আজে বাজে ছবি দেখবার উপায় ছিল না—বাছা

বাছা ছবি—বেশীর ভাগই বন-জঙ্গলের বা কোন বিখ্যাত বইএর ছবি, এই সবই দেখতে পেতাম। উঃ, কি ভালই না লাগ্‌ত!

মনোরঞ্জন ছিলেন রিপন্ কলেজের অধ্যাপক। কি ভীষণ টান ছিল তাঁর ঐ কলেজের উপর! কেউ তার বিরুদ্ধে কিছু বল্‌লে ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। রিপন্ কলেজের ছাত্রদের উপর ছিল তাঁর সত্যিকার স্নেহ। বাড়ীতে ছাত্রেরা এলে কত খুসী! পুরোনো দিনের ছাত্র ও শিক্ষকের সেই মধুর সম্পর্ক তিনি বজায় রেখেছিলেন এমন একটি যুগে যখন বেশীর ভাগ জায়গায়ই সে জিনিষটার অভাব লক্ষ্য করা যেত।

কোনও গল্প বা ছোটদের ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস লিখবার সময় তিনি হয়ে যেতেন অন্য মানুষ। অন্ধকার ছাদে ক্রমাগত বন্ বন্ করে ঘুরতেন কিংবা ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবতেন। কোন গল্প একবারে লিখতে পারতেন না—এক একটি ছোটগল্প লেখা শেষ করতেও অনেক সময় তাঁর মাস খানেক সময় লেগে যেত। সোনার হরিণ বইটা লিখবার সময় একবার আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বল্ তো আসল দোষীটি কে?" আমি গোড়ায় ভুল বল্‌লাম, উনি ভীষণ খুসী হয়ে উঠলেন। তারপর আমি ওঁকে জব্দ করবার জন্য প্রায় অসম্ভব জেনেও মিঃ বাসুর নাম করে বসলাম। উনি মুখে বললেন বটে 'ধ্যেৎ', কিন্তু মনে হ'ল ওঁর সারা মুখে কে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিয়েছে। এতদিনের পরিশ্রম যেন একেবারে জলে গেছে।

ওঁর আর একটা অভ্যাস ছিল অনর্গল রবীন্দ্রনাথ বা কালিদাস আবৃত্তি ক'রে যাওয়া। অর্থনীতির অধ্যাপক যে এ ভাবে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ বা মেঘদূত আওড়াতে পারে তা ভাবলে এখন নিজেদের স্মরণ-শক্তির উপর বিশেষ উঁচু ধারণা হয় না।

ওঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে লম্বা পথ তাড়াতাড়ি পার হ'তে হ'লে "আবোল তাবোলের" খুড়োর কলের মত একটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা ছিল। আর কিছু না—রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র সেই লাইন দু'টি—"যাও ঠা-কুর চৈতন চুটকী নিয়া, এস দা-ড়ি নাড়ি কলিমদ্দী মিঞা" ক্রমাগত আওড়াতে আওড়াতে তালে তালে পা ফেলতে হ'ত। ক্রমশঃ এই লাইন দু'টি তাড়াতাড়ি—আরো তাড়াতাড়ি বলতে হ'ত—সে এক অপূর্ব্ব আনন্দ! এ ভাবে কত বার যে লম্বা লম্বা পথ বিদ্যুৎ-গতিতে পাড়ি দিয়েছি তার ঠিক নেই।

শেষ যেদিন দেখা হয় সেদিন প্রায় চার ঘণ্টা আমাকে কলেজের গল্প বললেন। কবে কোথায় ক্লাশে একটা শব্দ হওয়ায় নাকি উনি ছেলেদের খুব বকেছিলেন। ছেলেরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্লাশের পর জানাল যে শব্দটা ক্লাশের কেউ করে নি—ওটা বাইরের শব্দ। তখন তাঁর কি মনস্তাপটাই না হয়েছিল! ঐ একদিন ছাড়া তিনি নাকি ক্লাশে, দীর্ঘ ১২ বছরের মধ্যে আর কোন দিন উপদ্রব বোধ করেন নি।

"চাকরী করা হয়রাণি"

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

বিজনপুর গ্রাম, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ষ্টেশনের পাঁচীলের উপর বসে গ্রামের কতকগুলি কুড়ি-বাইশ বৎসরের যুবক বেশ গল্পের আসর জমিয়েছে। সন্ধ্যার ট্রেন্‌টা এসে পৌছাল। ওরা একবার মাত্র ট্রেন্‌টার দিকে তাকিয়ে আবার যেমন গল্প করছিল তেমনই গল্প করে চল্‌ল। একটু পরেই ওদের মধ্যে থেকে একজন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"আরে, নিবারণ যে! কি আশ্চর্য্য!"

তাদের গল্প হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। ওরা সবাই এগিয়ে এল ট্রেন্‌টার দিকে। সত্যিই। নিবারণও তখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে ট্রেন্ থেকে নেমে।

বুধবার আজ—তবে নিবারণ এল কি ক'রে? অফিস কামাই করবে নাকি কাল? না রাত চারটের ট্রেনে চলে যাবে আবার কলকাতায়? এল কেন? বিশেষ কোন কাজ—না অসুখ-বিসুখ—?

নিবারণ এতক্ষণে একেবারে ওদের কাছে এসে পড়েছে কিংবা ওরাই নিবারণের কাছে এগিয়ে গেছে; যাই হোক, দুই পক্ষ তখন সামনা সামনি। এরা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই নিবারণ ওদের সমস্ত ঔৎসুক্য মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বল্‌লে—'চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম।'

কথাটা শুনে সকলে প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গেল—কেউ কথা বল্‌তে পারল না একটীও। শেষে মনে হ'ল, হয়ত নিবারণ ঠাট্টা করছে। কিন্তু না, ঠাট্টা ত' নয়—নিবারণ ত' বেশ গম্ভীর ভাবেই বল্‌ল কথাটা—আর ওর মুখে-চোখে ত' কোথাও ঠাট্টার চিহ্নের লেশ মাত্র নেই! তবে?

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল সবাই। নিবারণ নিজের ইচ্ছায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে এল! ও প্রাণ ছাড়তে পারে কিন্তু চাকরী ছাড়তে পারে না যে! গাঁয়ে ত' ওর খাওয়া-পরার অভাব ছিল না খুব—তবুও কলকাতার অফিসে চাকরী করার ওর একটা দুর্দ্দান্ত কামনা চিরকাল। পাকা তিনটী বছর ধরে চেষ্টা করার পর ও যেদিন চাকরী পেল একটা মার্চ্চেণ্ট-অফিসে—সে দিন ওর আশপাশে দাঁড়ান শক্ত হয়ে উঠেছিল অন্য লোকের পক্ষে। সুট্ পরে ও যেদিন উঠ্‌ল ট্রেনে সেদিন ওকে যারা দেখেছিল তা'রা জীবনে আর কোনও দিন ভুলবে না ওকে। মনে হ'ল—ওই বা কে আর হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ই বা কে?

সেই চাকরী ছেড়ে সে চলে এল আজ হঠাৎ!

নিবারণ যেন আর সে নিবারণ নেই, মহা মুষড়ে পড়েছে একেবারে! বল্‌লে, 'চাকরী ছাড়লাম বাধ্য হয়ে, মানে, কোন মানুষের সাধ্য নয় অফিসে—বিশেষতঃ মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকরী

করা। বল্‌বে, অজস্র লোক ত' করছে। হঁ্যা, করছে; তবে যারা করছে তারা হয় দেবতা না হয় পিশাচ।

'ভাবতে পারিস তোরা, সকালে ৮টায় রোজ ভাত খেতে বস্‌ছিস্—এক আধদিন নয়, রোজ? তারপর সাড়ে আটটার মধ্যে ট্রামের ধারে এসে ট্রামে উঠবার জন্য মারামারি। সে ভীড় তোরা কল্পনা করতে পারবি না! অর্দ্ধেক লোক যায় ট্রামের ভিতর, অর্দ্ধেক যায় বাইরে!

'এ দেহটার কথা ছেড়ে দে—এর না হয় কোনও দাম নেই, কিন্তু জামা-কাপড়, জুতো এ সবের দাম আজকালকার দিনে ভাব্ ত'? সেদিন একটা নতুন জুতো কিনে সেটা পরে অফিসে গেলাম। ফিরলাম যখন তখন দেখি একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিংবা সেকেণ্ড ফুট্‌ও বল্‌তে পারিস—জুতো পরে বাড়ী এসেছি। চিরকাল লোকেরা জুতো মেরে চেহারা বদ্‌লে দেয় শুনেছি, কিন্তু, দেহ দিয়ে মাড়িয়ে যে জুতোর চেহারা লোকে এ রকম বিগ্‌ড়ে দিতে পারে তা জানতাম না। একদিন দেখি কণ্ডাক্‌টারের সঙ্গে ফুট্‌বোর্ডের কাছে দণ্ডায়মান একটী ছোকরার তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে। কণ্ডাক্‌টার চায় ভাড়া, সে ছোকরাও দেবে না। কণ্ডাক্‌টার বল্‌লে—'ভাড়া দিন না মশাই?' লোকটী বল্‌লে—'ভাড়া দেব কেন?' কণ্ডাক্‌টার চটে উঠে বল্‌লে—'বাঃ, ভাড়া দেবেন না? ট্রামে চড়ে যাচ্ছেন, ট্রামের ভাড়া দেবেন না?' ছোকরাও একটু তেতে গিয়ে বল্‌ল—'ট্রামে চড়ে যাচ্ছি মানে? ভাড়া যদি দিতেই হয় তা' হ'লে এই ভদ্রলোককে দেব'—ব'লে সামনের একটী বিপুলাকায় ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিল।

'সবাই তাকাল তার দিকে, তার এই বিস্ময়কর উক্তিতে। সে বল্‌ল, 'বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা কর এই ভদ্রলোককে। কালীঘাট থেকে আস্‌ছি ওঁর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে এবং ওঁরই কোমরটী দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে। ভাড়া দিতে হয় ওঁকেই দেব।"

একটু থেমে নিবারণ বল্‌লে—'এই অবস্থায় যখন অফিসে এসে পৌঁছাই তখন দেখি দু'মিনিট দেরী হয়ে গেছে। নামটী আমার রক্ত-চিহ্ন বুকে ধারণ ক'রে হাজির হয়েছে সাহেবের কাছে। বড়বাবুর কাছে তাড়া খেয়ে কাজে বসি—ঘরে ফিরতে কত দিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। সবই সহ্য ক'রে কাজ করছিলাম, কিন্তু সেদিন যে ব্যাপার ঘটল তাতে আর কাজ করার সাহস হ'ল না।'

ব্যাপারটা জানবার জন্য সকলেই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। নিবারণ বল্‌তে লাগ্‌ল: 'আমাদের অফিসে কাজ করতেন হরিহর বাবু। কী খাটুনিটা খাটতেন ভদ্রলোক! বিশ বৎসর একটানা কাজ ক'রে এসেছেন এ অফিসে। সেই হরিহর বাবু একদিন অফিসে এলেন, শুনলাম ওঁর শরীরটা খারাপ—সর্দ্দি, কাশি ও তার সঙ্গে একটু জ্বর। ভদ্রলোক সেই রকম শরীর খারাপ নিয়েই দু'দিন অফিস করলেন, তার পর আর পারলেন না—ছুটী নিতে বাধ্য হলেন। একদিন যায়, দু'দিন যায়—হরিহর বাবু আসেন না। বুঝলাম শরীরটা একটু বেশীই খারাপ হয়েছে।

ক্রমশঃ বারো দিন কেটে গেল। সেদিনও হরিহর বাবু এলেন না! সাড়ে ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবু, যে ক'জনের নামসই নেই খাতায় তাদের নাম ধরে, যেমন রোজ ডাকেন সেদিনও তেমনি ডাকছিলেন। হরিহর বাবুর নামের কাছে এসে ডাকলেন—"হরিহর ভট্টাচার্য্য?" সবাই জানে, ভদ্রলোক আজ বারো দিন হ'ল আসেন নি, কাজেই ওঁর নামটা শুধু ডাকার জন্যই ডাকা। কিন্তু আশ্চর্য্য! মহা আশ্চর্য্য! হরিহর বাবুর নামটা ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর দিল—"ইয়েস স্যর্।"

'সকলে অবাক হয়ে গেল। কেউ কি চালাকী করছে? উঁহু, বড়বাবুর সঙ্গে রসিকতা করার মত দুঃসাহস আমাদের অফিসে কারো ছিল না। বড়বাবু খাতা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, উত্তর শুনে আর একবার ডাকলেন ''হরিহর ভট্টাচার্য্য?" আবার সেই উত্তর—"ইয়েস্ স্যর।"

'বড়বাবু গুরুগম্ভীর গলায় বল্লেন—'কে মিথ্যা রসিকতা করছে?' উত্তর এল—'রসিকতা নয়, সত্যিই স্যর, আমি এসেছি।'

'বড়বাবু চারিদিক্‌টায় একবার তাকিয়ে নিয়ে বল্‌লেন—'এসেছেন ত' কোথায় আপনি?' উত্তর এল—'আজ্ঞে, গাছের উপরে। এই যে বেল গাছে।' সবাই চমকে উঠ্‌লাম ভয়ে। বড়বাবুর গলার স্বর নেমে এসেছে ততক্ষণ। তবুও বল্‌লেন, 'গাছের উপর কেন?'

'উত্তর এল—'আজ্ঞে, পরশু রাত্রে আমি মারা গেছি; আমার 'ক্যাজুয়াল্ লীভ্' ফুরিয়ে গেল আজ, আর ত' ছুটী পাওনা নেই, তাই ছুটে এসেছি। ভেতরে যাওয়া সম্ভব নয় ব'লে গাছে বসে আছি—দয়া ক'রে আমাকে প্রেজেন্ট্ মার্ক করবেন—স্যর!'

'সাহস সঞ্চয় ক'রে বড়বাবু বল্‌লেন—'মারাই যখন গেছেন তখন ক্যাজুয়াল্ লীভ ফুরিয়ে গেলেই বা?'—উত্তর এল—'আজ্ঞে, ওটা অভ্যাস। ক্যাজুয়াল্ লীভ্ ফুরিয়ে গেলে আর কামাই করতে পারি কি? মারা গেলেও আস্‌তে হবে বৈকি! দয়া ক'রে প্রেজেন্ট মার্ক করবেন স্যর!' ক্যাজুয়াল্ লীভ্ হচ্ছে হঠাৎ দরকারের জন্য প্রতি বছর যে ছুটী বরাদ্দ থাকে। বেশী নয়, কোন অফিসে দশ দিন, কোথাও বা বারো দিন। কিন্তু জিনিষটা চাকুরের জীবনে যে কি মূল্যবান্ সম্পদ্ তা তারাই জানে।'

একটু থেমে নিবারণ বললে—'আর মুহূর্ত্ত মাত্র নয়। তৎক্ষণাৎ অফিস থেকে বার হয়ে সোজা ষ্টেশনের দিকে। চাকরীর পায়ে প্রণাম, আর নয় ও পথে।'

নিবারণ গল্পটা শেষ করতে সকলে চীৎকার ক'রে হেসে উঠ্‌ল। সমরেশ বল্‌ল,—'হাউ বোগাস্!'

নিবারণ কিন্তু ওদের হাসিতে ঠিক যোগ দিতে পারল না—হয়ত' খানিকটা সত্য কোথাও ছিল ওর গল্পের মধ্যে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা)

ঘুমপাড়ানী গান

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

মশলা-বন, ধানের ক্ষেত, পদ্ম ভরা নদীর উপর দিয়ে
এলাম আমি তোমার তরে শিশির-ধোয়া একটী স্বপন নিয়ে।
জোনাকীরা আনন্দে বিহ্বল
নিম গাছের ঐ ডালে ডালে মিশে,
খেলছে যেন একটী পরীর দল
নূতন ধানের কচি শ্যামল শীষে।
ছোট্ট খোকা, বন্ধ কর আঁখি
মদিরভরা আফিং পাতা হ'তে,
চুরি ক'রে ছোট্ট স্বপনখানি
এনেছি আজ দখিন্ বায়ু-স্রোতে।
তারকা দল তোমার চারিদিকে,
ছড়ায় আলো, আর কি তোমার চাই?
দিলাম চুমা ছোট্ট স্বপন রেখে,
প্রিয় শিশু, বিদায় দেহ, যাই।*

*শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর "Cradle Song"এর অনুবাদ।

প্যাণ্টেলারিয়া ও ল্যাম্পেডুসা নামে ইটালীর অধীন দু'টি দ্বীপ দখল করার পর মিত্র পক্ষ সম্প্রতি তাদের বিখ্যাত সিসিলি দ্বীপ আক্রমণ করেছে এবং দ্বীপের অনেকখানি অংশ দখলও ক'রে ফেলেছে। এক্সিস্ পক্ষ প্রাণপণে বাধা দিয়েও তাদের আটকে রাখতে পারছে না। ওদিকে জার্ম্মান্‌রা আবার নতুন ক'রে রাশিয়ার কুরস্ক, বিয়েলগোরদ প্রভৃতি অঞ্চলে আক্রমণ সুরু করে, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে নি, রুশরা বীরবিক্রমে তাদের হঠিয়ে দিচ্ছে। আর ওরেল অঞ্চলে তো রুশরাই জার্ম্মান্‌দের ওপর প্রবল আক্রমণ চালাচ্ছে। যুদ্ধ সমানে চলছে।

* * *

'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স ৭৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় নানা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিক সঙ্ঘ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছে। আমরাও রামধনুর পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। রামধনুর পুরানো গ্রাহকেরা রামধনুতেও তাঁর লেখা পড়ে থাকবে। রামানন্দ বাবু তাঁর দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন সংবাদ পত্রের সেবায় উৎসর্গ করেছেন,—এদিক্ দিয়ে তাঁর সমকক্ষ লোক এদেশে খুব বেশী নেই। সম্প্রতি তিনি অসুস্থ, ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

* * *

কলকাতার ফুটবল্ লীগ্ শেষ হয়ে গেল। তোমরা শুনে সুখী হবে এবার প্রথম বিভাগের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে জনপ্রিয় মোহন বাগান দল, এবং খুব সম্ভবতঃ লীগ্ বিজয়ের গৌরব এবার তারাই পাবে। খুব সম্ভবতঃ বলছি এই জন্য যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্ট বেঙ্গল দল শেষ খেলায় কাষ্টম্‌স্‌এর কাছে পরাজিত হয়ে ঐ দলের একটি খেলোয়াড়ের খেলার যোগ্যতা ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে আই-এফ্-এ'র কাছে অভিযোগ জানিয়েছে, আই-এফ্-এ কর্তৃপক্ষ এখনও এ বিষয়ে কোন 'রায়' দেন নি। আই-এফ্-এ যদি সে অভিযোগ মেনে নিয়ে ইষ্ট বেঙ্গলকে আবার কাষ্টম্‌স্‌এর সঙ্গে খেলবার নির্দ্দেশ দেন তবেই মোহন বাগানকে 'চ্যাম্পিয়ান্‌শিপ্' নিয়ে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হ'তে পারে। নচেৎ মোহন বাগানই হবে এবারের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্, এবং এই নিয়ে তারা দ্বিতীয় বার এই সম্মান পাবে। ১৯৩৯এ তারা আর একবার লীগ্ চ্যাম্পিয়ান্ হয়েছিল। মোহন বাগান ২৪টা খেলায় মোট ৩৯ পয়েণ্ট পেয়েছে। ২য় স্থান অধিকারী ইষ্ট বেঙ্গল দলের হয়েছে ৩৭ পয়েণ্ট। শেষ তিন তিনটে খেলায়ই পর পর খারাপ না করলে ইষ্ট বেঙ্গল দলেরও এবার লীগ্ বিজয়ী হবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। অন্যান্য দলের মধ্যে ভবানীপুর (৩৪) ৩য় হয়েছে। বিখ্যাত মহমেডান্ স্পোর্টিং এবার তেমন সুবিধা করতে পারে নি—মাত্র ২৮ পয়েণ্ট পেয়েছে। তালিকার সব চেয়ে নীচে রয়েছে ডালহৌসী দল। তারা মাত্র ১১ পয়েণ্ট পেয়েছে।

চিত্রশালা

দু'টি অদ্ভুত জীব

কলির 'মৎস্যকুমারী'

এই অদ্ভুত মাছ সমুদ্রে থাকে। এদের হঠাৎ দেখলে রূপকথার সেই মৎস্যকুমারীদের কথা মনে পড়ে। আকারেও এরা প্রায় মানুষেরই মত।

উড়ুক্কু ব্যাঙ

এরা আমাদের ব্যাঙেরই জাত ভাই, কিন্তু পায়ের পাতা একটু অদ্ভুত হওয়ায় তারই জোরে ঠিক উড়বার মত ক'রেই বহুদূরে যেতে পারে।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(প্রশ্ন আষাঢ় সংখ্যায় দেখ।)

(১) শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ের দশটি নাম আছে, এগুলি তার ৩টি।

(২) রয়টার—সংবাদ সংগ্রাহক কোম্পানী, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এদের কাজ হয়; ইয়েন্—জাপানী মুদ্রা (যুদ্ধের আগে অমাদের হিসাবে বারো আনার কিছু বেশী ছিল); রবট্—কলের মানুষ, এদের দিয়ে ইচ্ছেমত বিশেষ বিশেষ কাজ করান যায় ; শুক্তি—ঝিনুক—যার মধ্যে মুক্তো থাকে ; সিঙ্কোনা—এক রকম গাছ, এর ছাল থেকে কুইনাইন্ তৈরী হয় ; কথাকলি—মাদ্রাজ অঞ্চলের একরকম নাচ ; ক্লোরোফিল্—গাছের পাতার সবুজ অংশ।

(৩) ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মেরি য়্যান্ ইভান্স, রাজশেখর বসু, জর্জ্জ বার্নার্ড্ শ', মার্গারেট্-ই নোবল্, গদাধর চট্টোপাধ্যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১ = টাই, ২ = মানা, ৩ = সই, ৪ = ডাক, ৫ = চড়াই, ৬ = গলি।

উত্তরদাতাদের নাম

শ্যামল ও বিমলচন্দ্র দত্ত (শ্রীখণ্ড); লীলা, অশোক, অমিয়, প্রভাত (বাঁকুড়া); অরুণ, পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না, বৌদি; মীরা, কাকা, কাকীমা, অশোককুমার দত্ত (বহরমপুর); সুপ্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মোহনলাল আগরওয়ালা (পাবনা); ইলা রায় (নিউদিল্লী); রাবেয়া খাতুন (কলিকাতা); শ্রীমন্ত বসু (এলাহাবাদ); সরোজকুমার রায় (বন্দবিলা); চণ্ডী, জবা, কুন্দ, ছন্দা (ধানবাদ)।

জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৩৫০) ধাঁধার উত্তর

চা :—চাবি, চাদর, চাটাই, চাকা, চাটনী, কাঁচা, চাণক্য, চাষা, চাকরী, বিচার।

(এই উত্তরটি ভুলক্রমে আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নি।)

নূতন ধাঁধা

হেঁয়ালী

(১) ইংরেজী রাস্তার আগে মানুষ দাঁড় করিয়ে দিলে কোথায় হাজির হবে?

(২) বিহার প্রদেশের কোন্ সহরকে ছোট একটা অঙ্গ যুড়ে আর এক প্রদেশে আনা যায়?

(৩) কোন্ বিখ্যাত যমজ ভাই একটি প্রাচীন ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে পাহাড় হয়ে গেছেন?

(৪) বাংলার কোন্ গাছ না থাকলে বিহারে পাওয়া যাবে?

(৫) ভাল স্বর্গের বাগান কোথায় মিলবে?

(২০শে শ্রাবণের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।)

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ (উপন্যাস) ... ১৷০

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস ১৷০

নূতন পুরাণ
নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প ৸০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
গল্পসল্প ৷০ ছুটীর গল্প ৷০

মাঠব্য ও রসোদর শর্ম্মার
আজব গল্প ৷৴০ অনেক গল্প ৷৴০

হাস্য ও রহস্য (গল্প) ... ৸০

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় নং)
অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ॥৵০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)
পাতায় পাতায় হাসি — ৸০

* * *

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
দিগ্বিজয়ী বীর ... ॥৵০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

—ন তু ন ব ই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

দাম বারো আনা।

ছোটদের উপহারের আর কয়েকখানি ভাল ভাল বই

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প

মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির"

কয়েকটি ডিটেকটিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম. এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সরস মজাদার হাসির গল্প ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১॥৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং (গল্প) ... ॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৵০

কলকাতার হালচাল ... ১৲

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু (গল্প) ... ৸০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আবিষ্কারের গল্প ... ॥৵০

আকাশের গল্প ... ৸৶০

জন্মদিনের উপহার (গল্প) ॥৶০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—চিঠি লিখিলে ভি. পি.তেও বই পাঠান হয়। বেশী টাকার বই লইলে অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়। মফঃস্বলের ক্রেতাগণ স্থানীয় দোকানে আমাদের প্রকাশিত বই সংগ্রহ করিতে না পারিলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সহরের ও সেখানকার পুস্তক ব্যবসায়ীদের—বিশেষ করিয়া বাংলা পুস্তক বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইলে আমরা সাধ্যমত এ অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিব।

রামধনু

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

৬শ বর্ষ
সংখ্যা
ভাদ্র
১৩৫০

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১॥৵০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

Regd. No. C—1641

—ন তু ন ’ব ই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

দাম বারো আনা।

ছোটদের উপহারের আর কয়েকখানি ভাল ভাল বই

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
হুকাকাশির গল্প
মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির"
কয়েকটি ডিটেকটিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম. এ প্রণীত
বদ্যিনাথের বড়ি
সরস মজাদার হাসির গল্প ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১॥৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং (গল্প) ... ॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৵০
কলকাতার হালচাল ... ১৲

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
নতুন কিছু (গল্প) ... ৸০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
আবিষ্কারের গল্প ... ॥৵০
আকাশের গল্প ... ৸৵০
জন্মদিনের উপহার (গল্প) ॥৵০
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন
(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা
(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—চিঠি লিখিলে ভি. পি. তেও বই পাঠান হয়। বেশী টাকার বই লইলে অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়। মফঃস্বলের ক্রেতাগণ স্থানীয় দোকানে আমাদের প্রকাশিত বই সংগ্রহ করিতে না পারিলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সহরের ও সেখানকার পুস্তক ব্যবসায়ীদের—বিশেষ করিয়া বাংলা পুস্তক বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইলে আমরা সাধ্যমত এ অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিব।

রামধনু

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

...শ বর্ষ
... সংখ্যা
ভাদ্র
১৩৫০

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১॥৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSU[RE]

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের
ভারত অয়েল মিল
ঘানির তেল
ব্যবহার করুন
২৪৩ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা
২৭৭৪ বড়বাজার

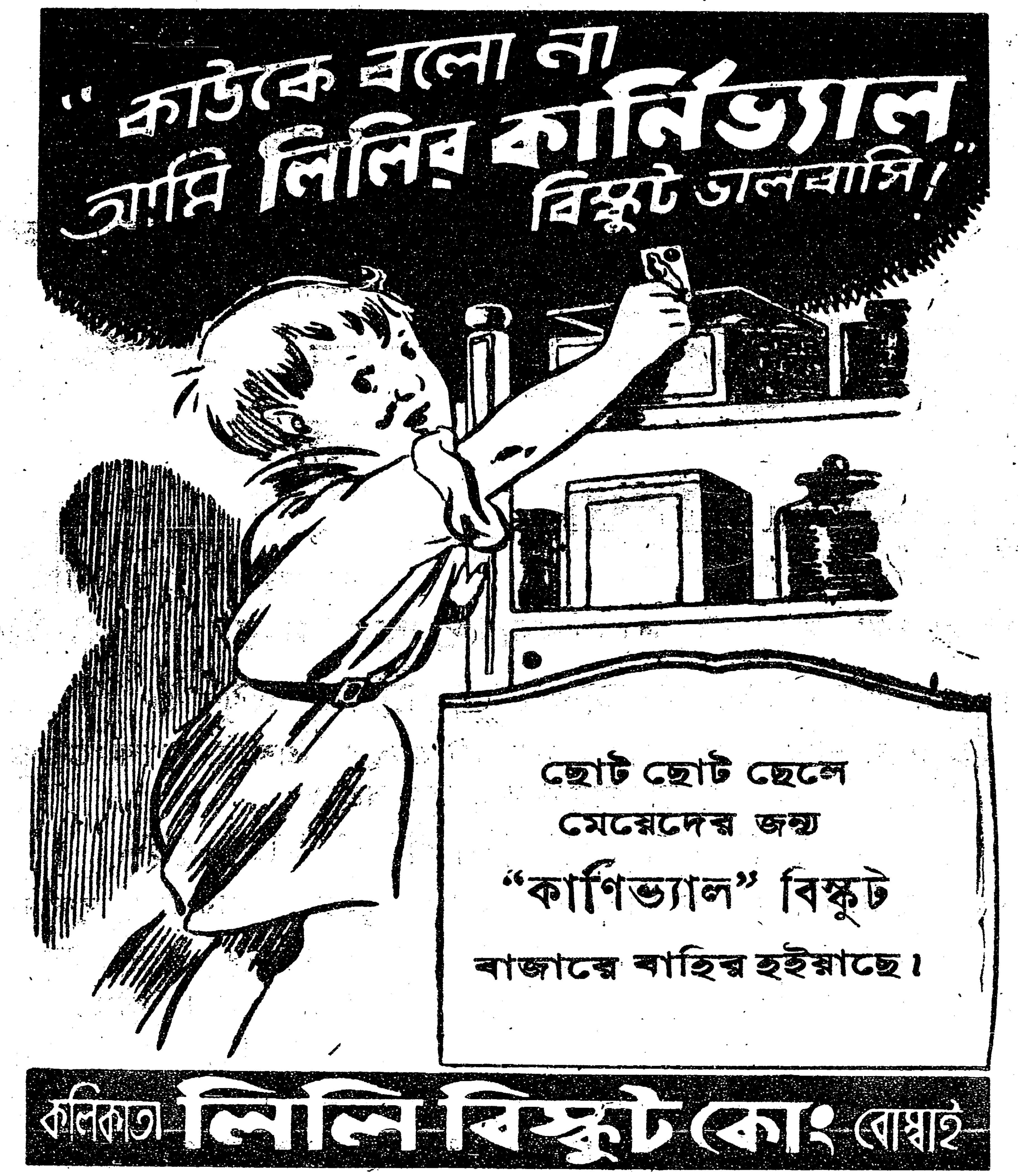

" কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি।"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

শারদীয়া পূজায়

ছেলেমেয়েদের চাঁদমুখে হাসি
ফুটাইতে উপহারের
অপূর্ব সমারোহ !

ছবি-ঝলমলে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
আনন্দ-বার্ষিকী

রূপ-রেখা

রূপ-রেখা

সম্পাদক—রেডিও'র 'দাদুমণি'
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ছবি, গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গচিত্র, প্রবন্ধ, রস-রচনা, আমোদ-প্রমোদ, হাসি ইত্যাদি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার !

তিনশত পৃষ্ঠারও উপরে বিরাট গ্রন্থ ! এবার আকারেও
পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃহৎ !

'রূপ-রেখার' সমৃদ্ধি-সম্পাদন করিয়াছেন

ডাঃ অবনীন্দ্র ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বেগম সামসুন নাহার, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সুনির্ম্মল বসু, গোলাম মোস্তাফা, অখিল নিয়োগী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক প্রভৃতি।

কাগজের এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও মূল্য দুই টাকা মাত্র।

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

১৬শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৫০ { ৫ম সংখ্যা

জোনাক্-পরী ডাক দিয়ে যায় কা'রে

শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়

জ্যোছ্না-আঁচল দুলিয়ে বারে বারে
জোনাক্-পরী ডাক দিয়ে যায় কা'রে !
আঁধার ঢাকা বিজন পথ নাইক' বুঝি শেষ,
তাহার পানে অচিন্ দেশের পারে
জোনাক্-পরী ডাক দিয়ে যায় কা'রে ?

সেথায় চোখের পাতায় পাতায় পালিয়ে যে যায় ঘুম,
আফিম্ ফুলের গন্ধেতে নিঃঝুম্।

তা'দের নূপুর বাজ্‌ছে গো নিতুই রুমু ঝুমু
রামধনুরই রঙীন বুকের পরে।
জোনাক্‌-পরী ডাক দিয়ে যায় কা'রে!

জোনাক্‌-পরীর পিছন পানে মাণিক মেখে তারা—
মাতাল হ'য়ে মহুয়া-বনে হারা।
ভোরের বেলা শিশির হয়ে ঘুমায় ফুলের বুকে—
ঘরের কথা মনেও পড়ে নারে।
জোনাক্‌-পরী ডাক দিয়েছে যা'রে।

বাদল-ব্যাকুল অচিন্‌ দেশের পারে,
জোনাক্‌-পরী ঘর ভোলালো কারে?
তা'দের মায়ের সকল ব্যথা হৃদয় ভেঙে বুঝি
কাঁদন ভ'রে নাম্‌ল অঝোর ধারে,
জোনাক্‌-পরী ডাক দিয়েছে যা'রে।

বুদ্ধির্যস্য

শ্রীসুবোধ বসু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

ড্রিল সার্‌: [ভ্রূক্ষেপ না করিয়া] সবই মনে করতে পারছি। প্রতিটি হেঁয়ালি কথা, প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি পা-ফেলা, শুধু আমাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। পূর্ব্ব-কল্পিত না হ'লে এমন দক্ষতার সঙ্গে আমাকে একটা প্রকৃত ভূতও ভয় পাওয়াতে পারত না। মেকী ভূত ব'লেই এতটা ভয় পেয়েছিলাম। বলে কিনা আমার সাহস পরীক্ষা করবে? বাড়বি তো বাড়, তাই ব'লে এতটা বাড়বি! বলে কিনা···

ভোম্বল: শুনুন, সার, শুনুন, আগে শুনুন।

ড্রিল সার্‌: কোনও কথা শুনতে চাই না। প্রশ্ন করছি, জবাব দে? আমি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"কে?" কি জবাব দিয়েছিলি মনে আছে? কেন বল্‌লি নে, "আমি ভোম্বল"? কেন ঘুরিয়ে বলা হ'ল—"আমি, আমি, আমি"? তার কারণটা কি আমি টের পাই নি, মনে করেছিস?

ভোম্বল: আজ্ঞে, ওটা মনে আসে নি। আমি ভাবলাম···

ড্রিল সার্‌: থাক্‌, থাক্‌, যথেষ্ট হয়েছে। মনে আসে নি! নিজের নাম মনে আসে না! আমার সাহস পরীক্ষা করিস তুই? স্পষ্ট বললি, "আমি অতুল, আত্মহত্যার···"

ভোম্বল: ওটা, সার্‌, আমি তো উল্টো অর্থে ব্যবহার করেছিলুম। আমি বলতে যাচ্ছিলুম···

ড্রিল সার্‌: নিজের নাম তোমার মনে থাকে না! থাক্‌ থাক্‌, যথেষ্ট হয়েছে। আত্মহত্যা তুমি উল্টো অর্থে ব্যবহার করো! কিন্তু জাপটে ধরা, গুরুজনকে অন্ধকারে জাপ্‌টে ধরা? সেটাও কি উল্টো অর্থে ব্যবহার করেছিলে? তোমাকে চাবকে আমি ঠিক করব, ড্রিলেতে ফেল করিয়ে দেব। সব্বাইকে তোমার মনিটর করে দেব। দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও, টেবিলের উপর উঠে কান ধ'রে দাঁড়াও।

ভোম্বল: [স্তম্ভিত ভাবে] আমি? আমি? কান ধরে? টেবিলের উপর?

ড্রিল সার্‌: আলবৎ টেবিলের উপর। দু' হাতে দুই কান ধ'রে এ মুহূর্ত্তে গিয়ে দাঁড়া। আহ্লাদ পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছ? [বেতের দিকে চাহিয়া] এ হাল্‌কা বেত দিয়ে কিছু হবে না, আমি পাকান বেত নিয়ে আসছি। (অন্যদের প্রতি) যা, তোদের শাস্তি মাপ করলুম। এইবারটা মাপ করলুম [ভোম্বলকে] উঠে দাঁড়া, ভোম্বল! কান ধর, [ভোম্বলের তথাকরণ] আমি পাকান বেত নিয়ে আসি···

(ছুটিয়া প্রস্থান)

সকলে: [সব্যঙ্গে] ওঃ ওঃ ওঃ! [ভোম্বল রাগে দাঁত কিড়মিড় করিতে লাগিল।]

হাবুল: এ আর কিছু নয়, এ হ'ল বুদ্ধির্যস্য। ভাই ভোম্বল, রাম নাম কর। রাম নামে শিলা জলে ভাসে। বেতের বাড়ি প্রায় টেরই পাবে না। আমাদের হাতে-নাতে পরীক্ষা করা। তুমি নতুন কিনা, তোমার সুবিধার জন্য বলছি।

ভোম্বল: [গর্জ্জন করিয়া] চুপ থাক, জোচ্চোর কোথাকার। [প্রায় কাঁদিয়া] ষড়্‌যন্ত্র, কুটিল ষড়্‌যন্ত্র।

(পাকান বেত হাতে ড্রিল সারের পুনঃপ্রবেশ)

ড্রিল সার্ : হাবুল ?

হাবুল : আজ্ঞে, সার্ ?

ড্রিল সার্ : য়্যানুয়্যাল্ পরীক্ষায় ড্রইং-এ কত নম্বর পেয়েছিলি রে ?

হাবুল : [শঙ্কিত হইয়া তোত্‌লাইয়া] ড্রইং-এ ? আমি ? কত নম্বর ?

ড্রিল সার্ : ভোম্বলের মুখটা ভয় পাওয়ার মতই এঁকেছিলি বটে, নইলে আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় সোজা কথা নয়। কত পেয়েছিলি বল্‌লি ? [ছেলেদের চোখ চাওয়াচাওয়ি, ভোম্বলের দন্ত-বিকাশ]

হাবুল : [বিনীত ভাবে] আজ্ঞে, আজ্ঞে, সার্—আমি, মানে হ'ল গিয়ে, শূন্য পেয়েছিলাম। কিন্তু···

ড্রিল সার্ : [সচীৎকারে] কি বল্‌লি, শূন্য ? শূন্য ! ড্রইং-এ শূন্য ! হতভাগা, বাঁদর ! তবে যে বল্‌লি, তোকেই ভোম্বল বললে মুখখানা ভয়ঙ্কর ক'রে দিতে ? তুই-ই এমন বিদ্‌ঘুটে ক'রে দিলি ? আর এখন বলছিস, ড্রইং-এ শূন্য ? ভোম্বল, নেমে দাঁড়া। তুই নির্দ্দোষ ! সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সব বুঝতে পেরেছি; মিথ্যা ক'রে তোকে···

(ভোম্বল নামিয়া পড়িল)

ছবি : পর পর দু'বছর ড্রইং-এ ফেল হওয়ায় হাবুল নিজে না এঁকে আমাকে বল্লে এঁকে দে। প্রকৃত পক্ষে আমিই···

ড্রিল সার্ : তুই ? তুই এঁকেছিস ? তবে এতক্ষণ চুপ করে ছিলি কেন রে, হতভাগা ? কেন বলিস নি, 'আমি এঁকেছিলাম' ? কেন বলা হয়েছিল, 'কিছু জানি না। ঘুমিয়ে ছিলাম' ? এখন হঠাৎ সত্যবাদিতার উপর ভক্তি গজিয়ে উঠ্‌ল কেন ? ভোম্বলকে জব্দ করবার ফন্দী এঁটেছিলে, কেমন ? ভেস্তে যেতে দেখে সত্যবাদী হয়ে উঠেছ ! এমন সৎ ছেলে ভোম্বল হয়েছে কিনা বাঁদরগুলির চক্ষুশূল ! দাঁড়া, সব সারিবন্দী হয়ে দাঁড়া। (সকলের হতাশ হইয়া তথাকরণ) মজাটা আমি টের পাওয়াচ্ছি। [ভোম্বলকে] বাবা ভোম্বল !

ভোম্বল : আজ্ঞে, সার্ ?

ড্রিল সার্ : ঘরে ক'টা পাকান বেত আছে রে ?

ভোম্বল : আর তিনটে আছে, সার্। বেশ ভাল পাকান, তেল লিকলিকে বেত।

ড্রিল সার্ : তবে যা, ছুটে যা। সবগুলি নিয়ে আয়। তিনটেই নিয়ে আয়। হস্তেরটা নিয়ে চারটে হ'ল। আমি পঞ্চমটার ব্যবস্থা ক'রে আসছি। প্রত্যেকটার পিঠে আস্ত এক একটা ক'রে ভাঙতে হবে; পাঁচটার কমে চলবে না। ছুটে যা, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

মন্টু : (হতাশ ভাবে) হাব্‌লু !

কানু : ভাই হাব্‌লু !

ছবি : কথা বলছিস্ না কেন, হাব্‌লু !

পল্টু : একি হ'ল, হাব্‌লু ?

হাবুল : একেই বলে, বুদ্ধির্যস্য ;—ফসকে গেলেই—বেতং তস্য।

যবনিকা।

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্. এ, বি. এস্-সি

টবের গাছ

তোমাদের মধ্যে যাহারা বড় বড় সহরে থাক তাহাদের কারো কারো হয়তো জমির অভাবে টবে ফুলগাছ লাগানোর সখ আছে। ফুলগাছের জন্য যে টব ব্যবহার করা হয় তাহার তলায় একটা ছিদ্র থাকে। কেন ঐ ছিদ্র রাখা হয় সে কথা কি তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ ? অনেকে হয়ত' তা লক্ষ্যই কর নাই। একটা মাটির গামলায় বা মালসায় বা হাঁড়িতে ফুলের গাছ পুঁতিলে কি হয় ? পুরান ভাঙ্গা ঘিয়ের বা কেরোসিনের টিনে কোন কোন বাড়ীতে গাছ হইতে দেখিয়াছ। কিন্তু টিনটা নতুন হইলে বা তার ভিতর কোন ছিদ্র না থাকিলে তাহাতে গাছ হয় না।

টবে ফুলগাছ করিতে হইলে প্রথমটা টবের ছিদ্রটার উপর এক বা দুই আঁজলা খোয়া দিতে হয়। শুধু মাটি দিলে ফুটাটা একবারে বন্ধ হইয়া যায়। জল গাছের জীবন, কিন্তু গাছ যদি এই জলও খুব বেশী মাত্রায় পায় তাহা হইলে উহা বিষের মত কাজ করে। গাছের শিকড়গুলি বাতাস না পাইয়া পচিয়া মরিয়া যায়। মালসায় গাছ পুঁতিলে বর্ষার দিনে উহাতে অনেক জল জমে ও গাছ মরিয়া যায়। মালসায় ফুটা করিয়া জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করিলে সেখানেও গাছ জন্মিবে। যখন খুব বেশী বর্ষা সুরু হয় তখন টবের উপর অনেক সময় মাটি বেশ উঁচু করিয়া দেওয়া হয়—যেন টবে বেশী জল সঞ্চিত হইতে না পারে।

জমির এই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চাষের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

গ্রীষ্মের দিনে লোকে গাছের চারি দিকে আলবাল বা থালা বাঁধিয়া দেয়—জল দিলে উহা যেন বাহিরে যাইতে না পারে। বর্ষার সময়ে কিন্তু গাছের গোঁড়ায় মাটি ঢিপি করিয়া দেয়—যাহাতে উহার তলায় জল জমিয়া বেশীক্ষণ না থাকে।

হাওড়া জেলার এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড জলার মধ্য দিয়া খাল কাটিয়া বিলটিকে নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিলের জল খালের মধ্য দিয়া নদীতে গিয়া পড়িয়া বাহির হইয়া যায়। সে সব বিলে আজকাল প্রচুর ফসল হইতেছে।

লোকে বেগুণ গাছ প্রায় পুকুরের পাড়ের উপর পোঁতে। পাড়ের ঢাল জমিতে জল জমে না, পুকুরে চলিয়া যায়। গাছগুলির গোড়ায় জল না জমাতে উহারা বেশ সতেজে বর্দ্ধিত হয় এবং বর্ষার শেষ হইতেই ফল দিতে আরম্ভ করে।

এক রকম উদ্যান রচনা আছে—সে উদ্যান ধাপে ধাপে রচনা করা হয়; ইংরাজীতে উহাকে বলে টেরাস্ গার্ডনিং (Terrace Gardening)। নীচে পুকুর, তার উপর একটু উঁচুতে একটা ক্ষেত, তার এক ধাপ উঁচুতে আর একটা ক্ষেত,—এইরূপ পর পর উঁচু ধাপের ক্ষেত। যে সব গাছ বেশী জল চায় তাহাদের নীচের ধাপে বসান হয়, যাহারা কম জল চায় তাহাদের উপরের ধাপে।

তোমাদের যদি কোনও বাগান থাকে বা টবে গাছ থাকে তাহা হইলে জল নিষ্কাশনের (Drainage) ভালরূপ ব্যবস্থা করিবে; বর্ষায় বাগান করিবার জন্য উহারই প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে।

বর্ষার জল

বর্ষার জল অস্বাস্থ্যকর, এজন্য ফুটান জল ব্যবহার করা উচিত। ফুটান জল অর্থে শুধু জলই যে ব্যবহার করিতে হইবে তাহার মানে নাই। খাইবার সময়ে ডালের ঝোল, মাছের ঝোল, চা, দুধ—এ সবের সঙ্গেও লোকে জল ব্যবহার করে। যে সব বাড়ীতে ফুটান জল ব্যবহার করা সম্ভব হয় না সেখানে ঝোল, ডাল ও তরকারীতে প্রচুর জল থাকিলে তাহা দ্বারা জলপান করিবার ইচ্ছা কমাইয়া রোগের আক্রমণ অনেকটা দূর করিবে।

"আমরা খাসা আছি"

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নির্ম্মেঘ আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ এসে উপস্থিত হ'ল। কিরণ তাড়াতাড়ি মাঠের থেকে এসে এস্‌প্লানেডে ফুট্‌পাথের উপর দাঁড়িয়ে মেঘের গতি নিরীক্ষণ করছিল। প্রবল বায়ু এসে পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিল। এই সময়ে হঠাৎ তার কাণে এল—কে যেন পিছন থেকে ব'ল্‌ছে, "আমরা খাসা আছি; হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি। আমরা খাসা আছি।" পিছন ফিরে দেখে এক শীর্ণ বৃদ্ধ এই কথা এক যুবককে ব'ল্‌ছেন। কিরণ দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে খানিকটা শুন্‌ল। যুবক ব'ল্‌ছে, "যান যান্ মশায়, ভিক্ষে চাচ্ছেন, আবার শ্লেষ!" কিরণ নিকটে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল, "কি হয়েছে মশায়?" যুবক ব'ল্‌লে, "হবে আর কী, ভিক্ষে চাচ্ছেন, তাতে লজ্জা তো নেইই, আবার বিদ্রূপ ক'রা হচ্ছে! পিক্‌পকেট হয়েছে না হাতী হয়েছে।" কিরণ দেখ্‌ল, বৃদ্ধের যেন আর কথা বেরোচ্ছে না, তিনি অপমানে দুঃখে কাঁপ্‌ছিলেন। সে ব'ল্‌লে, "আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে ট্রামের ভাড়া দেব।"

কিরণ কিন্তু সোজা ট্রামে উঠ্‌ল না, বৃদ্ধকে নিয়ে এক রেস্তোরাঁয় প্রবেশ ক'রে দুই কাপ চা ও দু'টো টোষ্ট আন্‌তে ব'ল্‌লে। বৃদ্ধ হেসে ব'ল্‌লেন, "এই ফিরে যাবার ট্রামের ভাড়া জুটছিল না, ভাড়াও জুট্‌ল, সঙ্গে এল চা ও টোষ্ট্!" শীঘ্রই চা ও টোষ্ট্ এসে প'ড়ল। চা খেতে খেতে কিরণ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বৃদ্ধকে, "আপনি কোথায় থাকেন?" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "বালীগঞ্জে"। কিরণ ব'ল্‌লে, "ভালই হয়েছে, আমিও বালীগঞ্জে থাকি—এক সঙ্গেই ফেরা যাবে।" কিরণ টোষ্ট্ এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল, "আপনি কি বরাবরই বালীগঞ্জে আছেন?" বৃদ্ধ ব'ল্‌লেন, "না মশাই, বড়ই নিরুপায়; জামাইয়ের বাড়ীতে আছি। জামাই ভাল, মেয়েও ভাল; কিন্তু বড় অপমান বোধ হয়। আর কত দিন এমন ভাবে কাট্‌বে? আজ বালীগঞ্জে এক ভদ্রলোকের বাড়ী টিউসানী করতে গিয়েছিলাম, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে দু'জনেই ম্যাট্রিক দেবে। ভদ্রলোক মাসে পনেরো টাকা দেবেন ব'লেছিলেন। দু' দিন পড়িয়েও ছিলাম কিন্তু আজ ছেলেমেয়ে উভয়ে ব'ল্‌লে, 'আপনি চোখে ভাল দেখ্‌তে পান না, আর বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছেন, আপনি পড়াতে পারবেন না।' কথা শুনে মনে বড়ই দুঃখ পেলাম। আমার মেয়ের দেওয়া একটা টাকা ব্যাগে ছিল, তাই পকেটে ফেলে ট্রামে ক'রে একটু মাঠে এসেছিলাম। ফুটপাথে এসে দেখি ব্যাগ শুদ্ধ কে পকেট কেটে নিয়ে গিয়েছে। ছোকরার কাছে দু' আনা পয়সা চেয়েছিলাম, তিনি যে রকম মুরুব্বী চালে আমার নাকের কাছে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কথা ব'ল্‌ছিলেন তাতে, হ্যাঁ, একটু বিদ্রূপ ক'রেই ঐ কথাগুলি বলেছিলাম।" চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে বৃদ্ধ ব'ল্‌লেন, "তার পর তো সব শুনেছেন আপনি।"

কিরণ জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি আগে কোথায় ছিলেন?" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "রেঙ্গুনে। এ্যাডভোকেট ছিলাম, বেশ ভালই প্র্যাকটিস ছিল। আমার স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিলেন—পুণ্যবতী ছিলেন তিনি......" এই সময়ে পাশের টেবিল থেকে অর্ডার হ'ল—"মোগ্‌লাই রোষ্ট,

ফাউল্ কারি"—বৃদ্ধ হেসে ব'ল্লেন, "ঐ শুনুন—আমরা খাসা আছি, হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি—আমরা খাসা আছি।"

কিরণ বুঝ্ল যে বৃদ্ধের মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত ; ব'ল্লে, "আপনার স্ত্রী আগে মারা যান—তার পর ?" বৃদ্ধ সংযত হ'তে চেষ্টা ক'রে ব'ল্লেন, "দেখুন, আমার মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে বোধ হয়—জামাই দু' দিন হাইকোর্টে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানেও……"

কিরণ বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "আপনার স্ত্রী আগে মারা যান্—তার পর ?" বৃদ্ধ লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তার পর দু'টী মেয়ের বিয়ে দি। এক জনের বিয়ে কলকাতায় হয় আর একজনের হয় আগ্রায়। আর আমার ছেলেপিলে নেই। এলাম কল্কাতায় রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে—তখনও রেঙ্গুনে বোমা প'ড়ে নি। এখানে এসে অনেক চাকরীর চেষ্টা করলাম কিন্তু চাকরী কোথাও পেলাম না। গভর্ণমেণ্টের লোকের কাছে খবর নিয়ে জান্লাম যে আমি বোমা পড়ার আগেই চ'লে এসেছি, বোমা পড়ার পর পালাই নি, সুতরাং আমাকে 'ইভ্যাকুয়ীর' (পলাতক) ক্লাশে ফেলা যাবে না ও আমাকে চাকরী দেওয়া বা কোন রকম সাহায্য করাও সম্ভব হবে না।"

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার যেন সান্ধ্য অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কিরণ ট্রামে এসে বৃদ্ধের পাশে ব'সে জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "আপনি রেঙ্গুনে বাড়ী ক'রেছিলেন ?"

বৃদ্ধ ম্লান হেসে ব'ললেন, "প্রকাণ্ড বাড়ী। মার্ব্বেল পাথরের মেজে—আমার স্ত্রীর ভারী সখ ছিল মার্ব্বেল পাথরের। বাড়ী, গাড়ী, ফোন, রেডিও—কিছুই বাকী ছিল না। সব ছেড়ে প্রাণভয়ে পালালাম রেঙ্গুন থেকে—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা যে সরিয়ে রাখ্ব তারও অবসর পেলাম না। প্রাণের জন্য পালালাম—সে প্রাণও বুঝি আর বাঁচে না !" কিরণ ব'ল্লে, "বৃদ্ধ হয়েছেন, এ রকম ভাগ্য বিপর্য্যয়ে এই অবস্থা হয়েছে, অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছেন—মেয়ের কাছে থাকুন না কেন ? আপত্তি কি ?" বৃদ্ধ বল্লেন, "পারি না মশায়, পারি না। নিজে খেতে পাই আর না পাই যায় আসে না, কিন্তু এতই আমি নিঃস্ব অসহায় যে একটা পয়সাও সাহায্য করতে পারব না কাউকে এই কথাটাই বড় বুকে বাজে—"

কিরণ কিছু ব'ল্লে না বটে কিন্তু মনে মনে বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'র্ল। গাড়ী এগিয়ে চল্ল।

বৃদ্ধ হঠাৎ ব'লে উঠ্লেন, "ঐ দেখুন জ্বল্ জ্বল্ ক'রে লেখা সব সিনেমা-ঘর। এই সব সিনেমায় কী ভীড় দেখুন ! কেউ বা বেশী সেজেগুজে, কেউ বা গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে সিনেমায় আসছেন। আর পাশেই দেখুন আমারই দেশের ভাইবোন, আমারই মতন গৃহহীন কাঙাল

সকালে কণ্ট্রোল থেকে এক সের চাল নেবে ব'লে কাতারে কাতারে ফুট্পাথে ব'সে আছে। রাত্রে হয়তো বৃষ্টি হবে, বাজ প'ড়বে ; কিছু ভ্রূক্ষেপ নেই, তবুও তারা ব'সে থাক্বে। সকালে সকলে চাল পাবে কিনা তারও স্থিরতা নেই ! আর আমরা ? "খাসা আছি, হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি"—কী গানই ডি. এল্. রায় লিখে গিয়েছেন মশায় !"

ট্রাম ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে বালীগঞ্জে এসে পড়ল।

উভয়ে ট্রাম থেকে নামলেন। বৃদ্ধ হেসে ব'ল্লেন, "অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাম ?" কিরণ ব'ল্লে, "কিরণ রায়, ৮৩-৬ বালীগঞ্জ প্লেস্। আপনার নাম ?"

বৃদ্ধ বললেন, "নারায়ণদাস ভট্টাচার্য্য—একডালিয়া রোড। ঐ যে বাড়ী।" এই সময়ে একটা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল তাদের সম্মুখে। এক মহিলা গাড়ী থেকে ব'ল্তে ব'লতে নাম্লেন—"বাবার গলা !" সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোকও নামলেন, বোধ হয় তাঁর স্বামী। মহিলা কাছে এসে বৃদ্ধের হাত ধ'রে ব'ল্লেন, "বাবা ? তুমি এই অন্ধকারে কোথায় গিয়েছিলে—আমরা খুঁজে খুঁজে হায়রান্ !" বৃদ্ধ মহিলাকে লক্ষ্য ক'রে কিরণকে ব'ল্লেন, "এই যে আর একদল—'আমরা খাসা আছি, হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।' জামাই বাবাজী এ আর'এর কী একটা ধুমধাড়াক্কা অফিসার—কাজেই তাঁর মোটর গাড়ীর তেলের অভাব হয় না। আমি এদের বলি, মশায়,—'ওরে মোটর গাড়ী, বাড়ী, টাকাকড়ির কী পরিণাম তা দেখ্ছিস্ তো ? আমাকেই দেখ্ছিস তো ? এখনও দেশের কথা একটু ভাব্।' ওরা বলে, 'বাবা পাগল।" কিরণ নমস্কার ক'রে বিদায় নিল।

কিরণ বাড়ীর গেটে ঢুকছে, দেখে বলাই হাঁফাতে হাঁফাতে আস্ছে। কিরণ জিজ্ঞাসা করলে, "কি ভাই বলাই, হাঁপাচ্ছ যে ?" বলাই ব'ল্লে, "কি করুণ দৃশ্য কিরণ দা ! গড়িয়া হাট মার্কেটের কাছে একটা লোককে এক হাতে চাল ও আর এক হাতে আটা নিয়ে অদ্ভুত ভাবে শুয়ে থাকৃতে দেখে সন্দেহ হ'ল, লোকটাকে ডাক্লাম। সে নড়েও না, কথার উত্তরও দেয় না। ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম—তিনি ব'ল্লেন 'চাল আর আটার জন্য দু'বার ঠেলাঠেলি ক'রে বোধ হয় এই অবস্থা হয়েছে, বাঁচ্বে না বোধ হয়। যাই হোক—হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।' ফোন্ ক'রে য়্যাম্বুলেন্স্ আনিয়ে হাসপাতালে লোকটাকে পাঠিয়ে দিলাম—কিন্তু কিরণ দা, যে বজ্রমুষ্টিতে সে চাল আর আটা ধ'রে রয়েছে তা তার হাত থেকে আর ছাড়ানো গেল না।"

কিরণের মনে তখন বৃদ্ধের কথাই গুণ্গুণিয়ে উঠ্ছে—"আমরা খাসা আছি।"

৩১

অশোক বলিল, "আচ্ছা, ওয়াল্‌ষ্টন্‌দের সঙ্গে একটা আপোষের চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না? ধরুন, যদি ওদের ভাঙ্গা নৌকোটা আমরা সারিয়ে দি?" ইভান্স হাসিয়া কহিল, "আপোষ! তুমি ওদের চেন না। বিশ্বাসঘাতকতায় ওদের যুড়ি নেই। আজ সাধু সেজে তোমাদের সাহায্য নেবে, কালই হয়তো তোমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে সবাইকে হত্যা ক'রে পালাবে। তা ছাড়া"—ইভান্স একটু থামিয়া কহিল, "ঐ ভাবে নৌকো যদি আজ তোমরা সারিয়ে দাও আর তা নিয়ে ওরা চলে যায় তা হ'লে তোমাদের কি গতি হবে?" তার কথার ভাব ভাল বোঝা না গেলেও আভাস পাওয়া গেল অশোক কহিল, "আপনি কি—আপনি কি বলতে চান ঐ নৌকো পেলে আমরা এ দ্বীপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি?" "নিশ্চয়।" "কিন্তু ঐ নৌকো চড়ে কি কেউ অত বড় প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে পারে—ঐ হাজার হাজার মাইল জলপথ?" ইভান্স হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাজার হাজার মাইল যেতে হবে কেন? এখান থেকে ত্রিশ মাইল গেলেই এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে যেখানে গেলে আমরা যে কোন বড় জাহাজের সাহায্য পেতে পারব।" রঞ্জিৎ বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "মাত্র ত্রিশ মাইল! তবে কি এ সিন্ধু দ্বীপের চারদিকে কোনও সমুদ্র নেই?" "আছে বৈকি, তবে চারিদিকে নয়, শুধু পশ্চিম দিকে। উত্তর, দক্ষিণ আর পূবে আছে কেবল সমুদ্রের অল্পপ্রসর ও অনতি-গভীর খাল। সে সব প্রণালী সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পার হওয়া যায়। এখন বুঝেছ তোমরা এতদিন কোথায় বাস করছ?" অশোক কহিল, "বোধ হয় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ওপর?" ইভান্স কহিল, "হ্যাঁ, দ্বীপই বটে। দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি শত শত দ্বীপপুঞ্জের ভিতর এও একটা দ্বীপ বই কি। এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকা মাত্র ত্রিশ মাইল। তোমাদের স্কুলের ম্যাপে এই দ্বীপের নাম হচ্ছে "হ্যানোভার আইল্যাণ্ড।" তার পর ইভান্স ধীরে ধীরে ছেলেদের সে অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ শুনাইতে আরম্ভ করিল।

ওয়াল্‌ষ্টন্‌দের দলের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, ইভান্স ছেলেদের লইয়া তারই তোড়জোড় সুরু করিয়াছে। ডাকাতগুলি সব সমান। শুধু কেটের মতে ওরই মধ্যে ফর্ব্‌সকে কিছুটা ভাল বলা যাইতে পারে—সেই নাকি কেট্‌কে মারিয়া ফেলিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু ইভান্স সে কথা মানিতে রাজি নয়। ইভান্সকে তো ফর্বসই গুলি করিয়াছিল!

ওয়াল্‌ষ্টন্ আজ কয়েকদিন বড় চুপচাপ। তার রকম সকম তাই বড় সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার হয়তো ধারণা কেট্ ও ইভান্স বাঁচিয়া নাই, আর ছেলের দলও তাদের কথা বিন্দুবিসর্গ জানে না। সুতরাং গোড়াতেই হয়তো সে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া জাহাজ-ডোবা নাবিক সাজিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। সে ক্ষেত্রে কি করিতে হইবে সে বিষয়েও সকলে ঠিক করিয়া রাখিল।

তাহাই হইল। পরদিনই ফর্বস ও রক্ জাহাজ-ডোবা নিরাশ্রয় নাবিক বলিয়া পরিচয় দিয়া ছেলেদের কাছে আসিয়া আশ্রয় চাহিল। ছেলেরা পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত হল্ ঘরে আনিয়া তাহাদের খাওয়াইল, তারপর শুইবার জন্য ফরাসী গুহাটা দেখাইয়া দিল। এখানে বলা দরকার কেট্ কিংবা ইভান্স কেহই তাহাদের সামনে বাহির হয় নাই—তারা চোর-কুঠুরিটায় লুকাইয়া রহিল। ডাকাত দু'টা ফরাসী গুহাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, এবং একটু পরেই তাহাদের নাক ডাকিতে লাগিল। আসলে কিন্তু উহা তাহাদের কপট নিদ্রা তা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। রাত্রি ন'টার সময় বুনোও একটা কম্বল লইয়া ফরাসী গুহায় শুইতে আসিল। বুনোকে দেখিয়া তাহারা ভাবিল "মাঝ রাতে উঠে বেটার ঘাড় মটকে ফেললেই হবে।"

এদিকে ওয়াল্‌ষ্টন্ ও তার দলের বাকী কয়জন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল না, তাহারা ফরাসী গুহারই আশপাশে ঘুরিতেছিল; কারণ রকের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল মাঝ রাতে সে ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিবে ও তাহারা ভিতরে ঢুকিয়া ঘুমন্ত ছেলেগুলিকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে।

ছেলেরা বুনোকে ও ঘরে শুইতে পাঠাইয়া দিয়া যাতায়াতের সরু গলির দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তোমাদের হয়ত মনে আছে এই মাঝের গলিটার দুই দিকে দুইটা দরজা ছিল। দরজা দুইটা বন্ধ করিয়া দিলেই হল্ ঘর ও ফরাসী গুহা সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যায়। দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া ছেলেরা অন্য চোর-কুঠুরির ভিতর হইতে ইভান্স ও কেট্‌কে নিজেদের হল্ ঘরে লইয়া আসিল। এদিকে, বলা বাহুল্য, ফরাসী গুহায় গিয়া বুনোও ঘুমায় নাই। ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল মাত্র। রাত বারোটার সময় হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল রক্ ও ফর্বস্ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তারপর তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া তাহারা দেখিল বুনো ঘুমাইতেছে

কিনা। তাহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া তাহারা তখন ধীরে ধীরে দুয়ারের নিকট অগ্রসর হইল। ছেলেরা আগে হইতেই ফরাসী গুহার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার সম্মুখে বিস্তর পাথর সাজাইয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে ওয়াল্‌টনের দল জোর করিয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে না পারে। বুনো এখন দেখিতে পাইল রক্‌ ও ফর্বস্‌ ধীরে ধীরে সেই পাথরগুলি সরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বুনো তখন কি করিল তাহা এখন আমি নাই বা বলিলাম। রক্‌ ও ফর্বস্‌ এক একবার পিছন ফিরিয়া দেখে ও পাথরগুলি সরাইতে থাকে। পাথর সরাইয়া রক দুয়ারের খিল খুলিতে গেল। কিন্তু খিলের উপর হাত না দিতেই দেখে কে যেন পাথরের মত ভারী হাতে তাহার কাঁধ চাপিয়া ধরিয়াছে। চম্‌কাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখে ইভান্স দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার স্কন্ধদেশ চাপিয়া তাহার দিকে কট্‌মট্‌ চোখে চাহিয়া রহিয়াছে। ভূত দেখিলেও বোধ করি লোকে অতখানি চম্‌কাইয়া উঠে না। রক্‌ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল—"ইভান্স! ইভান্স! তুমি এখানে?" ইভান্স কহিল—"হাঁ, আমি ইভান্স, কিন্তু এখন আমি তোমার যম।" সেই নিমেষেই হল্‌ ঘরের সমস্ত ছেলে (অবশ্য ছোটগুলি ও কেট্‌ ছাড়া) বন্দুক লইয়া এই ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিল। কুণাল, কমলাক্ষ ও রোহিতাশ্ব তিনজনে চোখের নিমেষে ফর্বসের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে মেঝের উপর চাপিয়া ধরিল। ওদিকে ইভান্সের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য রক্‌ ভয়ঙ্কর হুটোপুটি যুড়িয়া দিয়াছে। সুশান্ত, রঞ্জিৎ ও শঙ্খচূড় রক্‌কে ধরিতে যাইবে এমন সময় সে একটা ছোরা বাহির করিয়া ইভান্সের কাঁধে বসাইয়া দিয়া এক ঝটকায় সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া খোলা দুয়ার দিয়া বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইভান্সও ত্বরিৎপদে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া রকের ছায়ামূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল, কিন্তু রকের কোন শব্দই শুনা গেল না। রক্‌ অক্ষত শরীরে পালাইয়াছে। ইভান্স তখন গুহার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"বেটা পালিয়েছে। যাই হোক্‌, এক বেটাকে ত' ধরেছি। আয়, আজ তোকেই সাবাড় করি।" এই বলিয়া একটা ছোরা লইয়া সে ফর্বসের নিকট অগ্রসর হইল। এদিকে ছেলেরাও ফর্বসকে এমন জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে যে তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা চাহিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে কেট্‌ ও ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল—"ফর্বস্‌কে মেরো না ইভান্স, ও একদিন আমাকে বাঁচিয়েছিল।" ইভান্স কহিল—"এ বড় শয়তান, একে শেষ করলেই ভাল হ'ত। যাই হোক্‌, তোমার কথা আমি রাখলাম, আজকের মত অন্ততঃ একে প্রাণে মারব না।" ছেলেরা তখন ফর্বস্‌কে দড়ি দিয়া আচ্ছা করিয়া বাঁধিল, তারপর তাহাকে তুলিয়া লইয়া গলির পার্শ্বস্থিত একটা চোর-কুঠুরির মধ্যে কয়লার বস্তার মত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া রাখিল।

ইভান্সের কাঁধের আঘাত অল্পই লাগিয়াছিল, তাহার জন্য সে বিব্রত হয় নাই। ভোর

হইতেই সে বয়স্ক ছেলেদের লইয়া সশস্ত্র অবস্থায় বাহির হইয়া পড়িল। রকের পলায়নের পর এখন আর ঘরে বসিয়া চুপ্‌চাপ্‌ পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। ডাকাতের দল কোথায় গিয়াছে সন্ধান করা দরকার এবং প্রয়োজন হইলে সম্মুখ যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ও দলের চাইতে অস্ত্রশস্ত্র, গুলি-বারুদ তো তাদেরই অনেক বেশী।

ইতিমধ্যে কেট্‌ ফর্বসের কাছে গিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইয়া তার কাছ হইতে ডাকাতদের সম্বন্ধে সামান্য ২।৪টা খবর যোগাড় করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই—ফর্বস্‌ যেন কেমনতর হইয়া পড়িয়াছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ইভান্স কহিল, "ঝোপের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চল, ডাকাতগুলোকে দেখলেই গুলি ছুড়বে, কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না।" চলিতে চলিতে এক জায়গায় দেখা গেল খানিকটা পোড়া কয়লা পড়িয়া আছে; তখনও ভাল করিয়া নিভে নাই, একটু একটু ধোঁয়া বাহির হইতেছে। নিশ্চয়ই ডাকাতরা কালকের রাত এখানে কাটাইয়াছে বা অল্পক্ষণ আগে এখানে ছিল। ছেলেরা ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা করিতেছে এমন সময় হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি একেবারে সুশান্তর কান ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে আরও তিনটা শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে অবুঝ রঞ্জিৎ বিহ্বলভাবে ঝোপের দিকে ছুটিল। ঝোপের ভিতর বন্দুকের ক্ষণস্থায়ী আগুনের ঝলক লক্ষ্য করিয়া রঞ্জিৎ অবিচলিত ভাবে গুলি ছুড়িয়াছিল। রঞ্জিতের পিছন পিছন সকলে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখে সেখানে আর কেহ নাই, শুধু রঞ্জিৎ এক ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহের দিকে চাহিয়া আছে; সে মৃতদেহ পাইকের। অন্য ডাকাতগুলি কোথায়? ইভান্স কহিল, "যাই হোক্‌, সব হামাগুড়ি দিয়ে চল, কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে ওদের গুলি ছুটে আসতে পারে।" বলিতে বলিতে আবার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রি হুমড়ি খাইয়া পড়িল—তারও কপালে গুলি লাগিয়াছে।

গুলি নীলাদ্রির কপাল ছুঁইয়া গিয়াছিল, ভিতরে ঢোকে নাই; কাজেই আঘাত তত মারাত্মক নয়। যাই হোক্‌, আরও সাবধান হওয়া দরকার। হঠাৎ দূরে একটা ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টির শব্দ শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে সকলে লক্ষ্য করিল সুশান্ত সঙ্গে নাই। কোথায় গেল সুশান্ত? রঞ্জিৎ আবার ছুটিল! পিছন পিছন আর সকলে। আবার পাশ দিয়া সাঁৎ করিয়া একটা গুলি ছুটিয়া গেল—দেখা গেল অদূরে রক্‌ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালাইতেছে। ইভান্স নিমেষে বন্দুক তুলিয়া রক্‌কে গুলি করিল, সঙ্গে সঙ্গে, অতি আশ্চর্য্যভাবে রক্‌ যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল! ইভান্স ছুটিয়া গিয়া দেখে যেখানে রক্‌ ছিল সেখানে কোন মৃতদেহ নাই, রক্‌ তাহা হইলে আবার পালাইয়াছে! কিন্তু কোথা দিয়া পালাইল? ওদিকে ঝোপের মধ্য হইতে রঞ্জিতের গর্জ্জন শোনা গেল, "সুশান্ত, ছেড় না বেটাকে।" কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া সকলে সেখানে গিয়া দেখে সুশান্ত

ও একটা দস্যু, তার নাম কোপ্, প্রবলভাবে হুটোপুটি করিতেছে। ঐ ষণ্ডার সঙ্গে সুশান্ত পারিবে কেন? কোপ্ তাকে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া একটা ছুরি লইয়া তার বুকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে, সুশান্ত প্রাণপণে বাধা দিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে রঞ্জিৎ তার সামনে লাফাইয়া পড়িয়া বন্দুক তুলিয়া ধরিল, কিন্তু সে কিছু করিবার আগেই কোপ্ বিদ্যুৎবেগে সুশান্তকে ছাড়িয়া রঞ্জিতের বুকে ছোরাটা আমূল বসাইয়া দিয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রঞ্জিৎ শব্দ মাত্র না করিয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

সুমেরের কথা

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ

কিছুদিন আগে সুমেরের ইতিহাস বলতে গিয়ে তোমাদের সুমেরের নগর-রাজদের কথা বলেছিলাম।* সুমেরিয় নগর-রাজরা অনেক দিন ধরে রাজত্ব করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ করার ফলে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। তাই যখন উত্তর দিক্ থেকে যাযাবর সেমিটিক জাতি সুমেরের উর্ব্বর উপত্যকাগুলির উপর চড়াও হ'ল, তখন আর আক্রমণকারীদের বাধা দেবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। নিজেদের মধ্যে একতা না থাকার জন্য তাঁরা সেমিটিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলেন না এবং অবিলম্বে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হ'লেন। সেমিটিক জাতির সুমের দখল করা থেকেই ব্যাবিলনে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হ'ল বলা যেতে পারে।

* ১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা রামধনুতে এই লেখকের লেখা "সুমেরিয় সভ্যতার গোড়ার কথা" ও "সুমেরিয় সমাজ ও ধর্ম্ম" প্রবন্ধ দেখ।

এখন থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে আক্কাদে সারগন নামে একজন সেমিটিক সমরনায়ক খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। দক্ষিণের উর্ব্বর ভূভাগ ও সমৃদ্ধিশালী সহরগুলির উপর প্রতিষ্ঠা বিস্তার করতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, কেননা প্রথমতঃ সুমেরিয়দের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ সুমেরিয় সৈন্যেরা সারগনের নূতন সমর-কৌশলের সঙ্গে কিছুতেই যুঝে উঠতে প্যারে নি। সারগন ছিলেন সেমিটিক জাতির প্রথম জননায়ক এবং পশ্চিম এসিয়াতে সেমিটিক প্রাধান্যের গোড়াপত্তন তিনিই করে যান। এই কারণে সারগনের নাম ব্যাবিলনের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তিনি যাযাবর সেমিটিক উপজাতিগুলিকে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়ে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সভ্যজাতি-সুলভ জীবিকা অবলম্বন করাতে বাধ্য করেন। সুমেরিয়দের লিখন, ভাস্কর্য্য, ব্যবসায়-পদ্ধতি, গণনা এবং পঞ্জিকা—এ সবের কথা আগেই বলেছি। এর সমস্তই সেমিটিকরা তাদের কাজে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল।

সুমেরিয় সভ্যতা সেমিটিকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বটে কিন্তু তবুও তারা যার যার জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। চার হাজার বছর আগেকার কোনও ব্যাবিলনীয় নগরে যদি তুমি এখন যেতে পারতে তা হ'লে পথে ঘাটে দুই জাতের লোক দেখতে পেতে—সুমেরিয় ও সেমিটিক। কলকাতায় যেমন তুমি হরেক রকম জাতের লোক দেখ ও তাদের দেখে যেমন তারা কোন্ প্রদেশের অথবা কোন্ দেশের লোক তা বোঝা শক্ত নয়, সে রকম ব্যাবিলনের যে কোনও নগরে দাড়ি ও মাথা কামান খালি পায়ে কোনও লোককে দেখলে তোমার বুঝতে কষ্ট হ'ত না যে সে লোকই সুমেরের আদি বাসিন্দা। আবার অদ্ভুত রকমের চটি পায়ে, গাল ভরা দাড়ি ও বাবরি চুলওয়ালা লোক দেখলেই তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারতে এই লোকটি সেমিটিক, উত্তর দিক্ থেকে এসে সুমেরে আড্ডা নিয়েছে। সে বিজেতার জাত, তাই সে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটে এবং মুণ্ডিত-মুখ-মস্তক সুমেরিয়কে কৃপার দৃষ্টিতে দেখে। সেমিটিকরা সুমেরিয়দের তাদের নানা কাজে লাগাতেও ছাড়ত না—তারা বিজিত জাত যে! প্রাচীন সুমেরিয় ভাস্কর্য্য ও খোদাই করা প্রাচীর-লিখনে আমরা দেখতে পাই যে যুদ্ধক্ষেত্রে সুমেরিয়রা ঢাল ও বর্শা হাতে সেমিটিক নায়কদের অনুগমন করছে। সেমিটিক সেনাপতিদের হাতে কেবলমাত্র তীর ধনুক। আজকাল যেমন সাধারণ সৈন্য বহন করে টমিগান্ ও রাইফেল আর অফিসারদের কোমরবন্ধে ঝোলান থাকে পিস্তল, তেমনি আর কি! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যেমন ইংরেজরা ভারতীয় মুন্সি, সরকার, বেনিয়ান প্রভৃতির সাহায্য নইলে বাণিজ্য ও শাসন ব্যাপারে অসহায় ছিল এবং যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে কেরানী তৈরী করবার জন্য এমন এক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেছিল যাতে ক'রে এদেশের লোক তাদের নিজেদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য ভুলে যায়, ঠিক তেমনি নূতন অর্জ্জিত রাজ্য শাসনের জন্য সুমেরিয় কেরানী ও মুন্সির

সাহায্য নইলে সেমিটিক রাজা ও রাজকর্ম্মচারীরাও তাদের কাজ চালাতে পারত না। আবার যেমন আমাদের দেশে অনেক সরকার ও মুন্সি পরে প্রভুর দয়ায় এবং নিজেদের বুদ্ধিবলে প্রকাণ্ড জমিদারীর মলিক হ'য়ে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, প্রাচীন ব্যাবিলনেও হয়েছিল তেমনি। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার একটি খোদাই করা প্রাচীর-চিত্রে আমরা দেখতে পাই যে এক সেমিটিক রাজার ভ্রাতা তাঁর সুমেরিয় অনুচর ও কর্ম্মচারীদের নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। প্রাচীর-চিত্রে যে লিখন আছে তাতে দেখা যায় যে এই রাজভ্রাতার নাম ছিল ইবিল ইস্টার এবং তাঁর প্রধান অনুচরের নাম ছিল কল্কি। এই প্রাচীর-চিত্র কল্কির নিজের নামে খোদাই করা। এ থেকেই বোঝা যায় যে অনুচর হলেও কল্কির নিজের নামে লিখন খোদাই করবার মত ক্ষমতা ছিল।

নগর-জীবনের সুখ ও আরামে বর্দ্ধিত হয়ে সেমিটিক জাতির উত্তম, অধ্যবসায় ও নূতন কাজের প্রেরণা লোপ পেতে বসে। আবার ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে সুমেরিয়রা নিজেদের অধিকার ফিরে পাবার জন্য সচেতন হ'তে থাকে। ফলে সারগনের বংশধররা দুর্ব্বল হয়ে পড়্ল এবং উর নগরের রাজবংশের চেষ্টায় সুমেরিয় সামন্ত রাজরা একতাবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হ'ল। এই সময় উভয় জাতির জাতীয় নেতাদের চেষ্টায় সমস্ত ব্যাবিলনে ঐক্য ও কেন্দ্রীভূত শাসন-

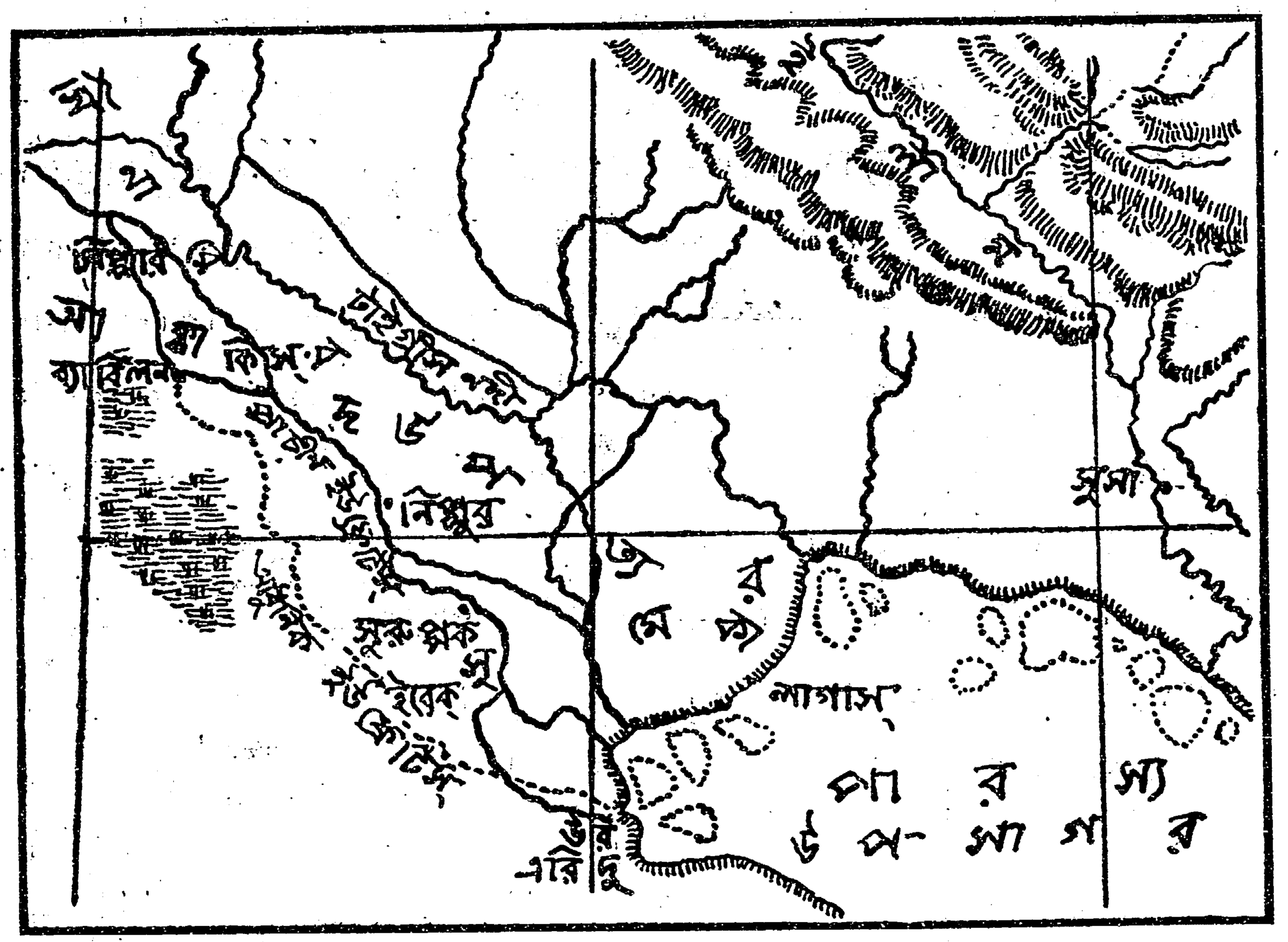

সুমের ও আক্কাদের মানচিত্র

পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। এই সময়ের রাজারা খুব জনপ্রিয় ছিলেন এবং সুমেরিয় সেমিটিক প্রভেদ ভুলে গিয়ে নিজেদের "সুমের ও আক্কাদের রাজা" বলে অভিহিত করতেন। এই সময়ের কোনও রাজা কোনও বিশেষ কারণে খ্যাতি লাভ করেন নি বটে, কিন্তু এই সময়ই সুমের ও আক্কাদের ইতিহাসে সব চাইতে গৌরবের যুগ। দীর্ঘ তিনশ' বছর ধরে সুমের ও

আক্কাদে অনাবিল শান্তি বিরাজ করেছিল। এই সময়েই ব্যাবিলনের সাহিত্য ও সর্ব্বপ্রকারের ললিত কলা গড়ে উঠেছিল। এই সময়কার মনীষীরা মানুষের জন্ম, মৃত্যু, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন ও সাধারণ চোখে যা দেখা যায় না অথবা বোঝা যায় না তা নিজেরা বুঝবার ও সহজ ও সরল গল্পের ভেতর দিয়ে তাঁদের লব্ধ জ্ঞান বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কাদার চাক্তিতে নল খাগড়া দিয়ে লেখা অনেকগুলি লিখন আমাদের হাতে এসেছে—তা থেকে আমরা এই সব গল্পের সন্ধান পাই। মেষপালক এটানার গল্পে আমরা জানতে পারি যে এটানা জীবনের উৎস সন্ধানে ঈগল পাখীর পিঠে চড়ে আকাশে উঠেছিল। কিন্তু তার সন্ধান শেষ হবার আগেই তাকে আবার পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। এই বোধ হয় মানুষের উড়বার চেষ্টার প্রথম গল্প। আবার জেলে আডাপার গল্পে জানতে পারি যে আডাপা অমরত্বের সন্ধান পেয়েও তার অবিশ্বাসের জন্য নিজেও অমর হতে পারে নি এবং পৃথিবীর লোককেও অমরত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত করেছে। শিকারী গিলগামেশের গল্পে আমরা মহাপ্রলয় এবং নবজীবনের আরম্ভের ইতিহাস পাই। এখানে একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সব দেশের প্রাচীনতম গল্পগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ গল্প প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক্ সাহিত্যেও তোমরা পাবে।

প্রায় তিনশ' বছর ধরে সুমের ও আক্কাদের এই গৌরবময় যুগ ছিল। তারপর আরম্ভ হ'ল এই একীভূত জাতির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতন।

এই জাতির ধ্বংসাবশেষের উপর ভিত্তি ক'রে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল আর এক নূতন সংস্কৃতি। তার গল্প আর একদিন তোমাদের বল্‌ব।

মালতী *

শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক

শুভ্র শুচি তনুরুচি গন্ধেতে অতুল
ফুট্‌লো আমার আঙ্গিনাতে সত্য যুগের ফুল।
হলো কি না জানি নাকো হঠাৎ যুগান্তর,
আলোকিত আনন্দেতে বাহির ও অন্তর।

*'চেতাবনীর' মতে ১৫ই শ্রাবণ সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। উহা কাল্পনিক। ঐ তারিখে ফুলটী প্রথম ফুটিয়াছে।

আমোদিত সুরভিত মন ও সমীরণ,
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী পাতলো রে আসন।
পূর্ণ পুণ্য, মূর্ত্ত সত্য, শ্রেষ্ঠ যুগের দান,
করি তাহার বন্দনা, দিই তাহাকে সম্মান।

ওই মালতী তপোমগ্না পার্ব্বতী বুঝি,
অঙ্গনেতে উদয়, যাঁরে ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজি।
ওই মালতী সাবিত্রী যে, অরুন্ধতী ওই,
শরীরিণী পবিত্রতা, ধন্য দেখে হই।
দেহে উহার স্নিগ্ধতা যে সহস্র বর্ষার,
দেবতারে দেবার-মত যুগের উপহার।
রূপ ধরিয়া আসিয়াছে স্নেহ ত' নয় কম,
সত্য যুগের একটী শুভ দিবস মনোরম।

স্বর্ণ যুগের শুভ্র প্রতীক, হেরি ক্ষণে ক্ষণ
ভাবি আবার আস্‌বে ঘরে লক্ষ্মী নারায়ণ।
নূতন হবে এই জগৎই, সত্যব্রত নর,
সুপবিত্র পুণ্যভূমি হবে সকল ঘর।
ওই মালতীর নির্ম্মলতা—পাবার যাহা নয়,
পাবে এবার পরার্থপর মনুষ্য-হৃদয়।
ওই মালতী শ্বেতাম্বরা—সন্দেহ নাই লেশ,
দিল আমায় সত্য যুগের অমৃত সন্দেশ।

চিন্তামনি সর্দ্দার

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন বিশপাড়ার ত্রৈলোক্য মুখুয্যে যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নদীর ঘাটে এসে পৌঁছলেন সন্ধ্যা তখন হয় হয়। ঘাটে বাঁধা পান্সীখানার ওপর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ব্যাগটা রাখতে রাখতে ব্রাহ্মণ মাঝিকে বলেন, "নে বাবা, একটু স্ফূর্ত্তি করে টেনে চ', সারা পথটা কি ভয়ে ভয়ে যে এসেছি!"

সঙ্গীকে পান্সী খুলতে ইঙ্গিত করে মাঝি বলে—"তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, তোমার এত ভয় কিসের ঠাকুর?"

"আরে বাবা, সে বেটা চিন্তে সর্দ্দার কেউটে সাপের বাচ্ছা; সে রাজা উজিরই মানে না তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত!" চাদরের খুঁটে ঘাম মুছতে মুছতে ত্রৈলোক্যনাথ বলেন, "তা ছাড়া সঙ্গে আবার রেস্ত কিছু রয়েছে।"

"তা ঠাকুর, আজকালকার দিনে টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে এত অবেলায় কি বেরুতে আছে? একটু দিন থাকতে আসতে হয়।"

"কি করব বাবা, কন্যাদায় ভীষণ দায়। চারদিন আজ ঘর ছাড়া। দু'-পাঁচ ঘর শিষ্য যজমান আছে, এই ক'দিন তাদের দোরে দোরে ঘুরে যা কিছু আদায় হ'ল তাই নিয়ে ফিরতেই দেরী হ'য়ে গেল।" নদীর জল নিয়ে মুখে চোখে দিতে দিতে ত্রৈলোক্যনাথ বলেন, "হতভাগা বেটার পাল্লায় পড়লে কি রক্ষে ছিল রে বাবা! ছোট লোক বেটার কি স্পর্দ্ধাই বেড়েছে। চ' বাবা একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে—দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মাগো!"

মাঝির সঙ্গীটি এইবার প্রতিবাদ করে: "তবে যে ঠাকুর, শুনতে পাই, কাঙ্গাল-গরীবের ওপর তার খুবই দয়া, আর দান-ধ্যানও আছে বেশ?"

"অমন দানের মুখে আগুন।" ত্রৈলোক্য ঠাকুর ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "গরু মেরে জুতো দান!"

কথায় কথায় নৌকো মাঝ দরিয়া পার হয়ে যায়। হঠাৎ বোটেখানা ছেড়ে দিয়ে মাঝি কাছে এসে বলে, "কই ঠাকুর, দেখি তোমার ব্যাগটা, কতগুলো টাকা যোগাড় করেছ?"

ব্যাগটা দু'হাতে কোলের ওপর চেপে ধ'রে ত্রৈলোক্যনাথ চমকে ওঠেন—"সে অতি সামান্য রে বাবা, সব ঘর কি ঘুরতে পেরেছি?"

"সে যাই হোক, তবু দেখি না কতগুলো?" ব্যাগটা টেনে ধ'রে মাঝি বলে ওঠে, "জোর করে কোন ফল নেই ঠাকুর, ছাড়, নইলে ধনে প্রাণে যাবে। টাকাগুলো আমাদের চাই।"

ব্রাহ্মণের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হয়ে আসে। প্রথমটা তিনি কিছু বুঝতেই

পারেন না, কিন্তু মাঝির মুখের ওপর একটা দৃঢ় সংকল্পের ভাব দেখতে পেয়ে আপনাআপনিই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—"হাঁ বাবা, তবে কি তোরাও!"

"হাঁ ঠাকুর, আমরাই।" অট্টহাস্যের সঙ্গে মাঝি সমর্থন করে। "যে চিন্তামণি সর্দ্দারকে অনর্থক এতক্ষণ গালমন্দ দিলে ঠাকুর, সে-ই তোমার সামনে। ছাড় ব্যাগ, নইলে দেখছ এই বোটে,—নিমেষের মধ্যে পান্সী সোয়ারী শুদ্ধ বানচাল হয়ে যাবে।"

ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নৌকোর পাটাতনের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিন্তামণি আবার হাল ধ'রে বসে। বুকখানাকে চেপে ধ'রে চোখের জল মুছতে মুছতে ত্রৈলোক্য ঠাকুর বলে ওঠেন, "মা জগদম্বা, তোমার মনে এই ছিল?" চিন্তামণি শুধু একটু ক্রুর হাসি হাসে।

পারে পৌঁছে সঙ্গীর দিকে চেয়ে চিন্তামণি হুকুম দেয়, "না' খানা আঘাটায় রাখ।" তারপর ব্রাহ্মণের দিকে ফিরে বলে; "চল ঠাকুর, তোমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি, অন্ধকারে এতটা পথ একলা যাবে? তার ওপর যা মনের অবস্থা, শেষে কি গোহত্যা বেহ্মহত্যার দায়ে পড়ে যাব! কিন্তু দেখ ঠাকুর, কত্তোয়ালীর লোককে জানালে কিন্তু তোমার রক্ষে নেই।"

ঘরের সামনে আটচালাটায় বসে ত্রৈলোক্য ঠাকুর গভীর চিন্তামগ্ন। ছোট ভাই কাশীনাথ সান্ত্বনা দেয়, "কি করবে দাদা, গ্রহের ফের। মিছিমিছি ভেবে শরীর নষ্ট ক'রে লাভ ত' কিছু নেই? আবার অন্য চেষ্টা দেখা যাক্।"

"চেষ্টার আর সময় কোথা ভাই, মাঝখানে মাত্র দু'টো দিন।" পাগলের মত উদাস ভাবে ত্রৈলোক্যনাথ বলে ওঠেন, "দু'-দু'শ' টাকারে ভাই,—কাপড়, গামছা—হায় হায় সব গেল! বেটীর বিয়ে আর হ'ল না রে ভাই!" বলতে বলতে দু'হাতে তিনি বুক চাপড়াতে থাকেন।

তাড়াতাড়ি হাত দু'খানা ধরে ফেলে চাপা গলায় কাশীনাথ অনুযোগ করে—"ছি ছি, কি হচ্ছে দাদা, কল্যাণী রয়েছে না?"

মাতৃহীনা কন্যা কল্যাণী পিতার অবস্থা সবই জানে। সামনে এসে স্নেহের শাসন জানায়, "কখন নাইবে বাবা, বেলা যে যায়! আমার বুঝি ক্ষিধে পায় না?"

নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ ভাবে কি বলতে যেতেই সম্মুখে চিন্তামণি সর্দ্দারকে দেখে চমকে ওঠেন। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত একটা বিকৃত স্বর তাঁর কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে আসে—"য়্যা, চিন্তে! তুই! আবার কি মনে ক'রে বাবা?"

ভারি বোঝাটা মাথার ওপর থেকে নামিয়ে চিন্তামণি ত্রৈলোক্য ঠাকুরের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। সর্ব্বাঙ্গে পায়ের ধূলা মাখতে মাখতে বলে, "ভয় নেই ঠাকুর, জাতে ছোট হলেও চিন্তামণি সর্দ্দার আজ পর্য্যন্ত গরীব-দুঃখীর ওপর কখনও অত্যাচার করে নি; দেবতা-ব্রাহ্মণের ত' কথাই নেই। যে দিন থেকে তোমার মাল-পত্তরগুলো নিয়ে রেখেছি সে দিন থেকে কি মনের

কষ্টে যে আছি তা মা কালীই জানেন। খালি তোমার মনের ঐ ভুল প্রত্যয়টা ছোটাবার তরেই এই কষ্টটুকু দিতে হ'ল কত্তা।"

তাড়াতাড়ি বোঝাটা খুলে তার ভেতর থেকে কয়েকখানা সোনা-রূপার গহনা আর একটা টাকার তোড়া ত্রৈলোক্যনাথের পায়ের কাছে রেখে চিন্তামণি মিনতি করে—"এগুলো আমার দিদিমণির বিয়েতে তার এই অধম ভায়ের সামান্য পেন্নামী, কত্তা, মেহেরবানী করে নিতেই হবে, না ব'ল না।"

সন্দেহ ভাবটা ত্রৈলোক্যনাথের এইবার অনেকটা কেটে যায়। চিন্তামণির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তিনি বলে ওঠেন, "কিন্তু বাপু, তোমার টাকা কেমন করে নেব আমি?"

"বুঝেছি ঠাকুর, তবে যা ভাবছ তা কিন্তু মোটেই নয়।" বিনীত ভাবে চিন্তামণি জানায়—"এর সবটুকুই নিজের গতর খাটিয়ে উপায় করা। চিন্তে সর্দ্দার চিরকাল এ রকম ছিল না ঠাকুর জমিজমা, স্ত্রী—এককালে ছিল তার সবই। এই 'সর্দ্দার' খেতাবটা তার নিজের জাতভাই আর পাড়াপড়শীর দেওয়া কত্তা! তাদের দায়ে-অদায়ে বুক দিয়ে পড়তে, জমীদারের একতরফা অত্যাচারের বিপক্ষে পাল্লা দিয়ে মহড়া নিতে একদিন, এই সর্দ্দারই ছিল আগুয়ান। কিন্তু তার ফলে কি হ'ল জান কত্তা? একদিন নিশুতি রাতে খড়ের ঘর ক'খানা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। জোয়ালের গরু ক'টা দড়ি ছিঁড়ে কে যে কমনে উধাও হ'ল তার পাত্তাই পওয়া গেল না। বৌটা অন্ধকারে বেরুতে যেয়ে হোঁচট খেয়ে সেই যে মরাইএর ধারে পড়ল আর উঠল না। ঠিক এই দিদিমণিটির মত ছোট একটা বোন ছিল; মটকার আগুন উড়ে এসে গেল বেচারীর কাপড় ধরে। সোনার প্রতিমে আমার আধপোড়া হয়েও ছিল খানিকক্ষণ, তার পরে সেও চলে গেল। ধান ঠাসা মরাই দুটো দেখতে দেখতে চোখের সামনে আঙ্গরা হয়ে গেল। তার পর—" চিন্তামণি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌ল, সোনাদানাগুলো সবই আমার স্ত্রী আর বোনের গায়ের, ভেঙ্গে চূরে নতুন ক'রে বানিয়ে আনতেই এই ক'টা দিন দেরি হয়ে গেল। আর টাকাটা নিছক ধর্ম্মের ওপর গতর খাটিয়ে উপায়। রাহাজানির একটা কাণাকড়ি ঘরে থুই না বাবাঠাকুর, বিলকুল দীনদুঃখী, কাঙ্গাল-গরীবের কাজে লাগিয়ে দি। তা হ'লে কি হুকুম হয় ঠাকুর, ছোট লোকের এই প্রণামী চরণে ঠেলাই থাকবে?"

দু'হাতে চিন্তামণিকে জড়িয়ে ধরে আবেগ ভরে ত্রৈলোক্যনাথ ব'লে ওঠেন, "ও দান ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা যে দেবতাদেরও নেই বাবা, আমি ত' সামান্য লোক!"

চিন্তামণির মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। তারপর ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে তার বলিষ্ঠ দেহটা দূর হ'তে দূরান্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

চিঠিপত্র

অনেক দিন পরে আবার তোমাদের সঙ্গে পত্রালাপ করছি। দেশের অবস্থা দিন দিন যে রকম হয়ে উঠছে তা তো চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছ। জিনিষপত্রের দাম ক্রমেই অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে উঠছে—তাও আবার কোন কোনটা মূল্যের বিনিময়েও পাওয়া যাচ্ছে না। খাতা-কাগজ থেকে সুরু ক'রে চাল-আটা, চিনি-কয়লা—কখন যে কোন্‌টা বাজার থেকে অদৃশ্য হবে বোঝা ভার। এ অবস্থায় মাথা ঠিক রেখে কাজ করাই কঠিন। তোমরা ছেলে মানুষ হ'লেও এর ধাক্কা এখন তোমাদেরও সহ্য করতে হচ্ছে। তার ওপর সুরু হয়েছে ক্রমাগত ঝড়, বন্যা, মহামারী। পথেঘাটে অনাহারে লোক যা মারা যাচ্ছে তা'তে সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ভগবানে বিশ্বাস রেখে নিজের কর্ত্তব্যে অবিচলিত থাকবে—এ ছাড়া আজ আর কি বল্‌ব ?

ইতিমধ্যে তোমাদের বহু চিঠিপত্র পেয়েছি। চিঠিতে যে সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে। "বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি" লেখাটির বাকী অংশটুকু আমরা এখনও পাইনি। 'বেতালের প্রশ্নের' উত্তর বারান্তরে প্রকাশিত হবে। এই বিভাগে তোমাদের প্রেরিত প্রশ্নগুলির কোনটাই তেমন উল্লেখযোগ্য হচ্ছে না। আমরা চাই, আজে বাজে প্রশ্ন না ক'রে তোমরা এমন প্রশ্ন করবে যাতে তোমাদের চিন্তাশক্তির—তোমাদের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যাবে—যার উত্তর জানলে অন্যেরাও উপকৃত হবে। পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় গল্প-কবিতা রচনা বা ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা না দিয়ে তথাকথিত 'ভোটের প্রতিযোগিতা' দেবার সার্থকতা কি কেউ কেউ জানতে চেয়েছ। তোমরা মনে রাখবে, রামধনুর সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাই (তাঁদের মধ্যে অনেকে বয়সে খুবই ছোট) আর কিছু সাহিত্য বা শিল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত ন'ন—মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া। কাজেই প্রতিযোগিতার কতকগুলি অন্ততঃ এমন ধরণের হওয়া উচিত যাতে সকলেই যোগ দিতে পারেন। আর সার্থকতার দিক্ দিয়ে উদাহরণ স্বরূপ গেল বারের প্রতিযোগিতাটি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, যে এই প্রতিযোগিতাটিতে যোগ দেবার লোভে বহু গ্রাহক-গ্রাহিকাকে রবীন্দ্রনাথের ছোটদের জন্য রচিত কবিতাগুলি আগাগোড়া ভাল ক'রে পড়ে দেখতে হয়েছে (যা আগে তাঁদের অনেকেই হয়তো পড়েন নি)। এটাও মস্ত বড় একটা লাভ বৈ কি! —রাঃ সঃ

রজত-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রাহক-গ্রাহিকার ভোটে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছোটদের কবিতার মধ্যে এইগুলি গুণানুসারে ১ম, ২য় ও ৩য় ব'লে স্থান পেয়েছেঃ ১ম—'বীরপুরুষ', ২য়—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', ৩য়—'জন্মকথা'। এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠানোয় পুরস্কার পেলেন—১ম পুরস্কার—শ্রীমণিকা রায় ও শ্রীতরুণ রায় (রাঁচি), ২য় পুরস্কার—শ্রীসুশীলকুমার দাশগুপ্ত (কলিকাতা) ৩য় পুরস্কার—শ্রীনিরুপম চট্টোপাধ্যায় (দেওঘর বিদ্যাপীঠ)।

এ মাসের যুদ্ধের বড় খবর মুসোলিনীর পদত্যাগ, তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ইটালির হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা—ফ্যাসিষ্ট দলের প্রবর্ত্তক মুসোলিনীকে যে এত শীগ্‌গির সমর-রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যেতে হবে তা কেউ ভাবতে পারে নি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাই হয়েছে। মার্শাল বাদোলিও মুসোলিনীর জায়গায় ইটালির প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, মুসোলিনী নাকি ইটালি থেকে কোন্ অজ্ঞাত জায়গায় চলে গেছেন। এই সঙ্গে ইটালিতে ফ্যাসিষ্ট্ প্রতিপত্তিরও অবসান হ'ল বলা চলে। এমন এক সময়ও ছিল যে দিন মুসোলিনীর নামে সারা ইয়োরোপ তটস্থ থাকত। তারপর আস্তে আস্তে সে ভাবটা কমে আসতে লাগ্‌ল যতই বাইরের সঙ্গে তাঁর ঠোকাঠুকি সুরু হ'ল—যেমন গত আবিসিনিয়ার যুদ্ধে। তারপর বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই তাঁর এবং তাঁর ইটালির জারিজুরি ধরা পড়ে গেল।

অনেকের ধারণা, ইটালি হয়তো এবার সন্ধির চেষ্টা করবে। মিত্রপক্ষের হাতে তাদের ক্রমাগতই পরাজয় ঘটছে। সিসিলি দ্বীপের অধিকাংশই তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখন যে কোন সময়ে খোদ ইটালির উপর মিত্রপক্ষের সৈন্য নামবে বলে আশা করা যায়। ওদিকে রাশিয়ায়ও জার্ম্মান্‌রা রুশদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। রুশরা একটির পর একটি জায়গা পুনরুদ্ধার করে চলেছে।

* * *

কলকাতা ফুটবল্ লীগের খেলায় কাষ্টম্‌স্‌এর সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলের যে খেলাটা নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল আপত্তি করেছিল তার মীমাংসা হয়ে গেছে। খেলার ফলাফল অনুযায়ী মোহনবাগানকেই এ বছরের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছে। আমরা এই পুরোনো ও জনপ্রিয় দলটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। লীগে রানার্স আপ্ হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল দল।

লীগের পর আই. এফ. এ. শীল্ড্। বাইরে থেকে অনেকগুলি দল এবার শীল্ড-প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল, তার মধ্যে সৈনিকদলও অনেকগুলি ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের কেউই কিছু করতে পারে নি। সেমিফাইনালে গিয়ে দেখা গেল চারটি দলই স্থানীয় ১ম বিভাগ লীগের দল—ইষ্টবেঙ্গল, বি. এণ্ড. এ, আর, মোহনবাগান ও পুলিশ। তার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল বি. এণ্ড. এ. আরকে ৭-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। মোহনবাগান ও পুলিশ পর পর তিন দিন খেলেও কেউ কাউকে হারাতে পারে নি। তিন বারই ড্র গেছে। দেখা যাক্ শেষ পর্য্যন্ত কি হয়!

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) নরওয়ে (নর+way) (২) আরা+কান=আরাকান (৩) হিন্দুকুশ (৪) পাটনা (৫) সুইডেন।

উত্তরদাতাদের নাম

অমিতাভ সেন (ধুবড়ী); সুশীল দাসগুপ্ত, মণিকাকা, সুনীল ও লুবী (কলিকাতা); অশোক, শীলা, অমিয় অমিতাভ ও প্রভাত (বাঁকুড়া); অশোক, অরুণ, পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না, ইলা, ঝর্ণা প্রভৃতি (গোরাবাজার); বিশ্বজিৎ বিশ্বাস (কলিকাতা); পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক এবং বিমলচন্দ্র দত্ত (শ্রীখণ্ড); চণ্ডী, চন্দন, জবা, লাড্ডু (ধানবাদ); রামানন্দ সাহিত্য সদনের সভ্যবৃন্দ (রামচন্দ্রপুর); তরুণ, নমিতা, সবিতা, অনিতা, মমতা, বেবী মজুমদার (দমদম); রণেন্দ্র, রমেশ, রথীন্দ্র, রণেশ, মুক্তি, ফাল্গুনী (রামচন্দ্রপুর); গণপতি চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ পাত্র (ধানবাদ); বুবুল, গীতা, মাকড়া, ভোঁকু ও শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য (মির্জ্জাপুর); মোহনলাল আগরওয়ালা ও সুপ্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পাবনা); সৌম্যেন্দ্রনাথ সিংহ (কটক)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নীচের খালি জায়গাগুলো একই কথা দিয়ে পূর্ণ করতে হবে, শুধু ইচ্ছে হ'লে তার সঙ্গে আ-কার, ই-কার ইত্যাদি খুসীমত যুড়ে নেওয়া চলবেঃ—

(১) মামারা —কদার। —তলায় মামাদের চার— বাড়ী, তার পাশেই বিরাট —গাছ।

(২) নতুন —ই — ভারী ভালবাসে। সেবার তো নতুন —য় রস মেখে এক কাণ্ড!

(৩) —র — নিয়ে লাভ? ওর —র ঠিক কি?

(৪) রমেশ — দেখে —কে গেল; হাতে আবার ছিল একরাশ —।

(৫) মেয়েটি — নিয়ে — থেকে —ম পাড়তে গিয়ে দেখে কারা সব পাশে — বুনছে।

(যাঁরা সবগুলোর নির্ভুল উত্তর দিতে পারবেন তাঁদের নামই শুধু ছাপা হবে।)

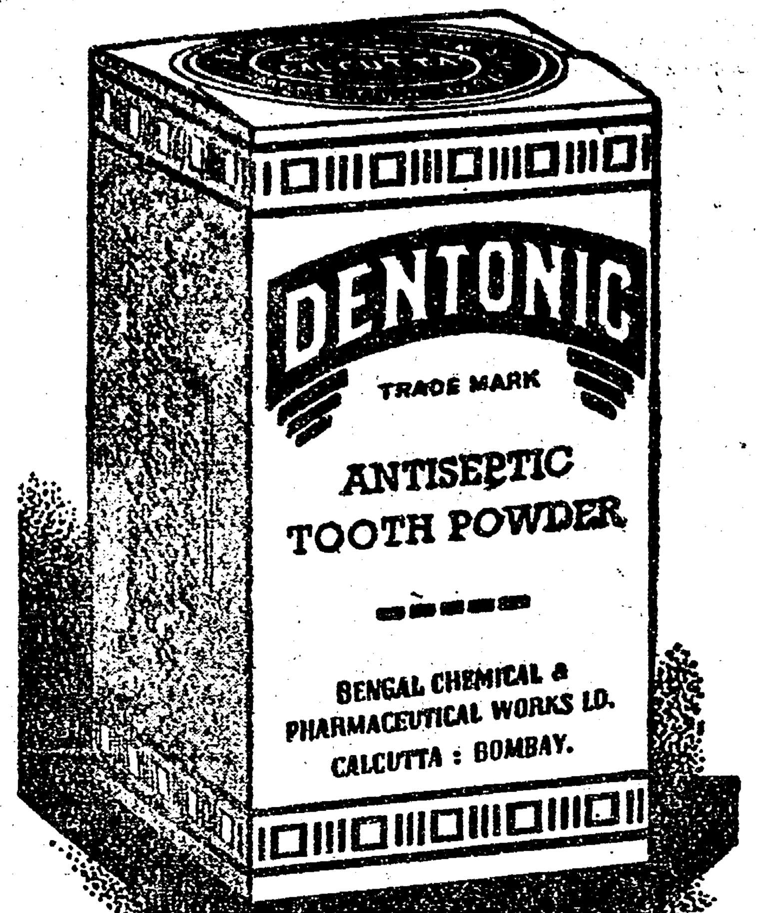

দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা দিলে
দেহের স্বাস্থ্য ও শ্রী অব্যাহত থাকে

ডেন্টনিক

দিয়া নিত্য দাঁত মাজিলে শুধু যে
দাঁত উজ্জ্বল হয় তাহা নহে, দাঁতের
মূল ও মাড়ি শক্ত হয় এবং সর্বপ্রকার
দন্তরোগ নিবারিত হয়।

চার আউন্স প্যাকেটে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ (উপন্যাস) ... ১৷৹

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস ১৷৹

নূতন পুরাণ
নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প ৸৹

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
গল্পসল্প ৷৹ ছুটীর গল্প ৷৹

মাঠব্য ও রসোজর শর্ম্মার
আজব গল্প ৷৴৹ অনেক গল্প ৷৴৹

আধুনিক বাংলার অন্যতম সেরা লেখক
শ্রীসুবোধ বসুর
ছেলেদের অভিনয়ের উপযোগী
কৌতুক-নাটিকা
বুদ্ধির্যস্য
পূজায় অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ বই
• দাম—ছ' আনা মাত্র
স্ত্রী-ভূমিকা নাই; আগাগোড়া হাসি আর
ছেলেদের কাণ্ডকারখানায় ভর্ত্তি
প্রকাশক : গ্রন্থাগার : কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান :—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

—ন তু ন ব ই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

দাম বারো আনা।

ছোটদের উপহারের আর কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প

মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির"

কয়েকটি ডিটেকটিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম. এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সরস মজাদার হাসির গল্প ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৷৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং (গল্প) ... ॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৵০

কলকাতার হালচাল ... ১

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু (গল্প) ... ৸০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আবিষ্কারের গল্প ... ॥৵০

আকাশের গল্প ... ৸৵০

জন্মদিনের উপহার (গল্প) ॥৵০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রমা রোড, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—চিঠি লিখিলে ভি পি তেও বই পাঠান হয়। দেড় টাকার বই লইলে অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়। মফঃস্বলের ক্রেতাগণ স্থানীয় দোকানে আমাদের প্রকাশিত বই সংগ্রহ করিতে না পারিলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সহরের ও সেখানকার পুস্তক ব্যবসায়ীদের—বিশেষ করিয়া বাংলা পুস্তক-বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইলে আমরা সাধ্যমত এ অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিব।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বার্ষিক ৩৲

ষান্মাসিক ১॥৵০

প্রতি সংখ্যা ।৴০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা

মাত্র ১৪ টী ঔষধ } { মূল্য ৮৲ টাকা

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী

Regd. No. C 1841

রামধনু

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷০ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৮৲ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে, চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।
ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১।৵০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOS

বাহির হইয়াছে

—ন তু ন ব ই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূ ম কে তু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

দাম বারো আনা।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

বাঙলা ভাষায়

বিশ্বসাহিত্যের সেরা বই

কারমেন—১৲

কার্ল য়্যাণ্ড আন্না—১৲

টুর্গেনিভের ছোট গল্প—২৲

গোর্কির ছোট গল্প—২।০

গোর্কির ডায়েরী—২৲

রেজারেকষান—২।০

শেক্সপীয়ারের কমেডী—১।০

শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডী—১।০

হান্‌চ্ ব্যাক অফ নৎরদাম—১॥০

লাস্‌ট ডেজ অফ পম্‌পেই—১॥০

আঙ্কল টম্‌স কেবিন—১॥০

টলষ্টয়ের ছোটদের গল্প—১।০

এন্‌ডারসেনের গল্প—১।০

ডন' কুয়িকজোট—১।০

লা'মিজারেব্‌ল—১॥০

বেন হুর—১॥০

কয়েকখানি ভাল বই

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্ত্তৃক রচিত

মার্কিন জাতির কর্ম্মবীর—১।০

শ্রীরাধারাণী দেবী কর্ত্তৃক রচিত

ষ্টালিন—॥০ ভরোশিলভ—॥০ লেনিন—॥০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত

চার্‌চিল—॥০ ট্রট্‌স্‌কী—॥০

মোস্‌লেম জাতির কর্ম্মবীর—১।০

যুগে যুগে—১৲ মোসলেম জগৎ—১৲

নূতন যুগের নূতন মানুষ—১॥০

জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা কথা—১৲

মেবারের বীর তনয়—১॥০

রুশ জাতির কর্ম্মবীর—১।০

বিজ্ঞানের আবিষ্কার—১৲

মজার গল্প—॥৵০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক রচিত

তৈমুরলঙ্গের দেশে—৸০

সত্যি যা ঘটেছিল—৸০

আবিষ্কারের কথা ও কাহিনী—১।০

ম্যমির জীবন্ত হাত—৸০

বিজ্ঞানে সপ্তর্ষি—৸০

প্রকাশকঃ—

ইউ. এন্. ধর. য়্যাণ্ড সন্‌স, লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৺পূজায় ছেলেমেয়েদের প্রিয় উপহার

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

আঁধার পথের যাত্রী

দুর্গম পার্বত্য-প্রদেশে লেখকের নিজ অভিজ্ঞতাপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাহিনী। মূল্য ১৲

ডাইনীর বাঁশী

বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে মরণের পথে ছুটে যায়। কিন্তু কে সেই যাদুকর যে বাঁশীর সুরে টেনে নিয়ে যায়? মূল্য ১৲

রক্তলোভী নিশাচর

(২য় সংস্করণ)

দুর্দান্ত দস্যু কালো ভ্রমরের নব অভিযান। এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। মূল্য ১৷০

কিরীটি রায়ের বাহাদুরী ১৷০ রাত্রি যখন গভীর হয় ১৲

বেঙ্গল পাবলিসার্স

১৭, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোটদের উপহারের আর কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প

মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির" কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ৷৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম. এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সরস মজাদার হাসির গল্প ... ৷৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৷৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং (গল্প) ... ৷৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৷৵০

কলকাতার হালচাল ... ১৲

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু (গল্প) ... ৸০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আবিষ্কারের গল্প ... ৷৵০

আকাশের গল্প ... ৸৶০

জন্মদিনের উপহার (গল্প) ৷৶০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১৷০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

বাহির হইল! ১৮-শ বর্ষ —১৩৫০— রকমারি রচনায় সমৃদ্ধ!

—শিশুদের অনবদ্য পূজা বার্ষিকী—

বার্ষিক শিশুসাথী

সম্পাদক ঃ শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বি. এ.

বাহির হইল!! ১৮-শ বর্ষ —১৩৫০— অসংখ্য ছবিতে ভরা!!

বার্ষিক শিশুসাথী · মূল্য ২৷৷০ মাশুল স্বতন্ত্র

কোন্ কোন্ সাহিত্য-মহারথীর রচনায় বার্ষিক শিশুসাথী সমৃদ্ধ হইয়াছে:—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (অপ্রকাশিত কবিতা), অনিল বরণ রায়, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, আশাপূর্ণা দেবী, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, এস্. ওয়াজেদ আলি, অধ্যাপক প্রিয় কুমার গোস্বামী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্রলাল ধর, জসীম উদ্দীন, নরেন দেব, রাধারাণী দেবী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কাদের নওয়াজ, ডাঃ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এবং বড় বড় শিশু-সাহিত্যিকগণ।

বার্ষিক শিশুসাথী · মূল্য ২৷৷০ মাশুল স্বতন্ত্র

প্রত্যেকখানা—পূজার উপহারের ভালো ভালো বই—প্রত্যেকখানা

—৷৷০—

টুলটুল
অলখ্ চোরা

সুনির্ম্মল বসুর
কুম্‌কুম্
যুক্তাক্ষর ছাড়া কথায় গল্প-কবিতায় ভরা

চূড়ামণি
হর্‌রা
রণজিৎ
পাতাবাহার
পূজার ছুটি
রাজকুমার

হে বীর কিশোর ৷৵০ তুমি কোন্ দলে ৷৵০
গুজরাটি হাতী ৷০ মন্টুর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট ৷০
হাবুল চন্দোর ৷৵০ হারানো মাণিক ৷৵০
পাঁচ শিকারী ৷৵০ রবিবার ৷৵০ সুরের পরশ ৷০
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ৷০ পুরাণো গল্প ৷০
টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার ৷০ মন্টু ৷৵০
ডাকাতের ডুলি ৷৶০ ভোম্বোল সর্দ্দার ৸০
রত্নপুরী ৷৴০ ছোট ঠাকুর্দ্দার কাশীযাত্রা ৷৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

লৌহ মুখোস

ফরাসী উপন্যাসের সরস ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—হাফটোন ছবি। মূল্য ১৲ টাকা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

রক্তমুখী নীলা

কয়েকটি রোমাঞ্চকর গল্পে পূর্ণ—চিত্রসম্পদে সমুজ্জ্বল। মূল্য ৸০ আনা

—৷৷০—

ছেলেখেলা
নাগরদোলা

সুনির্ম্মলবাবুর
ঝিল্‌মিল্
কচি শিশুদের জন্য সচিত্র গল্প, কবিতা

পরশমণি
ঠাকুর্দ্দা
বাজিকর
পারিজাত
সাঁঝের বাতি
চোর জামাই

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ঃ ঃ ৩৮নং জনসন রোড, ঢাকা

শারদীয়া পূজায়

ছেলেমেয়েদের চাঁদমুখে হাসি
ফুটাইতে উপহারের
অপূর্ব্ব সমারোহ !

ছবি-ঝলমলে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
আনন্দ-বার্ষিকী
রূপ-রেখা

রূপ-রেখা

সম্পাদক—রেডিওর 'দাদুমণি'
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ছবি, গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গচিত্র, প্রবন্ধ, রস-রচনা, আমোদ-প্রমোদ, হাসি ইত্যাদি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার !

তিনশত পৃষ্ঠারও উপরে বিরাট গ্রন্থ ! এবার আকারেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃহৎ !

'রূপ-রেখার' সমৃদ্ধি-সম্পাদন করিয়াছেন

ডাঃ অবনীন্দ্র ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বেগম সামসুন নাহার, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সুনির্ম্মল বসু, গোলাম মোস্তাফা, অখিল নিয়োগী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক প্রভৃতি ।

কাগজের এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও মূল্য দুই টাকা মাত্র ।

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ (উপন্যাস) ··· ১।০

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস ১।০

নূতন পুরাণ
নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প ৷৵০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
গল্পসল্প ।০ **ছুটীর গল্প** ।০

মাঠব্য ও রসোদ্গর শর্ম্মার
আজব গল্প ।৵০ **অনেক গল্প** ।৵০

আধুনিক বাংলার অন্যতম সেরা লেখক
শ্রীসুবোধ বসুর
ছেলেদের অভিনয়ের উপযোগী
কৌতুক-নাটিকা
বুদ্ধির্যস্য
পূজায় অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ বই
দাম—ছ' আনা মাত্র
স্ত্রী-ভূমিকা নাই; আগাগোড়া হাসি আর
ছেলেদের কাণ্ডকারখানায় ভর্ত্তি
প্রকাশক : গ্রন্থাগার : কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান :—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

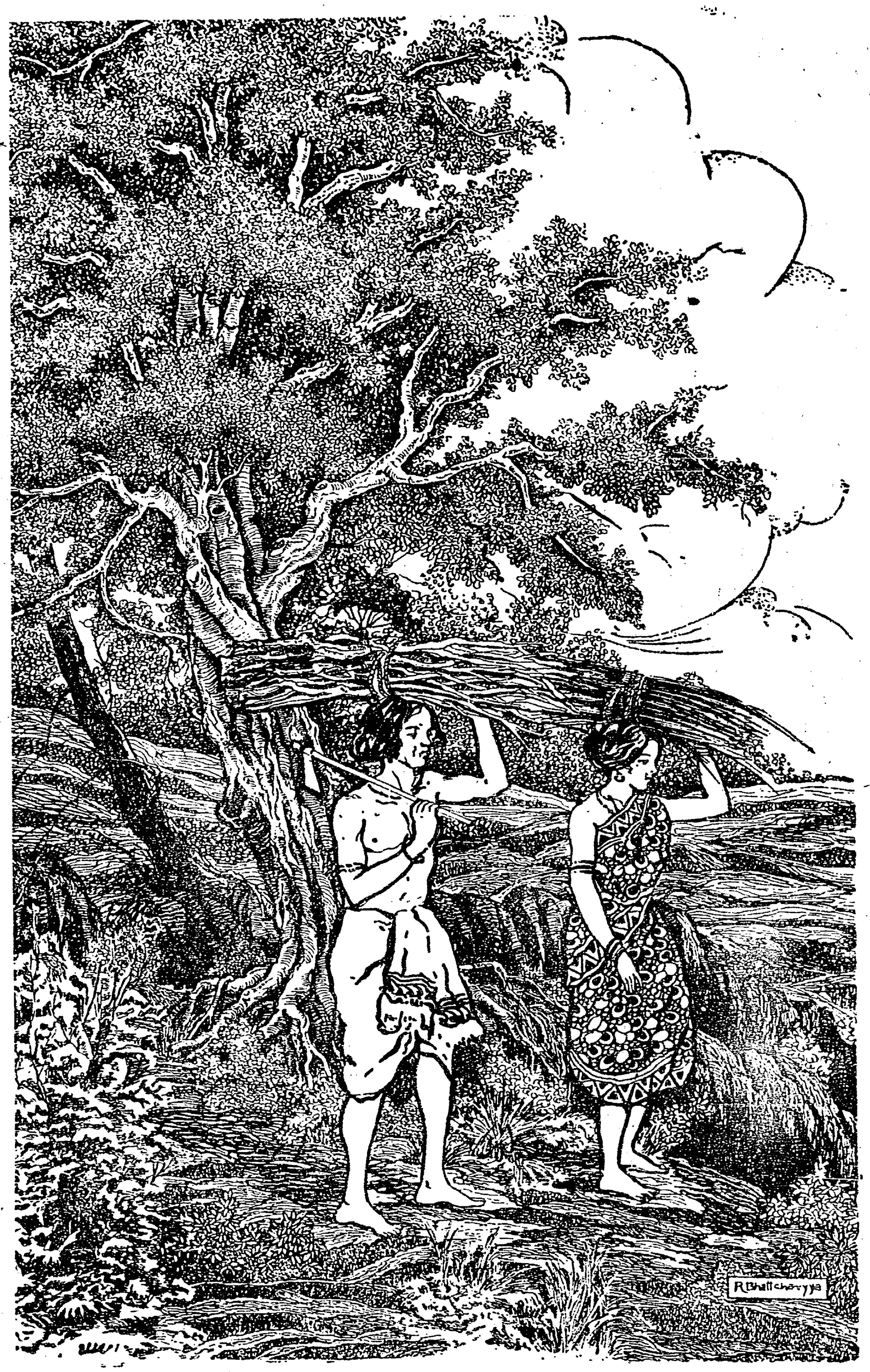

দিনের শেষে

শিল্পী—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

১৬শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৫০ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আমাদের ছেলেবেলা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

একদিন আমাদেরো ছেলেবেলা ছিল,
কে যেন সে দিনগুলি পিছে ফেলে দিল।
আমাদের ছেলেবেলা তোমাদেরই মত
আনন্দে মশ্‌গুল ছিল অবিরত।
আমরাও ছুটোছুটি, হুটোপাটি ক'রে
কত খেলা খেলতাম সারাদিন ধ'রে।
এ বেলায় দলাদলি সাথীদের সনে,
ও বেলায় গলাগলি খুসি-ভরা মনে।

পাহাড়ী-নদীর চড়া, ধব্‌ধবে বালি,
কত হুড়োহুড়ি সেথা কুরিয়াছি খালি।
তীর ঘেঁসে বয়ে যেত ক্ষীণ জলধারা ;
আজিও জাগিছে মনে তাহার চেহারা।
ওপারে শালের ঘন ছায়া-ঢাকা বনে,
চড়ুইভাতির কথা আজো আছে মনে।
ছুটির দিনেতে সব একসাথে জোটা,
ঝর্ণার জলে স্নান, পাহাড়েতে ওঠা।

মনে পড়ে মধুময় সেই দিনগুলি,
কিছু কিছু কথা আজো যাই নাই ভুলি।
ছায়া-ঘন পথ দিয়ে ইস্কুলে যেতে
কাঁচা-মিঠা আম পাড়া আম-বাগানেতে।
ক্লাশে গিয়ে পড়া-শোনা টুকিটাকি খেলা,
টিফিনে খাবার ঘরে আনন্দ-মেলা।
শনিবার রাত জেগে উৎসাহ ভরে
গল্পের বই পড়া ঘুম ত্যাগ ক'রে।
রবিবার সারা দিন টো-টো ক'রে ঘোরা,
বই-টই ফেলে দিয়ে হৈ-চৈ করা।
মনের আকাশে জাগে স্মৃতি-রামধনু—
পুলকে শিহরি' আজো ওঠে মোর তনু।

কলকাতার চোর

শ্রীশামুক

বিনু মামাতো বোনের বিয়েতে কলকাতায় এসেছে। নাগপুরে জন্ম ও মানুষ, সেজন্য কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এলে বেশ ভালই লাগে। সহরটি যেন দিনরাত বদলে বদলে যাচ্ছে।

বিয়ে বাড়ি। চারিদিকে হট্টগোল আর লোক। সারা বাড়িতে এতটুকু ফাঁক নেই, ফুরসৎ নেই। দুপুরে খাওয়ার পর বিনু দেখে বাইরের ঘরটি একটু নিরিবিলি, একখানা বই নিয়ে বসে গেল। এ সময়টা অন্ততঃ বাইরের কোন লোক এসে বিরক্ত করবে না। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে বেশ আরামসে বইএর গল্পের মধ্যে ডুবে যাওয়া গেল।

—গিরিজাশঙ্কর বাবু আছেন ?

মুখ তুলে দেখে একটি লোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, পিছনে দু'জন কুলি। লোকটির পরনে পরিষ্কার জামা কাপড়, কানে গোঁজা এক পেনসিল।

—মামাবাবু আপিস গেছেন।

—আপিস গেছেন কি মশাই ? আমাকে দুটো নাগাদ আসতে বলে দিলেন—জরুরী কাজ !—লোকটি বিরক্তি ও হতাশা মিলিয়ে মুখভঙ্গি করে বলে।

দাঁড়িয়ে উঠে বিনু বলে,—খুব কি দরকারী কাজ আপনার ?

—আমার চেয়ে ওঁর নিজের দরকারই বেশী। আপনাদের টেবিল-চেয়ারগুলো পালিশ ক'রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। বললাম, পারবো না মশাই, মাপ করুন, কাজের বড় ভিড়। শোনেন না কিছুতে ভদ্রলোক। হাত ধরে বারবার অনুরোধ করেন, করতেই হবে—বাড়িতে বিয়ে। শেষে ক্ষতি স্বীকার করেও রাজী হতে হয়। আর এখন কিনা নিশ্চিন্ত ভাবে বেরিয়ে চলে গেলেন।

বিনু বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়ে। এ রকম অন্যায় মামাবাবুর করা উচিত হয় নি। বলে,—মামীমাকে জিজ্ঞাসা করে আসবো যদি কিছু বলে গিয়ে থাকেন ?

—করুন গে। নিজের হাতের কাজ ছেড়ে এলাম, মিছামিছি সময় নষ্ট।

মামীমা বলেন,—কিছুই জানিনে ; উনি যে রকম ভোলা মানুষ, ভুলেই গেছেন হয় তো—মেয়ের বিয়েতে মাথার ঠিক নেই।

বিনু এসে জানায় এই ব্যাপার। লোকটি দু'হাত সামনে উলটে এমন মুখ করে যে সে লজ্জায় মরে যায়। মামাবাবুর উপর রাগ হয় ভয়ানক; লোককে কথা দিয়ে কথা রাখেন না আর যত বিপদে পড়তে হয় তাকেই।

—দেখুন, কথাবার্ত্তা দরদস্তুর সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু মানুষটি নেই। আজ দশ বছর গিরিজাশঙ্কর বাবুকে ঘনিষ্ঠভাবে জানি, উনি এই রকমই ভোলা মানুষ। তা আপনি যদি বলেন এগুলো নিয়ে যাই, কাল সন্ধ্যার মধ্যে পালিশ করে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

বিনু অকূলে কূল পায়। —যান যান, তাই নিয়ে যান, সেই ভাল। তা না হ'লে মামাবাবু ফিরে এসে আমাকেই বকতে থাকবেন, দিয়ে দিলি নি কেন, বোকা গাধা কোথাকার!

দু'জন কুলির মাথায় দড়ি বাঁধা চেয়ার টেবিল উঠলো। দুটো টিপয় এক পাশে রাখা ছিল, দেখিয়ে বিনু বলে,—এ দুটো?

—কই, ও দুটোর কথা বলেন নি ত'! আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছি; ওর আর চার্জ্জ নেবো কি?

এক ছাপানো রসিদে সমস্ত লিখে সই ক'রে দিয়ে নমস্কার করে লোকটি চলে গেল। বসবার আর কোন জায়গা ছিল না ঘরে; শুধু তক্তপোষখানা এক পাশে পড়ে, বিনু তার উপর শুয়ে রসিদটা পড়তে লাগলো—দি গ্রেট বেঙ্গল কারপেনটারী ওয়ার্কস!

আপিস থেকে মামাবাবু ফিরে আসতেই যা কাণ্ড হ'ল তা লিখে বর্ণনা করা শক্ত। সব শুনতে শুনতে বার কতক আওয়াজ করলেন—এঁ্যা এঁ্যা! তারপর বিনুকে কতকগুলি বিশেষণ বেছে বেছে উপহার দিলেন যেগুলি বিনুর মান বজায় রাখতে গেলে সাধারণে প্রকাশ করা চলে না। আসলে হ'ল এই যে ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক ওকে দেখেন নি—জানেন না কোন দিন। এদিকে রসিদের হিজিবিজি সই পড়া গেল না। আপিসের জামা কাপড় না ছেড়ে তখুনি দু'জনে গেলেন দি গ্রেট বেঙ্গল কারপেনটারী ওয়ার্কসের খোঁজে। সেই নম্বরে মিললো এক ফুলুরীর দোকান! সে তল্লাটে কোন কাঠের কারখানার বা ছুতারের পাত্তা পাওয়া গেল না। বাড়ি ফিরে এসে বিনুর সেদিন খিদে হ'ল না, অনেক রাত পর্য্যন্ত ছাদে অন্ধকারে গুম্ হয়ে বসে রইলো।

বিয়ে থা নির্ব্বিঘ্নে চুকে বুকে গেল। বিনুর ভাল লাগছিল না আর কলকাতায় এতটুকুও, তবু রয়ে গেল। ওর ধারণা চোরকে খুঁজে বার করবেই তা সে যে কোন উপায়ে হোক। খায় দায় আর রাস্তার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ডিটেকটিভের মত। মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় যে টি'পয় দুটোও, সে নিজে হাতে তুলে দিয়েছে—ভীষণ হাসি পায় নিজের বোকামীর জন্য। হেসে ফেলেও রাস্তা চলতে চলতে। কিন্তু না, হাসি নয়, চোর ধরতেই হবে, তা না হলে আর মুখ থাকে না।

একদিন বিকাল বেলা, সন্ধ্যা হতে তখন দেরী। শিয়ালদা ষ্টেশনের সামনে বিনু দাঁড়িয়ে। পিল পিল করে কত লোক বেরিয়ে আসছে, কোন ট্রেন তখুনি এসে পৌঁছেছে নিশ্চয়। ঐ যে—ঐ না? সেই লোকটি এক ছোট স্যুটকেশ হাতে বেরিয়ে আসছে! বিনুর হাত দুটি আপনা থেকেই শক্ত মুঠো হয়ে যায়—এস, আরেকটু কাছে এস যাদু!

দূর থেকে চোখাচোখি হতেই লোকটি চেঁচিয়ে উঠে,—ও মশাই, দাঁড়ান, দাঁড়ান! কাছে এসে বলে—ভাল হ'ল আপনার সঙ্গে আজকেই দেখা হয়ে গিয়ে। গিরিজাশঙ্কর বাবু নিশ্চয় চটে আগুন হয়ে গেছেন, না?

—মামাবাবু বললেন আপনাকে চেনেন না—দু'হাতে ঘুসি ও চোখ পাকিয়ে বিনু বলে।

—ঐ দেখুন রাগলে ওঁর জ্ঞান থাকে না। মশায়, সেদিন আপনার বাড়ি থেকে জিনিষ নিয়ে এলাম আর সেই রাতেই টেলিগ্রাম—মেয়ের ভারী অসুখ, এই যায় ত' এই যায়। এক জামা কাপড়েই এই স্যুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম আর আজ ফিরছি।

—আপনার কারখানা ঐ নম্বরে নেই, আমরা গিছলাম।

—আহাহা, কত কষ্ট দিয়েছি আপনাদের। নম্বরটি একটু গোলমেলে। ঐ গলিরই পিছন দিকে একটা মাঠ আছে, সেখানে কারখানা, নম্বরটা সামনের বাড়ির। আমার পাড়াপড়শীরা বললে ত' 'জানি না'? সে ত' বলবেই, আমার ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে আর ওরা হিংসেয় ফেটে মরছে। যাক, চলুন আপনার জিনিষ হাতে হাতে দিয়ে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ—এতদিন নিশ্চয় হয়ে গেছে। চলুন আমার সঙ্গে এখুনি।

বিনুর সব গোলমাল হয়ে যায়। মামাবাবু বলেন একে চিনি না—জানি না, আর এ লোকটি এত ভদ্র ব্যবহার করছে! চোর কি করে হয়? বিনু বুঝে উঠতে পারে না। ভাবতে ভাবতে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

—এই ট্যাক্সি! আসুন।

চলতে চলতে লোকটি বলে,—আমার ওখানে আজ আপনাকে একটু মিষ্টি-মুখ করতে হবে, না বললে শুনছি না। আপনিও খুব রেগেছেন দেখছি; তা রাগবারই কথা। চলুন 'আবার খাবো'র মিষ্টি খাইয়ে রাগ জল করে দি।

বিনুর এবার সত্যি ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে। অথচ মামাবাবু বললেন চিনি না, জানি না! কে জানে কলকাতার মানুষদের ভাষা বোঝা দায়!

'আবার খাবো' সাইনবোর্ড মারা এক দোকানের সামনে এসে লোকটি ড্রাইভারকে হর্ণ দিতে বলে। একটি ছোকরা বেরিয়ে এল।

—ওহে, শোন; তাড়াতাড়ি আছে আমাদের। দু'সেয় আম সন্দেশ কড়া পাকের, দু'সের কাঁচা-গোল্লা আর টাটকা রসগোল্লা সের দুই, আর মতিচুর একসের, বাস, চট করে নিয়ে এস। অমনি বিল আনবে।

ছোকরা চলে গেল।

লোকটি বলে,—ভারী চমৎকার জিনিষ এরা করে মশাই, একবার খেলে ভুলতে পারবেন না। দেখুন না ভিতরে কত লোক এসে খেয়ে যাচ্ছে।

বিনু দেখে ভিতরে ভিড়ে ভিড়, আর লোক অনবরত ঢুকছে বেরুচ্ছে।

ছোকরা জিনিষ নিয়ে ফিরে এল।

—দেখি কি রকম জিনিষ? গাড়ির ভিতর রেখে লোকটি টপাটপ দু'চারটা মুখে ফেলে দেয়। বিনুকেও জোর করে কয়েকটা চাখিয়ে দিল।

—কই, মতিচুর কই?

ছোকরা বলে,—আজ্ঞে তৈরী নেই।

লোকটি লাফিয়ে চেঁচিয়ে বল্লে,—তৈরী নেই মানে? জিনিষ চাইলে জিনিষ পাওয়া যাবে না ত' দোকান কিসের?

—মতিচুর অর্ডার না দিলে তৈরী হয় না।

—আরে থামো থামো, তুমি সব জানো। আমার চুল পেকে গেল এই দোকানে খেয়ে খেয়ে। কে আছেন, বিনোদবাবু অছেন?

—আজ্ঞে না, তিনি বেরিয়ে গেছেন, রসিকবাবু আছেন।

—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর, এই দু'রকমের সন্দেশ মিশে গেছে এদের আলাদা করে সাজিয়ে দাও। আমি দেখছি মতিচুর পাই কি না'।

ব্যস্ত ভাবে লোকটি দোকানে গিয়া ঢোকে। গাড়িতে ঝুঁকে ছোকরা সন্দেশ সাজায়, আর বিনু রাস্তার মানুষ গাড়ি ঘোড়া দেখে।

ছোকরা চলে গেল। বিনুর ইচ্ছে হ'ল আরো দু'চারটা মুখে পুরে দেয়—চমৎকার জিনিষ। থাক গে, ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েই খাওয়া যাবে। একবার মনে হয় লোকটি যদি আবার পালায়? কি করে হবে, ঐ ত' স্যুটকেশটি রেখে গেছে।

হুঁশ হ'ল, ছোকরা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে—দাম দিন!

—দাম কিসের?

—ঐ খাবারের। সে লোকটিকে ভিতরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

সঙ্গে সঙ্গে সেই রসিকবাবু না কে বেরিয়ে এলেন, আরো দু'চারজন, রাস্তার কয়েকজনও—বেশ একটি দল গাড়িকে ঘিরে দাঁড়ায়!

রসিকবাবু বলেন,—দাম দিন চুকিয়ে।

ড্রাইভার বাঁকা চোখে চায়, ভিড়ের লোকেরা মুচকি হাসি হাসে। এ রকম বিপদে বিনু পড়ে নি কোনদিন। কাঁদ কাঁদ ভাবে বলে সব কিছু—গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত।

রসিকবাবু দুঃখের ভান করে বলেন,—তাই তো যে ক'টা খেয়েছেন তার দাম ত' চুকিয়ে দিন। ড্রাইভার বলে,—ভাড়া দিলে আমি চলে যাই। লোকেরা বলে,—আচ্ছা আহাম্মুক আপনি, কলকাতার বদমাশ চেনেন না!

বিনুর নজর পড়ে সেই স্যুটকেশের উপর। খুলে দেখে আদালতের নথিপত্র একরাশ, খান কয়েক চিঠি—এস রায় জমিদার, বেলঘরিয়া—এই ঠিকানায়।

বুঝলো এটিও হাতসাফায়ের মাল, সম্ভব টাকাকড়ি ভিতরে ছিল কিছু—ফুস্ মন্তর হয়ে গেছে।

পকেট হাতড়ে মিষ্টির দাম, গাড়ি ভাড়া বিনুকে চুকিয়ে দিতে হয়। বাকী থাকে তিনটি মাত্র পয়সা। এখান থেকে মামার বাড়ি ঘণ্টা দেড়েকের পথ। ভিড় ঠেলে বিনু হন্ হন্ ক'রে পথ হাঁটতে থাকে, সমস্ত শরীর তখন রাগে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। স্যুটকেশটা নিয়ে নিলে হ'ত—যাক গে!

বিনু আরো ক'দিন থেকে গেল কলকাতায়। খুন চেপে গেছে মাথায়, যেমন করেই হোক ঐ বদমাশ চোরটাকে ধরা চাই। মামীমা বলেন,—এবার ছেলের সত্যি ভাল লেগেছে দেখছি, আহা, সেখানে এত ঘোরার জায়গা কোথা?

বিনু চুপ করে শোনে। মনে মনে বলে ছাই পাঁশ এই সহর-এর চেয়ে নাগপুর শতগুণে ভাল—সেখানে এমন মুখমিষ্টি শয়তানের আড্ডা নেই!

একদিন দুপুরে বিনু এক গলি ও তার তস্য গলি দিয়ে চলেছে। জায়গাটা নির্জ্জন, স্যাঁৎ-সেতে দুর্গন্ধভরা। এদিকে কখনও আসেনি; ভাবে, এর থেকে বেরিয়ে কোন বড় রাস্তায় যাওয়া যাবে। হঠাৎ সেই লোক একেবারে সামনে! আজকের বেশভূষা আসল, নোঙরা ছেঁড়া তালিমারা।

বিনু বাঘের মত তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে জামার কলার মুঠো করে ধরে দু'চারটা চড় চাপড় লাগিয়ে দেয় বেশ জোরে। দু'একবার ঝাপটা মেরে লোকটি দেখে নেয় বিনুর শক্তির সঙ্গে পারা সম্ভব নয় কোন রকমে। বাস্, টুঁটি টেপা বিড়ালের মত মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। বিনু এক ধাক্কা মেরে যে'দিক্ দিয়ে আসছিল সেদিকে নিয়ে চলে, ভাবে বড় রাস্তায় পুলিশের হাতে জিম্মা করে দেবে।

বেশ কয়েক পা সে ভাল মানুষের মত সঙ্গে সঙ্গে চলে, বলে না কিছু, জানায় না কোন আপত্তি। হঠাৎ একটি ছোট গলির বাঁকে ছিটকে গ্যাস পোষ্ট আঁকড়ে ধরে মাথা ঠুকতে থাকে। বিনু দেখে তার কপাল ফেটে রক্তের ধারা বইতে থাকে। লোকটি নিজের জামা কাপড় ফড়ফড় করে ছিঁড়ে

ফেলে; বুক পকেট থেকে কয়েকটা এক টাকার নোট নিয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়, আর সুরু করে চীৎকার—হাউ মাউ কান্না—আমায় মেরে ফেললেরে, লুট করলেরে, কে আছো রক্ষা করো!

এ কি নাটক! হকচকিয়ে বিনু ছেড়ে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ায়। তড়িৎগতিতে লোকটি এক সাপটে নোট ক'খানা তুলে নিয়ে দৌড় দে দৌড়! কি যেন কি হয়ে গেল!

আশপাশের বাড়ি থেকে দু'একজন করে লোক বেরিয়ে আসে, উপরের জানালা খুলে নানা বয়সের মুখ উঁকি মারে। অবস্থাটি মোটেই সুখকর নয়, বিনুকেও প্রায়-দৌড়ে সে স্থান ত্যাগ করতে হ'ল।

পরের দিন নাগপুরে রওনা হ'ল বিনু। হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যেতে যেতে মনে মনে তিনবার প্রতিজ্ঞা করলো আর কোনদিন কোন অবস্থাতেই কলকাতার মাটিতে পা দেবে না সে।

আমার পূজার উপহার

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"দিন রাত্ত ফ্যাচর ফ্যাচর হাঁচি ভালো লাগে না বাপু!" বল্ল বিনি। মাসিকপত্রের পাতা থেকে মুখ তুলে বল্ল।

"বা রে! হাঁচিরা কি আমার হাত ধরা যে দুষছ আমায়?" আমি বলি: "ওরা আমার অবাধ্য। ভয়ঙ্কর রকম বেয়াড়া।"

"এত ক'রে বলি, দাদা, একটু ব্যায়াম করো! হাত পা খেলাও খানিক! তা হলে তো আর এই সব সর্দ্দি টর্দ্দি কাছ ঘেঁষতে পায় না।" বিনি মুখ ভার করে।

"হাঁচিও কি একটা ব্যায়াম নয়? অন্ততঃ নাকের ব্যায়াম একে বলা যায় না কি? আর—আর এতে কি আমার হাত্ত পা খেল্‌ছে না?" বল্‌তে বল্‌তে একরাশ হাঁচি আমার নাসিকা-পথে এসে পড়ে—দস্তুরমত হাত পা খেলিয়ে। যেমন আমার হাত্ত পা খেল্‌তে থাকে তেম্‌নি আমার হাঁচিরাও খেলোয়াড়! তুখোর রকমের! পরস্পরের ক্রীড়ায় আমি তো কাহিল হয়ে পড়ি।

অবশেষে খেলার হাফ্‌ টাইম্‌ (কিংবা ইন্‌ট্যারভ্যাল্‌) এসে পড়লে হাঁচিরা থামে, আমিও হাঁপ ছাড়ি। যদিও ক্ষণেকের জন্যই থামা, তবু বড় কম রেহাই নয়! হাত্ত পার সঙ্গে মাথাও খেলাতে হয়েছিল, ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

"ব্যায়াম তো কতই করছি, কিন্তু থাম্‌ছে কই?" আমি বলি—গদ্যে-পদ্যে সুরু করি বল্‌তে—"বুঝ্‌লি কিনা বিনি, এই হাঁচি কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে, যতই ব্যায়াম করি তত যায় বেড়ে।"

"আমি কি ওই ব্যায়ামের কথা বলেছি? কেন, ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে কি হয়? ঘোড়ায় চড়া খুব ভালো এক্‌সারসাইজ্‌——"

"ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বল্‌ছিস? সে তো ঘোড়ার ব্যায়াম হবে, আমার কি? সেই তো হাত পা খেলাবে, ছুটোছুটি ক'রে মরবে—আমার তো তার পিঠে চেপে চুপ্‌চাপ্‌ ব'সে থাকা কেবল। পরের ঘোড়ার স্বাস্থ্য চর্চ্চায় নিজের বহুমূল্য সময় ব্যয় করতে বলিস্‌ তুই?" আমি অবাক্‌ হয়ে যাই: "যদ্দূর জানি, আমি অতটা পরোপকারী নই।"

ঘোড়ায় চড়ার কথা যদি বলো, ঘোড়ায় যে চড়ি নি কখনো তা নয়। চাপ্‌তব্য প্রাণীদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করলে ঘোড়ার চেয়ে বাইসিকেলকেই বাহন হিসেবে শ্রেষ্ঠতর আমি বল্‌ব। ঘোড়ায় চাপলেও পাদানীতে পা রাখতে হয়, সাইকেলেও। তবে সাইকেলের পাদানী ঘোরে, পা দিয়েই ঘোরানো চলে; ঘোড়ার পাদানী মোটেই তেমন ঘোরালো নয়; বরং বেশ স্থিতিস্থাপক।

এদিকে, সাইকেলের সীটের মত ঘোড়ার পিঠেও ঐ ধরণের একটা থাকে, তাকে জীন্‌ বলে। ঘোড়ার চলবার কালে মাঝে মাঝে ঐ সীটে তোমার বস্‌বার কথা—ব'সে পড়বার কথাই বটে। কিন্তু ঘোড়ার দুল্‌কি চালের তাড়নায় ঐ সীট্‌ টপ্‌কে কখনো বা তুমি ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে বস্‌ছ, কখনো বা তোমায় ওর লেজের কাছে গিয়ে বসতে হচ্ছে। তথাপি ঐ জীন্‌ ঘোড়ার শোভাবর্দ্ধনের জন্য নয়, আরোহীর উপবেশনের জন্যই, এ কথা জানানো দরকার। সাইকেলের সীটে যেমন ব'সে থাকা ছাড়া তোমার আর কোনো উপায় নেই, সাইকেল্‌ চালানোর সময়ে ওই সীট্‌ টপ্‌কে ইতস্ততঃ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব—ঘোড়ার বেলা ঠিক তা নয়। ঘোড়ার বেলায় ঐ জীনে বসতে পাওয়া—মাঝে মাঝে বস্‌তে পারা—সৌভাগ্যই বল্‌তে হয়।

তবে উভয় পক্ষেই তোমার বস্‌বার কি না বসবার কোনো স্বাধীনতা নেই—সমান নিরুপায় তুমি। এইখানেই দু'জনের মিল আছে আমি বল্‌ব।

তবে ঘোড়ার কোনো হ্যাণ্ডেল নেই সাইকেলের মত। হ্যাণ্ডেলের বদলে লাগাম লাগানো—তার সাহায্যেই ঘোড়াকে ঘোরানো ফেরানো চলে। এই সব বিবেচনা করলে ঘোড়া আর সাইকেলে এক চুলও তফাৎ নেই বলা উচিত। অথবা এক চুলই কেবল তফাৎ। এক চুলেরই তফাৎ—ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে চুল, আর সাইকেলের তা নেই।

এই সব অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া ক'রে বিনিকে আমি জানাইঃ "ঘোড়াকে নিয়ে ব্যায়াম করলে ঘোড়ার হয়ত উপকার হতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে খুব বেদনাদায়ক হবে। আমি আবার পাদানীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়া চালাতে পারি নে। আর বসতে হলেই তো আমি গেছি! অত কষ্ট ক'রে ব্যায়ামচর্চ্চা করার চেয়ে আমি বরং মাঝে মাঝে সর্দ্দি কাসিতে ভুগ্‌ব, সেও ভালো।"

"তোমার ভালো তুমিই জানো। এমন কি, কবিরাজ সোমেশচন্দ্র সেনের চেয়েও ভালো জানো তুমি।"

"কবিরাজি বই পড়া হচ্ছে বুঝি আজকাল?" আমি অভিযোগের স্বরে বলিঃ "কিন্তু সাবধান, ও কিন্তু কবিতার বইয়ের চেয়েও অপকারী।"

বিনি মাসিকপত্র খানা আমার হাতে চালান্ দিল—যেখানটা পড়ছিল, চোখে পড়ল আমার। "পড়ে দেখো, ছাপার অক্ষরেই লেখা রয়েছে।" বল্ল সে।

"প্রাচীন আর্য্যদের সনাতন ব্যায়াম রীতি"—পেল্লায় এক প্রবন্ধ! ঐ কবিরাজের লেখা। সে যুগের অশ্বঘোষের সময়ে যা রীতিমত ছিল এখন আমার একালে তা ভীতিপ্রদ হলেও উক্ত ব্যায়াম ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যোন্নতির আর কোনো ভরসাই নেই—স্পষ্টাক্ষরেই একথা বলা রয়েছে।

এবং কেবল অশ্বে গিয়েই ভদ্রলোক থামেন নি, তারপরও এগিয়েছেন। মুক্ত বাতাস, উপযুক্ত খাদ্য এবং প্রাতরুত্থানের মহিমা কীর্ত্তন করতেও তিনি ভোলেন নি। প্রাতরুত্থান! বলে কী লোকটা! ভাবতেই তো মাথার সমস্ত চুল আমার খাড়া হয়ে উঠল।

ছাপার অক্ষরে বিনির প্রগাঢ় বিশ্বাস। আর এই ধরণের হিতকর যত লেখা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু মামুলি লেখা তো প্রায় সব কাগজেই দেখা যায়। সাধারণ পাঠক এ সব সন্দেহের চক্ষে দেখে, বিশ্বাস না করেই পড়ে যায়, তারপর ভুলে যেতেও বেশী দেরি করে না। আমার মত যারা বিচক্ষণ পাঠক তারা এ সব পাতা ডিঙিয়ে গিয়ে গল্পের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই ভালোবাসে। কিন্তু বিনি আমার মত পাঠক নয়, এবং বোধ হয় আমার মত বুদ্ধিমান্ নয়। ছাপার অক্ষরে যা যা বেরোয় ওর কাছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

কিন্তু ছাপার অক্ষরের রহস্য আমার কাছে অজানা নয়। কি ক'রে লেখা ছাপানো হয়ে থাকে তার কি কিছুই আমি জানি নে? এবং লিখতেও এক আধটু জানি বোধ হয়? কাঁটা দিয়ে কি ক'রে কাঁটা তুলতে হয় দেখে নিচ্ছি আমি।

"বেশ, তুই যখন এত ক'রে বল্‌ছিস্, করব ব্যায়াম।" বিনীত হয়ে বলিঃ "সাইকেল একটা কিন্‌ব না হয়।"

"আহা! আর্য্যরা যেন সাইকেলে চেপেই ব্যায়াম করত!" বিনি বলে।

"তা হলে ঘোড়াই সই! আর্য্যোচিত ব্যায়াম-কার্য্যই করা যাক্।"

তারপর দিন কতক গেছে, আমি একদিন একখানা মাসিকপত্র পড়ছি—পড়তে পড়তে উৎসাহে আমায় চেঁচিয়ে উঠ্‌তে হোলোঃ "বিনি, দেখেছিস? ... এই লেখাটা দেখেছিস্ নাকি?"

"কোন্ লেখা?" বিনি তার বইয়ের পাতা থেকে চোখ তোলে।

"খুব তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। 'ব্যায়াম চর্চ্চার অপকারিতা।' কবিরাজ সোমেশচন্দ্রের সেই লেখাটার প্রতিবাদ করেছেন, ডাক্তার গোমেষ দত্ত।"

"বটে? পড়ো তো দেখি!" বিনির চোখ বড় বড় হয়।

"আমি আগাগোড়া পড়ে দেখলাম, দিব্যি লেখা! এ রকম চিন্তাশীল, সুলিখিত, চিত্তোত্তেজক প্রবন্ধ প্রায় চোখে পড়ে না। সত্যিকারের অভিজ্ঞ লোকেরাই এই ভাবে এমন ক'রে লিখতে পারে——"

"আহা, পড়োই না ছাই! তোমার প্রশংসাপত্র চাইছে কে?"

"পড়বই তো। পড়ব না তো কি? তোমার সোমেশ কবরেজের সমস্ত যুক্তিতর্ক এ ভদ্রলোক টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন যে ব্যায়াম করার মত বোকামি আর কিছুই নেই। আর প্রাতরুত্থান—প্রাতরুত্থান সম্বন্ধে বলেছেন—"

বিনি আমার হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে নিজেই গড় গড় ক'রে পড়তে আরম্ভ করেঃ

"সব জিনিসের মত ব্যায়াম নিয়েও বাড়াবাড়ি করা কিছু নয়। বহু ব্যায়ামবীরকে প্রায়ই অকালে দেহত্যাগ করতে দেখা যায়, অথচ জীবনে কখনো মুগুরের কাছ দিয়ে ঘেঁষে নি এমন বিস্তর অব্যায়ামীকে জরাজীর্ণ দেহে ঘুরফির করতে আমরা দেখি। তার মানেই তারা দীর্ঘজীবী হতে পেরেছে। এবং ব্যায়াম না করেই সেটা হয়েছে। ব্যায়াম আর ব্যারাম বল্‌তে গেলে এক কথা, কেবল উচ্চারণের তারতম্য। সুস্থ শরীরকে অকারণে আর মুহুর্মুহু ব্যস্ত করা ব্যাধি ছাড়া আর কি? আমাদের ওঠা বসায়, নড়া চড়ায়, আর বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতেই, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে আর অজ্ঞাতসারে যে ব্যায়াম হয়ে যায়, একজন লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট। এর বেশি করতে যাওয়াই বোকামি। সাইকেলের সঙ্গে ঘোড়ার যদিও বা কয়েক চুলের পার্থক্য দেখা যায়, ব্যায়ামের সঙ্গে ব্যারামের তাও নেই। সত্যি ক'রে বল্‌তে, বিন্দুমাত্রও তফাৎ নেই বলা উচিত, কেননা য়-এর তলাতেও ফুট্‌কি রয়েছে আর র-এর তলাতেও——"

এই পর্য্যন্ত পড়েই বিনি থম্‌কে যায়। অত্যন্ত হঠাৎ থামে। "কে লিখেছে এটা?" জিজ্ঞেস করে আমাকে।

"আমি কি ক'রে জানব? অমি কি গোমেষ বাবুকে চিনি? নিশ্চয় একজন পণ্ডিত লোক, কিংবা নামকরা ডাক্তার কোনো।"

"এ তো তোমার লেখা, পড়লেই ধরা যায়।" বিনি পাতা মুড়ে রাখে, পড়ে না আর।

"আমার লেখা!" আমি আকাশ থেকে পড়ি।

"লেখার আগাপাশতলাই তো তোমার ব্যারাম দেখছি।" বিনি ঠোঁট ওলটায়:

"ব্যারাম কিংবা ব্যায়াম—যাই বলো!"

"যদি হয়ই আমার লেখা তাতে কি?—" আমি কাবু হয়ে পড়ি: "ছাপার অক্ষরে লেখা তো?—যেই লিখুক, ছাপার অক্ষরে কখনো মিথ্যে কথা ছাপা হয়? কী যে বলিস!"

"গোমেষ দত্ত নাম দেখে গোড়াতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তোমার লেখা! কিন্তু সেই কাগজের লেখাটা ছিল আ স ল লেখকের।"

এ কথার কোনো জবাব আমার মুখে যোগায় না। আমি যে আসল লেখক নই, এমন কি ছাপার অক্ষরে বেরোলেও আমার লেখারা অবিশ্বাস্য, এত বড় নাস্তিক আমার এত কাছাকাছি আমি কোনোদিন কল্পনা করতেও পারি নি!

কিন্তু এর চেয়েও কল্পনাতীত কাণ্ড যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তাই কে জানত!

"তোমার জন্য আমার এবারকার পূজোর উপহার আমি ভেবে রেখেছি। এক্ষুণি ভেবে পেলাম। খুব চমৎকার হবে।" চিন্তিত ভাবে বিনি জানাল।

"বটে?" আমি সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকাই। "কী শুনি?"

"সত্যি চমৎকার!" বিনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: "একযোড়া দিশী মুগুর—খুব ভালো আর ভারী। আর স্যান্‌ডোর স্প্রিং গ্রিপ্ ডাম্বেল্। আর যদি লীডারম্যানের চেষ্ট্ এক্‌স্‌প্যাণ্ডার পাওয়া যায় বাজারে তা হলে তার এক সেট্। আর যদি টাকায় কুলোয়——" দুষ্টু হাসি খেলে যায় ওর মুখে—"তা হলে তোমায় ভোর বেলায় ডাকাডাকি ক'রে তুলবার জন্য গোটা দুই য়্যালার্ম্ ক্লক্!"

এই সবই হচ্ছে আমার এবারের পূজার উপহার। অমি দিচ্ছি নে দুঃখের বিষয়, আমিই পাচ্ছি।

ধান কই?

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এম্. এ

ধান কই, ধান কই?
ধূ ধূ করে রাঙা বাট, ধূসর দূরের মাঠ,
বনে বনে ফাটে কাঠ, পাখীদের গান কই?
আগুন লেগেছে কোথা! আকাশের গায়ে ঐ?
চাষীদের ঘরে আর মহাজনী নায়ে ঐ?
জল দিয়ে এ আগুন নিবাবার জান্ কই?
গোরুদের ঘাস আর ঘোড়াদের দানা নেই,
বেড়া-ভাঙা ছাগলের বাগানে ত' হানা নেই!
ছেলে-বুড়ো কাঁদে আর দোকানেতে বাঁধে সার,
বউরা না রাঁধে আর, থাকে তার মান কই?
ভদ্র-ইতর নেই,—ধান দাও মুঠি-ভর,
এক মুঠো টাকা নাও, যোড় করি দুটি কর।
ভুখারীকে ভিখ্ দাও, বাঁচে আর প্রাণ কই?
ধান কই?

জমেছে কি কালো মেঘ গগনের পারে ঐ?
বাতাসে কি লাগে বেগ সাগরের ধারে ঐ?
চাষী কি ঘুমালো আজ, ফালে তার শাণ্ কই?
অঝোরে ঝরিছে জল, ভেসে গেলো ভূমি-তল,
গান গায় ঝিঁঝিদল, শুনিবার কাণ কই?
ভরা গাঙে ঝরা জল ফুলে ফুলে ওঠে ঐ,
বাঁধ-ভাঙা রাঙা জল ক্ষেপে মেতে ছোটে ঐ।

চাষী কি জেগেছে, ভাই ? দেহে তার সান কই ?
বীজ বোনা সারা যেই এলো বান উতরোল,
গাঁয়ে গাঁয়ে ক্ষ্যাপা জল ঘরে ঘরে দেয় দোল।
এ দোলায় খাড়া রয় এমন জোয়ান্ কই ?
ধান কই ?

শরতের শাদা মেঘ ভেসে ভেসে যায় ঐ,
মাঠে মাঠে ছায়া ফেলে হেসে হেসে যায় ঐ।
পূজো এলো, পথে পথে আগমনী-গান কই ?
ধান কই মাঠে আজ ? কিনেছো পূজোর সাজ ?
ঢেকেছে দেহের লাজ, হয়েছে মানান-সই ?
গোলা-ভরা ছিল ধান ? মিছে কথা চাষী তোর,
দেশ কা'র ? জমি কা'র ? শুনে পায় হাসি ঘোর।
স্বপ্ন দেখিস্ ভাই ? ঘুমের আসান কই ?
চাষী তোর গোরু নাই, লাঙল কি মই নাই ?
বউ তোর রাঁধে নাই ? ছেলেমেয়ে কই ভাই ?
সবাই মরেছে ? তবে তোর সে শ্মশান কই ?
ধান কই ?

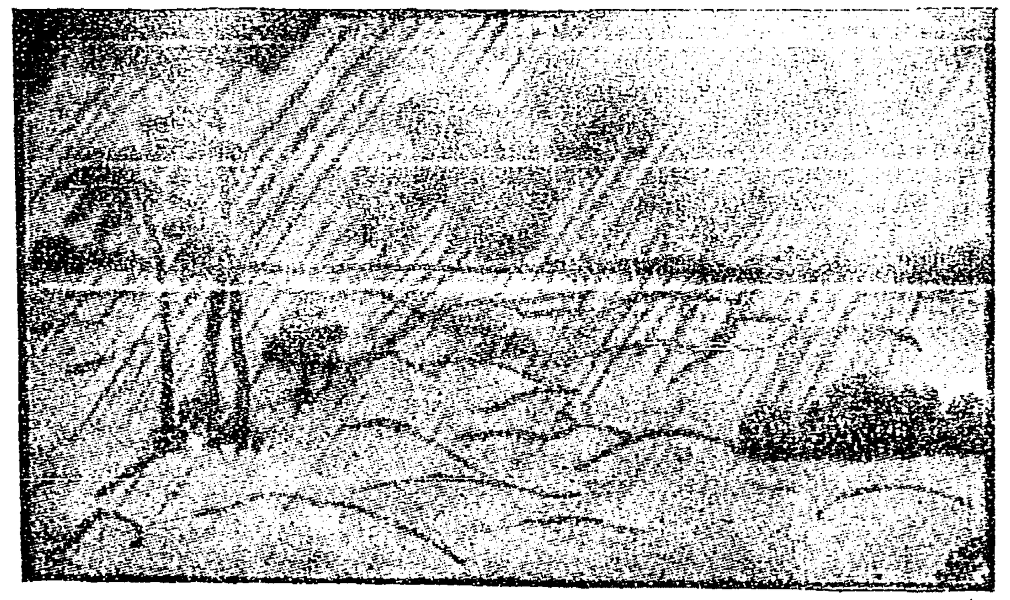

পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

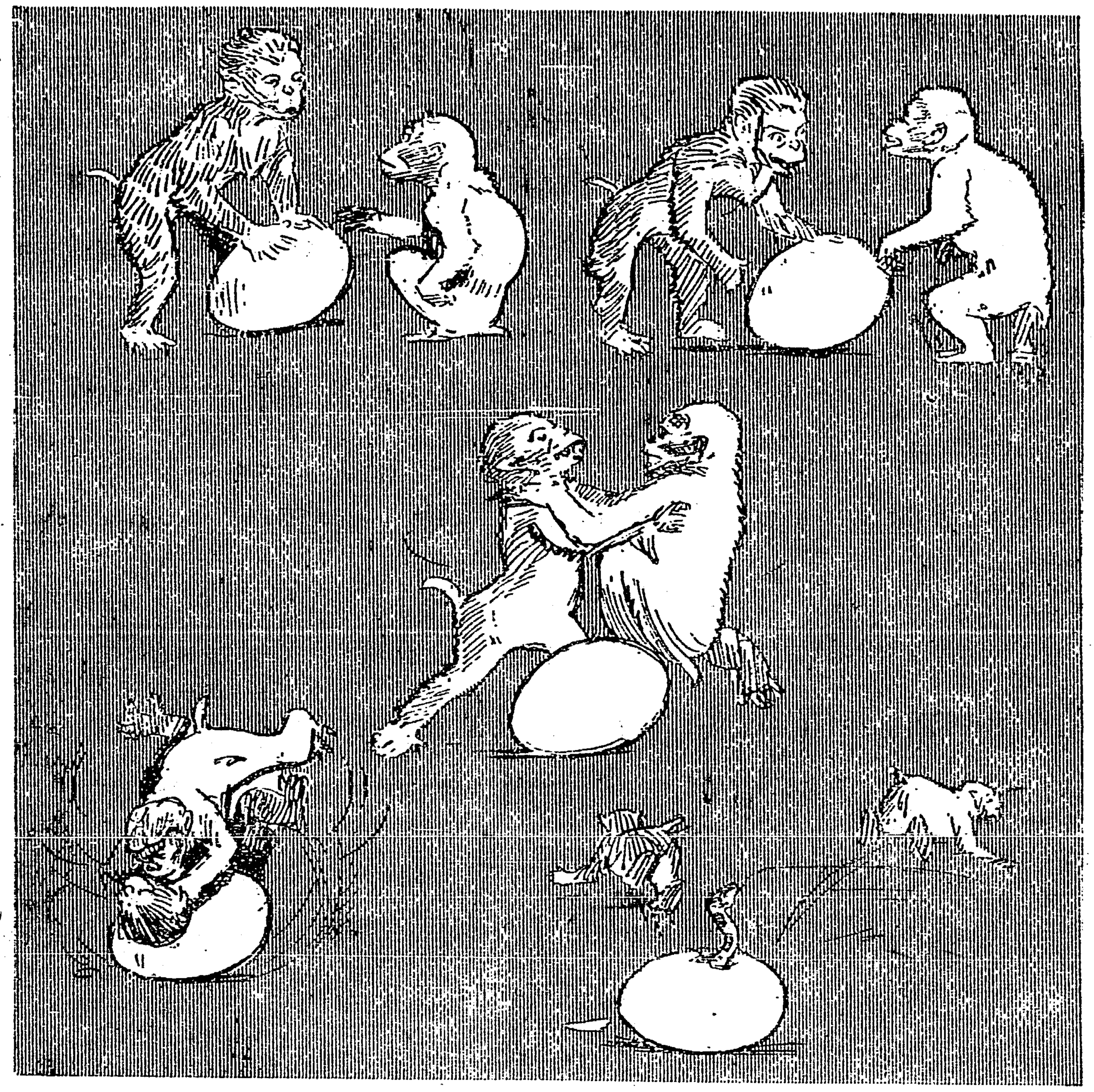

না-বলা গল্প

উপরের ছবিখানা দেখে একটি কবিতা লিখতে হবে। সেই কবিতা অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। কবিতা আগামী ১লা কার্ত্তিকের মধ্যে রামধনু-সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। কেবল মাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকারাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও নিজের গ্রাহক নং থাকা চাই। ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের মতামতই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

যুদ্ধ-পাগল জার্মানী

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

পৃথিবীতে একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন যে জাতির জীবনে যুদ্ধ কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং উপভোগ্য। যুদ্ধই এঁদের মতে গৌরবের সিঁড়িতে এবং জাতে ওঠার একমাত্র উপায়। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ সম্বন্ধে এই চণ্ডনীতি প্রচার করে যাঁরা প্রসিদ্ধ হয়েছেন আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই জাতিতে জার্মান্; আরও আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে এই যে এই সকল উগ্র যুদ্ধপন্থী যে কেবল রাজনৈতিক বা সুবিধাবাদীদের মধ্যে থেকেই এসেছে তা নয়, নামকরা সাহিত্যিক এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিকেরাও জার্মানীতে এই দল ভারী করেছেন।

প্রথমে একজন বিখ্যাত জার্মান্ সাহিত্যিক এবং দার্শনিকের কথা বলছি। এঁর নাম নীট্‌শে। মনে রেখ ইনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ইনি নিছক দার্শনিক এবং সাহিত্যিক। নীট্‌শে যুদ্ধকে মানবের একটা বিশেষ গৌরবের জিনিষ বলে বার বার তার গুণ গেয়েছেন। তিনি বলেন যে কোন জাতি যদি বড় হতে চায় তা হলে যুদ্ধ তার পক্ষে অপরিহার্য্য। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে "বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ করে তারাই যারা যুদ্ধে নামতে কখনও দ্বিধাবোধ করে না।" তাঁর আরও দু' একটি মতামত তোমাদের উদ্ধৃত করে শোনাচ্ছি; ভাবলেও আশ্চর্য্য হতে হয় যুদ্ধ সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর এই জার্মান্ দার্শনিকের সঙ্গে বর্ত্তমান নাৎসী দলের মতের কি অদ্ভুত মিল রয়েছে! নীট্‌শে বলেছেন—"শুধু কর্ম্ম নয়, যুদ্ধ কর। সন্ধি নয়, বিজয়ের দিকে চল। যুদ্ধই হোক তোমার কর্ম্ম।.........পুরুষদের গড়ে তুলতে হবে যুদ্ধের জন্য, নারীকে গড়ে তুলতে হবে যোদ্ধার মা হবার জন্য।" যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর এই সব মতামত গত যুগের ইয়োরোপের এবং বিশেষ করে জার্মানীর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে অনেকে মনে করেন যে গত মহাযুদ্ধের জন্য নীট্‌শের এই মতগুলিই পরোক্ষভাবে অনেকটা দায়ী।

আর একজন জার্মানের কথা বলছি; ইনি মোটেই দার্শনিক ন'ন, একেবারে পুরোদস্তর কর্ম্মী। ছলে, বলে, কৌশলে—যে রকম ভাবে হোক—জার্মানীকে ইয়োরোপের সর্ব্বপ্রধান দেশ করাই ছিল এঁর একমাত্র অভিপ্রায়। এঁর নাম হচ্ছে অটো ফন্ বিস্‌মার্ক্। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়ার প্রধান মন্ত্রী হয়েই ইনি সগর্ব্বে বলে ওঠেন—"এ যুগের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান বাক্যের দ্বারা হবে না, হবে রক্ত এবং লৌহদ্বারা।" জার্মান্-চিত্তকে ক্রমাগত এরূপ সাড়ম্বর কথায় উত্তেজিত ক'রে তুলে ইনি জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র করে তোলেন। ফলে এঁর সময় জার্মানী যুদ্ধবিদ্যায় এবং

কূটনীতিতে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠ্‌লেও দর্শনে এবং বিজ্ঞানে তার অত্যন্ত অবনতি ঘটে। বিসমার্কের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত জার্মান্ তাই বলেছেন—"বিসমার্ক্ জার্মানীকে বড় করেছেন কিন্তু জার্মান্‌দের ছোট করেছেন।"

বিসমার্কের চেয়ে উগ্রতর যুদ্ধপন্থী ছিলেন জার্মান্-সম্রাট্ কাইজার দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌ম্। ইনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে জার্মানী জগতের সকল জাতির সর্দ্দার হতে চায়; সে চায় সূর্য্যের নীচে (অর্থাৎ গরম দেশে) তার সাম্রাজ্য; সে সমুদ্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল দেশে তার "Kultur" অর্থাৎ সংস্কৃতি ছড়ান। বস্তুতঃ এ সকল লম্বা চওড়া কথায় রেগে গিয়ে ইয়োরোপের প্রায় সকল জাতিই জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং তা থেকেই হ'ল গত মহাযুদ্ধের সূত্রপাত।

গত মহাযুদ্ধে হেরে গিয়েও জার্মান্‌দের যুদ্ধ-লিপ্সা যে বিশেষ কমেছিল তা মনে হয় না। যুদ্ধ থামবার কয়েক বৎসর পরেই অস্‌ওয়াল্ড স্পেঙ্গ্‌লর নামক একজন জার্মান্ দার্শনিক "পশ্চিমের পতন" নামে একখানি পুস্তক লেখেন। এই 'বইএ তিনি যে সব মত ব্যক্ত করেছিলেন তা' শুনে সারা জগতের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এই পুস্তকের এক স্থানে তিনি বলেছিলেন যে বিশ বৎসরের ভেতর সমস্ত জগৎকে আর এক যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে যাকে মহাযুদ্ধ বলা চল্‌বে না, বলতে হবে মহত্তর যুদ্ধ। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। স্পেঙ্গলর হিংসানীতির একজন চরম সমর্থক ছিলেন। হিংসা সম্বন্ধে ইনি এমন লম্বা লম্বা কথা বলেছেন যে তাঁর নাম জানা না থাকলে তোমরা হয়ত ভাবতে হিট্‌লার বা মুসোলিনীর মুখ থেকেই বুঝি সে সব কথা বেরিয়েছে। এঁর দু'একটি মত উদ্ধৃত করে তোমাদের শোনাচ্ছি: "মানুষ হচ্ছে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির ন্যায় হিংস্র প্রাণী। সে সাহসী, চতুর অথচ নিষ্ঠুর।... আদর্শ বলে কোন কিছু থাকতে পারে না; আদর্শ কাপুরুষতা। জীবনের মত জীবন যদি যাপন করতে হয় তা' হলে করতে হবে ব্যাঘ্রের মত জীবন যাপন। শান্তি, সহানুভূতি এবং মিটমাটের জন্য যারা ব্যস্ত তারা হচ্ছে দন্তহীন ব্যাঘ্র; দাঁত নেই বলেই তারা হিংসায় বীতরাগ হয়েছে। মানুষ হবে সিংহের মত; তার গুহায় সমশক্তি কোন প্রাণীর অবস্থান সে সহ্য করবে না।" অতএব ধর অস্ত্র, কর যুদ্ধ।

বর্ত্তমানে জার্মান্ রণোন্মাদনার সর্ব্বাপেক্ষা একনিষ্ঠ নেতা হচ্ছেন এডল্‌ফ্ হিট্‌লার। ইহুদীদের এবং ইয়োরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে জার্মানীর কলহের যে কারণ ইনি নির্দ্দেশ করেছেন তা শুনে স্বতঃই মনে হয় কথামালার নেকড়ে বাঘ এবং মেষশাবকের গল্প। হিট্‌লার জার্মান্‌দের ক্রমাগত উত্তেজিত করছেন যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চল্‌বার জন্য। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—"Drang nach Osten; Drang nach Westen"—পূবে এবং পশ্চিমে

জার্মান্‌দের সশস্ত্র বিজয়াভিযান। হিটলারের প্রিয় শিষ্য হারমেন গোয়েরিংও কম যান না! তিনি এক বক্তৃতায় বলেছেন—"সত্যিকারের জার্মান্‌রা তাদের রক্ত দিয়ে চিন্তা করে।" ডাঃ গোয়েবল্‌স্‌ আর একটু ওস্তাদি করে বলেছেন—"দলপতি হিটলার হচ্ছেন ভগবানের অবতার; তিনি যখন আমাদের যুদ্ধ করতে বলেছেন তখন ধরে নিতে হবে ভগবানের তা অভিপ্রেত। অতএব, জার্মান্‌রা আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। কখনও কোন প্রশ্ন করবে না।"

যুদ্ধের স্বপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি তোমাদের শোনালুম! যুদ্ধের বিপক্ষে বলেছেন এমন শান্তিবাদী ব্যক্তিও পৃথিবীর নানা দেশে অনেক আছেন। কিন্তু তোমরা নিজেদের চোখের সামনে পৃথিবীর ভীষণতম সমর দেখ্‌ছ; যুদ্ধের সু এবং কু দুটো দিক্‌ই তোমাদের নিকট নিশ্চয়ই অনেকটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তোমরা নিজেরা কোনদিন ভেবে দেখেছ কি যুদ্ধ জিনিষটা ভাল না খারাপ?

কলির শেষ

শ্রীসুবোধ বসু

১৫ই শ্রাবণের কথা ভাবিয়া অধরের ধড়ে আর প্রাণ নাই। ইস্কুল হইতে শুনিয়া আসিয়াছে যে সেদিনই নাকি কলির শেষ—চারি পোয়াই পূর্ণ হওয়ায় এইবার সৃষ্টি লয় হইবার সময় আসিয়াছে। কোন্‌ এক পাঁজিতে নাকি ১৫ই শ্রাবণের পর অপ্রয়োজন বোধে আর গণনাই দেওয়া হয় নাই। ইংরেজীর মাষ্টার মশায় অমিয় বাবু অবশ্য একজন রীতিমত নাস্তিক; তিনি বলেন, '১৫ইর পর গণনা দেবে, তার কাগজ পাবে কোথায়? যুদ্ধের বাজারে কাগজ জোগাড় কি যার তার কর্ম্ম? কিন্তু অমিয় বাবুর কথা আলাদা; তিনি তো কল্কি অবতারকে পর্য্যন্ত মানেন না, বলেন, 'কল্কেতে বিশেষ এক প্রকার পদার্থ প্রদান করিয়া টানা মাত্র—এই অবতারটি হাজারে হাজারে জন্মগ্রহণ করেন'—পদার্থটি যে গাঁজা তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

অধর এবং তাহার বন্ধুরা এই মত মানিয়া লইতে পারে নাই। দু'এক বৎসরের মধ্যেই তারা ম্যাট্রিক পাশ করিবে, কলেজে পড়িতে যাইবে, কত দাঁত-ভাঙা তত্ত্ব না বিচার করিবে; তারা বুঝি আর একটু-আধটু ভাবিতে শেখে নাই? হিন্দু হইয়া পাঁজি, হাঁচি, টিকটিকি এ সব অবিশ্বাস

করে কি করিয়া? চতুর্দ্দিকেই তাহারা প্রলয়ের আভাস দেখিতেছে। দেশে চালের অভাব দেখা দিয়াছে কেন? দামোদরে বন্যা হইল কেন? মধ্যপ্রদেশে রেল-কলিশন হইল কি কারণে? এটনার আগ্নেয়গিরি এতকাল চুপচাপ থাকিয়া আবার ধোঁয়া ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে কেন? দাও, কি জবাব দিবে? কিন্তু ক্রমশঃই অধিক ফুলিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ফাটিয়া-যাওয়া বেলুনের মতো যে দিন মুসোলিনী "ভূপাতিত" হইল সে দিন ইহাদের মন হইতে সন্দেহের ক্ষীণতম ছায়াও দূর হইয়া গেল। প্রলয় যে আসন্ন এ বিষয় জলের মতো পরিষ্কার হইয়া গেল।

ক্যাব্‌লা আধ-উৎসাহের সঙ্গে কহিল, 'ভয় কি, সত্যযুগ আসছে, ভয় কি…?'

বিষ্টু বলিল, 'এই চারটে পয়সা আছে, লজেঞ্জুষ খেয়ে আর দরকার নেই, দিয়ে দিই খোঁড়াটাকেই, পরজন্মের কাজ করে যাই…মাকে না বলে সরিয়ে এনেছিলাম…'

হাঁদু বলিল, 'সেকেণ্ড টার্মিন্যাল্‌টা আর দিতে হবে না…প্রশ্নের অঙ্কগুলি দেখলেই মাথা কেমন ঘুলিয়ে যায়।…ও কি, জপ কচ্ছিস নাকি অধর! অনুস্বার বিসর্গ ছিট্‌কে বেরিয়ে আসচে মনে হচ্চে…?'

অধর চক্ষুস্থির রাখিয়া উদাত্ত কণ্ঠে কহিল, 'গীতার একটা মন্ত্র। সংস্কৃত ক'রে বল্লে তার একটি বর্ণও বুঝতে পারবি না।'

'তা বাংলা করেই না হয় বললি।' হাঁদু কহিল, 'সংস্কৃত নিই নি বলে কি মন্ত্রের সুফল থেকে বঞ্চিত হবো?'

বিষ্টু বলিল, 'একা একা স্বর্গে গেলে তো মুস্কিলে পড়বি? লাট্টু ঘোরাবি কার সঙ্গে?'

ক্যাবলা কহিল, 'স্বর্গ নয়, সত্যযুগ…। বল্‌ ভাই মন্ত্রটা, সত্যযুগটা একবার দেখতেই হবে…সত্যযুগে মোহনবাগানের ফর্ম্ম্‌টা কেমন হয় একবার দেখিস্‌…।'

অধর চক্ষু নিমীলিত করিয়া কহিল, 'আর্য্য ঋষিরা বহুযুগ পূর্ব্বেই ১৫ই শ্রাবণের ধ্বংসের কথাটা গীতার পৃষ্ঠায় বলে গেছেন। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি—মানে যখন পাপে পৃথিবী ভ'রে উঠবে, ঠিক তখন ভগবান্‌ অবতার হয়ে উপস্থিত হবেন, হ'য়ে সব চুরমার ক'রে, পৃথিবীতে আবার সত্যযুগ বিছিয়ে দিয়ে, পরের মুহূর্ত্তেই অন্তর্দ্ধান হবেন।'

হাঁদু বলিল, 'ঐ গা ঢাকা দিয়েই তো মুস্কিল করেন; কোন্‌টা পাপ আর কোন্‌টা পুণ্য জিজ্ঞেষ ক'রে নেওয়া যায় না।'

অধর গম্ভীর হইয়া কহিল, 'রাত আর দিন চিনতে পারিস আর পাপ পুণ্য চিনতে পারিস না? পাপে পাপে পৃথিবী ভ'রে গেছে; চলতে পাপ, বসতে পাপ, খেতে পাপ, শুতে পাপ।

পাপ বাতাসে, পাপ আলোয়, পাপ শব্দে, পাপ গন্ধে। পাপ ইয়োরোপে, পাপ এশিয়ায়, পাপ আফ্রিকায়, পাপ অষ্ট্রেলিয়ায়···।

'আর আমেরিকায় ?' ক্যাবলা জিজ্ঞাসা করিল।

'আমেরিকা বয়সে নতুন হলেও, পাপে তিনিও কম যান না। যন্ত্র দিয়ে পৃথিবীটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। যন্ত্রের শেষ টুকরো পর্য্যন্ত ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে না পারলে সত্যযুগের আসার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভয় নাই, ১৫ই শ্রাবণ এসে পড়েছে, আর ভয় নাই···'

কিন্তু সঙ্গীদের এমন ভাবে বরাভয় দিলে কি হইবে, শাস্ত্রজ্ঞ অধরকুমার ১৫ই শ্রাবণের দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই আর ঘরের বাহির হইতেছেন না। স্কুল কামাই হইতেছে, সঙ্গীরা খেলিতে ডাকিতে আসিয়া শুনিতেছে তাহার শরীর ভালো নাই। অধর পেট ভরিয়া খায় না, রাত ভরিয়া দুঃস্বপ্ন দেখে, আকাশের কোণায় কোণায় গুপ্ত অমঙ্গলের চিহ্নাদি দেখিয়া শিহরিয়া শিহরিয়া ওঠে। আসন্ন প্রলয়ের ছায়াটা তাহার মুখের উপর বেশ ভারি রকম এক কালো ছায়া ফেলিয়াছে।

মা বলেন, 'আজ একবার ডাক্তার বাবুকেই খবর দিই—এ রকম না খেয়ে না ঘুমিয়ে সুস্থ লোক থাকতে পারে? নিশ্চয়ই কিছু অসুখ-বিসুখ···নিজে কি সব টের পাওয়া যায়, তবে ডাক্তার আছে কি জন্য ?'

'এ ডাক্তার ফাক্তারের কর্ম্ম নয়,' অধর দার্শনিকের মতো কহিল। 'খবর দিতে হয় একবার বিঘ্নেরত্ন ঠাকুরকে ডাকাও; তিনি এসে একটা যাগযজ্ঞ করুন···গ্রহতুষ্টির ব্যবস্থা করুন···'

'যাগযজ্ঞ ?' মা সবিস্ময়ে কহিলেন। 'কেন, হলো কি ? এ সব আবার শিখলি কোত্থেকে ? ও খোকা, এ সব বলছিস কি ? রাতে না ঘুমতে না ঘুমতে শেষে মাথার কিছু গণ্ডগোল হলো না তো···কি সর্ব্বনাশ !'

'১৫ই শ্রাবণ !' অধর সংক্ষেপে কহিল।

মার দুই চোখে আশঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল; এ যে স্পষ্ট প্রলাপ!

'১৫ই শ্রাবণ ? তাতে কি হলো ?'

'প্রলয়। সৃষ্টি লোপ, কলির অবসান; ভূমিকম্প, সাইক্লোন, আগ্নেয়গিরি, দাবানল, হেইল্ ষ্টর্ম্ ষ্ম্যাণ্ড ফিউরি, গ্রহেতে গ্রহেতে কলিশন···'

মার আর সন্দেহ রহিল না; ছুটিয়া ডাক্তার বাবুকে টেলিফোন করিতে গেলেন। বলিলেন, 'চোখ লাল, ঘোলাটে চাউনি, কপালের রগ ফোলা, প্রলাপ বকছে, শীগ্‌গির আসুন।'

ডাক্তার আসিয়া দু'দিন হয় অধরকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছেন। স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত, বিশ্রাম এবং নিদ্রার প্রয়োজন। ব্রোমাইড মিক্‌শ্চার চলিতেছে। অবসন্ন দার্শনিক যেমন ভাবে

অর্ব্বাচীনদের অব্যবস্থা সহ্য করেন, অধরও তেমনি ভাবে এ সকল সহ্য করিতেছে। কিন্তু মনে মনে ইহাদের বুদ্ধির অভাবের কথা বিবেচনা করিয়া সে কৃপার হাসি হাসিতেছে। বিভীষিকা তাহার কিছুই কমে নাই, তবে ব্রোমাইডের দৌরাত্ম্যিতে মগজ বেশিক্ষণ চিন্তা কবিবার অবস্থায় থাকে না।

এইরূপ ভাবে প্রলয়ের দিন আসিয়া পড়িল। ভোরে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিতেই সম্মুখের দেওয়াল-পঞ্জিকাটায় দৃষ্টি পড়িল। যেন পায়ের কাছে সাপ দেখিয়াছে, এমনি ভাবে অধর শিহরিয়া উঠিল, শিহরিয়া চোখ বন্ধ করিল। কিন্তু চোখ বুজিয়া সর্ব্বনাশ এড়ানো যায় না। ১৫ই শ্রাবণ আকাশে আকাশে ভীম নিনাদ করিয়া উঠিল, মাটির নীচেকার বাসুকীর ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণায় তাহা ধ্বনিত হইল। অদৃশ্য গ্রহগুলি হইতে মাতালের অর্দ্ধ-উচ্চারিত কথার মতো এই সর্ব্বনাশা তারিখটা বারবার উচ্চারিত হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া অধরের ব্রোমাইডের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন।

কিন্তু অধর ভুল করে নাই। শাস্ত্র মিথ্যা নয়, পাঁজি বুজ্‌রুকি নয়। মধ্যরাত্রে সহসা পৃথিবী কাঁপাইয়া ঝড় উঠিল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন একজন মরণাহত দৈত্য দিগন্তভেদী চীৎকার করিয়া ছুটিতে লাগিল; গাছপালাগুলি যেন এতদিন পরে কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইয়া একযোগে আর্ত্ত নিস্ফল প্রার্থনা সুরু করিয়া দিল; আবর্ত্তিত বাতাস ক্রুদ্ধ সাপের মতো চতুর্দ্দিকে বিষাক্ত ছোবল মারিয়া ছুটিতে লাগিল। সহসা পৃথিবীর অন্তস্থল হইতে একটা অপার্থিব শব্দ শোনা গেল। মাটির তলায় যেন অযুত অশ্বশক্তির কোটি কোটি বয়লার ফাটিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—গুরু গুরু, গর গর, গুম্ গুম্। এই মিলিত শক্তি ক্রমেই ঠেলিয়া উপরে উঠিতে লাগিল; মাধ্যাকর্ষণ যেন ছাড়া পাইয়া মাটির বন্দীশালা হইতে ছুটিয়া পালাইয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। দালান, বাড়ি, কোঠা মাতালের মতো টলিয়া টলিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, মাটি টোল্ খাইতে লাগিল। সহসা লক্ষ বজ্রপাতের মিলিত শব্দে আকাশটা যেন ভাঙা বাড়ির ছাদের মতো পৃথিবীর উপয় ভাঙিয়া পড়িল মনে হইল। সংখ্যাতীত গ্রহ নীহারিকা আকাশব্যাপী আতসবাজীর মতন টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে—নিয়ম-ভ্রষ্ট গ্রহ-তারকারা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ করিতেছে। প্রলয় আসিয়াছে। অধর দাঁতে দাঁতে চাপিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ক্রমে সব কিছু শান্ত হইয়া গেল; সংঘর্ষ, সংঘাত, আলোড়ন সব দূর হইল। সুগন্ধ বাতাস উঠিল, সুমিষ্ট বাঁশীর সুরে আকাশ ভরিল, অতি স্নিগ্ধ কোমল আলোয় কুটিল অন্ধকার দূর হইল। অধর নিজের মুখে হাত দিল, চোখে হাত দিল, পা দুইটি অনুভব করিল, মাথা চুলকাইয়া দেখিল। বুঝিল সে মরে নাই। তাহার প্রার্থনাই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। সহর্ষে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। দেখিল, শরীরে সামান্য মাত্র অবসাদ নাই, মন হইতে ভয়ের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। অধর পুলকিত চিত্তে খাট হইতে নীচে নামিল।

পাশের ঘর হইতে মার গলার শব্দ শোনা গেল—'খোকা, উঠেচিস নাকি?' অধর সহর্ষে সাড়া দিয়া কহিল—'হ্যাঁ মা; একটুও আর অসুখ নেই; চমৎকার লাগছে।' বলিয়া ঘরের মেঝেতে একপাক নাচিয়া লইল।—মাও বাঁচিয়া আছেন, তবে আর দুঃখ কি? জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখিল, সারা পৃথিবীটাই যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে; গাছের পুরানো বিবর্ণ পাতা ঝরিয়া তাহার জায়গায় নবীন কিশলয় গজাইয়াছে; ঘাসগুলি মরকতমণির মতো জলজ্বল করিতেছে; মাটি নদীর ঢেউয়ের মতো দোল্‌-খাওয়া, সমস্ত আকাশ যুড়িয়া রামধনুর সমস্ত রংগুলি ঝলমল করিতেছে। অধর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং গেট খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কতক্ষণ ধরিয়াই সে একটা চমৎকার গন্ধ টের পাইতেছিল; ভাবিয়াছিল, ঘুমন্ত অবস্থায় মা হয়তো মাথায় অডিকোলন বা গায়ে সুগন্ধি দিয়া দিয়াছেন। এতক্ষণে সে টের পাইল, সমস্ত বাতাসেই এই গন্ধ ছড়ানো; গন্ধটা চন্দনের। তাহাদের বাড়ির সমুখের পিচের রাস্তায় এই রকম গাঢ় গোবরের আস্তর পড়িয়াছে যে মনে হইতেছে কে যেন পিচের উপর গোবর লেপিয়া দিয়াছে। গোবর অধর দেখিতে পারে না; তার গা-টা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করিতে লাগিল। আশেপাশের গোয়ালাগুলির অত্যাচার ক্রমেই বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। অধর তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেল। কিন্তু যতই আগাইয়া যাক্‌, গোবরের প্রলেপ আর সঙ্গ ছাড়ে না। বড় রাস্তায় আসিয়া দেখিল, আগাগোড়া গোবরের আস্তর। কতক্ষণ ধরিয়াই আশেপাশের বাড়িগুলি হইতে একটা সমবেত কোলাহল শুনিতেছিল, এইবার তাহা সংস্কৃত স্তোত্র বলিয়া মনে হইল। কিন্তু রাস্তার ধারের প্রায় প্রত্যেক ফাঁকা জায়গায়ই আগুন জ্বলিতেছে কেন? অধর শিহরিয়া উঠিল; গত রাত্রের প্রলয়ে যে সকল পাপী মারা গিয়াছে নিশ্চয়ই তাহাদের সৎকার। কিন্তু কোথাও মড়া দেখিতে পাইল না; বরঞ্চ আগুন বেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্রই পট্টবস্ত্র পরা লোকেরা আগুনের উপর টিন টিন ঘি ঢালিতেছে। অধর এই অদ্ভুত আচরণের কোনও মাথা মুণ্ডু করিতে পারিল না।

দেখিল ইতিমধ্যেই বহু কাগজওয়ালা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন অধর ইহাদের সাইকেল চড়িয়া ছুটিতে দেখিয়াছে। এখন কিন্তু ইহারা বিনা সাইকেলেও গড়গড়াইয়া চলিয়াছে। অধর বিস্মিত হইয়া ইহাদের পায়ের দিকে তাকাইল। দেখিল, সকলেরই পায়ে খড়ম, খড়মের তলায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা লাগানো থাকায় ইহারা এমন অবলীলাক্রমে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু কাগজ কিনিতে গিয়া সে বড়ই দমিয়া গেল; সমস্ত কাগজই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত কাগজ পড়িয়া ঠিক মতো অর্থ বুঝিবার মতো যথেষ্ট সংস্কৃত জ্ঞান তাহার এখনও হয় নাই; কিনিতে গিয়াও সে থামিয়া গেল। ভয়ে ভয়ে একজন হকারকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাংলা কাগজ নাই?' লোকটা অবাক্‌ হইয়া তাহার দিকে এক সেকেণ্ড তাকাইয়া থাকিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল;

এবং আর বিলম্ব না করিয়া খড়ম গড়গড়াইয়া আগাইয়া গেল। কিন্তু এ কি? কাগজের উপর অধর কি ছবি দেখিল? রুজভেল্ট টোজোর সাথে কোলাকুলি করিতেছেন; হিট্‌লার ও ষ্ট্যালিন, চার্চ্চিল ও বাদোলিও হাত ধরাধরি করিয়া মেরি-গো-রাউণ্ড খেলিতেছেন! এমারী গান্ধীর হাত হইতে এক বাটি ছাগলের দুধ লইয়া সহর্ষে পান করিতেছেন। বড়লাট খদ্দরের ধুতি পরিয়া জওহরলালের সাথে চা পান করিতেছেন। জিন্না জাতীয় পতাকা অভিবাদন করিয়া বলিতেছেন, 'জয় এক ও অখণ্ড স্বাধীন ভারতের জয়।' অধরের মাথা ঘুলাইয়া যাইবার উপক্রম হইল; ইহাও কি সত্য বলিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে? শরীরটা কি এখনও সারে নাই?

রাস্তার মোড়ের বড় মনোহারি দোকানটায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে কি, দোকানের সহকারী সহাস্যবদনে ছুটিয়া আসিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া কহিল, 'স্বাগতম্‌, সুস্বাগতম্‌!' অথচ ইতিপূর্ব্বে পনেরো মিনিট না দাঁড়াইয়া থাকিলে কেহ এখানে একটা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিত না।

অধর একটা ভালো কপিং-পেন্সিল, একটা লাল-নীল পেন্সিল, একটা ইরেজার, তিনটা মোটা মোটা বাঁধান খাতা, দুইটা নিব ও এক বোতল লজেঞ্জুষ কিনিল। প্যাকেটটা বগলে লইয়া, মণি-ব্যাগ খুলিয়া কহিল, 'কত দিতে হবে?'

সহকারীটি লজ্জায় জিভ কাটিয়া কহিল, 'আজ্ঞে, দাম দিতে চেয়ে লজ্জা দেবেন না। আর যাই করি তাই করি, জিনিষ বেচে দাম নিতে পারব না···'

অধর অবাক্‌ হইয়া মাথা চুলকাইয়া কহিল, 'কিন্তু জিনিষ নিলাম যে···'

বিক্রেতা কহিল, 'তাতে আর কি হয়েছে? যখন যা দরকার হবে, এসে নিয়ে যাবেন। আপনার চুলগুলি বড়ই এলোমেলো; একটা চিরুণী দিয়ে দেব কি?'

'জিনিষ কিনতে পয়সা লাগে না, এও কি সম্ভব!' অধর চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল।

'সত্যযুগে সবই সম্ভব।'

সত্যযুগ! অধর চমকাইয়া চাহিল। তাই তো, সত্যযুগ! সব কিছু চকিতে তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া গেল। গোময়, সামবেদ গান, যজ্ঞাগ্নি, খড়ম, সংস্কৃত, সংবাদপত্র, রুজভেল্ট-টোজো ইত্যাদি প্রহেলিকা নিমিষে জলবৎ হইয়া গেল! ব্যস, আর ভয় নাই, দুঃখ নাই, অভাব নাই, যাহা ইচ্ছা কেন, পয়সা দেওয়ারও প্রয়োজন নাই। সত্যযুগ, সত্যই সত্যযুগ। এক লম্ফে অধর দোকানের বাহিরে আসিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় খাইয়া যাঁহার গয়ে গিয়া পড়িল তাঁহার দিকে তাকান মাত্র অধরের হৃৎপিণ্ড জল হইবার উপক্রম করিল। তিনি অঙ্কের মাষ্টার দিগ্‌নাগ বাবু। দিগ্‌নাগ বাবু সারা স্কুলের আতঙ্ক; তাঁহার হাতের তেমন একখানা থাপড় যে খাইয়াছে তাহার গালে এখনও পাঁচটি আঙুলের চিহ্ন দেখা যাইবে। তবে থাপড় তিনি বড় বেশি মারেন না;

বেতই ব্যবহার করেন। রাশভারি, বুলডগ-মুখো চওড়া লোক; কথা বলিবার দরকার হইলেই বেত দিয়া বুঝাইয়া দেন। অঙ্কটা কম জানায় অধরকে তিনি কোনও দিনই ক্ষমার চক্ষে দেখেন না। ইহারই সহিত সংঘর্ষের বিষময় পরিণাম কল্পনা করিয়া অধর চোখে অন্ধকার দেখিল। তোত্‌লাইয়া কহিল, 'এই বারটি মাপ করুন স্যর, বড়ই অন্যায় করেছি, দেখতে পাইনি...'

দিগ্‌নাগ বাবু অধরকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। বীণানিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন, 'না বাবা, ও কথা বলে আর লজ্জা দিও না; অপরাধ আমার; বুড়ো-হাব্‌ড়া হয়েছি, চোখের দৃষ্টি ঠিক নেই।... হ্যাঁ, জান তো, ইস্কুল থেকে অঙ্ক তুলে দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে...মানে জটিল কিছুই রাখা হবে না; আমি এবার থেকে কালোয়াতী গান শেখাব...আচ্ছা, এসো বাবা, তোমাদের দেখলে আনন্দ হয়...'

রাস্তায় নামিয়া কৃতজ্ঞতায় গলার রগ ফুলাইয়া, ডান হাত আকাশের দিকে উঠাইয়া অধর গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, 'জয়, সত্যযুগের জয়।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া তু'চক্ষু মেলিল। অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিল, ডাক্তার বাবু গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ইনজেক্‌শানের সূচটা হাতের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতেছেন; বিছানার চারিদিকে মা, বাবা, কাকা, পিসিমা প্রভৃতি উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'নড়ো না খোকা, ব্যথা পাবে। স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?'

অসহ

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

এ বেদনাভার নিয়ত আমার শেল সম বুকে বাজে,
মোদের ভবনে ভাই আর বোনে এক আজো হোলো না যে!
প্রিয়তম কবি আমাদের রবি গিয়াছেন যাহা চেয়ে
ব্যর্থ তাহারে করিবে কি হা'রে বাঙ্‌লার ছেলে মেয়ে?

ওগো বাঙ্‌লার বোন্‌রা আমার, মোরা তোমাদের ভাই,
ধরি' হাতে হাতে দোঁহে এক সাথে চলা ছাড়া গতি নাই।
ভগিনীর বেলা যার অবহেলা সে ভাই দুষ্টমতি,
ভাইকে না যাচে সব কাজে কাছে,—সে বোন্‌ সে হীন অতি।

ক্যামেরার নতুন ব্যবহার

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌. এস্‌-সি.

আমাদের পাড়ায় এক আশ্চর্য্য সাধু এসেছেন, তিনি নাকি এমন সব জিনিষ দেখতে পান যা ভগবানের দেওয়া সাধারণ চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। ধর, তিনি তোমার চোখের দিকে তাকালেন; আমরা হ'লে সে রকম ক্ষেত্রে আর কি দেখতে পাব, চোখের কালো কালো তারা তু'টো, আর বড় জোর তার মধ্যে আমার নিজের বা সেই ঘরের কোন আসবাব পত্রের ছায়া। কিন্তু ঐ সাধুর চোখে নাকি ভেসে উঠবে,—একেবারে তোমার মনের ভিতরকার যত সব খবর। যদি মনে মনে কোন দুষ্টুমীর মতলব এঁটে থাক তা হ'লেও ভীষণ ভাবে ধরা পড়ে যাবে। এই রকম দৃষ্টিকে আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা বলতেন "দিব্যদৃষ্টি"।

সাধুর এই দিব্যদৃষ্টির কথা বিশ্বাস কর চাই না কর, কিন্তু এ যুগের মানুষ এমন সব যন্ত্রপাতি বার করেছে যার বিবরণ শুনলে তোমাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ, দিব্যচক্ষু বলে যদি কিছু থাকে তবে এই সে। আধুনিক ক্যামেরাকে এই রকম দিব্যচক্ষু বলা যেতে পারে। শুধু চোখে যা দেখবার কথা কল্পনা করাও যায় না, আধুনিক ক্যামেরার সাহায্যে হামেশাই তা চোখের সামনে ভেসে উঠছে, এবং শুধু ভেসে ওঠা নয়, স্থায়ী ভাবে গাঁথাও হয়ে থাকছে।

ক্যামেরার সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে, নানা রকম অদৃশ্য আলোর সাহায্য নিয়ে একালকার পণ্ডিতেরা কত কাণ্ডই না হাসিল করছেন! তার ফর্দ্দ দিতে গেলে বিরাট্‌ এক বই হয়ে দাঁড়াবে। আমি শুধু ক্যামেরার ২।৪টা নতুন ব্যবহারের কথা বল্‌ব।

প্রথমেই ধরা যাক্‌ ডাক্তারী শাস্ত্রে ক্যামেরার আবির্ভাব। শরীরের ভিতরকার হাড় ভেঙ্গে গেলে, পেট, গলা, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতির অন্দর-মহলে নানা ধরণের রোগ বাসা বাঁধলে এক্স-রে বা রন্‌জেন্‌-রশ্মির সাহায্যে ফটো তুলে কি ভাবে সে রোগকে গ্রেপ্তার করা হয় তা তো সকলেই জান। আজকালকার ডাক্তারেরা নাড়ীর স্পন্দন—হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন, এমন কি কণ্ঠস্বরের পর্য্যন্ত ফটো তুলে নিয়ে তার সাহয্যে চিকিৎসার আয়োজন করতেও ছাড়েন নি।

মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড অনবরত ধুক্‌ ধুক্‌ ক'রে কাঁপছে, কাঁপুনি-ধরা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে সেই স্পন্দনের ফটো নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। শব্দটা আসলে বাতাসের একটা ঢেউ। কথা বললে বাতাসে সেই অনুযায়ী একটা ঢেউ ওঠে। এই ঢেউএর ছবি নিতে পারলেই গলার স্বরের ছবি নেওয়া হ'ল। এই ফটো নেওয়ার যন্ত্রটা হচ্ছে মোটামুটি এই রকম:—যন্ত্রের মধ্যে থাকে একটা পাৎলা ধাতুর পর্দ্দা, আর তার সঙ্গে যোড়া থাকে একটা হাল্কা গোছের আয়না। যন্ত্রের

সামনে কথা বললে বাতাসে যে ঢেউ ওঠে যন্ত্রের পর্দ্দাটিও ঠিক সেই ঢেউএরই তালে তালে কাঁপতে থাকবে—সঙ্গে সঙ্গে আয়নাটাও। ঐ আয়নার উপর যদি একফালি সূক্ষ্ম আলো ফেলা যায় তবে তাও ঐ সঙ্গে কাঁপতে থাকেবে! এখন এই আলোর কঁপুনির ফটো তুলে নিলেই তা কণ্ঠস্বরের ফটো হবে। এমনি ভাবে, রোগী হয়তো রইল এক দেশে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রইলেন তিনশ' মাইল দূরে আর এক দেশে, কিন্তু ঐ হৃদ্‌স্পন্দনের বা কণ্ঠস্বরের ফটো দেখেই তিনি বুকের বা গলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। সব সময় ফটো তুলে পাঠাবারও দরকার হয় না, টেলিফোনের অনুরূপ যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তারই নিজের জায়গায় ব'সে রোগীর হৃদ্‌স্পন্দনের বা কণ্ঠস্বরের ফটো তুলে নিতে পারেন।

খাবারের মধ্যে ভেজাল দেওয়া হয়েছে, শুধু চোখে কিছুই ধরার যো নেই। কিন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে খাঁটী আর ভেজাল খাবারের তফাৎ ধরা পড়বেই। আধুনিক খাদ্য-পরীক্ষকদের কাছে নানান্ ধরণের খাবারের বিশুদ্ধ অবস্থায় এবং বিভিন্ন ভেজাল মেশান অবস্থায় অণুবীক্ষণের সাহায্যে তোলা অসংখ্য ফটো (মাইক্রো-ফটো) সাজান থাকে। নতুন খাবার এলেই তার একটা মাইক্রো-ফটো তুলে নিয়ে ঐ সব ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়—ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার দোষ-গুণ ধরে ফেলা যায়।

তোমরা 'মাইক্রো-মুভি'র নাম শুনেছ কি? 'মুভি' মানে চলচ্চিত্র। মাইক্রো-মুভি হচ্ছে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তোলা চলচ্চিত্র। আমাদের যত রকম ব্যারাম পীড়া সবই হয় নানা

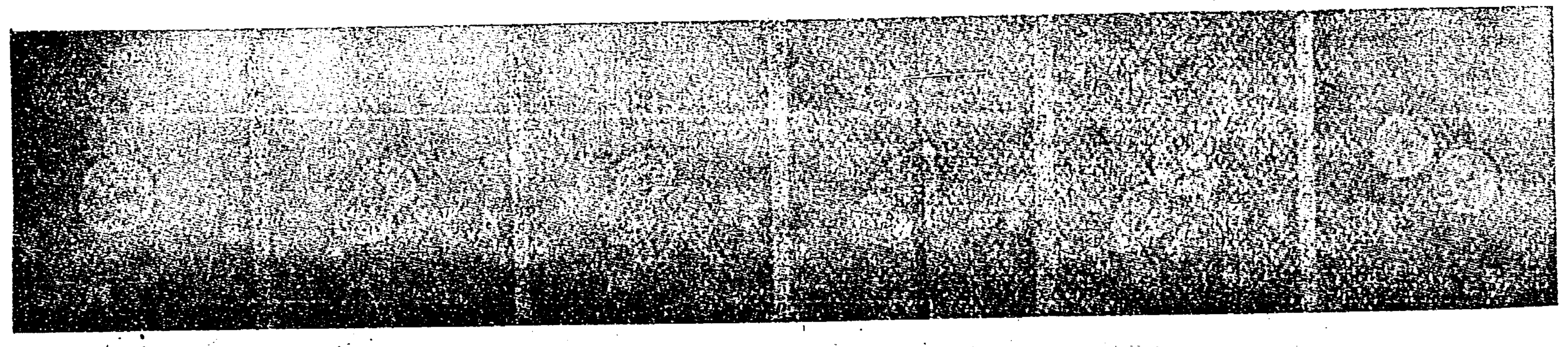

'মাইক্রো-মুভি' বা অণুবীক্ষণের সাহায্যে তোলা চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য: একটি জীবাণু কেমন ক'রে ভেঙ্গে দু'টি হচ্ছে।

জাতের অদৃশ্য জীবাণু—যাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ব্যাকটিরিয়া—তারই 'কল্যাণে'। অতিসূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সব জীবাণুকে অতি বড় ক'রে তাদের মাইক্রো-মুভি তুলে তাদের চালচলনের খুঁটিনাটী খবর জেনে নেওয়া হচ্ছে, এবং এর ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে কত সহজ হয়ে পড়ছে তা তো বুঝতেই পার।

এবারে চিকিৎসা ছেড়ে অন্য কথা বলি। তোমরা পড়েছ, সূর্য্যের আলো দেখতে সাদা

হ'লেও আসলে সাতটা রং—বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা এবং লাল এই দিয়ে তৈরী। আমাদের রামধনুর সাতটা রং আর কি! এই সাতটা রংই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। কিন্তু আসলে এ ছাড়া সূর্য্যের আলোয় আরো রং আছে—মানুষের চোখ তা ধরতে পারে না। এর মধ্যে দু'টি রংএর নাম তোমরা শুনে থাকবে—'আল্‌ট্রা ভায়োলেট্' বা অতি-বেগুনী এবং 'ইন্‌ফ্রা রেড্' বা অতি-লাল। মানুষের চোখে অদৃশ্য হ'লেও এই দু'রকম আলোরই নানা রকম গুণ আছে। তার কাহিনী আর একদিন বলা যাবে, কিন্তু ক্যামেরা আর এই অদৃশ্য আলোর সাহায্যে মানুষ যে দিব্যচক্ষু পেয়েছে তার কথা শোন। আল্‌ট্রাভায়োলেট্ আলোর সাহায্যে দলিল-পত্রের ফটো তুলে দেখা গেছে যে এমন অনেক জিনিষ যা শুধু চোখে বা সাধারণ আলোয় তোলা ফটোতে ধরা পড়ে না, তাও এতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরোয়। আমেরিকার গোয়েন্দা-পুলিশেরা জাল-জোচ্চুরি ধরার কাজে আজকাল এর খুবই সাহায্য নিয়ে থাকেন। সঙ্গের ছবিটায় দেখ, একই দলিলের দু'রকম আলোয় তোলা দু'টো ফটো। সাধারণ আলোয় তোলা ফটোতে তারিখ রয়েছে ১৯৩১, কিন্তু আল্‌ট্রাভায়োলেট্ আলোর সাহায্যে তোলা ফটোয় দেখা যাচ্ছে ১৯১৬কে কেমন ক'রে বদলে ১৯৩১ করা হয়েছে।

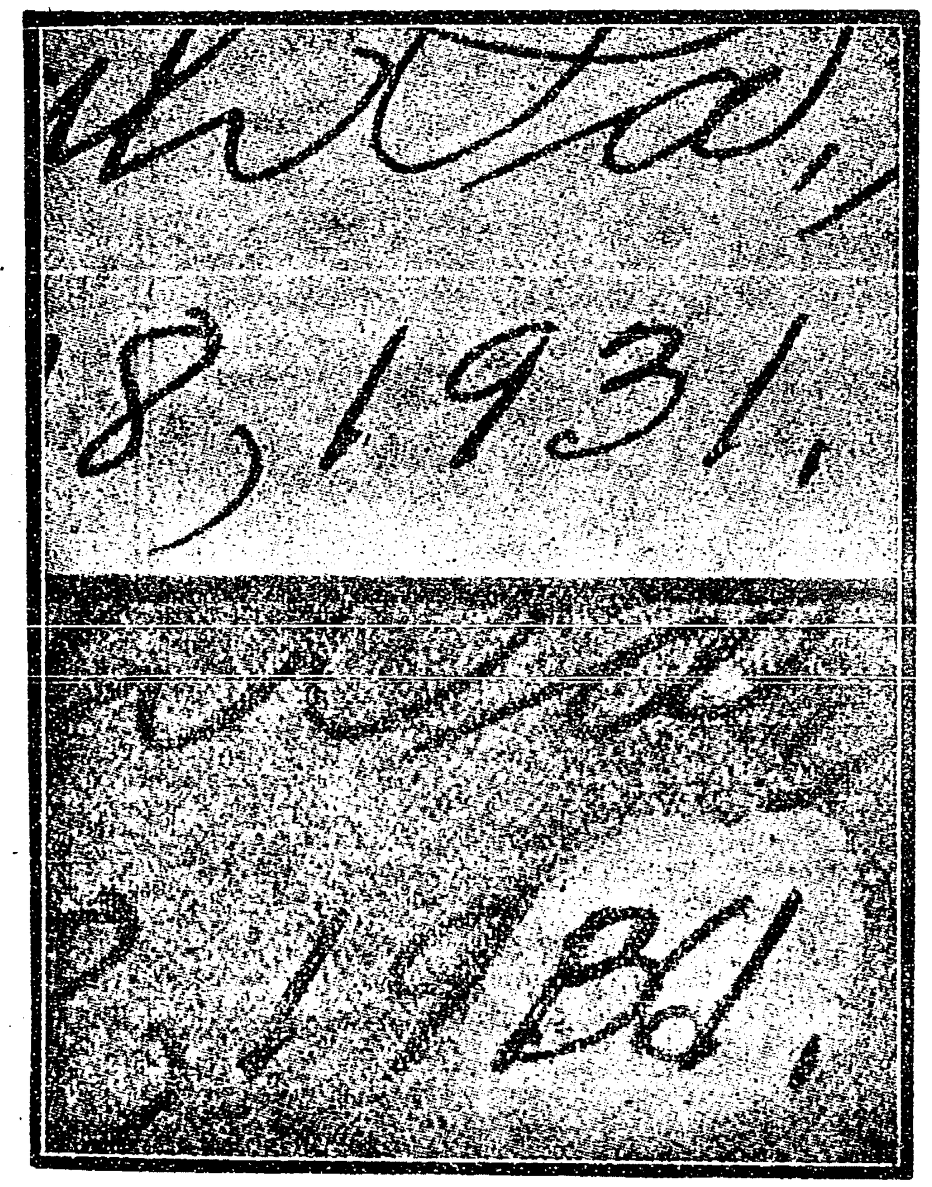

ওপরে—সাধারণ আলোয় তোলা ফটো;
নীচে—আল্‌ট্রা ভায়োলেট্ আলোর সাহায্যে তোলা ফটো;

ইন্‌ফ্রা রেড্ আলোর আবার আর এক গুণ। এই আলোর উপযোগী ক'রে বিশেষ ভাবে তৈরী ফটোগ্রাফীর প্লেটে অন্ধকারের মধ্যেও ফটো তোলা যায়। ধর, অন্ধকার ঘরে চোর ঢুকল; কেউ কোথাও নেই, চোর নিঃশব্দে ইচ্ছেমত জিনিষপত্র তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল, ভাবলে কেউ টের পায় নি। কিন্তু ঘরের মধ্যে ছিল ইন্‌ফ্রা রেড্ রশ্মি, ইন্‌ফ্রা রেড্ প্লেট্-ভরা সাজান একটি ক্যামেরা, আর তার টিপবার কল ছিল দরজার নীচে। চোর বাবাজী যেই দরজায় পা দিয়েছিলেন অমনি কোন্ অগোচরে অন্ধকার ঘরের মধ্যেই ইনফ্রা রেড্ প্লেটে তাঁর ফটো উঠে গেছে! চোর

চুরি করতে এসে যদি তার ছবিই রেখে যায় তবে তাকে খুঁজে বার করা কি গোয়েন্দা-পুলিশের কাছে বেশী কঠিন কাজ ?

ইন্‌ফ্রা রেড্ আলোর আর এক গুণ—এর সাহায্যে কুয়াসা ভেদ ক'রেও ফটো তোলা যায়; অর্থাৎ অনেক দূরের জিনিষ, যা দূরবীণ দিয়ে দেখলেও কুয়াসার দরুণ ঝাপ্‌সা দেখায়, তা এই আলোর সাহায্যে পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে। বছর কয়েক আগে কয়েকজন অভিযাত্রী এরোপ্লেনে ক'রে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের ওপর হানা দিয়েছিলেন। অবশ্য পাহাড়ের গায়ে নামেন নি, কিন্তু ঠিক তার ওপরে কয়েক মাইল উঁচুতে উঠে ঘুরে ঘুরে নানা ফটো সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল দূরবীণ-ক্যামেরা আর এই ইন্‌ফ্রা রেড্ প্লেট। নীচে ঘন কুয়াসা থাকায় তাঁরা শুধু

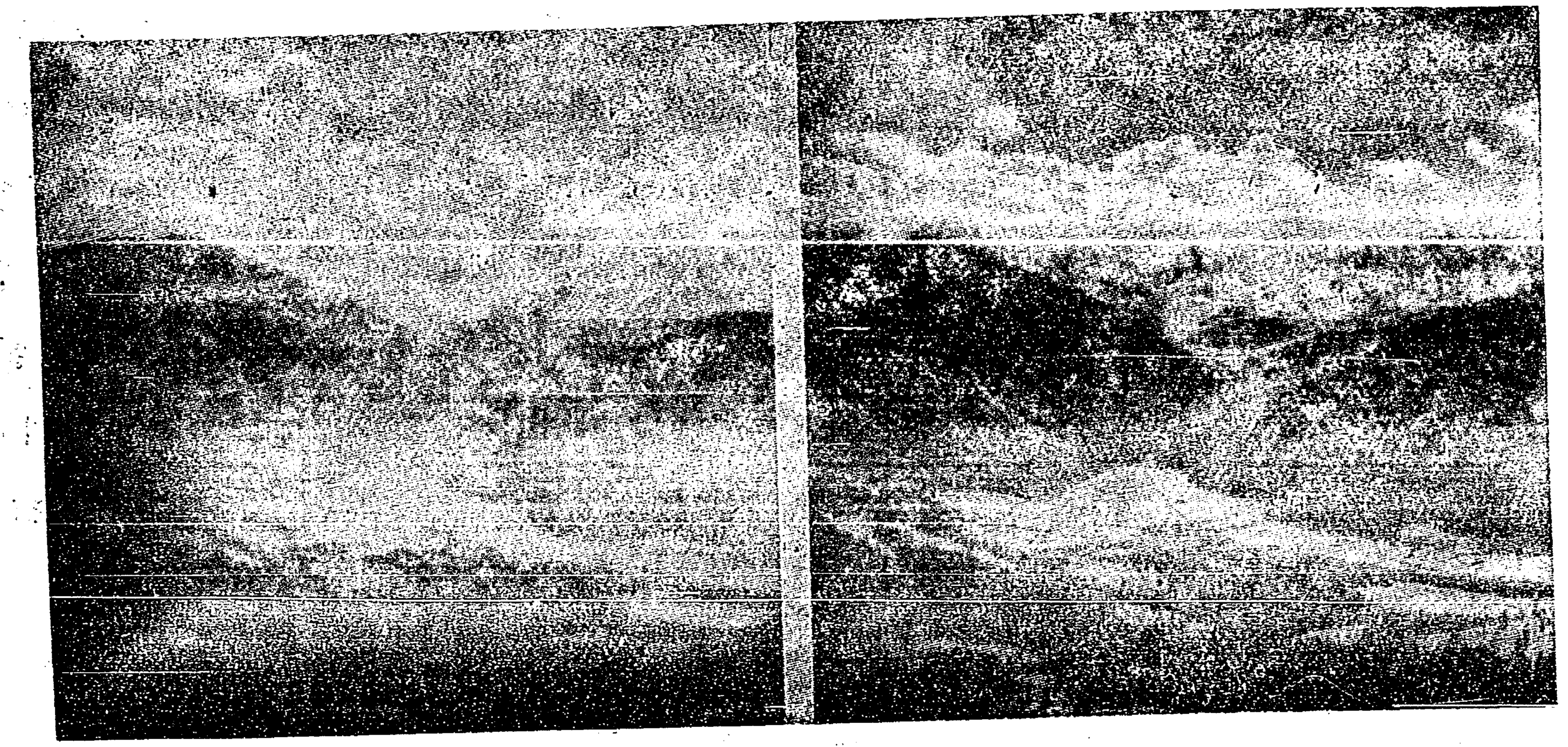

বাঁ দিকে সাধারণ প্লেটে তোলা ফটো, ডান দিকে ঐ একই দৃশ্যের ইন্‌ফ্রা-রেড্ প্লেটে তোলা ফটো।

চোখে বিশেষ কিছু দেখতে পান নি—কিন্তু তাঁদের ক্যামেরায় এভারেষ্টের অনেক কিছু দৃশ্যই ধরা পড়েছিল। দূরবীণ-ক্যামেরা আর ইন্‌ফ্রা রেড্ প্লেটের কল্যাণে আজকাল জ্যোতির্ব্বিদ্‌দেরও ভারী সুবিধা হয়েছে—গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে নানা তথ্য বার করবার পক্ষে।

যুদ্ধের সময়েও এই ইন্‌ফ্রা-রেড প্লেট্ খুব কাজে লাগছে। কারণ অন্ধকার রাত্রেও দূরবীণ-ক্যামেরায় এই প্লেট্ ভ'রে, খুব উঁচুতে উঠে, ইন্‌ফ্রা রেড্ রশ্মির সাহায্যে, নীচে যত কুয়াসাই থাকুক না কেন তা ভেদ ক'রে, শত্রুপক্ষের অনেক গোপনীয় দৃশ্যের ছবি তুলে নেওয়া যেতে পারে—এবং যুদ্ধজয়ের পক্ষে সেটা বড় কম কথা নয়।

যুদ্ধের সময় ক্যামেরার ব্যবহার আরও নানা দিক্ দিয়ে বেড়ে গেছে। গত বছর যখন আমাদের দেশে শত্রুবিমান-আক্রমণেরআশঙ্কা দেখা দিল তখন সরকারী এবং অন্য বড় বড় অফিসের

জরুরী কাগজ-পত্র নিরাপদ জায়গায় সরাবার ব্যবস্থা করতে হ'ল। যেগুলি খুবই মূল্যবান্ সেগুলির একখানা ক'রে নকল রাখারও দরকার হয়ে পড়্‌ল। এর জন্য মেহানৎ তো বড় কম নয়! প্রথমতঃ যেমন সময়ের দরকার, তেমনি দরকার বিপুল পরিমাণ কাগজের (যার নিতান্তই অভাব); আর দরকার সেগুলি ঠিক মত সাজিয়ে রাখবার উপযোগী জায়গা। ইয়োরোপের অনেক জায়গায় কিন্তু খুব সহজ উপায়ে এর সমাধান করা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছোট্ট ক্যামেরায় জরুরী দলিলপত্রের ছোট্ট ছোট্ট ফটো তুলে রাখা হয়েছে। হয়তো একখানা প্রকাণ্ড দলিল ডাকটিকেটের মত ছোট্ট একখানা ফটোর মধ্যেই কুলিয়ে গেছে। এতে কাজ যেমন তাড়াতাড়ি হয়েছে, সে সব নকল রাখবার স্থান সংকুলানের জন্যও তেমন ভাবতে হয় নি। দরকার হ'লে ঐ ছোট্ট ফটো এন্‌লার্জ্জার যন্ত্রের সাহায্যে বড় করে নিয়ে পড়া কিছুই কষ্টকর নয়।

যুদ্ধের সময় নানা রকম কলকব্জা, যন্ত্রপাতির ব্যবহারও বাড়ে। এবং কলকব্জা, তা সে যত নিখুঁতই হোক্, সময়ে অসময়ে বিকল হবেই। কলের কোন্ খানটায় গোল বাধল তা চট্ ক'রে বার করা সময় সময় বেশ কষ্টকর। তবে একটা বিষয় এঞ্জিনীয়াররা জানেন, যে যেখানটা বিকল হয় সেখানটা প্রায়ই একটু অস্বাভাবিক ভাবে কাঁপে—যন্ত্রের স্বভাবই এই। ঠিক যেমন ক'রে ডাক্তারেরা কাঁপুনী-ধরা যন্ত্রে রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ধ'রে তার ফটো তোলেন এই এঞ্জিনীয়াররাও তেমনি ক'রে কলের গায়ে কাঁপুনি-ধরা যন্ত্র বসিয়ে সেই কাঁপুনির ফটো তুলে কলের কোন্ খানটা কাঁপছে (শুধু চোখে হয়তো তা অনুমান করাও যাবে না) তা বার করে নিচ্ছেন এবং তদনুযায়ী চট্‌পট্ ক'রে মেরামতের ব্যবস্থা হচ্ছে।

এর পরেও যদি ক্যামেরাকে আমাদের পাড়ার সাধুটির মত 'দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন' ব'লে না মান তবে আমি নাচার।

কবিতা-কণা

নীরস কঠোর নহে এ জীবন—
অন্ধ আমরা দেখি না তাই,
কুসুমে সুবাস ভুঞ্জিতে গিয়া
কণ্টকে তার হাত ফুটাই।

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

সিসিলি

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্

চলো, এবার পূজোয় তোমাদের সিসিলি দেখিয়ে আনি। যে ভয়ানক যুদ্ধ সেখানে ইংরেজ আর আমেরিকানদের সঙ্গে ইটালীয়ান আর জার্ম্মানদের হ'য়ে গেল, তাতে আর সেখানে এখন জাহাজে চ'ড়ে যাবার ভরসা দিতে পারি না, তবে মনের পক্ষিরাজে চেপে যে কোনও দেশই দেখ্তে যাওয়া যায়।

ইউরোপের ম্যাপে দেখ্বে সিসিলি দ্বীপটী যেন একটা তে-কোণা ফুটবল, আর ইউরোপ তা'কে লাথি মারতে এসে দু'মাইল দূরে পা তুলে থেমে গেছে। ইটালী সেই পা। আসল লাথিও জুটেছে সিসিলির বরাতে অনেকবার। ইউরোপের নানা জাতি নানা সময়ে এর ওপর প্রভুত্ব ক'রে এসেছে। শেষ দখল ছিল ইটালীর, সেও আজ পলাতক।

সিসিলি যেতে হ'লে বিলেত যাবার পথে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পড়ব' নেমে। জাহাজ বদল করে যাব সোজা মেসিনায়। মেসিনা হ'চ্ছে সিসিলির সব চেয়ে বড় বন্দর। এখান থেকেই আমরা সিসিলি ভ্রমণ সুরু করব'। ট্রেণ ছাড়বে এখান থেকে। দক্ষিণে চল্ব আমরা। এ অঞ্চলটা বিশেষ সমতল নয়। লেবুর চাষ হয় খুব। নানা রকম ফলের বাগান আর শস্যের আবাদ দেখ্তে দেখ্তে আমরা তাওরমিনা বন্দর ছাড়িয়ে খানিকটা এলেই ডাইনে অনেক দূরে দেখ্তে পাব এট্না পাহাড। চারশ' বর্গমাইল যুড়ে এই জীবন্ত আগ্নেয়গিরি দাঁড়িয়ে আছে, উঁচু প্রায় এগার' হাজার ফুট। ১৯২৮ সনেও একবার এর প্রলয় নাচন হ'য়ে গেছে। ইউরোপের অনেকের বিশ্বাস যে এটা হ'চ্ছে দেবতাদের কামার বিশ্বকর্ম্মার (ভাল্কান্-এর) হাপর।

এট্না ক্রমে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। এবার আমরা এসে পড়ব' ক্যাটানিয়ার সমতলভূমিতে।

ছোট্ট সিমেতো নদীটা এর ভেতর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা দেখবার সময় নেই, কেননা তাড়াতাড়ি সাইরাকিউস্ পৌছতে হবে আমাদের। সেই সাইরাকিউস্,—যেখানে আর্কিমিডিস্ থাকতেন। যে আর্কিমিডিস্ দণ্ডযন্ত্র (Lever) আবিষ্কার ক'রে বলেছিলেন যে সুবিধেমত একগাছা ডাণ্ডা আর পৃথিবীর বাইরে একটু দাঁড়াবার জায়গা পেলে তিনি ঐ ডাণ্ডা দিয়ে চাড় মেরে পৃথিবীটাকে তার চলবার বাঁধা রাস্তা থেকে তুলে বাইরে ফেলে দিতে পারেন; যিনি আবিষ্কার ক'রেছিলেন যে তরল পদার্থে কঠিন পদার্থ ডুবিয়ে ধরলে কঠিন পদার্থটার ওজন ততটুকু ক'মে যায় যতটুকু ওজন হয় তা'র সমান আয়তনের তরল পদার্থের; যিনি একবার আয়না দিয়ে সূর্য্যের আলো ফেলে রোমান্ সৈন্যদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমনই আপন-ভোলা মানুষ ছিলেন যে একবার তাড়াতাড়ি ক'রে একটা আবিষ্কারের কথা বল্বার জন্য স্নানের টব থেকে উঠেই রাজসভায় দৌড়ে গিয়েছিলেন, কাপড় পরবার কথাও তাঁর মনে ছিল না তখন। যখন রোমান্ সৈন্যরা তাঁকে কাট্তে যায় তখন তিনি কিছুই টের পা'ন নি, একমনে বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করছিলেন।

সাইরাকিউস্ থেকে আমরা ফিরব'। দক্ষিণ উপকূল ধ'রে এগ্রিজেন্টো হ'য়ে দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে মার্সালা বন্দর যাওয়ার আমাদের দরকার নেই, কিন্তু গেলে দেখতে পেতুম যে ওদিক্টা প্রায় সমতলভূমি, আর মার্সালা সহরে খুব মদের কারবার। আমরা কিন্তু যাব উত্তর পশ্চিমে, রাজধানী পালার্মো সহরে। পথে পড়বে কাল্টানিসেটা, এরই আশেপাশে গন্ধকের খনি আছে। সিসিলির প্রধান উৎপন্ন জিনিষই গন্ধক। আর খানিকটা এলেই পালার্মো বন্দর।

এই পালার্মোতেই ১২৮২ খৃষ্টাব্দের ঈষ্টার সোমবারে এক কাণ্ড হ'য়েছিল। সিসিলি তখন এক ফরাসী রাজার অধীন। তাঁর সৈন্যদের অত্যাচার সিসিলিবাসীরা স'য়েছিল অনেক দিন, কিন্তু একটী বিয়ের ক'নেকে একজন ফরাসী সৈন্য অপমান করায় ঐ দিন সান্ধ্য-উপাসনার (Vespers) সময় পালার্মোর লোকেরা ফরাসী সৈন্যদের হত্যা করতে আরম্ভ করে। ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ড 'সিসিলিয়ান্ ভেস্পার্স' (Sicilian Vespers) নামে বিখ্যাত। এই আগুন ক্রমে মেসিনা এবং অন্যান্য সহরেও ছড়িয়ে পড়ে, এবং কিছুকালের মধ্যে ফরাসী সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে সিসিলি স্বাধীন হয়।

পালার্মো থেকে ইটালীর নেপ্ল্সে যাবার জাহাজে চড়তে পার, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমার অত দূরে যাবার কথা ছিল' না, তাই এখানেই আমি ইতি করলুম।

চীনের শিল্প

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

চীন দেশের সভ্যতা বহুকালের পুরানো, তা আমরা জানি। চীনারা যে ভাল কারিকর তা'ও আমরা জানি। আজকাল যে সব জিনিষ আমরা দিনরাত ব্যবহার করি বা কাজে লাগাই, তা'র কতগুলো চীনাদের আবিষ্কৃত তা জান কি ?

এই ধর, চীনামাটির বাসন। নামেই এর পরিচয়। যে মাটি দিয়ে এ বাসন তৈয়ারী হয় তা'র নামই চীনামাটি—যদিও অনেক দেশেই সে মাটি (কেওলিন্) পাওয়া যায়। কিন্তু চীনারা প্রথম এই মাটির বাসন তৈয়ারী করেছিল ব'লেই এর নাম 'চীনামাটি' দেওয়া হয়েছে। চীনারা এই বাসন তৈয়ারী করতে খুব ওস্তাদ্। এক সাহেবের একটি বহু পুরাতন মূল্যবান্ চীনা ফুলদানি ছিল; একদিন হঠাৎ সেটি হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। সাহেব সেই বাসনের টুকরাগুলি একত্র ক'রে, যোড়া লাগিয়ে, সেই ফুলদানিটিকে চীনদেশে বাসনের কারখানায় পাঠিয়ে দিলেন। লিখে দিলেন, ঠিক ঐ রকমের একটি ফুলদানি তাঁর চাই। কিছু কাল পরে চীনদেশ থেকে সাহেবের ফুলদানি তৈয়ারী হ'য়ে এল। সাহেব ফুলদানির বাক্সটি খুলে যা দেখলেন তা'তে তাঁর চক্ষুস্থির। সাহেব চেয়েছিলেন, "ঠিক ঐ রকমের একটি ফুলদানি", কাজেই তারা ঠিক ঐ রকমেরই একটি ফুলদানি তৈয়ারী ক'রে পাঠিয়েছে—অর্থাৎ, ভাঙ্গা ফুলদানির অবিকল একটি নকল পাঠিয়েছে; তার যেখানে ভাঙা, যেখানে যা' জোড়ার দাগ, সবই অবিকল নকল করা হয়েছে।

চীনারা প্রথম বারুদ আবিষ্কার করে, তা জান কি ? তা'রা কিন্তু শুধু পটকা তৈয়ারীর জন্য বারুদ তৈয়ারী করেছিল,—মারাত্মক কোন কাজের জন্য নয়। নানা রকম আতস বাজি তৈয়ারীতে চীনারা ওস্তাদ্। কালীপূজোর দিনে চীনা পটকা না হ'লে তো চলেই না।

ছাপার প্রণালীও প্রথমে চীনারাই আবিষ্কার করে। ইউরোপে ছাপার চল হবার প্রায় ১৪০০ বছর আগে চীনারা কাঠ খোদাই থেকে ছাপার প্রণালী আবিষ্কার ক'রেছিল। তবে তারা ছাপার কল তৈয়ারী করে নি; অনেকটা হাতের সাহায্যেই তা'রা ছাপ্ত। এই সব ছাপার কাজের জন্য তা'রা বেশ ভাল কাগজও তৈয়ারী করেছিল।

প্রায় দু'হাজার বৎসর আগে, চীনদেশের একজন কারিকর মাকড়শাকে জাল বুনতে দেখে মনে করল, "এই রকমের জিনিষ তৈয়ারী করতে পারলে তা দিয়ে মাছ ধরা যেতে পারে।" কিছুকালের মধ্যেই সেই লোকটি জাল বোনার প্রণালী আবিষ্কার করল। আজও চীনারা জাল দিয়ে মাছ ধরায় ওস্তাদ।

ইউরোপে রেশমের আমদানী হয় চীন দেশ থেকে, তা' জান কি ? চীনের রেশম-শিল্প বহু সহস্র বৎসরের পুরানো। সে দেশের রেশমী কাপড় খুব ভাল এবং সস্তাও।

রংএর বার্ণিস প্রথমে চীন দেশে তৈয়ারী হয়। সে আজ হাজার হাজার বছরের কথা। তার বহু শত বৎসর পরে ইউরোপের লোকে বার্ণিস তৈয়ারী করতে শেখে।

ছবি আঁকার জন্য যে চাইনীজ্ ইঙ্ক্ নামে কাল কালী ব্যবহার করা হয়, সে কালী ছোট ছোট সরু-লম্বা চাকৃতির আকারে আসে। তা'কে ঘষে, জলে গুলে ব্যবহারের উপযুক্ত ক'রে নিতে হয়। এই কালী চীন দেশ থেকে এত কাল চালান এসেছে; এখন সে চালান বন্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও ইউরোপের কোথাও এই চাইনীজ্ ইঙ্ক্-এর সমকক্ষ জিনিষ তৈয়ারী হ'তে পারে নি। এটি চীনাদের বিশেষত্ব।

চীনাদের ছবি আঁকার তুলিও কাজের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। বাঁশের সরু চোঙ্গায় লোম লাগিয়ে সে তুলি তৈয়ারী হয়। ইউরোপেও সে তুলির খুব আদর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চীনা তুলি ব্যবহার ক'রে তার উচ্চপ্রশংসা করেছেন।

কাঠের কাজে চীনারা খুব ওস্তাদ তা' আমরা জানি এবং দেখেছিও। চীনা জুতার মিস্ত্রীরা ভাল কাজের জন্য বিখ্যাত। আমাদের দেশেও বহু চীনা মিস্ত্রী কাঠের কারখানায় কাজ করে। চীনারা কাঠ খোদাই আর কাঠে কারিকুরি-করা আসবাব তৈয়ারীতেও পাকা ওস্তাদ। বহু শতাব্দী ধ'রে কাঠের সূক্ষ্ম কারিকুরি চীন দেশে চলে আসছে।

চীন দেশের সেলাইএর কাজ (এম্ব্রয়ডারী) খুব সুন্দর এবং সস্তা। অনেক চীনা ব্যবসাদার এই সব সেলাই এবং সিল্কের চটি, রেশমী কাপড় প্রভৃতি নিয়ে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় বিক্রী ক'রে বেড়ায় তা তোমরা দেখে থাকবে।

চীন দেশের বেতের আর বাঁশের কাজও খুব সুন্দর; যদিও এ দেশে সে সব জিনিষ খুব বেশী চালান আসে না।

কল্‌কাতার বাজারে চীনাদের কত জুতার দোকান আছে দেখেছ তো ? তারা যত তাড়াতাড়ি আর সস্তায় জুতার উপরের অংশটি তৈয়ারী করতে পারে, এ দেশের মুচিরা ততটা পারে না। কাজেই, অনেক কারখানার জুতার উপরের অংশটি চীনাদের হাতেই তৈয়ারীর ভার থাকে।

আজকাল চায়ের চল পৃথিবীর সর্ব্বত্র। কিন্তু, এই চা প্রথমে আসে চীন দেশ থেকে। ভারতবর্ষে আজকাল যে-চায়ের চাষ হয় তার সঙ্গে চীন দেশী চায়ের তফাৎ আছে, কিন্তু "পিকো", "সুচং" প্রভৃতি নাম থেকে বোঝা যায় এই চায়ের আদিস্থান চীন দেশ। চীন দেশী চায়ের রং সবুজ, কিন্তু তার গন্ধ চমৎকার।

মামা-ভাগ্নে

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

ত্রিলোচন বাবু যদি দুঃখ প্রকাশ করেন—মর্ম্মান্তিক ভাবেই দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাঁর পাঁচ পাঁচটা উপযুক্ত ভাগ্নে থাকতে অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে তাঁকে দেখবার একটা লোক পাওয়া যায় না, তা'হলে সত্যিই কিছু বল্‌বার নেই। এই ত' পাশের বাড়ীতেই থাকে অমন যোয়ান যোয়ান পাঁচটা ভাগ্নে—এ-আর-পি না সিভিক্ গার্ড-এ কাজ করে। রাস্তার লোকের প্রাণ বাঁচাবার জন্য, উপকার করবার জন্য যা'রা সদাই ব্যাকুল, তারা, নিজের মামা যে এই সেবার প্রায় একমাস বাতজ্বরে পঙ্গু হয়ে পড়ে ছিল, তার, একবারও কি খোঁজ নিয়েছিল? বেচারা ত্রিলোচন বাবু! না আছে স্ত্রী, না আছে একটী ছেলে মেয়ে। নিঃসন্তান ত্রিলোচন বাবুর আপনার বল্‌তে ঐ ভাগ্নে কয়টিই। অথচ ভাগ্‌নে ক'টী তাঁকে আপন ব'লে আমলই দেয় না। দেয় না তার কারণটা আর কিছুই নয়, ভাগ্নে কয়টী দেখেছে যে মামার সঙ্গে আত্মীয়তা রেখে লাভ কিছুই নেই—উপরন্তু হাঙ্গামাই বেশী। মামার থাকার মধ্যে আছে একখানা ছোট্ট একতলা ভাঙ্গা বাড়ী—প্রত্যেক ইটখানা তার প্রায় খসে পড়্‌বার যোগাড়। বাড়ীতে ত' এমন কোন কিছু নেই যা বিক্রী কর্‌লে ওদের পাঁচ ভায়ের দশটা করে টাকাও ভাগে পড়তে পারে।

মামার আর থাকার মধ্যে আছে শোনা যায় কোন্ সুদূর পাড়াগাঁয়ে একখানা পৈতৃক বাড়ী—যেখানে শেয়াল ছাড়া মানুষ বাস করা চলে না এখন।

ওরা শুনেছে, ওদের মামার কাছেই শুনেছে যে কোন দেবত্তর সম্পত্তি থেকে বুঝি মাসে ওঁর গোটা ত্রিশেক ক'রে টাকা আসে, তাতেই মামার দিন চলে কোনও রকমে। ত্রিশ টাকা ভাগ করলে প্রত্যেক ভাইএর ভাগে পড়ে ছ' টাকা ক'রে মাসিক হিসাবে—তাও মামার মৃত্যুর পরে! সম্পত্তি যে বিক্রী করবে তারও উপায় নেই—দেবত্তর সম্পত্তি নাকি আবার বিক্রী করা চলে না—ওদের মামাই বলেছেন। তবে? ঐ বুড়ো এক মামা, বাতে চল্‌তে পারেন না, চোখে দেখ্‌তে

পান না, তাঁর ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেবে কেন ওরা? মামার মৃত্যুর পর ঐ ভাঙ্গা নড়নড়ে বাড়ীর আধখানা করে ঘর আর মাসিক ছ'টা ক'রে টাকার উত্তরাধিকারী হবার লোভে? ছিঃ, অত বোকা ওরা নয়। তাই পাশের বাড়ীতে থাকা সত্বেও ওরা মামার দরজার ছায়া মাড়ায় না। তবে একটা কথা যে তা'দের ক' ভাইএর মনে মাঝে মাঝে উঁকি মারে না এ কথা বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হয়। ওদের মনে হয়—ওদের মামার অবস্থাটা বাইরে যা দেখা যায় সেটা হয়ত সত্যি নাও হ'তে পারে; হয়ত তাদের মামাটী একটী প্রকাণ্ড কৃপণ—দেশে কিংবা কোথাও কোনও প্রচুর অর্থ হয়ত লুকানো আছে—মামা ঘুণাক্ষরেও সেটা জান্‌তে দেন না কাকেও। তাদের এ সন্দেহটা ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ল সেবার আরও বেশী করে।

ত্রিলোচন বাবুর কে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়, আদিত্য না কি একটা নাম, যাকে ওরা, মানে ভাগ্নেরা, কোন দিন দেখে নি, ওদের মামাও কোনও দিন দেখেছেন কিনা সন্দেহ,—এসে আস্তানা গেড়েছে ত্রিলোচন বাবুর বাড়ীতে। ছেলেটাকে দেখ্‌লেই মনে হয় ভয়ানক চতুর। ওরা ভাব্‌লে, ছোকরা থাকে মামার দেশে, ও নিশ্চয়ই জানে মামার কি সম্পত্তি আছে না আছে। মামার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ রকমের ধন দৌলত লুকানো আছে কোথাও—অদিত্যটা মামাকে বশ ক'রে সেইগুলো হাতাবার চেষ্টায় আছে নিশ্চয়, তা না হ'লে এতকাল ও ছিল কোথায়!

তা ছাড়া মামার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করবার সময়ে ওরা জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখেছে—আদিত্যটা মামার সঙ্গে সমানে কি সব ফুসফাস্ ক'রে কথা বল্‌ছে। ভীষণ চিন্তা হ'তে লাগ্‌ল ওদের ক্রমশঃই। দুশ্চিন্তা ওদের চরমে উঠ্‌ল সেইদিন যেদিন আদিত্যটা দিন কয়েক কোথায় উধাও হওয়ার পর হঠাৎ একটা পুরানো প্রকাণ্ড কাঠের সিন্ধুক নিয়ে হাজির হোলো কোথা থেকে। ওরা পাঁচ ভাই মুষড়ে পড়ল একেবারে, ভাব্‌লে ঐ সিন্ধুক ভরা ধন দৌলত—সব মেরে দিল ঐ হতভাগা আদিত্যটা। হায় হায়, ওরা কি জান্‌ত যে ওদের ঐ মামা—বুড়ো মামাটী একটী যখ বিশেষ? এতটা ধন দৌলত থাক্‌তে ঐ রকম দুঃখে সারা জীবনটা কাটাল লোকটা!

কয়েকদিন যায়। ওরাও সমানে ভাবে। এ. আর. পি. না সিভিক্ গার্ডের কাজ ওদের মাথায় উঠে গেল। হঠাৎ ওরা দেখ্‌ল সেদিন আদিত্য তার বিছানা পত্র নিয়ে চলে গেল। একটু নিশ্চিন্ত হোলো ওরা। হঠাৎ ওরা ত্রিলোচন বাবুর মহা আত্মীয় হয়ে উঠ্‌ল। সে দিন পাঁচ ভাই গিয়ে হঠাৎ মামার বাড়ী হানা দিল। মামা বিশেষ যেন আশ্চর্য্য হলেন না—তিনি যেন এটা আশাই করছিলেন। যাই হোক, বড় ভাই ধীরেন বললে,—একটু যেন অভিযোগের সুরেই বল্লে, 'মামা, তোমার এত যে অসুখ করেছিল আমাদের কেন কোনও খবর দাও নি?'

সেজ ভাই নগেন অভিমান ভরা গলায় বল্লে,—'মামা আমাদের কি আর আপনার ভাবেন, বড় দা?' ন' ভাই সুরেন এবার সুরফেরতা মারে—মানে গানের মত কথার সুর ফিরিয়ে দেয়—

বলে, 'দেখ, মামা স্নেহ করেন চিরকালই আমাদের! আমাদেরই দোষ, আমরা কাজের চাপে মামার খোঁজ নিতে পারি নি—'

মামা কথা বল্‌বার সময় পান না, মেজ ভাই বলে, একটু গলে গিয়েই বলে,—'আমরা তোমার ছেলের মত মামা! আমাদের সমস্ত দোষ ক্ষমা করে নিও। আমরা আজ আসি, আবার আসব—'

ওরা চলে আসে। আসবার সময় সকলেই একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে সিন্দুকটার দিকে।

ওরা তার পর দিন যায়,—তার পর দিন যায়,—রোজই যায়। তার পর দিনে দু'বার, ক্রমশঃ তিন বার—চার বার যায়। শেষকালে ওরা মামার বাড়ীতেই প্রায় থাকতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে সমানে চল্‌ল মামার সেবা-যত্ন। সে সেবা-যত্ন দেখবার মত। পাঁচ ভাইএর সেবা একসঙ্গে, —সোজা কথা? ত্রিলোচন বাবুর সংসারে কিছুটী আর করতে হয় না; খাওয়া-পরার সুখও বেড়ে গেল।

এমনি চলেছে—বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন মেজ ভাই গিরিন বলে— 'দেখ, আমার মনে হয় সিন্দুকটার মধ্যে কি আছে মামাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয়। বুড়ো নিছক মিথ্যা কথা বলেন না, তা ছাড়া ওঁর বিছানায় মাথার কাছে বালিশের তলায় থাকে 'গীতা'। যখন শুয়ে থাকবেন মামা বিছানায় তখন জিজ্ঞাসা করতে হবে—গীতা ছুঁয়ে মিথ্যা কথা বল্‌তে সাহস পাবে না মামা নিশ্চয়। কি আছে সঠিক না জান্‌লে আমাদের এত করে মামার পিছনে লেগে থাকাটা বোকামো!' ওরা সবাই এ বিষয়ে একমত হোলো। ঠিক হোলো পরের দিন সকালে গিয়ে সবাই জিজ্ঞাসা করবে কথাটা—এমনি কথার ছলে।

পরের দিন সকালে পাঁচ ভাই গিয়ে হাজির হোলো ত্রিলোচন বাবুর বাড়ী; ত্রিলোচন বাবু তখনও বিছানায় শুয়ে। ওরা পাঁচ ভাই যেতেই ত্রিলোচন বাবু অতি আপ্যায়নের স্বরেই বললেন— 'এস, বাবারা, এস।' তারপর একটু থেমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ এত সকালে যে! সব ভাল ত'?

বড় ভাই বল্‌লে—'হ্যাঁ, আমাদের সব ভাল। আপনার শরীর কেমন? কাল রাত্রে অনেকবার আপনার কাসি শুনলাম যেন মনে হোলো, তাই আজ সকালে উঠেই—'

ত্রিলোচন বাবু তার কথায় বাধা দিয়েই বল্‌লেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে, 'কই, কাল রাতে ত' কাসি টাসি নি—!"

সেজ ভাগ্নে বল্‌লে—'তা হবে হয়ত! আমাদেরই ভুল হয়েছে। মনটা তোমার জন্য এতই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সব সময়ে যে ভয় হয় পাছে তোমার কিছু হয়—!

ত্রিলোচন বাবু একটু মৃদু হাসেন। ওরা এতক্ষণে মামাকে ঘিরে তাঁর আশেপাশে বসে পড়েছে।

মেজ ভাই কথার মাঝে হঠাৎ বল্‌লে, সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—'এ সিন্দুকটা আবার আন্‌লে কেন মামা? 'কোথায় ছিল এটা এত দিন?

মামা বল্‌লেন—'ওটা ছিল দেশে।'

ছোট ভাগ্নে বল্‌লে—'তা' এতদিন পরে ওটা দেশ থেকে টেনে আন্‌লে কেন? ওটায় আছে কি মামা?'

ন' ভাই একটু হেসে বল্‌লে—'মামার যা কিছু ধনদৌলত সব বোধ হয় ওর মধ্যে আছে; না মামা?'

মামা একটু যেন গম্ভীর ভাবেই বল্‌লেন—'ধন দৌলত কিনা বল্‌তে পারি নে—তবে আমার যা কিছু তা সব ওতেই আছে।'

সেজ ভাই এবার একটু যেন বেশী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, জিজ্ঞাসা করে—'কি আছে মামা?'

মামা একটু ম্লান হেসে বলেন, 'যা আছে তা ত' দেখ্‌তেই পাবে এই মামাটি মরলে পরেই। বুড়ো মামার যা কিছু আছে তা ত' সব তোমদেরই হবে।'

ওরা পাঁচ ভাই যেন আর নিজেদের সামলে রাখ্‌তে পারে না। তবুও বড় ভাই অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরে বলে—'না মামা, তোমার সম্পত্তির লোভে তোমাকে আমরা হারাতে রাজি নই। তবে এমনি একটা ঔৎসুক্য— কি আছে সিন্দুকটার ভিতর তাই জানবার জন্য।'

মামা তবুও বলেন না; শুধু বলেন—'যা আছে, যা রেখে যাব ঐ সিন্দুকের মধ্যে, তা'তে তোমাদের প্রত্যেকেরই সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বসে খেতে পারবে।'

ওরা চঞ্চল হয়ে ওঠে—অদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে যেন আনন্দে ফেটে পড়তে চায়।

সেদিন থেকে ত্রিলোচন বাবুর সেবা-যত্ন দশ গুণ বেড়ে গেল। সংসারে তাঁর নিজের কুটোটি নড়াতে হয় না—পাঁচ ভাইএর এক ভাই না এক ভাই সব সময়েই হাজির। দুধ, ফল, মিছরির সরবৎ—এ সব খেয়ে খেয়ে ত্রিলোচন বাবুর অরুচি ধরে গেল প্রায়; মোটারে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোয় প্রায় একটা ভয় এসে গেল।

সত্যিই, দেখবার মত সেবা-যত্ন। অতি বড় ভক্ত শিষ্যরাও তাদের গুরুদেবকে এ রকম সেবা-যত্ন করে উঠ্‌তে পারে না।

যাই হোক, এমনি করে দিন যায়, মাস যায়, বৎসরও যায়। ভাগ্নের দল ভাবে—এ কিরে বাবা! বুড়ো কি অমর হয়ে গেল নাকি শেষ পর্য্যন্ত! মরবার কোনও নামগন্ধই যে নেই! অসুখ-

বিসুখেরও নাম নেই বল্‌তে গেলে। আর কতদিন চলে এমনি করে? ওদের পয়সা কড়ি যা ছিল সবই যে গেল বুড়োর পিছনে!

এক বৎসর কেটে গেল—দু'বৎসর কেটে গেল; ওরা এবার বসে' পড়বার যোগাড়। ওরা দু'বেলা—দু'বেলা কেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই, মামার স্বর্গবাস কামনা করে। মেজ ভাই মনে মনে দেবতার কাছে ষোড়া পাঁঠা মানত করে। ছোটটা গোঁয়ার গোবিন্দ, বলে—'একদিন বুড়োর গলাটা টিপে ধরি, কি বল তোমরা?'

এমনি করে ওদের দিন কাটে—মানে আর কাটে না। অথচ এতদিন ধরে চালিয়ে এসে এখন হাল ছাড়তেও সাহস পায় না, শেষ কালে যদি মামা ঐ আদিত্যটাকেই উইল করে দিয়ে যায়।

যাই হোক, মামা একদিন মারা গেলেন শেষ পর্য্যন্ত। হাজার হ'লেও মামা ত'? ওরা পাঁচ ভাইএ পুড়িয়ে এল মামাকে মহা সমারোহ করে।

এইবার রাজার ঐশ্বর্য্য ওদের হবে, লোকে অবাক্ হয়ে যাবে—ঈর্ষ্যায় ফেটে মরবে। ওরা ফিরে এল, এল পাড়ার লোকজন। সকলের সামনে খোলা হোলো সেই বিরাট সিন্ধুক, ওঃ। সাত পুরুষ বসে খাওয়ার মত সম্পত্তি! যখের ধন! হয়ত তাল তাল সোনা—কিংবা অজস্র গিনি বা অমনি কিছু।

সিন্ধুক খুল্‌তে প্রথমে চোখে পড়ল—কতকগুলি লেপ কাঁথা, দু' একটা ভাঙ্গা ঘটিবাটি। ওরা আর ধৈর্য্য ধরতে পারে না। লেপ কাঁথা সরানো হোলো। বার হোলো তার তলা থেকে—চার ইঞ্চি পুরু, দু'হাত লম্বা, দেড়হাত চওড়া কাঁঠাল কাঠের তৈরী পাঁচখানি প্রকাণ্ড পিঁড়ি;—সত্যিই এক একটা পিঁড়িতে সাত পুরুষ বসে খাওয়ার মত।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

বুদ্ধির্যস্য—শ্রীসুবোধ বসু। প্রকাশক গ্রন্থাগার, পি. ৫৮. ল্যান্সডাউন রোড্ এক্সটেন্‌শন্, কলিকাতা। দাম ।৵৹

ছোটদের কৌতুক-নাটিকা। রামধনুর পাঠকেরা ইতিপূর্ব্বেই এর রসের আস্বাদ পেয়েছেন। তোমরা, যারা এবার পূজোয় কৌতুকনাট্য অভিনয় ক'রে বন্ধুবান্ধবদের সত্যিকারের আনন্দ দিতে চাও তারা, এ বইখানির সাহায্য নিলে নিশ্চয়ই ঠকবে না এ কথা জোর করে বলতে পারি।

অসি বাজে ঝন্ ঝন্—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ১৲

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে হূনরা যখন ভারতবর্ষের নানা স্থান অধিকার ক'রে তার বুকে অকথ্য অত্যাচার সুরু করেছিল সেই সময়কার এক ভারতীয় বীরের গৌরবময় কাহিনী নিয়ে এই গল্প রচিত হয়েছে। বইখানা কয়েক বছর আগে রামধনুতে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। এমন সুন্দর বই বাংলা শিশুসাহিত্যে অনেক দিন পড়ি নি।

লৌহমুখোস—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৮, জন্‌সন্ রোড, ঢাকা। ১৲

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেক্‌জাণ্ডার ডুমার "দি ম্যান্ ইন্ দি আয়রন্ মাস্ক্" নামে পরিচিত বইখানি অবলম্বনে লেখা। রচনাভঙ্গী সুন্দর। মূল বইখানিকে সংক্ষেপ করা হলেও গল্পের কিছুমাত্র রসভঙ্গ হয় নি। লেখকের কাছে আমরা এ ধরণের বই আরও চাই।

সস্তায় কিস্তি—শ্রীতরুণ রায় সম্পাদিত। অজানা সাহিত্য পরিষদ, ১০।১, এল্‌গিন্ রোড, কলিকাতা। দাম ॥০

কয়েকটি তরুণ লেখক লেখিকার রচনা-সংগ্রহ। ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন—"কাঁচা লেখকদের কাঁচা হাতের লেখা দিয়ে এর সৃষ্টি।" কাঁচা হাতের হলেও সব লেখাই কাঁচা নয়। প্রকাশক উদীয়মান লেখক লেখিকাদের তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করেছেন। তাঁরা উক্ত পরিষদের ঠিকানায় পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করতে পারেন।

বার্ষিক শিশুসাথী—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৮, জনসন্ রোড, ঢাকা। দাম ২॥০

প্রতিবারের মত এবারেও এই জনপ্রিয় বার্ষিকীখানি তার অজস্র বৈচিত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু রচনা-সম্পদেই নয়, এই দুর্দ্দিনেও ছাপা-কাগজ এবং চিত্রসম্ভারে এর বৈশিষ্ট্য দেখলে বিস্ময় লাগে। প্রকাশককে ধন্যবাদ,—বর্ত্তমান নিরানন্দের দিনেও তাঁরা ছোটদের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

সন্দেশ

গত মাসে তোমরা মুসোলিনীর পতনের খবর পেয়েছিলে। এবারকার খবর আরও বড়—ইটালি আত্মসমর্পণ করেছে। বলা বাহুল্য ইটালির এই পরাজয়ে জার্ম্মানী খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে। ওদিকে রাশিয়াতেও তাদের সে বিক্রম আর দেখা যাচ্ছে না—রুশরা ক্রমাগতই হৃত রাজ্য উদ্ধার ক'রে চলেছে। যুদ্ধের মোড় এবার সত্যিই ফির্‌ল ব'লে মনে হয়।

আই.এফ্. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দল পুলিশ দলের সঙ্গে তিন দিন ড্র ক'রে শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়েছে। পুলিশ দল কিন্তু ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। শীল্ড শেষ পর্য্যন্ত ইষ্ট বেঙ্গল দলেরই করায়ত্ত হয়েছে। আর একটি ভারতীয় দলের এই সম্মান লাভে তোমরা নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করবে।

এদিকে বাংলা দেশের অবস্থা তো চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছ। দলে দলে নিরন্ন গ্রামবাসী এক মুঠো ভাতের জন্য সহরের দিকে ছুটেছে। তাদের করুণ হাহাকারে সহরের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠছে! পথে ঘাটে ছড়ান অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারীর মৃতদেহ দেখলে বিশ্বাস হয় কি যে আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগে বাস করছি?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) তালঃ—তালু, তাল, তালা, তাল। (২) জামঃ—জামা, জাম, জামা। (৩) মতঃ—মতি, মত, মতি। (৪) ভড়ঃ—ভীড়, ভড়, ভাঁড়। (৫) ডালঃ—ডালি, ডাল, ডালি, ডালা।

উত্তরদাতাদের নাম

অর্চ্চনা, গায়ত্রী, উমা, শচীন, রমেন (নীলফামারী); অমিতাভ সেন (ধুবড়ী); সুনীল চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা); জংলী (ময়না—বর্দ্ধমান); সৌম্যেন্দ্রনাথ সিংহ (কটক); বিশ্বজিৎ বিশ্বাস (কলিকাতা); বিমলচন্দ্র দত্ত ও পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক (শ্রীখণ্ড); সনৎকুমার, জিতু প্রভৃতি (ভিরিঙ্গি); সেবা, হামির, বাপ্পা, মা-মণি (করিমগঞ্জ); অভিমন্যু দাশগুপ্ত (ধুম—চট্টগ্রাম); অধীররঞ্জন দাস (বরিশাল); রামানন্দ সাহিত্য-সদনের সভ্যবৃন্দ (রামচন্দ্রপুর); শিমুলিয়া হাইস্কুলের ছাত্রগণ (লাখপুর)।

নূতন ধাঁধা

আমেরিকার এক পাহাড়ী অঞ্চল। বিখ্যাত পর্য্যটক রো সাহেব ক্ষুধার্ত্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক খাড়া পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়ালেন। ওপর থেকে একটি লোক নেমে আসছিল, সে বল্‌ল, পাহাড়ের চূড়ায় এক রেস্তোরাঁ আছে, এই লিফ্‌টে চ'ড়ে ঠিক এক ঘন্টায় সেখানে পেঁাছান যাবে। রো সাহেব লিফ্‌টে উঠলেন এবং ঘড়ি খুলে দেখলেন ঠিক ১২টা বেজেছে। লিফ্‌ট্ উঠতে লাগ্‌ল এবং ক্রমেই তার গতিবেগ বাড়তে লাগ্‌ল। "ইন্‌ডিকেটার" যন্ত্র লক্ষ্য ক'রে রো বুঝলেন লিফ্‌ট্‌টা প্রতি মিনিটে ঠিক তার আগের মিনিটের দ্বিগুণ পথ পার হচ্ছে। হঠাৎ লিফ্‌ট্ গেল বিগড়ে। পাথরের গায়ে লেখা দেখে জানা গেল ঠিক অর্দ্ধেক পথ আসা গেছে। রো সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি খুললেন, কিন্তু এ কি, ঘড়ি যে বন্ধ হয়ে গেছে! রো প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটা কথা মনে পড়তে হাসিমুখে ঘড়ি ঠিক করে নিলেন। তোমরা বলতে পার ক'টার সময় লিফ্‌ট্ বন্ধ হয়েছিল?

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকবে। তাই কার্ত্তিকের রামধনু কার্ত্তিকের গোড়ায় না বেরিয়ে মাসের ২য় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

নারী ও শিশুর নবনীত কোমল
'অঙ্গের পেলব প্রসাধনী
ক্যালকেমিকোর

মার্গোসোপ

অতি মধুর সুগন্ধযুক্ত নিমের উদ্ভিজ্জ টয়লেট সাবান। জান্তব চর্ব্বি ও নোংরা তেল সম্পূর্ণ বর্জ্জিত। কমনীয় তনু রমণীয় করে।

রেণুকা

লঘু শুভ্র সৌরভময় নিমের টয়লেট পাউডার। অতি উৎকৃষ্ট মূল্যবান উপাদানে প্রস্তুত উপকারী রূপচূর্ণ। শিশু ও নারীর কচি ও কোমল অঙ্গের উপযোগী।

ক্যাষ্টরল

কেশ-প্রাণ 'ভিটামিন-এফ' সংযুক্ত মনোমদ সুগন্ধি রিফাইন ও মূল্যবান ক্যাষ্টর অয়েল। চুল উঠে যাওয়া ও টাক পড়া নিবারণ করে। কেশ-বিরল মস্তক নব-কেশোদ্গমে ভরে তোলে। মাথা ঠাণ্ডা ও মন প্রফুল্ল থাকে।

লা-ই-জু

লাইম ক্রীম গ্লিসারিন

এই স্নিগ্ধ সুন্দর সুরভি সম্পৃক্ত লাইম জ্যুস দেশী ও বিদেশী সমস্ত লাইম জ্যুসের তুলনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কলিকাতা।

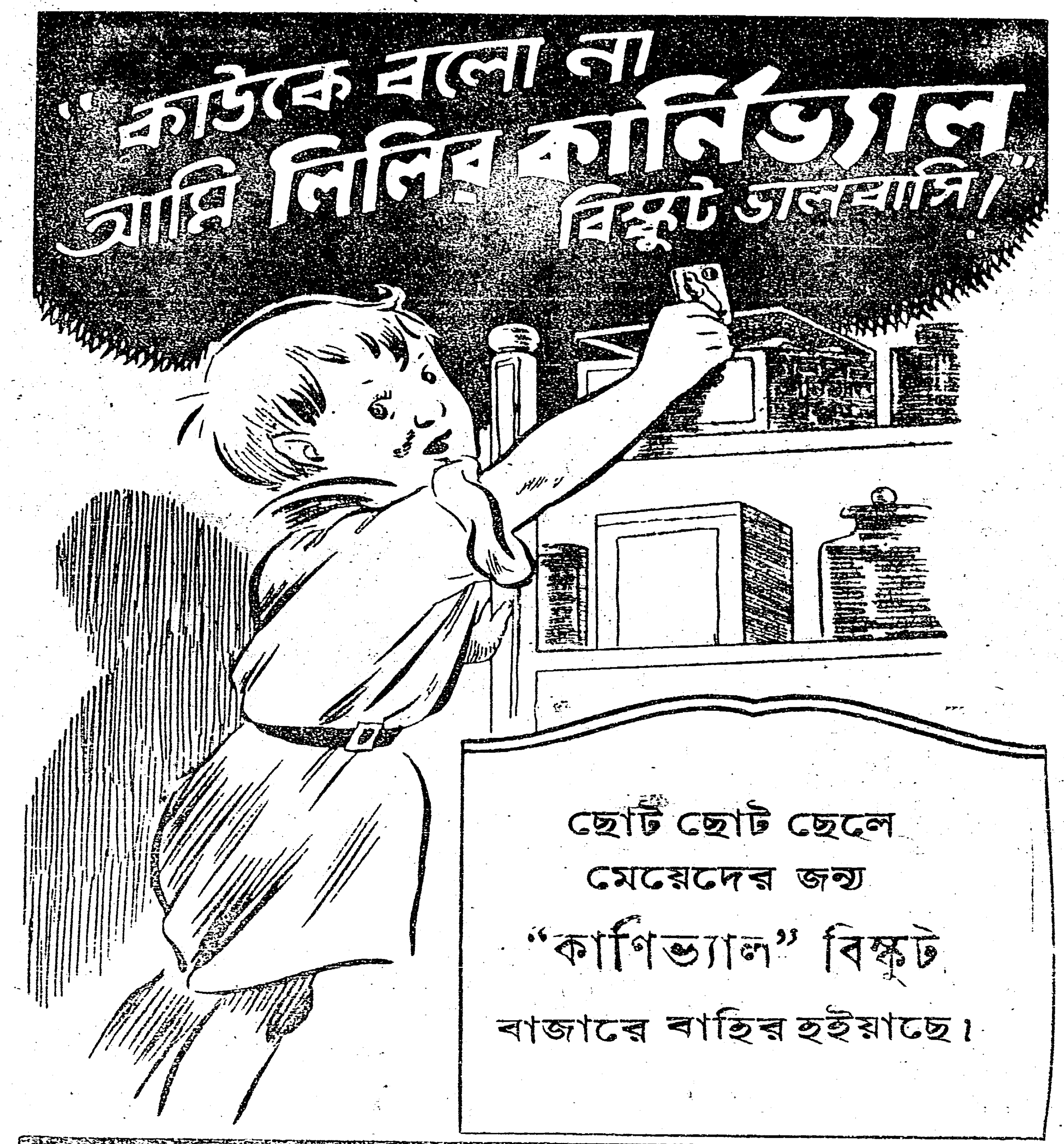

কলিকাতা **লিলি বিস্কুট কোং** বোম্বাই

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কালকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

চাই স্বাস্থ্য-চাই শক্তি . .

মনুষ্যত্বের

পূর্ণ বিকাশের

প্রথম সোপান

স্বাস্থ্য ও শক্তি

* * * *

লক্ষ্মী ঘি

ব্যবহারে

উভয়ই সম্ভব

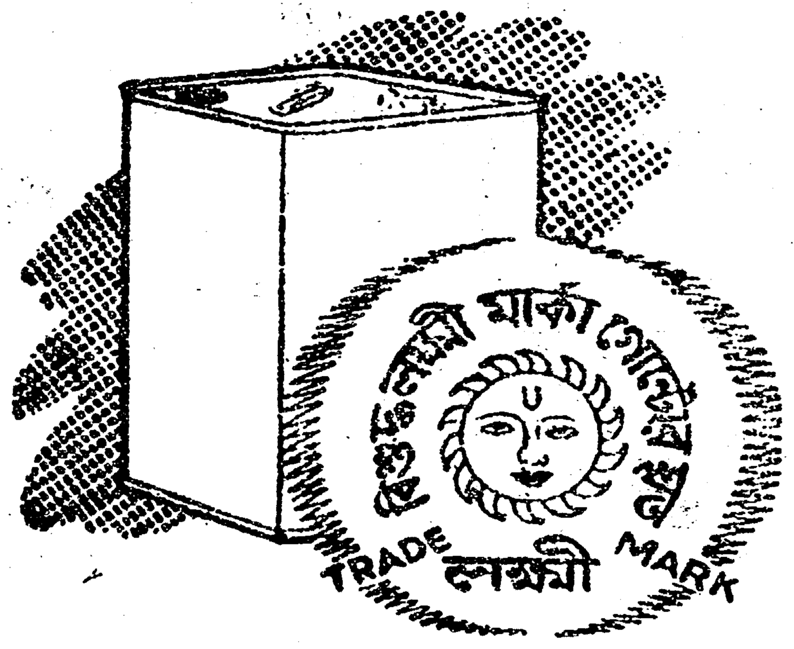

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
সুপরিচিত ও সমাদৃত
বিশুদ্ধ—সুস্বাদু—পুষ্টিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

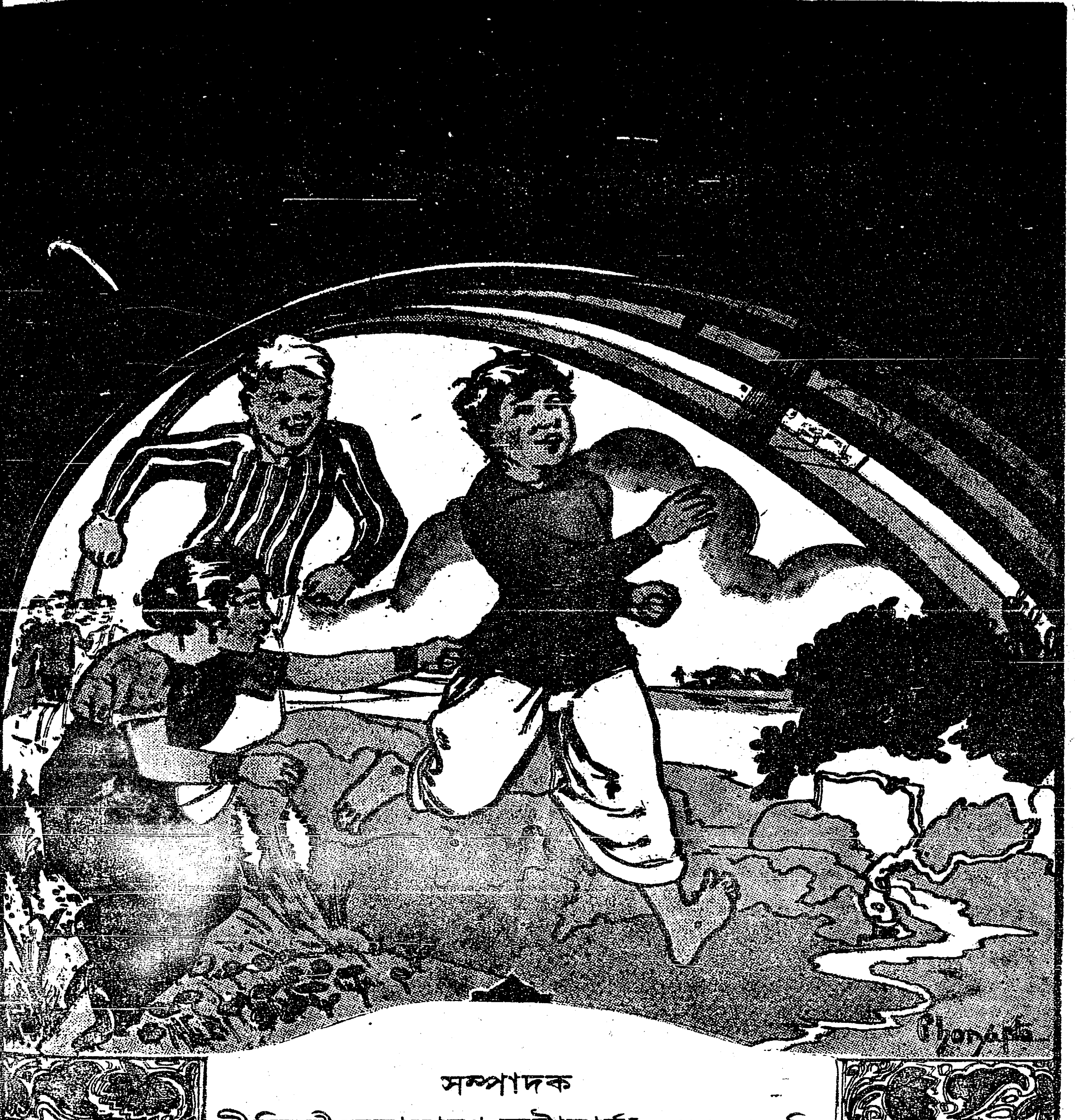

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

৬শ বর্ষ
ম সংখ্যা
কার্ত্তিক
১৩৫০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } { মূল্য ৮৲ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে, চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন,
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী।
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১৸৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

Regd. No. C—1641

চাই স্বাস্থ্য-চাই শক্তি . . .

মনুষ্যত্বের

পূর্ণ বিকাশের

প্রথম সোপান

স্বাস্থ্য ও শক্তি

* * * *

লক্ষ্মী ঘি

ব্যবহারে

উভয়ই সম্ভব

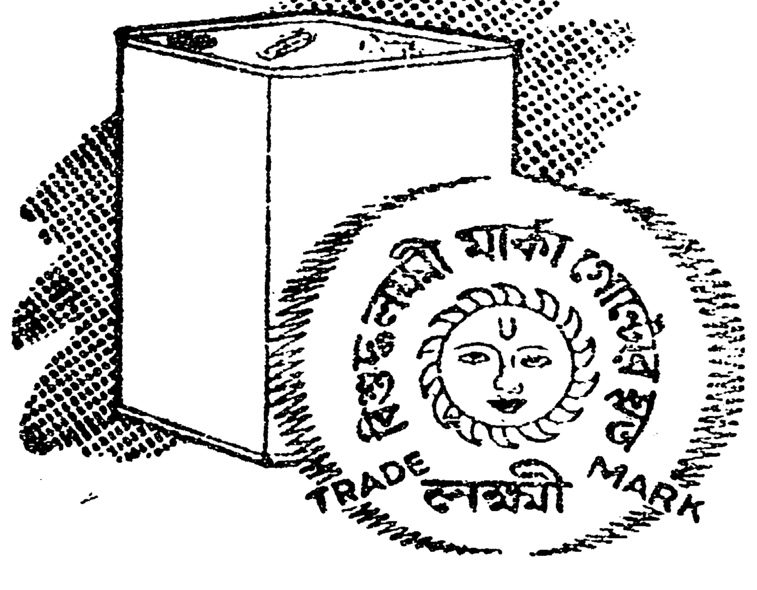

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর

সুপরিচিত ও সমাদৃত

বিশুদ্ধ—সুস্বাদু—পুষ্টিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

৬ষ্ঠ বর্ষ
...ম সংখ্যা
কার্ত্তিক
১৩৫০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪॥ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } { মূল্য ৮ টাকা

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী।
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১॥৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

বাহির হইয়াছে

—নতুন বই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

দাম বারো আনা।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

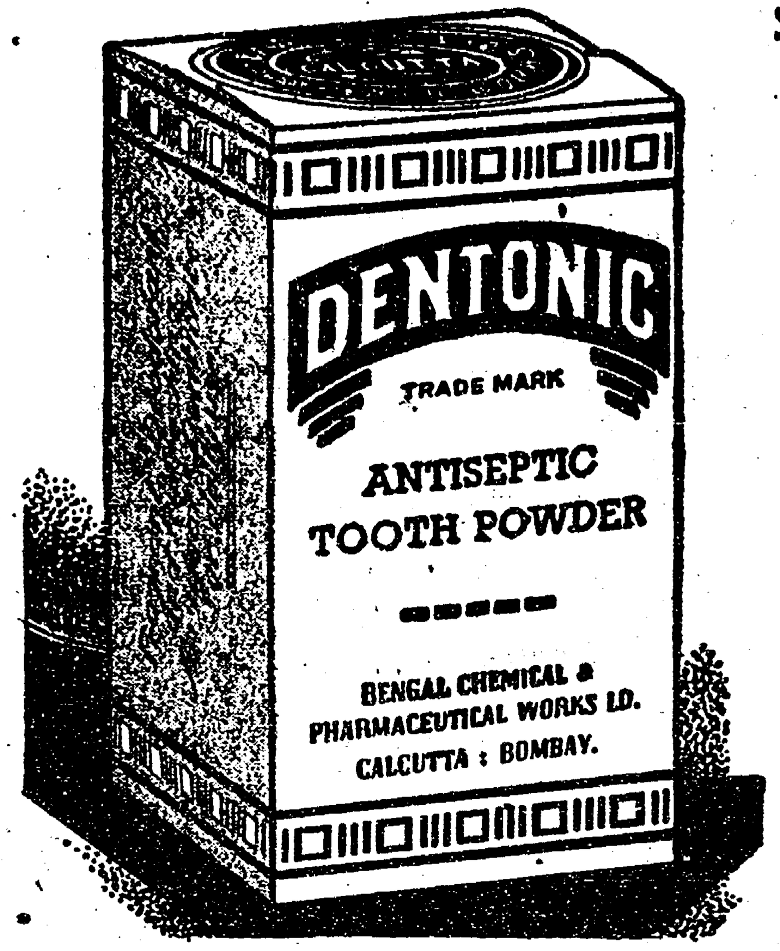

দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা দিলে
দেহের স্বাস্থ্য ও শ্রী অব্যাহত থাকে

ডেন্টনিক

দিয়া নিত্য দাঁত মাজিলে শুধু যে
দাঁত উজ্জ্বল হয় তাহা নহে, দাঁতের
মূল ও মাড়ি শক্ত হয় এবং সর্বপ্রকার
দন্তরোগ নিবারিত হয়।

চার আউন্স প্যাকেটে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

পুরস্কার !   পুরস্কার !!   পুরস্কার !!!

কুড়ি বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য গল্প প্রতিযোগিতা। ফুলস্কেপ তিন পৃষ্ঠার মধ্যে গল্প হওয়া চাই। গল্পের বিষয়বস্তু যেন ছেলেমেয়েদের উপযোগী হয়। গল্পের সঙ্গে পরিষ্কার করে নাম, ঠিকানা, বয়স এবং অভিভাবকের স্বাক্ষর পাঠাতে হবে। এ চারটী জিনিষ না থাকলে গল্প গ্রাহ্য হবে না।

প্রবেশমূল্য চার আনা। (Postal Stamp গ্রাহ্য হবে।)

প্রথম পুরস্কার—১৫"ই রূপার চ্যালেঞ্জ কাপ, রৌপ্য পদক, ও ছয়খানি গল্পের বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার—রৌপ্য পদক ও ছয়খানি গল্পের বই।

তৃতীয় পুরস্কার—ছয়খানি গল্পের বই।

পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প আমাদের ত্রৈমাসিক বই "সস্তায় কিস্তি"তে প্রকাশিত হবে।

গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ ২০শে নভেম্বর ১৯৪৩।

কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক বিচারক থাকবেন।

"অজানা সাহিত্য পরিষদ" ১০।১, এলগিন রোড, কলিকাতা।

রূপ-রেখা

উৎসবের দিনে

ছেলেমেয়েদের চাঁদমুখে হাসি
ফুটাইতে উপহারের
অপূর্ব্ব সমারোহ!

ছবি-ঝলমলে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
আনন্দ-বার্ষিকী

রূপ-রেখা

সম্পাদক—রেডিও'র 'দাদুমণি'
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ছবি, গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গচিত্র, প্রবন্ধ, রস-রচনা, আমোদ-প্রমোদ, হাসি ইত্যাদি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার!

তিনশত পৃষ্ঠারও উপরে বিরাট গ্রন্থ! এবার আকারেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃহৎ!

'রূপ-রেখার' সমৃদ্ধি-সম্পাদন করিয়াছেন

ডাঃ অবনীন্দ্র ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বেগম সামসুন নাহার, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সুনির্ম্মল বসু, গোলাম মোস্তাফা, অখিল নিয়োগী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক প্রভৃতি।

কাগজের এই দুর্মূল্যের দিনেও মূল্য দুই টাকা মাত্র!

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৫০ { ৭ম সংখ্যা

প্রতারণার ব্যথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নামটী 'নাবের' তার—আরবের সেখ,
যত ধন, তত মান, বুদ্ধি, বিবেক।
আছে তার সৌষ্ঠবে, গুণেতে অতুল,
আরবের সেরা ঘোড়া—নাম বুলবুল।
আগাম্ কদম্ টাপে সবেই নিঁখুত,
ছারতকে ছুটে চলে যেন বিদ্যুৎ।
কিবা রঙ, কিবা ঢঙ, দেখিলে তা'কে—
হারুণ আল রসিদেরও হিংসা জাগে।

'দাহের' হঠাৎ ধনী—ঘোড়াটি দেখি'—
ভাবিছে নাবের চড়ে আসিল এ কি ?
এমন ঘোটক পেতে লোকে যা বলে
বোখারা, সমরকন্দ্ দেওয়াই চলে।
জরুর এ ঘোড়া চাই—না হতে প্রভাত—
চাই ঘোড়া, চাই ঘোড়া, চাই আলবাৎ।
দাহের জানালো গিয়া মালিকের ঠাঁই
হাজার দীনার দিব—ঘোড়া মোর চাই।

মালিক বলিল এটা দিবার যে নয়,
বড় প্রিয়, বড় প্রিয়, জেনো মহাশয়।
অশ্বশালা তো মোর ঘোড়াতে বোঝাই,
নি কড়িতে লয়ে যান যেটি তব চাই।
দাহের ফিরিল ঘরে করি মুখ ভার,
ওই ঘোড়া ছাড়া নাই চিন্তা যে আর।
সহজে হলো না—চাই কৌশল, ছল,
দরকার হলে হবে প্রকাশিতে বল।

বুলবুলে চাপি সুখে চলেছে নাবের,
যাইতে সহরে দেরী এখনো যে ঢের।
পথপাশে গোঁগাইছে কাফ্রী পড়ি,
হাত পা ভেঙ্গেছে বুঝি উটেতে চড়ি।
কি ব্যাকুল কাতরতা—গলিল হিয়া,
নাবের সে ঘোড়া হতে এলো নামিয়া।
উঠাইয়া কাফ্রীরে ঘোড়ার পিঠে
পিছনে চলিছে কহি বচন মিঠে।

চড়িয়া ঘোড়ায়—ও কি! সওয়ার পাকা,
আগায়—আগায়—ঘোড়া যায় না রাখা।
মুছিতে মুখের রঙ—সন্নিকটে,
নাবের দেখিল—এ তো দাহেরই বটে।
বলে উপহাস করি—এ যে ঘোড়া মোর,
আটকাও—এই হই নাগালের ওর।
বেশী দামে দিলে নাকো—লোকে কি কবে ?
বোকা ত' তোমার মত নাহি আরবে।

নাবের বলিল তব মিটেছে তো আশ
অনুরোধ এ ঘটনা করো না প্রকাশ।
লোকে যদি জানে বন্ধু—এ কথা ত' ঠিক,
সহায়তা কম পাবে বিপদে পথিক।
করিতে করিবে দ্বিধা পর-উপকার,
বেড়ে যাবে দুঃখীর দুঃখের ভার।
জান তো ঘোড়াটী মোর প্রিয় অতিশয়
দেখো যেন যত্ন ও আদরেতে রয়।

নাবেরের কথা শুনে দাহেরের মন
লজ্জায় অনুতাপে হ'ল যে কেমন।
ঘোড়া তার হাতে দিয়া, নাকে দিয়া খৎ
বলে আমি প্রতারক—তুমি যে মহৎ।
পাপ এটা—সত্যই বেয়াদবি নয়,
রোধ করা চাই এরে, থাকিতে সময়।
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা চাই,—আর
তস্‌লিম, গুরু তুমি, বন্ধু আমার।

৩২

রঞ্জিৎকে সকলে ধরাধরি করিয়া ফরাসী গুহার দিকে লইয়া চলিল। আঘাত গুরুতর, রঞ্জিৎ ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল; সকলে যতটা সম্ভব পা চালাইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু ফরাসী গুহার কাছে পৌঁছিবার আগেই একটা ভীষণ চীৎকারের শব্দে সকলে শিহরিয়া উঠিল। ব্যাপার আর কিছু নয়, তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ওয়াল্‌ষ্টন্ ব্রাণ্ড ও কুককে লইয়া ফরাসী গুহা অক্রমণ করিয়াছে। আর একটু কাছে আসিতে দেখা গেল ওয়াল্‌ষ্টন্ একটি ছেলের টুঁটি ধরিয়া বাহিরে আনিয়াছে; সে মনন। তার পিছনে ব্রাণ্ড, তারও হাতে একটি ছেলে, বোধ হয় আশীষ। দস্যুরা দ্রুতবেগে কঙ্কণা নদীর দিকে চলিয়াছে। হঠাৎ দেখা গেল প্রদ্যোত ছুটিয়া আসিয়া ব্রাণ্ডের উপর লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু ব্রাণ্ডের সঙ্গে সে পারিবে কেন, ব্রাণ্ড এক ঘুঁষিতেই তাকে মাটীতে শোয়াইয়া দিল। এদিকে নদীতে তাহাদের নৌকার উপর কুক্ দাঁড়াইয়া। মতলবটা কি ওদের! ইভান্স, সুশান্ত প্রভৃতি প্রাণপণে নদীর দিকে ছুটিল, কিন্তু মনন আর আশীষের জন্য বন্দুক ছুঁড়িতে পারিল না। কিন্তু তাহারা কিছু করিতে না পারিলেও আর একজন করিল, সে বিয়্যার। তীরের বেগে ছুটিয়া গিয়া সে ব্রাণ্ডের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, তারপর প্রাণপণে তার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। ব্রাণ্ডের সাধ্য কি তার সঙ্গে আঁটিয়া ওঠে! বাধ্য হইয়াই সে তখন আশীষকে ফেলিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল, ওয়াল্‌ষ্টন্‌কেও মননকে ছাড়িয়া তার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতে হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আর এক নূতনতর দৃশ্য দেখা গেল। দেখা গেল, ফরাসী গুহা হইতে আর একটি পূর্ণবয়স্ক লোক ছুটিতে ছুটিতে ওয়াল্‌ষ্টনের দিকে যাইতেছে। তাকে দেখিয়া ওয়াল্‌ষ্টন্ যেন একটু আশ্বস্ত কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, "ফর্ব্‌স, শীগ্‌গির এস। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" কিন্তু এ কি, ফর্ব্‌স ওয়াল্‌ষ্টন্‌কে সাহায্য করা দূরে থাকুক বাঘের মত তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া

তার মুখের উপর প্রচণ্ড ভাবে ঘুঁষি চালাইতে লাগিল! ওয়াল্‌ষ্টন্ প্রথমটা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সহজে ঘাবড়াইবার লোক সে নয়; চকিতে কোমরবন্ধ হইতে লম্বা একটা ছোরা বাহির করিয়া সে ফর্ব্‌সের বুকে আমূল বসাইয়া দিল। ফর্ব্‌স মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। ফর্ব্‌সকে ছাড়িয়া তখন ওয়াল্‌ষ্টন্ আবার মননকে ধরিতে গেল। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও মননের উপস্থিতবুদ্ধি কম নয়, ইতিমধ্যে সে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছে। তার জামার পকেটে ছিল রিভলভার; ক্ষণমাত্র দেরী না করিয়া সে ওয়াল্‌ষ্টনের বুক লক্ষ্য করিয়া পর পর দুইটা গুলি চালাইয়া দিল। ওয়াল্‌ষ্টনের যেন কই মাছের প্রাণ, গুলি খাইয়াও সে টলিতে টলিতে গিয়া নৌকায় উঠিল। ব্রাণ্ড আগেই নৌকায় উঠিয়াছিল, কুক্ নৌকা ছাড়িয়া দিল। শিকার বুঝি পালায়! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ঘটিল আর এক অভাবিত কাণ্ড! হঠাৎ বজ্রপাতের মত বিকট শব্দে সমস্ত দ্বীপ কাঁপিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কামানের গোলা আসিয়া নৌকা আর নদীর জলের উপর পড়িল। বুনো ঘরের ভিতর হইতে কামান ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলেরা সভয়ে সরিয়া আসিল। পরমুহূর্ত্তেই এক করুণ আর্ত্তনাদ। তার পর সব চুপ্। কামানের গোলায় নৌকা ও তার আরোহী কয়জন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কেটের অক্লান্ত শুশ্রূষায় রঞ্জিৎ ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তখনও বড় দুর্ব্বল। চিরকুমারী কেট্ অবসর সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র চর্চ্চা করিত, এখন সে বিদ্যার পরীক্ষা সুরু হইল। ছেলেরা ফর্ব্‌সকেও গুহায় লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তার আঘাত ছিল মারাত্মক, তাকে আর বাঁচানো গেল না। মরিবার আগে একটু জ্ঞান হইয়াছিল, অনুতপ্ত চিত্তে সকলের কাছে ক্ষমা চাহিয়া সে চোখ বুঁজিল। ছেলেরা বদোয়াঁ সাহেবের কবরের কাছে লইয়া গিয়া তাকে সমাধিস্থ করিল।

কিন্তু দ্বীপ এখনও শত্রুশূন্য হয় নাই। কোপ্ ও রক্ বাঁচিয়া থাকিতে যে কোন সময়ে বিপদ্ ঘনাইয়া আসিতে পারে। তাই রঞ্জিৎ একটু সুস্থ হইলেই ইভান্স বড় ছেলেদের কয়েকজনকে লইয়া তাদের খোঁজে বাহির হইল। কোপ্‌কে বেশী খুঁজিতে হইল না, ফাঁদবনে ঢুকিতেই এক জায়গায় গুলিবিদ্ধ কোপের বিকৃত মৃতদেহ চোখে পড়িল, তখনও তা বন্য জন্তুদের চোখে পড়ে নাই। কোপ্ তা হইলে যুদ্ধের সময়েই সাবাড় হইয়াছে! কিন্তু রক্? বহু খুঁজিয়াও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

রকের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সেদিনকার মত ফিরিতেছিল, হঠাৎ রোহিতাশ্ব বলিল, "অনেক দিন ফাঁদের ভিতরটা দেখা হয় নি, একবার দেখা যাক্ ভিতরে কোন জন্তুটন্তু পড়্‌ল কিনা।"

ফাঁদের ডালপালা সরাইয়া রোহিতাশ্ব ভিতরে উঁকি মারিল এবং পরক্ষণেই বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। ফাঁদের মধ্যে অন্য কোন জন্তু পড়ে নাই, পড়িয়াছে স্বয়ং রক্। তখন ইভান্স বুঝিল পলায়মান রকের পিছনে সে যখন গুলি ছুঁড়িতেছিল তখন রক্ কেন অমন অদ্ভুত ভাবে হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছিল। রকের দেহে অবশ্য প্রাণ ছিল না।

সিন্ধুদ্বীপ শত্রুশূন্য হইল। এইবার রঞ্জিৎ আর একটু ভাল হইলেই যাত্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে দস্যুদের সেই স্লুপ নৌকাটা মেরামত করা দরকার। ইভান্স কয়েক জনকে লইয়া ভাল্লুক পাহাড়ে গিয়া নৌকাটি উদ্ধার করিয়া আনিল। দড়ি বাঁধিয়া অত বড় একটা ভাঙ্গা নৌকা টানিয়া আনিতে অবশ্য বেগ কম পাইতে হয় নাই—কিন্তু ছেলেরা এই দু'বছর অনেক অসাধ্যই সাধন করিয়াছে, তার উপর এখন তো ইভান্স্‌ও সঙ্গে আছে।

নৌকা মেরামত হইল। যন্ত্রপাতি তো ছেলেদের কাছে সবই ছিল, জাহাজে ভাঙ্গা তক্তারও অভাব ছিল না। নৌকা প্রস্তুত হইলে তাহাতে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র যতটা সম্ভব বোঝাই করা হইল; খাবার-দাবার, লোনা মাংস, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, এমন কি লাইব্রেরীর বইগুলিও বাদ পড়িল না।

পরদিন তাহারা দ্বীপ ত্যাগ করিবে। সে রাত্রিতে আর কাহারও ঘুম আসে না। এই দ্বীপটি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তারা এত দিন কত চেষ্টা করিয়াছে, আর আজ যেন এ দ্বীপ ছাড়িয়া যাইতে মন কেমন করিতে লাগিল। সত্যিই তো! দীর্ঘ দুই বছরের কত রকম স্মৃতিই না এই দ্বীপটির সঙ্গে জড়াইয়া আছে!

পরদিন নৌকা ছাড়িল। কঙ্কণা নদীর উপর দিয়া নৌকা দ্রুতবেগে স্কুনার উপসাগরের দিকে ভাসিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে নন্দন পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল। তার পর আসিল সেই সুবিশাল জলা।

পর দিন জোয়ারের মুখে প্রবাল-চরগুলি পার হইবার পর নৌকায় পাল খাটাইয়া দেওয়া হইল। সমুদ্রের প্রবল বাতাসের মুখে পড়িয়া নৌকা তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়া চলিল।

তার পর কেম্‌ব্রিজ্ দ্বীপ, স্মিথ্ চ্যানেল, কিং উইলিয়াম্ ল্যাণ্ড। শেষে নৌকা ম্যাগেলান প্রণালীর মুখে আসিয়া পড়িল। ডান দিকে সেণ্ট্ য়্যানের পর্ব্বতচূড়া, বাঁ দিকে বোফোর্ট উপসাগর। ট্যামার অন্তরীপ পার হইয়া তাহারা ম্যাগেলান প্রণালীর দাক্ষণ-পূর্ব্ব দিক্ চাপিয়া চলিতে লাগিল। ইভান্স সঙ্গে থাকিতে ভয় কি? সমুদ্রের স্নিগ্ধ হাওয়ায় রঞ্জিৎও এখন বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

এবার ডান দিকে সেই বিখ্যাত অনুর্ব্বর ডোজোলেসন্ দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে প্রায় নব্বই মাইল,

কিন্তু কোথাও গাছপালার চিহ্ন নাই—শুধু বালুময় প্রান্তর আর সুউচ্চ পর্ব্বতমালায় পূর্ণ।

ইভান্সের ইচ্ছা ছিল ফ্রোয়ার্ড্ অন্তরীপ ও ব্রান্সওইক্ উপদ্বীপ ঘুরিয়া একেবারে পুণ্টা এরিনায় গিয়া হাজির হইবে, কিন্তু তার আর দরকার হইল না।

সেদিন ভোরবেলা হঠাৎ নীলাদ্রি চীৎকার করিয়া কহিল,—"ধোঁয়া, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে!" প্রথমটা যেন কেহই বিশ্বাস করিল না। সুশান্ত ভাল করিয়া দেখিবার জন্য একেবারে মাস্তুলে উঠিয়া পড়িল, তার পর সোল্লাসে চেঁচাইয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি ধোঁয়া, একটা জাহাজও দেখা যাচ্ছে।"

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড কালো মালবাহী জাহাজ জল কাটিতে কাটিতে দ্রুতবেগে আগাইয়া আসিতেছে।

ছেলের দল নিশান, রুমাল প্রভৃতি হাতের কাছে যাহা পাইল তাহাই উড়াইতে লাগিল। এবার জাহাজখানিও বংশীধ্বনি করিতে লাগিল। নৌকা তবে তাহাদের চোখে পড়িয়াছে।

জাহাজ কাছে আসিয়া থামিল। জাহাজখানার নাম "লিওনারা"—ম্যাগেলান্ প্রণালী ঘুরিয়া অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী অভিমুখে যাইতেছিল। দু'বছর পূর্ব্বেকার সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা পৃথিবীর সকলেই জানিত। খবরের কাগজে ইহা লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছিল। অতগুলি ছেলে লইয়া আস্ত একখানি জাহাজ নিরুদ্দিষ্ট ভাবে কোথায় ভাসিয়া গেল ভাবিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। খোঁজাখুঁজিও কম হয় নাই। এত দিন পরে সেই হারানো জাহাজের যাত্রীদের উদ্ধারের গৌরব লাভ করিয়া 'লিওনারা'র ক্যাপটেন ও নাবিকদের আনন্দের অবধি রহিল না।

তার পর? তার পর নৌকার সতেরোটি আরোহীকে তাদের মালপত্র সমেত লিওনারায় তুলিয়া লইয়া স্লুপ্‌খানিকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। সীমাহীন কালো জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে কালো বিন্দুরই মত কোথায় যে সেটি অদৃশ্য হইয়া গেল আজ পর্য্যন্ত কেউ তাহার সন্ধান জানে না। *

— সমাপ্ত —

কবিতা-কণা

রাজার মুকুট ধূলায় লুটায়, বিজয়ে-মাল্য—যায় তা' শুখে',
সতের করম—গন্ধপুষ্প বিলায় সুবাস ধূলারও বুকে।

—শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

*জুল্ ভার্ণে রচিত একখানি বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস অবলম্বনে।

সতী জয়মতী

শ্রীঅশোকমোহন সেন, এম্.এ

খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রীর দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এঁদের জীবন-কথা, কীর্ত্তি-কাহিনী তোমরা সকলেই জান। এঁদের মত আর একজন মহীয়সী মহিলার কথা আজ আমি বল্‌ব, যাঁর আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব কাহিনী জগতে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। আমি অসমীয়া সতী জয়মতীর কথা বল্‌ছি।

প্রায় দু'শ' সত্তর বছর আগেকার কথা। আসামে তখন আহোম রাজগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন চালাচ্ছেন। শাসন চলছিল সত্যি, কিন্তু সেটাকে মোটেই সুশাসন বলা চলে না। দেশের চারিদিকে অত্যাচার ও অবিচার দিন দিন বেড়েই চলেছে—প্রজাদের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। সিংহাসনের অধিকারী লরা অর্থাৎ বালক রাজা যেমন অক্ষম, তেমন দুর্ব্বলচিত্ত। মন্ত্রী ও আমত্যদের কুমন্ত্রণার ফলে রাজদরবার হয়ে উঠেছিল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কেন্দ্র। লরা রাজার এদের পরামর্শ উপেক্ষা করবার সাহস বা সামর্থ্য ছিল না। ফলে, স্বার্থান্বেষী মন্ত্রীদের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য-শাসন চল্‌ছিল।

লরা রাজার কানে মন্ত্রণা দেওয়া হল, ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ তাঁর সিংহাসন দাবী করতে না পারে সে পথ পরিষ্কার রাখা উচিত; এবং এজন্য দরকার হলে তাঁর প্রতিপক্ষের প্রাণনাশ করতেও পশ্চাদ্‌পদ হওয়া উচিত নয়। সোজা কথায়, স্বেচ্ছাচারিতার পথ নিষ্কণ্টক করে নিশ্চিন্ত মনে লরা রাজার একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে হবে। এই হল তাদের অভিসন্ধি।

এই নিষ্ঠুর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে বেশী সময় লাগল না। এদিকে রাজবংশের একটি শাখার রাজপুত্র গদাপাণি। সিংহাসনে অধিকার লরা রাজার চেয়ে গদাপাণির বেশী। তদুপরি চরিত্র-গৌরবে ও শৌর্য্যে-সাহসে তাঁর যোড়া মেলে না। এঁরই স্ত্রী সতী জয়মতী। এঁদের দুই ছেলে,—লাই ও লেচাই। স্বভাবতঃই লরা রাজার আক্রোশ গিয়ে পড়ল তাঁর 'পর। আদেশ হল গদাপাণিকে বন্দী করে আনবার জন্যে।

জয়মতী চোখে অন্ধকার দেখলেন; তাঁর স্বামীর জীবন আজ বিপন্ন। রাজার লোক যে শীগ্‌গিরই এসে হানা দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক উপায় তাঁর মাথায় এল। গদাপাণিকে তিনি দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু গদাপাণির মত বীর কোন্ মুখে এই প্রস্তাবে রাজী হন? আজ যদি পালিয়ে যান, নিজে হয়তো তিনি নিষ্কৃতি পাবেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও ছোট শিশুপুত্র দুটির কথা ভেবে তাঁর বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। ওঁকে

খুঁজে বের করতে না পারলে রাজার সমস্ত প্রতিহিংসা যে ওদের ওপর গিয়ে পড়বে, তাতে আর বিচিত্র কি? জয়মতীর প্রস্তাবে তাঁর মন কিছুতেই সাড়া দিল না। নিজের প্রাণের মায়ায় ওদের বিপদের মুখে ফেলে তিনি পালিয়ে বাঁচতে চান না।

জয়মতী অনেক উপরোধ অনুরোধ করে তাঁর স্বামীকে বোঝালেন, শেষে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আমাদের জন্য নিশ্চিন্ত হও। আমাদের ওপর অত্যাচার করবার দুঃসাহস ওদের হবে না।" শেষ পর্য্যন্ত গদাপাণি জয়মতীর এই মিনতি ও তাঁর নিজের সামনের বিপদ্—এর কোনটাকে অস্বীকার করতে পারলেন না।

সন্ন্যাসীর বেশে তিনি নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লেন। ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে উপস্থিত হলেন নাগা পাহাড়ে। রাজার ছেলে, হলেন আজ পথের ভিখারী। ....

এদিকে রাজার কঠিন আদেশ, গদাপাণিকে চাই। গদাপাণি তো নিরুদ্দেশ। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। রাজ্যের মধ্যে কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না। লরা রাজা ক্রোধান্ধ ও মন্ত্রীরা বিচলিত হলেন। সবার রাগ গিয়ে পড়ল জয়মতীর ওপর। এত বড় আস্পর্দ্ধা যে রাজাকে ফাঁকি দেয়! ওঁরা ভাবলেন, এ-সব জয়মতীর কারসাজি: ও নিশ্চয় গদাপাণির সন্ধান জানে। জয়মতীর কাছে রাজদূত গেল। জয়মতী অচল, অটল। এক তাঁর জবাব, "জানি না।"

লরা রাজা ক্ষিপ্ত হলেন। সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়ে আদেশ দিলেন, ওকে রাজদরবারে সকলের সামনে এনে প্রশ্ন করা হবে। রাজার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় কোন কথা গোপন করতে সাহস করবে না। রাজমাতার নিষেধ তিনি শুনলেন না। রাজবধূকে দরবারের পাঁচজনের সাম্‌নে এনে অপদস্থ করতে ইতস্ততঃ করলেন না।

কিন্তু জয়মতী এজন্য প্রস্তুত ছিলেন। রাজদরবার। জয়মতী উপস্থিত। প্রথমে অনুরোধ করা হল; কোন ফল হল না। তারপর কঠিন আদেশ হল, গদাপাণির সন্ধান চাই-ই, এবং যে-পর্য্যন্ত ও সব কথা খুলে না বলবে, সে-পর্য্যন্ত ওর স্থান হবে বন্দীশালায়। উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রাও ক্রমশঃই কঠিন থেকে কঠিনতর হল। কিন্তু জয়মতী অচল, অটল। তাঁর সেই এক কথা, "আপনাদের যা খুশী তাই করতে পারেন, কিন্তু আমি কোন কথা বলব না।"

রাজদণ্ডও ক্রমশঃ নির্ম্মম হতে লাগ্‌ল। জয়মতী জানতেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কোন রকম নীচ উপায় এরা বাদ দেবে না। তবু যে দিন চোখের জলে গদাপাণিকে বিদায় দিয়েছিলেন, সে দিন থেকেই তাঁর কর্ত্তব্য কি, তা ঠিক করে ফেলেছেন। তাঁর স্বামী কোথায় তিনি জানেন, এও তাঁর জানা আছে যে আজ তাঁর মুখের একটি কথায় স্বামীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। ভগবান্‌কে

স্মরণ করে, তিনি নিঃশব্দে ধীর-স্থির হয়ে সব রকম লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সয়ে যেতে লাগলেন। আজ দীক্ষা নিয়েছেন আত্মত্যাগের মন্ত্রে ; ঐ এক তাঁর চিন্তা, এক স্বপ্ন। স্বামীর কল্যাণের ভাবনা অন্য সব ভাবনাকে ছাপিয়ে উঠ্ল। এজন্য যদি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাতে তাঁর এতটুকু দুঃখ নেই।

দিনের পর দিন চল্‌তে লাগল অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন। প্রথমে ছিলেন তিনি বন্দীশালায়, কিন্তু তাঁর শঙ্কাহীন অবিচলিত ভাব দেখে কিছুদিন পর সেখান থেকে তাঁকে একটা জঙ্গলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। কোন ফল হল না।

রাজদণ্ডের পশুশক্তি জয়মতীর মনোবলের কাছে হার মান্‌ল।

কয়েকদিনের মধ্যেই অত্যাচারের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—দেশের লোক শিউরে উঠ্ল। ....

এদিকে গদাপাণি নাগা পাহাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন,—এক বস্ত্রে, অসহায়ে, অনিদ্রায়। প্রাণাধিক স্ত্রীর কথা মনে পড়ে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে,—লাই, লেচাইর জন্য তাঁর মন কেমন করে। তারা সব কোথায় আছে, কি ভাবে আছে, ভগবান্‌ই জানেন। লোকের মুখে মুখে তাঁর কানে এসে পৌঁছল জয়মতীর ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা। তাঁরই জন্য আজ এই লাঞ্ছনা, এই যন্ত্রণা। স্ত্রীকে দেখবার জন্যে গদাপাণি অস্থির হয়ে উঠলেন। রওনা হলেন নাগার ছদ্মবেশে রাজধানী অভিমুখে। সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে গভীর রাতে একদিন উপস্থিত হলেন রাজবাড়ীর কাছে। এগিয়ে চল্‌লেন বন্দীশালার দিকে। প্রহরীদের ফাঁকি দিলেন, তারা তাঁকে চিনতে পারল না। নিঃশব্দে এসে উপস্থিত হলেন জয়মতীর সাম্‌নে। জয়মতীর কিন্তু চিন্‌তে এক মুহূর্ত্ত দেরী হল না; কিন্তু আনন্দের চেয়ে ভয়ই বেশী পেলেন,—এখন যদি তাঁর পরিচয় কোন রকমে প্রকাশ পায়! অবশ্য নিজের জন্যে তাঁর এতটুকু ভাবনা নেই। দুঃসহ উৎপীড়নে ও অবিরাম যন্ত্রণা ভোগে তাঁর প্রাণশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে তবু তাঁর দুঃখ নেই। স্বামীকে নিরাপদে রেখে মরতে পারবেন, এই তাঁর পরম সান্ত্বনা। ভীতকণ্ঠে গদাপাণিকে বললেন, "কেন তুমি আবার এসেছ? পালাও শীগ্‌গির।" গদাপাণি নিরুপায় হয়ে বিদায় নিলেন; এই হল তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ।

এই ভাবে মাত্র ষোল দিন তিনি বেঁচে ছিলেন। সংকল্প অটুট রেখে, তিনি আস্তে আস্তে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। সব রকম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা তুচ্ছ করে নিজের জীবনের বিনিময়ে বাঁচিয়ে গেলেন তাঁর স্বামীকে।

* * এর পর আছে ইতিহাসের অন্য কথা,—কি ভাবে গদাপাণি ছদ্মবেশে সৈন্য সংগ্রহ করে লরা রাজাকে পরাজিত করে গদাধর সিংহ নামে রাজা হয়ে বসলেন। গাদাপাণির সিংহাসন

অধিকার সুগম হয়েছিল তাঁর স্ত্রীর আত্মদানে। জয়মতীর মৃত্যু-কাহিনী সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল, এবং লরা রাজার সিংহাসন টলে উঠ্ল। তাঁর সুশাসনে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠ্ল। মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রুদ্রসিংহ রাজা হয়ে তাঁর পুণ্যাত্মা সতীমায়ের স্মৃতিকল্পে এক বিরাট হ্রদ তৈরী করেছিলেন। শিবসাগরে গেলে "জয়সাগর" নামে আজও সেই হ্রদটি দেখ্‌তে পাবে। তারই অনতিদূরে জয়দোল। এখানে এখনো প্রতি বৎসর জয়মতী-উৎসব হয়। *

পাগল

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

সমুদ্রের ধার দিয়া আঁকাবাঁকা রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে—শেষ হইয়াছে বহুদূরে কোন্ গ্রামের মধ্যে। মাঝে মাঝে দু'-একটা বড় বড় বেলে পাথরের চাঁই এধার ওধার ছড়ান; সমুদ্রের ঢেউ সবেগে তার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এমনি চলিয়াছে দিবারাত্র।

রাস্তার দু' পাশে ছোট ছোট বাংলো ধরণের বাগান-ওয়ালা বাড়ী, এখানে ওখানে ফাঁকে ফাঁকে সাজান-গোছান কতকগুলি দোকানপাট। ছোট সহর, কিন্তু তারই মধ্যে বিদেশীর চোখে বেশ একটু সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। সহরটির নাম শোভানিয়া।

শোভানিয়ার নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান? আমি স্বাধীন প্যারাগন্ রাজ্যের রাজধানী শোভানিয়ার কথা বলিতেছি। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর ছোট এই দ্বীপটির কথা কে না জানে? অবশ্য এখন যারা প্যারাগনিয়ান্ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয় আসলে কিন্তু তারা এদেশের আদিম অধিবাসী নয়, বিদেশের—বিশেষ করিয়া ইয়োরোপের কোন কোন অঞ্চল হইতে আসিয়া এরা এখানে উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। তার পর আজ কয়েক বছর হইল নিজেদের স্বাধীন জাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

স্বাধীন হইবার পর নানা দিক্ দিয়া এরা যে ভাবে আগাইয়া চলিয়াছে তা'তে শীঘ্রই হয়তো এরা পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে সুরু করিবে।

---

* অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্রের ছোটদের আসরে পঠিত ও উক্ত বেতার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

হ্যাঁ, যা বলিতেছিলাম। অনেকদিন আগেকার কথা, সেটা বোধ হয় ১৯২০ কি ২১ সাল। সমুদ্রের ধারে ঐ রাস্তাটির উপর ছোট একটি সরাইখানায় বসিয়া একটি যুবক কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আপন মনে কি ভাবিতেছিল। সরাইখানাটি ছোট বটে কিন্তু নামটা তার নেহাৎ ছোট নয়—"কাফে দ্য প্যারাগনিয়া প্যাসিফিকাটাম্।" নামটির মধ্যে ফরাসী, লাটিন এবং প্যারাগনী—সব রকম শব্দই আছে। যুবকের বয়স পঁচিশ বছরের বেশী হইবে না, বেশভূষা দেখিয়া ভদ্র ঘরের ছেলে বলিয়াই মনে হয়—কিন্তু কেমন যেন উদাসীন ভাব। চুলগুলিতে অনেক দিন চিরুণী পড়ে নাই। গোঁফ-দাড়ির সঙ্গেও বোধ হয় সপ্তাহ খানেক ক্ষুরের সংস্পর্শ ঘটে নাই। পায়ের জুতাটি দামী, কিন্তু বহুদিন পালিশ করা হয় নাই।

যুবক প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরিয়া বসিয়া আছে। এক পেয়ালা কফি খাইতে কারও এতটা সময় লাগে না—বিশেষতঃ একা বসিয়া। দেখিলে মনে হয় কফি খাওয়াটা যেন উপলক্ষ্য মাত্র, আসল কাজ তন্ময় হইয়া চিন্তা করা। দূরে আর একটা টেবিলে আর কয়েক জন ছোকরা বসিয়া প্লেটের পর প্লেট খাবার নিঃশেষ করিতেছিল, আর নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব আলোচনা করিতেছিল। বেশ বোঝা গেল আলোচ্য বিষয় ঐ যুবকটি। একজন বলিল, "ওকে চিনিস না? ও হচ্ছে হারিকুলা। আস্ত একটি পাগলের ডিম। কোন্ দিন দেখবি খোলস ভেঙ্গে একটা প্যাকৃপেকে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!" হারিকুলার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন মনে কি ভাবিয়া চলিয়াছে।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে হারিকুলার কফি-পাত্র খালি হইল। ওয়েটার বিল্ লইয়া আসিল। হারিকুলার সেদিকেও খেয়াল নাই। ওয়েটার দু' তিনবার সম্ভ্রম সহকারে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিল। তার পর বিরক্ত হইয়া বার কয়েক টেবিলের উপর ঠুক্ ঠুক্ করিল। হারিকুলার সাড়া নাই। এবার ওয়েটারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, খ্যান্‌খেনে গলায় হাঁকিল, "মশয়, শুনচেন? দামটা দিতে হবে যে!"

যুবক হঠাৎ ভীষণ ভাবে চমকাইয়া উঠিল; তার পর উদাস অথচ জিজ্ঞাসু নেত্রে ওয়েটারের দিকে চাহিল। ওয়েটার তেমনি রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, 'বলি কফির দামটা কে দেবে?" "ওঃ!" বলিয়া যুবক পকেট হইতে একটি ঝক্‌ঝকে রূপার প্যারাগনিয়ান্ ডলার বাহির করিয়া টেবিলে ফেলিয়া দিয়া সন্ সন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভাঙ্গানি লইবার কথা তার মনে নাই।

নিজের ঘরে গিয়া হারিকুলা অবশ ভাবে ইজিচেয়ারে গা ঢালিয়া দিল। কফি খাইবার পর শরীর সাধারণতঃ একটু চাঙ্গা হইবার কথা, কিন্তু সে রকম কোন ভাব তার মধ্যে দেখা গেল না। মাথাটা যেন এখনও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—আর কত রকম চিন্তা যে তার মধ্যে এক সঙ্গে মাথা

চাড়া দিয়া উঠিতেছে তার আর ঠিক নাই। বাড়ীতে হারিকুলা একেবারে একা। কারও সঙ্গে যে দু'টা ভালোমন্দ কথা বলিয়া মনটা একটু তাজা করিয়া লইবে তার উপায় নাই; বন্ধুবান্ধবও নাই বলিলেই চলে। তবে ঘরে টাকা-পয়সা কিছুটা আছে, কাজকর্ম্ম না করিলেও বেশ চলিয়া যায়।

ইহার কয়েক দিন পরের কথা। সমুদ্রের ধারের সেই আঁকাবাঁকা রাস্তাটার উপর দিয়া একটি লোক চলিয়াছে, আর পিছন পিছন ছেলের দল, যেমন সব দেশেই করে তেমনি, হাততালি দিতে দিতে চলিয়াছে। লোকটি আর কেউ নয়, হারিকুলা। এখন সে বদ্ধ উন্মাদ।

চলিতে চলিতে পাগল হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইল। তার পর কি ভাবিয়া সোজা সমুদ্রের দিকে দৌড় লাগাইল। ওকি, জলে ডুবিয়া মরিবে নাকি! রাস্তার লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল। দু'জন পাহারাওয়ালা নিকটেই ছিল, তারা দৌড়াইয়া গিয়া পাগলকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল। পাগল খানিকক্ষণ মুক্ত হইবার জন্য হাত-পা ছুঁড়িল, শেষে ছোট ছেলেটির মত আত্মসমর্পণ করিল।

এ রকম পাগলকে আর রাস্তায় একা ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। হারিকুলাকে সেই অবস্থায়ই পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পাগলা-গারদে ঢুকিবার সময় সেখানকার নিয়মানুযায়ী পকেট খানাতল্লাস করা হইল। পাওয়া গেল কয়েকটা ভাঙ্গা চীনামাটীর পেয়ালার টুকরা, এক টুকরা ময়লা কালি-মাখা ব্লটিং পেপার, গোটা দুই-তিন পেরেক, আর হিজিবিজি দাগ কাটা একরাশ কাগজ। মূল্যবান্ জিনিষের মধ্যে ছিল কুড়িটি রূপার প্যারাগনিয়ান ডলার। যথারীতি তার সবগুলিই হারিকুলার নামে খাতায় জমা করিয়া লওয়া হইল।

পাগলা-গারদে হারিকুলার চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

তার পর দীর্ঘ ত্রিশ বছর চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর উপর দিয়া এই সময়ের মধ্যে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা বহিয়া গিয়াছে, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের শোভানিয়া সহরটিও তার হাত হইতে রেহাই পায় নাই।

সমুদ্রের ধারের সেই আঁকাবাঁকা রাস্তাটি এখনও আছে, কিন্তু এখন আর তার পূর্ব্বের চেহারা নাই। রাস্তাটি আরও চওড়া হইয়াছে, তার দু' পাশে ফুটপাথ্ বসিয়াছে, আর তার ধার ঘেঁষিয়া উঠিয়াছে আকাশচুম্বী অগণিত অট্টালিকা। সে ছোট ছোট ফুলের বাগান বা বাংলো ধরণের বাড়ীর চিহ্নও নাই। রাস্তা দিয়া ট্রাম, মোটর গিস্‌গিস্ করিতেছে। শোভানিয়া আজ ইয়োরোপের বা আমেরিকার যে কোনও প্রথম শ্রেণীর সহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ থামিয়াছে কিন্তু তার রেশ এখনও মেটে নাই—কবে যে মিটিবে তাও বলা কঠিন।

ফুটপাথ ঘেঁষিয়া একটি ভদ্রলোক ধীরপদে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছেন। বয়স তাঁর প্রায় ষাটের কাছে গিয়াছে, গালে অল্প অল্প কাঁচা-পাকা দাড়ি। ভদ্রলোক যেন খুব বিস্মিতদৃষ্টিতে চারিদিক্ লক্ষ্য করিতেছেন। লোকটি আর কেউ ন'ন, আমাদের ত্রিশ বছর আগেকার পরিচিত সেই যুবক হারিকুলা। এই দীর্ঘ দিন পরে মাত্র আজই তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া পাগলা-গারদ হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ত্রিশ বছর পরে হঠাৎ সহরের এই নতুন চেহারা দেখিয়া তাঁর তো বিস্ময় লাগিবেই।

চলিতে চলিতে হঠাৎ তাঁর একটা সাইন্ বোর্ডের দিকে চোখ পড়িল—"কাফে ত্য প্যারাগনিয়া প্যাসিফিকাটাম্।" তাঁর সেই পরিচিত সরাই-খানা। আজ অবশ্য সে ঘরের সে চেহারা নাই, অন্যান্য সকলের সঙ্গে সেও আভিজাত্যের পোষাক পরিয়া সাজিয়া গুজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবু নামটি দেখিয়া বুঝা যায়—এ সেই পুরানো দিনেরই বন্ধু। হারিকুলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ওয়েটার আসিয়া সম্ভ্রম সহকারে অভিবাদন করিল। হারিকুলা খাবারের ফরমায়েস করিলেন। পাগলা-গারদের একঘেয়ে খাবার খাইয়া খাইয়া মুখে অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, আজ এতদিন পরে একটু মুখ বদলাইবেন বই কি।

খাওয়া শেষ হইতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল। হারিকুলা পকেটে হাত দিয়া কি অনুভব করিলেন, তার পর বিল্ আনিতে আদেশ দিলেন। পাগলা-গারদ হইতে বাহির হইবার সময় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর পকেটে পূর্ব্বেকার সেই কুড়িটি ডলার ভরিয়া দিতে ভুলেন নাই।

বিল্ আসিল। দেখিয়াই তো হারিকুলার চক্ষুস্থির। তিনি যা খাইয়াছেন তার দাম বড় জোর দু' ডলার কি তিন ডলার হইবে। জিনিষপত্রের দাম যদি কিছু বাড়িয়াও থাকে তবে না হয় ৫।৬ ডলার পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। কিন্তু ওয়েটার যে একেবারে ১৫০ ডলারের এক বিল্ আনিয়া হাজির করিয়াছে!

প্রথমটা বেচারা বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন, সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "এ-ত বিল্ হয়ে গেছে? আমার কাছে তো অত হবে না!"

ওয়েটার এবার বিরক্ত হইল। এই বহু পুরাতন সেকেলে পোষাক-পরা, সেকেলে চেহারার লোকটিকে দেখিয়া তার মোটেই সম্ভ্রম হয় নাই, কিন্তু ব্যবসার খাতিরে কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমে তাকে অন্য রকম ভাব দেখাইতে হইয়াছিল। এবারে তার স্বমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল। উদ্ধত কণ্ঠে কহিল, "দাম না জেনে শুনে, নিজের পকেটের খবর না রেখে ফরমাস্ দিলেন কেন? দাঁড়ান, ম্যানেজারকে ডাকি। পালাবেন না যেন।"

ম্যানেজার আসিলেন। মোটা ভুঁড়িওয়ালা লোকটি, হাঁটিতে একটু সময় লাগে—কিন্তু তাহা লইয়াই হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

প্রথমে তিনি মোলায়েম কণ্ঠেই কথা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ক্রমেই সুর ধাপে ধাপে উচ্চে উঠিতে লাগিল। হারিকুলা বেচারা আর কি করেন, সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, "ত্রিশ বছর আগে আমি কত বার এখানে খেয়ে গেছি, এ ক'টা খাবারের জন্য দু' ডলারের বেশী কখনও দিতে হয় নি।"

ম্যানেজারের মন বোধ হয় একটু নরম হইল, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, দেখি আপনার কছে কত আছে? বার করুন।"

"মাত্র কুড়ি ডলার আছে"—বলিয়া কাঁচুমাচু মুখে হারিকুলা পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিলেন এবং সবুজ স্যাঁৎলা-ধরা ২০টি রৌপ্যখণ্ড তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

রেস্তোরাঁ শুদ্ধ লোক এবার হাঁ করিয়া সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ম্যানেজারের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, "একটু বসুন আপনি"—বলিয়া তিনি তখনই ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং একটু পরেই হাসিমুখে এক মুঠা নোট্ ও পেষ্টবোর্ডের চাকৃতি আনিয়া হারিকুলার সামনে রাখিয়া বলিলেন, "নিন আপনার চেঞ্জ।" তার পর আর একটু হাসিয়া কহিলেন, "আজকাল তো আর রূপো দিয়ে ডলার তৈরী করা হয় না—সে সব কোন্ জন্মে উঠে গেছে। আজকাল ডলার বলতে, হয় পেষ্টবোর্ডের চাকতি, কিংবা কাগজের নোট। রূপোর ডলার যা দু'-চারটে পাওয়া যায় তা শুধু মিউজিয়ামে রাখা হয়—লোককে দেখাবার জন্য। আর ওর এক-একটার দামও এখন এখনকার ৫০টি ডলারের সমান। সেই হিসেবে আপনি আমাদের এক হাজার ডলার দিয়েছেন, তা হ'লে আপনি ফেরৎ পাবেন সাড়ে আটশ' ডলার।"

হারিকুলার মাথা আবার ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন তাঁর মাথা এখনও ঠিক হয় নাই,—এখনও তিনি তেমনি পাগলই আছেন। এখনও হয়তো একটু আধটু-জ্ঞান আছে, পরে হয়তো তাও থাকিবে কিনা কে জানে? তিনি দ্রুতপদে আবার পাগলা-গারদের দিকে ছুটিলেন।

পাগলা-গারদের ডাক্তার হাসিমুখে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, "আবার কি মনে ক'রে ফিরে এলেন? কিছু ফেলে গেছেন বুঝি?" হারিকুলা গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "আজ্ঞে না; আমার মনে হয় আপনাদের হয়তো একটু ভুল হয়েছে; আমার মাথা এখনও সারে নি। আবার আমাকে এখানে ভর্ত্তি ক'রে নিন।" ডাক্তার একে একে সব কথা খুঁটিয়া বাহির করিলেন, তার পর তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, "না, আপনি আর পাগল ন'ন, ভালই আছেন, বাড়ী যান।"

হারিকুলার মাথা তখনও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যদি তিনি সত্যি সত্যি পাগল না হন তবে কি আজ সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ লোক এক সঙ্গে পাগল হইয়া গেল? *

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে

ছোটদের পাতা

তূলোর জন্ম

শ্রীগৌরী দেবী

এক যে ছিল ছোট্ট পরী, তার ছিল এক অদ্ভুত গুণ। হাওয়ার গায়ে ছোট্ট একটি মৌমাছির হুল ফুটিয়ে সে এমন চমৎকার মিহি সুতো কাটতে পারত যে, যে দেখ্‌ত তারই তাক্ লেগে যেত; সে সূতো হ'ত হাওয়ার মতই ফিন্‌ফিনে।

সে বনে থাক্‌ত এক মস্ত মাকড়ষা। তার ধারণা ছিল, তার মত মিহি সূতোর জাল আর কেউ কাটতে পারে না। পরীর প্রশংসা শুনে তার হ'ল ভীষণ হিংসে। সে ভাবল পরী যত দিন থাকবে তত দিন তার আর খাতির হবে না। এক দিন তাই সে, পরী যখন আপন মনে সূতো কাটছিল তখন, তাকে আক্রমণ ক'রে বস্‌ল।

আচম্‌কা মাকড়ষার তাড়া খেয়ে পরী তো দে ছুট। মাকড়ষাও সহজে ছাড়বার পাত্র নয়, সেও তার পেছন পেছন ধাওয়া করল। ছুটতে ছুটতে পরী হাঁপিয়ে পড়ল; শেষে মাকড়ষা তাকে প্রায় ধরে ফেল্‌ল দেখে, টপ্ ক'রে একটা ফুলের মধ্যে লাফিয়ে পড়্‌ল। ফুলটাও অমনি পাপড়ি বন্ধ ক'রে বুঁজে গেল।

মাকড়ষা অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ল কিন্তু পরী আর বেরোয় না। তখন সে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। এদিকে কয়েক দিন পরে ফুলটি শুকিয়ে ঝরে পড়্‌ল। তখন দেখা গেল ভিতরে পরী তো নেই, তার বদলে রয়েছে রেশমের মত নরম, তুলতুলে, সাদা ধব্‌ধবে কি একটা জিনিষ! ফুলের মধ্যে বসে বসে পরী আপন মনে সূতো কেটেছে আর সেই মিহি সূতো জমে জমে ঐ জিনিষটা তৈরী হয়েছে।

লোকে আদর ক'রে জিনিষটির নাম রাখল তূলো। এমনি করেই নাকি তূলোর জন্ম হ'ল।

নানা কথ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

পাকা চুলের রহস্য

বুড়ো হ'লে মানুষের চুল সাদা হয়ে যায়—চলতি কথায় আমরা তাকে বলি চুল পেকে যাওয়া। তোমার মাথার চুল যেমন কুচকুচে কালো রং-এর, তোমার ঠাকুরদা'র চুল নিশ্চয়ই সে রকম নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেন অমনটা হয় তা ভেবে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য লাগে?

চুল বড় সূক্ষ্ম জিনিষ; একগাছা হ'লে তো অনেক সময় শুধু চোখে ভাল ক'রে দেখাই যায় না। কিন্তু ঐ চুলের ছোট এক টুক্‌রো ট্যারছা ভাবে কেটে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখ তবে ভারী মজার দৃশ্য দেখতে পাবে। মনে হবে ওটা ঠিক যেন এক টুকরো গাছের ডাল। তার ওপরটা শক্ত খোলার মত, তার গায়ে অবার অসংখ্য আঁশ। ভিতরের অংশটা আবার অন্য রকমের; সেখানে অসংখ্য কালো কালো দানা ছড়ান রয়েছে। আর একদম মাঝখানে দেখতে পাবে ঠিক গাছের ডালের নরম শাঁসের মতই একটা জিনিষ রয়েছে। মাঝের অংশের ঐ কালো দানাগুলির জন্যই চুলকে কালো দেখায়। বুড়ো মানুষের একগাছা পাকা চুল নিয়ে যদি ঐ ভাবে পরীক্ষা কর তবে দেখবে তার মাঝের অংশটায় একটিও কালো দানা নেই। তাই পাকা চুলের রং সাদা।

চুল মাথার যে জায়গায় বসান থাকে তাকে বলা হয় লোমকূপ। আমাদের শরীরের অন্যান্য অংশেও এই লোমকূপ আছে এবং সেখানে ছোট ছোট লোমও গজায়—তবে মাথার মত অত বেশী ক'রে নয়। অণুবীক্ষণ দিয়ে এই লোমকূপ বড় ক'রে দেখলে দেখা যাবে চুল লোমকূপের মধ্যে শক্ত ভাবে পোঁতা রয়েছে। আরও দেখবে—চুলের গোড়াটা তার বাকী অংশের চাইতে মোটা,—দেখতে অনেকটা পেঁয়াজের মত। চুলের এই গোড়াকার অংশটিই হচ্ছে সজীব—এখানেই নিরন্তর নতুন নতুন কোষ তৈরী হয়ে চুলকে বাড়ায়—লম্বা করে, চুলের কালো দানা এবং অন্যান্য অংশও তৈরী করে। এর সঙ্গে আবার দু'টি শিরার যোগ আছে, তাই থেকে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালিত হয়। চুলের ওপরের দিক্‌টার সঙ্গে কিন্তু ঐ শিরার কোন যোগ নেই। এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝছ—কেন চুলের ওপর দিকটা কাঁচি দিয়ে কাটলে ব্যথা লাগে না কিন্তু চুল ধরে টানলে ব্যথা লাগে। চুলের গোড়াকার ঐ পেঁয়াজের মত অংশে টান পড়ে কিনা, আর সেখানে যে শিরার যোগ রয়েছে, ব্যথা তো লাগবেই!

এখন যা বলছিলাম। মানুষ বুড়ো হ'লে তার শরীর স্বভাবতঃই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দেহের অন্যান্য অংশের মত চুলের গোড়াকার অংশটিও আগের মত আর কাজ করতে পারে না—

বিশেষ ক'রে ঐ কালো দানাগুলি তৈরী করবার ক্ষমতা তার একদম লোপ পায়। তাই বুড়ো হ'লেই চুল সাদা হ'তে থাকে।

অনেক সময়ে দেখা যায় অনেকের চুল অল্প বয়সেই পেকে যাচ্ছে। যারা খুব বেশী ভাবনা-চিন্তা করে বা খুব অসুখে ভোগে, বা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না তাদের চুলই তাড়াতাড়ি পাকে। এর কারণও বোধ হয় বুঝতে পারছ? শরীর যদি সুস্থ না থাকে তা হ'লে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিকমত কাজ করবে কি ক'রে? ফলে তাদের চুলের গোড়াও বুড়ো মানুষের মত সহজেই নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে ঐ রকম কাণ্ডটি ঘটায়।

চুল পাকবার কারণ হয়তো শুধু ঐ-ই নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে এখনও তেমন কিছু বলতে পারেন নি।

ক্যালডিয়ান্‌দের কথা

হিমালয়ের ওপরে প্রায় ১৭ হাজার ফুট উঁচুতে ক্যালডিয়ান্ নামে এক প্রাচীন সভ্য জাতি বাস করে। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মতে এরা নাকি পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের একেবারে প্রথম স্তরের জাত। এমন কি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার চাইতেও এদের সভ্যতা প্রাচীন।

ক্যালডিয়ানদের বংশ পৃথিবী থেকে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। বর্ত্তমানে এরা সংখ্যায় সাত-আটশ'র বেশী হবে না। এরা নিরামিষ খায় অত্যন্ত দীর্ঘায়ু এবং অসুখ-বিসুখও এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। বছর কয়েক আগে ডক্টর বেয়ার্ড্ ও শ্রীমতী কমলী বাট্ নামে দু'জন বৈজ্ঞানিক এদের সন্ধানে হিমালয় অঞ্চলে অভিযান করেছিলেন। দার্জ্জিলীং থেকে রওনা হয়ে দেড় হাজার মাইলেরও ওপর রাস্তা পার হয়ে অবশেষে তাঁরা ক্যালডিয়ানদের এক পল্লীতে হাজির হন, এবং লোকচক্ষুর আড়ালে, নিভৃত পাহাড়ের রাজ্যে এই প্রাচীন সভ্য জাতটিকে আবিষ্কার করেন। এরা নাকি ভারী লাজুক প্রকৃতির লোক, বাইরের পৃথিবীর কোনও ধার ধারে না;—কিন্তু নিজেরা নানা দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত। ডক্টর বেয়ার্ড এদের কাছে যে সব হাতে লেখা পুঁথিপত্র, ছবি প্রভৃতি পেয়েছেন তা খুব আশ্চর্য্যজনক। ছাগলের চামড়ার ওপর উদ্ভিজ্জ কালী আর রং দিয়ে তা তৈরী, আর এমন নিখুঁত যে হাজার বছরের পুরোনো পুঁথিকেও আজকালকার লেখা বলে চালানো যেতে পারে। এদের পূর্ব্ব ইতিহাসের কথাও নকি তা থেকেই অনেক কিছু জানা গেছে।

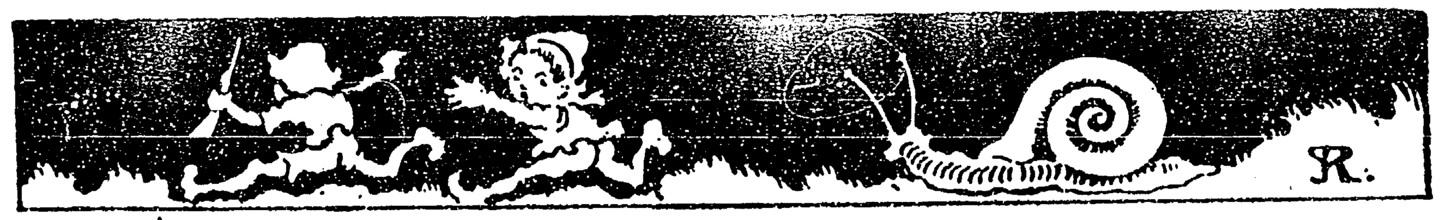

কুড়ানো গল্প

(গল্প-সংগ্রহ)

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ, বি. এস্-সি

১

ডাক্তার চিত্ত খুব নামজাদা চিকিৎসক। একবার একটি লোক তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্য আসিল। লোকটির নাকি কিছুই হজম হয় না এবং সর্ব্বদাই মনে হয় শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। চিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহার শরীরে কোনও অসুখ নাই, অসুখ যা কিছু মনের।

তিনি রোগীকে কয়েক পুরিয়া ওষুধ দিলেন আর বলিলেন ওষুধ খাইবার সময় সে যেন উট সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা না করে। ওষুধ খাইতে গিয়া উটের কথা মনে আসিলেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ রাখিতে হইবে। যখন উটের কথা মনে আসিবে না কেবল তখনই ওষুধ খাওয়া চলিবে।

রোগী মহা বিপদে পড়িল। ওষুধ খাইতে গেলেই শুধু উটের কথা মনে পড়ে, কাজেই ওষুধ আর খাওয়া হয় না। সে তখন উটের কথা আর ভাবিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু যতই সে কথা মনে করে ততই বেশী করিয়া উটের কথা মনে আসে। ফলে দিবারাত্র তাহার শুধু উটের চিন্তাই মনের মধ্যে রহিয়া গেল, নিজের অসুখের ভাবনা ভাবিবার আর সময় হইল না। কয়েক দিন পরে দেখা গেল তাহার রোগ একেবারে সারিয়া গিয়াছে।

২

এবারকার ঘটনা বিলাতের। এবারনেথি লণ্ডনের মস্ত বড় ডাক্তার। একদিন তাঁহার পরামর্শগৃহে একটি লোক প্রবেশ করিল। লোকটির মুখ বড় বিষণ্ন, চেহারায় মানসিক অশান্তির লক্ষণ টের পাওয়া যায়। ডাক্তার সাহেব তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার তো বিশেষ কিছু রোগ হয় নি—কেবল একটু আনন্দের অভাব। বেশ একটু স্ফূর্ত্তি করে বেড়ান, তা হ'লেই সেরে যাবে। এই ধরুন, আজই একবার থিয়েটারে যান না? হাস্যরসিক অভিনেতা গ্রীমাল্ডির অভিনয় দেখুন না গিয়ে? মনে আনন্দ পাবেন।"

লোকটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমাকে চেনেন না বোধ হয়, আমিই সেই গ্রীমাল্ডি।"

৩

বৈঠকখানায় প্রবল আড্ডা বসিয়াছে। আলোচনার বিষয় অন্যমনস্কতা। সেখানে একটি জার্ম্মানী-ফেরৎ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি যখন জার্ম্মানীতে ছিলাম তখন আমাদের

এক দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যেত। একবার পরীক্ষা করবার জন্য আমরা ঠিক করলাম সন্ধ্যাবেলা যখন অধ্যাপক মশাই বেড়াতে বেরোবেন তখন তাঁর পিছু নেওয়া যাবে। চাঁদনী রাত, অধ্যাপক মশাই আপন মনে কি চিন্তা করতে করতে মাঠের ওপর দিয়ে চলেছেন; আমরাও পিছনে আছি। হঠাৎ দেখি অধ্যাপক মশাই এক জায়গায় এসে থামলেন। তার পর দিলেন এক বিরাট্ লাফ। খানা মনে ক'রে আমরাও দাঁড়ালাম, কিন্তু তাকিয়ে দেখি, কোথায় খানা! সেটা একটা গাছের ছায়া মাত্র। আত্মভোলা অধ্যাপক তাকেই খানা মনে ক'রে লাফ দিয়ে পার হয়েছেন। সে রাত্রে অনেকক্ষণ আমরা তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিলাম, দেখলাম তিনি একে একে আগের মত ওরকম অনেকগুলি খানাই লাফ দিয়ে পার হলেন।"

জার্ম্মানী-ফেরৎ ভদ্রলোক থামিলে আর একজন গল্প সুরু করিলেন। ইনি এডিনবরা-ফেরৎ। "এডিনবরায়"—ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের শরীরবিধান শাস্ত্রের অধ্যাপক সম্বন্ধে এর চেয়েও মজার একটা গল্প আছে। অধ্যাপক মশাই ল্যাবোরেটারীতে কাজ করতেন আর তাঁর স্ত্রী প্রত্যহ তাঁর জন্য জলখাবার পাঠিয়ে দিতেন। জলখাবার ল্যাবোরেটারীর টেবিলেই ঢাকা থাকত। অধ্যাপক মশাই-এর স্ত্রী প্রত্যহ ছুটীর পর তাঁকে আনতে যেতেন। একদিন তিনি গিয়ে দেখেন, অধ্যাপক মশাই বেয়ারাদের ওপর খুব তম্বী করছেন, তাঁর ব্যবচ্ছেদ-টেবিলে যে ব্যাঙ ছিল তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! স্ত্রী দেখলেন, অধ্যাপক মশাইএর খাবার তখনও অভুক্ত রয়েছে। তিনি বল্লেন,"রাগ পরে হবে, আগে এগুলো খেয়ে নাও।" অধ্যাপক বল্লেন, "খেয়ে নাও মানে? কখন খেয়েছি তো!" "খেয়েছ তো এগুলো কি?" অধ্যাপক বড় ফাঁপরে পড়লেন। খাবার যে খেয়েছেন তা বেশ মনে পড়ছে তবে এগুলি কোথা থেকে এল! তখন ব্যবচ্ছেদ-টেবিলে পরীক্ষা ক'রে কয়েকটা ব্যাঙের হাড় পাওয়া গেল। বুঝতে বাকী রইল না, অন্যমনস্ক প্রফেসার খাবার মনে করে ব্যাবচ্ছেদ-টেবিল থেকে ব্যাঙটাই তুলে নিয়ে চিবিয়েছেন, খাবার পাশে অক্ষত দেহে বিরাজ করছে।"

চিঠিপত্র

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকেও প্রতি বারের মত বিজয়ার শুভেচ্ছা-সূচক অসংখ্য চিঠি আমরা পেয়েছি।

স্বল্পপরিসর কাগজের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে পত্রালাপ করা সব বার সম্ভব হয় না তা তো তোমরা বুঝতেই পার। আমরাও এজন্য কম দুঃখিত নই, কিন্তু উপায় কি? "নিরুদ্দিষ্টের দল" এবারে শেষ হল, ২।১ মাসের মধ্যেই আর একখানি নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস আরম্ভ করা

হবে। শ্রীমতী শেফালী দত্ত বাংলায় 'এপস্ট্রফী'র প্রয়োগ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন; বারান্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

বাংলা দেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। এ ঘোর দুর্দ্দিনে দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে তোমাদের যার যেটুকু সাধ্য সর্ব্বান্তঃকরণে করবে এইটুকু শুধু চাই।

—রাঃ সঃ

প্রবাসী-সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহলোকে নেই। গত শ্রাবণ সংখ্যায় তোমাদের তাঁর কথা বলেছিলাম। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়েছিল। তখন কে জান্‌ত এত শীগ্‌গির তিনি চলে যাবেন?

রামানন্দ কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের কাজ করেন কিন্তু শেষে তা ছেড়ে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ দিক্ দিয়া তাঁর সমকক্ষ লোক এ দেশে বেশী ছিল না। ভগবান্ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।

* * *

গত বারে ইটালির আত্মসমর্পণের খবর পেয়েছিলে। সম্প্রতি ইটালির বাদোলিও গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ওদিকে মিত্রপক্ষও জার্ম্মান্ বাহিনীদের ক্রমাগত হঠিয়ে দিয়ে দিয়ে ইটালির মধ্যে এগিয়ে চলেছে। রাশিয়ায়ও জার্ম্মান্‌দের ক্রমাগত পরাজয় ঘটছে।

* * *

সমস্ত পৃথিবীতে চীনাভাষায় কথা বলে ৪০ কোটি লোক। ইংরাজী ভাষায় ২০ কোটি, রুশ ভাষায় ১৩ কোটি, জার্ম্মান্ ভাষায় ৮ কোটি, ফরাসী ভাষায় ৭ কোটি, হিন্দী ভাষায় ৭ কোটি ২০ লক্ষ ও বাংলা ভাষায় ৫ কোটি লোক কথা বলে।

* * *

যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কাগজ তৈরী হ'ত আমেরিকায় তৈরী হ'ত তার প্রায় ১৯৪ গুণ, ক্যানাডায় ৬৫ গুণ, জার্ম্মেনীতে ৫৯ গুণ, এবং নরওয়ে সুইডেন মিলে প্রায় ২৬ গুণ বেশী কাগজ তৈরী হ'ত।

রাতের বাহার

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

ঝুম্‌ঝুমি তাল বাজে বনের হাওয়ায়,
সাড়া পাই একা তার ঘরের দাওয়ায়।
আঁধারিয়া রাত-কোলে এসেছে আলো,
গগনে স্বপন দোলে প্রাণ মাতালো।
ঝিকিমিকি বাঁকা চাঁদ পেয়েছে খেলা
ঝল্‌মল্‌ জম্‌কালো রাতের বেলা।
হাসির ঝর্ণা ঝরে অঝোর ঝাড়ে
নদীপথ, মাঠ, ভ'রে বন বাদাড়ে।
ফুর্‌ফুরে ঝুর্‌ঝুরে দূরে বহুদূর
শোনা যায় বেলোয়াড়ি বাঁশরীর সুর।
জোনাকীর আলো জ্বলে ফুলের বনে,
চঞ্চল কোন্‌ ছলে আমার মনে।
আগুনের ফুলঝুরি তারকার দল
রাতে আজ ক'রে সাজ হ'য়েছে উতল।
ঝিমিঝিম্‌ ঝিঁ ঝিঁ ডাকে নিরালা গাঁয়ে,
রেশ তার ফিরে যায় চপল বায়ে।
নিঃঝুমি রাতে আজ ঘুম যেন নাই,
চোখ চুমি' চেয়ে আছে আলো যে সদাই।

চিত্রশালা

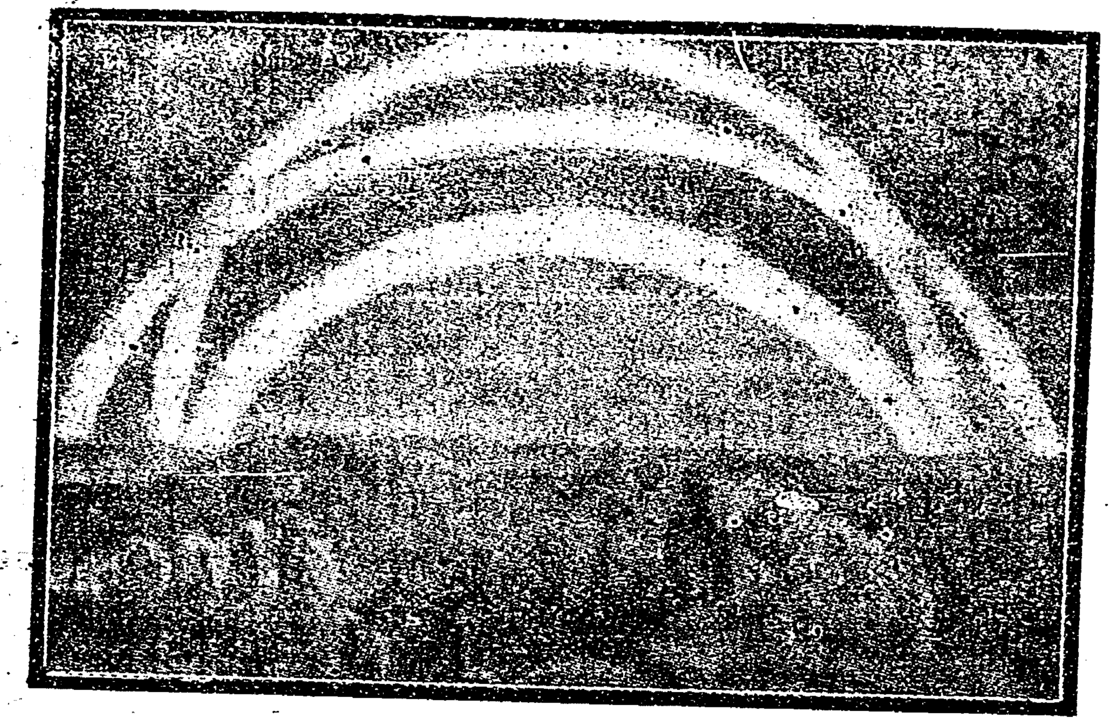

প্রকৃতির খেয়াল

এক সঙ্গে আকাশে তিনটি রামধনু

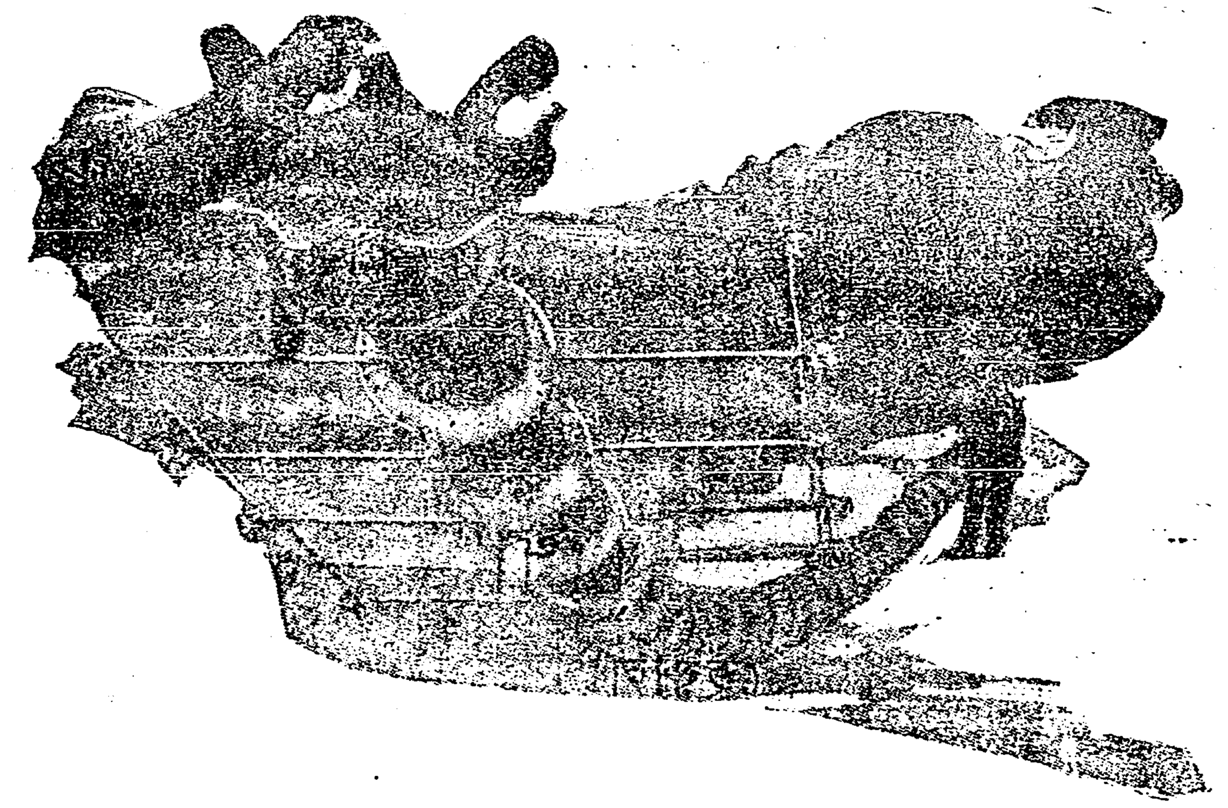

অদ্ভুত ঘুড়ি

এই অদ্ভুত জিনিষটি আসলে একটি ঘুড়ি—চীনদেশের ছেলেরা এই রকম মজার মজার ঘুড়ি ওড়ায়।

বেতালের প্রশ্ন

আষাঢ় মাসের প্রশ্নের উত্তর

(১)কাপড়ে মাইষে ধরিলে তুলিবার উপায়—ব্লিচিং পাউডার (বেশী দিলে কাপড় নষ্ট হয়), কাগজী লেবুর রস, গোল আলু সিদ্ধ জল প্রভৃতি যে কোনটির সাহায্যে ধোয়া। আর একটি উপায়—যে সাবানে খুব তাড়াতাড়ি ফেনা হয় তাহার সহিত সমপরিমাণ সাবদা মিশাইয়া তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ নূন ও এক চাকা পাতিলেবু মিশাইয়া, সবটুকু পেণ্টের মত করিয়া লাগাইয়া, পরে ব্রাশ্‌ করিয়া ফেলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। চায়ের দাগ তুলিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঠাণ্ডা জল বা আলুসিদ্ধ জলে ধুইতে হয়। (সরোজকুমার রায়, সুপ্রকাশ ও মোহন, রমেশচন্দ্র পট্টনায়ক, ইন্দ্রাণী রায় প্রভৃতি উত্তর পাঠাইয়াছেন)।

(২) বংলাভাষা শিখিবার বই—Hindi Bengali Self Tutor—এলাহাবাদ হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; Bengali Self Taught—ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোং লিঃ প্রকাশিত; বংলা ভাষা শিক্ষা—গোপাল চন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত।(সরোজকুমার রায়, রমেশচন্দ্র পট্টনায়ক ও গীতা বসু উত্তর পাঠাইয়াছেন)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

লিফ্‌ট্ বন্ধ হয়েছিল ১২টা ৫৯ মিনিটে।

উত্তরদাতাদের নাম

অমিতাভ সেন (ধুবড়ী); লুচি, সুনীল, সুধাংশু, অরুণ, সুশীলকুমার দাশগুপ্ত (পার্ক সার্কাস); বিমলচন্দ্র দত্ত, পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক (শ্রীখণ্ড); সম্পূর্ণা দেবী (নিউদিল্লী); রমা মৈত্র (লাহোর); শ্যামল বসু (ঢাকা)

নূতন ধাঁধা

হেঁয়ালী

(১) কার গায়ে পা লাগালে তা হবে সম্মানের চিহ্ন ?

(২) কোন্ ফলের গায়ে হাত লাগালে তা দিয়ে বাজনা বাজানো যায় ?

(৩) কোন্ সহর সামনের দিক্ থেকেও দেখতে যেমন, পিছন দিক্ থেকেও দেখতে তেমন ?

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
হুকাকাশির গল্প
মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির" কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম.এ প্রণীত
বদ্যিনাথের বড়ি
সরস মজাদার হাসির গল্প ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৵০
কলকাতার হালচাল ... ১৲

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
আবিষ্কারের গল্প ... ॥৵০
আকাশের গল্প ... ৸৶০
জন্মদিনের উপহার (গল্প) ॥৶০
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন
(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা
(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

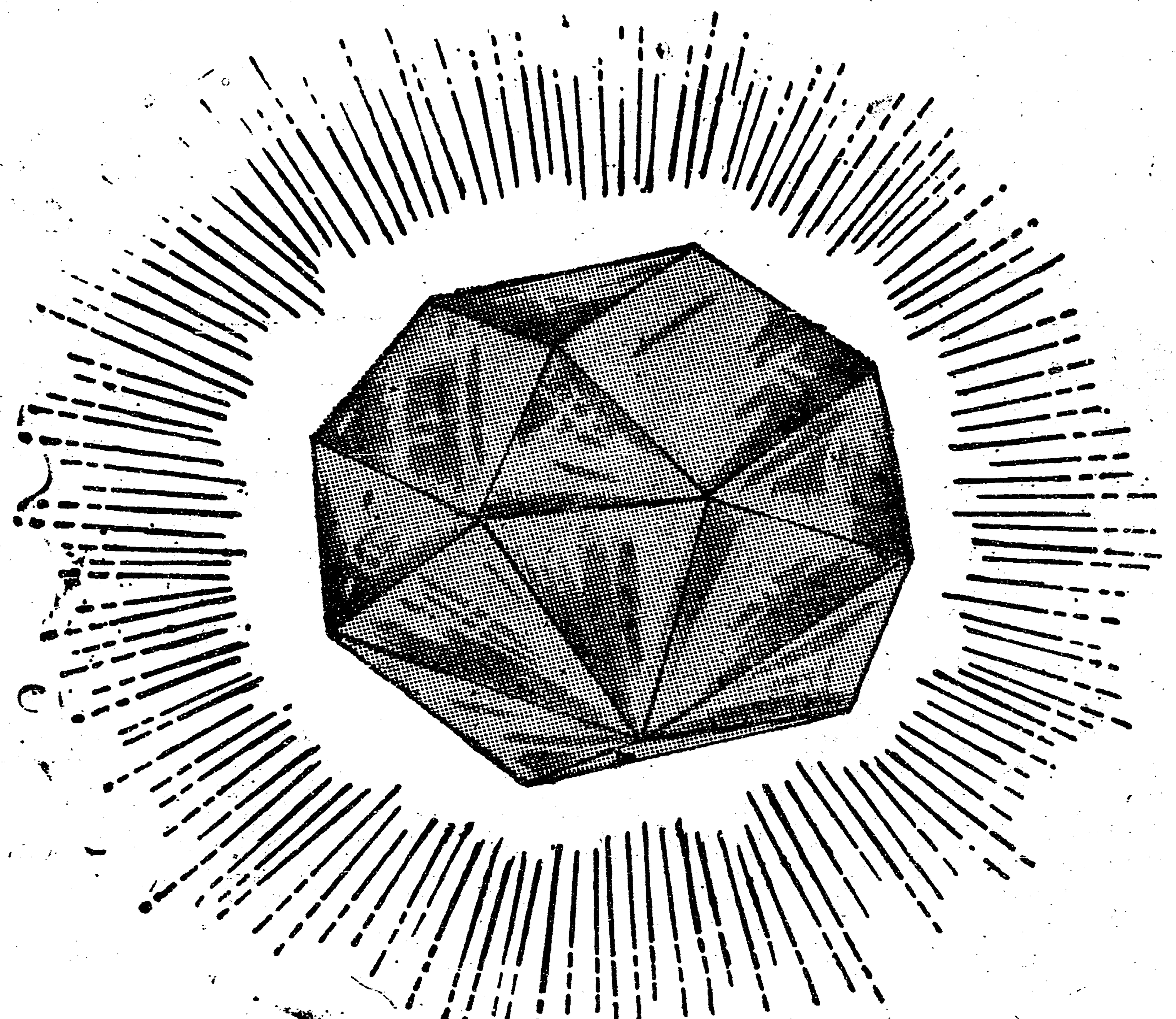

আপনার স্বাস্থ্য কি

অধিক মূল্যবান ?

'লক্ষ্মী ঘি'

স্বাস্থ্য অটুট রাখে
নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করে
বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

৬ষ্ঠ বর্ষ
... সংখ্যা
অগ্রহায়ণ
১৩৫০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৮৲ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১৷৵০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

Regd. No. C—1641

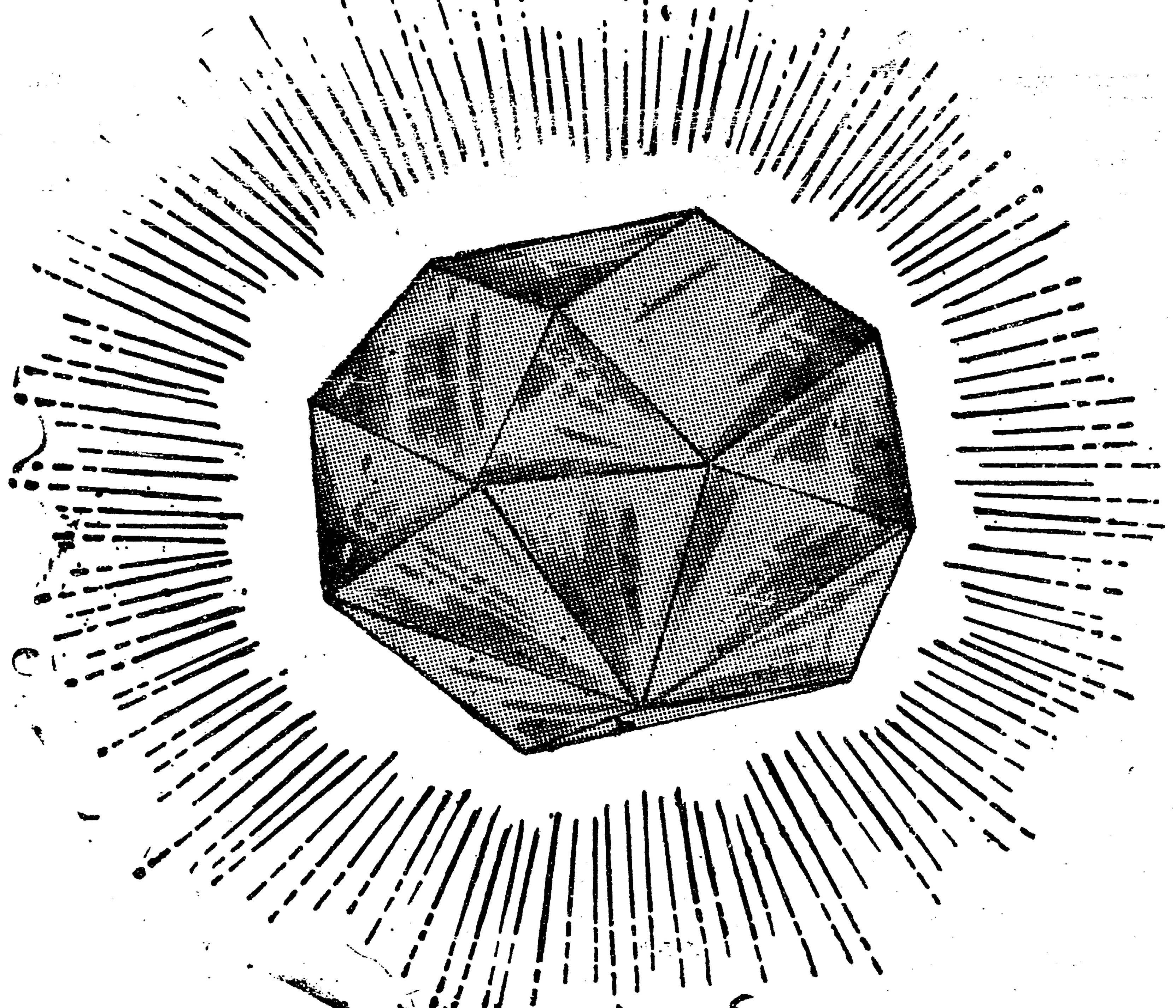

আপনার স্বাস্থ্য কি
অধিক মূল্যবান ?

'লক্ষ্মী ঘি'

স্বাস্থ্য অটুট রাখে
নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করে
বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৬শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ
১৩৫০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷৷ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৮৲ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১৷৷৶০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

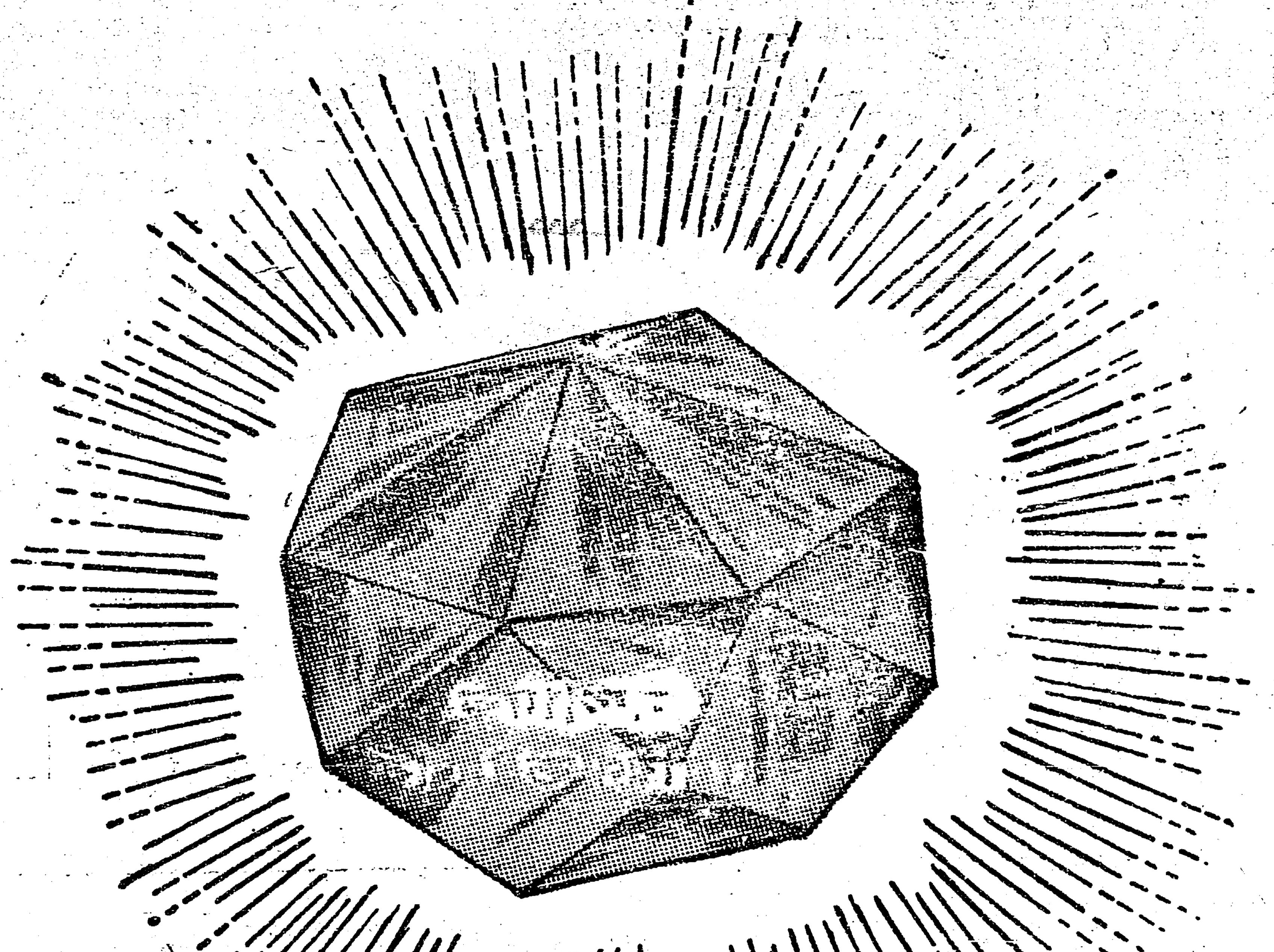

উৎসবের দিনে

ছেলেমেয়েদের চাঁদমুখে হাসি
ফুটাইতে উপহারের
অপূর্ব্ব সমারোহ!

ছবি-ঝলমলে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
আনন্দ-বার্ষিকী

রূপ-রেখা

রূপ-রেখা

সম্পাদক— রেডিওর 'দাদুমণি'
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ছবি, গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গচিত্র, প্রবন্ধ, রস-রচনা, আমোদ-প্রমোদ হাসি ইত্যাদি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার!

তিনশত পৃষ্ঠারও উপরে বিরাট গ্রন্থ! এবার আকারেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃহৎ!

'রূপ-রেখার' সমৃদ্ধি-সম্পাদন করিয়াছেন

ডাঃ অবনীন্দ্র ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বেগম সামসুন নাহার, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সুনির্ম্মল বসু, গোলাম মোস্তাফা, অখিল নিয়োগী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক প্রভৃতি।

কাগজের এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও মূল্য দুই টাকা মাত্র।

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ { ৮ম সংখ্যা

সাধ

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাগো, আমি রাখি তোমায় বলে'
বড় হব যখন বয়স হ'লে
হবই হব আমি রবি ঠাকুর ;
বাঙ্‌লা দেশের আকাশ বাতাস আলো
এদের সবায় বাস্‌ব আমি ভালো,
নয়ক' শুধু গিরিডি কি পাকুড়।
আমার মত তাঁরও ছেলেবেলা
কেটেছে মা, এমনি করে' খেলা,—
তাঁরও পড়ায় বস্‌ত নাক' মন,

আমার মতই আস্‌তো যে তাঁর ছুটি,
মন কর্‌ত কেবল লুটোপুটি—
লাগ্‌ত ভাল শিউলি ফুলের বন।
তিনিও মা, ছিলেন ছোট্ট ছেলে,
আমার মতই দিন গেছে তাঁর খেলে
বাদলা সাঁঝে তোমার কোলে ঘেঁষে.
গল্প বলার আবদারটী ধ'রে
গিয়েছিলেন পক্ষিরাজে চড়ে
নাম-না-জানা তেপান্তরের দেশে।
বর্ষা আসে ঝরঝরানি গানে,
দূরের মাঠে কে ডাকে কে জানে,
ফোটে আবার মেঘের কোণে আলো.
নদীর পারে ঝলমলানো মাঠে
একলা আমার বিজন বেলা কাটে,
বাংলাকে মা, বাসি আমি ভালো।
তাই তো তোমায় চুপি চুপি বলি—
চলো মা, যাই বাংলা দেশে চলি,
শুন্‌ব নাক' বারণ বাবা কাকুর,
অগাধ স্নেহে মন উঠেছে ভ'রে,
নেব মা, আজ সবায় আপন ক'রে—
হ'ব আমি হবই রবি ঠাকুর।

গিরিডি }

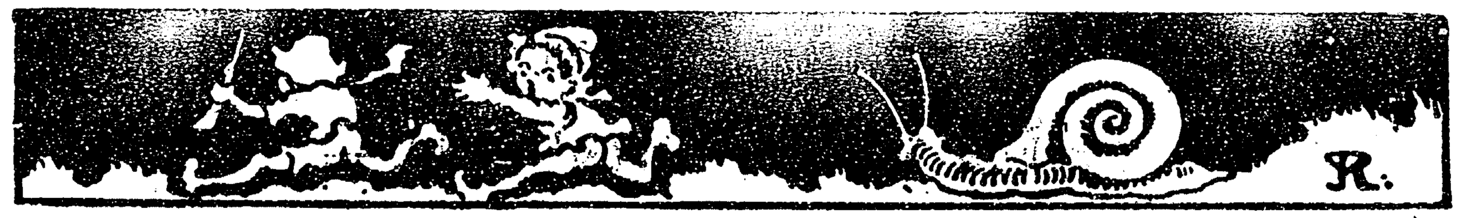

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

আজ তোমাদের বাংলার অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব।

কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বয়সে ছোট ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই, তাঁর বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হ'তেই, ১৯১৩ সালে অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে দ্বিজেন্দ্রলাল সারা বাংলা দেশকে কাঁদিয়ে চলে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৺দেওয়ান কার্ত্তিকচন্দ্র রায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। দেওয়ানজীর সাত পুত্র ও এক কন্যা—৺রাজেন্দ্রলাল, ৺দেবেন্দ্রলাল, ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল, ৺নরেন্দ্রলাল ৺সুরেন্দ্রলাল, ৺হরেন্দ্রলাল, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল। মেয়েটি ছিলেন সব চেয়ে ছোট। তাঁর আদৎ নাম ছিল প্রমীলাসুন্দরী, কিন্তু ৺মালতীমালা নামেই তিনি পরিচিতা। বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভি-নেতা শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এঁরই সন্তান।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দেওয়ান কার্ত্তিকচন্দ্র দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচিত 'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত' ইতিহাস শাখার একখানি অমূল্য গ্রন্থ। তাঁর আত্মজীবন-চরিতও একটী সুন্দর সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া কার্ত্তিকচন্দ্র ছিলেন একজন বিখ্যাত খেয়াল গায়ক। বাংলা গানও তিনি রচনা করতেন। তাঁর কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে বাংলার বিখ্যাত মনীষী ও দেশনেতারা সর্ব্বদাই আস্‌তেন। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাগ্মী ও কংগ্রেসের জনক সুরেন্দ্রনাথ—অনেকেই তাঁর বাড়ীতে অতিথি হয়ে গেছেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৭০ সালে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই একটু অসাধারণ ছেলে ছিলেন। একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির ছিলেন ব'লে পড়ার বই মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলতেন। বাবার কাছে এ কথা জানালে বকুনি খাবেন এই ভয়ে তিনি করতেন কি জান? সবার আগে ইস্কুলে গিয়ে ক্লাসের অন্য ছেলেদের পড়ার বই থেকে পড়া মুখস্থ ক'রে নিতেন। এ সত্ত্বেও তিনি বরাবর ক্লাসে ফার্ষ্ট্ হতেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর গান করবার ক্ষমতাও খুব ছিল। কৃষ্ণনগরে তিনি ও তাঁর দাদা ৺হরেন্দ্রলাল পিতার সঙ্গে গিয়ে অনেক বাড়ীতে গান করতেন। উভয়েরই গলা ভারী মিষ্টি ছিল।

কৃষ্ণনগরে তাঁদের বাড়ী তখন বড়ই সুন্দর ছিল (যদিও আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে)। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, সুন্দর পুকুর; তার মধ্যে অশোক গাছ, মেহগনি গাছ ইত্যাদি ছিল—আমের প্রকাণ্ড বাগান ছিল। সেই বিরাট বাগানের মধ্যে দেওয়ানজী রাজবাড়ী থেকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে চোগার ওপরে মাথায় হ্যাট্ পরে কনিষ্ঠা কন্যা মালতীমালাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

ছেলেবেলা থেকেই ৺দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবকবি ছিলেন। কবির অগ্রজেরা প্রায়ই তাঁকে হয় চাঁদ বা তারা বা আকাশ বা ঐ রকম একটা কিছু দেখিয়ে ব'ল্তেন হয় কবিতা না হয় গান রচনা করে দিতে।

এক সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে—বাগানবাড়ী, পুষ্করিণী সব জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে গিয়েছে—কবির অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল ব'ল্লেন, "দ্বিজু, ঐ চাঁদ দেখে একটা গান রচনা ক'রে গাও তো।" দ্বিজেন্দ্রলাল চাঁদের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গান রচনা করলেন, তার পর নেচে নেচে তা গেয়ে শোনালেন। তখন তাঁর বয়স নয় দশের বেশী হবে না। গানটী এই—

"গগনভূষণ তুমি জনগণমনোহারী!
কোথা যাও হে নিশানাথ, হে নীল নভোবিহারী!
হেসে হেসে ভেসে ভেসে
চলি যাও হে কোন্ দেশে,
হেলে হেলে ঢ'লে ঢ'লে
পড়িছ গগনতলে
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারী!"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন ইস্কুলের সে কালের চতুর্থ শ্রেণীর (অর্থাৎ ম্যাট্রিক থেকে তিন শ্রেণী নীচের) ছাত্র তখন থেকেই সংস্কৃতে বিশেষ মেধাবী ছিলেন—সেই কারণেই অমন সুন্দর সুন্দর শব্দ

ব্যবহার করতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল গান গাইবার পরই দ্বিজেন্দ্রলালকে জোর করে বসিয়ে খাতায় গান লিখিয়ে নিতেন ও রেখে দিতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছেলেবেলা থেকেই খুব জোরাল ভাষায় বক্তৃতা করতে ভাল বাসতেন। প্রায়ই তাঁর দাদা হরেন্দ্রলালকে (মদীয় আরাধ্য পিতৃদেব) সভাপতি ক'রে এবং চাকর বাকরকে শ্রোতা করে তিনি প্রাচীরর উপর চ'ড়ে বক্তৃতা করতেন। হরেন্দ্রলাল নীচে টুলের ওপর বসে হাততালি দিতেন, চাকরেরাও উৎসাহিত হয়ে হাততালি দিত।

এক সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেওয়ানজীর অতিথি ছিলেন। তিনি বাড়ীতে ঢুকতে এই অদ্ভুত দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। তিনি বেশী দূরে না গিয়ে চুপ ক'রে বক্তৃতা শুনলেন। তার পর দেওয়ানজীকে গিয়ে বললেন, "কার্ত্তিক বাবু, আপনার ছোট ছেলে দ্বিজেন্দ্রলাল বেঁচে থাক্‌লে দেশবিখ্যাত লোক হবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে শুনেছি যে তিনি ও তাঁর দাদা হরেন্দ্রলাল উভয়েই অত্যন্ত "ভুলো" ছিলেন—প্রায়ই তাঁরা জুতো হয় মাঠে না হয় বাগানে ফেলে আস্‌তেন। বাবাকে উভয়েই অত্যন্ত ভয় করতেন। অনেক দিন নগ্নপদে কাটানোর পর দুই ভাই হাত ধরে বাবার কাছে গিয়ে ব'লতেন—'ফাদার, উই হ্যাভ্ নো শুজ্।' দেওয়ানজী ইংরাজী কথাবার্ত্তা একটু পছন্দ করতেন। কাজেই আবার নতুন জুতো আসত। ৺রামতনু লাহিড়ীর মাতা দেওয়ানজীর পিসীমা ছিলেন—দ্বিজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল রামতনু লাহিড়ীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন—তাঁদের প্রিয়তম "সেজ জ্যাঠা" ছিলেন রামতনু লাহিড়ী। দুই ভ্রাতাই তন্ময় হয়ে সেক্সপিয়ারের জুলিয়াস্ সিজার পাঠ ও তার অর্থ সেজ জ্যাঠার কাছে শুন্‌তেন।

কবি অল্প বয়স হ'তে ম্যালেরিয়া রোগে বিশেষ ভুগেছিলেন। এতে শরীর এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে বিলাতে যদি চার বছর না থাক্‌তেন, এম্-এ পাশের পর হয়তো তাঁর মৃত্যু হ'ত—এ কথা তিনি আমাদের প্রায়ই ব'ল্তেন।

লেখাপড়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল বেশ ভাল ছিলেন সে কথা আগে বলেছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা থেকে তিনি বৃত্তি পেয়ে এসেছেন। এফ্-এ পরীক্ষাতে সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। বি-এ পরীক্ষাতে ইংরাজী, বটানী ও কেমিষ্ট্রিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন ও ইংরাজীতে এম্-এ পরীক্ষায় মরণাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হয়েও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেয়ে তিনি মাকে দশ টাকা করে দিতেন প্রত্যেক মাসে, এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত

বিশ্বাস করতেন যে এই কার্য্যের জন্য ভগবান্ তাঁর ভালই করবেন। এম্-এ পাশ করবার পর আড়াইশ' টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়ে গভর্ণমেণ্ট দ্বিজেন্দ্রলালকে কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে বিলাতে পাঠান। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতেও এম-আর-এ-এস্, এম্-আর-এ-এস্-ই, এফ্-আর-এ-এস্-পরীক্ষাতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন ও বৃত্তি পান। পরীক্ষার পর যে অবসর পেয়েছিলেন তাতে বিলাতের কলেজে পশুচিকিৎসা সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলাতে তখন প্রথমে পিতাকে হারান। কিছুদিন পরেই মাতারও মৃত্যু হয়। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি প্রায়ই সেখানকার কবরস্থানে গিয়ে পিতামাতার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রতেন।

মাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাস্তেন ও উত্তর কালে যখন তিনি বিখ্যাত নাটক সীতা, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, পরপারে ইত্যাদি লেখেন তখন মায়ের প্রতি ভক্তি প্রত্যেক নাটকে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করেছেন। যখন তিনি আর তাঁর অগ্রজ ৺হরেন্দ্রলাল যথাক্রমে বি-এ ও এম্-এ প'ড়তেন তখনও মার কোলে কে মাথা রেখে শোবেন তাই নিয়ে শিশুর মতন দুই পিঠোপিঠি ভাই ঝগড়া করতেন। তাই কবি তাঁর বিখ্যাত "আমার জন্মভূমি" গানে লিখেছেন—

"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ও মা, তোমার চরণ দুটী
বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম
যেন এই দেশেতে মরি।"

বিলাতে কৃষিকার্য্যের জ্ঞান অর্জ্জন করা শেষ হয়ে গেল—গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিও ফুরিয়ে এলো। এবার তাঁর ব্যারিষ্টারী পড়ার ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু তাঁর ভাইদের নিজেদের এমন অবস্থা ছিল না যে টাকা পাঠাতে পারেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাড়ী ফিরে আস্বেন। চার বছর বিলাতে থাকলেন, অর্থাভাবে ফরাসী দেশ, বেল্জিয়াম্, জার্ম্মানী, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড কিছুই দেখা হবে না—মন তাঁর বড়ই খারাপ হয়ে গেল। ইউরোপ বেড়াতে যাবেন, হাতে একটী পয়সা নেই। বন্ধুদের পরামর্শে বৃত্তি থেকে যে টাকা বাঁচিয়েছিলেন তাই দিয়ে দু'টী ইংরাজী কবিতার পুস্তক প্রকাশ ক'র্লেন—'এরিয়ান্ মেলডিজ্' ও 'লিরিক্স্ অব্ ইণ্ড্'। আর যে টাকা ছিল তা দিয়ে ইংরাজী গান ভাল ক'রে শিক্ষা কর্লেন। বিলাতে অবস্থান

কালে আর একটা খরচ তাঁর ছিল—সেটা হচ্ছে স্যর হেনরি আর্ভিংএর অভিনয় দেখা, সেক্সপিয়ার ও অন্যান্য নাট্যকারের নাটকের অভিনয় দেখা। যাই হোক, পুস্তক প্রকাশিত হ'ল। ইংরাজ জাতি কবিতার আদর করেছিল—বিখ্যাত কবি এডউইন্ আর্নল্ড্ উচ্ছসিত প্রশংসা ক'রলেন, স্কট্সম্যান্, লণ্ডন টাইম্স্এ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বেরোলো। বই সব বিক্রী হয়ে গেল, কিন্তু তাতে এমন টাকা হ'ল না যাতে ইউরোপ বেড়ান হয়। তাঁর অগ্রজ হরেন্দ্রলালের সেই সময়ে বিবাহ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ভ্রাতৃবধূর জন্য কি উপহার নিয়ে যাবেন তাও ভাব্ছিলেন।

একদিন লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে বিষণ্ণচিত্তে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ লণ্ডন মিউজিক্ হলে গানের প্রতিযোগিতা হবে এই বিজ্ঞাপন দেখ্লেন। যে প্রথম হবে সে পুরস্কার পাবে আড়াইশ' পাউণ্ড। ইংরাজী গান তিনি খুব ভাল গাইতেন। তাঁর মনে হ'ল একবার যে প্রতিযোগিতায় নাম দিলে কেমন হয়! আবার চিন্তা ক'র্লেন, যে ইংরাজদের মধ্যে কত ভাল গাইয়ে আছে—তাদের মধ্যে যোগ্যতায় তাঁর কী স্থান? তবু সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় নাম দিলেন। (এ গল্প দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে আমাকে ব'লেছিলেন।) তিনি বাঙ্গালী—ভারতবাসী বলেই হয়তো তাঁর নাম তাচ্ছিল্য ক'রে দেওয়া হ'ল সর্ব্বশেষে। গায়কের পর গায়ক গেয়ে যাচ্ছে—ঘন ঘন করতালি। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বশেষে উঠ্লেন। তিনি প্রথম গান গাইতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হল। পরীক্ষক আর একটী গান গাইতে ব'ল্লেন.—সকলে অধিকতর বিস্মিত হ'লেন।

সেদিনকার সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় তিনিই প্রথম স্থান অধিকার ক'র্লেন। আড়াইশ' পাউণ্ড পেয়ে লণ্ডন থেকে একটী সুন্দর ছোট সোনার ঘড়ি ভ্রাতৃবধূর জন্য কিনে দ্বিজেন্দ্রলাল ইউরোপ পরিভ্রমণে অগ্রসর হ'লেন।

বারান্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আরও বলবার ইচ্ছে রইল।

নীলমণির ভুল

কুঞ্জনাথ

কলকাতা পুলিশের নাম-জাদা গোয়েন্দা গোলোক চাটুয্যে সেদিন সন্ধ্যা-রাত্রে রাজসাহী ষ্টেশনে একখানা থার্ড্-ক্লাস কামরা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে লাগলেন। শীতকাল; এরই মধ্যে কুয়াসা পড়তে সুরু হয়েছে। আপাদ-মস্তক র‍্যাপার-মুড়ি দিয়ে কন্কনে শীতে হি-হি

ক'রে কাঁপতে কাঁপতে খুব অল্প লোকই কুয়াসাচ্ছন্ন প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর মাল-পত্র সমেত নেমে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে গোলোক চাটুয্যে নিরুপায় ভাবে মাথা চুলকাতে লাগলেন। কলকাতা থেকে তিনি ধাওয়া ক'রে আসছেন বিখ্যাত তস্কর শশী হাজরার পেছনে। সংবাদ পেয়েছিলেন, শশী রাজসাহীতে নামবে, তাই রাজসাহীতেই তাকে গ্রেপ্তার করবার আয়োজন ক'রে শশীর সঙ্গে এক গাড়ীতেই তিনি রাজসাহীতে এসে নেমেছেন। নেমে কিন্তু ভয়ানক মুস্কিলে পড়ে গেছেন। শিয়ালদহে শশীকে তিনি গাড়ীতে উঠতে দেখেছেন। শুধু তাই নয়, এর আগের ষ্টেশনেও তাকে তার কামরায় বসে দীর্ঘাকার একজন ক্রু-ম্যানের সঙ্গে নিশ্চিন্ত ভাবে গল্প করতে দেখা গেছে। রাস্তায় কোথাও সে নেমেও যায় নি। অথচ রাজসাহীতে যে কয়জন লোক নামল তার মধ্যে শশী নেই বা শশী ব'লে কাকেও সন্দেহ করা চলে না। শশী অবশ্য ছদ্মরূপ ধরতে ওস্তাদ শিল্পী; কিন্তু ছদ্মরূপ দিয়ে আর যাই হোক, দেহের অসাধারণ দৈর্ঘ্যকে ঢেকে রাখবার উপায় নেই; সুতরাং গোলোক চাটুয্যে ভেবেছিলেন, এই শারীরিক দৈর্ঘ্যটাই শশীর আত্মগোপনের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দেবে। কিন্তু এ কি ব্যাপার! যারা নামল তাদের প্রায় সকলকেই বেঁটে বলতে হয়, সাধারণ দীর্ঘ দেহও তাদের নয়। তাদের দিকে তাই নিরুপায় ভাবে চেয়ে চেয়ে গোলোক চাটুয্যে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

সুবোধ চাকী রাজসাহী সদর থানার সাব্‌-ইন্‌স্পেক্টর। আমি তার বন্ধু। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের আমি পোকা বললেই হয়। উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে কোন উপায়ে সত্যিকার চুরি-ডাকাতি খুন-জখমের রহস্য-লহরীতে দোল খাবার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলেও সে সুযোগ আমি সহজে ছাড়ি নে। এবারও যখন সুবোধের মুখে শশী হাজরার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থার কথা শুনতে পেলাম, আমি সুবোধের সঙ্গ ছাড়লাম না। বলতে কি, আমিই সন্ধ্যার সময় সুবোধকে তার দলবল সমেত থানা থেকে ডেকে নিয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে ষ্টেশনে এনে হাজির করাই। ব্যাপারটা তো আর সহজ নয়! শশী হাজরাকে গ্রেপ্তার করা মুখের কথা খসালেই হয় না, প্রখর বুদ্ধি চাই। অদ্ভুত লোক এই শশী হাজরা। নর-হত্যা তো অনেক বড় কথা, জীবনে কোন দিন কারো গায়ে নখের আঁচড়টি পর্য্যন্ত দেয় নি; অথচ বড় বড় ব্যাঙ্কের সিন্দুক থেকে নোটের তাড়া চুরি করেছে, বড় বড় ঘরের মেয়েদের গলা থেকে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হীরার নেক্‌লেস খুলে নিয়েছে, প্রকাশ্য দিনের বেলায় জুয়েলারী দোকানে সশস্ত্র প্রহরীর চোখের ওপর থেকে সোনার গয়না-ভরা শো-কেস্‌ সরিয়ে ফেলেছে,—এমনি আরো কত! অসাধারণ বুদ্ধি রাখে এই লোকটা। একে ধরবার জন্য কলকাতা থেকে তাই স্বয়ং গোলোক চাটুয্যেকে আসতে হয়েছে। এমন ব্যাপার চোখে দেখবার সুযোগ কি আমি ছাড়ি?

সুযোগ কিন্তু এলই না। মাত্র পাঁচ-ছ' জন লোক কুয়াসার ভেতর দিয়ে তাদের মাল-পত্র

সমেত ষ্টেশনের বাইরে চ'লে গেল; গোলোক চাটুয্যে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত তাদের দেখে নিলেন। নাঃ, এদের কেউ শশী হ'তে পারে না। তিন জন তাঁর নিজের কামরারই যাত্রী। তাদের দু'জন নেপালী, তারা রাজসাহীর একজন বড় জমিদারের বাড়ীর দ্বারোয়ান,—বাবুর সঙ্গেই কলকাতা থেকে আসছে, আর এক জন হয়ত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী,—নাম ফণী রায়। নামের সঙ্গে পোষাকের কোন সম্পর্কই নেই। নামটা গৃহস্থের, কিন্তু পোষাকটা সন্ন্যাসীর। কিন্তু সে যাই হোক, এমন বেকুব আর হয় না। লোকটা বাঙ্গালী কিন্তু এমন বেঁটে যে সচ্ছন্দে ওই নেপালী দু'জনের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছে, মাথা ভরা টাক, সমস্ত মুখখানাতে নির্বুদ্ধিতার একটা স্পষ্ট ছাপ আঁকা। সারাটা পথ লোকটা বাদামী কাগজে মোড়ানো ছোট-বড় গোটা কতক প্যাকেট আর এক বেঁটে ছাতা নিয়ে বিব্রত হ'য়ে আসছে। কখন যে কোন্‌টা সামলাবে এ আর ঠিক পায় না। এক হাত থেকে যদি বা পড়ল একটা প্যাকেট, সেটা তুলতে গিয়ে বগল থেকে পড়ল ছাতা। ছাতা সামলাতে সামলাতে ঢিলে আলখাল্লার বুক পকেট থেকে পড়ল আবার গোটা দুই প্যাকেট। এর ওপর রয়েছে তার লম্বা-চওড়া গল্প। কামরার প্রত্যেক লোককে ডেকে বলেছে, 'যেমন-তেমন কাজে রাজসাহী যাচ্ছে না। রাজসাহীর ডাক্তার জলধর দত্তর মেয়ের বিয়ে। এলাহাবাদে থাকতে ডাক্তার দত্ত একবার লক্ষপতি ব্যবসায়ী কিষণরামের একমাত্র সন্তানকে শক্ত অসুখ থেকে সারিয়ে তোলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ডাক্তার দত্তের মেয়ের বিয়েতে কিষণরাম এ মেয়েকে এক যোড়া কানের দুল উপহার দিচ্ছেন। দুল যোড়া একেবারে খাঁটি প্ল্যাটিনামের। কেবল তাই নয়, দু'খানা দুলে রয়েছে বড় বড় দু'খানা নীলকান্ত মণি। তার মারফতেই কিষণরাম দুল পাঠিয়েছেন। অন্যান্য প্যাকেটের সঙ্গে দুলের প্যাকেটটাও সে নিয়ে চলেছে, তাই তার ভারি ভাবনা পাছে কোন রকমে সেটা খোয়া যায়।'—এমনি তো বুদ্ধিমান্‌ লোক ফণী রায়! বাকি আর তিন জন যাত্রীর মধ্যে দু'জন বাঙ্গালী মুসলমান—এই সহরেরই দোকানদার, একজন অল্প বয়সের এক কলেজের ছাত্র।

ছ' জন লোক তাদের মাল-পত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ম্মব্যস্ত ষ্টেশন মাষ্টারের হয়ে দীর্ঘদেহ ক্রু-ম্যান্‌টা তাদের টিকিট নিলে। গোলোক চাটুয্যে বুঝলেন, শিকার হাত-ছাড়া হয়েছে; তখন ক্রু-ম্যান্‌কে ডেকে বললেন, 'হরিয়ান ষ্টেশন থেকে আপনি কি বরাবর ওই কামরাতেই ছিলেন?'

ক্রু-ম্যান্‌ বাঙ্গালী; এক হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে আর এক হাতে টিকিটের গোছা ধ'রে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে মোটা এক বর্ম্মা চুরুট টানছিল। গোলোক চাটুয্যের দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলে চুরুটটাকে দাঁতে চেপে ধ'রে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, 'তাই তো মনে হয়।'

গোলোক চাটুয্যে কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে লম্বা লোকটা আপনার সঙ্গে হরিয়ানে গল্প করছিল সে কোথায় নাম্‌ল বলতে পারেন ?'

শীতের রাত। টীকিট কিংবা মালের জন্যে যাত্রীদের কাছ থেকে ছ'পয়সা হাতিয়ে সোরাবজীর দোকানে ঢুকতে না পেয়ে একেতেই ক্রু-ম্যানের মেজাজ চ'ড়ে উঠেছিল, তার ওপর এই বেখাপ্পা প্রশ্ন। দস্তুর মত খিঁচিয়ে উঠে সে বললে, 'জাহান্নামে।'

গোলোক চাটুয্যে পকেট থেকে তাঁর নামের কার্ড বের ক'রে ক্রু-ম্যানের নাকের ওপর ধ'রে বললেন, 'এই আমার পরিচয়।'

কার্ডের ওপর নাম এবং পরিচয় দেখবা মাত্র বেচারা ক্রু-ম্যানের চক্ষুস্থির। মুখ থেকে জ্বলন্ত চুরুটটা ঝুপ ক'রে খসে পড়ল, দুই চোখ কপালে তুলে হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, 'মাই ঘড্, দ্য রিনাউণ্ড্ ডিটেক্‌টিভ্!'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'হ্যাঁ; এইবার বলুন, কোথায় সে নাম্‌ল ?'

ক্রু-ম্যান্ বিস্মিত হয়ে বললে, 'কে ? সেই বেটা দাঁতের মাজনের ক্যানভাসার ?'

গোলোক চাটুয্যে বললে, 'হ্যাঁ; ক্যানভাসার সেজেই সে আসছিল; কিন্তু কোথায় নাম্‌ল ?'

ক্রু-ম্যান্ বললে, 'ষ্ট্রেঞ্জ! আমার সঙ্গে সঙ্গেই তো সে নেমেছে এখানে। এরই মধ্যে আপনার চোখ এড়িয়ে গেল! ষ্ট্রেঞ্জ,—ভেরী ষ্ট্রেঞ্জ!'

গোলোক চাটুয্যে বুঝলেন, শশী হাজরা এবারেও তাঁকে ফাঁকি দিয়েছে।

ক্রু-ম্যান্ নিমেষে চঞ্চল হয়ে উঠে বললে, 'আমিও তাকে খুঁজে দেখতে পারি। আমার এখন অফ্ ডিউটি।' গোলোক চাটুয্যে কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখালেন না; বললেন, 'এখন আর হয় না। আপনি তাকে চেনেন না।' হুইস্‌ল্ দিয়ে ট্রেন ছেড়ে গেল।

সুবোধের দিকে ফিরে গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'তোমরা এখন যেতে পার। মনে রেখো সহরের যে কোন পথে যে কোন সময় আমার সাহায্যের দরকার হ'তে পারে। ভাল কথা, একজন সাধারণ ভদ্রলোকের দরকার যিনি এই সহরের পথ-ঘাট সব কিছু জানেন। দিতে পার সঙ্গে ?'

সুবোধ আমার মুখের দিকে চাইল। বললাম, 'এ কি আর বলতে হয় ?'

ষ্টেশন থেকে সহর প্রায় দু'-মাইল দূরে। ভেবেছিলাম তৎক্ষণাৎ একখানা ট্যাক্সি ক'রে গোলোক চাটুয্যে হয়ত সকলের আগে সহরে ঢোকবার মুখে এসে পথ আগলে দাঁড়াবেন। কিন্তু তা না ক'রে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে সুরু করলেন। অনেকটা হেঁটে আসবার পর বললাম, 'একখানা গাড়ী ভাড়া করলে হ'ত না ?'

গোলোক চাটুয্যে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন, হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে, নয় ?' বললাম, 'তা নয়; অনেক কম সময়ে তা হ'লে যাওয়া যেত।'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'তা হ'ত কিন্তু শশীর সঙ্গে দেখা হবার কোন সম্ভাবনা থাকত না।'

অবাক্ হ'য়ে বললাম, 'তার মানে ?'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'শশীও টম্‌টম্ ভাড়া করে নি; হেঁটেই রওনা হয়েছে।'

বলালাম, 'কি ক'রে বুঝলেন ?'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'সুবোধের ব্যবস্থা মত সহরে যাবার পথে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার-ভর্ত্তি গাড়ীগুলোর ওপরেও পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। এ কথা অনুমান করা তার পক্ষে শক্ত নয়। সে যে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নয়, পুলিশকে এই ভুল বোঝানর জন্যেই সে টম্‌টম্ ভাড়া করবে না।'

অকাট্য যুক্তি; সুতরাং গোলোক চাটুয্যের সঙ্গে হাঁটতেই হ'ল।

ঠিক যেখান থেকে সহরের বৈচিত্র্য সুরু হয়েছে তারপর খানিকটা পথ গিয়ে একটা মোড়ের মাথায় এক চায়ের দোকান,—নাম 'পিয়াস-বাড়ী'। অন্য পাঁচটা চায়ের দোকানের সঙ্গে পিয়াস-বাড়ীর তফাৎ এমন কিছু নেই; থাকলেও সহরের লোকের অভ্যস্ত চোখে তা সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু আগন্তুকের চোখে এর একটা বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। পিয়াস-বাড়ীর বিশেষত্ব তার একটা বিশেষ অবস্থানের জন্য। যে মোড়টা ঘুরলেই সহরের সব চেয়ে জমকালো রাস্তার আলোকোজ্জ্বল সহস্র বৈচিত্র্য হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে চোখের সম্মুখে এসে পড়ে ঠিক সেই মোড়ের ওপরেই পিয়াস-বাড়ী তার প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ডের মোহজাল ফেলে নবাগতকে প্রবল ভাবে টেনে নেবার জন্য অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। এমনি শীতের সন্ধ্যায় সহরে ঢোকবার মুখে ওই সাইন-বোর্ডখানার ওপর চোখ পড়লেই নবাগতকে থামতে হয়; এ সহরের বৈচিত্র্যকে পুরোপুরি উপভোগ করবার জন্য এক পেয়ালা চায়ের গরমে মনটাকে ঠিক মত না তাতিয়ে নিয়ে সহরের দিকে তার পা যেন আর এগোতে চায় না। দোকানের মালিকও তা ভাল করেই জানেন।

পিয়াস-বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে গোলোক চাটুয্যে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা কুঞ্জবাবু, আপনি যদি আমারই মত এ সহরে আজ এই প্রথম আসতেন তা হ'লে ঠিক এমনি সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আপনার কি মনে হ'ত বলতে পারেন ?'

বললাম 'খুব পারি। মনে হ'ত এক পেয়ালা গরম চা।'

গোলোক চাটুয্যে হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। আসুন চা খাওয়া যাক।'

(আগামী বারে সমাপ্য)

পৃথিবীর ইতিহাস

প্রাচীন গ্রীস্

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

আজ তোমরা যে গ্রীস্‌কে জানো সেই গ্রীস্ দু'হাজার বছর পূর্ব্বে এমনটি ছিল না। সে এই যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানদের কাছে হেরে গেছে; কিন্তু এক সময়ে এই গ্রীস্ সামরিক বলে এতই বলশালী ছিল যে সুদূর পারস্য ও আমাদের ভারতবর্ষ আক্রমণ করতেও তাদের বাধে নি। সেই প্রাচীন গ্রীসের কথা শুনলে সত্যই আশ্চর্য্য হতে হয়। তার সভ্যতা, তার দর্শন, তার কলা, তার সাহিত্য, তার ভাস্কর্য্য, তার স্থপতি একদিন ছিল সমস্ত ইউরোপের আদর্শ। ইউরোপীয়রা ঐ গ্রীস্‌কে নিয়ে কতই না গর্ব্ব করেছে! কিন্তু আজ সেই গ্রীস্ ইউরোপের একটি দুর্ব্বল রাষ্ট্র। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় পাঁচ-ছ'শ' বছর পূর্ব্বে গ্রীক্ ইতিহাসের অভ্যুদয় হয়। আর তার চরম উৎকর্ষ হয় এথেনীয় সভ্যতায়। তখনকার গ্রীস্ এখনকার মত কেবল গ্রীস উপদ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—দক্ষিণ ইউরোপের অনেক যায়গা যুড়ে ছিল তার বিশাল রাজ্য। এথেন্‌স্ ছিল ঐ রাজ্যের প্রধান নগর; এখনও এথেন্‌স্ তার পূর্ব্ব গৌরব হারায় নি—আজও সে গ্রীসের রাজধানী। গ্রীসীয় সভ্যতা বলতে এক রকম এথেনীয় সভ্যতাকেই বোঝাত।

প্রথমে গ্রীসীয় বলে কোন জাত ছিল না—তাদের মধ্যে নানা বিভাগ ছিল, যেমন আয়োনিক্, ডরিক্, এওলিয়ান্, এমনি সব। তখন কেউ নিজেকে গ্রীস্‌দেশ-বাসী বলে পরিচয় দিত না—নগরের নামেই তার আপন পরিচয় দিত। যেমন স্পার্টা নগরবাসী, থিবেস্ নগরবাসী, করিন্থ্ নগরবাসী, এথেন্‌স্ নগরবাসী। এই গ্রীসীয়দের প্রথমে নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছিল—যুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব এই সব। উপরে যত শ্রেণীর লোকেদের নাম দেওয়া হ'ল তাদের মধ্যে

প্রধান হচ্ছে স্পার্টাদেশবাসী আর এথেন্‌স্ নগরবাসী। তাদের দু'দলের মধ্যে অনেক দিন সদ্ভাব ছিল না।

এথেন্‌স্‌এর লোকেরা ছিল বড্ড বেশী বিলাসী; কিন্তু তা বলে যে তারা সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল না তা নয়। তারা দর্শন, কাব্য ও শিল্প আলোচনা করত; কিন্তু স্পার্টাবাসীরা এ সব ভালবাসত না। এথেনীয়দের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু জানা যায় না; তবে যত দূর জানা যায় থিসিউস্ ছিলেন এ দেশের প্রথম প্রধান রাজা। তিনি সমস্ত এথেনীয়দের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব ও সদ্ভাব এনে এথেন্‌স্ নগরকে সভ্যতার কেন্দ্র করে গড়ে তোলেন।

এথেনীয়রা ছিল খুব মিশুকে আর বন্ধুবৎসল। তারা অতিথিকে আদর করতে জানত, বিপন্নকে সাহায্য করতে জানত, সেই সঙ্গে দেশের জন্য তুচ্ছ প্রাণও দিতে পারত।

এথেন্‌স্‌এ তখন ছিল গণতন্ত্র, কিন্তু এখনকার মত নয়। ধনীরাই কেবল রাজ্যশাসন-ভার গ্রহণ করত—তাতে লক্ষ লক্ষ দাসদের কোন হাত ছিল না। যারা প্রতিপত্তিশালী তারাই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্র সম্বন্ধে একখানি বিখ্যাত বই লিখে গেছেন—বড় হয়ে তোমরা প'ড়ে দেখ। তাঁর আদর্শ ছিল একটা রামরাজ্য গড়া। তাতে তিনি লিখেছেন রাজ্যে সকলের সমান দাবী থাকবে। কোন একটা শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হবে না।

এথেনীয়রা বড় বড় ঘর বানাতে ভালবাসত—মস্ত বড় বড় থাম, তাতে নানা রকমের মূর্ত্তি, লতাপাতা। প্রাসাদের মত বাড়ী, বাগান, ফোয়ারা, মূর্ত্তি। সহরের মধ্যে তারা তৈরী করেছিল সুন্দর সুন্দর উদ্যান, স্নানাগার, থিয়েটারের ষ্টেজ—রঙ্গভূমি। তাতে তারা অজস্র ব্যয় করত।

এইবার স্পার্টার লোকদের কথা বলি। দক্ষিণ ল্যাকানায়ার অন্তর্গত ল্যাসোডমন ছিল এদের পীঠস্থান। এদের প্রথম ইতিহাসবিখ্যাত রাজা হচ্ছেন লাইকারগুস্। ইনি খৃষ্টজন্মের প্রায় ৮০০ বছর পূর্ব্বে বেঁচে ছিলেন। ইনি ছিলেন একজন মস্ত বড় আইনজ্ঞ—দেশের জন্য অনেক কিছু করে ছিলেন। এথেন্‌সের মত এ দেশের শাসনভারও ধনীদের হাতেই ছিল—এথেন্‌সের চেয়েও কড়াকড়ি ছিল এখানকার নিয়ম কানুন। এখানকার যে সেনেট ছিল, তাতে যারা সভ্য হ'ত, তাদের ৬০ বছরের বুড়ো হওয়া চাই। আরও একটা য়্যাসেম্ব্লি ছিল—তাতে সভ্য হওয়ার বয়স ছিল ৩০ বছর। প্রত্যেক স্পার্টাবাসী ছিল এক একটা সৈন্য—ছেলেবেলা থেকে তাদের ঐ ভাবে তৈরী করা হ'ত। ছেলেবেলা থেকে তাদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ত যেন বড় হয়ে তারা এক-একজন পাথরের মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। ফলে অনেকেই দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা এ সব গুণকে ঘৃণা করতে শিখত।

কোন ছেলে হ'লে তাতে মা-বাপের যত অধিকার তার চেয়ে বেশী ছিল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রই তাকে মানুষ করবার ভার নিত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক স্পার্টাবাসী ছিল রাষ্ট্রের এক একটি যন্ত্র মাত্র—তাদের ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতা ছিল না।

লোকেদের মেরে মেরে তাদের সহগুণ পরীক্ষা করা হ'ত। বেদম মার খেয়েও যে একটুও কাঁদত না বা উঃ আঃ করত না সেই ছিল তাদের মতে প্রকৃত মানুষ। কথিত আছে মার খেয়ে খেয়ে লোকেরা মরে যেত তবুও কোন রকম ব্যথা প্রকাশ করত না, পাছে তাতে তাদের সম্মান যায়, পাছে তারা কাপুরুষ বলে লোকসমাজে পরিচিত হয়। তাই স্পার্টাদেশবাসীরা কলাবিদ্যা বা ভাস্কর্য্যে কোন রকম উন্নতি করতে পারে নি। এক কথায় স্পার্টাবাসীরা যেন অনেকটা পশুর মত থাকত। এমনও হয়েছিল যে পাছে সোনা দেখে তাদের বিলাস ভাব মনে আসে তাই সরকার লোহার টাকার প্রচলন করেন। এরা শাসন-ভয়ে নিজেদের মধ্যে কোন দিন ঝগড়া করত না। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা থেকে তোমরা বেশ বুঝতে পারছ যে তাদের একটা সামরিক জাতের মতন করে গড়ে তোলা হয়েছিল। যুদ্ধে স্পার্টাদেশবাসীরা ছিল অদ্বিতীয়। বড় হয়ে তোমরা যখন দর্শন পড়বে তখন দেখবে যে প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে ছিলেন স্পার্টা-শিক্ষার মতাবলম্বী—তিনিও দয়া-ক্ষমাদি গুণগুলিকে ঘৃণা করতেন।

আগেই বলেছি গ্রীসীয়দের নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। পারস্য ছিল গ্রীসের শত্রু—নানা কারণ বশতঃ। প্রথম পারসিক আক্রমণ হয় সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৪৯২ সালে। মেরডোনিয়াস ছিলেন পারসিকদের সেনাপতি; তারপর খৃঃ পূঃ ৪৯০এ হয় বিখ্যাত ম্যারাথন যুদ্ধ।

আগে গ্রীসীয়দের সাথে স্পার্টাবাসীদের ঝগড়া ছিল—কিন্তু এই সময়ে গ্রীসীয়রা তাদের সাহায্য প্রার্থনা করল, তারাও সম্মত হ'ল। বিখ্যাত যুদ্ধভূমি ম্যারাথনে পারসিক আর গ্রীসীয়দের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল, তাতে গ্রীসীয়রাই জয়লাভ করল। গ্রীসীয়দের সেনাপতি ছিলেন মিলটাইভেজ। এই জয়ের খবর নিয়ে একটি লোক এথেন্‌সে দৌড়ে যায় ম্যারাথন থেকে—সেই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য আজও চলে আসছে ম্যারাথন দৌড়। তারপর কৃজেরেজ (জ্যারাক্‌সেস্) হলেন পারস্যের রাজা। তিনি খৃঃ পূঃ ৪৮০তে অনেক সৈন্য নিয়ে আবার এসে পৌছলেন গ্রীসে। সেবারকার যুদ্ধ-ক্ষেত্র হ'ল থারমোপলীতে। এ যায়গাটা একটা গিরিসঙ্কট। এই বারে স্পার্টা-সেনাপতি লিওনিডাস্ গ্রীসীয়দের খুব সাহায্য করেছিলেন। তিনি পারসিকদের দু'দিন অবরোধ করে থাকেন। তার পর পারসিকরা গ্রীসীয়দের ব্যূহ ভেঙ্গে প্রবেশ করল এথেন্‌সে। এথেন্‌স্ থেকে সকলে পালিয়ে গেল—এথেন্‌স্ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কিন্তু গ্রীসীয়রা কৌশল করে পারসিকদের

সমুদ্রে হারিয়ে দেয়—এতে পারসিকরা ভয় পেয়ে সরে পড়ল; তারপর গ্রীসীয়রা প্ল্যাটে যুদ্ধে সমূলে পারসিকদের পরাভূত করল। এর পর পারসিকরা আর কখনও আসে নি।

শুধু যে পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল তা' নয়, স্পার্টাদেশবাসীদের সাথেও এথেনীয়দের যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তারপর সন্ধি হয়ে যায় অবশ্য। এই সব যুদ্ধে কখনও এথেনীয়রা প্রতিপত্তি লাভ করত, কখনও বা স্পার্টাদেশবাসীরা। আবার থিবেসের বা ম্যাসিডনের লোকেরাও কম ছিল না। বিখ্যাত ম্যাসিডনাধিপতি আলেক্‌জাণ্ডারের নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই।

এই সব যুদ্ধ বিগ্রহের পর এল গ্রীসে বিশাল শান্তিপর্ব্ব। এই সময় গ্রীসের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল—তার কথা তোমাদের পরে বল্‌ব। হ্যাঁ, ঐ পুড়ে-যাওয়া এথেন্‌স আবার নতুন করে গঠন করলেন বিখ্যাত রাজর্ষি পেরিক্লীজ। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি বিদ্বান্ আবার তেমনি রাজনীতিজ্ঞ। এক রকম বলতে গেলে যুদ্ধের পরে যে নতুন গ্রীস দেশ তৈরী হয়েছিল তা' পেরিক্লীজের জন্যই।

(প্রবন্ধ)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্. এস্-সি

রাক্ষুসে পিঁপড়ে

জীবজগতে মানুষের পরেই নাকি বুদ্ধিতে পিঁপড়েদের আসন, অন্ততঃ কোন কোন পণ্ডিত এমনি বলে থাকেন। তোমাদের অনেকে হয়তো সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'পিঁপড়ে-পুরাণ' পড়ে থাকবে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরে পৃথিবীর দখল নিয়ে অতি-বুদ্ধিমান্ পিঁপড়েদের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধের গল্প তা'তে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সে তো গেল কল্পনা, আজকালকার যুগেও যে কোন কোন পিঁপড়ের হাতে মানুষকে নাকাল হ'তে হয় তার খবর রাখ কি? অবশ্য বুদ্ধির পাল্লায় নয়, অন্য ভাবে।

আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এক রকম দুরন্ত পিঁপড়ে বাস করে। ইংরাজীতে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ড্রাইভার য়্যাণ্ট্'। এই পিঁপড়েরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দল বেঁধে বাস করে—এক এক দলে যতগুলি থাকে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। পঙ্গপালের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ? সেই যে ফড়িংএর মত প্রাণী,—এক সঙ্গে কোটি কোটি একত্র হয়ে ঝাঁক বেঁধে যখন উড়ে চলে তখন তাদের সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারে না। বড় বড় জঙ্গল, মাঠ, শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে মরুভূমির মত ছারখার হয়ে যায়! তাদের পাখার আড়ালে স্বয়ং সূর্য্যদেবও একেবারে ঢাকা পড়ে যান! এমনি ধারা অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড! ড্রাইভার য়্যাণ্টের কাণ্ডকারখানাও অনেকটা ঐ ধরণের। এরাও এক সঙ্গে দল বেঁধে—এক এক দলে কোটি কোটি পিঁপড়ে একত্র হয়ে চলতে সুরু করে। মানুষ তো ছার, সিংহ, বুনো হাতী, গণ্ডার, হিপ্পোপটেমাস্—এই সব ভীষণ প্রাণীরাও তাদের সামনে দাঁড়াতে সাহস পায় না। কারণ এদের দ্বারা একবার আক্রান্ত হ'লে গায়ের জোর কোনও কাজে আসে না তো! আর এদের কামড়ের জ্বালাও বড় কম নয়। বড় বড় শিকারীরা, যাঁরা এই জাতের পিঁপড়ের উৎপাত স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁরা তার যে ভয়াবহ বিবরণ দিয়ে গেছেন তা শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একবার এক ইংরেজ শিকারী এই রকম এক জায়গায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। চলতে চলতে হঠাৎ সাহেবের নজর পড়ল দু'টো পাহাড়ের ফাঁকে এক জায়গা থেকে সুরু করে চার পাশে ছোট বড় অসংখ্য জন্তুর কঙ্কাল ছড়ান রয়েছে। এমনি এক-আধটুকু রাস্তা নয়—মাইলের পর মাইল কত যে জন্তু মরে পড়ে আছে তা আর গুণে শেষ করা যায় না। স্থানীয় লোকদের কাছে খবর নিয়ে শুনলেন কয়েক দিন আগে সেখান দিয়ে একদল ড্রাইভার য়্যাণ্ট্ চলে গেছে এবং সেই ক্ষুদে প্রাণীরাই চারদিক্ এমনি ভাবে উজাড় ক'রে দিয়ে গেছে।

এই ভীষণ প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। মানুষদেরও এরা ছেড়ে কথা কয় না। অনেক সময় দল বেঁধে কাফ্রীদের গ্রামের মধ্যেও ঢুকে পড়ে। তখন গ্রামবাসীদের ঘরদোরের মায়া ত্যাগ ক'রে গ্রাম ছেড়ে পালান ছাড়া আর গতি নেই। জলে নেমেও যে এদের হাত থেকে রক্ষা পাবে সে আশা নেই। এই ভীষণ পিঁপড়ে জড়াজড়ি করে নির্ব্বিবাদে জলের মধ্যেও নামতে কসুর করে না—তারপর অবলীলাক্রমে সাঁতার কাঁটতে সুরু করে। এমনি ভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পিঁপড়ে দেখতে দেখতে বড় বড় নদী, বিল বা জলা পার হয়ে যায়।

সভ্য মানুষেরা (যাঁরা সে দেশে গেছেন) এদের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় বার করেছেন। কেরোসিন তেলের কাছে এরা কাবু। কেরোসিনের গন্ধ তো সহ্য করতে পারেই না—কেরোসিন ছড়িয়ে এদের নিপাত করাও যায়। যে সব জায়গায় এদের উপদ্রবের ভয় আছে সেখানে

ভ্রমণকারীরা রাত্রে ঘুমুবার সময় খাটের বা মাচার পায়ার নীচে কেরোসিন-ভরা বাটী বসিয়ে রাখলে তবেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারে। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে ড্রাইভার য়্যাণ্ট্ ঘুমন্ত মানুষকে আক্রমণ করেছে এমন ঘটনাও শোনা গেছে।

আর একটি প্রাণীর কাছে এই পিঁপড়েরা জব্দ। সে হচ্ছে ঐ অঞ্চলেরই এক জাতের মাছি। ড্রাইভার য়্যাণ্টের ডিম হচ্ছে ঐ মাছিদের প্রিয় খাদ্য। যখন দলবদ্ধ ড্রাইভার য়্যাণ্টের প্রতাপে স্বয়ং পশুরাজ বা বুনো হাতীর দলও পালিয়ে পথ পায় না তখন এই মাছিরা দল বেঁধে এসে নির্ব্বিবাদে ওপর থেকে চিলের মত ছোঁ দিয়ে দিয়ে এদের ডিম নিয়ে পালায়।

র‍্যাফেলের ছবি

ইটালির বিখ্যাত চিত্রশিল্পী র‍্যাফেলের নাম তোমরা সবাই জান। অনেকের মতে আজ পর্য্যন্ত অত বড় শিল্পী আর পৃথিবীতে জন্মান নি। তাঁর আঁকা মায়ের ছবি—"ম্যাডোনা" পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

র‍্যাফেল জন্মেছিলেন আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ' বছর আগে—১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর বাবাও চিত্রকর ছিলেন, কিন্তু বাপের কাছে র‍্যাফেল বিশেষ কিছু শিখে উঠতে পারেন নি—অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হ'ন।

যাক্, র‍্যাফেলের জীবন-চরিত আজ আলোচনা করব না, তাঁর ছবি সম্বন্ধে একটি গল্প শোনাব। একবার। র‍্যাফেল এসেছেন কি কাজে ফ্লোরেন্স নগরে। তিনি লোকটি ছিলেন ভারী সাদাসিধে, কিন্তু কি ক'রে রটে গেল তিনি নাকি নেহাৎ সুবিধের লোক ন'ন, তলে তলে ওখানকার অধিবাসীদের ঘোরতর শত্রুতা করার মতলব নিয়েই তিনি ফ্লোরেন্স এসেছেন।

নগরের লোকেরা শুনে তো রেগেই আগুন,—ষড়্যন্ত্রকারীকে শাস্তি তারা দেবেই। র‍্যাফেলকে হত্যা করবে ঠিক ক'রে দল বেঁধে তারা তাঁর বাড়ী চড়াও হ'ল।

র‍্যাফেল তখন ব'সে ব'সে ছবি আঁকছিলেন—তাঁর বিখ্যাত মাতৃমূর্ত্তি ম্যাডোনার ছবি। ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, র‍্যাফেল তন্ময় হয়ে তাঁর তুলি বুলিয়ে যাচ্ছেন, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর কোন হুঁশ নেই। এতগুলি লোক যে তাঁরই সর্ব্বনাশ করবার জন্য তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছে তা তিনি টেরও পেলেন না।

হত্যাকারীরা ঘরে ঢুকতেই কিন্তু অবাক্ হয়ে গেল। এ কি দৃশ্য তাদের সামনে! মায়ের কোলে যীশু, মায়ের মুখে এ কি অপরূপ মহিমান্বিত স্নেহতৃপ্ত ভাব! এমন মায়ের ছবি যে ফুটিয়ে

আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এক রকম দুরন্ত পিঁপড়ে বাস করে। ইংরাজীতে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ড্রাইভার য়্যাণ্ট্'। এই পিঁপড়েরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দল বেঁধে বাস করে—এক এক দলে কতগুলি থাকে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। পঙ্গপালের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ? সেই যে ফড়িংএর মত প্রাণী,—এক সঙ্গে কোটি কোটি একত্র হয়ে ঝাঁক বেঁধে যখন উড়ে চলে তখন তাদের সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারে না। বড় বড় জঙ্গল, মাঠ, শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে মরুভূমির মত ছারখার হয়ে যায়! তাদের পাখার আড়ালে স্বয়ং সূর্য্যদেবও একেবারে ঢাকা পড়ে যান! এমনি ধারা অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড! ড্রাইভার য়্যাণ্টের কাণ্ডকারখানাও অনেকটা ঐ ধরণের। এরাও এক সঙ্গে দল বেঁধে—এক এক দলে কোটি কোটি পিঁপড়ে একত্র হয়ে চলতে সুরু করে। মানুষ তো ছার, সিংহ, বুনো হাতী, গণ্ডার, হিপ্পোপটেমাস্—এই সব ভীষণ প্রাণীরাও তাদের সামনে দাঁড়াতে সাহস পায় না। কারণ এদের দ্বারা একবার আক্রান্ত হ'লে গায়ের জোর কোনও কাজে আসে না তো! আর এদের কামড়ের জ্বালাও বড় কম নয়। বড় বড় শিকারীরা, যাঁরা এই জাতের পিঁপড়ের উৎপাত স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁরা তার যে ভয়াবহ বিবরণ দিয়ে গেছেন তা শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একবার এক ইংরেজ শিকারী এই রকম এক জায়গায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। চলতে চলতে হঠাৎ সাহেবের নজর পড়ল দু'টো পাহাড়ের ফাঁকে এক জায়গা থেকে সুরু করে চার পাশে ছোট বড় অসংখ্য জন্তুর কঙ্কাল ছড়ান রয়েছে। এমনি এক-আধটুকু রাস্তা নয়—মাইলের পর মাইল কত যে জন্তু মরে পড়ে আছে তা আর গুণে শেষ করা যায় না। স্থানীয় লোকদের কাছে খবর নিয়ে শুনলেন কয়েক দিন আগে সেখান দিয়ে একদল ড্রাইভার য়্যাণ্ট্ চলে গেছে এবং সেই ক্ষুদে প্রাণীরাই চারদিক্ এমনি ভাবে উজাড় ক'রে দিয়ে গেছে।

এই ভীষণ প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। মানুষদেরও এরা ছেড়ে কথা কয় না। অনেক সময় দল বেঁধে কাফ্রীদের গ্রামের মধ্যেও ঢুকে পড়ে। তখন গ্রামবাসীদের ঘরদোরের মায়া ত্যাগ ক'রে গ্রাম ছেড়ে পালান ছাড়া আর গতি নেই। জলে নেমেও যে এদের হাত থেকে রক্ষা পাবে সে আশা নেই। এই ভীষণ পিঁপড়ে জড়াজড়ি করে নির্ব্বিবাদে জলের মধ্যেও নামতে কসুর করে না—তারপর অবলীলাক্রমে সাঁতার কাটতে সুরু করে। এমনি ভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পিঁপড়ে দেখতে দেখতে বড় বড় নদী, বিল বা জলা পার হয়ে যায়।

সভ্য মানুষেরা (যাঁরা সে দেশে গেছেন) এদের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় বার করেছেন। কেরোসিন তেলের কাছে এরা কাবু। কেরোসিনের গন্ধ তো সহ্য করতে পারেই না—কেরোসিন ছড়িয়ে এদের নিপাত করাও যায়। যে সব জায়গায় এদের উপদ্রবের ভয় আছে সেখানে

ভ্রমণকারীরা রাত্রে ঘুমুবার সময় খাটের বা মাচার পায়ার নীচে কেরোসিন-ভরা বাটী বসিয়ে রাখলে তবেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারে। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে ড্রাইভার য়্যাণ্ট্ ঘুমন্ত মানুষকে আক্রমণ করেছে এমন ঘটনাও শোনা গেছে।

আর একটি প্রাণীর কাছে এই পিঁপড়েরা জব্দ। সে হচ্ছে ঐ অঞ্চলেরই এক জাতের মাছি। ড্রাইভার য়্যাণ্টের ডিম হচ্ছে ঐ মাছিদের প্রিয় খাদ্য। যখন দলবদ্ধ ড্রাইভার য়্যাণ্টের প্রতাপে স্বয়ং পশুরাজ বা বুনো হাতীর দলও পালিয়ে পথ পায় না তখন এই মাছিরা দল বেঁধে এসে নির্ব্বিবাদে ওপর থেকে চিলের মত ছোঁ দিয়ে দিয়ে এদের ডিম নিয়ে পালায়।

র‍্যাফেলের ছবি

ইটালির বিখ্যাত চিত্রশিল্পী র‍্যাফেলের নাম তোমরা সবাই জান। অনেকের মতে আজ পর্য্যন্ত অত বড় শিল্পী আর পৃথিবীতে জন্মান নি। তাঁর আঁকা মায়ের ছবি—"ম্যাডোনা" পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

র‍্যাফেল জন্মেছিলেন আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ' বছর আগে—১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর বাবাও চিত্রকর ছিলেন, কিন্তু বাপের কাছে র‍্যাফেল বিশেষ কিছু শিখে উঠতে পারেন নি—অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হ'ন।

যাক্, র‍্যাফেলের জীবন-চরিত আজ আলোচনা করব না, তাঁর ছবি সম্বন্ধে একটি গল্প শোনাব। একবার। র‍্যাফেল এসেছেন কি কাজে ফ্লোরেন্স নগরে। তিনি লোকটি ছিলেন ভারী সাদাসিধে, কিন্তু কি ক'রে রটে গেল তিনি নাকি নেহাৎ সুবিধের লোক ন'ন, তলে তলে ওখানকার অধিবাসীদের ঘোরতর শত্রুতা করার মতলব নিয়েই তিনি ফ্লোরেন্স এসেছেন।

নগরের লোকেরা শুনে তো রেগেই আগুন,—ষড়্‌যন্ত্রকারীকে শাস্তি তারা দেবেই। র‍্যাফেলকে হত্যা করবে ঠিক ক'রে দল বেঁধে তারা তাঁর বাড়ী চড়াও হ'ল।

র‍্যাফেল তখন ব'সে ব'সে ছবি আঁকছিলেন—তাঁর বিখ্যাত মাতৃমূর্ত্তি ম্যাডোনার ছবি। ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, র‍্যাফেল তন্ময় হয়ে তাঁর তুলি বুলিয়ে যাচ্ছেন, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর কোন হুঁশ নেই। এতগুলি লোক যে তাঁরই সর্ব্বনাশ করবার জন্য তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছে তা তিনি টেরও পেলেন না।

হত্যাকারীরা ঘরে ঢুকতেই কিন্তু অবাক্ হয়ে গেল। এ কি দৃশ্য তাদের সামনে! মায়ের কোলে যীশু, মায়ের মুখে এ কি অপরূপ মহিমান্বিত স্নেহতৃপ্ত ভাব! এমন মায়ের ছবি যে ফুটিয়ে

তুলতে পারে সে কি কখনও কোন হীন ষড়্যন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারে? লোকেরা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখ্‌ল, তারপর যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে এল। এমন শিল্পীর তপোভঙ্গ করতে তাদের সাহস হ'ল না।

এত যে কাণ্ড ঘটে গেল র‍্যাফেল কিন্তু তার কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি তখনও তেমনি তন্ময় হয়ে তূলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

কুড়ান পাতা

(সংগ্রহ)

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

১

বিলাতের এক পাড়াগাঁ হইতে এক মেম সাহেব সহরে আসিয়াছেন। মেম সাহেবের ধারণা তিনি খুব আধুনিক—সহরের আদবকায়দা সব তাঁহার জানা আছে। মেম সাহেব হোটেলে উঠিবেন। একটা হোটেলের সামনে গিয়া গেটের কাছের লোকটিকে বলিলেন, 'এখানে ভাল ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে?' লোকটি অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে বলিল ও একটি ছোট খাঁচার মত ঘরে আনিয়া হাজির করিল। মেম সাহেব চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'আমাকে কি গেঁয়ো লোক পেয়েছ যে এই রকম একটা ছোট খাঁচার মত ঘর দেখাতে এনেছ?' লোকটি গম্ভীর মুখে কহিল, 'না না, আপনি গেঁয়ো হবেন কেন, গেঁয়ো যে ন'ন তা তো আপনার কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।'—এই বলিয়া সে একটি কল টিপিল, অমনি সেই ছোট 'খাঁচার মত ঘরটি উপরে উঠিতে লাগিল। উপরে উঠিয়া লোকটি, অর্থাৎ লিফ্‌ট্‌ম্যান্, হাসিয়া মেম সাহেবকে সেই 'খাঁচা' অর্থাৎ লিফ্‌ট্ হইতে বাহির করিয়া ম্যানেজারের ঘর দেখাইয়া দিল।

২

প্রাচীন বৈদ্যগণ কোন একটা বিষয়ে শিষ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ঐ বিষয় লইয়া ২।১টি গল্প রচনা করিতেন। হরীতকী একটি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ এই কথা শিষ্যের মনে গাঁথিয়া দিবার জন্য এই রকম একটি গল্প আছে।

অবোধকুমার কবিরাজ রসসেনের কাছে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিত। অনেক দিন কাটিয়া গেলেও শিষ্য বেশী কিছু শিখিতে পারিল না। তখন সে গুরুকে ধরিল তাহাকে এমন একটা সংক্ষেপ ওষুধের

কথা বলিয়া দিতে হইবে যা সমস্ত রোগেই দেওয়া চলে। গুরু অনেক ভাবিয়া বলিলেন, 'বেশ, তুমি সর্ব্বরোগহর হরীতকী প্রয়োগ করতে শেখ। শাস্ত্রে বলে—কদাচিৎ কুপ্যতি মাতা নোদরস্থা হরীতকী। অর্থাৎ মাও কখন কখন কুপিত হ'তে পারেন কিন্তু হরীতকী উদরস্থ হ'লে কখনও কুপিত হয় না—অর্থাৎ অপকার করে না।' অবোধকুমার গুরুর নিকট হইতে 'বৈদ্যশাস্ত্রসিন্ধু' এই জমকালো উপাধি লইয়া মাথায় এক বিরাট্ পাগড়ী আঁটিয়া বিদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে রওনা হইল।

রাজা জবরদস্ত সিংহের কন্যা ভানুমতীর এক প্রকাণ্ড ওষ্ঠব্রণ হইয়াছে। রাজবাড়ীর বিচক্ষণ ও প্রবীণ বৈদ্যগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন শস্ত্রকর্ম্ম ছাড়া এ রোগ সারিবে না। কিন্তু আদরিণী রাজকন্যা কিছুতেই মুখে অস্ত্র করিতে দিবেন না; তাঁহার ভয়, পাছে অস্ত্রের একটা দাগ থাকিয়া তাঁহার সুন্দর মুখটা বিশ্রী হইয়া যায়। অগত্যা চতুর্দ্দিকে রাজদূত ছুটিল—বিনা শস্ত্রকর্ম্মে ওষ্ঠব্রণ সারাইতে পারে এমন বৈদ্যের সন্ধানে।

প্রকাণ্ড পাগড়ী-পরা বৈদ্যশাস্ত্রসিন্ধু অবোধকুমারকে পাইয়া তাহারা খুসী হইল। যথা সময়ে তাহাকে রাজকন্যার নিকট হাজির করা হইল।

ওষুধ তো অবোধকুমারের জানাই আছে। তখনই তাহার নির্দ্দেশ মত দুইজন বলিষ্ঠ পরিচারক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু'টি শিল-নোড়া লইয়া পাঁচ সের হরীতকী বাঁটিতে বসিয়া গেল। দুইটি প্রকাণ্ড হরীতকী বাঁটার তাল প্রস্তুত হইল। সমস্তই রাজকন্যার চক্ষুর সম্মুখে হইতেছে। ঐ দুই হরীতকীর তাল খাইতে হইবে শুনিয়া রাজকন্যার অত দুঃখের সময়ও হাসি আসিল। এদিকে ফোঁড়াটা এমনিতেই প্রায় ফাটিবার মত হইয়া ছিল, হাসির সময় একটু চাড় পাইয়াই উহা ফাটিয়া গেল। সমবেত লোকে কবিরাজের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। একজন বিজ্ঞ মন্ত্রী কবিরাজ মহাশয়ের প্রচুর প্রশংসা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে কবিরাজ মহাশয় ইচ্ছা করিয়াই রাজকুমারীকে হাসাইবার জন্য এই হাস্যরসপূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবোধকুমারেরও বুদ্ধি গজাইল, সেও মন্ত্রীর কথায় সায় দিল। রাজকুমারীর ফোঁড়া শীঘ্রই সম্পূর্ণ সারিয়া গেল, অবোধকুমার হইল রাজবাড়ীর প্রধান চিকিৎসক।

৩

একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক ফ্রান্স দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একদিন তিনি ট্রেনে করিয়া যাইতেছেন, সেই কামরায় ফরাসী দেশীয় একটি বৃদ্ধ ও একটি যুবকও রহিয়াছেন। ফরাসী জাত খুব আলাপী। যুবকটি বাঙ্গালী অধ্যাপককে কি জিজ্ঞাসা করিলেন। অধ্যাপক ফরাসী ভাষা পড়িয়া বুঝিতে পারিতেন কিন্তু শুনিয়া বুঝিতে পারিতেন না বা কহিতে পারিতেন না। তিনি এক টুকরা

কাগজে ঐ কথা লিখিয়া দিলেন। যুবক তখন আর-এক টুকরা কাগজে প্রশ্ন করে এবং অধ্যাপক লিখিয়া তাহার জবাব দেন। এই ভাবে তাঁহাদের আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। খানিক পরে গাড়ী একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইলে যুবকটি কিছুক্ষণের জন্য নামিয়া গেলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এতক্ষণ উভয়ের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন, এইবার একটুক্‌রা কাগজে কি লিখিয়া অধ্যাপকের সম্মুখে ধরিলেন। অধ্যাপক পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা—"আপনিও কি আমারই মত বোবা এবং কালা?"

ধাঁধা

শ্রীঅ. সে.

বুড়ো জমিদার বিজয়নারায়ণের দুই ছেলে,—অবিনাশ ও অবনী। অবিনাশ বড়, অবনী ছোট। অবিনাশের খেয়াল হ'ল, পূজোর ছুটিতে ভাইকে নিয়ে শিলঙ্‌ বেড়িয়ে আসবে। শুভদিন দেখে যাত্রা করা স্থির হ'ল। যাবার দিন পুরানো চাকর দাদাবাবুদের বিছানা বাক্স বেঁধে ঠিক করে বারান্দায় এনে রাখল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ীর কাছে একখানা ট্যাক্‌সি গাড়ী এসে থামল। চাকর নির্দ্দেশ মত সমস্ত মালপত্র গাড়ীতে বোঝাই করে কিছু বক্‌শিস্‌ পেল। ওরা গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে হুকুম দিল, 'মোটর ষ্টেশ্যনে চল'। মোটর ষ্টেশ্যনে পৌঁছতেই কুলির দল ওদের ঘিরে ধরল। দুটো কুলিকে মাল নামাতে বলে, আর সবাইকে অবিনাশ হাঁকিয়ে দিল। ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হ'ল। মালপত্র সহ কুলি দুটিকে নিয়ে অবনী একখানা গাড়ী অধিকার করে বসল। অবিনাশ এদিকে টিকেট্‌ ঘরে গিয়ে একখানা সিঙ্গ্‌ল ও একখানা রিটার্ণ টিকেট্‌ কেটে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে এসে বসল। গাড়ী ছাড়বার আর পাঁচ মিনিট বাকি। অবিনাশ খবরের কাগজওয়ালাকে ডেকে একখানা ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কিনে সুস্থির হয়ে বসল।

মোটর গাড়ী পাহাড়ী পথে এঁকে বেঁকে চলেছে। ওদের এই প্রথম অভিজ্ঞতা। মুগ্ধ হয়ে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছে। নঙ্‌পো এসে গাড়ী থামল। দু'পেয়ালা চা ও টোষ্টের অর্ডার গেল,—রেস্তোরাঁর একটি ছোক্‌রা এসে দিয়ে গেল। চা-পান করে ওরা চাঙ্গা হয়ে বসল। মোটর গাড়ী আবার চলতে সুরু করল। সন্ধ্যার সময় গাড়ী এসে পৌঁছল শিলঙে। এক হোটেলে গিয়ে ওরা উঠ্‌ল। বিছানাপত্র খুলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে করতে রাত হয়ে গেল। পরদিন ভোরে উঠেই দু' ভাই সহর দেখবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। যাবার সময় ম্যানেজারকে বলে গেল, ওদের ফিরতে কিছু দেরী হতে পারে।

দুপুরের দিকে অবিনাশ হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। চুল আলুথালু, কি রকম ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি! এসেই ম্যানেজারকে বল্‌ল, "আপনাদের কয়েকজন শীগ্‌গির আমার সঙ্গে চলুন; আমার ভাই অবনী হঠাৎ মাথা ঘুরে পাহাড়ের গহ্বরে পড়ে গেছে; তাকে উদ্ধার করতে হবে,—যে ভাবেই হোক্‌।"

তৎক্ষণাৎ হোটেলের কয়েকজন ম্যানেজারের সঙ্গে রওনা হ'ল। অনেক অনুসন্ধানের পর অবনীর মৃতদেহ পাওয়া গেল; কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যাওয়াতে মৃত্যু হয়েছে। বোধ হয় প্রায় দু'শ' ফুট্‌ ওপর থেকে পড়েছে। মৃতদেহটি হোটেলে আনা হ'ল।

পুলিশ শব পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিল—"দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।"

সবাই অবিনাশকে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি জানাল। অবিনাশ বাড়ী ফিরে এল। বুড়ো বাপ ভেঙ্গে পড়লেন। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে এই দুর্ঘটনার কথা বার হ'ল।

একজন লোক গৌহাটি পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এমন প্রমাণ দিল যার ফলে বিস্তৃত তদন্ত হ'ল। অবিনাশকে গ্রেপ্তার করে তাকে ভ্রাতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হ'ল এবং বিচারে তার শাস্তি হ'ল।

লোকটি কে এবং তার কি প্রমাণ ছিল বলতে পার? *

(২০৭ পৃষ্ঠায় উত্তর দেখ)

আশ্বিন মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

১ম পুরস্কার—শ্রীকনককান্তি রায় (কলিকাতা), ২য় পুরস্কার—শ্রীমন্দিরা সেন (নিউ দিল্লী), ৩য় পুরস্কার—কুমারী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)।

শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ সিংহ (কটক), শ্রীমাধুরী দেবী (ঢাকা) ও কুমারী মেহেরউন্নিসা (কলিকাতা) —এঁদের কবিতাও বেশ ভাল হয়েছে।

ভ্রম সংশোধন:—এ সংখ্যার ১৮৬ হইতে ১৯২ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠার শিরোনামায় ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক স্থলে ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ হইবে।

* বিদেশী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত ও রূপান্তরিত।

কণ্ট্রোল

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা

'এত ভোরে ঘুম ছেড়ে গ্রীষ্মের উষাতে,
কোথা যাও ছুটে ছুটে বাসি বেশভূষাতে ?
ছিঁড়ে গেছে জুতো যোড়া, ছিঁড়ে গেছে জামাটা,
হাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে আছো ধামাটা !
ব'লে যাও দুটো কথা, ভালো আছো সকলে ?
রোগা হয়ে যাও নি তো যুদ্ধের ধকলে ?
আরাকানে কি ঘটিছে ? তিউনিস্ ? রাশিয়া ?
শত্রুর কারসাজি যায় বুঝি ফাঁসিয়া !'

শেষ রাতে একটুকু ঝিরঝিরে বাতাসে
যদি বা ঘুমুই তাও ভঙ্গে যায় হুতাশে।
বুঝি বা হ'ল না ঠাঁই কণ্ট্রোল লাইনে
সেই ভয়ে রাতটুকু ঘুমুতেও পাই নে।
হতেছে সহর ভরে নরনারী যজ্ঞ,
প্রভুদের হয়ে যাবে অক্ষয় স্বর্গ !
রোদে পুড়ে, জলে ভিজে দেহ পাকা বংশ—
শীঘ্রই বনে যাব শ্রীপরমহংস।'

'আরে ভাই, আমাদের উদরেই যুদ্ধ,
নিত্য স্মরণ করি রাম, যিশু, বুদ্ধ।
যুদ্ধের বার্ত্তা রাখে কার সাধ্য ?
এক তা' কাগজ কিনে দু' আনার শ্রাদ্ধ।
ভাঁড়ারেতে চাল নেই, উনুনেতে কয়লা,
টাকায় দু' সের দুধ বলে গেছে গয়লা।
ঘুমুবো কি, সারারাত ছট্ফটি গ্রীষ্মে,
যুদ্ধে কি বাতাসও কমে গেল বিশ্বে ?

'দুঃখের দিন দাদা, চলে গেছে অতীতে,
এখন তো খাওয়া পরা সুখে বসে গদীতে।
কি কি চাই তোমাদের ? সোনা, রূপো, মুক্তো ?
কাঁচকলা ? পলতা ? খেতে হবে সুক্তো ?
যাহা চাই সবই পাব, শুধু ভয় পাই নে,
সোজাসুজি গিয়ে দাদা, খাড়া হ'ব লাইনে।
চিঁড়ে, গুড় কণ্ট্রোল, তেল, আটা সরষে
বেশী দামে বেচ্লেই জেল খাটে, চোর সে।

পুঁইডাঁটা, ধনে শাক, তাও জাই, কণ্ট্রোল—
লাইনে দাঁড়াও গিয়ে আর কিছু নাই গোল।
হয় না মেয়ের বিয়ে, জোটে নাক' পাত্র ?
বর পাবে কণ্ট্রোলে খাড়া হবা মাত্র।

আর দাদা, অবসান হবে সব কষ্ট,
রামরাজ্য যে এসে দেখা দিল স্পষ্ট।
শুধু এই কথা ভাবি বসে সারা বেলাটা,
'কণ্ট্রোল' হ'ল নাক' উদরের জ্বালাটা !'

গত ১৩ই কার্ত্তিক বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ৺সুকুমার রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট সাহিত্যরসিকদের উপস্থিতিতে একটী স্মৃতিসভার আয়োজন হয়েছিল। সুকুমার রায়ের হাসির কবিতা-গল্প তোমরা কিছু কিছু পড়েছ, কিন্তু হাসি ছাড়াও আরও কত কিছু যে তিনি লিখতে পারতেন আর সেগুলি যে কত সুন্দর হ'ত তা অনেকেই হয়তো জান না। প্রায় ৩০ বছর আগেকার কথা, আমাদের শিশু-সাহিত্যে তখনও এত সমারোহ দেখা দেয় নি। সে দিনে সন্দেশের মত পত্রিকার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে যেন এক নবযুগের সূচনা করেছিল। আর সুকুমারই ছিলেন তার প্রাণ। তাঁর জন্মদিন—১৩ই কার্ত্তিক নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যে একটী স্মরণীয় দিন।

সম্প্রতি পরিণত বয়সে দেব সাহিত্য কুটীরের প্রতিষ্ঠাতা আশুতোষ দেব মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে। পুস্তক প্রকাশক হিসাবে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সুলভে সৎসাহিত্য এবং বিশেষ ক'রে শিশুসাহিত্য প্রচারের জন্য বাংলা সাহিত্যও তাঁর কাছে অনেকটা ঋণী। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

* * *

যুদ্ধের খবর এখন ক্রমাগতই মিত্রপক্ষের অনুকূলে চলেছে, এবং জার্ম্মান্রা যেন ক্রমেই কাবু হয়ে পড়ছে। রাশিয়া, ইটালি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই মিত্রপক্ষ জয়লাভ করছে। এখন কেউ কেউ আশা করছেন, হয়তো আর মাস ছয়েকের মধ্যেই ইয়োরোপে যুদ্ধ শেষ হ'তে পারে।

২০৫ পৃষ্ঠার ধাঁধার উত্তর

গৌহাটি মোটর ষ্টেশ্যনের কেরাণী, যে অবিনাশের কাছে টিকেট বিক্রী করেছিল। অবিনাশ একখানা সিঙ্গ্ল ও একখানা রিটার্ণ টিকেট কেটেছিল।

চিঠিপত্র

বাংলায় এপষ্ট্রফী (') র প্রয়োগ সম্বন্ধে শ্রীমতী শেফালী দত্ত আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন। 'চিহ্নটিকে বাংলায় লুপ্তি চিহ্ন বলা যেতে পারে। কোন শব্দ থেকে কোন অক্ষর লুপ্ত হ'লে বুঝবার এবং উচ্চারণের সুবিধার জন্য ' চিহ্ন দেওয়ার রীতি আছে। বাংলা ব্যাকরণ ও বানান আগে বহুল পরিমাণে সংস্কৃতের অনুগামী ছিল। এখন বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, বানানেও নানা রকম সংস্কার চলছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ কাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা বানানে এখনও কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। লুপ্তি চিহ্ন সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা চলে। অনেকে এর ব্যবহার একেবারেই অনাবশ্যক মনে করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা ক'রে ওর নামকরণ করেছিলেন 'শোকচিহ্ন'। আবার অনেক লেখকের মতে পাঠকের বুঝবার সুবিধার জন্য এর ব্যবহার মন্দ নয়। যেমন—"সে কাজ করে" এখানে 'করে'র মধ্যে কোনও চিহ্নের প্রয়োজন নেই। কিন্তু "সে কাজ ক'রে (বা করে') বাড়ী যায়" এখানে 'করে'র মানে অন্ত, অর্থাৎ 'করিয়া'—তাই 'চিহ্ন দেওয়া হ'ল। 'য়া' লোপ পাচ্ছে বলে কেউ কেউ চিহ্নটা পদের শেষে দেন, আবার কেউ কেউ কথাটার উচ্চারণ 'কোরে' হচ্ছে দেখে ও-কারের পরিবর্ত্তন বোঝাবার জন্য পদের মধ্যেই ঐ চিহ্ন প্রয়োগ করেন। ঠিক ঐ কারণে উচ্চারণের পরিবর্ত্তন বোঝাবার জন্য পদের শেষেও ঐ চিহ্ন দেবার রীতি আছে। যেমন—বলল'। মোট কথা এক-একজন লেখকের এক এক রকম অভ্যাস, অথচ যুক্তিতর্কের পর কোন্ প্রয়োগটা সঠিক তা এখনও স্থির হয় নি—মতভেদ রয়ে গেছে। কাজেই সবগুলিকেই মেনে নিতে হয়। রামধনুতেও ঠিক এই নিয়মই অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ মুদ্রণের সময় বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিগত অভ্যাসকেই বজায় রাখা হয়। এ ছাড়া ইংরাজীর অনুকরণে ষষ্ঠী বিভক্তিও এই চিহ্ন দিয়ে বোঝাবার চল হয়েছে, আর উদ্ধৃত অংশ বোঝাবার জন্য 'ইন্‌ভার্টেড্ কমা' হিসাবে এর প্রয়োগ তো আছেই।—রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ক—পদক। (২) তাল—করতাল। (৩) কটক।

উত্তরদাতাদের নাম

রঞ্জন রায় চৌধুরী (কলিকাতা); বিমলচন্দ্র দত্ত ও পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক (শ্রীপণ্ড); অমিতাভ সেন (ধুবড়ী); অঞ্জলি,আরতি, অর্চনা, আশীষ দত্ত(শ্রীহট্ট); হরেন্দ্রনাথ পাত্র ও গণপতি চট্টোপাধ্যায়(ধানবাদ); সুনীল চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা); শীলা লাহিড়ী (বালিগঞ্জ); শীলা, অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (বাঁকুড়া); অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাসত); সোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা); অমরেন্দ্রনাথ সরকার(কুড়িগ্রাম); নবেন্দু সেন(বালিগঞ্জ); মোহনলাল আগরওয়ালা ও সুপ্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পাবনা); প্রফুল্লবালা সাধুখাঁ (উত্তরপাড়া)।

নূতন ধাঁধা

সে থাকত জলে। কিন্তু সে জায়গা তার পছন্দ হ'ল না, সে উড়তে সুরু করল আকাশে। কিন্তু তাও শেষ পর্য্যন্ত তার ভাল লাগল না; সেখানে গিয়ে সে চীৎকার সুরু করল, তারপর দলবল নিয়ে হুড়মুড় ক'রে আবার নেমে এল মাটীতে। না মাছ, না পাখী, না মানুষ, তাকে চিনতে পার?

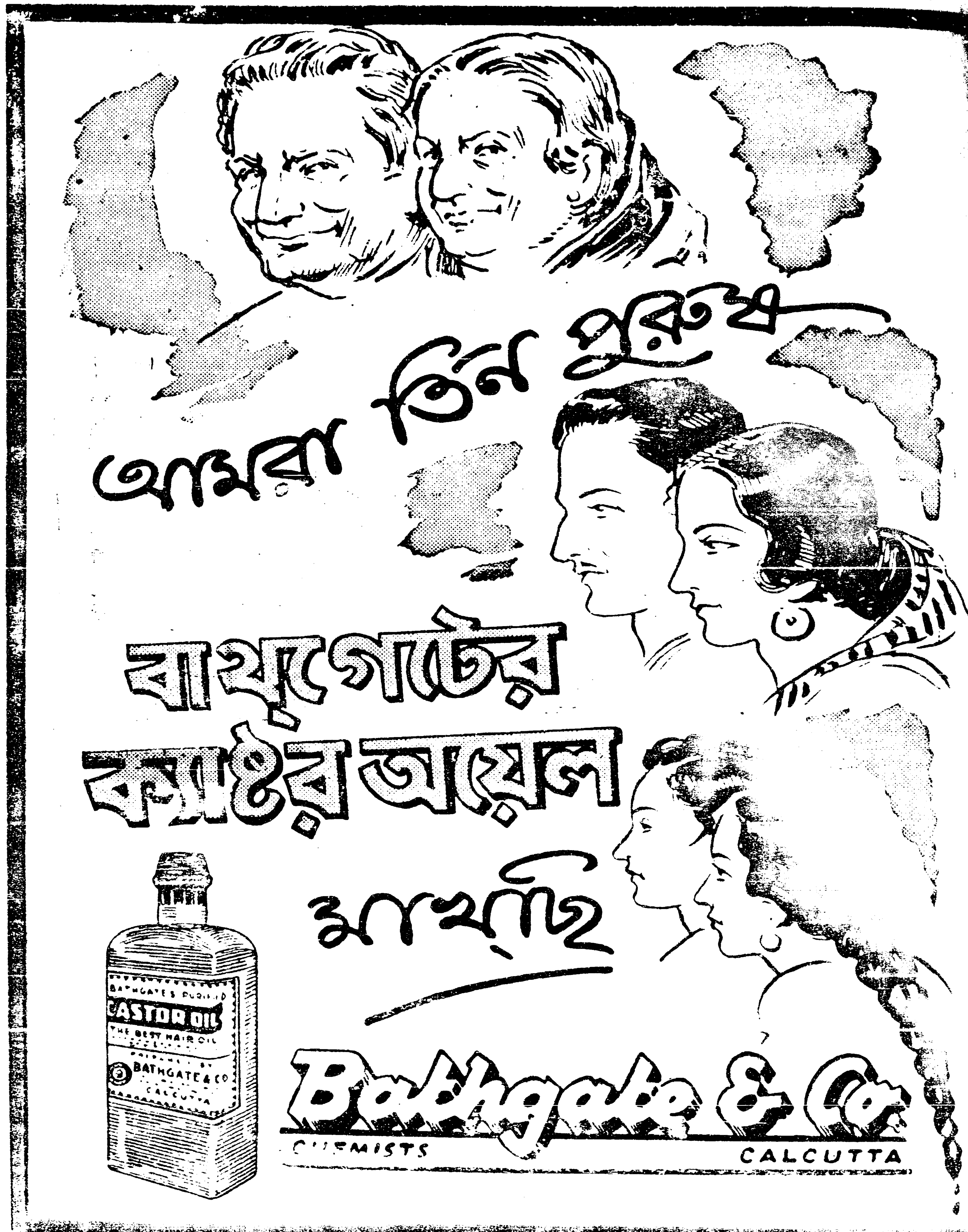

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭ টী ঔষধ / মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা / মূল্য ৮ টাকা

বার্ষিক ৩৲

ষাণ্মাসিক ১৷৷৵০

প্রতি সংখ্যা ।৵০

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

২৪৩ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

স্কুলের বই

রামধনুর পাঠক পাঠিকারা, যারা ইস্কুলে পড়, তারা সকলেই এবার নতুন ক্লাশে উঠলে। তাদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নতুন ক্লাশে তোমাদের যে সব নতুন বই দরকার হবে তা আমাদের দোকানেই পাবে। চিঠি লিখলে ভি, পি,তেও আমরা বই পাঠিয়ে দিতে পারি।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

রামধনু শাখা কার্য্যালয়

১বি, রসা রোড্ কলিকাতা।

শ্যা[illegible]পন

সুগন্ধ

তরল শ্যাম্পু

কেশশ্রীর

পূর্ণ বিকাশে সহায়ক

ব্যবহারে কেশ মসৃণ ও নমনীয় হয় এবং খুস্কি, মরামাস প্রভৃতি কেশরোগ নিবারিত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

বাহির হইয়াছে

—ন তু ন ব ই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূ ম কে তু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

দাম বারো আনা।

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প

মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির"
কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম. এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সরস মজাদার হাসির গল্প ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৵০

কলকাতার হালচাল ... ১৲

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আবিষ্কারের গল্প ... ॥৵০

আকাশের গল্প ... ৸৶০

জন্মদিনের উপহার (গল্প) ॥৶০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ৸০
(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১৲

প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)।

নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
নূতন গ্রন্থে হবে আনন্দ,

ঘরে ঘরে কলতান—

এইমাত্র বাহির হইল

Dev's Concise Dictionary

By A. T. Dev

যাবতীয় প্রয়োজনীয় ইংরেজী শব্দের বাংলা উচ্চারণ, বাংলা ও ইংরেজী প্রতিশব্দ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আকারে Oxford Pocket Dictionaryর মত—পাঠ্য-পুস্তকের মত Handy. ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

বার্ম্মা-প্রবাসী—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বোমার ভয়ে বার্ম্মা ত্যাগ

জাপানী আক্রমণে বিপন্ন হইয়া গ্রন্থকার কেমন করিয়া সপরিবারে হাঁটা পথে বার্ম্মা হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহারই জ্বলন্ত চিত্র। উপন্যাসের চেয়েও মধুর। পড়িতে বসিলে কেহ শেষ না করিয়া উঠিতে পারিবে না। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শীঘ্রই বাহির হইবে

শ্রীসরলা নন্দী ও প্রফুল্ল নলিনী নন্দী প্রণীত

প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

প্রেমাবতার যীশুখৃষ্টের অলৌকিক জীবন-কাহিনী—সরল ভাষায় লিখিত।

মূল্য—৸০ আনা মাত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বলদর্পী হিট্‌লার

বর্ত্তমান জগতের যুগান্তকারী এডল্‌ফ্ হিট্‌লারের স্ব-লিখিত Mein Kampf অবলম্বনে রচিত অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী। অতীতের অতিনগণ্য সৈনিক আজ বিশ্ব-বিপ্লবের প্রধান নেতা। তাঁহারই অত্যুজ্জ্বল জীবন-চিত্র।

মূল্য—১৲ টাকা মাত্র।

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৫০ { ৯ম সংখ্যা

মায়ের মায়া

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাপিয়া গায় একটী গানই, কোকিল কুহুই ডাকে রে,
বিল্বপাতা একই রকম, একই ত' সুর শাঁখে রে।
বৈচিত্র্যহীন এই যে ধরা বিড়ম্বিতের বাসভবন,
কোন্ গুণেতে করে হেথায় মহামায়ায় আকর্ষণ ?
একই জিনিষ কি দেখিবেন, একই গীতের মূল্য কি ?
নগণ্য সব তাঁর শ্রবণের, তাঁর গ্রহণের তুল্য কি ?

কিন্তু আহা, মায়ের স্বভাব মহামায়ার থাক্‌বে তো,
না হোক্ ভাল-লাগার মতন মায়ের ভাল লাগবে তো।
দামাল ছেলের একই কথা—কি আছে তার পছন্দের?
স্নেহই করে তুচ্ছকেও বস্তু চির আনন্দের।

নীলমণির ভুল

কুঞ্জনাথ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গোলোক বাবুকে বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু শশী হাজরা—'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'রয়েছেই কোথাও; এক সময় দেখা হবেই তার সঙ্গে। যে কথা আপনার-আমার মনে হয়েছে সে কথা শশীরও তো মনে হতে পারে? সেও তো আমাদেরই মত মানুষ! আসুন, আপনাদের পিয়াস-বাড়ীর চা আমার পিয়াস মেটাতে পারে কি না দেখা যাক।'

পিয়াস-বাড়ীতে ঢুকে গোলোক চাটুয্যে দু' পেয়ালা চা আর ওমলেট ফরমাস ক'রলেন। চা তখনি এল, কিন্তু এক চুমুক মুখে দিয়েই চাটুয্যে মশায় মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'যুদ্ধের বাজার ব'লে এরা একেবারে পুকুর চুরি আরম্ভ করেছে মশায়; চিনির নাম গন্ধও নেই।'—বলেই চিনির লেবেল-আঁটা টিনের কৌটোটা পেয়ালার উপর উপুড় ক'রে ঝাঁকিয়ে খানিকটা চিনি ঢেলে নিলেন। কিন্তু তারপর আর এক চুমুক মুখে দিতেই দারুণ বিরক্তিতে তাঁর দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। হাতের তেলোয় খানিকটা চিনি ঢেলে নিয়ে আস্বাদন করলেন, কি যেন একটুখানি ভাবলেন। তারপর নুনের লেবেল-আঁটা কৌটো থেকে একটুখানি নুন ঢেলে নিয়ে আস্বাদন করলেন। একবার মনে হ'ল তিনি ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন। তার পর মনে হ'ল তা নয়, ভয়ানক বিস্মিত হয়েছেন। যাই হোক, ডাক দিলেন বয়কে। বয় এল। গোলোক চাটুয্যে—রুক্ষস্বরে বললেন, 'খদ্দেরের সঙ্গে এমনতর ইয়ার্কি কতদিন ধরে দেওয়া চলছে?'

বয় অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল।

গোলোক চাটুয্যে জোর ক'রেই তাকে চিনি চাখালেন; জিজ্ঞেস করলেন, 'কি এটা?'

বয় ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আজ্ঞে নুন।' নুন চাখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি?' বয় আরো ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আজ্ঞে চিনি।'

গোলোক চাটুয্যে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'এমনতর ইয়ার্কি দেবার মানে?'

বয় হকচকিয়ে বললে, 'ভারি তাজ্জব তো! একটু দাঁড়ান স্যর; এলাম ব'লে।'

ছুটে গিয়ে বয় খোদ মালিককে এনে হাজির করালে। মালিক নন্দগোপাল তাঁর বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, 'ব্যাপার কি?' তারপর ব্যাপার দেখে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আশ্চর্য্য! এমন তো কখনো হয় না! এ নিশ্চয় সেই হতচ্ছাড়া গেরুয়াধারীর কাণ্ড! সন্ধ্যে বেলাতেই এসে হতভাগা এমন কাণ্ড বাধিয়ে গেছে যে সে বলবার নয়। ও সব সন্ন্যেসী-ফন্ন্যেসীকে মশায় আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে।'

কৌতূহলী হ'য়ে গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী?'

নন্দগোপাল, বললেন, 'হলে কি হয়? অমি বাজী রেখে বলতে পারি বেটা একের নম্বর ভণ্ড। এই তো আধ ঘণ্টা আগে সে আর তার সঙ্গেকার আর এক বেটা তেমনি ভণ্ড দু'জনে দু'কাপ চা আর ওম্‌লেট্ খেয়ে চার আনা পয়সা দিয়ে—'

বাধা দিয়ে বয় বললে, 'চার আনা নয় স্যর, চোদ্দ আনা।'

মালিক বললেন, 'না না; চোদ্দ আনা নয়, চার আনা। আমি নিজে বিল করেছি।'

বয় বললে, 'কিন্তু আমায় দিয়ে গেছেন চোদ্দ আনা।'

মালিক একটু চটেই বললেন, 'তুমি নিলে কেন?'

বয় বললে, 'বিলে চোদ্দ আনাই ছিল যে! এই দেখুন না, বিলখানা তাঁরা ফেলে গেছেন, আমি কুড়িয়ে রেখেছি।'

বয় পকেট থেকে বিল বের ক'রে দেখাল; বিলে চোদ্দ আনাই ছিল। নন্দগোপাল অবাক হ'য়ে বললেন, 'সে কি! হবার কথা তো মোটে চার আনা! আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

গোলোক চাটুয্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, 'তারপর কি হ'ল?'

নন্দগোপাল বললেন, 'উঃ, কি গোলমেলে লোক মশায়, সেই বেঁটে সন্ন্যেসীটা! সামান্য কি একটা কথা নিয়ে এই ছোকরার সঙ্গে গোলমাল বাধিয়ে শেষটা যাবার সময় রেগেমেগে অনেকটা চা ওই দেয়ালের গায়ে ঢেলে দিয়ে দে দৌড়।'

গোলোক চাটুয্যে চট্‌পট উঠে দাঁড়িয়ে দু'পেয়ালা চায়ের দাম মিটিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কোন্ দিকে গেছে দেখেছেন?'

মালিক দোকানের দরজা থেকে ডান দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এই সোজা,—বাজারের দিকে।'

ব্যস্ত হ'য়ে গোলোক চাটুয্যে পথে নামলেন। / বাজারে ঢুকবার মুখেই পথের ধারে একটা লোক দোকান সাজিয়ে ব'সে কমলা আর আপেল বিক্রি করছে। সেই দিকে গোলোক চাটুয্যে কিছুক্ষণ অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আসুন, গোটাকত কমলা কেনা যাক।' ভারি আশ্চর্য্য হলাম।

অনেকক্ষণ ধ'রে দরদস্তুর ক'রে গোলোক চাটুয্যে গোটা-চারেক কমলা কিনলেন। দাম চুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'কমলা কিনতাম না বাপু; কিনলাম কেবল তোমার ওই বিদ্ঘুটে বিজ্ঞাপন দেখে।'

দেখে আমিও হেসে উঠলাম। কমলার গাদার ওপরে হলদে কার্ডের গায়ে লিখে রেখেছে—'টাটকা আপেল—৷৴০ যোড়া'; আর আপেলের গাদায় তেমনি কার্ডে লিখে রেখেছে—'তাজা কমলা —৴০ যোড়া।'

দোকানী লজ্জা পেয়ে কার্ড্ দুটো ওলোট-পালোট ক'রে রেখে বললে, 'ভুল হয়ে গেছে বাবুসাহেব! সেই বেটা বেঁটে গেরুয়ার সঙ্গে হাতাহাতি ক'রে কুড়িয়ে তুলে রাখবার সময় ওলোট-পালোট হ'য়ে গিয়েছিল।'

বেঁটে গেরুয়া! গোলোক চাটুয্যে থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছিল, বাপু?'

দোকানী বললে, 'ধাক্কা দিয়ে আমার ঝাঁকার সব ফলগুলোই রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল বাবু। ঢ্যাঙ্গটা তেমন বদ্ নয় কিন্তু বেঁটেটা শয়তানের ধাড়ী।'

ব্যস্ত হয়ে গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'কোন্ দিকে গেছে তারা, দেখেছ?'

ফল-ওয়ালা বললে, 'দেখি নি তবে! একছুটে ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে লক্ষ্মীপুর যাবে ব'লে টম্‌টমে উঠে পড়ল, তাই বেটা বেঁচে গেল; নইলে পিটে লম্বা করে দিতাম না!'

গোলোক চাটুয্যে জিজ্ঞেস করলেন, 'লক্ষ্মীপুর কত দূর, কুঞ্জবাবু?' বললাম, 'অনেক দূর। তা ক্রোশ দেড়েক তো বটেই।'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'বেশ; তবে শীগ্‌গির একখানা টম্‌টম্ ভাড়া করে ফেলুন। এই যে, সুবোধও এই দিকে আসছে দেখছি। ওহে সুবোধ! শশীর দেখা পাওয়া যাবে ব'লে মনে হচ্ছে। তুমি, আমি আর কুঞ্জবাবু—এই তিন জনই যথেষ্ট। এসো, আর দেরি করলে চলবে না।'

টম্‌টমের পক্ষিরাজ ছুটল। সুবোধ বললে, 'ট্যাক্সি করলে হ'ত না?'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'না। কোথায় নামতে হবে তা যদি জানা থাকত তা হ'লে অবশ্য হ'ত। কিন্তু আঁধার হাতড়াতে হলে ধীরে চলাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষ ক'রে তারাও যখন টম্‌টমেই গেছে।'

অদ্ভুত অভিযান। কোথায় যেতে হবে, জানা নেই; কি অবস্থায় ধরতে হবে, ঠিক নেই; এমন কি কা'কে ধরতে হবে সে সম্বন্ধেও সন্দেহ রয়েছে। আদ্ভুত লোক গোলোক চাটুয্যে।

লক্ষ্মীপুরের নতুন খাবারের দোখানখানা চোখে পড়ল, রাত তখন ন'টা। শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী; শীতের জ্যোৎস্নার রহস্যময় আবেশে মশগুল হয়ে এতক্ষণ ক্ষিদের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম; খাবারের দোকানখানা চোখে পড়তেই একেবারে নিঃসঙ্কোচ সত্যি কথাটা মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—'কিছু খেলে হ'ত।' সঙ্গে সঙ্গে গোলোক চাটুয্যে চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'এই; রোকো, রোকো,—একদম বাঁধকে।'

তারপর টম্‌টম্ থামলে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে কুঞ্জবাবু! সঙ্কোচ ক'রে যদি না বলতেন, এ অভিযানে তা হ'লে একটা ভুল থেকে যেত। নেমে পড় হে সুবোধ, নামতে হবে এখানে।'

বিস্মিত হ'য়ে সুবোধ নেমে পড়ল; বললে, 'কিন্তু শশী হাজরা—'

গোলোক চাটুয্যে বাধা দিয়ে বললেন, 'নেভার মাইণ্ড; শুনছ না শশী হাজরার ক্ষিদে পেয়েছে?'

লজ্জিত হয়ে বললাম, 'শশী হাজরার নয়, আমার।'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'ও একই কথা। ক্ষিদে পাওয়ার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে শশী হাজরার কোন তফাৎ নেই। আসুন ওই দোকানটায়। না না, লজ্জা করবেন না কুঞ্জবাবু। কেন জানি না, আমারও মনে হচ্ছিল, ওই দোকানটায় একবার যেতে হবে; কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এবার খুঁজে পেয়েছি, আসুন।'

একেবারে খাঁটি কলকাতার ষ্টাইলে সাজানো দোকানখানা বিদ্যুতের আলোতে ঝক্‌ঝক্ করছে, কিন্তু তার সামনের শাসির বড় রঙিন কাচখানাই একেবারে চৌচির হয়ে ভেঙ্গে গেছে, দু'-একখানা তার ভাঙ্গা অংশ চার কোণা ফ্রেমের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে,—চারিদিকের সুশ্রী সঙ্গতির মধ্যে বিশ্রী রকমের খাপছাড়া এক ব্যাপার।

খাবার দাম দেবার সময় দোকানীকে গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'সুন্দর দোকান; ভারি তৃপ্তি পেলাম খেয়ে। একটা কথা কিন্তু না বলে পারছি নে। ওই কাঁচখানা আপনারা তাড়াতাড়ি সারিয়ে নেবেন মশায়! ভারি খাপছাড়া দেখাচ্ছে ওটা'

দোকানী বললে, 'কি বলব! এই মিনিট বিশেক হ'ল লোকটা ভেঙ্গে গেছে মশায়! মিশনের সন্ন্যাসী হ'লে কি হয়, নিশ্চয় ওর মাথায় ছিট রয়েছে।'

'মিশনের সন্ন্যাসী!' গোলোক চাটুয্যে লাফিয়ে উঠলেন।

দোকানী বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ; দু'জন ছিল। একজন বেজায় ঢ্যাঙ্গা, আর একজন বেজায় বেঁটে। দু'জনে পাঁচসিকের খাবার খেয়ে দিতে চায় পাঁচ টাকার নোট। চেঞ্জ দিতে গেলাম; বললে, চাই না। বললাম চাই না কি রকম? আপনি পাবেন যে! শুনে সেই বেঁটে সন্ন্যেসীটা চোখ পাকিয়ে তেড়ে এসে বললে, চোপ্ রও! আমার খুসি, আমি নেব না। বললাম, সে কি কথা! দোকানের বদ্নাম হবে যে! লোকে বলবে, ভালমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে। তা কি হয়? শুনে সেই বেঁটে শয়তান তেড়ে-মেরে এসে বললে, বটে! দেখবে তবে? পুষিয়ে নেব? এই নাও, শোধ! বলেই মশায়, তার হাতের বেঁটে ছাতার এক গুঁতো মেরে আমার এমন চমৎকার দামী কাচখানা একেবারে চুরমার করে দিয়ে গেল। এই বিশ মিনিটও হয়নি। বদ্ধ পাগল!'

গোলোক চাটুয্যে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ দিকে গেছে, দেখেছেন?'

দোকানী বললে, 'এখান থেকে নেমে ওই ষ্টেশনারী দোকানটায় ঢুকেছিল; বোধ হয় সিগারেট কিনতে।'

গোলোক চাটুয্যে ঢুকলেন ষ্টেশনারী দোকানে। দোকানী এক কেতা দুরন্ত ছোকরা; আমাদের দেখেই বললে, 'আপনারা বুঝি সেই প্যাকেটটা নিতে এসেছেন? সে কিন্তু আমি তক্ষুণি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'প্যাকেট! কিসের প্যাকেট?'

ছোকরা বললে, 'তা হ'লে আমারই ভুল হয়েছে; কিছু মনে করবেন না। এই মিনিট পনেরো হ'ল ফণী রায় নামে বেঁটে একজন আর ঢ্যাঙ্গা আর একজন—এই দু'জন মিশনের সন্ন্যাসী এসেছিলেন সিগারেট কিনতে। তাঁরা সিগারেট নিয়ে যাবার পর গেরুয়াধারী সেই বেঁটে লোকটি এসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি একটা প্যাকেট ফেলে গেছেন কিনা! প্যাকেটটা নাকি বাদামী কাগজে মোড়ান। আমি খুঁজে দেখে বললাম, না। তখন তিনি আমায় পাঁচ টাকার একখানি নোট আর একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, যদি পরে পাওয়া যায় তা হ'লে দয়া করে সেই ঠিকানায় সেটা লোক দিয়ে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিতে। নোটখানা সেই লোকের বক্‌শিষ। তিনি চলে যাবার পরেই কিন্তু প্যাকেট্‌টা পাওয়া গেল। সেটা আমি তক্ষুণি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

গোলোক চাটুয্যে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা দু'জন কোন্ দিকে গেছে, দেখেছেন?'

ছোকরা সোজা পদ্মার দিকে দেখিয়ে বললে, 'নদীর ধারে খুঁজে দেখুন।'

চললাম সকলে পদ্মার ধারে ধারে। শীতের অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোতে দেখলাম দূরে নদীর ধারে ধারে চলেছে দুই ছায়ামূর্ত্তি,—মানুষেরই! একজন বেঁটে, একজন লম্বা। বুকের ভেতর দুরদুর করে উঠল। ওই সেই শশী হাজরা। কিন্তু এই শীতের ম্লান চাঁদের আলো মাথায় করে— জনহীন নদীতীর ধরে সহর ছেড়ে কোথায় চলেছে ওরা!

কিছুক্ষণ এমনি চলবার পর দু'জনে ওরা নদীর ধারেই ব'সে পড়ল। গোলোক চাটুয্যের নির্দ্দেশ মত আমরাও একটা ঘোরা পথ ধরে নিঃশব্দে তাদের পেছনে উপস্থিত হয়ে একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলাম।

ফণী রায় তখন বলছিলেন, 'ভগবান্ আছেন বৈ কি! প্রকাণ্ড একখানা নীলকান্ত মণির মত নীল আকাশে প্ল্যাটিনামের থালার মত ওই সুন্দর ঝকঝকে চাঁদের দিকে যখন চেয়ে দেখি—'

ঢ্যাঙ্গা সন্ন্যাসীটি বলে উঠল, 'ষ্টপ্! আর না, ঢের হয়েছে। এইবার দাও দেখি তোমার দুলের প্যাকেট্‌টা।'

ফণী রায় বললেন, 'দুলের প্যাকেট? তা সেটা তোমাকে দেব কেন? সে তো দেবার কথা ডাঃ দত্তকে! তুমি কে?'

ঢ্যাঙ্গা বললে, 'আমি কে? আমি শশী হাজরা। তোমার দুলের প্যাকেটটা আমি চাই।'

নিজের বুক-পকেট হাতড়ে মাথা চুলকে ফণী রায় বললেন, 'তোমার জন্য আমি খুবই দুঃখিত বন্ধু! এখন আর সেটা তোমাকে দেবার উপায় নেই।'

মুচকি হেসে শশী বললে, 'তা জানি; কারণ তোমার আলখাল্লার নীচেকার ফতুয়ার পকেট থেকে সেটা এখন আমার কোমরবন্ধে আঁটা চামড়ার ব্যাগের ভেতর এসে উঠেছে। তা হলে আসি বন্ধু?'—শশী উঠতে গেল।

ফণী রায় বললেন, 'তুমি ঠিক বলছ?'

শশী ব্যাগের ভেতর থেকে বাদামী কাগজে মোড়ান একটা ছোট প্যাকেট বের করে বললে, 'দেখতে পাচ্ছ?'

ফণী রায় তাঁর গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস দুখানা সীসের চাকতি ছাড়া ও প্যাকেটের ভেতর আর কিছু নেই।'

শশী বললে, 'আমি ছেলেমানুষ নই বন্ধু, যে তাই শুনে এটা তোমাকে ফিরিয়ে দেব।'

ফণী রায় বললেন, 'আমি চাই নি বন্ধু। যাচাই করবার জন্য তুমি ওটা খুলে দেখতে পার; আমি মিথ্যা বলি নি।'

শশী পকেট থেকে ছুরি বের ক'রে প্যাকেটটা কেটে ফেললে; বেরোল দু'খানা সীসের চাকতি।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে শশী বললে, 'এটা তবে নকল! আসলটা দাও শীগ্‌গির। দাও বলছি।'

হতাশ ভঙ্গী করে ফণী রায় বললেন, 'একটু আগেও যদি বলতে বন্ধু! সে আর দেবার নেই। ষ্টেশনারী দোকানটায় দ্বিতীয়বার গিয়ে সেটা নিরাপদে ডাঃ দত্তর কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। আমি জানতাম, তুমি আসবে। তোমাকে আনবার জন্যেই সমস্ত পথ আমি মুক্তকণ্ঠে দুলের অস্তিত্ব প্রচার ক'রে এসেছি। এলে খালি হাতে যে তুমি ফিরবে না, এও জানতাম; তাই নকলও একটা রাখতে হয়েছিল, এবং আসলটা নিতান্ত অযত্নে রেখে নকলটাকে রেখেছিলাম অতি যত্নে, অতি সঙ্গোপনে। আমার এ সামান্য কৌশল ব্যর্থ হয়নি।'

আশ্চর্য্য হয়ে শশী বললে, 'তুমি—তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে!'

ফণী রায় বললেন, 'ক্রু-ম্যানের পোষাকে তোমাকে চিনতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তখনই বুঝেছিলাম, বেচারা আসল ক্রু-ম্যান্‌কে পরের ষ্টেশনেই অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যাবে। তারপর সহরে আসবার পথে গেরুয়া পোষাকে তোমাকে দেখে চিনতে ঠিক পারি নি, তবে সন্দেহ হয়েছিল। পিয়াস-বাড়ীতেই সন্দেহ দূর হ'ল। তোমার অলক্ষ্যে চিনির কৌটোতে নুন রাখলাম। তাই কাপে ঢেলে নিয়ে সেই নুন-চা তুমি অক্লেশে খেলে,—বিনা প্রতিবাদে। বুঝলাম, প্রতিবাদ ক'রে গোলমাল বাধাতে তুমি চাও না, তুমি চুপটি ক'রে লুকিয়ে থাকতেই চাও। তারপর এল পিয়াস-বাড়ীর বিল,—চার আনার। এবারও তোমার অলক্ষ্যে নিজের পেন্সিল দিয়ে আমি সেই বিলে চারের আগে একটা এক বসিয়ে চারকে করলাম চোদ্দ। এই অসম্ভব দাম দেখেও তুমি কোন প্রতিবাদ করলে না বন্ধু, বিনা বাক্যব্যয়ে চার আনার জায়গায় চোদ্দ আনাই তাকে দিলে। বুঝলাম, নির্ব্বিবাদে স'রে পড়তে পারলে তুমি বাঁচ। তখনই সন্দেহ দূর হ'ল; বুঝলাম আমি যার কাছে সাবধান থাকতে চাই, তুমি সেই শশী হাজরা!'

শশী রাগে গরগর করতে করতে বললে, 'আমি তোমাকে খুন ক'রে পদ্মায় ভাসিয়ে দিলে কেউ জানবে না, তা জানো?'

কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে ফণী রায় বললেন, 'ধীরে বন্ধু, ধীরে। যা ভাবছ তা নয়; জানতে পারবে।'

শশী বললে, 'কেউ জানবে না। তুমি আর আমি ছাড়া এত রাত্রে নদীর ধারে এখন কেউ নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণী রায় বললেন, 'তোমার জন্য আমি খুবই দুঃখিত বন্ধু! তোমার কোন ইচ্ছাই আমি পূর্ণ করতে পারলাম না। তুমি ভাবছ, এখানে এখন তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু আমাদের পেছনের ঝোপটা অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবে কলকাতার সেরা গোয়েন্দা তাঁর দলবল নিয়ে তোমারই জন্য গোপনে অপেক্ষা করছেন।'

শশী শঙ্কিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মিথ্যা কথা। এখানে কে তাকে খবর দিয়ে আনবে?'

ফণী রায় বললেন, 'আমিই এনেছি বন্ধু! আজ সন্ধ্যে থেকে তোমার সঙ্গে যখনই যেখানে যেখানে গেছি, তুমি কি লক্ষ্য কর নি, একটা-না-একটা অভদ্র বেয়াড়া কাণ্ড সেখানে ক'রে এসেছি? আমি জানতাম, আমার এ কাণ্ডগুলো নিয়ে সে সব জায়গায় অন্ততঃ আজ রাতের মত আলোচনা চলবে এবং আমি না হলেও আমার এই কাণ্ড-কীর্ত্তিগুলো এত বড় গোয়েন্দার চোখ-কান এড়িয়ে যাবে না।'

গোলোক চাটুয্যের ইঙ্গিতে ঝোপের ভেতর থেকে বের হয়ে শশীকে ঘিরে দাঁড়ালাম। শশী হাজরা লোকটা সত্যিই আর্টিষ্ট্। গোলোক চাটুয্যের দিকে সে ফিরেও চাইলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ফণী রায়ের দিকে। তারপর এতটুকুও চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে স্থিরকণ্ঠে বললে, 'জীবনে বুদ্ধির যুদ্ধে এই প্রথম হার মানলাম, ইন্‌স্পেক্টর! আমায় তুমি ধরতে পার।'

গোলোক চাটুয্যে কিন্তু শশীকে হাতে পেয়েও ধরলেন না; বললেন, 'এ যাত্রা তোমার ভয়ের কারণ নেই শশী! তোমাকে ধরবার জন্য সহর থেকে এত দূর আমি আজ আসিও নি। এসেছি এঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিতে।' বলেই মাথা নীচু করে ফণী রায়ের পায়ের দিকে হাত বাড়ালেন।

'আরে করেন কি,—করেন কি!'—বলতে বলতে ফণী রায়ও নীচু হয়ে পিছু হটলেন। বগল থেকে পড়ল ছাতা; ছাতা সামলাতে বুকের পকেট থেকে ঝুপ্ ঝাপ্ করে পড়ল গোটা-কতক বাদামী কাগজে মোড়ানো প্যাকেট্।

যুদ্ধকালের শুষ্ক খাদ্য

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্, এ

জগৎযোড়া লড়াই বড় সহজ কথা নয়। ব্রহ্মদেশের গভীর জঙ্গল, লিবিয়ার ধূ ধূ মরুভূমি, রাশিয়ার অভ্যন্তর প্রদেশের প্রাণ-কাঁপান কন্‌কনে ঠাণ্ডা, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির মারাত্মক ম্যালেরিয়া—প্রকৃতির এই সব বিপুল বাধা ভেদ করে কোথায় না সৈন্যগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করছে! এই

সব দুর্গম এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ চালাতে হলে সৈন্যদের শক্তি ও উদ্যম যাতে পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে তার ব্যবস্থা আবশ্যক—এবং তার জন্য সকলের আগে প্রয়োজন হচ্ছে সৈন্যদের যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর অথচ মুখরোচক খাদ্য যোগান! গত মহাযুদ্ধেও খাদ্যসমস্যার এই দিকটা ধরা পড়েছিল; কিন্তু তখন যুদ্ধ এরূপ ব্যাপক ছিল না বা এ রকম দুর্গম স্থানে ছড়িয়ে পড়ে নি। তথাপি নানাপ্রকার শুক্‌নো তরিতরকারি, টিনে সংরক্ষিত ফল, মাছ, মাংস, কাঁক্‌ড়া প্রভৃতি দ্বারা সৈন্যদের খাদ্যাভাব পূরণ করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মহাসমরে ডুবো-জাহাজের দৌরাত্ম্যের জন্য সমস্যাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে কি করে অতি অল্পসংখ্যক জাহাজ দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য নানান্ যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই মানুষের মস্তিষ্কে খাদ্যের "শুষ্কীকরণ" নামক উপায়টির উদ্ভব হয়েছে। ইংরাজিতে এই কার্য্যটিকে বলে 'ডিহাইড্রেশন্', অর্থাৎ খাদ্য থেকে জল বার করে তাকে শুকিয়ে নেওয়া এবং পরে চাপ দিয়ে তা থেকে হাওয়া দূর করে দেওয়া।

ডিহাইড্রেটেড্ বা শুক্‌নো খাদ্যের ব্যবহার খুব নতুন জিনিষ নয়। তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে যে তোমাদের বাড়ীতেও রৌদ্রে শুষ্ক ফুলকপি বা বাঁধাকপির ব্যবহার অসময়ে হয়ে থাকে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে রৌদ্র খাদ্য থেকে চার ভাগের তিনভাগ জল টেনে নিতে পারে, তার বেশী পারে না—একভাগ জল রৌদ্রে-শুষ্ক খাদ্যে থেকেই যায়। ফলে খুব বেশী দিন এই সব খাদ্য সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা যায় না। তা ছাড়া সহজেই সেগুলিতে ছাতা ধরে, ভ্যাপ্‌সা গন্ধ হয় এবং সেগুলির স্বাদ ও গুণ অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য থেকে শতকরা সাতানব্বই ভাগ জল নিঃশেষিত করে দেওয়া যেতে পারে এবং তার গুণাবলী প্রায় অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব হতে পারে। তোমাদের এ কথাও জেনে রাখা দরকার যে শুধু তরিতরকারি নয়, বর্ত্তমান যুদ্ধে যে সব খাদ্যকে শুষ্ক করা হচ্ছে তার মধ্যে দুধ, ডিম এবং মাংসও প্রধান।

মানুষের প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে জলীয় অংশ রয়েছে। তাজা ফল এবং তরিতরকারির ভেতর জলের অংশ শতকরা নব্বই ভাগ, টাট্‌কা মাংসের মধ্যে তিন ভাগের দু'ভাগই জল। একটা তাজা ডিমের এক চতুর্থাংশ শুধু জলে ভরা এবং দুধের মধ্যে জলের অংশ যে প্রচুর তা তো তোমরা নিজেদের চোখেই দেখ্‌ছ। সুতরাং খাদ্য থেকে এই জলীয় অংশ যদি দূর করে দেওয়া যায় তা হলে অনেক কম স্থানে একই পরিমাণ খাদ্যের সংকুলান হবে। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যবিজ্ঞানীরা বল্‌ছেন যে শুষ্ক ডিমগুলি রাখতে সাধারণ ডিম রাখবার চারভাগের একভাগ স্থান হলেই চল্‌বে, শুক্‌নো শাকসব্জীর জন্য সাধারণ শাকসব্জীর পনোরো ভাগের এক ভাগ স্থানই যথেষ্ট এবং তরল দুধ রাখতে যতখানি যায়গা লাগ্‌বে তার ছ'ভাগের একভাগ স্থানেই সেই পরিমাণ শুষ্ক দুধ রাখা যেতে পারবে।

তোমাদের মধ্যে যারা ভোজনবিলাসী তারা হয়ত বলবে যে শুকনো তরিতরকারি একবার দেখলে সেগুলি কি আর মুখে দিতে ইচ্ছে ক'রে? ভয় নেই, বিজ্ঞানীরা এ বিষয়েও নজর দিয়েছেন। রাঁধবার আগে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখলে পরেই শুষ্ক সব্জীগুলি ফেঁপে ফুলে ঠিক্ তাজার মত হয়ে উঠ্‌বে, এমন কি তার সবুজ রং পর্য্যন্ত আবার ফিরে আস্‌বে। অবশ্য নজর রাখতে হবে যে গাছ থেকে তুল্‌বার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন তরিতরকারিগুলোকে শুষ্ক করা হয়। কেননা বাসি হয়ে গেলে এই সব গুণ ফিরে আসা আর সম্ভব হবে না। তাজা এবং শুক্‌নো খাদ্যের স্বাদের প্রভেদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা জোর দিয়ে এই কথা বল্‌ছেন যে এ প্রভেদ উনিশ বিশ,—ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এমন কি, কোন কোন শুষ্ক খাদ্য নাকি তাজা খাবারের চেয়ে বেশী মুখরোচক বলে বিবেচিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবিভাগের জন্য যে পাঁউরুটি প্রস্তুত হচ্ছে তার ভেতর আজকাল শুক্‌নো দুধ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুক্‌নো দুধ-ভরা পাঁউরুটি যে কেবল বেশী দিন তাজা থাকে তাই নয়, সৈন্যেরা বল্‌ছে সাধারণ পাঁউরুটির সঙ্গে দুধ খেলে যে স্বাদ অনুভূত হয় শুক্‌নো দুধ-ভরা পাঁউরুটি নাকি তার চেয়ে অনেক বেশী মিষ্টি এবং সুস্বাদু।

ডিহাইড্রেশন্ বা শুষ্কীকরণের অনেক উপায় আজকাল যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত হয়েছে। তরিতর-কারি কি করে শুষ্ক করা হয় তা অতি সংক্ষেপে তোমাদের বল্‌ছি। বড় বড় থালা বা ট্রেতে তরিতরকারি সাজিয়ে সেগুলিকে প্রকাণ্ড লম্বা একটা নলের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে চালিয়ে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে ঝলকে গরম হাওয়া এসে সেগুলি থেকে জল শুষে নিতে থাকে। শুক্‌নো হয়ে গেলে যন্ত্রদ্বারা সেগুলিকে বেশ ভাল করে চেপে দেওয়া হয়—যেন তা থেকে সব হাওয়া বেরিয়ে যায় এবং অধিকতর সংক্ষিপ্ত স্থানে সেগুলি ধরান যেতে পারে। ডিম কি করে শুকিয়ে নেওয়া হয় তাও জেনে রাখ্‌তে পার। অনেকগুলি ডিমকে আগে যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় সেগুলি বেশ তাজা আছে কিনা; তারপর সেগুলিকে পরিষ্কার করে ধুয়ে, খোলা ভেঙ্গে ফেলে একটি বিরাট পাত্রে তরল অংশগুলি জমা করা হয়। এবার যন্ত্রের সাহায্যে ডিমের সাদা এবং হল্‌দে অংশ খুব ভাল করে ঘুঁটিয়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়, তারপর শুকিয়ে নিলেই হ'ল। যে জিনিষটি তৈরী হ'ল তাকে ডিম্ব-চূর্ণ বল্‌লেই চলে। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সৈন্যদের কাছ এ খাবারটি যখন পৌঁছয় তখন রাঁধুনিকে বেশী পরিশ্রম করতে হয় না; অল্প জল দিয়ে ফেনিয়ে ওম্‌লেট্ প্রস্তুত করলে কেউ বুঝতেও পারবে না যে তা তাজা ডিম থেকে তৈরী নয়।

তোমরা হয়ত ভাবছ যে তাজা খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি যে সব গুণ বর্ত্তমান থাকে শুক্‌নো খাদ্যে সেগুলি থাকে না। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং তার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। বিশেষজ্ঞেরা বল্‌ছেন যে তাজা মাখন-তোলা দুধে যে যে গুণ থাকে শুষ্ক

মাখন-তোলা দুধে সে সব গুণই বর্ত্তমান, থাকে না কেবল মাত্র চর্ব্বি। সাধারণ তরল দুধ আর শুক্‌নো দুধে তফাৎ এই যে পরেরটাতে ভিটামিন "সি" পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ তোমরা জেনে রাখতে পার যে দুধে ভিটামিন "সি"র অভাব এমন কিছু ক্ষতিকর নয়। টাটকা ডিম আর শুক্‌নো ডিমের মধ্যে গুণাবলীর প্রভেদ কিছু মাত্র নেই। কমলা লেবুর রসের প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে তাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "সি" থাকে; পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কমলা লেবুর শুক্‌নো রসেতেও এই ভিটামিন পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে। এ ছাড়া শুষ্ক এবং তাজা তরিতরকারিতে কার্বোহাইড্রেট্ এবং প্রোটিনের পরিমাণ থাকে ঠিক একই রকম।

ডিহাইড্রেশনের আর একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে বরফের সাহায্যে কোন খাদ্যকে সংরক্ষিত করতে হয় না। প্যাকিংএর হাঙ্গামাও খুবই কম। এমন কি দুগ্ধচূর্ণ, ডিম্বচূর্ণ প্রভৃতি খাদ্যগুলিকেও টিনে প্যাক্ করতে হয় না, আর যেগুলিকে হয় সেগুলির জন্যও অতি অল্পপরিমাণ টিনেরই প্রয়োজন।

ডিহাইড্রেশনের দৌলতে যুক্তরাষ্ট্র কেবল মাত্র ১৯৪৩ সালেই ১১০,০০০,০০০ পাউণ্ড অধিক ডিম, প্রায় ৮৫,০০০,০০০ পাউণ্ড বেশী দুধ, ৬৬,০০০,০০০ পাউণ্ড বেশী তরিতরকারি এবং ৬০,০০০ পাউণ্ড অধিক মাংস পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি করতে পারবেন। সুতরাং যুদ্ধজয়ে খাদ্য সংরক্ষণের এই নীতির দান সামান্য নয়। তোমরা শুনে খুসী হবে যে একাধিক ভারতীয় কোম্পানী এই ব্যবসা অবলম্বন করে যুদ্ধ ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করছেন।

মনোরঞ্জন

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

তোমার সাথে নাই রহিল মোর
নাই রহিল মুখের পরিচয়,
লেখার মাঝে এই যে জানাশোনা
এই চেনা কি গভীর চেনা নয়?
নাই রহিল মুখর পরিচয়।

শুধু আমার একটী বেদন জাগে,
তোমার প্রতি গোপন অনুরাগে
হৃদয়-কুসুম পূর্ণ দানের আগে
কোন্ অসীমে হঠাৎ পেলে লয়?
অনাগত বিরাট সম্ভাবনা
যাত্রাপথের মধ্যে হ'ল ক্ষয়।
পেলাম না রে পূর্ণ পরিচয়!

কাগজ মাঝে টানা আঁচড় তব
মন-সায়রে উঠে তরঙ্গিয়া,
হাসির লেখা রেখার টানে টানে
ঠোঁটের কোণে জাগে উচ্ছ্বসিয়া।
নিঝুম রাতি, তোমার কেতাব হাতে,
ঘুম আসে না অলস আঁখিপাতে,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লেখা,
ধন্য তুমি জানি সুনিশ্চয়,
কিন্তু কেন বাঁধন হারায় হিয়া,
এমন ধারা উতলপারা হয়?
পাই নে যে গো পূর্ণ পরিচয়।

'পদ্মরাগে'র বাইরে আসার পরেই
কোথায় তুমি গেলে 'পদ্মরাগ'?
'হুকাকাশি'র চরণ গেল থামি
শিশুর মনে রেখে প্রথম দাগ।
'অনেক লিখুন' বলছে যখন সবে,
কিশোর দলে উছল কলরবে,

মরণ তখন বরণ করে তোমা—
যখন তুমি মরণ কর জয়,
রাঙাও হিয়া হে মনোরঞ্জন,
স্মরণ তব তরুণ ভুবনময়—
পাই নে তবু পূর্ণ পরিচয়। *

আচার্য্য নলিনীমোহন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

অল্প কয়েক দিন আগে কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, তোমরা তা লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না। খবরটা এই রকম: সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ছাত্রকে হিন্দী ভাষায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখবার জন্য 'আচার্য্য' অর্থাৎ ডক্টর (পি. এইচ্. ডি.) উপাধি দেওয়া হয়েছে। ছাত্রটির নাম শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল।

এই ছাত্রটির বয়স কত শুনবে? মাত্র ৮৩ বছর। তিরাশী বছর বয়সেও যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হন না সেই জ্ঞানযোগী আদর্শ ছাত্রের কথা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই আগ্রহ হচ্ছে?

ডক্টর নলিনীমোহন সান্যাল

নলিনীমোহনের বাড়ী নদীয়া জেলার বিখ্যাত গ্রাম শান্তিপুর। সেইখানেই ইংরাজী ১৮৬১ সালে তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁকে কাটাতে হয়েছিল পশ্চিমের নানা জায়গায়। ১৮৭৭ সালে তিনি আগ্রা কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর নানা জায়গা ঘুরে কলকাতা থেকে ১৮৮৫ সালে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে এম্.এ পাশ করেন।

---

* বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের উদ্দেশে রচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে নলিনীমোহন বেছে নিলেন শিক্ষাব্রতীর জীবন। এ কাজে তিনি অচিরেই খ্যাতি অর্জ্জন করলেন, এবং বাংলা ও বিহারের নানা জায়গায় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক রূপে কাটাবার পর স্কুল সমূহের পরিদর্শকের পদে উন্নীত হলেন। এই সময়ে তিনি অনেক বার বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টারের দায়িত্বপূর্ণ পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

কিন্তু অবসর গ্রহণ করলেও সাধারণ পেন্সনভোগীদের মত ঘরে বসে থাকবার লোক নলিনী-মোহন ছিলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন। এর পর তিনি যথাক্রমে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী এবং ভবানীপুরের বিখ্যাত সাউথ্ সুবার্ব্বন্ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েট্ বিভাগে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। শেষোক্ত স্থানে প্রায় সাত বছর কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা করার পর বর্ত্তমানে তিনি নিজ গ্রাম শান্তিপুরে বাস করছেন এবং আজও তেমনি বাগ্দেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে আছেন।

এই তো গেল নলিনীমোহনের কর্ম্মজীবনের কথা। কিন্তু এটুকু বললে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। ১৮৮৫ সালে তিনি একবার এম্.এ পাশ করেছিলেন তা আগেই বলেছি। ১৯২১ সালে সরকারী চাকরী থেকে অবসর নিয়ে তিনি আবার এম্.এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। এবারে তাঁর বিষয় ছিল হিন্দী সাহিত্য। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর। ষাট বছরের বৃদ্ধ যুবকের মত উৎসাহ নিয়ে নাতিদের সঙ্গে নতুন ক'রে এম্.এ পরীক্ষা দিতে বসলেন। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল তিনি প্রথম বিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন।

নলিনীমোহন সারা জীবন শুধু পরীক্ষা পাশ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তা যেন কেউ মনে ক'র না। তিনি একজন সুলেখক—বিশেষ ক'রে হিন্দী সাহিত্যে তাঁর স্থান খুবই উঁচুতে। ভারতীয় হিন্দী পরিষদের তিনি একজন 'মান্য' সদস্য। যাঁরা হিন্দী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরাই জানেন এই মান্য সদস্য হওয়াটা কত বড় সম্মানের! শুধু কি হিন্দী! বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি সব ভাষাতেই তিনি নানা সাময়িক পত্রে নিয়মিত লিখে আসছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য—সব কিছুতেই তিনি কিছু-না-কিছু দান করেছেন। তাঁর অনেক লেখা পুস্তকাকারেও বেরিয়েছে। তার মধ্যে কয়েকখানা আবার ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্.এ পরীক্ষার পাঠ্য রূপেও নির্ব্বাচিত হয়েছে। তাঁর লেখাগুলি সাধারণতঃ একটু উঁচুদরের এবং বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এখন তোমরা হয়তো তা বুঝবে না, কিন্তু বড় হয়ে অবশ্যই পড়ে দেখবে। তবে ছোটদের জন্যও তিনি কিছু কিছু লিখতে ছাড়েন নি। 'রামধনুতে'ও তোমরা তাঁর লেখা গ্রীক্ পুরাণের গল্প পড়ে থাকবে।

এ ছাড়া নলিনীমোহন উর্দ্দু, ফারসী, আরবী, তামিল প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ভাষা জানেন। তামিল ভাষা থেকে তিনি 'কুরল' নামে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আশ্চর্য্য পণ্ডিত এই লোকটি!

শুধু বড় পণ্ডিত ন'ন, মানুষ হিসাবেও নলিনীমোহনের মত লোক বেশী দেখা যায় না। তিনি যখন ভবানীপুর সাউথ্ সুবার্ব্বন্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আজও সেজন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি। আমাদের বারে আমিই ছিলাম স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সেই সূত্রে নলিনীমোহন ও তাঁর ছেলে, বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে (তিনিও তখন ঐ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার আমার সুযোগ হয়েছিল। সে সব দিনের কথা মনে পড়লে আনন্দে মন ভরে ওঠে। ইস্কুল-বাড়ীরই একটা অংশে তাঁরা পিতাপুত্রে থাকতেন। আমরা যখন তখন গিয়ে তাঁদের বিরক্ত করতাম। সাহিত্য থেকে আরম্ভ ক'রে কত বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ত! আমরা ভুলে যেতাম তিনি অত বড় একজন পণ্ডিত,—অত বড় একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আর আমরা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক মাত্র। তিনি যেন আমাদেরই একজন হয়ে সমানে উৎসাহ সহকারে গল্প করতেন, আমাদের সঙ্গে তর্ক করতেন, আমাদের কাঁচা হাতের লেখা ধৈর্য্য ধরে শুনতেন আর তার বদলে প'ড়ে প'ড়ে শোনাতেন নানা হিন্দী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁরই নিজের লেখা রচনা!

গত বছর কি উপলক্ষ্যে একবার শান্তিপুর গিয়েছিলাম। প্রায় ১৬।১৭ বছর পরে দেখা—তাঁর অগণ্য ছাত্রের মধ্যে আমি একজন, অথচ তিনি ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতই নিতান্ত আপনার ভাবে সস্নেহে আমাকে গ্রহণ করলেন। বাইরে ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে কত বিষয়ে আলোচনা হ'ল। দেখলাম আজও তাঁর অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত্ত জ্ঞানানুশীলনে কেটে যাচ্ছে;—এখনও ঠিক ছাত্রসুলভ উৎসাহ নিয়েই সমানে চলেছে তাঁর অধ্যয়ন। ভুরি-ভোজনের পর যখন উঠলাম, তিনি আমাকে রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন, তার পর একটু থেমে, ইতস্ততঃ ক'রে হাসিমুখে বল্লেন, "দেখ ক্ষিতীন, একটা দুষ্কর্ম্ম ক'রে ফেলেছি।" অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। তিনি বল্লেন, "পি. এইচ্. ডি'র জন্য একটা থিসিস্ সাবমিট্ ক'রে ফেলেছি—হিন্দীতে। এখন ভাবনা হচ্ছে সফল হব কিনা।" ৮৩ বছরের বৃদ্ধের মুখে এই কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এমন গুরুর ছাত্র হ'তে পারা একটা মস্ত গৌরবের কথা নয় কি? আমি তো তাই মনে করি।

'রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর'

(ধারাবাহিক রহস্য-উপন্যাস)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

দেবেশ বাবুর মৃত্যুটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। ঘটনাটিও সংক্ষিপ্ত :

গান্ধীজী, জওহরলাল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের পর সারা হিন্দুস্থানে বিক্ষোভ দেখা দিল। কলকাতাতেও এসে লাগলো তার ঢেউ। আন্দোলনকারীদের একটা দল সহরের ট্রামগাড়ীগুলিকে আক্রমণ করলো—বিদেশী কোম্পানীর একচেটিয়া লাভের কারবার নাকি তারা বন্ধ করবে! কিন্তু ট্রামগাড়ীতে আগুন লাগিয়ে যখন বিশেষ কোন সুবিধা হোল না, তখন কোম্পানীকে ছেড়ে আরোহীর উপর তারা চড়াও হোল, সুরু হোল আচম্বিতে আরোহীদের গায়ে এসিডের বোতল ছুঁড়ে মারা।

একদিন সন্ধ্যার সময় দেবেশ বাবু ফিরছিলেন মোটরে। রাসবিহারী এভেন্যুর মুখে একখানি রিক্সায় বাধা পাওয়ায় মোটরখানি থমকে দাঁড়ালো। একখানি ট্রাম যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। কোথা থেকে দু'টি বোতল এসে পড়লো ট্রামের দিকে। একটি বোতল ট্রামে না পড়ে পড়লো এসে মোটরের ভিতরে। বোতল ফেটে তীব্র এসিড ছড়িয়ে পড়লো দেবেশ বাবুর চোখে মুখে। দেবেশ বাবু আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

তখনই এম্বুলেন্স এলো।

হার্ট দুর্ব্বল ছিল, পরদিন হাসপাতালে দেবেশ বাবু মারা গেলেন।

সত্যেন কলকাতার বাইরে ছিল। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেল—পিতা সাংঘাতিক আহত, শীঘ্র চলে এসো!

তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো!

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে সত্যেন ছুটল ষ্টেশনে।

বাড়ী পৌছে শুনলো দেবেশ বাবু মারা গেছেন—পূর্ব্বরাত্রে।

ঘটনাটা দুঃখজনক হলেও সত্যেন তাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছিল, আর দশজন যে ভাবে পিতৃবিয়োগ স্বীকার করে। কিন্তু—

একখানি চিঠি ঘটনাটি রহস্যময় করে তুললো।

চিঠিখানি দেবেশ বাবুর লেখা, ছিল সত্যেনের ড্রয়ারের ভিতর, খামের উপর লেখা ছিল—

'টুমাই সন্—'

ভিতরের চিঠিখানিও ইংরাজীতেই লেখা। সত্যেন এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো—

কল্যাণীয় সত্যেন,

তুমি সহসা একদিন খবর পাবে আমি হঠাৎ মারা গেছি। মৃত্যুটা ঘটবে সম্ভবতঃ কোন দুর্ঘটনা থেকে। পারিপার্শ্বিক সব কার্য্যকারণ দেখে মনে হচ্ছে সেই ঘটনা খুব নিকট হয়ে এসেছে। সেই জন্যই তোমাকে আমি কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই।

আমার মৃত্যুর পর তুমি অর্থাভাবে পড়বে। ব্যাঙ্ক-একাউণ্টে তোমার জন্য আমি বিশেষ কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। কিন্তু তোমাকে আমি যে ভাবে শিক্ষিত করেছি তাতে ভদ্রভাবে জীবিকা উপার্জন করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না। চাকরীর জন্য কোন দিন উমেদারী করো না, দেবেশ বাঁড়ুয্যের ছেলে চাকরী করে—এ আমি চাই না। পরের দাসত্ব করার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা অনেক ভালো। আসবাবপত্র ও বাড়ী বিক্রী করে দিও, সেই টাকা দিয়ে লোহা, কাগজ বা কন্ট্রাক্‌টারীর ব্যবসা সুরু করবে। যুদ্ধের বাজার, লোকসান হবে না।

আমার মৃত্যুটা তোমার কাছে রহস্য বলে মনে হবে। তার কারণ আমি আজ তোমার কাছে অব্যক্তই রাখলাম। ভবিষ্যতে একদিন সব কথা তোমার কাছে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর তার উপলক্ষ্য হবে একখানি ছোট ছবি। ছবিখানি এই খামের মধ্যেই রইল। যদি সব কথা জানার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে তা হলে ছবিখানি হাতছাড়া ক'র না।

তোমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের সূত্রও রইল ওরই মধ্যে। ওই পোষ্টকার্ডখানি হাত-ছাড়া হয়ে গেলে লাখ লাখ টাকা তোমার হস্তচ্যুত হবে। সে কথা সব সময়ে মনে রেখো।

তোমার জীবনের পথ পুষ্পাস্তীর্ণ হোক—এই আমার কামনা। ইতি—

তোমার পিতা দেবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

খামের ভিতর থেকে সত্যেন বের করলো একখানি ছবি। পোষ্টকার্ড সাইজের একখানি কার্ডবোর্ডের উপর ছবিখানি আঁকা। হিমালয়ের তুষারধবল শৃঙ্গ, সেই শৃঙ্গের ধবলিমার উপর প্রতিভাত হচ্ছে ধ্যানমগ্ন মহেশ্বর। জটার ছন্দে ছন্দে পার্ব্বত্য বন্ধুরতা উঠছে নামছে। রহস্যের পর রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে মেঘের সীমানায়। মহাকালের অনন্ত গতিবেগকে রোধ করে ধ্যানাতীত শিব শিলাভূত হ'য়ে আছেন হিমালয়ের কালজয়ী রূপে।

ছবিখানি শিল্পীর উৎকর্ষতার পরিচায়ক। রঙের সঙ্গে ভাব মিলে মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

কার্ডখানির অপর পিঠে দেবেশ বাবুর হাতের লেখা ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ।

এই সুন্দর ছবিখানির মধ্যে কি এমন রহস্য লুকানো থাকতে পারে, তা সত্যেন ভেবে পেল না। নানা প্রশ্ন তার চিন্তার স্নায়ুগুলিকে বার বার আঘাত করতে লাগলো। মনের বালুচর

ফেনিল হয়ে উঠলো। পিতার বুদ্ধির কোন বিকৃতি কোন দিন তার নজরে পড়ে নি। এই ছবিখানি তিনি যে কোন খেয়ালের বশে সযত্নে রেখে গেছেন, তা তো মনে হয় না। তবে? কি রহস্যের ইঙ্গিত এর মধ্যে লুকানো আছে তা যখন জানা নেই, এবং এই সামান্য ছবিখানি রেখে দিতে কোন কষ্ট কি বাধা যখন নেই তখন থাক্‌। হয়তো এই ছবিখানিই একদিন সবচেয়ে মূল্যবান্‌ হয়ে দেখা দেবে।

(ক্রমশঃ)

ছোটদের পাতা

সাম্যবাদ

বন্দে আলি মিয়া

(বনমধ্যে অশথ বৃক্ষছায়ায় পশু ও পক্ষিগণ সমবেত।)

শকুনী ঃ আমি শকুনী—পাখীদের রাজা। আমি আপনাদের ডেকেছি কেন জানেন?

কাক ঃ না মহারাজ, অপনার প্রধান মন্ত্রী হয়েও আমি সে বিষয় অবগত নই।

শকুনী ঃ বাজ পাখী, চিল, বৌ-কথা-কও, দোয়েল, কোকিল, হাড়িচাচা, ফিঙে, শালিক, বুল্‌বুলি, টুন্‌টুনি, পায়রা, বক, হাঁস, ঘুঘু সকলে এসেছে?

কাক ঃ হ্যাঁ মহারাজ!

শকুনী ঃ বেশ, বেশ। পশুদের মধ্যে কে কে এসেছেন?

কাক ঃ শেয়াল, বাঘ, হরিণ, বুনো গরু, বুনো ঘোড়া, হাতী—প্রধান প্রধান সকলেই প্রায় এসেছেন।

শকুনী ঃ উত্তম—উত্তম। আজকের সভায় আমরা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলে যে একত্র হতে পেরেছি তা খুব আনন্দের কথা। আমাদের অভিযোগ মানুষের বিপক্ষে।

কাক ঃ কা ক্‌ কা—কা ক্‌ কা, মানুষ অতি বেয়াড়া জীব, দেব তাদের শিক্ষা।

শকুনী ঃ মানুষেরা বনে-জঙ্গলে এসে খুশী-খেয়াল মত আমাদের হত্যা করছে। হাঁস, পায়রা, মুরগীকে তো ঘরে পুষে যখন তখন খাচ্ছে। বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক ভ্রাতাগণ মাঝে মাঝে

মানুষদের উচিত সাজা দিয়েছেন। ওঁদের মত আমাদের দাঁত নেই, নখ নেই, গায়ে শক্তি নেই। আমরা, পাখীরা, অতি নিরীহ জীব। মানুষদের দেখে আমরা উড়ে পালাতে পারি, কিন্তু পালাতে গিয়েও বিপদ্।

শৃগাল : ক্যা হুয়া—ক্যা-ক্যা হুয়া? পালাতে গিয়েও বিপদ্ আবার ক্যায়সা হুয়া?

শকুনী : শূন্য দিয়ে আমরা উড়্‌বো—সেখানেও এক দুষ্‌মন এসেছে।

বৌ-কথা-কও : কও কথা কও। কে দুষ্‌মন তাই কও?

শকুনী : উড়ো জাহাজ। এমন বিশ্রী বেমক্কা জিনিস জন্মে দেখি নি।

কোকিল : কুহু, কুহু, ঠিক-ঠিক। এমন ঘর্ঘর আওয়াজ যে আমার বসন্তের গানগুলোকে একদম মাটি করে দিয়েছে। গান গাহিলে আর শোনা নাহি যায়, দেশ ছেড়ে চলে যাবো ফাগুন যেথায়।

শকুনী : আমাদের অবাধ উড়্‌বার স্বাধীনতা আর নেই। মানুষেরা যেমন আমাদের জব্দ করেছে—তেমনি তাদের জব্দ করতে হবে।

ফিঙে : ক্যাঁচর—ক্যাঁচর—ক্যাঁচ—ক্যাঁচ, এমন রকম কষ্‌বো প্যাঁচ …

শকুনী : আসুন, আমরা পশুপক্ষী সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বলি, এই সভা মানুষদের অন্যায় ব্যবহারের নিন্দা করছে।

সকলে : এই সভা মানুষদের অন্যায় ব্যবহারের নিন্দা করছে।

শকুনী : আমরা যেরূপে পারি তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌বো।

সকলে : তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌বো।

বক : আমি বক—করি এক মন, এই কথা করি সমর্থন।

টুনি : আমি টুনা টুনটুনাই, সাত রাণীর নাক কাটাই।

বাজপাখী : আমি বাজ পাখী শিকারের রাজা, দেবো মানুষেরে সমুচিত সাজা।

চিল : আমি চিল; ভয় করি না কারুরে একতিল। ছোঁ মেরে আন্‌বো আমি ওদের কেনা মাছ, বোকা হয়ে থাক্‌বে চেয়ে,—কেমন মহারাজ?

ঘুঘু : আমি ঘুঘু, ডাকি ঘু—ঘু, ওদের ভিটায় চর্‌বো আমি দেবো মাথায় থুথু।

বাঘ : হম্—হালুম—হম্, আমি মানুষের যম।

শৃগাল : হুক্কা হুয়া—হুয়া—ক্যা—ক্যা—হো, ওদের ছাগল খাবো, মুরগী খাবো—কিছু রাখ্‌বো নাকো।

শকুনী : আজকের মত সভা ভঙ্গ হ'ল।

দৃশ্যান্তর

(গৃহস্থ-বাড়ীর খড়ের গাদার উপর মোরগ বসিয়া ছিল। তাহাকে দেখিয়া শৃগাল মনে মনে দুষ্ট অভিসন্ধি আঁটিয়া নিকটবর্ত্তী হইল।)

শৃগাল : মোরগ ভায়া, কী মিষ্টি ভাই তোমার গলা! একবার শুন্‌লে ভুল্‌তে পারা যায় না। একবার কঁ—কঁ—কঁ—কঁ—অ—অ— ব'লে ডাকো তো, শুনে কাণ জুড়াই। তোমার গায়ের রংটাই বা কি সুন্দর!

মোরগ : (স্বগতঃ) শেয়ালটার নিশ্চয় কোনো মত্‌লব আছে; শত্রুর মিষ্টি কথায় ভুল্‌তে নেই। (প্রকাশ্যে) কে? শেয়াল ভায়া! এসো—এসো, কি খবর?

শৃগাল : খবর খুব গুরুতর। আজ্‌কের মিটিংএ তুমি যাও নি?

মোরগ : মিটিং? কোথায়!

শৃগাল : ন্যাকা। বনের মধ্যে আজ পশুপক্ষীদের বিরাট মিটিং হয়ে গেছে।

মোরগ : নাকি? কি বিষয় হ'ল?

শৃগাল : স্থির হয়েছে, তুমিও যা—আমিও তাই,—আমরা সবে ভাই ভাই।

মোরগ : আমরা সবে ভা—ই ভা—ই! বেশ কথা।

শৃগাল : তুমি রাজী?

মোরগ : হুঁ, আল্‌বৎ, একশ'বার। আমরা পরস্পর বন্ধু।

শৃগাল : বন্ধু, তবে নেমে এসো আমার কাছে, কাণে কাণে শোনো একটা কথা।

(দূর হইতে কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ শোনা গেল।)

মোরগ : শুন্‌ছি।

শৃগাল : কুকুরও আমাদের বন্ধু।

মোরগ : হোঁৎকা কুকুর দু'টো এদিকেই আস্‌ছে। আমি ওদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

শৃগাল : এদিকেই আস্‌ছে? মাটি করেছে! (স্বগতঃ) নিজেরাই আমরা পরস্পর শত্রু—মানুষ তো ভিন্ন জাত, তাদের আর দোষ কি? কুকুর এলে আমায় আস্ত রাখ্‌বে না—এবার পালাই। (প্রকাশ্যে) উ হু-হু, পেটে হঠাৎ কামড় দিল মোরগ ভাই, আজ আসি। আর একদিন নয় বল্‌ব।

মোরগ : না, না, যেও না, কাণে কাণে কি কথা বল্‌তে চেয়েছিলে এক্ষুণি বলে যাও।

শৃগাল ঃ আজ নয় বন্ধু, আর একদিন হবে! (বলিতে বলিতে দূরে চলিয়া গেল।)

মোরগ ঃ ছুটে পালালে কেন স্যাঙাৎ! ধড়িবাজ শেয়াল, তোমার জোচ্চুরি আমি জানি।

যবনিকা

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে কলকাতার বালীগঞ্জ প্লেস্ অঞ্চলে একটি দুর্ঘটনার কথা বেরিয়েছিল। একটি ছেলে টেবল্ ল্যাম্পে একটা বাল্‌ব্ লাগাতে গিয়ে তড়িতাহত হয়ে মারা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছিল রামধনুরই গ্রাহক শ্রীহরিহর মজুমদারদের বাড়ীতে। এ সম্বন্ধে রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের সাবধান ক'রে তিনি এক চিঠিদিয়েছেন।

বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম নিয়ে (বিশেষতঃ এ.সি কারেণ্ট হ'লে) খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা উচিত। সুইচ্ বন্ধ না ক'রে কিছু করা উচিত নয়। সর্ব্বদাই একটা কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। ছোট ছেলেদের একা একা বয়স্কদের (এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের) অনুপস্থিতিতে কিছু করতে যাওয়া খুবই অন্যায়। রাত্রে ওতে হাত না দেওয়াই ভাল। পুরোনো ভাঁজ পড়া তার, বেড্ সুইচ, প্লাগ্‌পয়েণ্ট্ ইত্যাদিতে দোষ থাকলে তা থেকে যখন তখন বিপদ্ হ'তে পারে। এমন কি বাল্‌ব্ পরাতে গিয়েও সতর্ক না হ'লে দুর্ঘটনা হওয়া বিচিত্র নয়। যে ঘটনাটির কথা বলা হ'ল সেটিও ঐ ভাবেই হয়েছিল। অন্ধকার ঘরে মেঝেতে দাঁড়িয়ে কাজ করতে গিয়ে হোল্ডারে হাত আটকে যায় এবং এ.সি. কারেণ্ট থাকায় হাত আর টেনে খোলা যায় নি। কাছাকাছি কেউ ছিল না। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে যখন ছেলেটির খোঁজ পড়ল তখন আর কিছু করার ছিল না—কনুই পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেটির আত্মীয়স্বজনকে আমরা সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাদেরও এ সম্পর্কে সতর্ক হ'তে অনুরোধ করছি। —রাঃ সঃ

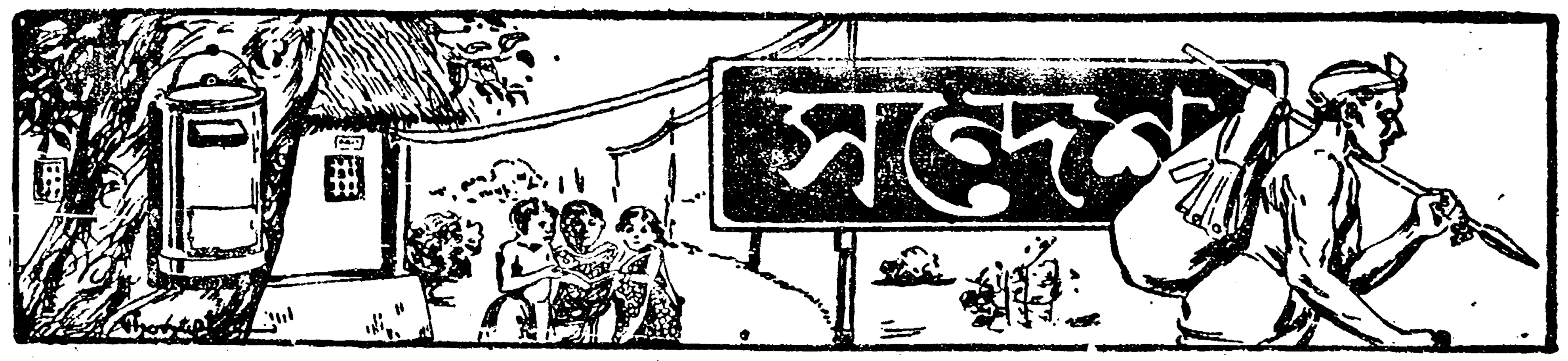

সম্প্রতি বোম্বাইএ পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলা শেষ হয়েছে। ফাইনালে হিন্দু দল অবশিষ্ট দলকে এক ইনিংস্ ও ৬১ রানে পরাজিত করেছে। এবারকার পেণ্টাঙ্গুলারের বিশেষত্ব—পর পর তিন বার রানের রেকর্ড্ ভঙ্গ। প্রথমে অবশিষ্ট দলের হাজারী সেমি ফাইনালে মুসলিম্ দলের বিরুদ্ধে ২৪৮ রান্ ক'রে নতুন রেকর্ড্ করেন। ফাইনালে হিন্দু দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট ২৫০ (নট্ আউট্) রান্ ক'রে সে রেকর্ড্ ভঙ্গ করেন। ঠিক তার পরেই হাজারী আবার হিন্দু দলের বিরুদ্ধে ৩০৯ রান্ ক'রে নতুন রেকর্ড্ সৃষ্টি করেছেন। অবশিষ্ট দল পরাজিত হ'লেও ভারতীয় ক্রিকেটে হাজারীর নাম স্মরণীয় হয়ে রইল।

* * *

রিপন্ কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় আর ইহলোকে নেই। মস্ত বড় পণ্ডিত এবং আদর্শ শিক্ষাব্রতী ব'লে তাঁর যেমন সুনাম ছিল, চরিত্রগুণেও তিনি ছিলেন তেমনি সকলের প্রিয়। তাঁর অভাবে শিক্ষাজগতের মস্ত একটা ক্ষতি হ'ল।

সম্প্রতি কলিকাতায় বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যর্ জন্ হার্ব্বার্টের মৃত্যু হয়েছে। কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর জায়গায় স্যর্ রাদারফোর্ড গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর।

* * *

মুন্সী বিলায়েৎ হোসেন বাঁকুড়া সিভিল্ কোর্টে কাজ করতেন। ১৮৭৩ সালে অর্থাৎ আজ থেকে সত্তর বছর আগে তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে এত দিন পেন্সন ভোগ করছিলেন। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল কত শুনবে? ১৩৬ বছর।

* * *

ইয়োরোপের যুদ্ধ মিত্রপক্ষের অনুকূলেই চলেছে। মিত্রপক্ষ ইটালীর ভিতর অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, ওদিকে রুশ বাহিনীও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য সহর পুনর্দখল করেছে। সম্প্রতি ইরাণের টেহেরেন সহরে রুজভেল্ট, চার্চ্চিল ও ষ্টালিনকে নিয়ে একটা সম্মেলনও হয়ে গেছে।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

গল্প হলেও সত্যি—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৵৹

মহাপুরুষদের জীবনের অনেক ঘটনা উপন্যাসের মতই মনোরম। ভারতীয় মনীষীদের জীবনী থেকে এই রকম কতকগুলি গল্প অথচ সত্যি ঘটনা সংগ্রহ ক'রে গ্রন্থকার দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এগুলি পড়ে সেই সব মহাপুরুষদের সমগ্রভাবে জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক এবং আজকের দিনে তারই প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। এদিক্ দিয়ে বইখানিকে শুধু সময়োচিত নয়, উল্লেখযোগ্যও বলতে হবে। লেখকের ভাষা সুন্দর এবং জীবন-কাহিনীকে গল্পের মত সরস ক'রে বলবার ক্ষমতাও তাঁর আছে। কাহিনীর সঙ্গে সেই সব মনীষীদের রেখাচিত্র থাকায় বইখানির আদর আরও বাড়বে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

জলকণা। জল—মেঘ—বৃষ্টি।

উত্তরদাতাদের নাম

অমিতাভ সেন (ধুবড়ী); প্রফুল্লবালা সাধু খাঁ (উত্তরপাড়া); সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); বিমলচন্দ্র দত্ত (শ্রীখণ্ড); অশোককুমার নাহার (দুমকা); অজিত. খুকু, জ্যোৎস্না, টকি, শিপ্রা, ডলি, গার্গী, সুজিত, খোকন, কালিনাথ, মীরা চক্রবর্ত্তী (খুলনা); নবেন্দু সেন (বালিগঞ্জ); উমা, রমা, শচীন, টুলু, মাষ্টার মশাই, অর্চ্চনা (নীলফামারী); সুব্রত, সুপ্রভাত, সুপ্রিয়া ও মঞ্জু বসু (ছাপরা); উৎপলা সরকার (পুরুলিয়া); রাজা ও মনু (মাধিপুরা); অতীন্দ্রনাথ দত্ত (তেজপুর); অজিতকুমার সেনগুপ্ত (গুঠিয়া); শীলা, অশোক, অমিয়, প্রভাত, অমিতাভ (বাঁকুড়া); সন্তোষ, কৃতেন্দ্র, মৃত্যুঞ্জয় ও অনুকূল (ছাতক); রতীন্দ্রদাস চৌধুরী, গোপেশ ভট্টাচার্য্য (হবিগঞ্জ); স্বাস্থবালা সিংহ (দেবীপুর); কিশোর লাইব্রেরীর সভাবৃন্দ (মহামুনি); অমিতকুমার ব্যানার্জ্জি (বারাসত); বরুণ, বেলা, খুচু, খোকন, অণিমা (মাধিপুরা); সরোজকুমার রায় (বন্দবিলা); চিন্ময়, জয়ন্ত ও অমিতাভ ঘোষ, (ভবানীপুর); আব্দুর রহমান চৌধুরী, প্রয়াগ ধর, রজতকান্তি দাস (সুনামগঞ্জ); অরুণিমা বসু (লাহোর); অনিন্দ্যকুমার মুখোপাধ্যায় (মধুপুর)।

নূতন ধাঁধা

বলাই বাবু দশ টাকা নিয়ে বাজার করতে বেরুলেন। ফলের দোকানে গিয়েই কিন্তু ঐ দশ টাকা খরচ হয়ে গেল। দেখা গেল, দশ টাকায় তিনি কলা, কমলালেবু, আম, আতা ও আপেল—এই কয় রকম মিলিয়ে মোট ১০০টি ফল কিনেছেন। একটি আতার যা দাম পড়েছে কলার দাম পড়েছে তার দ্বিগুণ, আপেলের চার গুণ, কমলা লেবুর ছয় গুণ এবং আমের পড়েছে আট গুণ। বলতে পার তিনি কোন্ ফল ক'টি ক'রে কিনেছেন এবং কোন্‌টার দাম কত পড়েছে ?

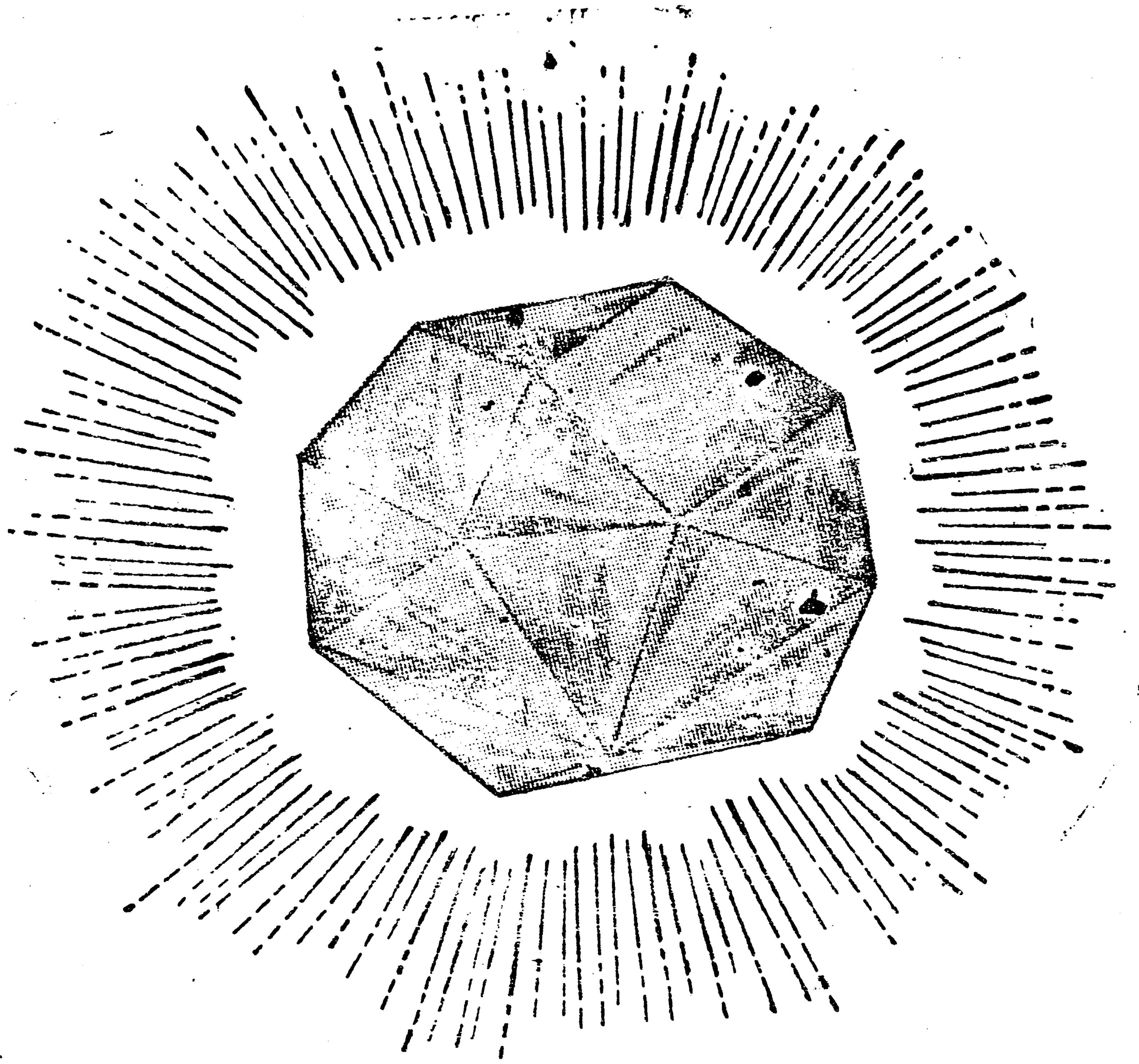

আপনার স্বাস্থ্য কি

অধিক মূল্যবান ?

'লক্ষ্মী ঘি'

স্বাস্থ্য অটুট রাখে

নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করে

বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৫০ { ১০ম সংখ্যা

তিনসুকিয়ায় ভ্রমণ

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি.)

বংশীবদন হঠাৎ সেদিন অংশুমালীর দাওয়ায় ব'সে
তিনসুকিয়ার গল্প বলে নস্যি ঠুসে নাসায় ক'সে ঃ
"দশটি সুড়ঙ্ পেরিয়ে এলুম সুরুৎ ক'রে রেলগাড়ীতে,
সাতটা হাতী গোঁত্তা মেরে লাফায় তখন পাহাড়-ভিতে।
তিনটে নাগার নাগ্‌রা জুতো আট্‌কে গেলো বাঘের থাবায়,
কুকীর ছেলে কুর্কী হাতে শালুক-বনে ভালুক নাবায়।

একটী ছোট ইষ্টিশনের ভীষণ মোটা টিকিট বাবু
বিকট হাঁ-এর হাই তুলিতেই চোয়াল ভেঙ্গে হ'লেন কাবু।
হাফ্‌লঙে সেই হোটেল-খানায় পটল-ভাজায় লঙ্কা-বাটা,
দু'বার খেয়েই শোবার যোগাড়, অবশ পা-টায় যায় না হাঁটা।
শালের বনে চাল-ভাজা আর কড়াইসুঁটির-সঙ্গে মধু
চড়াই ভেঙে আন্‌লে কিনে বাদ্‌লা দিনে জংলী বধূ।
গড়িয়ে গেল আমার গাড়ু দেবদারু-বন দেখ্‌তে গিয়ে,
গরম-জামায়-নরম মামার টিকির ডগায় বস্‌লো টিয়ে।
অজগরের রগড় ভারি হরিণ গেলার দুর্ঘটনায়,
শিঙের খোঁচায় পেট্‌টি ফটাস্! হায়না হেসে খায় দু'জনায়।
সেগুন গাছের অরণ্য আর বেগুন-ক্ষেতের বাহার দেখে
তিনসুকিয়ায় পৌঁছিনু শেষ তিনশো পাহাড় ডাইনে রেখে।
কোড্যাক্ ছিলো ক্যামেরা মোর, সখও ছিল তুলতে ফটো,
হঠাৎ শুনি মামা ডাকেন,—বংশীবদন ওঠো, ওঠো—,
চম্‌কে চেয়েই লম্ফ দিলুম! জল-প্রপাত চল্‌ছে ছুটি',
মাথার ওপর ঈগল পাখী প্রকাণ্ড সাপ গিল্‌ছে দু'টি!
গর্ব্ব ক'রে লাভ কি বলো, হয়ে গেলুম সর্ব্বহারা—
কিন্তু ছবি তুলবো আবার, ঈগলটাকেও করবো তাড়া!"
অংশুমালী অবাক্ শুনে। বংশী বলে, "সত্যি দাদা,
পাহাড়-পথে এক্কেবারেই নেইকো ধূলোয় পিছল কাদা;
নইলে কি আর জামায় আমার রইতো না দাগ ভাবছো বুঝি?
তবু যদি সন্দেহ হয়—বলছি তোমায় সোজাসুজি—
তিনসুকিয়ায় গিয়েছিলুম—য়্যাট্‌লাসে মোর আঙুল দিয়ে,
না হয় যাবো ভবিষ্যতেই—তোমায় শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে।"

ফসল আরো ফলাও!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচা বিরাট প্রতিভার পরিচয়। প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির প্রায় কাছাকাছি কিছু একটা বই কি! আমাদের বিনিও এই পাড়াগাঁর বাড়ীতে এসে, সংলগ্ন একটু পড়ো জমি পেয়ে কি করে' তাকে শাকশব্জীর বাগানের মত করে' বাগানো যায় দিনরাত সেই চিন্তায় আছে।

তারপর কাল একটা সরকারী ইস্তাহার এসে পৌচেছে—ফসল আরো বেশী করে' ফলাবার ইস্তাহার। আর সেই থেকেই আরো কাল হয়েছে। আরো বেশী সে তৎপর হয়েছে তার পরে।

এবং যা ভয় করছিলাম তাই। সকালের বেড়ানো শেষ করে বাড়ী ফিরে টেবিলের ওপরে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড দেখলাম। কাণ্ড এবং কারখানা। লেখার টেবিলে ফাউন্টেন্ আর আমার খাতার পাশাপাশি, খুরপি আর কোদালকে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

"এ সব কি? আমার কবিতার স্থলে কোদাল কেন? আমার গল্পের ওপরে খুরপি দেখচি যে!" ভয়ে ভয়েই আমি জিজ্ঞেস করি। পাণ্ডুলিপিদের দুর্দ্দশা দেখে নিজেই পাণ্ডুলিপি হ'য়ে যাই।

বিনি ফসল ফলানোর ইস্তাহারখানা আমার মুখের ওপর মেলে ধরে—"এটা পড়েছ দাদা?"

"পড়েচি। কিন্তু ফসলকে আরো ফলাও করা আমার কর্ম্ম নয়।" পাণ্ডুর মুখে বলি।

"ফসলের কাজই হচ্চে এখন দেশের কাজ। তুমি দেশের কাজ করতে চাও না?" বিনি আরো বেশি গম্ভীর হয়ে যায়।

দেশের কথায় একটু কাহিল হতে হয় বটে। আমি আম্‌তা আম্‌তা করি—"কত বড় দেশ! আর কতটুকু কোদাল! এবং কী যৎকিঞ্চিৎ আমি! নামমাত্র সার বল্‌তে গেলে! সারা দেশকে কি আমি চষে উঠ্‌তে পারবো? তুই বলিস্ কি?"

"হাতের কাছকাছি এই জমিটুকু তো ফলাতে পারো—তাই বা কম কি?" বিনি বাংলায়। "পারিব না এ কথাটি বলিয়ো না আর।"

হাতের কাছাকাছি বটে কিন্তু হাতখানেক জমি নয়, আমি দেখেছি। ক' বিঘে হবে কে জানে! তা ছাড়া, আকাশের মত জমিরও তো কিনারা নেই। জমির ওধারে আরো জমি আছে—তারও ওপারে, প্রায় দিগ্বলয় রেখার মতই সরে সরে গিয়ে আরো আরো জমি দেখা যাবে নিশ্চয়। একবার স্থরু করলে চষে কূল পাব না। আবার ভুলক্রমে হয়তো—জমিদারীর নেশা ধরতে কতক্ষণ? শেষটা কি জমি চষ্‌তেই জীবন কাট্‌বে?

বিনিকে সেই কথা বলি। "চাল না মেরে চাল বেচ্‌লে ঢের টাকা মেলে, তা জানো? লেখকের চেয়ে চাষীরা আজকাল বেশি রোজগার করে জানো তা?"—সরাসরি জবাব পাওয়া যায় ওর।

কথায় কোনো দিনই ওর সঙ্গে আমি পারি নে। কৃষিকাজ সারগর্ভ কাজ এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আগাগোড়াই ওর সার—প্রথমেই সার দিতে হয়, তা হলেই পরে আরো সারবান্‌ যত ফসল সব উঠ্‌তে থাকে। এক কথায় জমিবতী এই ধরিত্রীকে শ্রীভগবানের মতই সারাৎসার বলা চলে।

কিন্তু আসলে সারগর্ভ হলে কি হবে, ওই কাজের আনুষঙ্গিক—কোদাল, খুরপি প্রভৃতি থেকে স্থরু করে' লাঙল, হাল ইত্যাদি পর্য্যন্ত সব কিছুই বেশ ভারগর্ভ। এই কঠোর সত্যকে হস্তগত করে', হৃদয়ঙ্গম করতে করতে বাগানে গিয়ে হাজির হই। রীতিমত ভারিক্কি হয়েই বল্‌তে কি!

একটুখানি মাটি কোপাতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে যাই। এক হাত জিভ বেরিয়ে পড়ে। মাটির প্রকোপ কি সহ্য হয় আমাদের—এই দুর্ব্বল লেখকদের? ক্লান্তিতে সেইখানেই ভূমিসাৎ হয়ে ধরাশয্যা নেব কিনা মনে মনে ভাবছি, 'সরল কৃষিবিজ্ঞান' হাতে করে' সহাস্যবদনে বিনি এসে হাজির হয়।

বিনিকে আস্‌তে দেখেই আমি আর আমার খুরপি দু'জনেই কোপান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। মরিয়া হয়ে মাটি কোপাচ্ছিলাম। সহসা······একি! আমার নিদারুণ এক চীৎকার শোনা যায়। "য়্যাঁ—টাকাই তো!" চেঁচিয়ে উঠি আমি। বিনিও ঝুঁকে পড়ে আমার ওপরে। "দেখি দেখি?"

ধূলোমাটি লাগানো চক্‌চকে একটা টাকা আমার খুরপির মুখে উঠে এসেচে। টাকা—রাজার টাকা! "ত্যাখ্‌—ত্যাখ্‌।"

টাকা দেখে বিনিও চীৎকার ছাড়তে কসুর করে না।

"বেশ বোঝা যাচ্ছে এ জমিতে সোনা ফল্‌বে!" আমি বলি: "এখন থেকেই যখন রূপো বেরুতে স্থরু করেছে।"

"টাকাই তো! আসল টাকাই তো!!" বিনি উচ্ছ্বসিত হতে থাকে।

"মাটির তলায় পোঁতা ছিল। আগেকার লোকেরা মাটিতেই টাকা পুঁতে রাখত কিনা। ডাকাতের ভয়েই। তখন তো আর ব্যাঙ্ক ছিল না এখনকার মতো।"

"আরো আছে নিশ্চয়।" বিনি আন্দাজ পায়।

"আছেই তো! চার ধারেই ছড়ানো আছে। লুক্কায়িত ভাবে রয়েছে। কুপিয়ে তুলে নেয়ার অপেক্ষা কেবল। কাউকে বলিস্‌ নে এ কথা,—ঘুণাক্ষরেও না। আলিবাবার কথা মনে আছে তো? কেউ যেন টের না পায়। এবং আর কেউ যেন এ জমিতে হস্তক্ষেপ না করে। এ বেলা এই ধাক্কাতেই আমি কাহিল হয়ে পড়েচি, জমি কপ্‌চানোর অভ্যাস্‌ নেই তো! আকস্মিক অর্থলাভের আঘাতটাও বড় কম নয়। ও বেলায় উঠে আবার লাগা যাবে—আরো দশ বিশ বাইশ হাত যতটা পারি—জমিটার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে দেখা যাবে ফের।"

সটান্‌ গিয়ে শুয়ে পড়ি। জমিদারি থেকে জমাদারী—কিম্বা চৌকিদারিও বলা যায়। চৌকিতে গিয়ে জমা হই। এইটুকু জমি চষতেই কাতর হয়ে কাত হয়ে পড়তে হয়। তারপর যা প্রকাণ্ড একখানা ঘুম লাগাই তার তুলনা হয় না। স্বপ্নের ঘোরে আভাসের মত শুধু মনে পড়ে কারা যেন আমাকে স্নানের জন্যে সাধাসাধি করেছে, খাবার জন্যে তাড়া লাগিয়েছে, কিন্তু আমি কোন সাড়া দিই নি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, উঠে দেখলুম, চমৎকার সূর্য্যোদয়। সূর্য্যদেব আমার ওঠার আগেই আমার মুখাপেক্ষা না করেই এক বাঁশ উঠে পড়েছেন আকাশে।

কিন্তু এ কি, উঠ্‌তে গিয়ে সূর্য্যদেব শুয়ে পড়তে লাগলেন যেন! ভালো করে' চোখ রগ্‌ড়ে নিতে হোলো। তাই তো, ক্রমশঃই তো ভদ্রলোক নেমে যাচ্ছেন বলে' বোধ হচ্ছে! উন্নতির মুখেই এ হেন অবনতি—এমনটা বড় দেখা যায় না, অন্ততঃ সূর্য্যের বেলায় কখনো নয়।

আমি অবাক্‌ হয়ে বিছানায় বসে' সূর্য্যের এই কাণ্ড দেখ্‌ছি আর চেতাবনীর সেই বিপর্য্যয় এসে পড়ল কিনা ভেবে খুঁৎ খুঁৎ করছি, এমন সময়ে বিনি ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে এল। সূর্য্যের মতই তার মুখ চোখ লাল।

"জোচ্চুরির কি আর জায়গা পাও নি? শেষটায় আমার সঙ্গেও জোচ্চুরি?" বল্‌ল ও।

আমি সে কথায় কর্ণপাত না করে' সূর্য্যের বদ্‌খেয়ালের কারণ ওর কাছে জানতে চাইলাম। বল্‌লাম—"এ রকম তো কক্ষণো হয় না। আমার সারাজীবনে হতে দেখি নি। অবশ্যি আমার জীবন খুব বেশি দিনের নয়, ক' শতাব্দীই বা হবে! এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও অতি যৎসামান্য, কিন্তু এটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলেই আমার ধারণা হচ্ছে। আর যেমন আশ্চর্য্য তেম্‌নি বিচ্ছিরি! কলিযুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে না তো?" আমার সংশয়টাও প্রকাশ না করে' পারি না।

"এর ওপরে আবার আদিখ্যেতা !" বিনি ঝাম্‌টা দিয়ে ওঠে: "আধ হাত জমি কুপিয়ে কী আমার উনি কাজ করেছেন যে তার তাড়সে সারা দুপুরটা তো নাক ডাকিয়ে কাটালেন। এখন ভর্ সন্ধ্যেয় উঠে সূর্য্যোদয় দেখা হচ্ছে। ইস্ !"

"য়্যাঁ, তাই নাকি ? সকাল নয় তা হলে ?" সমস্তই এখন আমার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে আসে। প্রাতঃকালের সেই কৃষি-ক্রিয়ার ফলে সমাধি পদবাচ্য এই যোগনিদ্রার মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নেই, কিন্তু সেই কুরু-ক্ষেত্রের ধাক্কায় যে আমার জীবনে এতখানি ওলোটপালোট এসে যাবে তা কে ভেবেছিল ? অস্তে উদয়ভ্রমই তো নয় কেবল, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে আমার,—পশ্চিম দিকে সূর্য্যোদয় দেখছি ! বেহেড্ হয়ে যাবার বাকী কি আছে আর ?

"নিজের বোনের সঙ্গে চালাকি করতে লজ্জা করে না তোমার ?" বিনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: "মাটি খুঁড়ে উনি টাকা পেয়েছেন ! মিথ্যেবাদী জোচ্চোর কোথাকার !"

সূর্য্যের এই দুর্ব্ব্যবহার তখনো আমি সামলে উঠ্‌তে পারি নি—সূর্য্যের সম্বন্ধে আমার দূরদৃষ্টির অভাব নিয়ে চিন্তা করছি তখনো—তার ওপরে বিনির এই দুর্ব্বাক্য ! সমস্তই আমার কেমন গুলিয়ে যায়।

"আমার কী সর্ব্বনাশ তুমি করেচ, দেখবে এসো।" আমাকে ধরে ও টান মারে।

টানাটানিতে যেতে হয়। গিয়ে দেখি, শুধু বিনির নয়, সর্ব্বনাশ সারা বাগানটারই। এক বিঘৎ জমি উপড়ে আমি আর কি বৃহৎ যজ্ঞ করেছিলাম (আমার অযোগ্য হলেও তাতেই যথেষ্ট উপ্‌রি লাভ করেছি যদিও)—বিনি আজ সারা দিনে সমস্ত বাগানাটার—ক' বিঘে কে জানে—কোনোখানে খাম্‌চাতে বাকী রাখে নি। কলের ট্র্যাক্টর্ গড়্‌গড়্ করে' গড়িয়ে গেলে মাঠের যে দুর্দ্দশা দেখা যায়—আমার চারধারে সেই বিকল-করা দৃশ্য ! কেবল মাত্র বিনির বিনিময়ে এতটা হয়েছে ভাবতে পারা যায় না।

"এ কি, তুমি করেচ কি ?" সবিস্ময়ে আঁৎকে উঠি।

বিনির বকুনি থাম্‌তে চায় না। সারা বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজে (খুঁজে কিম্বা খুঁড়ে, কী যে বলে ওর গদ্‌গদ ধ্বনির থেকে বোঝা যায় না ঠিক—তবে দুটো কথাই প্রায় এক কথা এখানে) আর একটা টাকারও নাকি টিকি দেখা যায় নি। মাঝখান থেকে সেই মৃত্তিকালব্ধ টাকাটাও কে আবার তার আঁচল থেকে খুলে নিয়েছে। আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম, কে নেবে ? তারা না তো ?—ইন্‌কামের সমস্তটাই যারা ট্যাক্‌সের অন্তর্গত মনে করে ? কিম্বা ওটা ম্যাজিকের আউট্‌কাম্ নয় তো ? ম্যাজিকের টাকা বলে ওটাকে আমার মনে হয় এখন।

তা না তো কি, ওকে ঠকাতে কায়দা করে আগে লুকিয়ে রেখে তারপর হাতসাফাই করে টাকাটা বার করে' এনেছি নাকি ? ও বল্‌ছে যেমন !

"টাকার জন্য ভাবনা কিসের ?" আমি ওকে সান্ত্বনা দিই: "কৃষি-বীজ ছড়িয়ে দে এবার। (সকালে ঘুমোবার আগে সরল কৃষিবিজ্ঞানের কয়েক পাতায় একটুখানি চোখ বুলোতে পারা গেছল—তার জোরেই এ কথা বল্‌তে পারি।) কিম্বা ওর গর্ভে ছড়াছড়িও করতে পারিস্। টাকার ভাবনা কি ? ওই জমি থেকেই কত টাকা উঠে আস্‌বে, দেখে নিস্।"

ফসল আরো ফলাবার ইস্তাহারটা ওইখানেই পড়েছিল ভূঁয়ে। ধূলোমাটি লেগে মলিন মুখে পড়েছিল। সেখানা তুলে ধরে ওর মুখের ওপরে আমি মেলে ধরি।

নদীর জন্মকথা

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্.এস্-সি

তোমার গাঁয়ের কোল ঘেঁসিয়া যে নদীটি গাঁয়ের চিরসঙ্গীর মত দিনরাত বহিয়া যায়, মনে করিও না যে সে চিরকাল ধরিয়া ঐখান দিয়া অমনি করিয়া বহিয়া আসিতেছে। এমন সময় ছিল যখন তার কোন অস্তিত্বই ছিল না; শুধু তার নয়, এককালে তোমার ঐ গ্রামটিরই হয়ত কোন চিহ্ন ওখানে ছিল না।

তবে কোথা হইতে, কেমন করিয়া কবে ওরা ওখানে আসিয়া জুটিল ? সেই কথাই বলিতে বসিয়াছি।

বৃষ্টির ধারা পৃথিবীর টানে আকাশ হইতে ঝরিয়া মাটির উপর পড়ে। বৃষ্টিজলের কিছু অংশ বাষ্প হইয়া উবিয়া যায়, আবার বায়ুমণ্ডলেই ফিরিয়া যায়—আবার এক সময়ে বৃষ্টি হইয়া ঝরিয়া পড়িবার জন্যই। মাটি তার কিছু অংশ শুষিয়া নেয়,—মাটির উপর হইতে কিছু নীচে তা জমা থাকে; পুষ্করিণী, কূপ, নলকূপ ইত্যাদিতে আমরা সেই জলকে দেখিতে পাই। তাকে আমরা ভূজল বলি; আর অবশিষ্ট অংশ—প্রায় এক তৃতীয়াংশ—মাটির উপর দিয়া মাটির ঢাল বাহিয়া নীচের দিকে অর্থাৎ নদী, হ্রদ, খাল এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের দিকে যাইতে থাকে।

মাটির উপর দিয়া বহিয়া-যাওয়া এই জলই নদীর জন্মদাতা।

পৃথিবীর উপরের জমি, তার পাহাড়, পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে যেন চিরদিনের জিনিষ। কিন্তু তা মোটেই নয়। আমরা টেরই পাই না—সব জায়গার জমি, সে মাটিতে গড়াই হ'ক কি পাথুরিয়া পাহাড়ে জমিই হ'ক, চুপে চুপে তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

একদিকে যেমন এমনি করিয়া উঁচু জমির ধ্বংস হইতেছে, অন্য দিকে আবার তেমনি হিমালয়ের মত বিরাট পাহাড়ও কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া তিল তিল করিয়া সমুদ্রের মধ্য হইতে চুপিচুপি মাথা জাগাইয়া উঠিতেছে। হিমালয়ের উপর কত পাথরে শামুক গুগলি জাতীয় জীবের পাথুরিয়া খোলস (ফসিল) দেখা যায়; সে শামুক গুগলিরা সব সামুদ্রিক জীব। তারাই এখন সাক্ষী দিতেছে যে হিমালয়ের ঐ পাথর এখন দেখিতেছ বটে পাহাড়ের চূড়ায় ২০,২২ হাজার ফুট উপরে, এককালে সমুদ্রের তলায় পলি জমিয়া ঐ পাথরের উদ্ভব হইয়াছিল; খোলসগুলি সেই পলির সঙ্গে চাপা-পড়া তখনকার দিনের সেই সমুদ্রের জীব। অমনি করিয়া কত জায়গা সমুদ্রের উপর জাগিয়া ওঠে, কত জায়গা ধ্বসিয়া বসিয়া যায়, কত জায়গা ঠাসিয়া কোঁকড়াইয়া যায়। এ সব পৃথিবীর ভিতর একটা অস্বস্তির চিহ্ন। ভূমিকম্পে যখন মাটি ফাটিয়া, ধ্বসিয়া, বসিয়া যায়, বা ঠেলিয়া ওঠে, মাটির নীচে হইতে জল বালি কাদা ঠেলিয়া উপরে আসে, তখন ত' তোমরা স্পষ্টই দেখিতে পাও যে পৃথিবীর ভিতরটা অশান্ত। কেমন করিয়া, কি জানি তার কি লুকান শক্তি আছে, তারই ফলে এমনি করিয়া পৃথিবীর উপরটায় সে নিজেই নানা ওলটপালট ঘটায়।

পৃথিবীর ভিতরের এই শক্তির ফলে অতীত কালে অনেক সময় কোথাও কোথাও সমুদ্র-উপকূলে বিরাট এক এক খণ্ড জমি সমুদ্রের জলের বাহিরে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। সেই সদ্যোজাত জমির উপর যেই বৃষ্টির জল পড়িয়াছে, অমনি তার কিছু অংশ জমির উপর দিয়া ঢালের মুখে সমুদ্রের দিকে গড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছে। সমুদ্র-হইতে-জাগা জমি স্বভাবতঃ প্রায় সমতল; তা সত্বেও সামান্য কিছু বন্ধুরতা তাতে থাকিবেই। বৃষ্টির জল তাই সেই জমির যেখানে একটু নালির মত নীচু খাত আছে সেইগুলি ধরিয়াই বহিতে থাকে। প্রথমে নালিগুলি একেবারে নিতান্ত অল্প গভীর থাকিবে; ক্রমে নালিপথের আলগা মাটি বা পাথর-গুঁড়া ধুইয়া গিয়া নালিগুলি কিছু গভীর হইবে। সেগুলি তখনও পরস্পর ছাড়া ছাড়া থাকে এবং অল্প কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়াই ফুরাইয়া যায়; বৃষ্টির জল তাদের সম্পূর্ণ ভাবে ও সারা বছর ধরিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিবার মত যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না।

এই নালিগুলি ভাবী নদীর অঙ্কুর,—যেন ডিম ফাটিয়া পরে পাখী অর্থাৎ নদী প্রকাশ পাইবে।

ইহার পর বৃষ্টির জল যখনই সেই নালি বাহিয়া চলিতে থাকে, তার চলার বেগে সে নালির গায়ের মাটি ধুইয়া ক্ষয় করিয়া নালিটিকে গভীর আর চওড়া করিয়া তুলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট নালির ছোট ছোট জলধারাগুলি একটু একটু করিয়া বাড়িয়া পরস্পরে গিয়া মেশে। সেগুলির আলাদা অস্তিত্ব ক্রমশঃ লোপ পায়, আর তাদের বদলে কতকগুলি মাত্র বেশ দীর্ঘ জলের নালি বেশ সুস্পষ্ট নদী হইয়া দেখা দেয়।

এই সময় নদীর নালি বা খাতগুলি আরও গভীর হইয়া ভূমির উপর হইতে কিছু নীচে যেখানে "ভূজল" সঞ্চিত থাকে সেইখানে গিয়া পৌঁছায়। নদী তাই শুধু বৃষ্টির জল লইয়াই চলে না, ভূজল তাকে সারা বৎসরই পরিপুষ্ট করিয়া রাখে। তখনই সে দস্তরমত নদী হইয়া দাঁড়ায়। আগের যে নালি ধরিয়া নদীর সূত্রপাত হইয়াছিল সেগুলি তখন যথার্থ উপত্যকা বলিয়া পরিচিত হয়।

নদীর জন্ম এমনি করিয়া হয়। তখন সে তরুণ থাকে; তার গতি থাকে তীব্র; সে জমির ঢাল বাহিয়া সোজাসুজি পথে সমুদ্রে যাইতে চায়; সামনে সামান্য উঁচু জমি যা পড়ে তাকে ভাঙ্গিয়া ক্ষয় করিয়া চলাই তার স্বভাব।

তবে চিরদিন এমনটি সে থাকে না। ক্রমে তার উপত্যকার মধ্যে বা আশে পাশে জমির যতটুকু অসমতলতা আগে ছিল তা সব কমিয়া জমি সমান চৌরস হইয়া আসে, নদীর খাত তখন চেপ্টা ও ছড়ান হইয়া পড়ে; নদীর গতি ক্রমে ধীর হইয়া যায়, আর সামনে অল্প বাধা পাইলেই নদী বাঁকিয়া অন্য পথে চলে, তার গতি সাপের গতির মত আঁকাবাঁকা হইয়া পড়ে। তখন নদী বুড়া হইয়াছে।

নদী যে শুধু এমনি করিয়া সমুদ্র-উপকূলের নতুন-জাগা জমিতেই জন্মলাভ করে তা' মনে করিও না। পৃথিবীর উপরে যেখানে সেখানে অমনি করিয়া নতুন করিয়া উঁচু জমির সৃষ্টি হইতে পারে, পুরানো জমির ঢাল বদলাইয়া যাইতে পারে, এমনি সব ক্ষেত্রেই নতুন নদীর জন্ম হইতে পারে। জন্মের সময়ে সব নদীই প্রায় এমনি করিয়া গতি সুরু করে। পৃথিবীর ভিতরের যে অশান্ত একটি শক্তির কথা বলিয়াছি, সেই শক্তিই নতুন দেশ জাগাইয়া তোলে বা কোন দেশকে অন্য ঢালে গড়িয়া তোলে; তখনই বৃষ্টির জল সুবিধা পাইয়া নতুন নতুন নদী সৃষ্টি করিতে বসে। বৃষ্টির জলই নদীর প্রাণ সঞ্চার করে, তবে "ভূজল" না হইলে নদী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীর নদী মাটি মায়ের জল না পাইলে কি বাঁচে!

কবিতা-কণা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্. এ, বি. টি

বন্ধু বৈরী যাই কেন হোক্—নীচমনা জন থাক্ তফাৎ,
শীতল কয়লা ময়লা জমায়, তপ্ত হ'লে সে পোড়ায় হাত।

‘রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর’

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

দ্বিতীয় কাণ্ড

সত্যেন চমকে উঠলো।

এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে জানালো—নমস্কার!

—নমস্কার!

—আপনিই সত্যেন বাবু? শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী?

—হ্যাঁ। কি বলতে চান বলুন?

—আমার নাম রবি ঘোষ। আমি পুরানো আসবাব্-পত্তর কেনা বেচা করি, শুনলাম এই বাড়ীর সব ফার্নিচার আপনি বিক্রী করবেন, তাই…

—আপনি শুনেছেন! কি করে শুনলেন? কে বললে আপনাকে?

সত্যেনের বিস্ময় বড় কম হোল না। কাল বিকালে পিতার শেষ চিঠি সে পড়েছে, কারুর কাছে মুখ ফুটে এখনও কিছু বলে নি, অথচ এই অচেনা লোকটী জানতে পারলো যে এখানকার সব ফার্নিচার বিক্রী হবে!

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—দেবেশ বাবুই আমাকে বলেছিলেন।

—বাবা বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। ক'দিন আগে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন পুরানো ফার্নিচার বেচে নতুন ডিজাইনের সব ফার্নিচার তৈরী করাবেন। কথাবার্ত্তা এক রকম প্রায় সব ঠিকই হ'য়ে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, তিনিও ইতিমধ্যে মারা গেলেন। তাই আজ একবার খবর নিতে এলাম আপনি বেচবেন কি না।

সত্যেন এবার একটু গম্ভীর ভাবে বললে—বেচতে পারি তবে এখনও কিছু স্থির করি নি।

—যদি বেচার ইচ্ছা থাকে তা হলে এখনকার দিনেই বেচা ভালো। এখন যুদ্ধের বাজার, ভালো দাম পাবেন। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, লেকের সামনে আপনাদের এই বাড়ীতে এই সব সেকেলে ফার্নিচার মানায় না। সব আপ্-টু-ডেট্ নভেল্‌টি আনাবেন, ঝল্‌মল্ করবে, ঘরের চেহারা যাবে বদলে…

—ভালো দাম মানে? কি দাম পাব বলুন তো?

—ভালো দামই দেব আপনাকে। অপনার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা।

তখনই রাজী হলে পাছে ভদ্রলোকের উৎসাহ কমে যায় তাই সত্যেন বললে—আচ্ছা, ভেবে দেখি, আপনি সাত-আট দিন পরে আসবেন।

—সাত আট দিন! বড় বেশী দেরী হয়ে গেল। আমার হাতে এখন একজন খদ্দের রয়েছে, সে অন্য কোথাও চলে গেলে আবার একজন বড় পার্টি পেতে দেরী হবে। তার উপর যা বোমার হাঙ্গাম, হয়তো এর পরে আর কেউ ফার্নিচার কিনতেই চাইবে না। তাই বলছিলাম যা করতে চান দু'-একদিনের মধ্যে ঠিক করুন।

সত্যেন বললে—বেশ, তা হলে আপনি দিন দুয়েক পরেই আসবেন।

কথা এখানেই শেষ হোল বটে কিন্তু রবিবাবুর উঠে পড়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তিনি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। বল্লেন,—আপনার কাছে আমি নতুন বটে কিন্তু দেবেশ বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল বহু দিনের। কত ফার্নিচার, বাড়ী, মোটর গাড়ী বিক্রী করেছি আধাআধি বখরায়। এখনও তো একখানা বাড়ীর কথা চলছিল, এ ভাবে মারা যাবে জানলে…সবই ভগবানের ইচ্ছা…

সত্যেন বললে,—বাবার সঙ্গে আপনার অনেক দিনের পরিচয় ছিল?

—অনেক দিনের, অনেক দিনের। সেই ছেলেবেলা থেকে। আমরা দু'জনে একই ইস্কুলে একসঙ্গে পড়তাম, তারপর এক কলেজে। তারপর যখন কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখালাম সেও দু'জনে একসঙ্গে। জেলও হয়েছিল একসঙ্গে। পাশাপাশি ঘরে আমাদের আফিস ছিল, দিনে দশবার তার সঙ্গে আমার দেখা হ'ত। বাড়ীতে তো আসতাম না, তাই তুমি আমাকে চেনো না।

—দেখুন, তা হলে আপনাকে একটা কথা বলি, আমি এই বাড়ীখানাও বেচে দেব…

—এই বাড়ীখানা? নতুন করকরে বাড়ী দেবেশ কত সখ করে তৈরী করালো আর তুমি এটা বিক্রী করে দেবে!

—টাকার দরকার যে! ব্যাবসা করব।

কিন্তু টাকার জন্য এ বাড়ী বেচা ঠিক হবে না।

কিন্তু বেচলে এখনই বেচা উচিত, যুদ্ধের বাজার, দাম বেশী।

—কিন্তু বাবা, এর মধ্যে আর একটী কথা আছে।

সত্যেন জিজ্ঞাসু ভাবে মুখ তুললো।

রবিবাবু একটু থামলেন, কি যেন কি ভেবে নিলেন, তারপর বললেন—বাড়ীটি ঠিক দেবেশের একার তো নয়, দলিল-টলিলগুলো যদিও সবই ওর নামেই হয়েছে…

—তার মানে ? সত্যেন জিজ্ঞেস করলো,—আপনার কথাটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

দেবেশের কোন চিঠিপত্তর তুমি এখনও পাও নি ? তার একখানা উইল লেখা আছে বলে শুনেছি, খুঁজে দেখো দিকি, তাতে সবই লেখা আছে···

—কিন্তু তেমন তো কিছু আমি এখনও পাই নি। শেষ চিঠি যা পেয়েছি তাতে শুধু একখানি ছবির কথা আছে—এক পোষ্টকার্ড।

—সেইটাই যত্ন করে রেখো, তাইতেই হয়তো সব কিছু আছে···

—সে দেখে বোঝা আমার পক্ষে কঠিন, তার চেয়ে সেটা বরং আপনাকে দেখাই, আপনি তো অনেক কিছু জানেন, আপনিই সেটার একটা ভাষ্য করে দিয়ে যান না কেন ?

—আমি ! তা সে ছবি তুমি আমাকে দেখাতে পার, তবে আমি যে ঠিক মত তা বুঝতে পারবো তা তো মনে হয় না। ও বিষয় সব কথা জানে শৈলেন, কিন্তু তাকে তো এখন পাওয়া যাবে না···

—কেন, তিনি এখন কোথায় আছেন ?

তখনই কথাটির জবাব না দিয়ে সত্যেনের মুখের পানে তাকিয়ে রবি বাবু আবার কি যেন ভেবে নিলেন, তারপর কিছু বলার আগেই জন চারেক লোক হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকলো, বললে—মাপ করুন স্যর, সাইরেন—

সত্যেন চমকে উঠলো, বললে—সাইরেন ? কই, আমরা তো শুনতে পাই নি !

—আপনারা হয়তো অন্যমনস্ক ছিলেন, সেই জন্যই শুনতে পান নি। এ-আর-পির লোকেরা সব আমাদেরকে এই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়ে দিল।

রবি বাবু হতাশ ভাবে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন, বললেন—তাই তো, আমার খুব জরুরী দরকার ছিল·

—আমাদেরও কম দরকার ছিল না। কিন্তু এখন করি কি বলুন তো ?

বক্তার মুখের পানে এবার রবি চোখ তুলে তাকালো, পরিচয়ের সঙ্কেত ফুটে উঠলো মনে. বললে—আরে শশধর ! তুমি এখানে ?

—তুমি তা হলে আমাকে চিনতে পেরেছ ?

—তোমার সঙ্গে কত দিন কাজ করলাম, আর আজ চিনতে পারবো না ?

—আমি ভেবেছিলাম, পারবে না।

—তা তুমি এখন কি করছ ?

—তোমাদের পিছনে ঘুরছি টাকার ধান্দায়।

—তার মানে ?

—মানে একজন মরেছে, একজন জেলে আছে, বাকী শুধু তুমি আর আমি। আমি সব ঠিক-ঠিক জানি না, তুমি জান। তুমি যদি সেই হদিস আমাকে বাৎলে দাও তা হলে অমি আধা-আধি বখরা করতে রাজী আছি।

—কিন্তু তুমি জান, আমি বখরাদারিতে রাজী নই, কেননা ও পয়সা আমাদের কারুর নয়, ও টাকা সঙ্ঘের নামে···

—ও সব সঙ্ঘ-টঙ্ঘ ছাড়, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি আগে বাঁচি, তারপর সঙ্ঘ···

—সেই জন্যই বুঝি তুমি দলবল নিয়ে এখানে এসেছ ?

—হ্যাঁ। তোমাকে এখন যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আজ আমি একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

—যদি আমি না যাই ?

—তোমার যাওয়া না যাওয়ায় কিছু যায় আসে না; আমরা তোমায় নিয়ে যাব।

—বেশ, আমি যাব না।

শশধর ইঙ্গিত করলো, লোক তিনজন এগিয়ে গিয়ে রবিকে চেপে ধরলো।

সত্যেন লাফিয়ে উঠলো,—এ কি অন্যায় কথা ! আমার বাড়ী থেকে এঁকে তোমরা জোর করে ধরে নিয়ে যাবে আর···

শশধর আচম্বিতে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলে সত্যেনের চোয়ালের উপর। সত্যেন ঘুরে পড়ে গেল, আর উঠলো না।

গুণ্ডারা রবিকে জোর করে ধরে নিয়ে বেরিয়ে গেল; এমন ভাবে তার মুখখানি চেপে ধরলো যে বেচারা একটু চীৎকার করতেও পারলো না। বাইরে মোটর অপেক্ষা করছিল, তুলে নিল তার মধ্যে।

(ক্রমশঃ)

বিরাট সাগর যে নাচ নাচে ঢেউএর ছলে,
ঝরণাধারা যে গান গাহে পাহাড়-তলে,
যে হাসি ওই হাস্‌ছে আকাশ সকাল, সাঁঝে,
জাগুক সে নাচ, সে হাসি, গান আমার মাঝে।

শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী

কর্ণেল স্বরেশ বিশ্বাস

অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্যাল, এম্.এ

স্কুল ও কলেজে পড়িয়া পড়িয়া বেঁকে গেছে শির-দাঁড়া,
ঠুলি-আঁটা চোখে লতাইয়া চলে—কৃষ্টি সৃষ্টি-ছাড়া।
নয়নে নাহিক তুরশার নেশা, যৌবনে বুড়া যেন—
কিন্তু বচনে কামান ছুটায়; কে কোথা দেখেছে হেন?
ছেঁদো কথা আর ধেরো ভাব নিয়ে জাবর কাটিয়া সুখে
অলস বিলাসে গোঁয়ায় দিবস, নাহি চাহে সম্মুখে।
কর্ম্মমুখর বৃহৎ জগৎ হাতছানি দিয়ে ডাকে,
মোহ-ঘোরে, হায়, হ'য়ে অচেতন তবু চিনিল না তাকে!

আজ হ'তে আশী বছরেরও আগে নদীয়ারি নাথপুরে
জনমিল এক অশান্ত শিশু, নাম তার দেশ যুড়ে।
ছোট কচি বুকে অমিত সাহস, যুড়ি তার নাহি মেলে,
সাপের ফণারে সাপটিয়া ধরে ডাঁটো, ডান্‌পিটে ছেলে।
কেতাবী বিদ্যা শেখে নি সে বেশি, শেখে নি চাতুরী-কলা,
মুখে এক আর কাজেতে অন্য, টেনে বলা, বেঁকে চলা।
ঋজু-উন্নত সুঠাম গঠন, হৃদয় বজ্রসার;
সাহসে অটল, রণে দুর্বার, তুলনা নাহিক তার!

বাঙালীর চির-ভীরুতার গ্লানি মুছাল সগৌরবে,
তরুণ যাত্রী লভুক প্রেরণা স্মরণ-মহোৎসবে।*

---

* গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে শান্তিপুরে বীর যোদ্ধা সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের ৩৮ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পঠিত।

আমাদের অজানা বন্ধু

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

আমেরিকায় টেক্‌সাস্ বলিয়া একটা জায়গা আছে তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ঐ সহরের প্রান্তে জনৈক ডাক্তার বাস করিতেন। পেশা ডাক্তারী হইলে কি হয়, ভদ্রলোকের বাগ-বাগিচার সখও বড় কম ছিল না। সখের বাগানের জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম ও তেমনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।

একদিন ডাক্তার সাহেব ডারউইনের লেখা একখানি বই পড়িতেছিলেন। ডারউইন সাহেবের নামও তোমাদের নিশ্চয়ই অজানা নয়। 'ক্রমবিবর্ত্তন বাদ' আবিষ্কার করিয়া যিনি বিজ্ঞান-জগতে অমর হইয়া আছেন তাঁরই কথা বলিতেছি। ডারউইন সাহেব কীটপতঙ্গ লইয়াও কম গবেষণা করেন নাই, আর এ বইটিও ছিল কীটপতঙ্গেরই সম্বন্ধে। পড়িতে পড়িতে ডাক্তার সাহেব একটা অদ্ভুত তথ্য সংগ্রহ করিলেন। কেঁচোর কথা লিখিতে গিয়া ডারউইন লিখিয়াছেন—"কেঁচো জমির পক্ষে পরম উপকারী বন্ধু—গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ইহারা প্রভূত সাহায্য করে।"

ডাক্তার সাহেবের প্রচণ্ড কৌতূহল হইল—ব্যাপারটা সত্য কিনা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তখনই পরীক্ষার আয়োজন করা হইল। প্রথমে আটটি টব লইয়া তার চারটিকে লাল এবং চারটিকে সবুজ রং করা হইল। ডাক্তার সাহেব লাল টবগুলির মাটী হইতে কৌশলে সমস্ত পোকা বাহির করিয়া লইলেন, আর সবুজ টবগুলির ভিতর ছাড়িয়া দিলেন কয়েকটি করিয়া কেঁচো। তার পর সেই টবের সবগুলিতেই ঠিক এক রকমের গাছ বসাইয়া দেওয়া হইল। কয়েক দিন পরেই দেখা গেল সবুজ টবগুলির গাছে বেশ সতেজে বাড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু লাল টবের গাছগুলি তেমনটা হয় নাই। বরঞ্চ তার কয়েকটিতে আবার পোকা ধরিয়া গাছের অবস্থা কাহিল করিয়া তুলিয়াছে। ডারউইন সাহেব তা হইলে ভুল বলেন নাই।

এইবার ডাক্তার সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, এই অভিনব পদ্ধতিটিকে কৃষির ক্ষেতে কি করিয়া কাজে লাগান যায়। সহজে ছাড়িবার পাত্র তিনি ন'ন, নানা ভাবে চেষ্টা চলিতে লাগিল। প্রথমেই তিনি কেঁচোর বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দেখা গেল তেলাল—অর্থাৎ স্নেহযুক্ত পদার্থ খাইতে দিলে কেঁচোর বংশ খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে। এই ভাবে অল্প দিনেই প্রচুর পরিমাণে কেঁচো সংগৃহীত হইল। তিনি তখন সেগুলি তাঁর বাগানের চারদিকে ছড়াইয়া দিলেন।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেল বাগানে কে যেন যাদুর কাঠি ছোঁয়াইয়া দিয়াছে! গাছগুলি যেন হঠাৎ নতুন জীবন লাভ করিয়াছে! কেঁচো গাছের কি কি সাহায্য করে সে সম্বন্ধে

তাঁর ডায়েরী হইতে খানিকটা তুলিয়া দিতেছি: "প্রথমতঃ—ফুল এবং ফলগুলি আকারে অনেক বড় হয়। দ্বিতীয়তঃ—গাছের ফসল ফলাইবার শক্তি অদ্ভুত রকম বাড়িয়া যায়,—গাছগুলি ভারী সতেজ হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ—পোকামাকড়ের উৎপাত হইতেও গাছগুলি রক্ষা পায়।"

এখন কথা হইতেছে, কেঁচোর মত একটা সামান্য প্রাণী কি ভাবে গাছের সাহায্য করে?

কেঁচো জমির তলায় বাস করে, এবং সময় সময় জমির পাঁচ বা ছয় ফুট নীচে গর্ত্ত করিয়া চলিয়া যায়। এখন, কেঁচোর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিতে অনুরূপ গর্ত্তের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। গর্ত্তগুলি থাকাতে সুবিধা এই যে মাটীর নীচেটা ৫।৬ ফুট পর্য্যন্ত খুব সরস থাকে, বাগানে জল সরবরাহ করার পরিশ্রম অনেক কমিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, গর্ত্তগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাছের শিকড়গুলিতে অক্সিজেন জোগায়, ফলে গাছের জীবনীশক্তি বাড়ে। কেঁচোরা মাটী, শুকনো পাতা ও পচা জিনিষ খাইয়া জীবন ধারণ করে, আর শরীরের ভিতরকার যন্ত্রগুলির সাহায্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অতি চমৎকার এক রকম মাটী তৈরী করিয়া বাহির করিয়া দেয়। জমিতে বিশেষ পরিমাণে সার বা জল না দিলেও এক কেঁচোর সাহায্যেই জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ানো চলে;—শুষ্ক, অনুর্ব্বর জমিতেও কেঁচোর চাষ করিয়া প্রচুর ফসল ফলান যাইতে পারে।

যে কেঁচোকে দেখিলে তোমাদের অনেকেই হয়তো ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর সে আমাদের এত বড় বন্ধু ভাবিলেও আশ্চর্য্য লাগে না কি?

কুমারজীবের চীনযাত্রা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার কথা। বৌদ্ধ ধর্ম্ম তখন ধীরে ধীরে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। তিব্বত, চীন, অফগানিস্থান, তাতার,—এমন কি সুদূর পারস্যেও ভগবান্ বুদ্ধের মতাবলম্বী লোকের অভাব নেই। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা দিকে দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। ভারতের ইতিহাসে সে এক গৌরবময় যুগ।

তিব্বতে খুৎশী ব'লে একটা জায়গা আছে, সেইখানে তখন কুমারজীব নামে এক ভারতীয় ভিক্ষু বাস করতেন। ভিক্ষু অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কুমারজীব যেমন ছিলেন বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,

তেমনি সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, চীনা প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষায়ও ছিল খুব দখল। তিব্বতের লোকেরা তাঁকে পরম পণ্ডিত ব'লে খাতির করত।

এই সময়ে চীনের সম্রাট্ ছিলেন হিয়ান ইউ। সম্রাট্ নিজে ছিলেন বুদ্ধদেবের পরম অনুগত; শুধু অনুগত নয়, চীনদেশে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। শোনা যায় তাঁর সময়ে এবং অনেকটা তাঁরই চেষ্টায়, চীনের শতকরা নব্বই জন লোকই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সম্রাটের ইচ্ছা হ'ল চীনের নিতান্ত সাধারণ লোকটিও যাতে বুদ্ধের অমৃতময় বাণীর মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা তিনি করে যাবেন। আর বুদ্ধদেবের দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ, কাজেই এ কাজে সাফল্য লাভ করতে হলে সকলের আগে দরকার ভারতীয় পণ্ডিতদের চীনে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করা।

তিব্বত অত্যন্ত দুর্গম হ'লেও ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে তিব্বতে আসতেন, এবং অনেকে সেখানেই থেকে যেতেন। সম্রাট্ হিয়ান ইউএর কানেও এ সংবাদ গিয়েছিল। তিনি তাই ঠিক করলেন সোজা ভারতবর্ষে লোক না পাঠিয়ে তিব্বত থেকেই তিনি ভারতীয় পণ্ডিত আনিয়ে নেবেন। চীন থেকে একদল লোককে তিব্বতে পাঠান হয়েছিল, তাদের বলে দেওয়া হ'ল, এ রকম পণ্ডিত কাউকে তিব্বতে পেলে তাঁকে যেন চীনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তিব্বতে তখন কুমারজীবের পাণ্ডিত্যের ভীষণ খ্যাতি। চীন-সম্রাটের লোকেরা খোঁজ-খবর নিয়ে কুমারজীবকেই চীনে যেতে আমন্ত্রণ করল। কুমারজীব সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না।

৪০৮ খৃষ্টাব্দের এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে কুমারজীব পায়ে হেঁটে চীন দেশে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গী হ'লেন বিমলাক্ষ নামে আর একজন পণ্ডিত। তখনকার দিনে পথঘাট এত ভাল ছিল না। তার ওপর তিব্বত থেকে সোজাসুজি চীনে যাওয়ার পথটা ছিল আবার ভীষণ দুর্গম। কিন্তু সে বাধা কুমারজীবকে আটকে রাখতে পারল না।

কুমারজীবের এই চীনযাত্রার কাহিনী ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। কী প্রচণ্ড কষ্ট আর বাধাবিপত্তি তুচ্ছ ক'রে তাঁকে প্রতিটি পদ অগ্রসর হতে হয়েছিল তার কাহিনী শুনলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। অজানা দেশ, অজানা পথ, সামনে কখনও বা দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়, কখনও বা সীমাহীন মরুভূমি! আশ্রয় নেই, খাবার নেই, এক ফোঁটা জল পাবারও উপায় নেই। যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণ হারাবার আশঙ্কা রয়েছে! এমনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। তাঁর সঙ্গী বিমলাক্ষ পথের এ ক্লেশ সহ্য করতে পারলেন না, চীনে পৌছেই তার মৃত্যু হ'ল। কুমারজীব ভগবান্ বুদ্ধের নাম স্মরণ ক'রে একা গিয়ে চীন-রাজধানীতে হাজির হ'লেন।

বলা বাহুল্য সম্রাট্ হিয়ান ইউ কুমারজীবকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গেই অভ্যর্থনা করলেন। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে কুমারজীব চীন-সভাতেই স্থায়ী ভাবে রয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর কাজ হ'ল নানা বৌদ্ধশাস্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করা। আগেই বলেছি কুমারজীব নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, শীঘ্রই এ কাজে তার পরিচয় পাওয়া গেল। এক এক ক'রে তিনি তিনশ'খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করলেন। সে অনুবাদ নাকি এত প্রাঞ্জল আর সহজবোধ্য হয়েছিল যে নিতান্ত সাধারণ লোকের পক্ষেও তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে কোন কষ্ট হ'ত না। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। শোনা যায় তাঁদের সংখ্যাও সাত-আটশ'র কম হবে না।

চীন দেশে কুমারজীবের প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। সে সময়কার বহু বড় বড় চৈনিক পণ্ডিত এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত পর্য্যটক ফা হিয়ানও একজন। যারা ভারতের ইতিহাস পড়েছ তাদের কাছে এ নাম নিশ্চয়ই অপরিচিত নয়।

তিন সাধুর কাহিনী

(টলষ্টয় হইতে)

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

নীল সমুদ্রের বুক চিরিয়া তর্ তর্ করিয়া জাহাজ চলিয়াছে। হঠাৎ দেখা গেল জাহাজের একদল লোক দূরে অস্পষ্ট আলোয় কি যেন দেখিতেছে। জাহাজের আরোহীদের মধ্যে একজন নাম-করা বিশপ্ (পাদ্রী) ছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল হইল। খোঁজ লইয়া শুনিলেন, জাহাজ এখনই একটা ছোট্ট দ্বীপের পাশ দিয়া যাইবে। সেই দ্বীপে থাকেন তিন জন সাধু; দিবারাত্র সাধন-ভজন লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন, অন্য কোন দিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। ঐ দ্বীপে তাঁহারা ছাড়া আর কোন লোকও নাই। কিন্তু আশপাশের অন্য জায়গার লোকেরা সাধুদের ভারী ভক্তি করে। এবং তাহারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সপ্তাহে ২।৩ বার নৌকায় করিয়া আসিয়া সাধুদের খাদ্যাদি পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। সাধুরা কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করেন না, কিন্তু তাঁহাদের কোন অভাবও ঘটে না।

সাধুদের কথা শুনিয়া বিশপ্ মহাশয়ের তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার ভারী ইচ্ছা হইল। জাহাজটি অবশ্য ঐ দ্বীপে কখনও দাঁড়ায় না, কিন্তু অত বড় একজন পাদ্রী সাহেবের কৌতূহলের কথা শুনিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন ঘণ্টা ২।৩এর জন্য জাহাজখানি সেখানে ভিড়াইতে রাজী হইলেন।

জাহাজ দ্বীপে দাঁড়াইল। বিশপ্ দূর হইতে সমুদ্রতটে তিন জন লোককে নিশ্চল ভাবে আসীন দেখিলেন। তাঁহার নৌকা যখন সাধুদের কাছে পৌঁছিল তখন তাঁহারা উঠিয়া বিশপ্ মহাশয়কে পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিশপ্ তাঁহাদের ভদ্র ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইলেন ও তাঁহাদের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। বড় সাধুটি বলিলেন, "আমরা মূর্খ লোক, বেশী পড়াশোনাও করি নি, মন্ত্র বা সাধন-পদ্ধতি বিশেষ কিছুই জানি না। আমরা শুধু প্রার্থনা করি, হে প্রভু, তোমরা তিন জন, আমরাও তিন জন। তোমরা আমাদের মঙ্গল কর।"

বিশপ্ বুঝিলেন, সাধুরা সৎ লোক বটে কিন্তু খৃষ্ট-ধর্ম্মসম্মত সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। তিনি সাধুদের সে কথা বলিলে তাঁহারা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিশপ্ তাঁহাদের অতি কষ্টে ঠাণ্ডা করিয়া খৃষ্টীয় সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। শেষে একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন। কিন্তু সাধুরা সে মন্ত্র উচ্চারণই করিতে পারেন না। বিশপ্ তখন অনেক ধৈর্য্য সহকারে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরিয়া একটি একটি করিয়া মন্ত্র বলেন, আর সাধুরা তা আওড়ান। এই ভাবে বহুক্ষণের চেষ্টায় সাধুরা মন্ত্রটি আয়ত্ত করিলে পর বিশপ্ নৌকায় করিয়া জাহাজে ফিরিয়া গেলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

জাহাজ দ্বীপ হইতে ৩।৪ মাইল গিয়াছে, এমন সময় জাহাজে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। সকলেই দ্বীপের দিকে চাহিয়া 'ঐ যে, ঐ যে' বলিয়া চেঁচাইতেছে। বিশপ্ও সেই দিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিন জন সাধু জলের উপর দিয়াই সাঁতরাইয়া জাহাজের দিকে আসিতেছেন। নাবিকরা আর কি করে, আবার জাহাজ দাঁড় করাইল। সাধু তিনজন জাহাজে উঠিয়া বিশপ্কে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আপনি আমাদের যে মন্ত্রটা শিখিয়ে গেলেন তা একটু পরেই আবার সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। দয়া ক'রে যদি আরও কিছুক্ষণ ওটা শিখিয়ে দেন তবে ভারী খুসী হব।"

বিশপ্ বুঝিলেন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি কি কাণ্ডটাই না করিয়া আসিয়াছেন! কিন্তু আর নয়; হাতযোড় করিয়া কহিলেন, "আপনারা মহাপুরুষ, আপনাদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা ক'রে যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছি সে জন্য ক্ষমা করবেন। আপনারা মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ, অন্য মন্ত্রের দরকার নেই।"

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা)

বন্দিনী ধরা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বন্দিনী ধরা রক্তধারায় নেয়ে
    চাহিল আকাশ পানে,
হিংসা-দানব উঠেছে পরাণ পেয়ে
    শঙ্কা জেগেছে প্রাণে।
ভ্রূকুটী ভয়াল্ মুখেতে অট্টহাস,
    কুৎসিত দেহে লাগিয়াছে আজ নাড়া,
প্রলয়ের মেঘে ঘনায় সর্ব্বনাশ,
    তাই কি জেগেছে ধরার বুকেতে সাড়া?
মানুষ ছুটেছে মানুষের প্রাণ নিতে
    অত্যাচারের বিশ্বস্তর রথে,
কামনার পায়ে দুর্ব্বলে বলি দিতে
    ছুটেছে মানুষ নরকের রাজপথে।
ক্ষমতা তুলেছে আকাশেতে আজ মাথা—
    রাক্ষসী ক্ষুধা মেলিয়াছে তার মুখ,
তরবারি আজ শুনিবে না কোন কথা,
    উপাড়ি ফেলিবে জীর্ণ ধরার বুক।
দয়ারে সে আজ দিয়াছে নির্ব্বাসন,
    কৃষ্টিরে তার পাঠায়েছে রসাতল,
লুব্ধ আঁখিতে দেখিছে দুঃস্বপন,
    জ্ঞানেরে করেছে মানুষ মারার কল।
ক্লান্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া ভাবে
    হয় না কি ঠাঁই বিশাল তাহার বুকে?
অন্যের ভিটে কাড়ে কেন নর তবে—
    বিষ তুলে দেয় মানুষ ভাইয়ের মুখে?
কতখানি ধরে ছোট্ট একটু পেটে
    তবে কেন কাড়ে খিন্ন মুখের গ্রাস,
অজগর-ক্ষুধা কেন তার নাহি মেটে,
    কেন সে ডাকিছে নিজের সর্ব্বনাশ?
বন্দিনী ধরা চেয়ে আকাশের পানে
    কাতর কণ্ঠে মাগিছে মুক্তিফল,
কে শোনাবে আজ নির্ব্বাণ-বাণী তারে,
    কোন্ তথাগত ঢালিবে শান্তিজল!

হারানো ছেলে

শ্রীমানবেন্দ্র পাল

অনেক দিন পরে আবার চারিদিকে আজ আনন্দের ফোয়ারা। বহু দিন পরে আবার এসেছে বসন্তোৎসব।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে উৎসবে চলেছেন স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গে তাঁদের ছোট্ট একটি ছেলে। পথের ধারে একটি খেলনার দোকান। ছেলেটি আব্দার ধরে—"বাবা, ঐ লাল খেলনাটা আমি কিনব।" বাবা ধমক দিয়ে ওঠেন। মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে ছেলেটি বলে—"মা?" মা উত্তর দেন, "কি করব বাবা, এখন থাক।" ছেলেটি চুপ্ করে এগিয়ে চলে। আরও খানিকটা এগিয়ে তারা গিয়ে সহরে ঢোকে। একটা মিষ্টির দোকান। থরে থরে মিষ্টি কাঁচের আলমারিতে সাজান। ছেলেটি খানিকক্ষণ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বরফিগুলোর পানে। কিন্তু বাবার কাছে চাইতে পারে না। মনে পরে একটু আগে বাবার ধমকের কথা। একটু পরেই একটা বাঁশীর মিষ্টি সুর তার কানে আসে। এগিয়ে যায় সে সেই দিকে। দেখে একজন বাঁশীওয়ালা অনেকগুলো বাঁশী বাজিয়ে বিক্রী করছে। বাঁশীর সুর শুনে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার ভারী ইচ্ছে করে একটা বাঁশী কেনে। কিন্তু বাবার কথা মনে পডতেই আবার সে থেমে যায়।

আপন-ভোলা হয়ে সে এগিয়ে যায় আরও কিছু দূর। দেখ্তে পায় এক ফেরীওয়ালা—লাল, নীল, সবুজ রংএর বেলুন বিক্রী করছে। একবার তার ইচ্ছে করে বাবার কাছে চায়, কিন্তু পরক্ষণেই ফের নিজেকে সামলে নেয়। আরও কিছুদূর গিয়ে দেখে এক নাগরদোলা। তার মত কত ছেলেমেয়ে তা'তে চড়ছে! একটা কাঠের ঘোড়া তখনও খালি পড়ে ছিল। সে আর থাকতে পারে না, বলে—"বাবা, ঘোড়াটায় চড়ব?" কোন উত্তর পায় না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে—তার মা-বাবা কেউই নেই। একমুহূর্ত্তে তার মুখের ওপর ভয়ের ছায়া ঘনিয়ে আসে। চেঁচিয়ে ডাকে, "মা—বাবা—" তবু কোন উত্তর মেলে না। একদল লোক তার পাশ কাটিয়ে চলে যায়—ছেলেটি তাদের মধ্যে মা-বাবাকে খোঁজে, কিন্তু পায় না। দু হাত দিয়ে ভীড় সরিয়ে যেতে যেতে ডাকে—"মা—বাবা—"

চল্তে চল্তে সে পূজোর মন্দিরের কাছে গিয়ে পৌছয়। ভীড় দেখে বেচারা কেঁদে ফেলে। চোখের জল টুক্টুকে গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। ভাঙ্গা গলায় আবার ডাকে, "মা গো! মা!—বাবা!" একজন লোক তাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—"তোমার বাড়ী কোথায় খোকা? কার ছেলে তুমি?" ছেলেটি শুধু বলে—"আমি মা-বাবাকে চাই।" লোকটি তাকে কোলে

ক'রে বেলুনের দোকানে নিয়ে যায়। ভোলাবার জন্য তাকে বলে—"কোন্ বেলুনটা নেবে—এইটে?" এই বলে একটা লাল রংয়ের বেলুন তার হাতে তুলে দেয়। বেলুনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটি বলে—"আমি মা-বাবাকে চাই।"

লোকটি তাকে নিয়ে যায় বাঁশীর দোকানে। "কি সুন্দর বাঁশীর শব্দ! একটা তুমি নেবে খোকা?" কানে আঙ্গুল দিয়ে ছেলেটি শুধু বলে—"আমি আমার মা-বাবাকে চাই।"

লোকটা তাকে নিয়ে যায় মিষ্টির দোকানে। "কেমন সুন্দর সুন্দর বরফি দেখেছ—একটা খাবে?" ছেলেটি চোখ দুটো বন্ধ করে বলে, "না—না, আমি মা-বাবাকে ফিরে পেতে চাই।" লোকটি জিজ্ঞেস্ করে, "খোকা আমাদের বাড়ী থাক্‌বে? কেমন তোমার বন্ধু হবে অনেক।" ছেলেটি লোকটির কোল থেকে নেমে পড়ে। কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে—"আমি কিছুই চাই না, চাই শুধু আমার মা-বাবার মিষ্টি চুমু!" বল্‌তে বল্‌তে সে ভীড়ে মিলিয়ে যায়।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

বঙ্গবীর সুরেশ বিশ্বাস—শ্রীচণ্ডীচরণ দে প্রণীত। নিউ বুক্‌ষ্টল্, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৵০

বিখ্যাত বাঙ্গালী যোদ্ধা কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম কে না জানে? সুদূর ব্রেজিলের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা শুনলে মন গর্ব্বে ভরে ওঠে। গ্রন্থকার ছোটদের উপযোগী করে এই বীরের জীবন-কথা শুনিয়ে বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। বইখানির মধ্যে এমন অনেক নতুন তথ্য আছে যা অনেকেই হয়তো জানেন না। তোমরা বইটা নিশ্চয়ই পড়ে দেখবে।

ছোটদের নদীয়া—শ্রীচণ্ডীচরণ দে প্রণীত। নীলমণি লাইব্রেরী, শান্তিপুর। মূল্য ।/১০

এই বইখানিতে নদীয়া জেলা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ছোটদের উপযোগী করে দেওয়া হয়েছে। নিজেদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। এই ধরণের এক-একখানি বই প্রত্যেক জেলা সম্বন্ধে লেখা হ'লে দেশের একটা মস্ত অভাব পূর্ণ হবে। নদীয়া বাংলার গৌরবস্থল। ছোটদের নদীয়া পড়ে শুধু নদীয়াবাসীরা ন'ন, বাঙ্গালী মাত্রেই উপকৃত হবেন।

চিত্রশালা

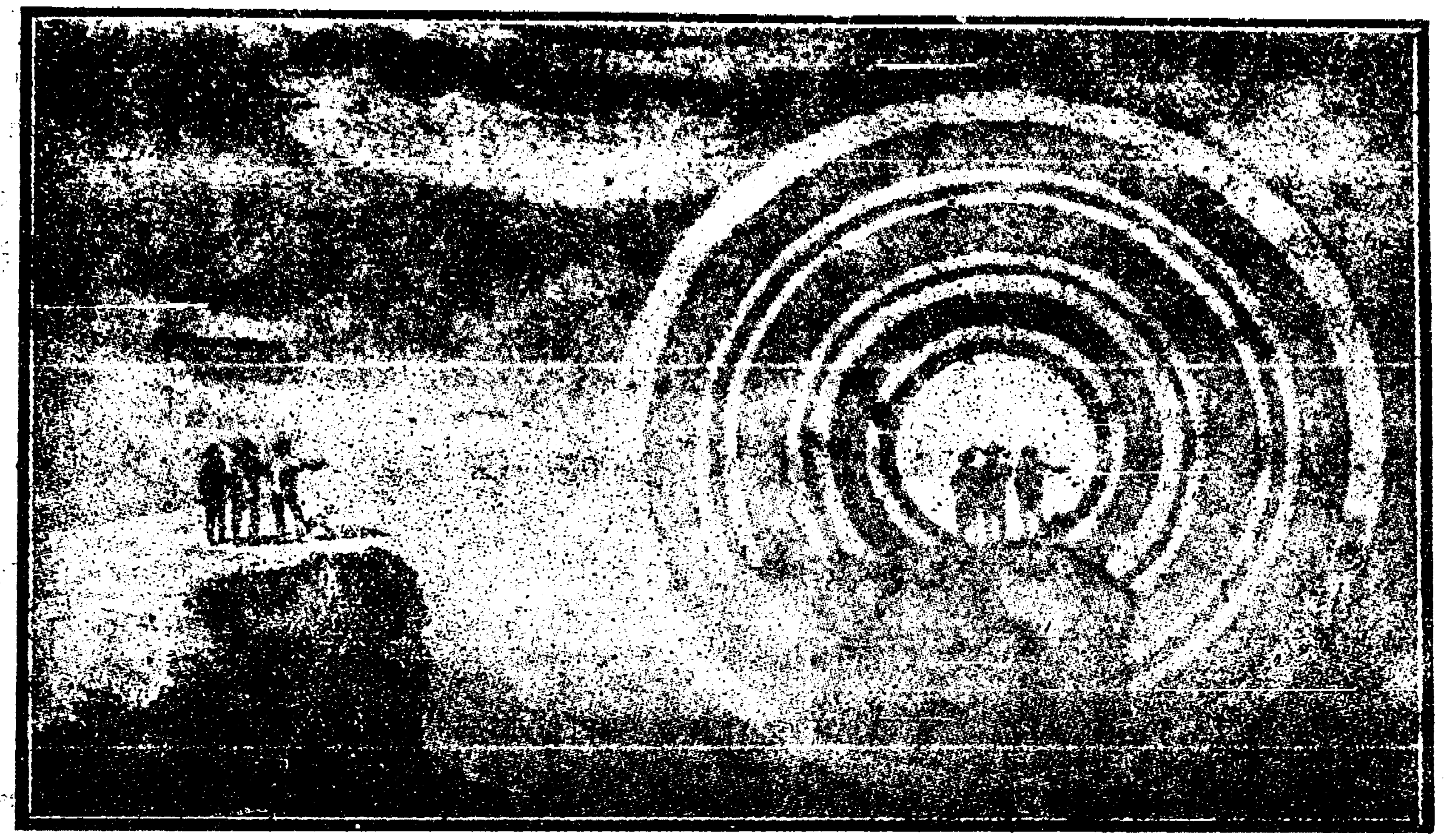

প্রকৃতির খেয়াল

মেঘের গায়ে মানুষের ছায়া

বিখ্যাত মহিলা কবি মানকুমারী বসু আর ইহলোকে নেই। বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইনি সুপরিচিত। অল্প বয়সে স্বামী-বিয়োগের পর সাহিত্যসাধনাকেই ইনি জীবনের প্রধান ব্রত ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি বাংলার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

* * *

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্য আরও একটি নিপুণ শিল্পীকে হারিয়েছে। কবি অজয় ভট্টাচার্য্যের কথা বলছি। কবিতা, এবং বিশেষ ক'রে সঙ্গীত রচনায়

অতি অল্প দিনে ইনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এঁর রচিত ছায়াচিত্রের গানগুলি প্রত্যেক ঘরে ঘরে সমাদর পেয়েছে। মৃত্যুকালে এঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর।

* * *

সম্প্রতি কলকাতায় রণজী ক্রিকেট-প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলা শেষ হয়েছে। খেলা হয়েছিল বাংলার সঙ্গে হোলকারের। হোলকার দলে সি. কে. নাইডু, মুস্তাক আলি, ভায়া প্রভৃতি সুবিখ্যাত খেলোয়াড়েরা যোগ দিয়েছিলেন, অধিনায়ক ছিলেন সি. কে. নাইডু। বাংলা দলের খেলোয়াড়েরা সকলেই প্রায় ছিলেন অল্পবয়সী। তাঁদের অধিনায়ক ছিলেন কুচবিহারের মহারাজা। হোলকার দল বাংলার কাছে শোচনীয় ভাবে দশ উইকেটে পরাজিত হয়েছেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৩০টি আতা ৵১০ ক'রে ৮৶০, ১৮টি কলা /০ ক'রে ১৵০, ৩৫টি আপেল ৵০ করে ৪।৵০, ১১টি কমলা ৶০ ক'রে ২/০ ও ৬টি আম ।০ ক'রে ১॥০।

উত্তরদাতাদের নাম

রঞ্জন রায়চৌধুরী (কলিকাতা); জংলী (ময়না); বিবেকান্দ,প্রণবানন্দ, সচ্চিদানন্দ, জ্যোতির্ম্ময়, ডুলো, ও সবিতা (যশোহর); বিমল দত্ত, অরুণ চৌধুরী (শ্রীখণ্ড); সতী, করুণা, বেবী, গীতীন্দ্র ও রেণু মৈত্র (রাজসাহী); বুনু ও ভাব্লু (ভিরিঙ্গি); সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); অনিন্দ্যকুমার মুখোপাধ্যায় (মধুপুর); অশোককুমার নাহার (ডুম্কা); প্রফুল্লবালা সাধুখাঁ (উত্তরপাড়া); জয়ন্ত, অনন্ত, সান্নু, ভগবতী, ঝরা প্রভৃতি (কানপুর); সুজিৎকুমার রায় (শিলচর) ভেণ্টু, ধীরা, ডলি, সুশান্ত, কাকীমা, জয়া পিসিমা, বিজলী ঘোষ (মহেশতলা); অজিত ও সুজিত, খুকু, মীরা, টকি, ডলি প্রভৃতি (খুলনা); শ্যামল, টিটু, টুকু, খুকু, মিঠু (কলিকাতা); চিন্ময়, জয়ন্ত, অভিতাভ ঘোষ (ভবানীপুর); গোরাচাঁদ গুপ্ত (গিরিডি); চৌধুরী আবদুর রহমান, শচীন্দ্র, প্রয়াগ, রবি, সতু প্রভৃতি (সুনামগঞ্জ); শুভলাল, জহিরুল, সত্য, নিমচাঁদ, যোগেন্দ্র (মানকাচর); নবেন্দু সেন (বালীগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

তাদের দু'জনা পরস্পরের পরম আত্মীয়। সচরাচর ডাঙ্গাতেই যদিও তাদের বাস, কিন্তু এমনি তাদের স্বভাব, দু'জনে একত্র হ'ল কি আর ডাঙ্গায় থাকতে চাইবে না। তখন থেকে জলে জলেই তাদের বেশীর ভাগ সময় কাটবে। চিনতে পার তাদের?

ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা
চাই-ই...

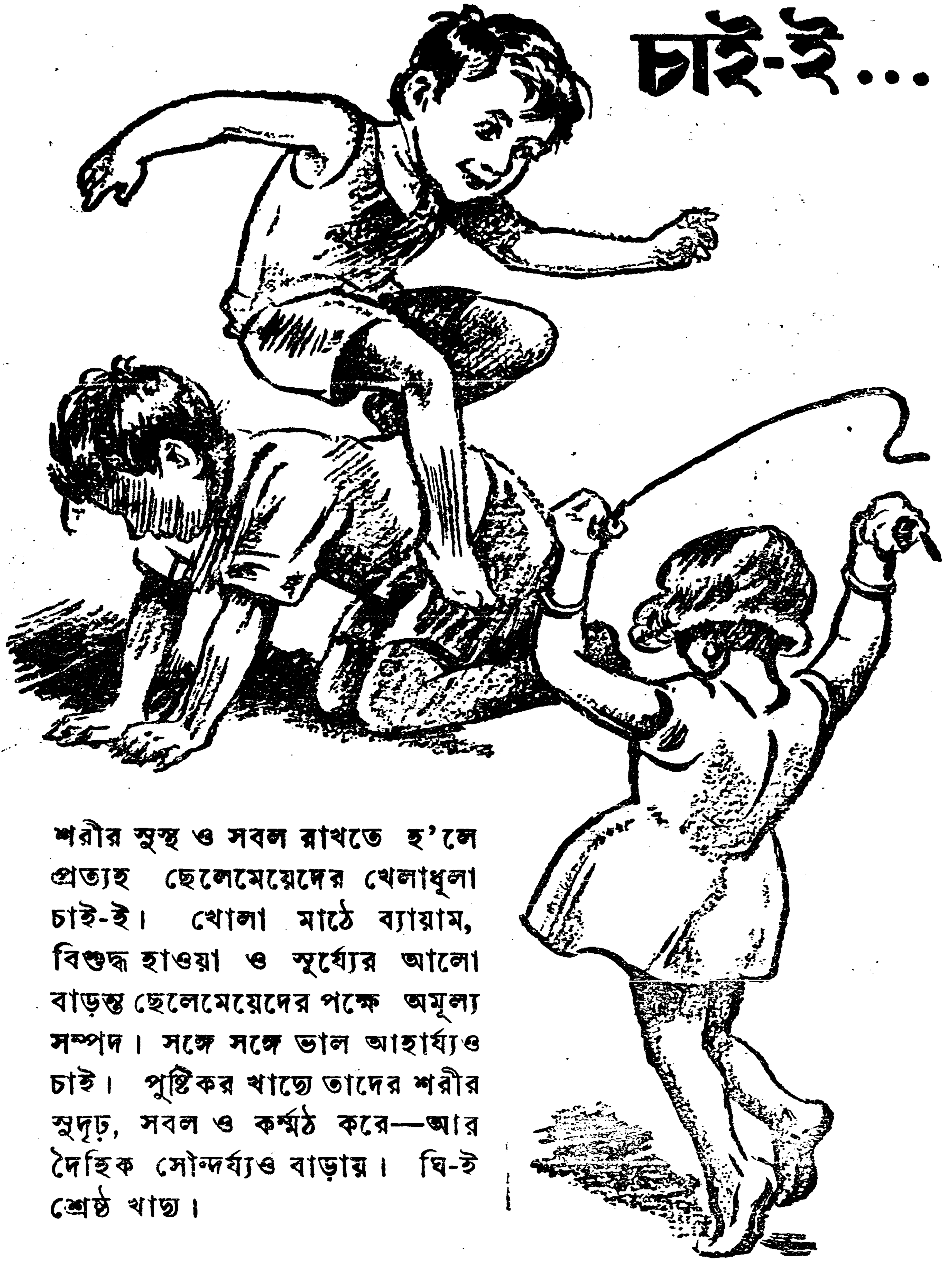

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সঙ্গে সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—আর দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়। ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

লক্ষ্মী ঘি

Regd. No. C—1641

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌.এস্‌-সি

…শ বর্ষ
… সংখ্যা
…াল্গুন
১৩৫০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪। আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৮৲ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১।৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

Regd. No. C—1641

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

...শ বর্ষ
...সংখ্যা
ফাল্গুন
১৩৫০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক পারিবারিক ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ ⎫ পকেট কেস ও পুস্তক সহ ⎧ মূল্য ৪। আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ ⎭ ⎩ মূল্য ১৲ টাকা

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১॥৵০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOS

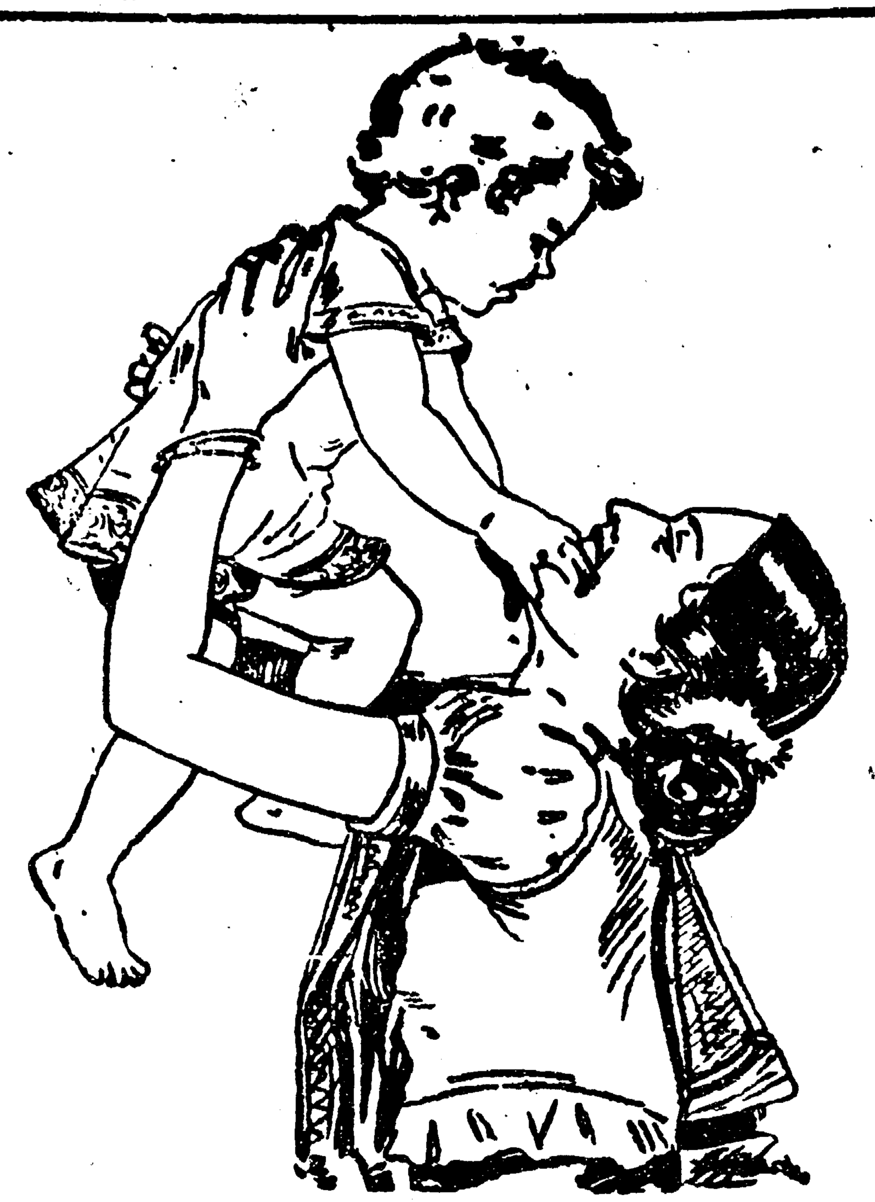

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে

বাহির হইয়াছে

—ন তু ন ব ই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

দাম বারো আনা।

শ্যাম্পন

সুগন্ধ
তরল শ্যাম্পু

কেশশ্রীর
পূর্ণ বিকাশে সহায়ক

০

ব্যবহারে কেশ মসৃণ ও নমনীয় হয় এবং খুস্কি, মরামাস প্রভৃতি কেশরোগ নিবারিত হয়।

০

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক্ কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸৹

আকাশের গল্প

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸৶৹

আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট. দাম ॥৶৹

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—॥৶৹

ক্ষিতীন্দ্র ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

গল্পসল্প…।০ ছুটীর গল্প…।০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প

মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির"

কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প … ॥৶৹

শ্রীলীলা মজুমদার এম.এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সরস মজাদার হাসির গল্প … ॥৶০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) … ১॥৶০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৶০

কলকাতার হালচাল … ১৲

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ … ১।০

সোনার হরিণ … ১।০

হাস্য ও রহস্য (গল্প) … ৸০

নূতন পুরাণ … ৸০

চায়ের ধোঁয়া … ॥৶০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন … ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) … ১৲

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)।

বাহির হইয়াছে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বলদর্পী হিটলার

বর্ত্তমান জগতের যুগান্তকারী এডল্‌ফ্ হিট্‌লারের স্ব-লিখিত Mein Kampf অবলম্বনে রচিত অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী। অতীতের অতিনগণ্য সৈনিক আজ বিশ্ব-বিপ্লবের প্রধান নেতা। তাঁহারই অত্যুজ্জ্বল জীবন-চিত্র।

মূল্য—১৲ টাকা মাত্র

শ্রীসরলা নন্দী ও প্রফুল্লনলিনী নন্দী প্রণীত

প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

প্রেমাবতার যীশুখৃষ্টের অলৌকিক জীবন-কাহিনী—সরল ভাষায় লিখিত।

মূল্য—৸৹ আনা মাত্র।

বার্ম্মা-প্রবাসী—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বোমার ভয়ে বার্ম্মা ত্যাগ

জাপানী আক্রমণে বিপন্ন হইয়া গ্রন্থকার কেমন করিয়া সপরিবারে হাঁটা পথে বার্ম্মা হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহারই জ্বলন্ত চিত্র। উপন্যাসের চেয়েও মধুর। পড়িতে বসিলে কেহ শেষ না করিয়া উঠিতে পারিবে না। মূল্য ১৲টাকা মাত্র।

Dev's Concise Dictionary

By A. T. Dev

যাবতীয় প্রয়োজনীয় ইংরেজী শব্দের বাংলা উচ্চারণ, বাংলা ও ইংরেজী প্রতিশব্দ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আকারে Oxford Pocket Dictionaryর মত—পাঠ্য-পুস্তকের মত Handy. ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

দেব সাহিত্য-কুটীর—২১।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৫০ { ১১শ সংখ্যা

সূর্য্যকিরণ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমরা রবির কিরণ মৃগ
সুদূর থেকে এসেছি গো।
নীহারিকার ভিতর দিয়ে
উষ্ণতা ও আলোক নিয়ে,
কনক ঢেলে পাহাড় শিরে,
তরল সোনা নির্ঝর নীরে,
হীরার কুচি সাগর বেলায়
ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি হায়।

খেলবো বলে তোমার সাথে—
ছুটে এলাম এই প্রভাতে।

থাকি যেথায় ঠাঁইটী ভালো
কেবল আলো—কেবল আলো।
দেহে মনে কোথাও রে ভাই,
অন্ধকারের কণিকা নাই!
নয়কো হিংসা, দ্বেষ কি ভয়ের
সে সুখদেশ জ্যোতির্ম্ময়ের।
পুণ্য এবং জ্ঞানের শিখা,
ছাই করে সব বিভীষিকা।
আমরা আসি অবনীতে
খবর নিতে, খবর দিতে।

আমরা সূর্য্য-লোকনিবাসী
ফিরে তাকাই যতই আসি।
এলে তুমি যে দেশ থেকে
তার কথা দিন শুনাই ডেকে।

যেখান থেকে এসেছ ভাই,
তার সাথে ত' যোগ রাখা চাই!
কমল যেমন ফুটাই জলে
বুক ভরি তার পরিমলে
তেমনি তোমার নির্ম্মল মন
ভগবানের করবো আসন।

দেখে এলাম কতই তারা,
ধূমকেতু সব বাঁধনহারা।
কতই প্রতাপ, কতই বিভব,
রাজে বৃহৎ গ্রহেরা সব।
সে সব দেখার সময় আছে,
এলাম ছুটে ধরার কাছে।
হরির করের পরশ বহি
মহীয়সী করবো মহী।

দেবো রবি-করের সাথে,
তাঁহার করই তোমার মাথে।

বেশী সাহস ভাল নয়

শ্রীশামুক

স্কুলের ছুটির পর দল বেঁধে বেরিয়েছি,—সুখেনকে ঘিরে বেশী ভিড়। নতুন এসে ভর্ত্তি হয়েছে কিন্তু চমকে দিয়েছে সকলকে পড়া বলে। প্রশ্নের উত্তর যেন ঠোঁটের উপর তৈরী হয়ে সর্ব্বদা ঝুলছে। সুকুমার জিজ্ঞাসা করে,—তুমি কোথায় থাক ভাই?

আলীপুরের চিড়িয়াখানায়।

বাস্, আর কি! সুকুমারের ঐ এক ভীষণ রোগ, হাসি পেলে বসে পড়তে হবে তখুনি, তা সে যেখানেই হোক, ফুটপাথ ফুটপাথই সই। ভাবি যদি কোনদিন গঙ্গার ডুবন্ত জলে স্নান করতে করতে ওর হাসি পায়—তখন?

আমাদের সকলকে হাসতে দেখে সুখেন রাগের সঙ্গে বলে ওঠে,—এতে হাসবার আছে কি? কিন্তু তখনি ওর মুখের চেহারা বদলে যায়, বলে—ও, চিড়িয়াখানায় থাকি বলেছি বলে? সুখেনও হাসতে থাকে খুব।

সুকুমারের চোখে জল এসে গেছে; একটু সামলে বলে.—খাঁচার মধ্যি থাকা হয়?

—হুঁ মশাই!—বুড়োর মতন মুখ কুঁচকে সুখেন উত্তর দেয়।

—কি রকম করে খাও?

দু'হাতের আঙ্গুল জড় করে মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে সুখেন মুখ তাড়াতাড়ি খোলে, বন্ধ করে; বাঁদররা যেমন করে খায়। দাঁতে দাঁতে ঠোকা লেগে কট কট করে শব্দ হয়।

এবারে সুকুমার তুফান লাগা ছোট নৌকার মতন দুলতে থাকে, আমরা ডাঙ্গার চারাগাছ মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি আর সোজা দাঁড়িয়ে উঠি। ইন্দু পণ্ডিত মশাই চাদর বগলে চেপে ছাতা খুলতে খুলতে বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যান, ভ্রূ কুঁচকে কটমট করে তাকান। কিন্তু উপায় কি? তখন যদি তাঁর রাম-গাঁট্টা মাথায় আলু করে দিত তবু বোধ হয় হাসি থামাতে পারতাম না। সে কি ভয়নাক হাসি!

যাই হোক, আসল কথা এই যে সুখেনের বাবা আলীপুরের চিড়িয়াখানায় বড় চাকরী করেন, জন্তু-জানোয়ারদের দেখাশুনা করবার ভার তাঁর, সে জন্য সুখেনরা ওর মধ্যেই চমৎকার এক বাংলোয় থাকে।

আমার সঙ্গে সুখেনের ভাব হয়ে যায় সব চেয়ে বেশী অল্প দিনেই। জন্তু-জানোয়ার পোষা শুধু যে আমার সখ তা নয়, ওদের আমি সত্যি ভালবাসি অনেক সময় মানুষের চেয়েও। সুযোগ পেলেই সুখেনের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় যাই, ঘুরে বেড়াই, ওর বাবা কাকাবাবুর কাছে জন্তুদের বিষয় নানা গল্প শুনি, আর কাকীমার হাতের ভালমন্দ রান্না খাই। আর এক জনের সঙ্গেও ভাব হয়ে যায়—সে সোমা। সোমার কাজ চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদের খাবার দেওয়া ও তদারক করা। সোমার হাত থেকে কাঁচা মাংস বা অন্য খাবার নিয়ে খাঁচার মধ্যে ছুঁড়ে দিতে ও পেটুকরামদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখতে ভারী মজা লাগে।

একটি বাঘের খাঁচার সামনে আমাদের সময় কাটে সব চেয়ে বেশী। হ্যাঁ, ঠিক বাঘের মতনই চেহারা বটে। এক কেঁদো বাঘ—সাতফুট লম্বা। চওড়ায় জড়িয়ে ধরলে নাগাল পওয়া যাবে না নিশ্চয়। যখন সোজা সোজা পা ফেলে সামনে এগিয়ে আসে, বুকের ভিতরটা থর থর করে ওঠে, আর গাঢ়

হলদে-কালো ডোরার দিকে চেয়ে ঝলসে যায় চোখ। মনে হয় থাবা মেরে মনুমেণ্টকে চিনির মন্দিরের মত গুঁড়িয়ে ছাতু করে দিতে পারে ও অক্লেশে! একে এক নেপালী রাজা—মহারাজা নয়, ছোট একজন রাজা—ফাঁদ পেতে জ্যান্ত ধরে এখানে এনে রেখেছেন। যাকে বলে রাজার হালে রেখেছেন। সোমার বাড়তি বখশিস বরাদ্দ আছে এর উপর একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখবার জন্য।

এই বাঘের হ'ল অসুখ,—আমাদের চোখের সামনে। খায় না কিছু, বমি করে খাঁচা কাঁপিয়ে গজরায়, আর গুঁড়ি মেরে শুয়ে ধক্ ধক্ করে হাঁফায়। শুনি, শুধু এর জন্য সেই নেপালী রাজা কলকাতায় এসেছেন। সহরের বড় বড় ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, চিকিৎসা চলছে। বাঘ ওষুধ খায় না কিছুতে। কত রকম ফন্দিফিকির করে ওষুধ দেওয়া হয় কিন্তু সে দিকে তাকায় না, একটু শুঁকেও দেখে না। শেষে শুনি ডাক্তাররা বলছেন ওর পেটে য়্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে, তার নাকি ভয়ানক যন্ত্রণা, কেটে দিলে তবে সারবে। অপারেশন হবে কাকাবাবুর বাইরের ঘরে। এ কথা শুনেই সুখেন বাবাকে ধরে বসে—দেখতে দিতে হবে একেবারে গোড়া থেকে। আমিও প্রায় হাত যোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি আর বারবার বলি,—কাকাবাবু, দু'টি পায়ে পড়ি।

শেষে কাকাবাবু হাসতে হাসতে বল্লেন,—আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু দূর থেকে। ঠিক হ'ল তার আগের দিন রাত্রে এসে আমি থাকবো।

সে দিন ভোর থেকেই খাঁচার সামনে আমাদের দু'জনার ঘোরাঘুরি আর সোমাকে দেখতে পেলেই নানা প্রশ্ন। বাঘ সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি সোমার চেয়ে আর জানবে কে?

কাকীমা লোক পাঠিয়ে অনেক ডাকাডাকি করে এক এক বাটি দুধ ও হালুয়া খাইয়ে দিলেন। বল্লেন,—ঐ সব হাঙ্গামা চুকতে যেতে দেরী হবে আজ। কিন্তু বীরপুরুষেরা যদি ভয় পেয়ে আঁচলে মুখ লুকাতে আসেন তখন দেবো না বলছি।

সুখেন লজ্জায় লাল হয়ে বলে,—ধেৎ।

নেপালী রাজা এলেন তিনজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে। তার মধ্যে একজন কলকাতার সব চেয়ে বড় ডাক্তার কাটাকুটিতে।

নেপালী রাজার মোটাসোটা সুন্দর চেহারা কিন্তু বড় ছেলেমানুষের মত এতটুকু মুখ। সম্ভব এই ছেলেমানুষী ঢাকবার জন্য ঝাঁকড়া গোঁফ সোজা দু'পাশে টানা—উড়ন্ত এরোপ্লেনের ডানার মত। একজন ডাক্তার একটুকরো কাপড়ে ক্লোরোফর্ম্ নিয়ে খাঁচার মধ্যে ফেলে দেন। বাঘের কাছ থেকে অনেক দূরে গিয়ে সেটা পড়লো। সোমা নিয়ে আসে এক লম্বা লগি। ডাক্তার সেটা নিয়ে কাপড়টুকু ঠেলে ঠেলে বাঘের কাছে নিয়ে যান। বাঘ এক ভীষণ গর্জ্জন করে থাবা মেরে লগিটি ভেঙ্গে দিল। আবার সোমাকে আনতে হ'ল অন্য লগি। এবারে ডাক্তার সাবধানে তাড়াতাড়ি কাপড়টা ঠেলে দিয়ে দিয়ে লগি সরিয়ে নেন। বাঘ গজরায় ও সরে সরে যায়। শেষ পর্য্যন্ত এক জায়গায় বসে প'ড়ে ধক্ ধক্ করে হাঁফায়! মনে হয় যেন নেশা লেগেছে।

দেখি, নেপালী রাজা ডাক্তারের পাশে ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে দেখছেন, গোঁফের একটা লম্বা দিক্ ডাক্তারের গালে ছোঁয় ছোঁয়—ঐ ঠেকে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে বাঘ করে হালুম্। বাস্, ডাক্তার ভাবেন বুঝি বাঘের গোঁফ তাঁর মুখে—হাউম্ করে লাফিয়ে ওঠেন, সঙ্গের অন্য সকলেও। শেষে ভুল বুঝতে পেরে চলে হাসি—ঐ গম্ভীরমুখো ডাক্তারেরাও বেশ হাসতে পারেন দেখলাম।

বাঘ নেতিয়ে পড়ে, হাত পা অবশ, গলা দিয়ে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোয় যেন আস্তে আস্তে নামতা মুখস্থ করছে। এবারে আরো খানিকটা ক্লোরোফর্ম্ কাপড়ে নিয়ে ওর ঠিক নাকের উপর ফেলে দেওয়া হ'ল। তারপর যখন একেবারে পুরোপূরি অজ্ঞান সোমা ও তার দলেরা ভিতরে ঢুকে এক খাটিয়ায় শক্ত করে বেঁধে বার করে নিয়ে এল। এবারে কাকাবাবুর বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া, সেখানে কাটাকুটির সমস্ত সরঞ্জাম তৈরী। টেবিলে শুইয়ে বাঁধা খুলেছে, হঠাৎ বাঘ মশাই এক হাই তোলে—ওয়াও। দৌড়—যে যে দিকে পারে, ওরে বাবারে মারে!

আমরা সোজা রান্না ঘরে। কাকীমা আঁচল কোমরে জড়িয়ে ছ্যাঁক ছোঁক করে কি রাঁধছিলেন, বলতে হয় না কি হয়েছে। ঠকাস্ করে কড়াটা মাটিতে নামিয়ে বড় খুন্তিখানা আগুনে গুঁজে দেন, বলেন,—তোমরা আমার পাশে এই জলের বালতির পিছনে বসে পড়।

বসে আছি, বাঘ আসে না, কোন হৈ-চৈ ও শুনতে পাই না। শেষে আমরা তিনজনই পা টিপে টিপে এগিয়ে চলি। কই, কোথাও নেই কিছু! পাশের ঘরের জানালা দিয়ে দেখি বাঘ অসাড় হয়ে পড়ে আছে আর ডাক্তাররা ঘিরে কাটাকুটি করছেন। কাকীমা এ সব দেখতে পারেন না তাই চলে গেলেন। আমরা বসে থাকি। মানুষের ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু চোখে পড়ে, একটা বিকট অস্বস্তিকর গন্ধ এসে লাগে নাকে। দেখি, নেপালী রাজা জানালার সামনে পায়চারী করছেন, হাতে ধরা এক রিভলভার। সম্ভব এটি দিয়ে ডাক্তারদের আশ্বাস দিয়ে কাজে লাগিয়েছেন। গরম,—ভয়ানক গরম। এতটুকু হাওয়া নেই, সকলে ঘেমে অস্থির। রাজা পায়চারী করতে করতে একটা টেবিল-ফ্যান্ পিছনে রাখা ছিল, চালিয়ে দেন। ফ্যান্ যেই হঠাৎ বুউউ করে ঘুরেছে অমনি সকলে হাউ-মাউ-খাঁউ তড়াক তড়াক লাফ! ভাবে বাঘ বুঝি উঠে বসে এবারে! এবারে শুধু আমাদের হাসবার পালা। ভয় পেলে মানুষ কত রকম মজা করে তার ঠিক নেই। মুখে কাপড় চেপে খুক খুক হাসি, কাকাবাবু চোখ রাঙ্গিয়ে তবে থামান।

শেষ হয়ে গেল। বাঘের পেটে বাঁধা হ'ল অনেক ফের্তা দেওয়া এক ব্যাণ্ডেজ। কিন্তু কই, বাঘ নড়ে না চড়ে না। ঠিক ছিল অল্প জ্ঞান হলেই খাটিয়াতে শক্ত করে বেঁধে খাঁচায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু জ্ঞান হয় না কিছুতে! ডাক্তাররা কত রকম চেষ্টা করেন তবু কোন সাড়া শব্দ নেই! শেষে মাথা নেড়ে তাঁরা জানান আর কোন উপায় নেই সম্ভব ক্লোরোফর্ম্ বেশীক্ষণ

বেশীমাত্রায় দেওয়াতে এই অবস্থা হয়েছে। অপারেশন খুব চমৎকার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু রোগী বাঁচলো না। রাজা এমন মুখ করেন যেন কেঁদে ফেলবেন এখুনি। আমাদেরও কান্না আসছিল, ঠিক এ রকম হবে আশা করি নি এতটুকুও। ডাক্তাররা যন্ত্রপাতি নিয়ে গম্ভীর হয়ে চলে যান। রাজা, কাকাবাবু প্রভৃতি অন্য সকলেও ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। বাঘ শুধু একলা মরে পড়ে থাকে আর তার পাশের ঘরে আমরা দু'জনে।

দুঃখে আমাদের ভারী কষ্ট লাগে। আস্তে আস্তে বাঘের ঘরে গিয়ে ঢুকি। মরা বাঘ হলেও ভয় করে বৈকি। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়াই, ভাল করে দেখি এতটুকুও নড়ছে কিনা, নিঃশ্বাসে পেটটা ওঠা-নামা করছে কিনা। সুখেন চট করে একবার গায়ে হাত দিয়েই সরিয়ে নেয়। ক্রমশঃ ভয় ভেঙ্গে যায়। আদর করে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দি, থাবার তলোয়ারের মত ধারালো নখ টিপে টিপে দেখি, মুখের ভিতর হাত পুরে বর্শার মত ছুঁচালো দাঁত গুণি।

হঠাৎ ফোঁস করে এক নিঃশ্বাস পড়ে! ভীষণ চমকে হাত সরিয়ে নি, দেখি বাঘ হাই তোলে—ওয়াও! যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে উঠে বসে টেবিলের উপর! ভয়ে কি যেন হয়ে গেলাম আমরা। ধড়াস্ করে বসে পড়ি মাটিতে, এত কাছে যে বাঘ থাবা বাড়িয়ে স্বচ্ছন্দে আমাদের মাথায় চাঁটি লাগাতে পারে। সুখেনের মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে আসে—মম্‌ম্মা! আমার কাঁধটা খামচে ধরে আমার গায়ে ওর নখ বিঁধে যেতে থাকে।

আমি পাথরের মত স্থির বসে বাঘের ঘোলাটে চোখের দিকে চেয়ে থাকি। আমার চোখের পাতা যেন আটকে গেল, ওঠা নামা করে না; নিজের দাঁতে দাঁতে ঠোকা লেগে আওয়াজ হয়, বন্ধ করতেও পারি না। মনে মনে বারবার এক দুই গুণি,—যেন দশে পৌঁছালেই বাঘ লাফিয়ে আমাদের ঘাড়ে পড়ে টপাটপ্ গিলে খেয়ে ফেলবে। ভয়ে আধমরার অনেক বেশী মরে গিছলাম দু'জনাই, বাকীটুকু কেউ একটা সুচ ফোটালেই শেষ হয়ে যেত!

খানিক বাদে চোখের কোণ দিয়ে আবছা দেখি ভিতর দিকের ঘরের জানালায় কাকীমা এসে দাঁড়িয়েছেন। তবু বাঘের চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না, কোন শব্দও বেরুল না গলা থেকে। কাকীমার আবছা মূর্ত্তি সরে গেল তাড়াতাড়ি।

এর পর বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেতে দেরী হ'ল না বেশী। সোমা আসে লোকজন নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

বাঘ অনেক হাঙ্গামা করে নিজের আস্তানায় ফিরে গেল এবং কয়েক দিন পরে সুস্থও হয়ে গেল।

সেদিন প্রচুর রক্তপাতে মশাই একটু বিশেষ রকম কাবু হয়ে পড়েছিলেন বলে টেবিল থেকে

দয়া করে নামতে পারেন নি এবং আমরাও জলখাবার হওয়া থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। সেদিন আমাদের দু'জনকারই সামলে নিতে একটু বেশী সময় লেগেছিল বৈকি। কেমন যেন বোম ভোলানাথ হয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ!

কিন্তু তাই বলে কি কাকীমার অত হাসা উচিত আজ পর্য্যন্ত?—আর সকলের সামনে বার বার বীরপুরুষ বীরপুরুষ বলে ক্ষেপানো?

চোর, ডাকাত, সাবধান!

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

মস্ত বড় ব্যাঙ্ক। চারদিকে লোকজন গম্ গম্ করিতেছে। একধারে সুসজ্জিত একখানি কামরা। কাচের দরজার উপর সুদৃশ্য অক্ষরে লেখা 'ম্যা নে জা র'। দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলে দেখা যাইবে দামী পোষাক পরা আয়নার মত চকচকে একখানি টাক মাথায় আঁটিয়া মোটা সোটা গোছের এক ভদ্রলোক কাগজপত্র ঘাঁটিতেছেন। লোকটি ভীষণ ব্যস্ত, সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় না ইনিই এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

হঠাৎ ক্রীং ক্রীং করিয়া টেবিলের উপরকার টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল। ম্যানেজারের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। আস্তে রিসিভারটি কানে লাগাইবার পর তেমনি জলদগম্ভীর স্বরে শব্দ হইল "হ্যালো!" কিন্তু সে একমুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইয়া গেল। বিনয়ে গলিয়া গিয়া তিনি কহিলেন, "ওঃ, মিষ্টার পপার! নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনি এখনই আসুন না। আসা মাত্র পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ। নমস্কার।"

টেলিফোন করিয়াছেন মিঃ পপার। নাম পপার হইলে কি হয়, ইনি একজন শাঁসাল লোক। এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের কারবার, তাই খাতিরও খুব। কিছুদিন আগে একখানি দামী হীরা তিনি এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহাই লইয়া যাইতে চান। ম্যানেজার সহকারীকে ডাকিয়া তখনই হীরাটি ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরের কথা। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী-মহলে মহা উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। ম্যানেজারের মুখেও সে গদ্‌গদ ভাব আর নাই, তার জায়গায় ফুটিয়া উঠিয়াছে দারুণ দুশ্চিন্তা। সেই মূল্যবান্ হীরাখানি নাকি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশে খবর গিয়াছে, জোর তদন্তও সুরু হইয়াছে, কিন্তু হীরার সন্ধান মেলে নাই।

কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সহজে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। এ ভাবে ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত ঘর হইতে হীরা চুরি যাওয়া তো পুকুর চুরিরই সামিল। যে ভাবে হোক্ চোরকে ধরিতেই হইবে। ব্যাঙ্কের পরিচালকেরা পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শেষে ঠিক করিলেন—এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের সাগায্য লইবেন। বিজ্ঞান আজকাল এত কাণ্ড করিতেছে, আর একটা চোর ধরিয়া দিতে পারিবে না?

বৈজ্ঞানিক আসিলেন। সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত এক যন্ত্র। একে একে ব্যাঙ্কের সকল কর্ম্মচারীকেই সেই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করা হইল। বাহিরের লোক নিশ্চয়ই ও হীরা সরায় নাই, ঘরের লোকই সরাইয়াছে; কাজেই তাদের পরীক্ষা করিলেই হয়তো কার্য্যোদ্ধার হইবে।

তার পর? এক সপ্তাহের মধ্যে বামাল সমেত চোর ধরা পড়িল। হ্যাঁ, ব্যাঙ্কেরই এক বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর এ কাজ। ম্যানেজারের হোঁৎকা মুখে পুনরায় হাসি ফুটিল।

তোমরা হয়তো ভাবিতেছ, এ আমি আরব্যোপন্যাসের গল্প শোনাইতেছি। কিন্তু মোটেই তা নয়। উপরের ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য, এবং চোর-ধরা কলটিও কাল্পনিক কিছু নয়, এ যুগের বৈজ্ঞানিক সত্যিই অমনি ধারা কল আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই "মিথ্যা-ধরা কল"—ইংরাজীতে যাকে বলে "লাই ডিটেক্‌টিং মেশিন্" আজ আমেরিকায় শত শত চোর-বাটপাড়ের মুণ্ডপাত করিতেছে!

মিথ্যা-ধরা কল—নামটি শুনিলে যেমন অসম্ভব একটা কিছু মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতেছি। তোমরা স্বভাবতঃই লক্ষ্য করিয়াছ যে লোকে ভীত বা উত্তেজিত হইলে তার শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত চলাচল দ্রুত হয়, সারা গা দেখিতে দেখিতে ঘামিয়া উঠে। লোকে যখন সত্যকে মিথ্যা দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করে তখন তার মনেও একটা দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। এবং মনের এই বিচলিত ভাবও ঠিক অমনি ধারা কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নিঃশ্বাস তাড়াতাড়ি পড়ে, রক্ত চলাচল দ্রুততর হয়, হাতের তালুতে ঘামের সঞ্চার হয়। তেমন ঘুঘু লোক হইলে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে এই পরিবর্ত্তন খুব সামান্য মাত্রায় হইতে পারে কিন্তু খানিকটা, তা যতই মৃদু রকম হউক্ না কেন, না হইয়া উপায় নাই। ইহা প্রকৃতির নিয়ম; প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সাধ্য মানুষের নাই। শুধু চোখে দেখিয়া হয়তো এই সব পরিবর্ত্তনের ধারণাও করা যায় না, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র বাহির করিয়াছেন যা দিয়া এ রকম সামান্যতম অস্বাভাবিকতাও ধরিয়া দিতে পারেন। মিথ্যা-ধরা কলটির কাজও ঠিক এই রকম। অস্বাভাবিক অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়াগুলি যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত করাই হইল সে কাজ।

ধর, ব্যঙ্কে যখন হীরাটি চুরি গেল তখন জন ছয়েক কর্ম্মচারী এমন ভাবে ছিল যাতে সন্দেহটা তাদের উপরই পড়ে। ঐ ছয় জনের মধ্যে যে চুরি করিয়াছে সেই শুধু জানে কি গিয়াছে,

কেমন করিয়া গিয়াছে, কি তার দাম! অন্য সকলে (তার মধ্যে দোষী লোকটিও অবশ্যই থাকিবে) এ সব বিষয়ে যাতে ভাল করিয়া না জানিতে পারে তার দিকে কর্ত্তৃপক্ষ যতটা সম্ভব নজর রাখিলেন। এইবার তাদের এক এক করিয়া পরীক্ষার জন্য যন্ত্রের সামনে আনা হইল। প্রথমে বুকের উপর স্প্রিংএর সঙ্গে ইলাষ্টিক্ ফিতা দেওয়া একটা পেটী, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ধরিবার জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল। রক্তের চাপ পরীক্ষার জন্য বাহুতে একটি যন্ত্র, এবং হাত কি রকম ঘামিতেছে দেখিবার জন্য দুই হাতের তালুতে দু'টি করিয়া যন্ত্র আঁটিয়া দেওয়া হইল। এইগুলি আবার প্রধান যন্ত্রের সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হইল। প্রধান যন্ত্রের খুঁটিনাটী বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ একটু বিজ্ঞান না জানিলে তোমরা তা বুঝিবে না। যাই হোক্, ঐ অবস্থায় একজন বিশেষজ্ঞ, যিনি ঐ যন্ত্র চালাইতে বিশেষ ভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, লোকটিকে নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এবং লোকটির উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রশ্নগুলি হয়তো এই রকম: "তুমি কি এর আগে কখনও চুরি করেছ?" "কখনও কি থালা-বাসন, গহনা বা হীরাজহরৎ চুরি করেছ?" "চুরির জন্য ইতিপূর্ব্বে কি কখনও ধরা পড়েছ?" "হীরা চুরি সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জান?" "গোপন ক'রে লাভ নেই, আসল ব্যাপার আমরা জানি, সত্য কথা বলে ফেল।"—ইত্যাদি। এ সব প্রশ্নে নিরপরাধ ব্যক্তির শারীরিক ক্রিয়ার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হইবার কথা নয়, কিন্তু প্রকৃত অপরাধীর পক্ষে প্রশ্ন এড়াইবার জন্য বা সত্যকে মিথ্যা দিয়া ঢাকিবার জন্য মনের মধ্যে, যতই সে সেয়ানা হোক্, কিছু-না-কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিবেই। মানুষের চোখকে ফাঁকি দিলেও বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম যন্ত্রকে ফাঁকি দিবার সাধ্য তার নাই। আর যন্ত্রের প্রতিধ্বনি-লিপির সাহায্য পাইলে বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও অপরাধী ধরা এমন কিছু কঠিন নয়।

এইবার তোমাদের মনে যে প্রশ্নটি জাগিতেছে তার উত্তর দিব। এমন অনেক লোক আছে, যারা সহজেই বড় ভয় পায়। ইংরাজীতে তাদের আমরা বলি 'নার্ভাস্', বাংলা তর্জ্জমা করিলে বলা যায় 'স্নায়বিক দুর্ব্বলতা-প্রবণ'। এই ধরণের নিরপরাধ লোককেও ঐ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে তার নিঃশ্বাস দ্রুততর হইবে, এমন কি হাতের তালুও ঘামিয়া যাইবে। তবে তো বড় ভয়ানক কথা! যন্ত্রের উদ্দেশ্য তো সফল হইল না, নিরপরাধ লোককে ধরিয়াই তো সে টানাটানি করিবে! কিন্তু আসলে তাহা নয়। বিশেষজ্ঞেরা প্রকৃত অপরাধীর এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা-প্রবণ লোকেদের শারীরিক ক্রিয়ার প্রতিধ্বনি-লিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উহাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই তাঁরা ঐ প্রতিধ্বনি-লিপির তফাৎ ধরিতে পারেন—বলিয়া দিতে পারেন—কোন্ লিপিটি সত্য গোপনের দরুণ, আর কোন্‌টি বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতার দরুণ।

মিথ্যা-ধরা কল শুধু যে চোর ধরিয়া দেয় তাই নয়, ভাল লোক চোর অপবাদে ধরা পড়িলে তাহাকেও নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করে।

এই ধরণের আর একটি ঘটনার কথা বলিয়া আজ শেষ করিব।

একবার আমেরিকায় একটি বড় ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার ডলারের নোট্ চুরি যায়। ছয় জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও নোটগুলির কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ শেষে মিথ্যা-ধরা কলের সাহায্য লইলেন। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এরা সকলেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" তখন যাদের আগে সন্দেহ করা হয় নাই এমন কয়েক জন লোককে ধরিয়া যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করা হইল, এবং তাদেরই একজন দোষী বলিয়া ধরা পড়িয়া গেল। নোট-গুলিও শেষ পর্য্যন্ত তার কাছেই পাওয়া গেল।

ছোটদের পাতা

গঙ্গার জন্মকথা

(পুরাণের গল্প)

শ্রীগৌরী দেবী

দেবর্ষি নারদের ধারণা ছিল যে তাঁর মত ওস্তাদ্ গাইয়ে আর দুনিয়ায় দু'টি নেই। আসলে কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যাটা তখনও তাঁর ভাল ক'রে আয়ত্ত হয় নি। গাইতে গাইতে যখন তখন তাল কেটে যায়; কিন্তু নারদ তা ধরতে পারেন না, অহঙ্কারও তাঁর কমে না।

রাগ-রাগিণীদের এটা সহ্য হ'ল না। তারা ঠিক করল নারদকে জব্দ করতে হবে। একদিন তারা দল বেঁধে মেয়ে পুরুষের রূপ নিয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে লাগ্‌ল—তাদের কারও হাত ভাঙ্গা, কারও বা পা ভাঙ্গা, কারও ঘাড় মটকে গেছে।

নারদ সেই পথে যাচ্ছিলেন। পথের ধারে এতগুলি বিকলাঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন; ব্যাপারটা কি!

রাগ-রাগিণীদের মধ্যে থেকে একজন বল্লে, "আর বলেন কেন, আমরা হচ্ছি রাগ-রাগিণীর দল। নারদ নামে এক মুনি আছে, তার বিশ্বাস তার মত গাইয়ে বুঝি আর হয় না। আসলে কিন্তু লোকটি গানের 'গা'ও জানে না। সুর তাল ইত্যাদি সম্বন্ধে তার কিছুই জ্ঞান নেই। দেখছেন না বাঁকা করে গেয়ে গেয়ে আমাদের সব্বাইকে সে কেমন বিকলাঙ্গ ক'রে ফেলেছে!"

শুনে নারদের বড় লজ্জা হ'ল। কিছু অনুতাপও হ'ল। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে ক্ষমা চাইলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন কি করলে রাগ-রাগিণীরা আবার সুস্থ দেহ লাভ করতে পারে। তারা বল্‌ল, "যদি কাউকে দিয়ে সত্যিকারের গান গাওয়াতে পারেন তবেই আমরা সুস্থ দেহ লাভ করব।" নারদ আবার জানতে চাইলেন কে অমন গায়ক আছেন। উত্তর এল—"আছেন। দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারেন?"

নারদ তখনই ছুটলেন মহাদেবের কাছে। ধরে বসলেন, "আপনাকে গাইতেই হবে।" মহাদেব হেসে বল্লেন, "বেশ, গাইব,—তবে এক সর্ত্তে। আমার গান শুনবার উপযুক্ত শ্রোতা যদি এনে দিতে পার তবেই গাইব।" হায় রে! নারদ কি তবে শুধু অক্ষম গায়কই ন'ন, ভাল গানের শ্রোতা হবার যোগ্যতাটুকুও কি তবে তাঁর নেই! যাই হোক্, এখন উপযুক্ত শ্রোতা কোথায় পাওয়া যাবে! মহাদেব বল্লেন, "ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে যদি ডেকে আনতে পার তবেই চলবে।" নারদ আবার ছুটলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণুর কাছে।

মহাদেব গান গাইবেন, ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর কেউই আসতে আপত্তি করলেন না। মহাদেব তখন সত্যি সত্যি গান সুরু করলেন।

সে কি গান! সমস্ত সৃষ্টি সেই অদ্ভুত সুরের ঝঙ্কারে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। ব্রহ্মা মুগ্ধ নিষ্পলক নেত্রে মহাদেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর বিষ্ণু? তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে ঝরণার মত গ'লে পড়তে লাগলেন।

হঠাৎ ব্রহ্মার নজরে এ দৃশ্য পড়্‌ল। এখন উপায়! কিন্তু তখনই বুদ্ধি এল, চট্ ক'রে কমণ্ডলুটা নিয়ে তার মধ্যে গলিত বিষ্ণুকে ধারণ করলেন।

বিগলিত বিষ্ণু ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যেই তখনকার মত রয়ে গেলেন। সেই কমণ্ডলুর জল-ধারাই পরে গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

'রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর'

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

তৃতীয় কাণ্ড

থানা-পুলিশ, জেরা ও জবানবন্দীর হাঙ্গামার ভিতর দিয়ে কয়েকটি দিন কেটে গেছে। কিন্তু রবি ঘোষের কোনও উদ্দেশ এখনও পুলিশ পায় নি। একটি লোককে কলকাতার মত সহরের মধ্যে

গুণ্ডারা গুম করে ফেললে, পুলিশ কিছুই করতে পারলো না,...তার বাবার মৃত্যুটাও কেমন যেন রহস্যজনক...সত্যেন যতই ভাবে ততই তার চিন্তাধারা ঘোলাটে হয়ে ওঠে; এলোমেলো ভাবে সে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

সিনেমা থিয়েটার দেখতে ভালো লাগে না, বন্ধুরাও বোমার ভয়ে সহর ছাড়া। অশান্ত মন নিয়ে সত্যেন ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সত্যেন লেকের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে বসে ছিল। সন্ধ্যা থেকেই চাঁদ উঠেছে। কোথাও এতটুকু মেঘের রেশ নেই। তারাগুলো না থাকলে হয়তো আকাশের গভীরতা আরো বাড়তো। ঝিক্‌মিকে তারাগুলো ছোট ছেলেমেয়ের চোখের তারার মত ঝিল্‌মিল্ করছে। নীচে লেকের জলে সারি সারি চাঁদকে চাঁদমালার মত কে যেন সাজিয়ে দিয়েছে! বাতাসে ঢেউ তুলছে, জল দুলছে, আর ছায়ার চাঁদমালা। সেই বাতাসেই ভেসে আসছে হাস্নুহানার আমেজ। গাছগুলো থামের মত দাঁড়িয়ে আছে, আকাশের ছাদটাকে যেন ধরে আছে ওরা। চমৎকার সুন্দরী রাত। কিন্তু অমন লেকের ধারেও আজ মানুষের সাড়া নেই, দু-একজন সৈনিক একটু আধটু বেড়াচ্ছে শুধু। জাপানীরা হিন্দুস্থানের সীমানায় এসে পৌঁছেচে, সেই ভয়ে মৃত্যুভীত নরনারী সৌন্দর্য্যের পূজা ছেড়ে গৃহকোণে আশ্রয় নিয়েছে। শঙ্কা সৌন্দর্য্যবোধকে নির্ম্মূল করেছে।

সত্যেন বসে আছে। অমন নির্জ্জন চাঁদনী রাত ছেড়ে উঠে আসতে তার ইচ্ছা করছে না। বাড়ীতে জবাবদিহী করার তো কেউ নেই, যতটা সম্ভব আলস্য করে নেওয়া যাক না। নিরবচ্ছিন্ন স্নিগ্ধতার মাঝে আকাশের পানে তাকিয়ে সত্যেন অনেক কথাই ভালো করে ভেবে নেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু টুকরো টুকরো চিন্তা ছাড়া কিছুই জমাট বাঁধছে না মাথার মধ্যে।

অমন জ্যোৎস্নাময়ী নিবিড়তার মাঝে গুঞ্জন তুলে ভেসে বেড়াচ্ছে প্লেনের আলো। এমনি চাঁদনী রাতে বোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস করার সুবিধা বেশী, সেইজন্যই কক্ষচ্যুত উল্কার মত প্লেনের আলো ছুটছে আকাশের গায়ে। আজকের মত আকাশে ওরা বড় বেমানান। হাস্নুহানার সুরভি আর দূর থেকে ভেসে-আসা সেতারের ঝঙ্কারই যেন এর সঙ্গে মানায় ভালো।

সত্যেন বসে থাকে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে; রাত এগিয়ে চলে। ঘড়ির কাঁটা একটির পর একটি গুণে চলে প্রহরের পদক্ষেপ।

সামনে একটা ছায়া পড়লো।

সত্যেন চমকে উঠলো, দু'জন সৈনিক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইউ ডার্টি নিগার! গেট্ আউট্!—বলেই একজন সৈনিক সত্যেনের গায়ে মারলো এক বুটের ঠোকর।

—রাইট্‌লি সার্ভ্‌ড্!—বলে অপর জন হাঁটুর এক কোঁৎকা মারলো সত্যেনের পিঠে।

সত্যেন প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলো গোরা দু'জন মদে চুর হয়ে আছে তখন সে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

নেহাৎ ভালোমানুষ বই-মুখো বাঙালী ছেলে সে নয়। কুস্তি, বক্‌সিং যুযুৎসু সব কিছুই সে কিছু-না-কিছু জানে। এই সময় শত্রুপক্ষের চোয়ালই সবচেয়ে নিরাপদ; সেই হিসাব করেই বাঁ হাতের এক ঘুঁসি সে ছুঁড়ে দিল একজন গোরার চোয়াল লক্ষ্য করে। কেন-জানি-না ঘুঁসিটা কিন্তু ঠিক চোয়ালে গিয়ে পড়লো না, পড়লো গলায়। যতটা সুফল পাবার আশা ছিল তা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে অপর গোরাটি তাকে জাপ্টে ধরে ফেলে দিল মাটির 'পরে। তারপর বুকের উপর বসে দুম্ দুম্ করে ঘুঁসি মারতে সুরু করলো। সত্যেন যতটা পারলো আত্মরক্ষা করলো বটে, কিন্তু দু'টি জোয়ান সৈন্যের সঙ্গে সে একা পারবে কেন? তা ছাড়া একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়। ঘুঁসি খেতে খেতে সত্যেনের চোখমুখ ফুলে উঠলো। ঝিম ঝিম করে উঠলো মাথার মধ্যে। সে বুঝতে পারলো ধীরে ধীরে সে চেতনা হারাচ্ছে।

একজন যুবক ওদিক থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, এবার সে কাছে এসে দাঁড়ালো, তারপরেই হাঁক দিল—এ—! কী হচ্ছে!

একজন সৈনিক তার পানে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলো—রাস্কেল্ নিগার!

—কী! মুখ সামলে কথা বল, মদ খেয়ে মাতলামি করার আর জায়গা পাও নি? কার সঙ্গে কথা বলছ তা জানো? তোমাদের দু'জনকেই আমি এখুনি গ্রেপ্তার করবো। যাও, এখুনি চলে যাও এখান থেকে—

এবার যেন মাতালদের নেশা অনেকটা কেটে গেছে বলে মনে হোল। সত্যেনকে ছেড়ে দিয়ে দু'জনে এবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর একজন বক্তার পানে তাকিয়ে বললে—হোয়াট্! মাই ডিয়ার মিষ্টার ব্ল্যাকি?

—আবার! দেখছ এটা কি? গুলি খাবার ইচ্ছা না থাকলে এখুনি চলে যাও আমার সামনে থেকে—

বক্তার হাতে একটি রিভলভার নজরে পড়তেই সৈনিক দু'জনের বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে গেল, সৈনিকের কায়দায় স্যালুট্ দিয়ে তারা সেখান থেকে সরে পড়লো।

যুবক পিস্তলটি পকেটে রেখে এগিয়ে এলো সত্যেনের কাছে।

যুবকটী সত্যেনকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল সে-রাত্রে।

চতুর্থ কাণ্ড

ধর্ম্মতলা। চাঁদনী চকের একপাশে এক দরজীর দোকান। দোকানের মালিক ফিরিঙ্গি।

ভালো 'কাটার' হিসাবে 'সোলার' সাহেবের এ অঞ্চলে নাম আছে। অল্প খরচে ভাল স্যুট করতে হলে লোকে এখানেই আসে।

মুখের পানে তাকালেই মনে হয় কাঁচি চালাতে চালাতে লোকটি যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, চোয়ালের হাড় হয়ে উঠেছে উঁচু, চোখের কোলে ঘন কালো রেখা। একবার দেখে তার বয়স যে কত ঠিক করে বলা কঠিন : চল্লিশও হতে পারে, পঞ্চান্ন বললেও কেউ অবিশ্বাস করবে না।

সন্ধ্যাবেলা সোলার একটী কোটের কাপড়ে কাঁচি চালাচ্ছিল, এমন সময় একটি লোক এসে ভিতরে ঢুকলো; বললে—গুড্ মর্ণিং, মিষ্টার সোলার !

গুড্ মর্ণিং! বসো! সোলার তাকে পাশের একখানি চেয়ারে বসতে নির্দ্দেশ দিলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—তারপর, নতুন খবর কি শশাবাবু?

লোকটীর চোখে ছিল এক যোড়া রোদ-রোধী চশমা, সেটী খুলে মুছতে মুছতে মুখখানি হাঁড়ীর মত করে শশা বললে—তুমিও আমাকে শশা বলতে সুরু করলে ?

সোলার মুচ্ কি হেসে বললে—আহাঃ, রাগ করছ কেন! তুমি কবি মানুষ, তোমাকে আদর করে আমরা শশা বলি, তা তুমি যদি নেহাৎ আপত্তি কর, এবার থেকে শশধরই বলব।

—থাক্ গে, তোমার যা খুসি বলতে পার, কিছু আসে যায় না। এখন কাজের কথা শোন—

—বল।

—কাল তো দু'জনকে পাকা গোরা সৈনিক সাজিয়ে পাঠিয়েছিলাম। লেকের ধারে কালকে তারা সত্যেনকে ধরেছিল। কিন্তু ভালো করে কায়দা করার আগেই কোথা থেকে একজন পুলিশের লোক এসে ভণ্ডুল করে দিলে। তার হাতে পিস্তল ছিল, না হ'লে···

—না হ'লে তোমরা গণ্ডার মারতে আর ভাণ্ডার লুঠ করতে। কী কুক্ষণেই তোমাদেরকে এখানে জুটিয়েছিলাম। চোরাই মাল কেনা-বেচার মধ্যে এমন বিপদ্ ছিল না বাপু! বেশী টাকার লোভে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনলাম।

—ও সব বাজে কথা তো অনেক বার বলেছ। এখন কাজের কথা কিছু বল না, একটা ভালো যুৎসই পরামর্শ দাও না যাতে পোষ্টকার্ড্খানি সহজে হস্তগত করতে পারি।···

এত কীর্ত্তি ক'রে এখনও পোষ্টকার্ড্খানি হস্তগত করতে পারলে না! এর পর আবার সেই কার্ডের হদিশ জানতে হবে জেলে শৈলেনবাবুর কাছ থেকে, তারপর সেই যখের ধন উদ্ধারের কথা···; তোমরা যে ভাবে এগুচ্ছ তাতে এখন দু'-দশ বছরের কথা, ইতিমধ্যে আমার হাতে হাতকড়ি আর তোমাদের কোমরে দড়ি ···

—আহা, তোমার কাছে এলাম একটা পরামর্শ নেবার জন্য···

—বিনা পয়সায় অত পরামর্শ দেব কেন বল ত'? আমার কথা তোমরা শুনলে কই? গোড়াতেই তো বলেছিলাম শৈলেনের মেয়েটির খোঁজ নাও। সেটাকে অট্কালেই ম্যাজিকের মত কাজ হবে, যা কিছু চাও সব আপ্‌সে হয়ে যাবে—শুধু শৈলেনের কানে কথাটি একবার পৌছে দিতে যেটুকু দেরী। বুঝলে মিষ্টার শশধর ?

—কিন্তু···, শশধর চিন্তিত মুখে বললে।

সোলার মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে বললে—ভাবছ বুঝি মেয়েটিকে আটকে রাখবে কোথায়? তোমরা রাখলেই হাঙ্গামায় পড়ে যাবে, রবি ঘোষকে নিয়ে তোমরা কি কেলেঙ্কারীই করলে! আমি হলে ও রকম হোত না। আমার যা আড্ডা আছে দু'-চার দিন কেন, দু'চার মাস—দু-চার বচ্ছরও রেখে দিতে পারি। বাইরের কোন লোক এতটুকু টের পাবে না। মেয়েটাকে কায়দা করে একবার নিয়ে এসো দেখি, পৌছে দাও দেখি আমার আড্ডায়। তারপর দেখে নিও কাজ কত সহজ হয়ে যাবে।

কথাটী শশধরের মনে লাগলো কিনা ঠিক বোঝা গেল না, মুখখানি পেঁচার মত গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে—দেখি···

(ক্রমশঃ)

কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসে বাহুতে অজেয় শকতি,
বাংলার বীর ছেলে,
হে অকুতোভয়, দূর 'নিক্তেরোয়',
'ব্রেজিলে' চালিয়া গেলে।
সেইখানে তুলি' বিজয়-নিশান
হ'লে তুমি বরণীয়,
পেলে গৌরবী বীরের পদবী,
বাঙ্গালীর স্মরণীয়।

তুমি আমাদেরি, এই নদীয়ার
নাথপুরে তব ঘর,
ভাগ্য-বিপাকে কত দুখ পেয়ে
গেলে গো দেশান্তর।
অদ্ভুত তব রণ-বিক্রম,
নত কর নাই শির,
গ্রহণ কর গো শ্রদ্ধার ডালি
বাংলা দেশের বীর !

নানা প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

যে মানুষ গর্ত্তে থাকে

আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে মাটমাটা নামে একটা জায়গা আছে। জায়গাটা আসলে একটা উপত্যকা—চারদিক্ অনতি-উচ্চ পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ভিতরটাও মরুভূমির মতই খট্‌খটে; দৃষ্টি প্রসারিত করলে গাছপালা বড় একটা দেখা যায় না, বালি আর পাথরই শুধু চোখে পড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে চোখে পড়ে আর একটা অদ্ভুত জিনিষ। সারা দেশ যুড়ে অসংখ্য বড় বড় কূয়োর মত গর্ত্ত। গর্ত্তগুলি চওড়ায় এক-একটা ৬০।৭০ ফুটের কম হবে না, গভীরতায়ও এক একটা অন্ততঃ ২৫।৩০ ফুট।

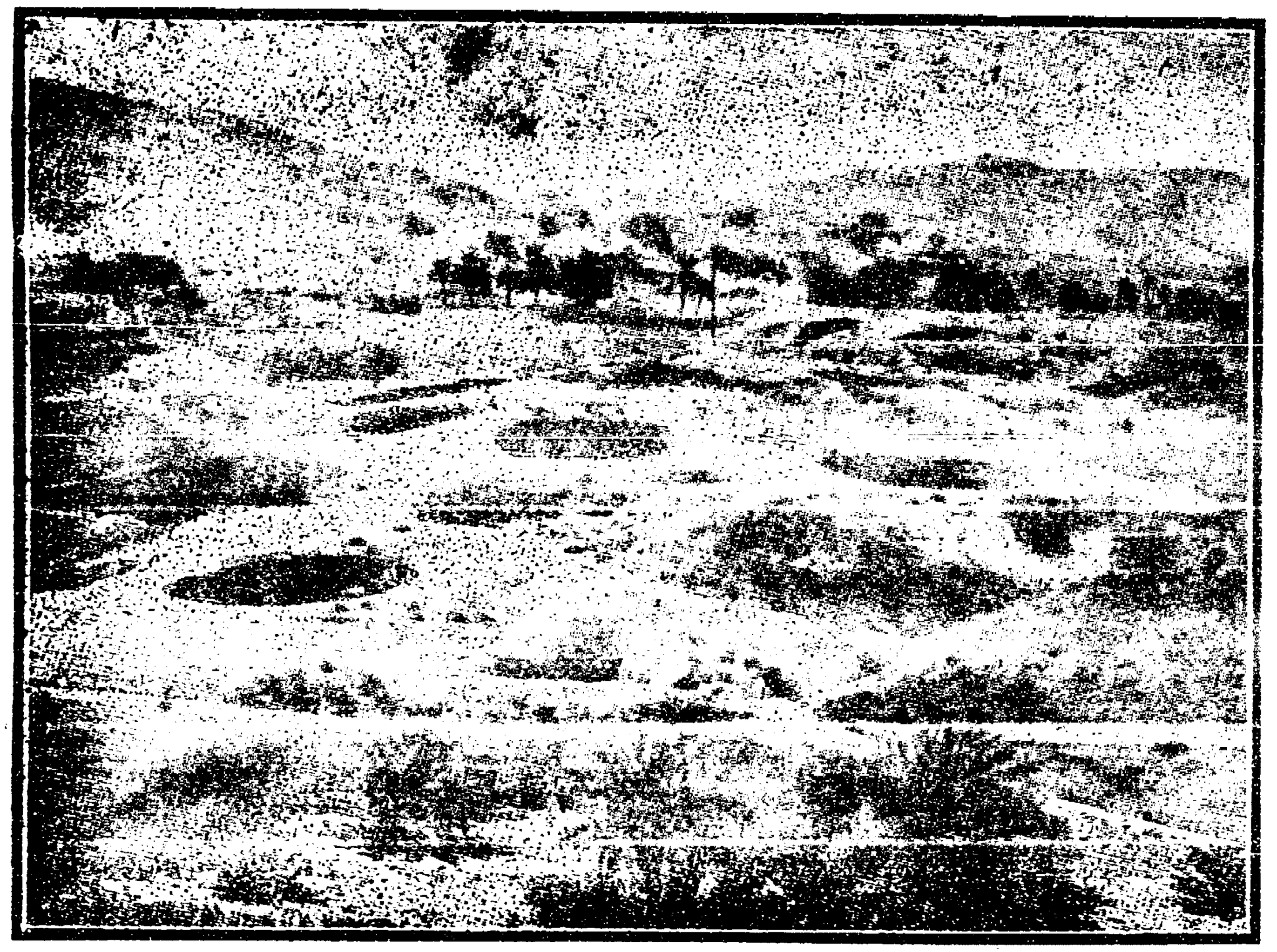

মাটমাটা উপত্যকায় ট্রগলোডাইট্‌দের বাসা বা গর্ত্ত

এক সঙ্গে একই জায়গায় এতগুলো বিরাট্ বিরাট্ গর্ত্ত কি ক'রে হ'ল ভাবলে অবাক্ লাগে। কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, এগুলো সব মানুষেরই তৈরী! ও দেশের লোকেরা ওরই মধ্যে বাস করে। ছুঁচো বা সাপের মত মানুষও গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করে শুনলে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রায় কত অসংখ্য রকম বৈচিত্র্য দেখা যায় তা তো তোমরা জানই! গাছের ডালে, জলের উপর ভেলার মধ্যে, পাহাড়ের গুহার মধ্যে, কত

জায়গায়ই না মানুষকে থাকতে দেখা গেছে! গরম দেশে মাটীর তলায় মানুষ থাকবে তাতেই বা বিস্মিত হবার কি আছে? আফ্রিকার এই গর্ত্তে-বাস-করা লোকদের ইংরেজীতে বলা হয় "ট্রগলোডাইট্।" কথাটার মানেও তাই—"গর্ত্তে ঢোকা"।

মাটীর নীচে থাকে ব'লেই ট্রগলোডাইট্‌দের খুব অসভ্য জাত ব'লে মনে করবার কারণ নেই। এরা প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, এবং অত্যন্ত নিরীহ গোছের। কোন্ প্রাচীন কালে এদের পূর্ব্বপুরুষেরা শত্রুর অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে হয়ে এই ভাবে গর্ত্তে ঢুকে শত্রুকে ফাঁকি দেবার কৌশল অবলম্বন করেছিল, সেই থেকে তাদের বংশধরেরাও সেই ভাবেই থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এবং এই বিংশ শতাব্দীতেও তাদের সেই নিয়মই চলে আস্‌ছে।

মাটমাটা উপত্যকাটির আয়তন সব শুদ্ধ প্রায় ৩ বর্গ মাইল হবে। এর প্রায় সমস্তটাই ঐ রকম মানুষের খোঁড়া গর্ত্তে ভর্ত্তি, এবং এই সব গর্ত্তে প্রায় বারো হাজার লোক বাস করে।

মাটমাটার অধিবাসীরা খুব ভদ্র; বিশেষ করে অতিথিকে তারা ভারী সম্মান করে। তুমি যদি ওদের দেশে যাও, তোমাকে ঐ গর্ত্তের ভিতর নামতে কেউ বাধা দেবে না। গর্ত্তের ভিতর নামলেই সামনে পড়বে ঢালু সুড়ঙ্গ পথ। সেই পথ বেয়ে এগিয়ে চল। মাটী থেকে আন্দাজ ফুট ত্রিশেক নীচে নামলেই দেখবে সে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে একটা চওড়া উঠোনের মধ্যে। এই উঠোন ঘিরে সারি সারি ঘর—পাথুরে মাটী খোদাই ক'রে সে ঘর কাটা হয়েছে। এই ঘরগুলির মধ্যেই ট্রগলোডাইট্‌রা থাকে। তাদের জীবনযাত্রার নানা আসবাবপত্রও সেখানে দেখতে পাবে। কাপড় বুনবার তাঁত থেকে আরম্ভ ক'রে বড় বড় জালা ভর্ত্তি খেজুর, ডুমুর প্রভৃতি ওদেশের সুখাদ্যগুলিরও কোনটার অভাব দেখবে না। ঘরের ভিতর চেয়ার-টেবিল বা খাট-পালঙ দেখবার সম্ভাবনা অবশ্য খুব কম, তবে বসবার জন্য ছাগলের চামড়া বা ঐ রকম কিছু দিয়ে তৈরী আসন বা কম্বল তুমি নিশ্চয়ই পাবে। অতিথিবৎসল কোন কোন পরিবার হয়তো জলপাই তেলে রান্না-করা তাদের ২।১টা দেশী খাবারও তোমাকে খাইয়ে দিতে পারে।

মাটমাটা অঞ্চলের কাছাকাছি পাহাড়ী অঞ্চলে ট্রগ্‌লোডাইট্‌দের আরও অনেক জাতভাই আছে। এদেরও চাল-চলন অনেক দিক্ দিয়েই মাটমাটাবাসীদের মত। তবে জাতভাইদের আর কেউ গর্ত্তের ভিতর বাস করে না। তাদের অনেকেই পাহাড় কেটে গহ্বরের আকারে তৈরী বড় বড় ঘরে বাস করতে অভ্যস্ত। পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ির আকারে তৈরী রাস্তা দিয়ে সেখানে ঢুকতে হয়। দূর থেকে দেখলে এই পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা গ্রামগুলিও কম বিচিত্র ব'লে মনে হবে না।

অজগরের খানা

জন্তুদের মধ্যে খানেওয়ালা জীব ব'লে অজগরের বদ্‌নাম আছে। কিন্তু আসলে এর জন্য তাকে লজ্জা দেওয়া ঠিক নয়। অজগর যখন খায় তখন শরীরের তুলনায় একটু বেশী পরিমাণই সে খেয়ে ফেলে, কিন্তু তার পর আর সে কয়েক দিন খাওয়ার নাম করবে না। তোমার আমার মত ব্রেক্‌ফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার ইত্যাদির বালাই তার নেই।

'অজ' অর্থাৎ ছাগল গেলে ব'লে অজগরের ঐ নামকরণ হয়েছে। আসলে কিন্তু ছাগলের চাইতে অনেক বড় বড় জানোয়ারকেও সে খেতে ছাড়ে না। হরিণ, শূয়োর, মানুষ, কুমীর, এমন কি বাঘকেও সে বাগে পেলেই আক্রমণ করে বসে। অবশ্য, এদের কারো কারো হাতে তাকেও সময় সময় প্রাণ দিতে হয়।

একবার এক ইংরেজ শিকারী আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এক চিতার সঙ্গে অজগরের যুদ্ধ দেখেছিলেন। অজগরটা চিতাকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে প্রবল চাপ দিচ্ছে, চিতাও তার ঘাড়টা কামড়ে ধরে অনবরত থাবা চালাচ্ছে। হঠাৎ অজগরটা একটু অসতর্ক হওয়ায় চিতা তার ঘাড় ছেড়ে মাথাটা কামড়ে ধরল। চিতার কামড়, সে তো সহজ নয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে তার দাঁতের পেষণে অজগরের মাথা গুঁড়ো হয়ে গেল। অজগর মরলেও চিতাকে আস্ত রেখে গেল না। তার প্রচণ্ড চাপে চিতারও হাড়গোড়ের দফা শেষ হয়ে এসেছিল। একটু পরেই তাকেও অজগরের পথ ধরতে হ'ল।

ফ্রাঙ্ক বাক্‌ আর একজন নামজাদা শিকারী। তবে এঁর শিকার হ'ত সাধারণতঃ ক্যামেরা দিয়ে—অর্থাৎ বন্য জীবজন্তুকে পারতপক্ষে প্রাণে না মেরে তিনি অলক্ষ্যে থেকে তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার ফটো তুলে আনতেন। এমনি ভাবে তিনি বুনো জানোয়ারদের নিয়ে বায়স্কোপের ফিল্‌ম্‌ তুলতেও ছাড়েন নি।

সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে বাক্‌ সাহেব অনেক বার অজগরের শিকার ধরা দেখেছেন। বাঘের সঙ্গে, কুমীরের সঙ্গে, মোষের সঙ্গে, নেকড়ের সঙ্গে অজগরের লড়াই তাঁর চোখে পড়েছে। এমন কি একবার এক হতভাগ্য মানুষকেও তিনি অজগরের হাতে আক্রান্ত হ'তে দেখেছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেন নি।

অজগর যখন কোন কিছু খায় তাকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলে। তাই অজগরের পেটের মধ্যে গিয়েও সে জিনিষটার আকার বাইরে থেকে অনুমান করা যায়। ভর পেট খাবার পর অজগরের অবস্থা হয় বড়ই কাহিল। তখন আর তার নড়বার চড়বার ক্ষমতা থাকে না—দিনের পর দিন খাবার হজম না হওয়া পর্য্যন্ত সে নির্জ্জীবের মত পড়ে থাকে। তখন যে কেউ গিয়ে তাকে নাড়াচাড়া

করতে পারে—বন্দী করা তো কিছুই না। একটা ছাগল, কি হরিণ, কি শূয়োর গিলবার পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে অজগরের ১২।১৪ দিন লেগে যায়। কাজেই তার পক্ষে প্রত্যহ খাবারের চেষ্টা করার দরকার কি?

অনেক চিড়িয়াখানায় অজগরকে মাসে মাত্র একবার ক'রে খাবার দেওয়ার রেওয়াজ আছে। খাবার আর কিছু নয়, খরগোস, গিনিপিগ্‌ ইত্যাদি। কিন্তু সে সব জন্তু দিতে হয় আস্ত আস্ত—অর্থাৎ জ্যান্ত। অজগর তাদের ধরে গিলে ফেলে, তার পর এক মাস নিশ্চিন্ত।

ক্ষিদে পেলে অজগর অনেক সময় যা পায় তাই ধরে গিলতে চেষ্টা করে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একবার একটা অজগর তার সঙ্গী আর একটা অজগরকেই ধরে গিলে ফেলেছিল। যেটা গিলেছিল সেটা লম্বায় ছিল সাড়ে দশ ফুট, আর যেটাকে গিলেছিল সেটা ন' ফুট। অমন একটি বিপুলকায় সঙ্গীকে খাওয়ার পর অজগরের অবস্থা যে খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল তা তো বুঝ্‌তেই পারছ।

রাঘবেন্দ্রের রূপান্তর

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্‌. এ

বরিশাল শহরের দক্ষিণে আলেকান্দা পাড়াটা বরিশালের বালীগঞ্জী সংস্করণ। ছোটবেলায় আমরা তাই ওটাকে বলিতাম 'আলাদা কান্দা'।

আমাদের রাঘবেন্দ্র রক্ষিতও ভাগ্যগুণে ঐ পাড়ারই অধিবাসী। তাহার কাকা বরিশাল্‌ ব্যাপটিষ্ট্‌ মিশনে কি কাজ করেন, সেই সুবাদে ঐ পাড়ায়ই বাসা করিয়া আছেন। রাঘবেন্দ্র তাহার কাকা-কাকীমার দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু বলা বাহুল্য তাহার কার্য্যকলাপ বাড়ীর গণ্ডীতেই আবদ্ধ নহে। পাড়ায় সময়ে অসময়ে "প্লে" হইতে "পার্টি" পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই রাঘবেন্দ্র রক্ষিত ছিল চীফ্‌ অর্গানাইজার। রাঘবেন্দ্র বিহনে 'আলেকান্দা অন্ধকার।'

কিন্তু "আলেকান্দার আলো" এই রাঘবেন্দ্র রক্ষিত কি করিয়া একদা নিজের মুখ অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল,—ফলে কি ভাবে তাহার নামের দু'টি অক্ষর অদ্ভুত রূপান্তর লাভ করিয়াছিল, তাহা লইয়াই আমাদের গল্প।

শ্রীযুত সুবিমল সাধু সম্প্রতি সাবজজ্‌ হইয়া আসিয়াছেন বরিশালে। বলা বাহুল্য সুপ্রসিদ্ধ আলেকান্দা পাড়াতেই তিনি কোয়ার্টার্স্‌ পাইলেন।

সাধু মহাশয়ের একমাত্র সন্তান শ্রীমতী সুচিরা সেবার আই-এ দিবে। নাচে-গানে, ফ্যাসানে-ফূর্ত্তিতে শ্রীমতী সুচিরা সে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী রহিয়াছে। ক্ষুদ্র বরিশালের ক্ষুদ্রতর আলেকান্দা পাড়া যে মুহূর্ত্তে মাৎ করা তাহার পক্ষে একান্তই সহজ এ বিষয়ে অবশ্য তাহার আত্মীয়স্বজনদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কেবল একটা সুযোগের যা অপেক্ষা !···

অবশেষে সেই সুযোগ এইভাবে উপস্থিত হইল।

একদিকে আই-এ পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল—অপর দিকে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—শ্রীমতী সুচিরার শুভ জন্মতিথি আগাইয়া আসিল।

সাবজজ্ বাবুর সংসারে লোকের একান্ত অভাব। একটি শ্যালক ব্যতীত সুবিমল বাবুর সংসারে আর তৃতীয় পুরুষ নাই। মিসেস্ সাধু ও শ্রীমতী সুচিরা ব্যতীত ঘরে অন্য তৃতীয় স্ত্রীলোকও নাই। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যাহাদের অর্থের অভাব নাই তাহাদের আবার অভাব কিসের ? সাবজজ্ বাবুর শ্যালক সুধাংশু প্রস্তাব করিয়া বসিল—এবার সুচির জন্মদিনের উৎসবে পাড়ার গণ্যমান্য সবাইকে নিমন্ত্রণ করা যাউক এবং সেই উৎসব উপলক্ষে সুচির নাচ-গানের ডেমনষ্ট্রেশন্-এর ব্যবস্থা হউক।

"আর"—মামাবাবু কথাটা বলি বলি করিয়া শেষে বলিয়াই ফেলিলেন, "ঐ সঙ্গে একটা ছোটখাট ফ্যান্সী ড্রেস্ পার্টির ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না কিন্তু।"

"দি আইডিয়া !" হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠে সুচিরা। "ঠিক মামু ! সে বেশ মজা হবে কিন্তু। নিমন্ত্রিতেরা এক একজন এক এক বিচিত্র সাজে আস্‌বেন। যার পোষাকটি সবচেয়ে মজার হবে তাকে দেব আমরা স্পেশ্যাল কম্প্লিমেণ্ট !···ঠিক তাই করা যাক।" আবদারে গলিয়া পড়ে সাবজজের একমাত্র আদরের কন্যা শ্রীমতী সুচিরা।

"তবে"—সুধাংশু কথাটা শেষ করে। "সবাইকে নিয়ে ওসব চল্‌বে না। টাইম্‌টা একটু আগিয়ে দিয়ে জন কয়েককে নেমন্তন্ন করা যাবে ফ্যান্সী ড্রেস্ পার্টিতে। বেশ কিন্তু রগড় হবে। দিদি, তুমি আপত্তি কোরো না—এতে তোমার পার্ট না থাকলেই হোল তো ?"

"যা ইচ্ছে তাই করগে' তোমরা"—সাবজজ্ গিন্নী অনিচ্ছায়ও চুপ্ করিয়া যান। নিজে তো আর তিনি সাবজজের মেয়ে নহেন, এ সবের মর্ম্ম তিনি কি বুঝিবেন ? মক্কেলহীন উকীল হইতে মুন্‌সেফ্। মুন্‌সেফ্ হইতে সাবজজ হইয়া উঠিয়াছেন সুবিমল সাধু মহাশয়। সুতরাং সংসারের সাত ঘাটের জল আস্বাদন করিতে করিতে জীবনে অগ্রসর হইয়াছেন মিসেস্ সাধু। তাঁহার সংস্কার ও সংস্কৃতির মাপকাঠিতে সাবজজ-কন্যা শ্রীমতী সুচিরার বিচার হইতে পারে না !

যথাকালে নিমন্ত্রণ-লিপি যথারীতি মুদ্রিত ও বিতরিত হইল। সমস্ত আলেকান্দা পাড়ায় রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। নবাগতদের নবীনতায় সকলেরই তাক্ লাগিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট শনিবারের অপেক্ষায় সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। গোপনে গোপনে সকলেরই মনে চলিতে থাকে নিজস্ব ফ্যান্সী ড্রেসের প্ল্যান্।

পাছে ভুল হইয়া যায় এই আশঙ্কায় রাঘবেন্দ্র তার ঘরের দেয়াল বিলম্বিত হিমানী ক্যালেণ্ডারের বুকে ১৬-শনিবারের চতুর্দ্দিকে লাল পেন্সিলের গণ্ডী আঁকিয়া রাখে।

সেদিন শনিবার। বেলা ৪টা।

আলেকান্দার এক নিভৃত জনবিরল গলিপথে হন্তদন্ত হইয়া ও কে ছুটিয়াছে ? ও আর কেহ নয়—আমাদেরই রাঘবেন্দ্র রক্ষিত। বগলে কাগজে মোড়ানো তার নিজস্ব ফ্যান্সী ড্রেস্। সাবজজ্-ভবনের ফটকের অদূরে অবস্থিত সুপারীবাগের আড়ালে গিয়া পোষাক পরিয়া লইবে এই তাহার পরিকল্পনা। বস্তুতঃ রাঘবেন্দ্রের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত প্ল্যান অনুযায়ী যে বিচিত্র পোষাকের ব্যবস্থা সে করিয়াছে তাহা প্রকাশ্য দিবালোকে সদর রাস্তায় পরিয়া বাহির হওয়া বিপজ্জনকই বটে ! একটা অস্বাভাবিক 'অরিজিন্যালিটি' দেখাইয়া সুচিরা দেবীকে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়াই তাহার অদ্যকার অভিযানের একমাত্র সাধু উদ্দেশ্য।

হ্যাঁ, এই যে গ্যেট্।········· কিন্তু কৈ ? চারিদিক্ যে বড় নির্জ্জন ! কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নাই এতটুকু ! ব্যাপার কী ? রিষ্ট-ওয়াচের দিকে তাকাইয়া দেখে রাঘবেন্দ্র। ৪-৩০ মিঃ —সে কি ! পাঁচটায় না পার্টি সুরু !···

বেঙ্গল টাইম—ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—লোক্যাল টাইম—সব মিলিয়া তালগোল পাকাইয়া মগজ গাঁজিয়া উঠে রাঘবেন্দ্র রক্ষিতের। আলেকান্দার আলো মুহূর্ত্তের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণ-লিপির সন্ধানে পকেটে হাত দেয় সে। নাঃ, সেই যে সেদিন এট্যাচি কেসের ভিতর সন্তর্পণে তথা সঙ্গোপনে সেটী রক্ষিত হইয়াছিল, আর বাহির করাই হয় নাই যে !···থাক্ গে···

গুটি গুটি পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে থাকে সে। ল্যনটা পার হইয়া বাগানের বেড় ঘুরিয়া পোর্টিকোতে প্রবেশ করে।

"ও মাগো !"—

আর্ত্ত চীৎকারে শিহরিয়া উঠেন মিসেস্ সাধু। "সুচি ! শীগ্‌গীর দেখ্ কে !"

ভয়ে কাঁপিতে থাকেন তিনি।

আরে ! দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দিব্যি একটী গাধা !

গা— ধা ! আস্ত, জ্যান্ত গাধা !— সেই লেজ, সেই কান, সেই রং !

রাঘবেন্দ্র পুলকিত হয়। অভিনয় তাহা হইলে ভালই হইতেছে। মন্থর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে থাকে সে।

"ও মা! ঘরে ঢুকচে যে—য়্যাঁ!" চীৎকার করিয়া উঠে সুচিরা। মিসেস্ সাধু ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকেন—"রামখেলান, রামখেলান!" সঙ্গে সঙ্গে সুচিরাও।

"ইস্‌কো নিকাল দেও—আব্বি—" মিসেস্ সাধু ও সুচিরা একসঙ্গে বলিয়া উঠেন।

ইতিমধ্যে ভোজপুরীর সুপুষ্ট হাতে মর্দ্দিতকর্ণ গর্দ্দভনন্দনকে অগত্যা বাহিরে আসিতে হয়। হায় রে, এখন সত্য কথা বলাও যে লজ্জাকর!

"ইডিয়ট্!"—তীব্র কণ্ঠে মন্তব্য করিতে করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয় শ্রীমতী সুচিরা। কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য! গর্দ্দভচন্দ্রের লেজের পুচ্ছটি দুই কপাটের ফাঁকে আটকাইয়া যায়! রামখেলান আবার বলপ্রয়োগ সুরু করে।

টানাটানির চোটে শেষটা লেজের গুচ্ছ টুটিয়া গেল। ছাড়া পাইয়া পুচ্ছহীন গর্দ্দভরূপী রাঘবেন্দ্র রক্ষিত প্রাণপণে প্রাণ লইয়া ছুটিয়া পলায়ন করে। হাঁফ লইয়া বলে, "ওঃ, ভারী আমার আধুনিক হয়েছেন! সাহেবদের অনুকরণে ফ্যান্সী ড্রেস করা চাই, এদিকে রসজ্ঞানের র-ও নেই!"

নিজের ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বপ্রথমেই রাঘবেন্দ্র এট্যাচি কেসের ডালাটা খুলিয়া সযত্নরক্ষিত নিমন্ত্রণ-লিপিটা টানিয়া বাহির করিল। উৎসবের তারিখ?—হ্যাঁ, এই তো ১৬ই শনিবার। য়্যাঁ! জ্যৈষ্ঠ! বাংলা মাস? বাং—— লা—!

আজ?···দেয়ালে টাঙানো হিমানী ক্যালেণ্ডারের বুকে লাল চক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার চক্ষুস্থির!

ওহ্ হরি! ১৬ তারিখ শনিবার দেখিয়াই রাঘবেন্দ্র ভাবের আবেগে কখন যে ১৬ই মে শনিবারটি লাল পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সে নিজেই ভুলিয়া গিয়াছে।

রহস্য প্রকাশ হইতে অবশ্য বিলম্ব হইল না। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের জ্বালায় সেই হইতে রাঘবেন্দ্রের আর পথেঘাটে মুখ দেখাইবার যো নাই। কারণ সেই হইতে রাঘবেন্দ্র নামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে —!

ইংরেজীতে 'সিয়ামিজ্ টুইন্স' (শ্যাম দেশীয় যমজ) নামে একটা কথা আছে। দু'টি যমজ ভাই বা বোনের শরীর যদি একত্র যোড়া থাকে তবে তাদের ঐ নাম দেওয়া হয়। কথাটার উৎপত্তি হ'ল এই কারণে যে এই ধরণের যমজের খবর প্রথম পাওয়া যায় শ্যাম দেশে। এদের নাম ছিল চ্যাং ও য়্যাং। ঐ রকম যুক্ত দেহ নিয়ে তারা ৬৩ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে ছিল, তার পর আধ ঘণ্টার তফাতে মারা যায়। এ রকম যুক্ত-দেহ যমজ আমাদের দেশেও দেখা গেছে।

* * *

ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (কলেজ) স্থাপিত হয়েছিল ইংরেজী ১২৪৯ সালে; কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (পিটার হাউস কলেজ) তার কিছু পরে ১২৮৪ সালে। ইটালীতে এর অনেক আগেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৯ম শতাব্দীতে স্থাপিত স্যালার্ণো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১২শ শতাব্দীতে স্থাপিত পাদুয়া, পাভিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা যেতে পারে। আমাদের দেশে কিন্তু তার বহু আগেই—খৃষ্টীয় ৫ম কি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

২রা সেপ্টেম্বরের পর কোন্ তারিখ জিজ্ঞাসা করলে ৩রা সেপ্টেম্বরই তোমরা বলবে। কিন্তু প্রায় ২০০ বছর আগে—১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপের ইতিহাসে একবার ২রা সেপ্টেম্বরের পরের তারিখ হয়েছিল ১৪ই সেপ্টেম্বর। লীপ্ ইয়ার গুণতে ভুল হওয়ায় ইয়োরোপের প্রচলিত পঞ্জিকা ঐ সময় ১১ দিন পিছিয়ে পড়েছিল; ঐ বছর ৩রা থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখগুলো বাদ দিয়ে সে ভুল সংশোধন করা হয়। সেই থেকে এ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই চলে আসছে।

* * *

উত্তেজিত হ'লে আমাদের শরীরের কোন কোন অংশ—যেমন হাতের তালু প্রভৃতি থেকে ঘাম বেরুতে থাকে। কিন্তু হিপ্পোপটেমাস বা জলহস্তী উত্তেজিত হ'লে তাদের গা দিয়ে কি বেরোয় জান? রক্ত। আমাদের মত হিপ্পোরও গা লোমকূপে ভরা। আমাদের যেমন ঘাম বেরোয় তেমনি তাদের গা থেকে বেরোয় এক রকম তেলাল পদার্থ। উত্তেজনার সময় ঐ তেলাল ঘামের সঙ্গে বিন্দু বিন্দু রক্তও দেখা দেয়।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

ছড়া

শ্রীবিজলী ঘোষ

বাঘের মাসী, চেপ্‌টা-মুখী, থেবড়া-নাকী, মারব ঘুঁসি তোকে,
একদৃষ্টে চেয়ে আছ খোকার দুধের দিকে!
এত খেয়েও যায় না তোমার খোকার দুধে লোভ?
পালাও, ভাগো, ধমক দেব নইলে পরে—চোপ্‌!
খোকার পরে হিংসে তোমার বড়ই বেড়েছে,
আ সোহাগী, আবার দেখ লেজটি নেড়েছে!
লেজ নাড় আর নাক নাড়—বা যতই কর গোল,
খোকায় ভাল বাসলে পরে—তবেই পাবে কোল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মা ও ঝি; একত্রে মাঝি।

উত্তরদাতাদের নাম

শিপ্রা মজুমদার (এলাহাবাদ); কমল নন্দী (দিল্লী); জয়ন্ত রায় (কলিকাতা); নূরজাহান বেগম (ঢাকা); সাধনা দেবী ও শিবু (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

```
   ৬৮৭০৫০
      ১২৩
---------
   ৬৭৮০০৫
  ১৩৫০৭০০
 ২০৫৩৫০০
---------
২১৭৭৯৮৫০০
```

ছাপাখানায় একটা অঙ্কের বই ছাপা হচ্ছিল। মেশিন-ম্যান্ ছাপতে ছাপতে অসতর্ক হওয়ায় কতকগুলি টাইপ্ খুলে পড়ে গেল। পাছে ধরা পড়ে এজন্য সে কাউকে কিছু না ব'লে নিজেই বুদ্ধি ক'রে টাইপ্‌গুলো ফের বসিয়ে নিল; কিন্তু ও ভাবে অন্দাজে ঠিক ঠিক বসান যাবে কেন? বই ছাপা হ'লে দেখা গেল যেটা ছিল একটা কষা গুণ অঙ্ক, সেটা, সংখ্যাগুলো ওলট্‌পালট্ হয়ে গিয়ে, এক কিম্ভূতকিমাকার অঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে উত্তরটা ভাঙ্গে নি—সেটা ঠিক আছে। তোমরা ওলটপালট সংখ্যাগুলো ঠিক মত সাজিয়ে দিতে পার?

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই...

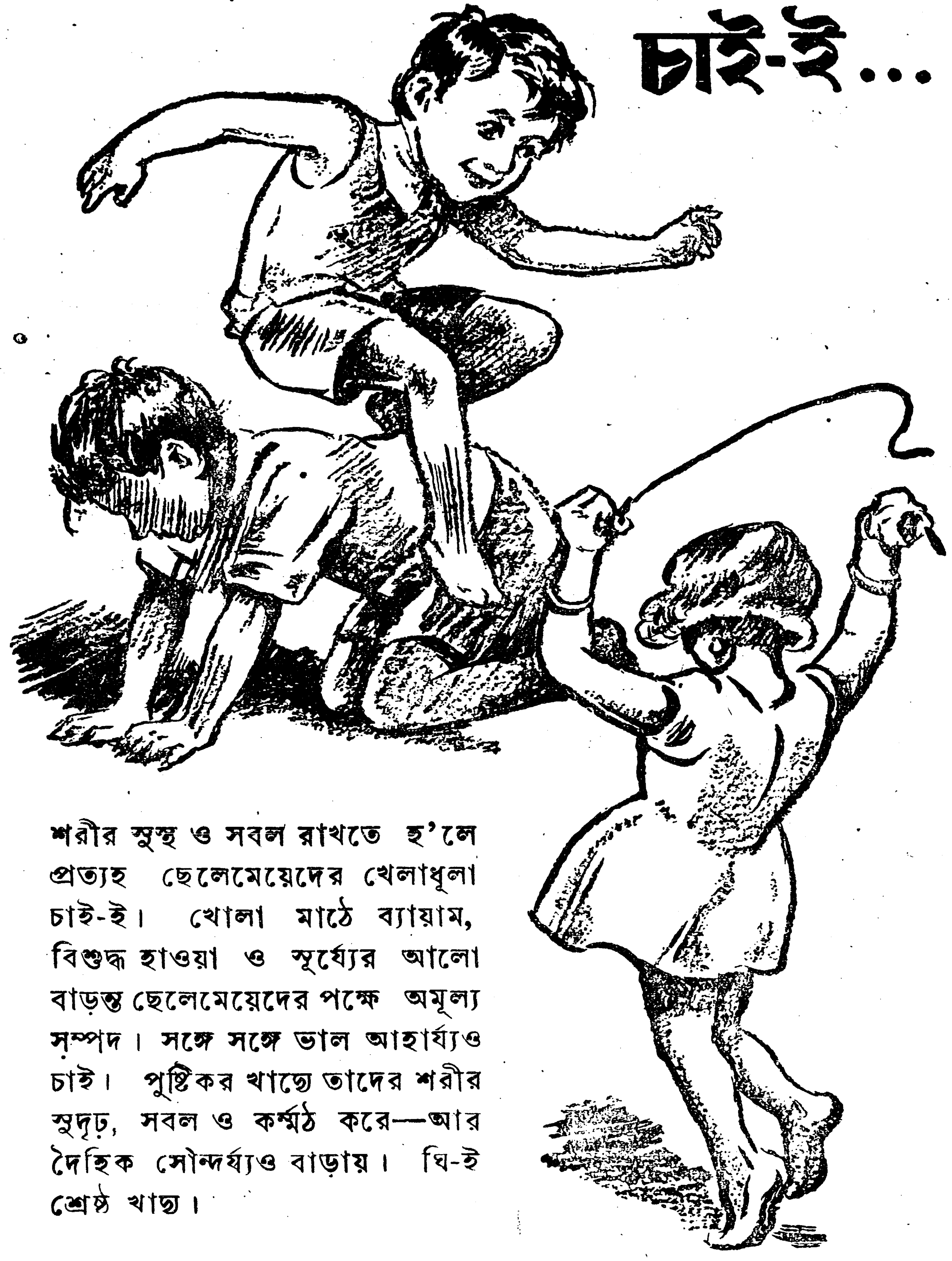

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সঙ্গে সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—আর দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়। ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

লক্ষ্মী ঘি

Regd. No. C—1641

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৬শ বর্ষ
২শ সংখ্যা
চৈত্র
১৩৫০

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১৸৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গাহস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৮৲ টাকা

Regd. No. C—1641

রামধনু

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৬শ বর্ষ
২শ সংখ্যা
চৈত্র
১৩৫০

মাত্র ৭ টি ঔষধ | মাত্র ১৪ টি ঔষধ
পকেট কেস ও পুস্তক সহ
মূল্য ৮ টাকা

বার্ষিক ৩
ষান্মাসিক ১।৵০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে

বাহির হইয়াছে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বলদর্পী হিটলার

বর্ত্তমান জগতের যুগান্তকারী এডল্‌ফ্‌ হিট্‌লারের স্ব-লিখিত Mein Kampf অবলম্বনে রচিত অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী। অতীতের অতিনগণ্য সৈনিক আজ বিশ্ব-বিপ্লবের প্রধান নেতা। তাঁহারই অত্যুজ্জ্বল জীবন-চিত্র।

মূল্য—১৲ টাকা মাত্র

শ্রীসরলা নন্দী ও প্রফুল্লনলিনী নন্দী প্রণীত

প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

প্রেমাবতার যীশুখৃষ্টের অলৌকিক জীবন-কাহিনী—সরল ভাষায় লিখিত।

মূল্য—৸০ আনা মাত্র।

বার্ম্মা-প্রবাসী—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বোমার ভয়ে বার্ম্মা ত্যাগ

জাপানী আক্রমণে বিপন্ন হইয়া গ্রন্থকার কেমন করিয়া সপরিবারে হাঁটা পথে বার্ম্মা হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহারই জলন্ত চিত্র। উপন্যাসের চেয়েও মধুর। পড়িতে বসিলে কেহ শেষ না করিয়া উঠিতে পারিবে না। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

Dev's Concise Dictionary

By A. T. Dev

যাবতীয় প্রয়োজনীয় ইংরেজী শব্দের বাংলা উচ্চারণ, বাংলা ও ইংরেজী প্রতিশব্দ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আকারে Oxford Pocket Dictionaryর মত—পাঠ্য-পুস্তকের মত Handy. ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

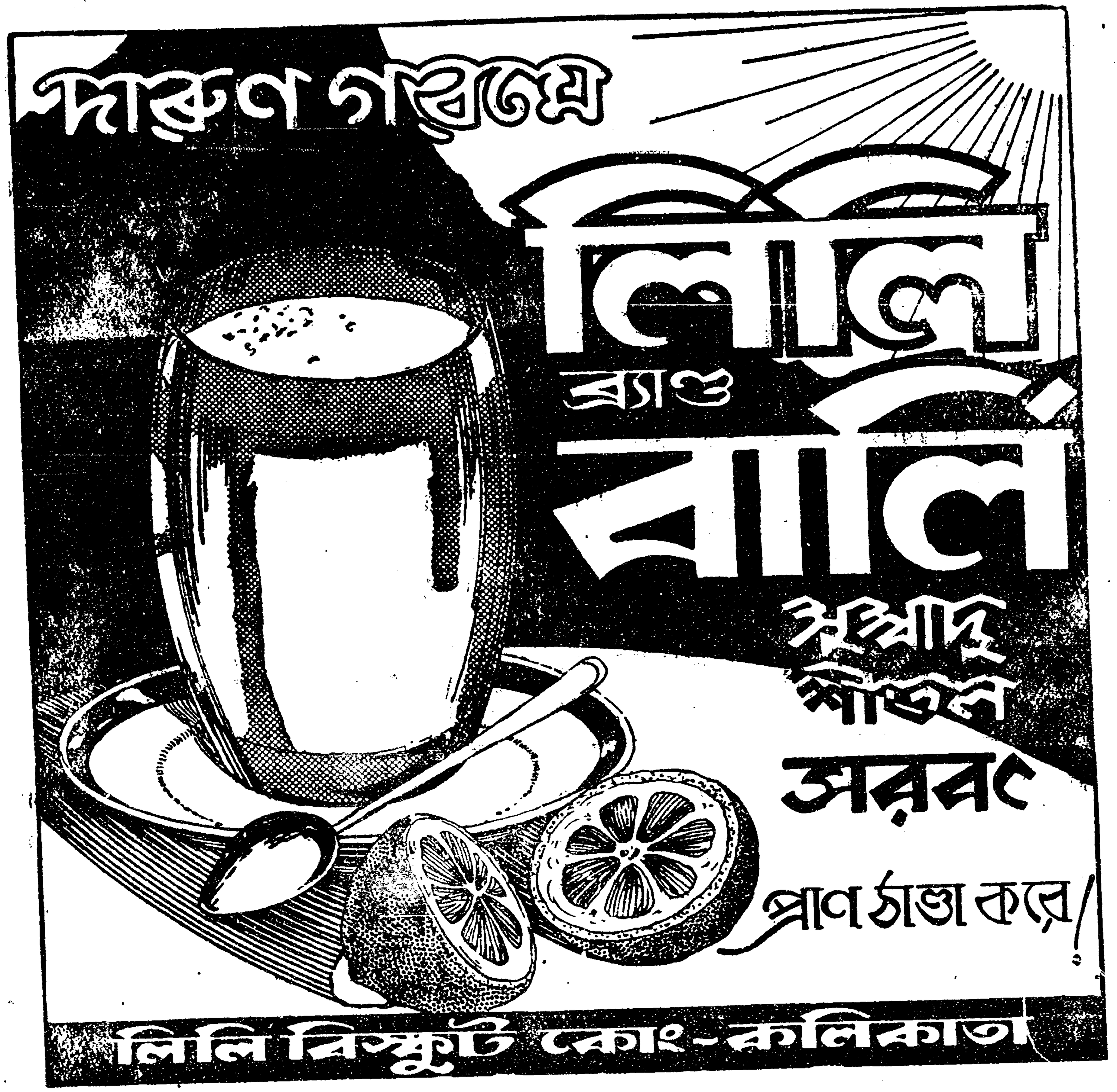

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৬শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৫০ { ১২শ সংখ্যা

লাল করবীর গাছ

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাল করবীর গাছ—বুঝি তার
বয়স ছ' মাস হবে,
সে না জানি ফুল ফোটাতে
শিখ্‌লে আবার কবে!
প্রথম তারার শিশির ধারা
ঝরেছে তার কোলে,
চিকণ কচি শাখাগুলি
ভোরের হাওয়ায় দোলে।

কোন্ গোপনে মা আছে ওর
মুখের পানে চেয়ে,
ভালবাসার রাঙা ফুলে
বুক গিয়েছে ছেয়ে।
গুরুমশাই আসে না ওর—
নেইক' পড়ার তাড়া,
ফুটে ওঠার পুঁথি পড়া
একটী রাতেই সারা।

ভাব করেছে সবার সাথে—
প্রজাপতি, ভ্রমর,
খুকুর ঠোঁটের হাসিখানি
ওই ফুলেতে অমর।
লাল করবীর গাছ—বাড়ী ওর
ফাগুন মাসের দেশে,
ফাগুন-ভোরে ফুল ফোটাল
মোদের বাড়ী এসে।

শিবুর কথা

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ.

ভাই রামধনু, যদিও শিবুর বিষয়ে সব কথাই তোমাকে বলা উচিত তবু অনেক ভুলে টুলে গেছি বলে সে আর গেল না। তবু যা একটু আধ্টু মনে আছে তোমাকে লিখে পাঠাচ্ছি। আশা করি তুমিও এ সব ভুলে মেরে দেবে না; কারণ ভাই, কিছু মনে ক'রো না, কিন্তু তোমার এখনও অনেক শেখবার বাকী আছে।

শিবু, শিবুর মা, আর শিবুর বৌ ৩ নং হোগ্‌লাপট্টি লেনের দোতালার তিনখানি ঘর ভাড়া নিয়ে থাক্‌তো।

একটা ঘরে শিবুর মা শু'তো, সেটা সব থেকে বড় ও ভালো, কারণ বুড়ী ভারী খিট্‌খিটে। আরেকটাতে শিবু আর শিবুর বৌ শু'তো, সেটা মাঝারি সাইজের। আর সব থেকে ছোটটাতে শিবু, শিবুর মা আর শিবুর বৌ তিনটে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে, কানা তোলা বড় বড় কাঁসার থালায় ভাত খেতো, বড় বড় কাঁসার বাটিতে ঝোল খেতো, আর বড় বড় কাঁসার গেলাসে জল খেতো; কিন্তু নূন আর লঙ্কা রাখ্‌তো থালার পাশে সান বাঁধান মেঝের উপর।

আগে খেতো শিবু আর শিবুর মা, দরজার দিকে পিঠ ক'রে পাশাপাশি বসে। তা'রা উঠে গেলে খেতো শিবুর বৌ, দরজার দিকে মুখ ক'রে। কিন্তু শিবুর বৌ সব থেকে বড় মাছটা নিজের জন্য তুলে রাখ্‌তো। শিবু জান্‌তো না ব'লে রাগ করতো না।

শিবু রোজ রাত্রে খেয়েদেয়ে, মুখে একটা পান পূরে, একটা শাবল, একটা শেড্ লাগানো লণ্ঠন আর এক থলে হাতিয়ার হাতে নিয়ে চুরী করতে বেরুতো। কারণ শিবু ছিলো অসাধারণ সাহসী, পুলিশটুলিশ দেখে কেয়ার করতো না। তা ছাড়া শিবু অসম্ভব রকম দৌড়তে পারত, আর টীকৃটিকির মতন জলের পাইপ্ বেয়ে নিমেষের মধ্যে তিনতলায় উঠে যেতে পারতো।

যাই হোক্, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শিবু নিজের ঘরে যেতো রেডী হবার জন্য, আর শিবুর বৌ অম্‌নি রান্নাঘরের দরজার দিকে মুখ ক'রে খেতে বস্‌তো।

শিবুর মা নিজের ঘর থেকে ডেকে বল্‌তো: "হ্যাঁরে শিবে! জামা ছেড়ে উঁচু করে ধুতী মাল্‌কোঁচা মেরে পরেছিস্ ত'?"

শিবু বল্‌তো—"সে আর তোমায় ব'লে দিতে হবে না।"

শিবুর মা বল্‌তো—"গায়ে আচ্ছা ক'রে তেল মেখে নিতে ভুলিস্ না।"

শিবু বল্‌তো—"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ!"

শিবুর মা তবু বল্‌তো—"শাবল, লণ্ঠন, থলে সব নিয়েছিস্?"

শিবু বল্‌তো—"কি মুস্কিল!"

তখন রান্নাঘর থেকে শিবুর বৌ ভাত-খাওয়া গলায় বল্‌তো, "দেখে শুনে আন্‌বে, ছেঁড়াফাটা না হয় যেন।"

শিবু বল্‌তো—"জ্বালালে দেখ্‌ছি!"

আর শিবুর মা আর শিবুর বৌ একসঙ্গে বল্‌তো—"দুগ্‌গা দুগ্‌গা! হরিনারায়ণ!"

শিবুও অমনি চট্ ক'রে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো।

শিবুর মা তখন নিজের ঘরে আবার ফিরে খাটের নীচে, ট্রাঙ্কের পেছনে, আনাচে কানাচে দেখ্‌তো সব জিনিষ ঠিক আছে কি না। তার ঘরভরা কত জিনিষ, রূপোবাঁধানো গড়গড়া, দাঁড়ানো ঘড়ি, গ্রামোফোনের চোং, মেম্‌দের হ্যাণ্ডব্যাগ, পাউডার কৌটো, এইসব। এদিকে চোর ছ্যাঁচোড়ের যা উপদ্রব!

বুড়ীর ছিলো সজাগ ঘুম। শিবু বাড়ী ফিরতেই যেই সিঁড়ির আল্‌গা রেলিংটা ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ করতো, মা'র ঘুম যেতো ছুটে, আর যা কিছু ভালো জিনিষ বুড়ী আগেই গাপ্ করতো।

বৌয়ের ওদিকে অ্যায়সা ঘুম যে সকালে চা তেষ্টা পেলে ঠেলা না দিলে ওঠে না। সেও উঠেই কতক জিনিষ বাক্সে তোলে—মালা, আংটি, রুমাল, সিগারেট্ কেস্। আর বাদ বাকী যা' থাকে শিবু তাই বিক্রী ক'রে সংসার চালায়।

তবে দিনে দিনে শিবুও চালাক্ হয়ে গেছে। সেও অর্দ্ধেক জিনিষ আগেই গছিয়ে আসে।

এম্‌নি ক'রে পূজোর সময় এসে গেলো।

মহালয়ার দিন। শিবু রাতে খেতে বসে ভাব্‌ছে যে একটা মোটা রকমের দাঁও মারতে না পারলে তো আর এই মা-টিকে আর গিন্নীটিকে ঠেকানো যাবে না।

এমন সময় একজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে রান্নাঘরের দরজায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালো।

শিবুর বৌ অম্‌নি জিভ্ কেটে ঘোম্‌টা দিলো।

লোকটার একটা চোখ আছে, আরেকটার উপর সবুজ একটা তাপ্পি মারা। নাকটা কার ঘুঁষি খেয়ে থ্যাব্‌ড়াপানা হ'য়ে গেছে, থুত্‌নিটা বুল্‌ডগের মতন, মাথার চুলে কদমছাঁট্, গায়ে একটা কালো হাফ প্যাণ্ট আর সাদা হাতাওয়ালা গেঞ্জি।

শিবুর তখন খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। সে জল খেয়ে, গেলাসটা থালার ঠিক মধ্যিখানে রেখে, লোকটিকে বল্ল—"গুপী! কি মনে করে?"

গুপী কোনও কথা না ব'লে ডান হাতের বক্‌বার আঙ্গুল বেঁকিয়ে শিবুকে ডাক্‌লো। শিবু উঠে বাইরে গেলো।

এতক্ষণ শিবুর মা ও শিবুর বৌ একহাত ক'রে ঘোম্‌টা দিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে বসে ছিলো, এবার তারা আবার এদিকে ফিরলো। শিবুর মা মস্ত এক গ্রাস ভাত মুখে পূরলো আর শিবুর বৌ নথ খুঁট্‌তে লাগ্‌লো।

এদিকে গুপী শিবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে জোরে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্‌লো—"শিবে, তুই রাজা হ'বি! আজ তোর কপাল খুলে যাবেরে শা—! চিংড়িহাটার জমিদারের বাড়ী চিনিস্ ত'? সেই যেখানে আমার মামতো ভাই চাকরি করে? সেই যে দোতলার লোহার সিন্ধুকে ইয়া ইয়া পায়রার ডিমের মতন মণিমুক্তো আছে! আজ কেউ বাড়ী থাকবে না। গিন্নী রেগেমেগে ছেলেপুলে, সেপাই, ডালকুত্তো আর বাপের বাড়ীর গয়না নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছেন। জমিদার বাবুও রেগেমেগে মাছ ধরতে চলে গেছেন। কাল সব ফিরে আসবে যে যার রাগ পড়লে। আজ রাতে বুঝলি কি না—"

শিবু বল্‌লো—"গয়না নিয়েই না চলে গেছে?"

গুপী বল্‌লো—"সে তো শুধু বাপের বাড়ীর গয়না, আসলগুলো এখানে!"

শিবু—"তোর তা'তে কি?"

গুপী—"তুই কাজ বাগাবি, তিন ভাগ তোর। আমি খবর এনেছি, এক ভাগ আমার। রাজী?"

শিবু বল্‌লো—"রাজী।" গুপী চলে গেলো।

মার আর বৌয়ের উৎসাহ দেখে কে? "ওরে শিবে, দেরী করিস্ নি!" "পায়রার ডিমের মতন দুটো একটা আমরা নেব।"

শেষ পর্য্যন্ত তোড়জোড় করে শিবু বেরুলো।

গভীর রাত্রে চিংড়িহাটার চেহারা বদ্‌লে গেছে। বাড়ীগুলো আরো কাছাকাছি ঘেঁসে এসেছে, মাঝের গলিগুলো আরও সরু, আরও লম্বা হ'য়ে গেছে। থেকে থেকে বিরাট বিরাট ষাঁড় দিব্যি নিশ্চিন্তে পথ যুড়ে শুয়ে আছে, অন্ধকারে তাদের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানুষের সাড়া নেই, খালি পথের ধারে ডাষ্টবিনের পাশে মড়াখেকো খেঁকী কুকুর পেছনের ঠ্যাংয়ের ফাঁকে ল্যাজ গুঁজে আকাশের দিকে মুখ ক'রে বিশ্রী করে ডাক্‌ছে। আকাশে একটু একটু মেঘ, আর চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার।

এমন সময় শিবু এসে সেখানে পৌছালো।

মস্ত বাড়ীটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। কিন্তু শিবুর নাড়ীনক্ষত্র সব জানা ছিলো। পেছন দিক্ দিয়ে গিয়ে উঠোনের পাঁচীল টপ্‌কে শিবু একগাদা ঘুঁটের উপর পড়লো। সামনে একটা কাঁচের জান্‌লা, তাতে শিক্ দেওয়া নেই; অন্য দিন এখানে ডালকুত্তো বাঁধা থাকে।

শিবু তখন পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ সুরু করলো। বাঁ হাতে একটা আঠা লাগানো কাগজের একটা দিক্ জান্‌লার কাঁচে সেঁটে দিলো; তারপর ডান হাতে একটা ন্যাক্‌ড়া জড়ানো হাতুড়ী দিয়ে এক ঘা দিতেই কাঁচটা ভেঙে গেলো। কোনও আওয়াজ হ'ল না, ভাঙা কাঁচটা কাগজে আট্‌কে ঝুলে রইলো।

শিবু তখন সেই ফুটো দিয়ে হাত গলিয়ে ছিট্‌কিনি তুলে জান্‌লা খুলে ফেল্‌লো আর এক নিমিষে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

একেবারে নিঝুম ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার; শিবু খুব সাবধানে এগুতে লাগ্‌লো। আলোর ঢাক্‌নিটা একটু তুলে দেখ্‌লো চওড়া শ্বেত পাথরের ছক্ কাটা বারাণ্ডা, তার এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, তার আবার ধাপে ধাপে খোঁচা খোঁচা কি সব গাছপালা পেতলের হাঁড়িতে বসানো।

জনমানুষের সাড়া নেই।

শিবু উপরে উঠবার জন্য সবে এক পা তুলেছে এমন সময়ে নাকে এলো কিসের একটা কেমন চেনা চেনা সোঁদা সোঁদা আঁষ্টে গন্ধ।

শিবু ঘুরে দাঁড়ালো। তার মুখচোখের চেহারা অবধি বদ্‌লে গেলো। শিকার দেখ্‌লে বেড়ালের যেমন হয়।

নাক উঁচু ক'রে শুঁকতে শুঁকতে সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে একেবারে ভাঁড়ার ঘরের সাম্নে হাজির। দরজায় মস্ত তালা মারা, কিন্তু শিকলির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা চোখ-ভোলানো একটা আট সেরি কাৎলা মাছ ঝুলে রয়েছে।

শিবুর মন থেকে আর সব কিছু মুছে গেলো। এ যে সাত রাজার ধনের বাড়া কাৎলা মাছ! শিবু কাৎলা মাছের দড়ি কেটে নামিয়ে নিয়ে পিঠে ফেলে সোজা সদর দরজা খুলে, আবার সেটা সযত্নে ভেজিয়ে রেখে, একেবারে সটাং ৩ নং হোগ্‌লাপট্টি।

সিঁড়ির ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শুনে শিবুর মা দৌড়ে এসে বল্‌লো—"কই, পায়রার ডিমের মতন?" তারপর মাছ দেখে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বল্ল, "অ শিবে! এমনটি যে পনেরো বছর দেখি নি! সের দশেক হ'বে নারে?"

বৌও জেগে ছিলো, ধুপ্ ধাপ্ করে দৌড়ে এসে বল্ল—"পায়রার ডিমের মতন সত্যি?" তারপর মাছ দেখে গালে হাত দিয়ে বল্‌লো—"আরে বাবারে! এমনটি যে জন্মে দেখি নি! বড় বঁটিটা বের করতে হ'বে দেখ্‌ছি!"

শিবু মাছটা তার হাতে দিয়ে বল্লো—"তিন ভাগ আমার, এক ভাগ গুপীর। ও খবর এনেছে।"

ক্রমবিবর্তনের 'ক খ'

অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি

"ওঃ ডারউইন? হ্যাঁ, তাকে আর চিনি না—যে বলে আমাদের পূর্বপুরুষদের এক-একটা করে লেজ ছিল? রামচন্দ্র! ওর কথা আবার মানুষে শোনে! তাঁর লেজ আছে কিনা তিনি দেখুন গিয়ে—আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে টানাটানি কেন রে বাপু? মানুষের পূর্বপুরুষ বানর? ছিঃ!"

এ রকম কথা এক সময়ে ঘরে ঘরে শোনা যেত। কিন্তু আজ ডারউইনের কথা সবাই মেনে নিয়েছে। এ মেনে নেওয়া সত্বেও আমাদের বিপদ্ কোথায় জান? আমাদের একটা স্বভাব, কোন মানুষ যদি খুব বড় হয়ে যায় তখন আমরা, তিনি সত্যি সত্যি কি বলেছেন সে সব কথা ভুলে গিয়ে, শুধু তাঁর পূজো নিয়েই ব্যস্ত থাকি। এই দেখ না, যাদের জন্য আজ পৃথিবীতে রক্তের স্রোত বইছে তারা হয় যীশুখৃষ্ট নয় বুদ্ধদেবের ভক্ত। তারা যীশুখৃষ্ট কিংবা বুদ্ধদেবের পূজো করে কিন্তু তাঁদের কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমাদেরও হ'য়েছে তাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু কিংবা চার্লস্ ডারউনের কথা আমরা কে না জানি? কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—এঁরা কি করেছিলেন? তখন আমরা অনেকেই বলব যে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন আর ডারউইনের "আবিষ্কার" হচ্ছে ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)। খুব কম লোকেই জানে দুটো কথাই ভুল। এই দুটো সত্য অনেক আগে থেকেই জানা ছিল। কাযেই এই সব মহাপুরুষদের সম্মান দেখাতে হ'লে আমাদের উচিত নয় কি এঁরা সত্যি সত্যি কি বলেছেন তাই জানা? আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কথা এখন থাক্, আজ শুধু ডারউইনের কথাই আলোচনা করব।

ডারউইনের সব কথা আলোচনা করতে গেলে যতটা জায়গা লাগবে তোমাদের সম্পাদক মশাই নিশ্চয় আমাকে ততটা জায়গা দিতে পারবেন না। কাজেই আজকে শুধু ডারউইনের গোড়ার কথাটাই আমরা দেখব।

বাইবেলে লেখা আছে কোন এক শুভমুহূর্তে ভগবান্ পৃথিবীতে সমস্ত রকমের জীবজন্তু এবং মানুষের সৃষ্টি করলেন। সুতরাং সমস্ত খৃষ্টানরা ভাবল সৃষ্টির সব কথা ত' বলা হয়ে গেল—আর কিছু ভাবাও পাপ। কিন্তু এ রকম অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা অন্য পাঁচজন যা ভাবে তা ছাড়াও স্বাধীন চিন্তা করতে পারেন। এই "অপরাধের" জন্য এঁদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। শুধু পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে (এ কথাও বাইবেল-বিরুদ্ধ) এই কথাটা কোপার্নিকাস বুঝতে পেরেও বলতে সাহস পান নি এবং বলার জন্য ব্রুণোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, টাইকোব্রাহেকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয় এবং গ্যালিলিওকে সত্তর বৎসর বয়সে জেলে পচে মরতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত তবু কিন্তু সত্যেরই জয় হয়। আমাদের এই বিষয়েও বহুদিন থেকেই অনেক পণ্ডিত ভেবে দেখেছিলেন যে বাইবেলের ঐ সৃষ্টির গল্প একেবারেই গল্প। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করে সকলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবীতে বড় বড় জীবজন্তু ছিল কিন্তু মানুষ ছিল না। তারো আগে ছিল শুধু ছোট ছোট জীব-জন্তু আর গাছপালা। আবার তারো আগে পৃথিবীতে কোন প্রাণীই ছিল না। তা'হলে একসঙ্গে

গাছপালা, জীবজন্তু ও পৃথিবী সৃষ্টির গল্প একেবারেই গাঁজাখুরি নয় কি? এটা সকলেই ধরে নিয়েছিলেন—এক সময়ে ছোট ছোট জীবজন্তু, গাছপালা, তারপর বড় বড় জীবজন্তু (যেমন বানর) এবং শেষকালে ঐ বড় বড় জীবজন্তু থেকেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। এটাই হোল বিবর্তনবাদ বা Theory of Evolution। যে সব পণ্ডিত এ সব নিয়ে ভাবতেন তাঁরা যে শুধু বৈজ্ঞানিকই ছিলেন তা' নয়— নানা রকমের মনীষীই আমরা এঁদের মধ্যে দেখতে পাই। যেমন ধর, বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দ্য' ভিঞ্চি (যাঁর বিখ্যাত ছবি 'মোনা লিসা' এবং 'লাষ্ট সাপার'), বিখ্যাত জার্মান্ কবি গ্যেটে কিংবা চার্লস্ ডারউইনের পিতামহ ইরাসমাস ডারউইন। কিন্তু সবাইকেই এক জায়গায় ঠেকে যেতে হোত—এক জাতের জীব থেকে অন্য জাতের জীব কেমন করে সৃষ্টি হোল?

প্রথম এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন ফরাসী পণ্ডিত জীন লামার্ক। তিনি বললেন—'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়?' ধর একটা বিরাট মাঠে হাজার হাজার জেব্রা বাস করে। কিছু দিন পরে হয়ত সে অঞ্চলে এমন কোন পরিবর্তন হোল যে ঘাস আর জন্মায় না—খালি বড় বড় গাছ হ'তে লাগল। জেব্রারা দেখল ঘাড় নীচু করে ঘাস খাওয়ার আর উপায় নেই—ঘাড় 'টান করে উঁচু করে গাছের পাতা খেতে হয়। তখন তারা ভাবতে লাগল—আহা, আমাদের ঘাড় যদি আরেকটু লম্বা হোত! সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগলো চেষ্টা। হাজার হাজার বছর ধরে বংশানুপরম্পরায় এই চেষ্টার ফলে জেব্রা থেকে লম্বা গলা জিরাফের সৃষ্টি হোল।

লামার্কের পরে এলেন চার্লস্ ডারউইন। বিবর্তনবাদের কথা এত দিন পণ্ডিতদের মধ্যেই চলত। কিন্তু ডারউইন এত সহজ ভাবে এই মত প্রচার করতে লাগলেন যে বাগানের মালীও বুঝতে পারে। এটাই তাঁর বাহাদুরী এবং এই জন্যই তাঁর এত নাম। তিনি বললেন, বিবর্তনবাদ বুঝতে চাও ত' বাগানে যাও। দেখবে একটা গাছের পঞ্চাশ কি হাজার চারা হয়—মালী তার মধ্যে বেছে হয়ত পাঁচটা রাখে। মালী যদি বড় ফুল চায় সে শুধু বড় ফুলওয়ালা গাছের চারা রাখে। এমনি করে সে বড় ফুলওয়ালা গাছের সৃষ্টি করে। এমনি বাছাই প্রকৃতিতেও চলছে—সেখানে মালীর জায়গা নিয়েছেন স্বয়ং প্রকৃতিদেবী। যে কোন গাছ বা প্রাণীর সমস্ত চারা বা বাচ্চা যদি বাঁচে তবে খুব অল্প সময়েই তা' পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। কিন্তু দেখা যায় সব বাঁচে না—সামান্যই বাঁচে। সত্যি সত্যি যেগুলি শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি সেগুলিকেই বেছে নেয়। এমনি করে এক জাতের জীব থেকে আর এক জাতের জীবের সৃষ্টি হতে পারে। ধর, এক জায়গায় এক জাতের শান্তশিষ্ট নিরীহ জীব চরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময়ে প্রকৃতিদেবী সেখানে বিদেশ থেকে এক

জাতের হিংস্র জীব আমদানী করলেন। ব্যস্, হিংস্র জীবদের সঙ্গে নিরীহ জীবদের লড়াই চল্‌ল। এখন, নিরীহ জীবদের দু' একটার হয়ত কেমন করে মাথাটা একটু শক্ত ছিল—তাই দিয়ে তারা এমন লড়াই করল যে তারা বেঁচে গেল, যদিও তাদের অন্য নরম মাথাওয়ালা সঙ্গীরা কেউ বাঁচল না। এই জন্তুদের যে বাচ্চা হোল তাদের মধ্যে কতকগুলোর মাথার ঐ শক্ত জায়গা আরো বেড়ে গিয়ে ছোট শিংএর মত হোল। শেষ পর্য্যন্ত এই শিংওয়ালারাই টিঁকল। এমনি করে শিং-শূন্য জাত থেকে শিংওয়ালা জাতের সৃষ্টি হোল।

বহু পণ্ডিত ডারউইনবাদ এবং লামার্কবাদের মধ্যে খুব মতভেদ না দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও পরে লামার্কবাদী এবং ডারউইনবাদীদের মধ্যে দারুণ তর্কবিতর্ক আরম্ভ হোল। লামার্কবাদীদের প্রধান কথা হোল যে নানারকম অবস্থায় পড়ে জীব পুরুষানুক্রমে নিজের চেষ্টায় নিজের চেহারা বদলায়। ডারউইনবাদীরা বল্লেন—তা নয়, প্রাকৃতিক নিয়মে জীবের চেহারা আপনি বদলায়—তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতরগুলি বেঁচে যায়। ডারউইনবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করা যায় জার্মান পণ্ডিত বহাইস্‌মানের (Weismann)। ডারউইনবাদীদের প্রধান কথা হোল যে কোন জীব যদি নিজের চেষ্টায় শারীরিক কোন পরিবর্তন করে তবে সন্তান সেই পরিবর্তন পাবে এমন কোন কথা নেই। ডারউইনবাদীগণ এমন অনেক 'প্রমাণ' উপস্থিত করেছিলেন এখন অনেকে যে সবকে ঠাট্টা করেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ডারউইনবাদীদেরই জিত হোল, কারণ এটা কে না জানে যে এক হাত কাটা লোকের এক হাত কাটা ছেলে হয় না। কিন্তু তর্কে জিতেও শেষ পর্য্যন্ত তাদের হেরেই যেতে হোল। কেন তাই বলছি।

এ পর্য্যন্ত হাতে কলমে পরীক্ষা খুব বেশী হয় নি। এবার কয়েকজন পণ্ডিত (যেমন জোহানসেন) তাঁদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করলেন। তাঁরা পরিষ্কার প্রমাণ করলেন যে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে জীবের এমন কোন পরিবর্তন হয় না যাতে নূতন জীবের সৃষ্টি হ'তে পারে। সাধারণতঃ আমরা বাগানে মিশ্রিত জাতের গাছ দেখি—তাই মনে হয় চারাগুলি বুঝি নানা রকমের হোল। কিন্তু তা সত্যি নয়। ধর, ক্রমাগত বাছতে বাছতে এক ইঞ্চি ফুলওয়ালা গাছ থেকে ১০ ইঞ্চি ফুলওয়ালা গাছ করা অসম্ভব। লুথার বুরবঙ্ক ইত্যাদি "গাছের যাদুকরের" নতুন গাছ তৈরী করার যে সব কথা শোন তা' করা হয় সম্পূর্ণ অন্য নিয়মে—সেটা তোমরা বড় হলে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে রকম করেও নূতন জাত সৃষ্টি করা যায় না। মোটের উপর সবাই বুঝতে পারলেন যে ডারউইনের নিয়মে নূতন জীব সৃষ্টি হ'তে পারে না।

পণ্ডিতেরা এবার মহা চিন্তায় পড়লেন। তা' হলে বিবর্তন হোল কেমন করে? নতুন জীব কেমন করে সৃষ্টি হোল? বিবর্তনবাদ তো আর ভুল নয়!

প্রথম উত্তর এল ডাচ্ পণ্ডিত ডে ভ্রিস্ (De Vrice) এর কাছ থেকে। তিনি এক জাতের গাছ চাষ করতে করতে দেখলেন কচিৎ কখনো এমন এক একটা অদ্ভুত চারা দেখা যায় যেগুলো সাধারণ গাছ থেকে একেবারে আলাদা। তিনি বল্লেন, এমনি 'হঠাৎ পরিবর্তন' (Mutation) থেকে নতুন জীব সৃষ্টি সম্ভব। এই মতের আসল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করলেন আমেরিকান মর্গান্ সাহেব (T. H. Morgan), যার জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তিনি ড্রসফাইলা (Drosophila) বলে এক রকম মাছির মত ছোট পোকা (যাকে তোমরা পচা ফলের উপর উড়তে দেখতে পাও) নিয়ে পরীক্ষা করলেন। তিনি দেখলেন, এ পোকাকে নানারকম অস্বাভাবিক অবস্থাতে (যেমন ভয়ানক গরম, ভয়ানক ঠাণ্ডা, এক্স্-রের আলোর ভিতরে, ইত্যাদি) রাখলে এর ভিতরে একরকম পরিবর্তন হয় যার ফলে এর এমন সব বাচ্চা হয় যেগুলোর সঙ্গে সাধারণ ড্রসফাইলার অনেক তফাৎ।

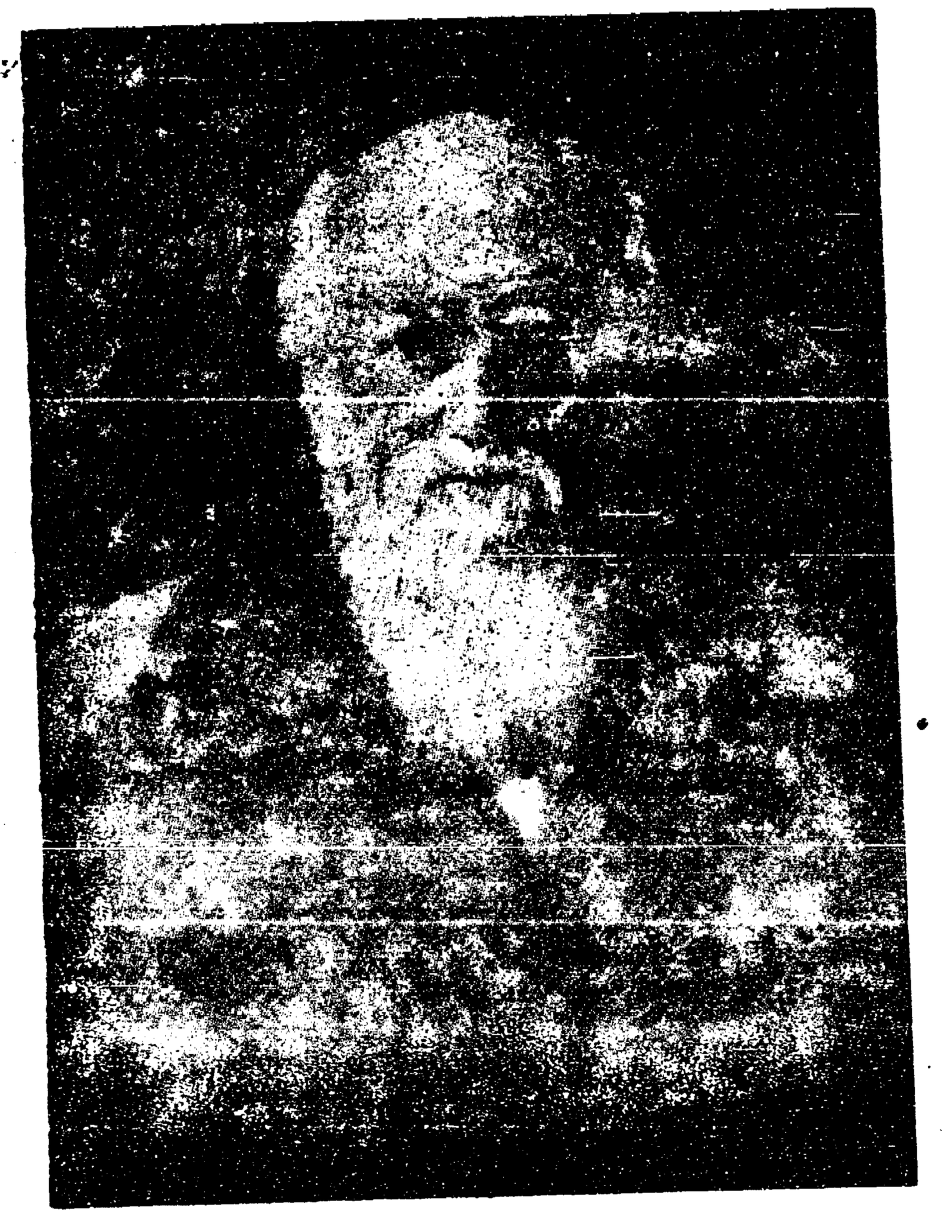

চার্লস্ ডারউইন

এবার মনে হয় আমরা ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি; কিন্তু সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি। হঠাৎ পরিবর্ত্তন (Mutation) হয়ে একেবারে সুস্থ নূতন জাতি সৃষ্টি হতে পারে কিনা তা' আজো বোঝা যায় নি। লেজওয়ালা বানরের হঠাৎ লেজহীন মানুষ বাচ্চা হ'তে পারে না। কিন্তু এ পথে এমন পরিবর্তন হতে পারে যা অন্য পথে হওয়া সম্ভব নয়। এমন হ'তে পারে যে বহুদিন ধরে, অল্প অল্প করে এই নিয়মে পরিবর্তন হয়ে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন এক্স্-রের চেয়েও শক্তিশালী এক রকম শক্তি—কসমিক্ রে (Cosmic Ray) পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীর উপরে এসে পড়ে। অনেকে মনে করেন এই 'কস্মিক রে' হয়ত প্রকৃতিতে অনেক 'হঠাৎ পরিবর্ত্তন' সৃষ্টি করেছে।

এই সঙ্গে কয়েকজন দার্শনিক সাহিত্যিক পণ্ডিতের কথাও না বলে পারা যায় না। যেমন ফরাসী পণ্ডিত বার্গসঁ (Bergson) এবং বিশ্ববিখ্যাত আইরিশ মনীষী বার্ণার্ড শ'। এঁরা দু'জনেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। এঁরা তাঁদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রচার করেছেন—আমাদের ভিতরের ইচ্ছাশক্তিই কি ভাবে আমাদের পরিবর্তন এনে বিবর্তন করতে পারে। অনেকটা লামার্কের মতই এঁরা চিন্তা করেছেন। এঁরা বৈজ্ঞানিক ন'ন—কিন্তু এঁদের কল্পনাকেও একেবারে বাজে বলে ওড়ানো চলে না।

লেজওয়ালা বানর থেকে লেজ-ছাড়া মানুষ কেমন করে এল একেবারে সঠিক তা' আমরা এখনো বুঝি নি কিন্তু যতদূর আমরা অগ্রসর হয়েছি তাতে মনে হয় শীঘ্রই আমরা ঠিক নিয়মটী জানতে পারব। তখন হয়ত দেখব লামার্ক, ডারউইন, বহাইসমান, ডে ভ্রিস্, মর্গান কিংবা দার্শনিক পণ্ডিতেরা কেউই একেবারে ভ্রান্ত ন'ন—প্রকৃত সত্যের মধ্যে প্রত্যেকের মতেরই অংশ রয়েছে।

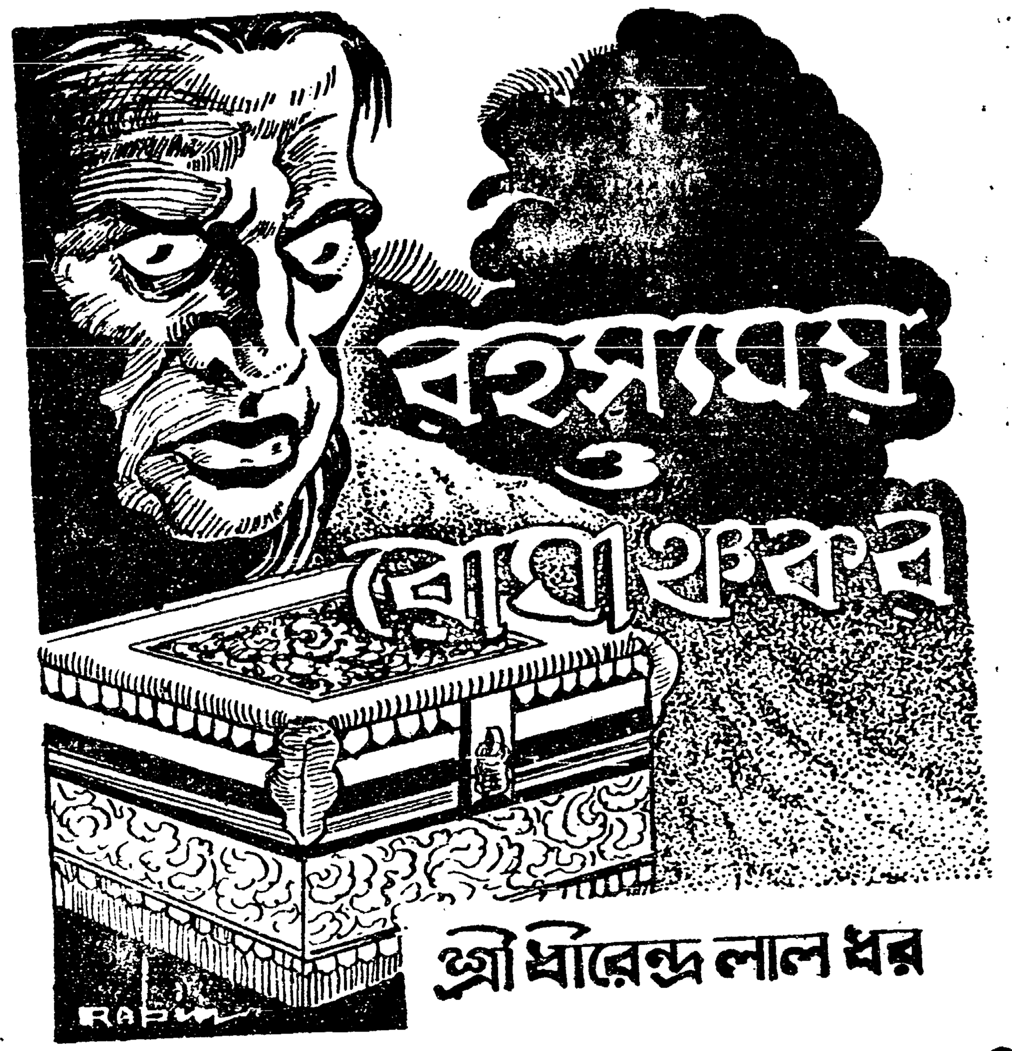

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম কাণ্ড

চমৎকার রাত। অমাবস্যার অন্ধকার কালো জলের মত টল্‌টল্ করছে কলকাতার বুকে। মনে হয় এই অন্ধকারকে যেন ছোঁয়া যায়, দেহের চারিপাশে যেন লেপ্টে আছে এই আঁধার। মুখোমুখী হলেও চেনা মুখকে আর চেনা যায় না। অতি-জানাকেও অন্ধকারের পর্দ্দা আড়াল করে দিয়েছে। বেশের অক্ষমতা, দেহের বিরূপতা চোখে পড়ে না, গতিশীল ছায়াটাই শুধু প্রাণশক্তির একান্ত পরিচয়।

বিদ্যুৎ-আলোকে উচ্ছ্বাসময়ী মহানগরীর বিলাস-মাধুর্য্য দৃষ্টিকে আর ঝলসে দেয় না। একখানি ঝলমলে হীরক সহসা ইন্দ্রনীলে রূপান্তরিত হয়েছে। এই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের বুকে ঠুলি লাগানো আলোগুলি এক একটি স্বল্পপরিসর

ব্যতিক্রম। অমাবস্যার কালো রূপের উপর ওগুলো যেন এক একটি বসন্তের গুটি। ওই আলো-গুলিকে নিভিয়ে দেবার পর মহা-কালো আরো মহীয়ান হয়ে ওঠে। যে সরীসৃপ মানুষের জ্ঞান-গরিমা বহে আনে যুগ থেকে যুগান্তরে, এই অন্ধকারে সে বোধ হয় দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে যায়, কর্ষণার মৃত্যু ঘটে, আর তার সঙ্গে মানুষও হারিয়ে ফেলে তার মনুষ্যত্ব। মানুষ তখন পরস্পরের বুকে ছুরী মারে আর লজ্জা ঢাকে এই ব্ল্যাক্ আউটের অন্ধকারে।

এমনি রাতে টর্চের আলোয় নম্বর দেখে দেখে একজন যুবক বালিগঞ্জের রাস্তা দিয়ে এগুচ্ছিলো। সত্যেনের বাড়ীর নম্বর দেখে সে থমকে দাঁড়ালো।

কলিং বেল্ টিপেছে এমন সময় একটি ছায়া এসে সামনে দাঁড়ালো। যুবক জিজ্ঞেস করলো—কে?

—আমি সত্যেন বাবুর এক বন্ধুর কাছ থেকে আসছি, একখানি চিঠি আছে তাঁর নামে।

চিঠিখানি সে বাড়িয়ে দিলে যুবকের দিকে।

—ও চিঠি দিয়ে আমি কি করবো?

—আপনি তাকে দিয়ে দেবেন।

—আপনার চিঠি আমি দেব কেন?

—চিঠিখানা সত্যেন বাবুর পাওয়া নিয়ে কথা, তা সে যেই দিক না কেন—

—তা হলেও আপনার চিঠি আপনি দেবেন,—বলে যুবক আবার কলিং বেলের দিকে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় এক প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়লো তার মাথার উপর। যুবক ঘুরে পড়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে নেপালী দরোয়ান এসে দাঁড়ালো দরজা খুলে। গতিক সুবিধা নয় দেখে গুণ্ডাটি সরে পড়লো। দরোয়ান হাঁকডাক সুরু করে দিলে।

কারুর কাছে কোন সাহায্য পাবার আগেই যুবক উঠে বসলো। তারপর গায়ের ধুলো ঝেড়ে এসে ঢুকলো বাড়ীর মধ্যে।

সত্যেন নীচে নেমে এসেছিল, যুবককে দেখেই চিনলে। আরে, আপনি!…

যুবক হাসলো, বললে—আপনার বাড়ী! আর আমি খুঁজে মরছি, শেষ পর্য্যন্ত মারও খেলাম!…

এই যুবকই সেদিন লেকে গুণ্ডাদের হাত থেকে সত্যেনকে রক্ষা করেছিল।

সব শুনে সত্যেন বললে—ডাণ্ডা খেলেন তবু মাথা ফাটলো না যে? ঠিক লাগেনি বুঝি?

—লেগেছিল ঠিক, কিন্তু গুরুর দয়ায় রক্ষা পেয়েছি—বলে যুবক মাথার উপর থেকে গান্ধী টুপিটা খুলে ফেললে, দেখা গেল এক গোছা চুলের ঝুঁটি।

সত্যেন বললে— আপনি শিখ বুঝি?

যুবক মৃদু হাসলো।

ভালো করে পরিচয় হোল। যুবকের নাম—মনু সিং, আশুতোষ কলেজে বি-এ পড়ছে।

তারপর মনু আসল কথা পাড়লো: আপনার বাবার নাম দেবেশ বাবু?

—হ্যাঁ, কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন।

—মারা গেছেন!—মনুর মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো, বললে,—তা তিনি যখন নেই, আপনাকেই বলে যাই। বাবা খবর পাঠিয়েছেন—'শশক তিন মাস গর্ত্তের বাইরে বেরিয়েছে।'

—তার মানে?

—মানে তো আমি জানি না, যেটুকু জানাতে বলেছেন, তাই জানালাম।

—আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেই…

—বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন কেমন করে, বাবা তো জেলে। ভারত-রক্ষা আইনে বাবা আটক আছেন।

—তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছেন বুঝি?

—চিঠি নয়, লোকের মুখে খবর দিয়েছেন। বলেছেন দেবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর রবীন্দ্র ঘোষকে জানাতে। তাঁরা এ কথা শুনলেই নাকি সব বুঝতে পারবেন।

—রবীন্দ্র ঘোষ! সত্যেন চমকে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে,—তার ঠিকানাটী কি বলুন তো?

মনু সিং পকেট থেকে একখানি ছোট নোট-বই বের করে রবি ঘোষের ঠিকানাটী পড়ে শোনালো।

সত্যেন হাসলো, বললে—আপনি দেখছি জীবন্ত জগৎ পছন্দ করেন না। ওই রবিবাবুকে ক'দিন আগে আমার এখান থেকে গুণ্ডারা জোর করে ধরে নিয়ে যায়, তারপর তাঁর আর কোন খবর মেলে নি। সাতদিন পরে হুগলীর কাছে তাঁর মৃতদেহ ভেসে ওঠে।

—ব্যাপারটা খুব রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

—আপনার বাবাকে একখানি চিঠি লিখে দিন না, তিনি সব কথা খুলে লিখে দেবেন।

—চিঠিতে আবার অনেক সময় অনেক কথা তো লেখা যায় না।

—গিয়ে দেখা করবেন তারও তো কোন উপায় নেই।

—দেখি তা হ'লে, যদ্দিন না বাবা ছাড়া পান। চুপ করে বসে থাকি গে' ততদিন।—অবশ্য ততদিনে পুলিশ যদি কোন হিসাব-নিকাশ করে ফেলতে পারে তো অন্য কথা।

ষষ্ঠ কাণ্ড

মনুর সঙ্গে সত্যেনের বন্ধুত্ব জমেছে ভালো। মাঝে সে একান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল, এখন মনুকে সাথী পেয়ে বিকালের দিকে প্রতিদিনই সে বেড়াতে বের হয়, কথা কওয়ার মত একজন সঙ্গী পেয়ে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে বেশ প্রসন্ন মনেই সত্যেন বেড়িয়ে ফিরছিল।

ঠিক বেড়িয়ে নয়, ফিরছিল বায়োস্কোপ দেখে। শতাব্দীর সভ্যতা একটা মানুষের জীবনে কি ভাবে আঘাত করে, এক পরিবারের মধ্যে কত বিপর্যয় ঘটাতে পারে তারই একটী সুন্দর কাহিনী ছবিটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে একটা কয়লা-কুঠিকে কেন্দ্র করে। এই ধরণের গল্প এ দেশে সম্ভব হতে পারে না, এ দেশের নৃত্যগীত-বিলাসী ছবিওয়ালারা এই দিক্ থেকে এখনও ভাবতেই শেখে নি। একটী ছোট ছেলে, পাঁচ-ছ'টি ভাইবোন মিলে একটি ছোট সংসার। কয়লার খনিতে কাজ করতে করতে এলো মালিকের সঙ্গে সংঘর্ষ, ভাইয়েরা সহরে চলে গেল, তারপর একদিন বাপের মাথায় ধ্বসে পড়লো খনির ছাদ ··· একটী শোকাবহ আবহাওয়ার মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে। ছবি দেখা শেষ হলেও তার বেদনার সুরটুকু মাথার মধ্যে ঝঙ্কার তুলতে থাকে।

পথ দিয়ে সত্যেন চলছিল চিন্তাচ্ছন্ন বিশ্রস্ত পদক্ষেপে।

হঠাৎ চারিদিক্ সচকিত করে সাইরেন বেজে উঠলো।

দু'দিন আগে বিমান আক্রমণ হয়ে গেছে, সেদিন সাইরেন শুনেও সত্যেন গ্রাহ্য করে নি, বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী ফিরেছে। আশে পাশে যে বোমা পড়েছে তা মনেই হয় নি, কিন্তু পরদিন খবরের কাগজ পড়ে সে ধারণা একেবারে বদলে গেছে। বিরাট নগরীর একদিকে বোমা ফেললে যে আর একদিকে শোনা যায় না, তা এবার সে বুঝেছে। এবং বুঝেছে বলেই ভয় বেড়ে গেছে, কখন কোনখান দিয়ে মাথার উপর বজ্রাঘাতের মত মৃত্যু নেমে আসবে তার ঠিক নেই, সেই জন্যই সাবধান হওয়ার প্রয়োজন।

অন্ধকারে লোক এদিক্ ওদিকে ছুটোছুটি সুরু করে দিলে, চারিদিকে আলো নিভে গেল, বড় বড় বাড়ীর দরজাগুলি বন্ধ হয়ে গেল, সত্যেন কোথায় আশ্রয় নেবে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো।

একজন এ-আর-পি এসে বললে— টেক্ শেলটার, আশ্রয় নিন্—

—কোথায় যাব?

—এই বাড়ীর মধ্যেই ঢুকে যান। আসুন আমার সঙ্গে···

সামনের বাড়ীর দরজাটা বন্ধ ছিল, এ-আর-পির লোক 'নক' করতেই খুলে গেল, সত্যেনকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এ-আর-পিটা চলে গেল।

ভিতরে একজন একটি বেতের মোড়া এগিয়ে দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালো—বসুন!

সত্যেন বসলো।

মাথার উপর দিয়ে গুম্‌গুম্ করে প্লেন চলে যাবার শব্দ শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ, শঙ্কা ও উৎকণ্ঠা সবার মুখে রেখায়িত হয়ে উঠেছে।

সে প্লেনের শব্দ দূরে চলে গেল। সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এ যাত্রা বোধ হয় রক্ষা পাওয়া গেল, এইবার 'অল্ ক্লিয়ার' বাজবে।

কিন্তু ক'মিনিট পরেই আবার ভেসে এলো প্লেনের শব্দ। শব্দটা কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোমা বিস্ফোরণের শব্দও ভেসে এলো—বুম্ বুম্ বুম্!

বিমান-ধ্বংসী কামানে তার প্রতিধ্বনি উঠলো—গুরু গুরু গুরু গুম্!

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কবির কল্পনা ছিল, এখন তা বাস্তব হোল।

আলোর ঝিলিক এসে লাগলো খড়খড়ির ফাঁকে, কম্পন এসে ধাক্কা মারতে লাগলো গৃহের দেয়ালে। তারপর মাথার উপর দিয়ে প্লেনগুলো চলে গেল। আবার সব চুপচাপ।

ক'মিনিট পরে আবার প্লেনের শব্দ···

তিনটি ঘণ্টা এইভাবে কেটে যাবার পর অল্-ক্লিয়ার বাজলো।

সত্যেন উঠে দাঁড়ালো, বললে—চল্‌লাম মশাই, অশেষ ধন্যবাদ···

গৃহস্বামী সত্যেনের একখানি হাত চেপে ধরলেন—তা কি হয়? বসুন। এই এত রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে না খেয়ে চলে যাবেন?

সত্যেন কিন্তু-ভাবে বললে—তা হয় না, আমার বাড়ীতেও তো···

—কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে যে!

—জরুরী কথা?—সত্যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো বক্তার মুখের পানে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জরুরী কথা! সেই কার্ডবোর্ডের ছবিটা আমাদের চাই।

(ক্রমশঃ)

গুণী যেথা নাই নির্গুণ সেথা সহজেই লভে গুণীর স্থান—
বৃক্ষবিহীন বিজন প্রদেশে লভে এরণ্ড বৃক্ষ-মান।

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

অভিযাত্রীর পত্র

শ্রীবিশ্বপতি দাশগুপ্ত

[এই চিঠিগুলি ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি দাশগুপ্ত লিখেছিলেন রামধনুর গ্রাহক শ্রীঅভিমন্যু দাশগুপ্তের কাছে। বিশ্বপতি বাবু পৃথিবীর প্রায় সব ক'টি মহাদেশেই ঘুরেছেন এবং এই চিঠির মধ্যে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। রামধনুর উপযোগী করার জন্য চিঠিগুলি (লেখক ও চিঠির মালিক মিলে) কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে দিয়েছেন। রামধনুর পাঠকদের এ চিঠি ভাল লাগবে বলেই আশা করি।]

রামধনুর ভাইবোনেরা,

ছেলেবেলা থেকেই দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াবার উপর আমার একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। আমার সেই ঘর-ছাড়া দিক্‌হারা প্রবৃত্তিই শেষ পর্য্যন্ত আমাকে টেনে নিল বিরাট্ বিশ্বের মাঝখানে।

আত্মীয় স্বজন বলতে আমার কেউ ছিল না। দেশে কিছু সম্পত্তি ছিল, তারই থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে একদিন বেরিয়ে পড়বার আয়োজন করলাম। আমার বন্ধু বীরেন্দ্র হ'ল এ কাজে আমার প্রধান সহায়। স্থির করলাম বিদেশে যাবার আগে আমাদের নিজের দেশটাকে একটু ভাল ক'রে দেখে যাই।

ভারতের নানা জায়গায় আমি ঘুরেছি। তোমরাও হয়তো গেছ, কাজেই তার বিশদ বিবরণ আমি দেব না, সংক্ষেপে ২।৪টের উল্লেখ করব মাত্র।

* * * * *

শুনেছি একজন আমেরিকান্ 'টুরিষ্ট্' ভারতে এসে তিনটি জিনিষ দেখতে চেয়েছিলেন—হিমালয়, তাজমহল এবং মহাত্মা গান্ধী। দার্জ্জিলীংএ হিমালয় দর্শন ক'রে আমিও আগ্রায় চলে এলাম—তাজমহল দেখব ব'লে।

সন্ধ্যার পর পায়চারী করতে করতে এসে দাঁড়ালুম তাজমহলের সামনে। তাজমহলে ঢুকতে হ'লে লাল বেলে পাথরের তৈরী একটা গেট্ সামনে পড়ে; তার ভিতর দিয়ে তাজমহলকে ফ্রেমে আঁটা ছবির মত দেখায়। গেটের উপর কোরাণের নানা উপদেশাবলী খোদাই করা। এই গেট্‌টিকে বলে তাজগঞ্জ গেট্। গেটের ভিতরে তাজ-উদ্যান। দু'টি উঁচু রাস্তা পরস্পরকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে বাগানকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে। এর এক একটিকে আবার দু'টি দু'টি রাস্তা চার ভাগে ভাগ করেছে। পথের দু'পাশে শোকজ্ঞাপক চিরহরিৎ বৃক্ষশ্রেণী (সাইপ্রেস্), আর চারপাশে অফুরন্ত ফুলের গাছ।

তাজমহল আগাগোড়া শুভ্র মর্ম্মরে তৈরী। প্রতিটি পাথর আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বসান। কোথাও কোথাও লাল, হলদে, সবুজ, নীল প্রভৃতি নানা রংএর পাথর ফুলের মত কেটে কেটে অপরূপ ভাবে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাথর যে এত নিখুঁত ভাবে বসান যেতে পারে তা আর কোথাও দেখি নি।

ক্রমে মাথার উপর চাঁদ উঠল। সে অপরূপ শোভা জীবনে ভুলব না। চিরনবীন তাজমহলের সামনে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

সম্রাট্ শাজাহান তাঁর প্রিয় পত্নী মমতাজমহলের মৃত্যুস্মৃতি উপলক্ষ্যে এই "মর্ম্মর-স্বপ্ন" (সত্যিই তাজমহল পাথরে গড়া স্বপ্নপুরীই বটে) তৈরী করান। তাঁর ইচ্ছে ছিল যমুনার এক তীরে শুভ্র পাথরে যেমন তাজমহল তৈরী হ'ল, তেমনি তার অপর তীরে যেন কালো পাথরে অনুরূপ আর একটি সমাধিসৌধ তৈরী করা হয় এবং তাতে যেন তাঁকে সমাহিত করা হয়। পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন নি; তাজমহলের মধ্যেই মমতাজের পাশে তাঁরও সমাধিশয্যা রচিত হ'য়েছে।

কারো কারো মতে তাজমহল তৈরী করতে ১৮৫০০০০০৲ টাকা লেগেছিল, এবং কারো কারো মতে আরও বেশী, ৩১৭৫০০০০৲ টাকা, ব্যয় হয়েছিল। তাজের গায়ের অপরূপ অক্ষরগুলি খোদাই করেন আমানৎ খাঁ সিরাজী। তাজমহলের প্রধান "রাজমিস্ত্রী" হিসাবে ওস্তাদ্ ঈশা কাজ করেন। এ ছাড়া কাঠের কাজ করেছিলেন ওস্তাদ্ পীরে, স্থপতির কাজ করেছিলেন বানুহর, জাঠমল ও জোরওয়ার। গম্বুজের অংশটি গড়েছিলেন ইসমাইল খাঁ রুমি, বাগান তৈরী করেছিলেন রামমল কাশ্মীরী এবং এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মীর আফজল করীম ও মুকরমৎ খাঁ। তাজমহল তৈরী করতে ২২ বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল। সে সময় তেভার্নিয়ার নামে একজন ফরাসী এ দেশে ছিলেন। তিনি এর নির্ম্মাণ কার্য্য প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখেন।

তাজমহলের পর দেখলাম আগ্রার কেল্লা। কেল্লাটি প্রায় এক মাইল জায়গা যুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাল বেলে পাথরের তৈরী দুর্গ-প্রাচীরটি প্রায় সত্তর ফুট উঁচু। দুর্গের ভিতর মোগল-রাজপরিবারের কত চিহ্ন ছড়ান রয়েছে—কত ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়ান রয়েছে তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এ ছাড়া এখানকার মতি মস্‌জিদ, জামি মস্‌জিদ ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

আগ্রা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সেকেন্দ্রা। মহামতি আকবরের সমাধি এখানে। এই আকবর চেয়েছিলেন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতির বিভেদ তুলে সমস্ত ভারতবাসীকে এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত মহাজাতিতে পরিণত করতে। এই সমাধি-মন্দির তাই প্রত্যেক জাতির তীর্থক্ষেত্র।

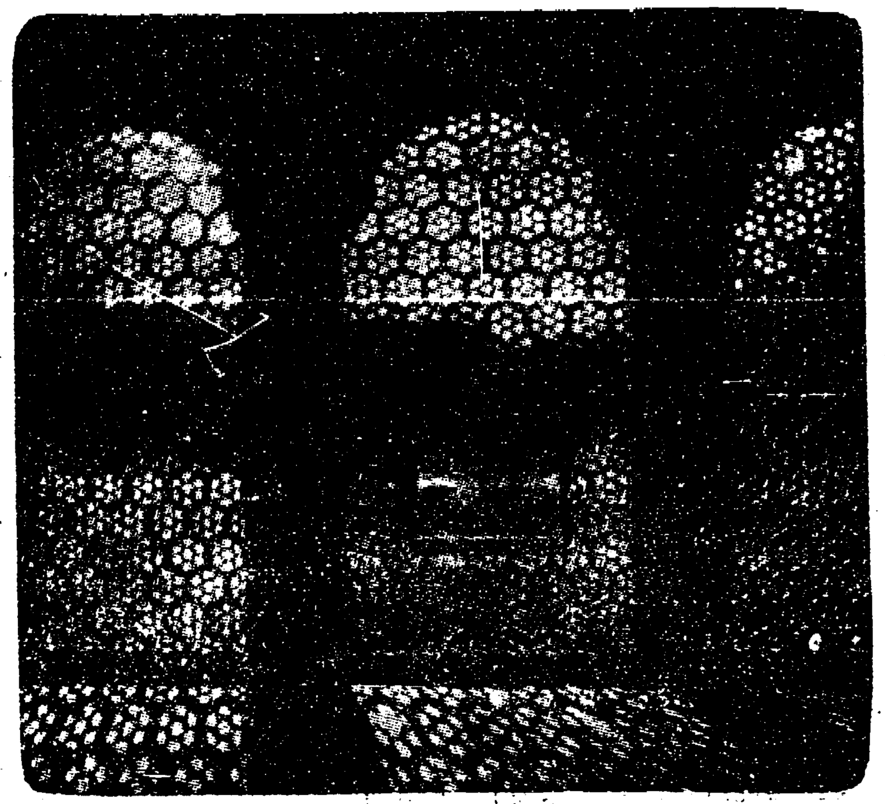

ফতেপুর সিক্রীর একটি দৃশ্য

আগ্রা থেকে বাইশ মাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে 'পরিত্যক্ত নগর' ফতেপুর সিক্রী। আকবর ছিলেন এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। বড় আশা করে তিনি এই লাল পাথরে গড়া বিরাট্ কেল্লা তৈরী ক'রে এখানে রাজধানী বসাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষটা জলাভাব আর অস্বাস্থ্যকর আব্‌হাওয়ার জন্য একে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফতেপুর সিক্রীর বুলন্দ দরওয়াজার মত বিরাট ফটক খুব কমই দেখা যায়।

এই ফতেপুর সিক্রীর কাছে মানুয়ার প্রান্তরে একবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষা হয়েছিল। রাণা সংগ্রাম সিংহ চেয়েছিলেন নবাগত মোগলদের তাড়িয়ে ভারতে রাজপুত প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আর বাবর চেয়েছিলেন ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করতে। এই মানুয়ার মাঠে দুই দলে সেই ইতিহাসবিখ্যাত সংঘর্ষ (যা "মনুয়ার যুদ্ধ" নামে খ্যাত) হয়। বাবর বিজয়ী হন। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

* * * * *

আগ্রা থেকে এলাম দিল্লী। এও যমুনার তীরে। এই দিল্লী সহরে ভারতের অতীত ইতিহাসের যে সব চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, ভারতের আর কোথাও তার কাছাকাছি কিছু পাবে না। ভারতের রাজধানী হবার জন্যই যেন এর সৃষ্টি। দিল্লী কিন্তু আসলে একটি সহর নয়—কুতুব-নগর, তোগলকবাদ, ফিরোজাবাদ, শাহ্‌জাহানবাদ, নয়া দিল্লী প্রভৃতিকে একত্রে "দিল্লীর সপ্ত নগরী" বলা হয়।

কুতুবউদ্দীন আইবেক কুতুব নগরের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে কুতুব নামে কোন সাধুর নামানুসারে কুতুব মিনারের ভিত্তি ইনিই স্থাপন করেছিলেন। সেই কুতুব মিনার আজও সদম্ভে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর পাশেই দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের মন্দির, হিন্দু আমলের প্রাচীন লৌহস্তম্ভ এবং পাঠানরাজদের অনেক স্মৃতিচিহ্ন ছড়ান।

কুতুব মিনার

তোগলকবাদ সম্বন্ধে গল্প আছে যে এই নগরী প্রতিষ্ঠার ফলে এক সাধুর পুকুর কাটা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁরই শাপে তোগলকবাদ জনহীন পরিত্যক্ত নগরে পরিণত হয়। ফিরোজাবাদ ফিরোজশাহ্‌ তোগলকের কীর্ত্তি। কাঁটা ও ফুলবনে ঘেরা এঁর ভাঙ্গা দুর্গ—কোটলা আজও রয়েছে। সম্রাট্ অশোকের তৈরী বিখ্যাত স্তম্ভগুলির একটিকে এখানে এনে বসানো হয়েছে। নয়া দিল্লী ইংরেজের তৈরী। ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী এখানেই।

শাহ্‌জাহানবাদে শাহ্‌জাহানের বিখ্যাত দুর্গ অনেকটা আগ্রা দুর্গেরই অনুরূপ। এরই ভিতর বিখ্যাত দেওয়ানী খাস (যেখানে ময়ূর সিংহাসন থাকত), দেওয়ানী আম প্রভৃতি। এই দুর্গের সামনেই বিরাট্ জুম্মা মসজিদ্।

পাঠান আমলের আর একটি দুর্গকে বলা হয় পুরানো কেল্লা। এর ভিতর আলাউদ্দীন বাদশার একটি মস্‌জিদ এবং হুমায়ুনের লাইব্রেরী ঘর নাম করবার মত। কাছেই হুমায়ুনের কবর। হুমায়ুন কথাটির অর্থ ভাগ্যবান্; কিন্তু তাঁর মত দুর্ভাগা সম্রাট্ ভারতে বেশী জন্মান নি। সাম্রাজ্যচ্যুত, গৃহহারা হ'য়ে পথে পথে তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল, পায়ে হেঁটে নানা দুর্গম দেশ পার হয়ে শেষে পারস্যে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানেও কম অপমানিত হতে হয় নি। শেষ বয়সে তিনি ভারত-সিংহাসন পুনরধিকার করলেন বটে কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই লাইব্রেরীর সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন। সেই লাইব্রেরী আর সিঁড়ি আজও রয়েছে।

দিল্লীতে থাকতে বীরেন্দ্রের চিঠি পেলাম, আমাদের বাল্যবন্ধু প্রকাশ ব্যারিষ্টার হয়ে বিলেত থেকে ফিরছে। করাচী বন্দরে সে নামবে। সময় পেলে সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে। কাজেই এর পর করাচী যাওয়াই ঠিক করে ফেললাম। সেখান থেকে আবার তোমাদের চিঠি দেব।

মহিয়সী মহিলা কস্তুরবাঈ

শ্রীরাধারাণী দেবী

ভারতপূজ্যা, মহাত্মা গান্ধীর যোগ্যা সহধর্ম্মিনী কস্তুরবাঈ গান্ধী আর ইহলোকে নেই। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পুণায়, বন্দী-নিবাস আগা খাঁ প্রাসাদে, তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক ব'লে অনেকে মত প্রকাশ ক'রে থাকেন। তাঁর উপযুক্ত স্ত্রী হ'তে পারাটা নেহাৎ কম কথা নয়, কিন্তু কস্তুরবাঈ তা হ'তে পেরেছিলেন।

অতি অল্প বয়সে তাঁদের বিয়ে হয়। বয়সে দু'জনেই প্রায় সমবয়সী। ফলে সেই অল্প বয়স থেকেই তাঁদের মধ্যে গভীর মনের মিলের সূত্রপাত হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁরা পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ সমান ভাবে গ্রহণ করেন।

কস্তুরবাঈ ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। শ্বশুরবাড়ীও ছিল তদ্রূপ। তার ওপর তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত লাজুক ধরণের। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীর ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য তিনি আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে চলতেও দ্বিধা করতেন না। এমনি ভাবে, পরিজনদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও, গান্ধীজির হাতে তাঁর লেখাপড়ার চর্চ্চা সুরু হয়।

তার পর ব্যারিষ্টার হয়ে গান্ধী দেশে ফিরলেন। দেশে সুবিধা হ'ল না—সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তাঁর কর্ম্মস্থল বেছে নিলেন। গোঁড়া গৃহস্থ-ঘরের বধূ কস্তুরবাঈ নিঃসঙ্কোচে স্বামীর সঙ্গিনী হলেন।

আফ্রিকায় বৃহত্তর কাজের ডাক পড়ল, সুরু হ'ল গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন। সেখানেও কস্তুরবাঈ তাঁর পাশে রয়েছেন। গান্ধীজি কারাগারে বন্দী হলেন, কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজ চলতে লাগ্‌ল—কস্তুরবাঈ সে ভার নিলেন। শেষে তাঁকেও কারাগারে যেতে হ'ল।

গান্ধীজি ভারতে ফিরে এলেন। ১৯১৫ সালে সবরমতীতে তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কস্তুরবাঈ হলেন তার প্রথম আশ্রমবাসিনী।

তার পরের ইতিহাস তোমরা ভাল করেই জান। মহাত্মার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন—একটার পর একটা চলতে লাগল। কস্তুরবাঈ নীরব কর্ম্মী হিসাবে স্বামীর পাশে পাশে রয়েছেন। গান্ধীজি বারে বারে বন্দী হচ্ছেন, কস্তুরবাঈও সে জীবন থেকে বঞ্চিত হলেন না। কারাগারের সঙ্গে তাঁরও বারে বারে পরিচয় হতে লাগল। অন্তরালে থেকেই তিনি কাজ করতেন, স্তুতিবাদের ধার ধারতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর যশো-সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

১৯৪২ সালে ভারত রক্ষা আইনে শেষ বার তাঁকে বন্দী করা হয়। এবারে তাঁকে পুণায় মহাত্মাজীর সঙ্গেই আগা খাঁ প্রাসাদে থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়। সেইখানেই তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বামীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মনুষ্যের গড়া কারা-প্রাচীর তাঁর মুক্ত আত্মাকে আটকে রাখতে পারল না।

উইল

শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ

বিষ্ণুপুর গ্রামের রামেন্দুলোচন সামান্য কিছু বিষয়সম্পত্তি রেখে যেদিন চোখ বুজলেন সেদিন শোকের চেয়ে অশান্তিটাই সংসারে বড় হ'য়ে দেখা দিল। সংসার বলতে দুই ছেলে নবেন্দু ও শিবেন্দু, আর দাসী ও চাকর, তারা ও রামদাস; সম্পত্তি মানে, পৈত্রিক ভিটের উপর দু'খানা ঘর, একটি বাগান, নদীর ওপারে মহেশতলায় একখানা বাড়ী আর একটি পেশোয়ারী গাই। এই গাইটি ছিল বৃদ্ধ রামেন্দুলোচনের বড় আদরের জিনিষ—হাজার টাকা খরচ করে সেবার কিনেছিলেন; তারপর গেল বছর পশু-প্রদর্শনীতে যখন ওটা প্রথম পুরস্কার পেল তখন থেকে ওর আদর-যত্ন আরও বেড়ে গেল। তার নাম রাখা হল চুনি। মৃত্যুর সময় রামদাসকে ডেকে তিনি বলে যান, "রামু, এতদিন তুই-ই চুনিকে দেখাশুনা করেছিস্; দেখিস, আমার মরার পর ওর যেন-কোন রকম অযত্ন না হয়। তোর 'পর ওর সব ভার দিলুম।" এদিকে বড় ছেলে নবেন্দুর ওটার ওপর একটু বিশেষ নজর ছিল।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই, নবেন্দু তার জ্যেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে নতুন মনিব হবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেল। বাড়ীর সামনের বহুদিনের সুপুরি গাছটা তার আদেশে ধরাশায়ী হল।

শিবেন্দু ভাল মানুষ। বেচারী শোকে বড্ড মুষড়ে পড়েছে। তার মন-মরা ভাব দেখে নবেন্দু তো তাকে ঠাট্টাই করে বসল: "ওরকম চুপচাপ বসে থাকলে তো আর বাবাকে ফিরে পাবে না।"

"কিন্তু দাদা, আমরা তাঁর ছেলে; এত শীগ্‌গিরই কি তাঁকে ভুলতে পারি?"

"ভুলতে হবে। পিতৃভক্তি না দেখিয়ে একটু ভ্রাতৃভক্তি দেখাও—কাজে লাগবে। জান তো, সমস্ত সম্পত্তির মালিক এখন আমি। আমায় মেনে চলতে হবে।"

"কিন্তু বাবা যে বলেছিলেন, আমার জন্যও আলাদা করে কিছু রেখে যাবেন। আচ্ছা, কাকাবাবু আসুন, তিনি-এ বিষয়ে কিছু জানতে পারেন।"

পিতার মৃত্যুর দু'দিন পর এই হ'ল ভাই-ভাইয়ে আলাপের নমুনা। এদিকে তারা ও রামদাসও নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে। নবেন্দু কোনদিন ওদের ভাল চক্ষে দেখে না; আজ যে বড়বাবুর অবর্ত্তমানে ওদের তাড়াবার ব্যবস্থা হবে না—এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আজ ২০।২৫ বছর এই সংসারে ওরা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে এসেছে—এখন বুড়ো বয়সে যাবেই বা কোথায়?

রামদাসের যত ভাবনা চুনিকে নিয়ে। অনেক দিন থেকেই নবেন্দুর ওটার ওপর নজর আছে, এখন হয়তো ওটাকে নিজের বলে দাবী করে বসবে। তা ছাড়া চুনি আজ একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে—এজন্যও তার মনটা খারাপ। সারাদিন তার সেবা শুশ্রূষা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে।...

এই সময় এসে উপস্থিত হলেন ওদের দূর সম্পর্কীয় কাকা, রাজীব বাবু। তাঁকে দেখে এক নবেন্দু ছাড়া আর সকলেই আশান্বিত হ'ল। সবাই ছুটে গিয়ে নবেন্দুর দুর্ব্ব্যবহারের কথা তাঁকে জানাল।

তারা কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলল, "সেই এতটুকু বয়স থেকে এদের মানুষ করেছি, আর আজ কিনা আমায় তাড়িয়ে দেবে!"

রামদাস নির্লিপ্তস্বরে বল্‌ল, "আমি ও-সব কিছু বুঝি না, চুনিই আমার সব।"

রাজীব বাবু এ-সব কথায় কান দিলেন না—সবাইকে ডেকে তিনি ঘরে গিয়ে বসলেন। আস্তে আস্তে পকেট থেকে সিল করা একখানা লম্বা এন্‌ভেল্‌প্ বার করে বললেন, "এটা হ'ল তোমাদের বাবার উইল—এটা পড়ে শোনাচ্ছি। গেল বছর পূজোর সময় তাঁর শরীর খারাপ হবার পর তিনি এটা আমায় বুঝিয়ে দিয়ে যান—একজন উকিলকে দিয়ে আইন-সম্মত ভাবেই এটা করা হয়েছে।"

নবেন্দু বাধা দিয়ে বলে উঠল, "আমি বাড়ীর বড় ছেলে, সব সম্পত্তি আমার, ও-সব উইল-টুইল আমি মানি না।"

রাজীব বাবু এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে একটু থেমে উইলটা পড়তে আরম্ভ করলেন,—

"আমি, রামেন্দুলোচন রায়, জানাইতেছি যে আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবেন্দু নিম্নলিখিত উপদেশ অনুযায়ী দুই সমান অংশে ভাগ করিবে।

"গ্রামের বসতবাটী, মহেশতলার বাড়ী, একটি বাগান আর আমার অতি আদরের চুনি—ইহাই হইল আমার সম্পত্তি। চুনিকে যে রাখিবে, সে একটি অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।..."

এই সময় রামদাস এমন ভাবে মাথা ঝাঁকাতে সুরু করল যে তারার তাকে হাত ধরে থামাতে হ'ল।

আবার তিনি পড়ে চললেন, "আমার যে পুত্র মহেশতলার বাড়ীটা লইবে, রামদাস তাহার সহিত বাস করিবে; এবং রামদাস যখন চলিয়া যাইবে তখন তাহাকে পাঁচশত টাকা দিয়া বিদায় করিতে হইবে। তদ্রূপ যে পুত্র গ্রামের বসত-বাটী লইবে, তাহার সহিত তারা বাস করিবে, এবং সে যখন চলিয়া যাইতে চাহিবে তখন তাহাকেও পাঁচশত টাকা দিতে হইবে। তবে আমি আশা করি, উহারা যতদিন বাঁচিবে, ততদিন এই বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না। উল্লিখিত সম্পত্তি নবেন্দু দুই অংশে ভাগ করিবে, এবং শিবেন্দুকেই প্রথমে উহার এক অংশ বাছিয়া লইবার সুযোগ দিতে হইবে......"

নবেন্দু: আমি ও-উইলের এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। বাবা আমাকে অন্য রকম বলে যান; তিনি বলেছিলেন, আমার ইচ্ছামত আমি সব ভাগ করব।

রাজীব: তোমাকেই তো ভাগ করতে বলা হ'য়েছে—উইলে তো তাই লেখা আছে। এবার সমস্ত সম্পত্তি দু'ভাগ করে দু'টো লিস্ট্ তৈরী কর; তারপর তোমাদের দু'জনের নাম সই কর—উইলে সে-রকমই লেখা আছে।"

ভাগ করতে গিয়ে নবেন্দু একেবারে হিমসিম খেয়ে গেল। দুটো বাড়ী যদি সমান হ'ত—তা হলে ভাগ করা সোজা হ'ত। আর ভাগ যে রকমই হোক না কেন, শিবেন্দুই তো আগে বেছে নেবে—ও কি আর চুনিকে ছাড়বে? আবার ওদিকে রামদাস কি তারা—একজন তার কাঁধে এসে চাপবেই। যাক্, অনেক ভেবে-চিন্তে দুটো ভাগ করা হল: মহেশতলার বাড়ী ও চুনিকে নিয়ে হল এক অংশ, আর অপর অংশ হ'ল বসত-বাটী, বাগান ইত্যাদি। শিবেন্দু নিজের গ্রামে থাকবার আগ্রহে বসত-বাটীর অংশটি নিল। এতে রাজীব বাবু একটু অসন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন, "তোমার মনে রাখা উচিত, তোমার বাবা চুনিকে অনেক পয়সা খরচ করে কিনেছিলেন; আর ওটাকে যে নেবে তারই লাভ।"

"না থাক, আমি গ্রামেই থাকতে চাই।"

"বেশ, তা হলে তোমরা দুজনেই রাজী। এবার কাগজ দু'টোতে তোমাদের নাম সই কর।"

নবেন্দুর মনস্কামনা পূর্ণ হল। নাম সই করা হলে পর রাজীব বাবু কাগজ দুটো ভাজ করে পকেটে রাখতে যাবেন, এমন সময় রামদাস হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কেঁদে বলল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু,

আমার সব গেছে। আমি গোয়াল-ঘরে যেতেই চুনি শিঙ্ উঁচু করে একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ মাটিতে শুয়ে চোখ বুজল। সব শেষ হ'য়ে গেছে।"

ঠিক এই সময় নবেন্দু রাজীব বাবুর হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল; কিন্তু তিনি ততক্ষণে ওটা পকেটের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।*

কুড়ানো গল্প

(সংগ্রহ)

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্.এ, বি.এস্-সি

১

সম্রাট্ তৈমুরলঙ্গ রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করিতেছেন। সঙ্গে আছে কয়েকজন অন্তরঙ্গ পারিষদ্ ও বিদূষক। নাপিত আসিয়া ক্ষৌরী করাইয়া দিল, তার পর সম্মুখে ধরিল একখানা আরশী। তৈমুর দেখিতে ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিৎ। তাঁর একটা চোখ ছিল কাণা, এবং একটা পা-ও ছিল খোঁড়া। আরশীতে নিজের মুখ দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিয়া গেল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় কহিলেন, 'ভগবান্ আমাকে এত শক্তি—এত ক্ষমতা দিয়েছেন, বিরাট্ সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু এত কুৎসিত চেহারা দিলেন কেন!' সম্রাটের দেখাদেখি বিদূষকও কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে কি হাপুস নয়নে কান্না,—থামিতেই চায় না। তৈমুর বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, 'নিজের কুৎসিত চেহারা দেখে আমার চোখে জল এসেছিল, কিন্তু তা কোন্‌কালে বন্ধ হ'য়ে গেছে, আর এ বেকুবটার কান্না এখনও থামে না কেন?' বিদূষক হাত যোড় করিয়া কহিল, 'জাঁহাপনা, আপনার ঐ মূর্ত্তি আরশীতে একবার মাত্র দেখেই যদি আপনার এমন কান্না পায় তবে আমরা, যারা দিবারাত্রি ঐ চেহারা দেখছি, তাদের কান্নাটা কি রকম পাওয়া উচিত তা ভেবে দেখুন দেখি!'

তৈমুর এবার হাসিয়া ফেলিলেন।

২

অর্থথী খুব চালাক লোক, নবাবের কাছে চাকরীর জন্য আসিয়াছে। নবাবের এক অন্তরঙ্গ

---

* একটি বিখ্যাত বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

বন্ধুর নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লইয়া আসিয়াছে—তা'তে লেখা: 'এই লোক খুব কাজের, একে যে কোন কাজে দিলে এ তা ক'রে দিতে পারে, উপরন্তু তা থেকেই কিছু অর্থোপায়ের ব্যবস্থাও ক'রে নিতে পারে।'

নবাবের কৌতুহল হইল, কহিলেন, "পরীক্ষা দিতে পার?" অর্থথী তখনই রাজী। নবাব বলিলেন, "বেশ, তুমি ইচ্ছামতী নদীর ধারে গিয়ে ব'স। নদীতে কতগুলো ঢেউ আছে গুণে সন্ধ্যাবেলা আমাকে হিসাব দাখিল ক'রবে।"

অর্থথী করযোড়ে কহিল, "জাঁহাপনা, হুকুমটা লিখিয়ে দিন, আর ফৌজদারকে ব'লে দিন কেউ যাতে আমার কাজে বাধা না দেয় তা যেন সে দেখে।" কিছু পরেই অর্থথী নবাবের দেওয়া হুকুমপত্র, প্রকাণ্ড একটি খাতা ও একটা বাক্স লইয়া ইচ্ছামতীর ধারে গিয়া বসিল। ফৌজদারকে বলিল, "সব নৌকো বন্ধ করুন; নৌকো চলাচল হ'লে ঢেউ ভেঙ্গে যাবে, আমি গুণব কেমন ক'রে?" ফৌজদারের হুকুমে নৌকা চলা বন্ধ হইল।

সন্ধ্যার কিছু আগে এক ধনীর পুত্রের বিবাহের শোভাযাত্রার কয়েকখানি নৌকা আসিয়া হাজির। নৌকা আটক থাকিলে তাহাদের বিবাহের লগ্ন নষ্ট হইয়া যায়। অগত্যা তাহারা চুপি চুপি আসিয়া কহিল, যত টাকা চাই তাহারা দিতে রাজী আছে, নৌকা ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা হোক্। অর্থথী হাজার টাকা আদায় করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। ফৌজদারকে কহিল, "এই দেখুন, নবাবের জন্য পাঁচ শ', আপনার আড়াই শ', আর আমার আড়াই শ' টাকা পাওয়া গেছে। এখন ওঠা যাক্।"

সন্ধ্যাবেলা অর্থথী নবাবের কাছে টাকা আর খাতা লইয়া হাজির। খাতার বারো আনা অংশই অসংখ্য ফুটকিতে ভরা। হাসিয়া কহিল, "জাঁহাপনা, ঢেউ গুণবার কাজে এই টাকা রোজগার হয়েছে, আর এই খাতায় ঢেউয়ের হিসাব আছে, ঠিক হয়েছে কিনা কাউকে দেখে নিতে বলুন।"

নবাব বেচারা নিজের কথায় নিজেই বোকা বনিয়া গেলেন। সত্যই তো আর ঢেউএর সংখ্যা নির্ভুল কিনা পরখ করিয়া লওয়া সম্ভব নয়! যাই হোক্, সেই দিনই নবাব-সরকারে অর্থথীর চাকরী ঠিক হইয়া গেল।

মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনু-সম্পাদক ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষার জন্য এই পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। রামধনুর চার পৃষ্ঠার অনধিক একটা হাসির গল্প আগামী ১০ই বৈশাখের (১৩৫১) মধ্যে লেখকের নাম ও ঠিকানা সহ সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন।

দুর্ভিক্ষের দিনে

(পৌরাণিক গল্প)

শ্রীহেমলতা দেবী

পুরাকালে একবার অনাবৃষ্টি হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দলে দলে লোক ক্ষিদের জ্বালায় মরতে সুরু করল। পৃথিবী দেখতে দেখতে শ্মশান হয়ে দাঁড়াল।

এই সময় একদিন বিশ্বামিত্র মুনিও তাঁর শিষ্য ও পরিবারবর্গকে নিয়ে খাবারের খোঁজে ঘুরছিলেন। কোথাও এক কণা খাবার নেই। বিশ্বামিত্র নদীর ধারে ব'সে পড়ে শিষ্যদের বললেন, "যাও, খাদ্য অখাদ্য যা পাও নিয়ে এস।" শিষ্যরা অনেক খুঁজে শেষে একটা মরা কুকুর নিয়ে এল। বিশ্বামিত্র বল্লেন, "বেশ, আজ এই মরা কুকুরই খাওয়া হবে। তোমরা এর মাংস রান্না ক'রে ফেল। রান্না হ'লে তা দেবতা, ঋষি ও পূর্ব্বপুরুষদের তর্পণ ক'রে বাকীটা আমরা খাব।" শিষ্যেরা উনুন তৈরী ক'রে মাংস চড়িয়ে দিল।

এদিকে অগ্নিদেব শুনতে পেয়ে তখনই গিয়ে দেবসভায় খবর দিলেন, বিশ্বামিত্র আজ সমস্ত দেবতাকে কুকুরের মাংস দিয়ে তর্পণ করবার আয়োজন করেছেন। দেবতারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ইন্দ্রদেব তখনই এক বিরাট বাজপাখী সেজে বিশ্বামিত্রদের কাছে হাজির হলেন আর ছোঁ মেরে মাংসের হাঁড়ী নিয়ে হলেন উধাও।

বিশ্বামিত্র ধ্যানে সবই বুঝতে পারলেন। তাঁর তপস্যার তেজ তো সহজ নয়! তিনি ইন্দ্রকে শাপ দেবার উদ্যোগ করলেন। ফলে ইন্দ্রকে তখনই আবার এসে ভয়ে ভয়ে হাঁড়ীটা উনুনের ওপর রেখে যেতে হ'ল; তবে এবার আর তার মধ্যে মাংস রইল না, রইল অমৃত।

কিন্তু বিশ্বামিত্র সহজে ছাড়বার লোক ন'ন। তখনই ইন্দ্রকে হেঁকে বল্লেন, "ভাল চাও তো আমাদের সেই কুকুরের মাংস ফিরিয়ে দিয়ে তোমার অমৃত নিয়ে চলে যাও। পৃথিবী শুদ্ধু লোক আজ অনাহারে উজাড় হ'য়ে গেল, আমরা মুষ্টিমেয় এ ক'জন তোমাদের অমৃত নিয়ে কি করব? যদি সবাইকে অমৃত দিতে পার তবেই এস, না হ'লে সমস্ত দেবতাকে আজ এই ঘৃণ্য কুকুরের মাংসই গ্রহণ করতে হবে। দেখি, কার সাধ্য আমার দেওয়া ভোগ নিতে অস্বীকার করে!"

তখন ইন্দ্র বেগতিক দেখে মেঘদের ডেকে বল্লেন, "আর দেরী নয়, তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে পৃথিবীতে অমৃত বর্ষণ কর। নইলে বিশ্বামিত্রের তেজে আজ দেবলোক উচ্ছন্নে যাবে।"

ইন্দ্রের আদেশ মেঘেরা অমান্য করতে পারল না। আকাশ থেকে নেমে এল অমৃত-ধারা। পৃথিবীর ক্ষুধাতৃষ্ণা মুহূর্ত্তে দূর হ'ল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

যে ভাষা সবাই বুঝবে

পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকম ভাষা। আমাদের এই ভারতবর্ষেই কম ক'রে ২২২টি ভাষা প্রচলিত আছে। সমস্ত এসিয়ায় আছে প্রায় ৯০০ রকম ভাষা। আমেরিকা অবশ্য সকলের ওপরে যান—সেখানে নাকি প্রায় ১৬০০ রকম ভাষা চলে। মহাদেশগুলির মধ্যে ইয়োরোপ ক্ষুদে হ'লেও সেখানেও ৬০০ রকম ভাষা আছে। কাজেই এক দেশের লোক আর এক দেশে গিয়ে এই ভাষার গোলমালে সময় সময় কি রকম মুশ্‌কিলে পড়ে তা তো বুঝতেই পার। এ রকম অনেক হাস্যকর এবং করুণ কাহিনী আমাদের শোনা আছে।

আমাদের দেশে হরিনাথ দে ছিলেন নানা ভাষায় পণ্ডিত। তিনি নাকি ৩৪টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। ঐতিহাসিক যুগে ইটালির মেজোফান্তি নামে এক ভদ্রলোক নাকি ১১৪টি ভাষা শিখেছিলেন এবং এখনও নাকি ইংলণ্ডে গ্রীয়ার্সন্ নামে এক ভদ্রলোক ১৭৯টি ভাষার সঙ্গে পরিচিত (সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন)! কিন্তু যাই হোক্, একেবারে ওপরে যে হিসেব দেওয়া গেছে তা'তেও দেখা যায় যে শেষের (১৭৯টি ভাষা-জানা) ভদ্রলোকটিকেও পৃথিবীর অনেক জায়গায় গিয়েই ভাষার গোলমালে বিপদে পড়তে হবে। কাজেই এমন একটা ভাষার চলন হওয়া দরকার যা পৃথিবীর সব দেশের লোকই বুঝবে।

এখন কথা হচ্ছে, এমন আন্তর্জ্জাতিক ভাষা কোথায় পাওয়া যায়! সবাই নিজের নিজের দেশের ভাষার দাবী জানাতে চায় (যেমন আমাদের ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তাই নিয়ে হচ্ছে)। কিন্তু তাতে অন্য দেশের লোক শুনবে কেন? শেষটায় ডাঃ লাড্‌উইগ্ জ্যামেনহফ্ নামে একজন রুশ ডাক্তার ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় ভাষা থেকে বাছাই করা প্রায় আড়াই হাজার শব্দ আহরণ করে তার সাহায্যে ১৮৮৭ সালে তিনি এক নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেন—যার নিয়ম-কানুন হ'ল খুব সোজা এবং সব দেশের লোকেরাই যা খুব সহজে শিখে নিতে পারে। এই নতুন ভাষার নাম দেওয়া হ'ল "এস্‌পারেণ্টা" অর্থাৎ "আশাবাদী"।

যতটা আশা করা গিয়েছিল ঠিক ততটা না হ'লেও এস্‌পারেণ্টা ভাষা এখন নানা দেশে, বিশেষ ক'রে ইয়োরোপে, বেশ চলিত হয়েছে। এই যুদ্ধের আগেই এই ভাষায় চার হাজারের ওপর বই বেরিয়েছিল এবং আজও শতাধিক সাময়িক পত্রিকা এই ভাষায় নিয়মিত ভাবে বেরুচ্ছে। অনেক আন্তর্জ্জাতিক সভাসমিতিতেও আজকাল এস্‌পারেণ্টো ভাষায় কাজ চালান হয় এবং কম ক'রে প্রায় পঞ্চাশটি বেতার ষ্টেশন থেকে নিয়মিত ভাবে এই ভাষায় বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা আছে।

সমুদ্র কি সবটাই নোনা?

সমুদ্রের জল নোনা তা তোমরা সবাই জান। যারা সমুদ্রে স্নান করেছ তারা বোধ হয় চেখেও দেখেছ। সমুদ্রের এই নোনা জলের জন্য নাবিকদের, বিশেষ ক'রে আগেকার দিনে, খুবই অসুবিধায় পড়তে হ'ত। জাহাজ-ডুবি হ'লে তো কথাই নেই। চারদিকে থৈথৈ করছে জল অথচ পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সে জল খাবার উপায় নেই। কি অদ্ভুত ব্যাপার বল তো!

কিন্তু ভৌগোলিকেরা বলেন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে সমুদ্রের জল নোনা তা নয়, কোন কোন সমুদ্রের স্থান বিশেষে "মিষ্টি" অর্থাৎ নদীর মত স্বাদু জলও পাওয়া যায়। তবে তা এত কম জায়গায় যে তা'তে ক'রে সমুদ্রের 'নোনা অপবাদ' ঘোচে না। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূব দিকে, যেখানটায় আমাজন নদীর বিরাট্ জলরাশি আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে এসে পড়ছে সেখানটায়, পাড় থেকে প্রায় দু' শ' মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল ঐ রকম 'মিষ্টি'। অবশ্য, সমুদ্রের ওপরের অংশটাই শুধু ঐ রকম, নীচের দিক্‌টা নয়। এর কারণ হচ্ছে আমাজন। পণ্ডিতেরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, আমাজন প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ দশ লক্ষ ঘন ফুট মিষ্টি জল এনে সমুদ্রে ঢালছে, আর আমাজনের সেই মিষ্টি জলই দু'শ' মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্র-জলকে ওরকম স্বাদু ক'রে রেখেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার পূব দিকে এবং দক্ষিণ সমুদ্রের কোন কোন জায়গায়ও মিষ্টি সমুদ্র-জল পাওয়া যায়; তবে এ ক্ষেত্রে সমুদ্রের ওপরের দিকে নয়, একেবারে তলায়। ওপরে হয়তো নোনা জল ঢেউ খেলে যাচ্ছে কিন্তু নীচে আছে মিষ্টি জলের ঝরণা, কূয়ো থেকে জল তোলার মত ক'রে সেখান থেকে মিষ্টি জল সংগ্রহ করা হয়। সেখানকার লোকেরা ডুবুরীর মত জলের তলায় নেমে গিয়েও সে জল তুলে আনে, কারণ এ জল নাকি অদ্ভুত রকম সুস্বাদু।

যে রাজ্যে পুরুষ নেই

তোমরা মহাভারতে প্রমীলার গল্প পড়ে থাকবে। যেখানে মেয়েরাই দেশের সব কাজ চালাত; তারাই রাণী, তারাই সৈন্য, তারাই ছিল সব। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জ্জুন বেচারাকে

যেমন অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছিল, তেমনি অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়েও এই প্রমীলার রাজ্যে গিয়ে তাঁকে কম নাকাল হ'তে হয় নি। অবশ্যি শেষ পর্য্যন্ত সে দেশের রাণী প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

ঠিক এই ধরণের এক নারী-রাজ্যের গল্প পাওয়া যায় 'আমাজন'দের কাহিনীতে। আমেরিকার বিশাল নদী আমাজনের সঙ্গে অবশ্যি এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা থাকত কৃষ্ণসাগরের উপকূলে। মেয়ে হ'লে কি হয়, যেমনি ছিল এরা সাহসী তেমনি ছিল দুর্দ্ধর্ষ। বিশেষ ক'রে যুদ্ধবিদ্যায়। যুদ্ধে এদের সঙ্গে নাকি কেউই সহজে এঁটে উঠতে পারত না।

আমাজনদের রাজ্যে পুরুষের প্রবেশ একদম নিষিদ্ধ ছিল। রাজ্যের সমস্ত কাজই মেয়েরা চালাত, এবং সুচারুভাবেই চালাত। বড় বড় ইমারত বা সহর গড়তেও তারা ছিল ওস্তাদ্। এদের রাণীর নাম ছিল পেন্থেসিলি। গল্প আছে, এরা ইলিয়াড্ যুদ্ধে গ্রীক্‌দের বিরুদ্ধে ট্রোজান্‌দের হয়ে যুদ্ধ করে এবং সেই যুদ্ধেই তাদের রাণী য়্যাকিলিসের হাতে প্রাণ হারান।

আমাজনদের কাহিনীর মধ্যে কতটা ঐতিহাসিক সত্য আছে তা এখনও প্রমাণিত হয় নি।

প্রশ্ন

শ্রীকানাই দীর্ঘাঙ্গী

খোকার চিত্ত খোকামিতেই ভরা,
বোকামিরই মতন তাহা বটে,
তাই ব'লে তা নয় বোকামি—নয়,
এ বুদ্ধিটা আছে সবার ঘটে।
বুড়োদেরও অনেক বুড়োমিতে
হাস্য পাওয়ার বেজায় সম্ভাবনা
তাই ব'লে তা নয় অসহনীয়,
ঠাট্টা করার যোগ্য তো ভাবব না!

কিন্তু যদি বয়স কাঁচা ছেলে
বুড়োমিতে যায় অকালেই পেকে,
সবার চোখেই হয় তা অসহ রে,
ঠাট্টা তারে করাই উচিত ডেকে।
তেমনি যদি কোনও বুড়ো খোকা
খোকামিতেই ভরিয়ে রাখে মন,
কী করা যায় সে রাম-খোকায় নিয়ে,
পাই নে জবাব ভেবে অনুক্ষণ!

ভ্রম সংশোধন :— ৩০০ পৃষ্ঠায় শিরোনামায় 'মহিয়সী' স্থলে 'মহীয়সী' হবে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহকগ্রাহিকার লেখা)

নাক ডাকার গান

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়—বুক করে ধড়ফড়,
ঐ বুঝি এল ঝড়—মেঘ হাঁকে যে,
ঘরবাড়ী কেঁপে যায়, পথঘাট ফেঁপে যায়,
শুনে লোক ক্ষেপে যায়,
মেঘ নয় মেঘ নয়—নাক ডাকে রে!
নাক টিয়ার মতন ডাকে ঘড়র ঘড়র
সরু বাঁশের মতন নাক সুড়ুর সুড়ুর,
নাক শর্দ্দী ভরা ডাকে ফসর ফসর,
নাক চেপ্টে যাওয়া ডাকে ফুস্থুর ফুস্থুর।
নাক ডাকে, ডাকে নাক, খাঁদা নাক, বাঁকা নাক,
কুটার ক্ষুদে নাক—সেও ডাকে রে!
নাক ডাকা মহারোগ, বুড়ো হোক্ ছোট হোক
সব নাক ছোট লোক,
দিল দিল শেষ ক'রে কানটাকে রে!

চিঠিপত্র

এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হ'ল, আসছে মাসে সে ১৭ বছরে পড়বে। কাগজের বিভ্রাটে এ বছরের গোড়ার দিকটা রামধনুর পক্ষে বড় দুঃসময় গেছে; ঈশ্বরেচ্ছায় সে দুর্দ্দিন আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং হ্রস্ব-কলেবরে হ'লেও রামধনু প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে তার অগণিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাসি-মুখে হাজির হয়েছে। রামধনুকে আমরা যে ভাবে সাজাতে চেয়েছিলাম কাগজ এখনও দুষ্প্রাপ্য থাকায় তা অবশ্য সম্ভব হয় নি, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি এই ভেবে যে পাঠক-পাঠিকারা সে ত্রুটী সহ্য করে নিয়েছেন এবং তাঁদের সহানুভূতির কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি। আসছে বারে আমরা পৃষ্ঠাসংখ্যা আরও কিছু বাড়াবার চেষ্টা করব—অবশ্য যদি ঠিকমত কাগজ সংগ্রহ করতে পারি।

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধরের একটি রহস্য-উপন্যাস চলছে। শীঘ্রই আমরা ঐ সঙ্গে আরও একখানা বিখ্যাত লেখকের লেখা উপন্যাস দেবার ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া বিশেষ ক'রে মেয়েদের জন্য লেখা একখানা নাটকও ঐ সঙ্গে প্রকাশিত হবে। এখানা লিখবেন 'শুভযাত্রা', 'জন্ম-তিথি' প্রভৃতি বড়দের উপযোগী বিখ্যাত নাটকের লেখক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের রামধনুতে প্রকাশিত "নীলমণির ভুল" নামে গল্পটি চেষ্টারটনের লেখা একটি ইংরাজী গল্পের ছায়া নিয়ে রচিত। ভুলক্রমে সেটি উল্লেখ করা হয় নি। গ্রাহিকা শ্রীমতী সীতা সরকার সে ত্রুটী দেখিয়ে দিয়ে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

—রাঃ সঃ

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণী শ্রদ্ধেয়া কস্তুরবাঈ গান্ধী ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মত বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির স্ত্রী হ'তে পেরেছিলেন—তাঁর সম্বন্ধে এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট বলা হয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন সত্যিকারের মহীয়সী মহিলাকে হারাল।

* * *

রণজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে বাংলা দল মাদ্রাজ দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। খেলা হয়েছিল কলকাতায়। বাংলা দলের অধিনায়ক এবারেও ছিলেন কুচবিহারের মহারাজা এবং মাদ্রাজ দলের অধিনায়ক ছিলেন গোপালন্।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে (কেমিষ্ট্রী) গবেষণা ক'রে শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন। তোমরা নিশ্চয়ই জান এই বৃত্তি পাওয়াটা কি রকম সম্মানজনক! এঁর আগে মেয়েদের মধ্যে শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার এই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এখন মোট ৯১টি কলেজ আছে। তার মধ্যে ২৭টি কলিকাতায়, ৪৯টি কলিকাতার বাহিরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাকী ১৫টি আসামে। এই সব কলেজের মধ্যে ১২টি কেবল ছাত্রীদের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে ১৮৫৬। তার মধ্যে বাংলার ১০২টি এবং আসামের ২৩টি মেয়েদের।

* * *

যুদ্ধের জন্য (ভারত রক্ষা ও সরবরাহ ব্যাপারে) এই পাঁচ বছরে ভারত সরকারের কত খরচ হয়েছে জান? ৭১৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া বৃটীশ সরকারও নাকি ঐ বাবদে ভারতের জন্য ৯২৬ কোটি টাকা খরচ করেছেন।

* * *

কিছুদিন আগে (৩রা জানুয়ারী) দিল্লীতে যে বিজ্ঞান কংগ্রেস্ হয়েছিল তার কথা তোমাদের বলা হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবারে মূল সভাপতি হয়েছিলেন। এবারকার অধিবেশনের বিশেষত্ব ছিল এই যে বিলাতের বিখ্যাত রয়্যাল সোসাইটির যুক্ত অধিবেশনও এই সঙ্গে হয় এবং তা'তে যে সব ভারতীয় গত ৬।৭ বছরের মধ্যে ঐ সোসাইটির ফেলো (এফ্. আর. এস্) হয়েছেন সোসাইটির খাতায় তাঁদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। গত ২৬১ বছর ধরে ঐ খাতায় এই ভাবে সভ্যদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হচ্ছে। ডক্টর সাহনী, কৃষ্ণন, ভব এবং ভাটনগর—এঁরাই রয়্যাল সোসাইটির নতুন সভ্য।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

অঙ্কটি এই রকম হইবে :-

৬৭৮৫০০
৩২১
৬৭৮৫০০
১৩৫৭০০০
২০৩৫৫০০
২১৭৭৯৮৫০০

উত্তরদাতাদের নাম

রবি, রাম্নু, রাধু (কলিকাতা) ; সত্যপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর) ; সতী, করুণা, কল্পনা ও রেণু মৈত্র (রাজসাহী) ; ঝুনু, বাবু, সুনীল, দাদা, সুশীল দাশগুপ্ত (কলিকাতা) ; সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ) ; গায়ত্রী দেবী, নারায়ণদাস ও ধুর্জ্জটী মুখার্জ্জি (মুন্সীগঞ্জ) ; বিমলচন্দ্র দত্ত (শ্রীখণ্ড) ; আবদুল কুদ্দুস (বর্দ্ধমান) ; অমিতাভ সেন (ধুবড়ী) ; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাসত) ; অজিতকুমার সেনগুপ্ত (গুঠিয়া), বারীন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়া) ; প্রতিমা অধিকারী, ঝুন্টু, বেবা, রিণা, অজিত, অসিত, খোকন (মুন্সীগঞ্জ) ; অমিয়কুমার গোস্বামী (মুন্সীগঞ্জ) ; রমেন, মাষ্টার মহাশয়, অর্চ্চনা, উমা, খোকন, গায়ত্রী, মুকুল (নীলফামারি) ; ছবি রায় ও ছায়া রায় (নিউ দিল্লী) ; অমিতাভ দাশগুপ্ত (ফরিদপুর) ; মহাদেবী, ছবি, বিশু দাস (হাওড়া) ; জংলি (ময়না) ; কমলা রাহা (স্বর্ণঘোষ) ; বরুণ, খুচু, চিত্রা, খোকন (মাধিপুরা) ; অরুণ, অনিল, সুখু, দীপু, অপু, রেখা, মমতা, খোকা (জামসেদপুর) ; উৎপলা সরকার (পুরুলিয়া) ; বিজয়েশ্বর রায় চৌধুরী (উলানিয়া) ; শুভলাল ও জোহিরুল (মাণিকাচর) ; মনীষা সেন, কানু, অশোক, নীপা, শঙ্কর ও ভেনি (খুলনা) ; অতীন্দ্রনাথ দত্ত (তেজপুর) ; রজত, শ্যামল, অমলা, বন্দনা, মণিকা, রণবীর, খোকা দা', পটল, সাধনা, বাটু (বকসা-দুয়ার) ; বিজলী ঘোষ (মহেশতলা) ; বুবুল, গীতা, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য (মির্জ্জাপুর) ; গোরা, গোপা, বুলি, ঝুনু, টুনু (গিরিডি) ; ছায়া, নীলিমা, আভা (নিউ দিল্লী) ; গীতা দত্ত, শান্তি, কাজল, শঙ্কর, ছোটকাকা (কলিকাতা) ; সুভাষচন্দ্র দাশশর্ম্মা (কলমা) ; সন্তোষচন্দ্র দেবনাথ (ছটক) কিশোর লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ (মহামুনি) ; বলাই, অজিত, বাঁশরী (গোছাতি) ; নাছিমন আরা খানম ; সরোজকুমার রায় (সেকেন্দ্রাবাদ) ; চিন্ময়, জয়ন্ত, অমিতাভ ঘোষ (ভবানীপুর) ; অশোককুমার নাহার (তুমকা)।

নূতন ধাঁধা

দাদা ইংরেজীতে বল্লে, 'খোকা, বেড়াতে যাবি ?' দিদি বাংলায় বল্লে, 'খোকা, খেয়েছিস্ ?' মা বল্লেন, 'কি খেতে চাস্ ?' খোকা একটি শব্দে তিন জনকে জবাব দিল। কি সে শব্দটা বলতে পার ?

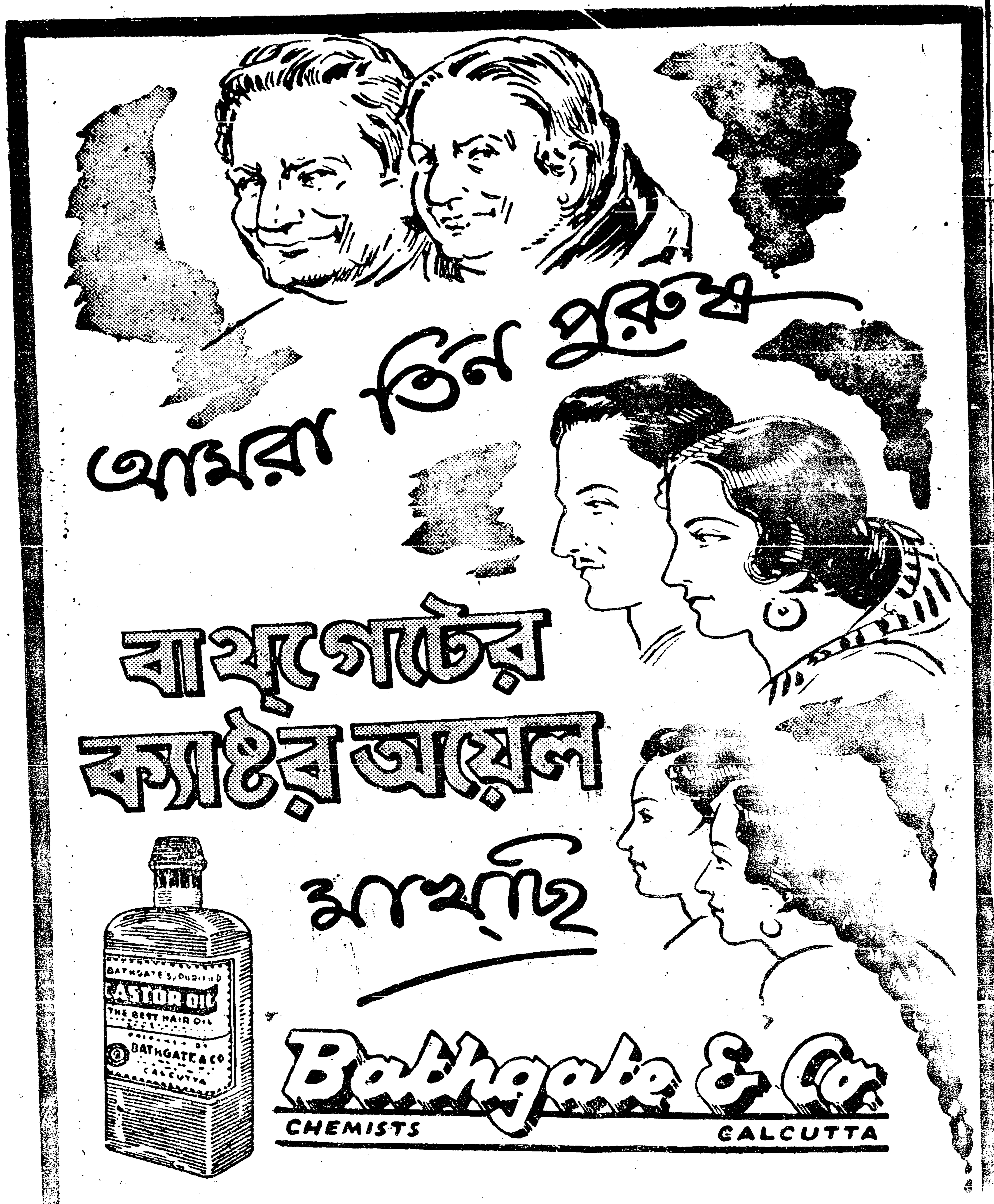
আমরা তিন পুরুষ
বাথ্‌গেটের
ক্যাষ্টর অয়েল
মাখ্‌ছি
CASTOR OIL
THE BEST HAIR OIL
BATHGATE & CO
CALCUTTA
Bathgate & Co.
CHEMISTS
CALCUTTA

VOLUME
ENDS.

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

…বর্ষ
…ম সংখ্যা
বৈশা…
১৩৫১

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭টী ঔষধ / মাত্র ১৪টী ঔষধ | পকেট কেস ও পুস্তক সহ | মূল্য ৪৷ আনা / মূল্য ৮ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১৸৶০
প্রতি সংখ্যা ।৴০

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনেকেই আমাদের লিখে জানিয়েছিলেন

—"কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের" মতো রূপসজ্জায় সমৃদ্ধ 'সিরিজ' প্রকাশ যদি এ-দুর্দ্দিনে সম্ভব না হয় তবে খুব 'থ্রীলার', 'রোমাণ্টিক' ও শিক্ষাপ্রদ 'ডিটেকটিভ' গল্পের একটা সাধারণ ১৲ এক টাকা সংস্করণ মাসিক সিরিজ পেলে আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে সম্মত আছি"—

তাই শিশু-সাহিত্যে নূতন অভ্যুদয়

প্রহেলিকা সিরিজ

বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র কাগজের উৎকর্ষ-সাধনই আমাদের পক্ষে অসম্ভব। নইলে এর ছবি, ছাপা ও রচনা-ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ অতুলন পরিকল্পনা।

বিজ্ঞপ্তি

প্রথম প্রকাশ: শুভ নববর্ষ ১৩৫১ সাল।

পরিচয়: প্রতিমাসে রহস্য-ঘন রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ-গল্প।

রচয়িতা: ছদ্মনামে স্ব-প্রকাশ 'সব্যসাচী'।

সমৃদ্ধি: চার-পাঁচখানি চিত্র-বিচিত্র হাফটোন ছবি।

মূল্য—প্রত্যেকখানি ১৲।

"সব্যসাচী"-বিরচিত প্রথম গ্রন্থ

মুখোশের অন্তরালে

কেমন সেই মুখোশ? আর কে তার অন্তরালে থেকে কোন্ রহস্যের সৃষ্টি করে যাচ্ছে?—তাই ভেবে সকলেই উদ্‌গ্রীব!

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য,

পৃষ্ঠা
… ১৬১
… ১৬৬
১, ১৪২, ১৭৪, ১৯৪
৮৫
বি. এস্-সি ৯৩
… ১২১
… ১৩৭
… ৮৯
… ১৫৪
… ১
… ৯৯
… ৯৬
… ১৮০
… ৭০
… ৬
… ১৪
… ১
… ১৩
… ২
বি.এস্-সি ১৬
…
…
…
৯৬, ১০৮, ১৩৪, ২
…
…
…
৩০, ৫৪, ৮৩, ৯১,
…

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
স্মৃতি-রঞ্জিত

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র
মাসিকপত্র

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,
এম্.এস্-সি

সপ্তদশ বর্ষ (বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৫১)
কার্য্যালয় :—১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সূচীপত্র

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
াল বাদল (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬১
ার (গল্প)	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৬৬
ভিযাত্রীর পত্র (ভ্রমণ কাহিনী)	শ্রীবিশ্বপতি দশগুপ্ত	১২, ৬১, ১০২, ১২৩, ১৪২, ১৭৪, ১৯৪
াচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র (জীবনী)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৮৫
াচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের গ (ঐ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	৯৩
জব পাচ (গল্প)	শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত	১২১
দর্শ জীবন (কবিতা)	শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী	১৩৭
মসত শিকার (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৮৯
মের ছোট বাঘ (শিকার-কাহিনী)	শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত	১৫৪
টি অপ্রকাশিত কবিতা (কবিতা)	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	১
টি সন্ধ্যা (ঐ)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	৯
ছরের ফুটবল (খেলাধুলা)	...	৯৬
কা (কবিতা)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত এম্.এ, বি. টি	১৮
ও কাজ (কবিতা)	শ্রীরেণুকণা কুমার	৭
ব (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস. সি	৬
একটি উজ্জ্বল দিনের কাহিনী (গল্প)	শ্রীরজত সেন	১৪
ার দিব্যচক্ষু (বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	১
নিন কুইনিন (ঐ)	ঐ	১৩
ীর শ্রী (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২
ণ (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি.এস্-সি	১
ওয়ার রকমফের (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৭
লমুথ সিং-এর ঘোড়া (গল্প)	শ্রীমানসমোহন রায়	১
মানিক হরমানিক (কবিতা)	শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, আই.সি-এস্	৮
ঠিপত্র	...	২৬, ৯৬, ১০৮, ১৩৪, ২
ড়া (ছড়া)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	...
ছোটদের চিত্রশালা	...	...
জনে মাথ (সংগ্রহ)	শ্রীউপগুপ্ত রায়	...
াক্তার লাহিড়ীর বাগান (ধারাবাহিক গল্প)	শ্রীকুঞ্জনাথ	১৪, ৩০, ৫৪, ৮৩, ৯১,
ারাদি' (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু, এম্.এ	...

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
তাসের প্রচলন (সংগ্রহ) ...	শ্রীঅংশুরঞ্জন সেন ...	১২৫
ধাঁধার উত্তর ও নূতন ধাঁধা ...		২৮, ৫২, ৭৮, ৯৭, ১০৮, ১১৮, ১২৭, ১৩৭, ১৫৯, ১৮৩, ২১২
নন্দের চাঁদ (গল্প) ...	শ্রীশামুক ...	১৬৪
নানা প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি ...	৫১, ১৯৬
নাড়ি-ছেঁড়া গল্প (গল্প) ...	৺সুবিনয় রায় চৌধুরী ...	[illegible]
পদ্ম (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	১২[illegible]
পুস্তক-পরিচয় ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ...	১৫[illegible]
পূজার ভোজ (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	[illegible]
পূর্ণিমা (ধারাবাহিক নাটক) ...	শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার, এম্.এ, বি-ল্	২০, ৪২, ৬৭, ১১৪, ১৪৮, ১৬২, [illegible]
পেনিসিলিন (বিজ্ঞান) ..	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি ...	
ফাগুন এসেছে (কবিতা) ...	শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী ...	
বর্ষার গান (কবিতা) ...	৺ফাল্গুনী রায় ...	
বড়দিনের বরাত (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	
বাঙালীর বাংলা বল ...	অরূপ ...	
বাজিকরের শেষ বাজি (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	
বাদুড় কেন নিশাচর (গল্প) ...	শ্রীরাধারাণী দেবী ...	
বিজয়ার শুভেচ্ছা (কবিতা) ...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ...	
বিনুর বিড়াল (গল্প) ...	শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা ...	
বীর আশানন্দ ঢেঁকী (কবিতা) ...	শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ, কবিভূষণ, সাহিত্যরত্ন ...	
ব্যাধের পূজা (গল্প) ...	শ্রীগৌরী দেবী ...	
ভজগোবিন্দ রায় (গল্প) ...	শ্রীশামুক ...	
ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি (প্রবন্ধ) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র ...	
মঞ্জু পিসীর ছেলের বিয়ে (কবিতা) ...	শ্রীবুলি চৌধুরী ...	
মণিমঞ্জুষা ...	...	১১[illegible]
মনে করো (কবিতা) ...	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার ...	
মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল	...	
মহাপুরুষের বাণী (কবিতা) ...	শ্রীকালিদাস রায়, বি. এ, কবিশেখর ...	৯[illegible]
মাণ্ডব্য ঋষি (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	
মান রক্ষা (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	
যা ছিল সবার মনে (প্রবন্ধ) ...	শ্রীগগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৩৪, ১৫২, ১৭০
যুদ্ধে ছদ্মবেশ বা ক্যামোফ্লেজ (প্রবন্ধ) ...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত ...	
যুদ্ধের যেটুকু ভাল (প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (গল্প) ...	শ্রীবিকাশ রায় ...	
রয়্যাল সোসাইটি (প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
[illegible]ত্যময় ও রোমাঞ্চক[illegible]াহিক উপন্যাস) ...	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৮, ৩৬, ৫৮, ৮৪, ৯২, ১০১, ১১৩, ১২৪, ১৩১, ১৪০
[illegible]র মন্ত্রী (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	১০৭
[illegible] সুখের নয় ...	শ্রীসীতা দেবী ...	২০৫
[illegible]কিল (গল্প) ...	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ...	১০৯
[illegible] দেশে (ক[illegible] ...	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৩৯
[illegible](কবিতা) ...	শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৯৬
[illegible]ৎ ভোরের স্বপ্ন (ক[illegible]) ...	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১০৯
[illegible]মূলের শাস্তি (গল্প) ...	শ্রীসীতা দেবী ...	২৫
[illegible]সাহিত্য-সংবাদ ...	...	৭৬, ১২৭, ১৮০, ২০৮
[illegible]সাহিত্যিক সুবিনজীবন-কথা) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	১৭৬
[illegible] (কবিতা) ...	শ্রীঅঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ...	১৮৩
[illegible]যমজ এং-চ্যাং (প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	১৫০
[illegible]বনাম স্বর্গীয় (গ[illegible]) ...	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্. এ ...	১৯২
...		২৭, ৫২ ৭৭, ৮৭, ৯৭, ১০৮, ১১৮, ১২৬, ১৩৬ ১৫৮, ১৮১, ২০৭
	...	২০০
[illegible] হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্যদেব ...	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	১২৬
[illegible] রীতিনীতি (প্রবন্ধ) ...	শ্রীগৌরী দেবী ..	২৩
[illegible]টের ছেলেমেয়ে (প্রবন্ধ) ...	রঞ্জিৎ ভাই ...	১১৭
[illegible]কাহিনী (প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্. সি ...	৩৪
[illegible]খার্জ্জি রোড (জীবন-কথা) ...	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ ...	২৭
[illegible]ী ...	শ্রীসুরঙ্গমা বসু ...	১৬০
[illegible]গান (কবিতা) ...	বন্দে আলি মিয়া	

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যার সহিত রামধনুর ১৭শ বর্ষ শেষ হইল। আগামী বৈশাখ হইতে রামধনুর ১৮শ বর্ষ আরম্ভ হইবে।
[illegible]-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া রামধনুর আগামী বর্ষের বার্ষিক (তিন টাকা) বা ষান্মাসিক (১৷৵০) চাঁদা আগামী
[illegible] চৈত্রের মধ্যে মনি অর্ডারে আমাদের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া সুখী করিবেন। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে[illegible]
[illegible]ের কার্য্যালয়ে (১৬, টাউনসেণ্ড রোড) বা শাখা কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড
[illegible]পুর, কলিকাতা) চাঁদা জমা দিতে পারেন। কোন কারণে মনি অর্ডার করা অসুবিধাজনক হইলে অনুগ্রহ
[illegible] ভি. পি. করিবার নির্দ্দেশ দিয়া পত্র দিবেন। কারণ কাগজের অপ্রাচুর্য্যের জন্য বর্ত্তমানে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রামধনু
[illegible] হয়, উহা যে কোন সময়ে নিঃশেষিত হইয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে পত্র দিলে, যাঁহারা রামধনু লইতে ইচ্ছুক
[illegible] উহা পাইতে কোনও অসুবিধা হইবে না। ভি. পি.তে অতিরিক্ত ।৵০ লাগিবে।
আমরা আশা করি এ বৎসর যাঁহারা গ্রাহক আছেন তাঁহারা আগামী বৎসরও গ্রাহক থাকিবেন। কোন
[illegible] কারণে কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে আগামী ২০শে চৈত্রের মধ্যে জানাইলে অনুগৃহীত হইব।
২০শে চৈত্রের মধ্যে কাহারও চাঁদা বা নিষেধসূচক পত্র না পাইলে আমরা উদ্বৃত্ত বৈশাখ সংখ্যাগুলি তাঁহাদে[illegible]
(ক্রমিক গ্রাঃ নং অনুসারে) ভি.পি.তে পাঠাইব। আশা করি উহা ফেরৎ দিয়া এই দুর্দ্দিনে কেহ
[illegible]দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করাইবেন না। ইতি— নিঃ কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাত[illegible]

বিষয় (বর্ণা
তাসের প্রচল
ধাঁধায় উত্তর
নন্দের চাঁদ (
নানা প্রসঙ্গ
নাড়ি-ছেঁড়া
পদ্ম (কবিত
পুস্তক-পরি
পূজার ভো
পূর্ণিমা (খ.

পেনিসিলি
ফাগুন এ
বর্ষায় গা
বড়দিনের
বাঙালীর
বাজিক
বাদুড়
বিজয়ার
বিদুর
বীর অ
ব্যাধে
ভজগে
ভারে
মঞ্জু
মণি
মনে
মনে
মহা
মা
মা
যা
যু
যু
র
র.

কয়েকখানা ছেলেমেয়েদের গল্পের বই ঃ—

এবারের

পূজা-বার্ষিকী
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বর্ষ-মঙ্গল

বিরাট গ্রন্থ—অসংখ্য ছবি ঃ এক রং, দুই রং ও বহু রং—গল্প ও কবিতার ঝরণা—সুন্দর বাঁধাই—উৎকৃষ্ট ছাপা।

মূল্য ২৷৷৹ মাত্র

ইহাতে লিখিয়াছেন

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু. "বনফুল", নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র-কুমার রায়, মাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সরোজ রায় চৌধুরী, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী, জসিম-, ধীরেন্দ্র ধর প্রভৃতি বিখ্যাত লেখক ও লেখিকাগণ।

এত বড় সমৃদ্ধ গ্রন্থ, [illegible]ত কম দামে—
বর্ত্তমান জগতে পরম বিস্ময়

নব প্রকাশিত
যাদুসম্রাট—পি. সি. সর
প্রণীত

ম্যাজিকের খে

দাম ১৲

**প্রতি মাসেই একখানি সিরিয়
বাহির হইতে**

প্রহেলিকা সিরিজে
(চমকপ্রদ ডিটেকটিভ্ কাহিনী)

১ম গ্রন্থ মুখোশের অন্তরালে (সব্যসাচী
২য় ,, মৃত্যুদূত ,,
৩য় ,, ব্লাড হাউণ্ড ,,
৪র্থ ,, কালের কবলে ,,
৫ম ,, শেষ বলি ,,
৬ষ্ঠ ,, নৈশ অভিযান ,,
৭ম ,, কবরের নীচে ,,

❋

বিশ্বপ্রতিভা সিরিজের
অমূল্য গ্রন্থ
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

যাদুকর মার্কণী

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস

❋

শিহরণের খনি
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন

দেব-সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৭শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৫১ { ১ম সংখ্যা

একটি অপ্রকাশিত কবিতা

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

সংযাপিয়া দীর্ঘ দিবস বদ্ধ পুরানিলে
দাঁড়ায় যখন আসি' মানব রম্য বিমান তলে
মিষ্টি লাগে সৃষ্টি তাহার হেরি' নীলাম্বর,
নিঃশ্বাসে তার মিশ্রিত হয় প্রার্থনারি স্বর।

সুখের তাহার নাই উপমা—যখন পরাণ ভরি'
নম্র তৃণ-অঙ্কোপরি ক্লান্ত তনু ছাড়ি'
চিত্তহারী আখ্যায়িকা ধরে চোখের আগে
পূর্ণ যাহা মানব-হিয়ার স্নিগ্ধ অনুরাগে।

নীল-বসনা সন্ধ্যা এলে ফিরতি পথে তার
কর্ণে পশে বুলবুলেরি কূজন বারম্বার ;
নেত্র তাহার মুগ্ধ হয়ে ঊর্দ্ধ দিকে চায়—
ক্ষুদ্র মেঘের হৃষ্ট গতি হেরে বিমান গায়।

স্বর্গদূতের অশ্রু যথা মর্ত্ত্যে ঝরে পড়ে
কেউ দেখে না—নিঃশব্দে হাওয়ার রথে চড়ে,
সন্ধ্যা সাথে তেমনিতর দিনটি চলে যায়
মনটি তাহার বিষাদ-ভারে পূর্ণ রেখে হায়।*

বড়দিনের বরাত

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

আপিসের ছোট সাহেব গড্‌ফ্রে বোনার্জ্জি আধা বাঙালী আধা সাহেব। বোনার্জ্জি কথাটার মধ্যে বাঙালীয়ানার অস্থিগত কিছুটা অস্তিত্ব থেকে গেছে বোধ হয়। কথাবার্ত্তায় বাঙালী হতে তাঁর বাধা নেই, কিন্তু চালচলনে তিনি সাহেব। রঙে এ দেশী, ঢঙে বিদেশী।

নিঃসন্দেহই খৃষ্টান। এবং খৃষ্টানদের বড়দিন একটা বড় পর্ব্ব, কাজেই বড়দিনের উপলক্ষে আফিস বন্ধ হবার দিনে তাঁকে উৎফুল্ল দেখানো স্বাভাবিক। এক সপ্তাহব্যাপী লম্বা ছুটি! এবং ছুটির সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কত রকমের না প্রমোদ!

উৎফুল্ল মুখে গড্‌ফ্রে আফিস থেকে বেরুচ্ছেন, দেউড়িতে মোম্‌রেজের সঙ্গে দেখা।

মোম্‌রেজ সেলাম করে দাঁড়াল। বড়দিনের একটা উপহার সে হাতে করে এনেছে—ছোট-খাট ডালি।

"কী—হাঁস নাকি?"

"জী হুজুর! একটা হাঁস।" বল্ল মোম্‌রেজ।

ভালো ক'রে কাগজে প্যাক্ করা একটা হাঁসের মৃতদেহ—গলার দিকটা মুখ বাড়িয়ে রয়েছে,

* কবি কীট্‌স্‌এর একটি কবিতার অনুবাদ। মনোরঞ্জনের বাল্যরচনা।

পা দুটো ঝুল্‌ছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর একটি হাঁস, আকার-প্রকারের দ্বারাই বোঝা যায়। নিজের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এটা সে এনেছে এ কথা জানাতেও মোম্‌রেজ কোনো দ্বিধা করল না।

গড্‌ফ্রের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভ'রে গেল—একটু অপ্রতিভ হলেন বোধ হয় তিনি।

"মোম্‌রেজ, তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমার অবাধ্যতার জন্যই বড় সাহেবকে ব'লে তোমাকে সাস্‌পেণ্ড্ করিয়েছি। বড়দিনের ছুটির পরে এসে দেখা কোরো। তোমাকে এবারে আপিসের বড় আর্দ্দালির কাজে বাহাল্ ক'রে নেব।"

মোম্‌রেজের চোখের কোণটা যেন জ্বলে ওঠে—অদ্ভুত একটা খুসিতেই বোধ হয়। ছোট আর্দ্দালির থেকে এক চোটে বড় আর্দ্দালিত্ব পাওয়া—শুদ্ধ একটা হাঁসের দৌলতে! তাই হয়তো স্বভাবতঃই তার হাসি পায়। সে হেসে বলে: "হুজুরের মর্জ্জি! অন্য এক আপিসে আমি ডেস্‌প্যাচারের কাজ পেয়েছি, কাজটা আর্দ্দালিগিরির চেয়ে একটু উঁচুই বটে। তা হোক্, তা হলেও আপনার আপিসের ছোট চাকরিও অন্য জায়গার বড় চাকরীর চেয়ে ঢের ইজ্জতের ব'লে আমি মনে করব।"

"ধন্যবাদ, মোম্‌রেজ, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এই হাঁসটা এনে তুমি আমায় কতখানি ঝঞ্ঝাট্ থেকে যে বাঁচালে! এখুনি একটা হাঁস কেনবার জন্য ছুট্‌তে হোতো আমাকে। হগ্ সাহেবের বাজারে মিল্‌ত কিনা কে জানে! বড়দিনের পর্ব্বে হাঁসের কেমন চাহিদা জানো তো? এদিকে মিসেস্ বোনার্জ্জি—তোমাদের গিন্নি—তোমরা যাকে গিন্নী বলো গো—আপিসে আসার সময়ে পুনঃ পুনঃ আমাকে ব'লে দিয়েছেন একটা হাঁস নিয়ে বাড়ী ফিরতে। বাড়ীতে আজ রাত্রে একটু খানাপিনা আছে কিনা—দু' একজন বন্ধুবান্ধব আস্‌বেন—একটু মান্যগণ্যই বই কি—সস্ত্রীক বড় সাহেবকেও নেমন্তন্ন করেছি কিনা! তুমি আমার যে কী উপকার করলে মোম্‌রেজ, কী বল্‌ব। ধন্যবাদ, মোম্‌রেজ, পুনশ্চ তোমাকে ধন্যবাদ।"

"উপকারের কথা কী বল্‌ছেন হুজুর! আপনি আমাকে বর্‌খাস্ত ক'রে দিয়ে যে উপকারটা করেছিলেন—যেটার জন্যই এই ডেস্‌প্যাচারি কাজটা পেয়ে গেলাম—তার কাছে এ তো কিছুই নয়। হুজুর খানাপিনার সময়ে দয়া ক'রে এই গরীবকে একটু মনে স্থান দেবেন তা হলেই আমি ধন্য হয়ে যাব।" বল্‌তে বল্‌তে মোম্‌রেজ যেন বিগলিত হয়ে পড়ে।

"নাঃ, মোম্‌রেজ, তুমি লোকটা বড় ভালো। খানার সময় কেন, এখন থেকেই আমার মনে তোমার স্থান রইলো। বড়দিনের পরে দেখা করতে ভুলো না যেন।"

মোম্‌রেজের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে গড্‌ফ্রে হাঁসের মুখের দিকে তাকালেন। গদ্‌গদ হয়ে মনে মনে হাঁসকেও একটা ধন্যবাদ জানালেন বুঝি। তারপর পা চালালেন গড্‌ফ্রে। গড্‌স্পীডে।

থোক্‌থাক্ দশ টাকা বেঁচে গেল তাঁর। মিসেস্ বোনার্জ্জি হগ্‌মার্কেটের এক দোকানে একটা হাঁসের বরাত দিয়ে রেখেছিলেন আগে থেকেই—কথা ছিল যে আপিস ফেরতা গড্‌ফ্রে সেখান থেকে নগদ মূল্যে হাঁসটাকে হস্তগত করে আন্‌বেন। কিন্তু আর তার দরকার হবে না। একটা হাঁস এখনই তো তাঁর হাতে এসে হাসছে,—এই টানাটানির বাজারে দশ দশটা টাকা বাঁচোয়া! বরাত বলে কাকে?

কিন্তু আরও বরাত ছিল বুঝি ওর পরও। তাঁর প্রিয় রেস্তোরাঁটীতে ঢুকে বৈকালিক চা-পান সেরে তিনি উঠ্‌তে যাবেন এমন সময় রেস্তোরাঁর মালিক এগিয়ে এলেন: "আপনার জন্য আমাদের সামান্য একটু উপহার আছে। একটি দিনও ফাঁক না দিয়ে সারা বছর ধরে যাঁরা প্রত্যহ আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন কেবল তাঁদেরকেই আমরা এই উপহার দিচ্ছি। আপনি হচ্ছেন তাঁদেরই একজন।"

মালিকের ইঙ্গিতে রেস্তোরাঁর বোয়্ প্যাকেট মোড়া একটি বস্তু এনে হাজির করল।

"হাঁস?" বেরুলো গডফ্রের মুখ দিয়ে।

"হাঁসই বটে।" জানালেন রেস্তোরাঁর মালিক। "এবং আমার একান্ত অনুরোধ আমাদের এই উপহারের কথাটা আপনার বন্ধুবান্ধবদের জানাতে আপনি যেন কুণ্ঠিত হবেন না।"

"না না, বল্‌ব বইকি। নিশ্চয়ই বল্‌ব।" বল্লেন গড্‌ফ্রে: "সামনা সামনি যাঁদের পাব দেখা হ'তে সঙ্গে সঙ্গেই ব'লে দেব, বাকী সবাইকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ব'লে আসব। আর যাঁরা একটু দূরে দূরে থাকেন, সিম্‌লায়, বোম্বেয়, কি ট্রাভাঙ্কোরে—তাঁদের চিঠি লিখে লিখে জানিয়ে দেব। কিচ্ছু ভাববেন না।"

"ধন্যবাদ। বহুৎ ধন্যবাদ।" হাঁস তো দিলেনই, সেই সাথে ধন্যবাদ দিতেও ভুল্‌লেন না মালিক।

তারপর রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে, দু' হাতে দুটি হাঁস নিয়ে দৌড়বোড় করতে করতে গড্‌ফ্রে ডালহৌসী স্কোয়ারে এসে পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠ্‌লেন। হাঁস এবং নিজেকে বাঁচিয়ে বেশ সুকৌশলেই তাঁকে উঠ্‌তে হলো বই কি!

পার্ক সার্কাসের গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর বেশীর ভাগ যাত্রীই সাহেবী। তাদের মুখের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাত ক'রে মধুর হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে চল্লেন গডফ্রে। ভাবখানা যেন কেমন পায়াভারী দেখেছ? দু' পায়ে দু'খানা!

এস্‌প্ল্যানেডের কাছে এসে তাঁর মনে হোলো, কথাটা হগ্‌মার্কেটের সেই দোকানদারটিকে জানিয়ে যাওয়া দরকার। বেচারা যদি হাঁস নিয়ে তাঁর প্রত্যাশায় ব'সে থাকে, সেটা উভয়তঃই আপ্‌শোসের হবে।

মার্কেটের সেই দোকানটিতে বেজায় ভীড় আজ। দোকানদার একটার পর একটা হাঁস হুক্ থেকে নামাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটি উধাও! মরা হাঁস, কিন্তু পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে যেন! খদ্দেরের মাত্রা যেমন বেড়ে চলেছে হাঁসের সংখ্যাও তেমনি কমে আস্‌ছে দ্রুতবেগে।

"ও, আপনার হাঁসটা আর চাই না?" আনন্দে যেন ফেটে পড়লো দোকানদার: "খোদা মেহেরবান্! বাজারে কোথ্‌থাও হাঁস নেই—কেবল আমার দোকানেই যা এই ক'টা। এক একটা হাঁস কুড়ি কুড়ি টাকায় বিক্রি হচ্ছে মিস্‌টার! তবু কুলিয়ে উঠতে পারছি না।"

"বলো কি?" গডফ্রে চম্‌কে উঠলেন যেন। ইস্! কুড়ি কুড়ি টাকা তো তাঁরও লাগত তা হ'লে—তাঁকেও কিন্‌তে হোতো যদি—ভাগ্যিস্ মোম্‌রেজ একটা দিয়েছিল। আর সে দিয়েছিল বলেই কিনা কে জানে, জলে জল বাধার মত, আরেকটা হাঁস অযাচিত ভাবে তাঁর হাতে এসে বাধ্য হয়েছে।

"যদি আপনি দিতে চান্, আপনার একটা হাঁস আমি কিনতে পারি। কুড়ি টাকাতেই কিন্‌ব। সন্ধ্যের পরে দাম আরও চড়বে, সেই চড়া বাজারে বেচে দেব তখন।" বল্ল দোকানদার।

তিন মিনিট বাদে মাইনাস্ এক হাঁস আর প্লাস্ কুড়ি টাকা হয়ে গডফ্রে বেরুলেন হগ্ সাহেবের বাজার থেকে।

না, হ্যাপি ক্রিস্‌মাস্ নিঃসন্দেহেই! শ্রীমতীর বরাতী হাঁসের বাবদে কুড়ি টাকা বেঁচে গেছে, কিন্‌তে হয়নি, তার ওপরে নিজের হাঁস বেচে নগদ কুড়ি টাকা লাভ। নেট্ চল্লিশ টাকার মুনাফা! এবং তারও ওপরে আর একটা হাঁস—মোম্‌রেজের দেয়া—তাঁর কাছে মজুদ্! দোকানদারটা মোটাসোটা দেখে মোম্‌রেজেরটাই কিন্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি কি ক'রে একজনের কৃতজ্ঞতার উপহার পরিত্যাগ করতে পারেন? প্রাণ গেলেও ও হাঁস তিনি হাতছাড়া করবেন না।

চৌরঙ্গী দিয়ে হেঁটে চলেছেন গডফ্রে। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে গিয়ে পার্ক সার্কাসের ট্রাম ধরবেন। একটু দূর যেতেই পেছন থেকে একজন ছুটে এল ডাকতে ডাকতে।

"ওঃ, আপনি এখান দিয়েই চলেছেন! খুব ভাল হোলো। আপনার বাড়ীই যাচ্ছিলাম, ট্রাবল্ বেঁচে গেল আমার।"

"কী ট্রাবল্?"

"ট্রাবল্ কিছু না, এই হাঁসটা।" বল্ল সেই লোক।

"হাঁস? হাঁস কেন?" গডফ্রে অবাক্ হয়ে যান।

"আমাদের অর্ফ্যানেজের আপনি টিকিট্ কিনেছিলেন, মনে নেই? আজ সেই লটারী হোলো। আপনার টিকিটে একটা প্রাইজ উঠেছে।"

"ফাস্‌ট্ প্রাইজ নাকি? কত টাকা?" হাঁসটা গডফ্রের হাত থেকে খসে পড়ে।

"আজ্ঞে ফার্স্ট প্রাইজ নয়। কোনো টাকাও না। একটা কনসোলেশন্ প্রাইজ আপনি পেয়েছেন—এই হাঁসটা।"

"হাঁস? আবার হাঁস? আরো হাঁস?" গডফ্রে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। তবু নিজেকে অনেকটা সামলে হস্তচ্যুত হাঁসটাকে তিনি মাটি থেকে তুলে নেন্।

"এই নিন্ আপনার হাঁস।" এই ব'লে লোকটা পুরস্কারের হাঁসটা গডফ্রের অপর হাতে গছিয়ে দিয়ে ধন্যবাদ লাভ ক'রে চলে গেল।

"বাবাঃ, এতো হাঁস! এত হাঁস আসছে আজ কোথ্‌থেকে?" চল্‌তে চল্‌তে গডফ্রে মনে মনে ব'লে ওঠেন: "কেউ নাকি একটা হাঁস পাচ্ছে না—আর আমার ভাগ্যে যতো হাঁস!" নিজেকে মানস সরোবর ব'লে তাঁর জ্ঞান হতে থাকে। সমস্ত হাঁস যাত্রা ক'রে তাঁর উদ্দেশে বেরিয়েছে—উদরসাৎ হবার উদ্দেশ্যে।

ব্রিষ্টল্ হোটেলের কাছাকাছি এসে এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা। "এসো, আমাদের ক্লাবে যাওয়া যাক্। কাল ক্রিসমাস্ ইভ্, আজ ফূর্ত্তি করা যাক্ একটু।"

কাছেই ওঁদের ক্লাব। দুই বন্ধুতে সেখানে হাজির হলেন। একটা পিন্ টেবিলে বাজি ধ'রে খেলা চল্‌ছিল। পিন্ টেবিল হচ্ছে পিন্ দিয়ে সাজানো এক রকমের টেবিল্—নানান্ ঘরে ভাগ করা—প্রত্যেক ঘরে একটা ক'রে সংখ্য দাগা থাকে। কতকগুলো মার্ব্বেলের গুলির মত দেয়া আছে—ছোট্ট একটা লাঠির ধাক্কায় তাদের তাক্ ক'রে বড় বড় সংখ্যার ঘরগুলিতে পাঠাতে হয়। যদি গুলি-লাগা সংখ্যাগুলি যোগ করলে পাঁচ হাজার তিনশো দাঁড়ায় তা হলে ক্লাব থেকে একটা পুরস্কারের বরাদ্দ।

এ পর্য্যন্ত কারোই তিন হাজারের বেশী এগোয় নি। গডফ্রে বল্লেন—"বটে? পাঁচ হাজার তিনশো করতে হবে? দেখি তো আমি একবার।"

এই ব'লে এক হাত দেখতে তিনি লাগলেন। ও মা, দেখতে দেখতে—মেরী মাতার জয় হোক্!—তাঁর সবগুলো গুলিই তাক্ মাফিক্ লাগসই হয়ে গেল।

ক্লাবের সেক্রেটারী এগিয়ে এসে সংখ্যাগুলি যোগ ক'রে দেখলেন—"ছ' হাজার সাত শো

পঞ্চাশ!" বিস্ময়ে তাঁর কণ্ঠ ফিস্‌ফিসিয়ে এল। অবশেষে আচ্ছন্নের মত তাঁকে বল্‌তে শোনা গেল—"আপনার হাঁসটা আপনি নিয়ে যান্ দয়া ক'রে।"

"আবার—আবার একটা হাঁস?" গডফ্রে এবার কাহিল হ'য়ে পড়েন। হাঁসের ত্র্যহস্পর্শ হয়ে গেল যে! তৃতীয় হাঁসটি দখল করবেন তেমন কোনো বাড়তি হাতও তাঁর নেই। "য়্যাতো হাঁস আমি ধরব কোথায়? করব কী?"

"নিলাম ক'রে দাও না।" উপদেশ দিলেন একজন।

"বেশ, তাই করো তা হলে। এই দুটো দিলাম—এটি থাক্। একজনের উপহার দেয়া এটা, এটাকে আমি নিলামে দিতে পারব না।" বল্লেন গডফ্রে।

একটা হাঁসের নিলাম হোলো—সর্ব্বোচ্চ ডাক উঠ্‌ল সাতচল্লিশ টাকার। আরেকটা হাঁস এক টাকার টিকিট ক'রে ক্লাবের বন্ধুদের মধ্যে লটারী করা হোলো, তার থেকে গডফ্রের এল তিপ্পান্ন।

এই সব শেষ হ'তে সন্ধ্যা কাবার হয়ে বেশ রাত হয়ে গেল। মিসেস্ বোনার্জ্জি হয়ত এতক্ষণ হাঁসের অপেক্ষায় হাঁসফাঁস করছেন। এক্ষুণি নিমন্ত্রিতরা সব এসে পড়বে—অথচ এখনো রান্নাই হয়নি। আসল হাস্যই বাকী।

নাঃ, আর দেরী করা নয়। ভারী পকেটে আর হাল্‌কা মনে গডফ্রে এবার সোজা বাড়ীর দিকে। অতগুলো হাঁসের তাঁর কোন দরকার ছিল না—অত খাবে কে? তার বদলে নগদ লভ্যয় সারা ছুটিটা বেশ আরামে কাটানো যাবে। আর ওই সব বাজে হাঁসদের—কারো কৃতজ্ঞতার উপহার ছিল না তো ওরা—বিদায় ক'রে ভাল করেছেন উনি। অকৃতজ্ঞতার বোঝা বাড়ী বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে না ওঁকে।

"উঃ, এত দেরি হোলো ফিরতে তোমার? দাও হাঁসটা, দাও।" গডফ্রের বৌ ওঁর হাত থেকে হাঁসটা ছিনিয়েই নিল যেন—

"ও গড্, এ কি!" কাগজের মোড়ক খুল্‌তে মোম্‌রেক্সের হাঁস বেরিয়ে পড়ল—একটা রাগ্‌বি ফুটবলের একধারে হাঁসের গলা আর অন্য ধারে দু'টো পা সেলাই ক'রে যুড়ে দেওয়া। বরাতের এ কোন্ উপহাস?

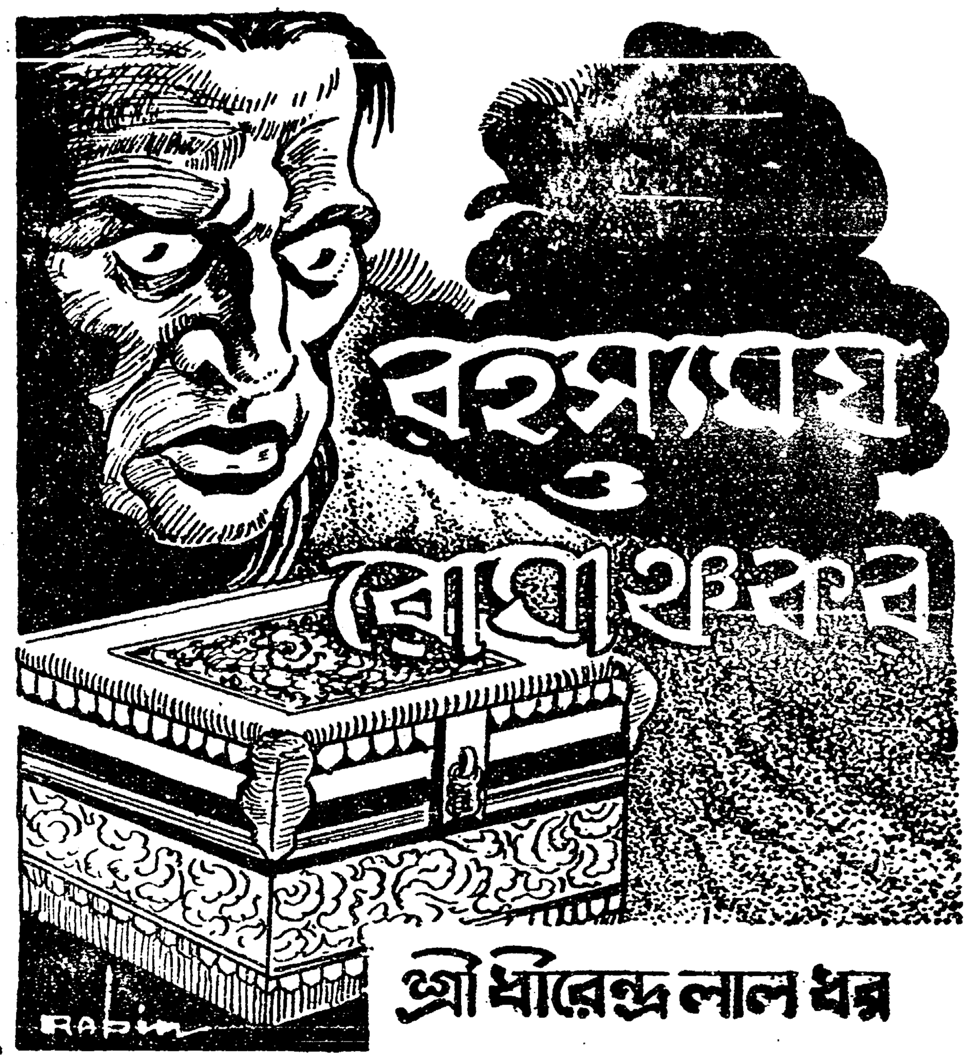

[পুর্ব্বকথা—সত্যোনের বাবা দেবেশ বাবুর মৃত্যুটা আকস্মিক এবং কিছুটা রহস্যজনকও। মৃত্যুর পর সত্যোনের কাছে লেখা তাঁর একখানা রহস্যজনক চিঠিও পাওয়া গেল। চিঠির সঙ্গে ছিল একখানা ছোট ছবি। ঐ ছবিই নাকি দেবেশ বাবুর রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ জানাবে আর সন্ধান দেবে প্রচুর সম্পত্তির। কাজেই ওটা সাবধানে রাখতে হ'বে। এর পর একদিন সত্যোনের বাড়ী চড়াও হয়ে দেবেশ বাবুর বন্ধু রবি ঘোষকে একদল গুণ্ডা ধরে নিয়ে গেল এবং তার পরেই তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হ'ল নদীতে। ধর্ম্মতলায় ফিরিঙ্গি সোলার সাহেবের দর্জির দোকান গুণ্ডাদের আড্ডা। শশধর দলের একজন। একদিন সত্যোনও লেকের ধারে তাদের হাতে আক্রান্ত হ'ল। এক যুবক তাকে রক্ষা করল। এই যুবক মনুসিং দেবেশ বাবুর বন্ধুপুত্র এবং এর কাছে পাওয়া গেল দেবেশ বাবুকে পাঠানো মনুসিংএর বাপের এক সাঙ্কেতিক খবর—কিন্তু কিছু তার বোঝা গেল না। ইতিমধ্যে একদিন বেড়াতে গিয়ে সাইরেন শুনে সত্যোন একজন এ-আর-পির কথায় একটা বাড়ীতে আশ্রয় নিল। বেরিয়ে আসবার মুখে হঠাৎ গৃহস্বামী দাবী করল সেই ছবিটা। তারপর পড়:]

সপ্তম কাণ্ড

এখানে এ রকম কথা শুনতে হবে সত্যেন তা মোটেই ভাবতে পারে নি। কোন রকমে সামলে নিয়ে বল্‌ল,—তার মানে?

—মানে জলের মত সরল। আপনার বাবা যে কার্ডবোর্ডের ছবিটা আপনাকে দিয়ে গেছেন সেটি আপনি আমাদের দিন ···

—ওঃ, তাই এতক্ষণ তোমাদের মুখগুলো চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছিল! তোমরাই রবি ঘোষকে ধরে এনেছিলে আমার বাড়ী থেকে ··· আমার বাবার মৃত্যুর কারণও তা হলে তোমরা?

—দেখ ছোকরা, ও সব বাজে কথার সময় নেই। ছবিখানা তুমি দেবে কিনা?

—তার মানে, তোমাদেরকে দেবার জন্যে সে ছবিখানা কি আমি পকেটে নিয়ে ঘুরছি নাকি?

—কোথায় আছে তা হলে?

—যেখানে থাকা উচিত সেইখানেই আছে।

—বাড়ীতে নেই?

—না।

—তা সে যেখানেই থাক, কাল সন্ধ্যা সাতটার সময় একটা সুতোয় বেঁধে সেটাকে তোমার গলির দিকের জানালা দিয়ে বাইরে ঝুলিয়ে দেবে। আমাদের লোক গিয়ে যথা সময়ে খুলে নিয়ে আসবে। এর মাঝে যদি তুমি পুলিশে খবর দাও বা কোন রকম চালাকী করার চেষ্টা কর তা হলে বিষম বিপদে পড়বে; সে কথা খেয়াল রেখো।

বক্তার পাশে যে বসে ছিলো সে এবার রহস্য করে বললো—'বিষম বিপদটা অবশ্য তেমন কিছু নয়। ধরো তোমার জিভটা কেটে ফেলা হোল, নয়তো দু' হাতের দশটা আঙ্গুল। তাতে আর তোমার বিশেষ কি ক্ষতি হবে বল, তোমাকে তো প্রাণে মারা হোল না! পুলিশের ডাক্তার কতকগুলো ইস্‌প্রিঙের আঙ্গুল লাগিয়ে দেবে, না হলে একটা রবারের জিভ। পুলিশ থাকতে তোমার ভয়টা কিসের বল?

প্রথম বক্তা এবার তারিফ করে বললে,—বা, তুই রসিয়ে রসিয়ে কথা বলতে পারিস বেশ, গুণ্ডা না হয়ে তুই কেন ফিলিমের এক্‌টোর হলি নি তাই ভাবি।

—তাই হব একদিন দেখিস। কোন এক্‌টোরের চেয়ে মদ তো আমি কম খাই নে। দাঁড়া, আগে কিছু পয়সা পিটে নিই। একখানা মোটর হ'লেই দেখবি সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

—আরে মোটর গাড়ী থাকলে তুই এক্টোর কি, ডিরেক্‌টোর হবি। যাক্, সত্যেন বাবু, থুড়ি মিষ্টার বাঁড়ুয্যে, আপনি তা হলে এখন আসুন, আবার সুবিধা মত দেখা হবে। কালকের কথাটা মনে রাখবেন ···

—আজ্ঞে তা হলে পেন্নাম হই ঠাকুর মশাই; —দ্বিতীয় গুণ্ডাটি সত্যেনকে গোপালভাঁড়ী কায়দায় নমস্কার করলো।

—যা যা, আর হাসাস নি—বলে প্রথম গুণ্ডাটি দরজা খুলে দিলে, সত্যেনের দিকে ফিরে বললে—এবার তা হলে আপনি বিদায় হোন।

পথে নেমে সত্যেন ছুটলো, বাড়ীর দিকে নয় থানার দিকে।

থানায় ঢুকেই সত্যেন হৈচৈ করে উঠলো—খুব লোক বটে আপনারা! আপনাদেরকে এত করে বললাম তবু গ্রাহ্য করলেন না! এদিকে গুণ্ডার দল সুবিধে পেয়ে আমাকে বেশ শাসিয়ে দিলে। বলেছে আমায় খুন করবে, জিভ কেটে দেবে, হাত-পায়ের আঙ্গুল কেটে নেবে! আমি এখন করি কি! দু' দুটো খুন হোল তবু আপনারা···আর আপনাদেরকে কত করে বলবো বলুন··· স্বদেশীর ব্যাপার হ'লে আপনারা কি এমনি ভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারতেন; বলুন?

ইন্‌স্‌পেক্‌টার রমেশ বাবু আফিসেই ছিলেন. হেসে বললেন,—বসুন বসুন। আপনাকে বড় চঞ্চল বলে মনে হচ্ছে।

—কলকাতার মত শহরে গুণ্ডার হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছি তবু চঞ্চল হব না? আপনি তো হাসছেন, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো?

—তা না হয় খুবই ভেবে দেখবো, কিন্তু কি ভাববো সেই উপকরণগুলো আগে আমায় বলুন!

—কিছুই আপনারা করবেন না, আর কি বলবো?—সত্যেন এবার হতাশভাবে চেয়ারে বসে পড়লো।

—আবার নতুন কোন উপসর্গ দেখা দিল নাকি?

—আর কত বলব?—সত্যেন সেই রাত্রির কাহিনী সুরু করলো।

—হুম্!—সব শুনে রমেশ বাবুর মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। একটির পর একটি সিগারেট পুড়তে লাগলো। কুণ্ডলীময় ধোঁয়ার কালিমা সরল হ'য়ে বায়ুস্তরে মিশছে। চিন্তার জট ওই রেখার মত আপনাকে সহজ করার আকাঙ্ক্ষায় সচেষ্ট। রমেশ বাবুর মন চিন্তামুক্ত হবার আগ্রহে পথ খুঁজছে।

কয়েক মিনিট পরে রমেশ বাবু জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

—কাকে সন্দেহ করবো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—মনু সিং ছোকরাটি কেমন?

—কেন, সে তো খুব ভালো লোক! সেদিন লেকের ধারে সে না এসে পড়লে তো আমাকে আজ হাসপাতালে থাকতে হোত।

—তা হোক, কিন্তু ওই যে সে 'শশক গর্ত্ত থেকে বেরিয়েছে' বলে খবর দিলে, তার মানে কি?

—তার মানে সে তো নিজেও জানে না, জানলে নিশ্চয়ই বলতো।

কিন্তু সে যে শত্রুপক্ষের লোক নয় তা আপনি কি করে বুঝলেন?

—কথাবার্ত্তায় তেমন কিছু তো মনে হয় না। অত কম বয়স, এমন ভদ্র, সে কখনও অত ছোট হতে পারে না।

—দেখুন সত্যেন বাবু, ওটা নিছক মনোবিজ্ঞানের কথা। আপনার আমার কাছে যেটা সহজ সরল বলে মনে হচ্ছে না, অপরাধ-প্রবণ মনের কাছে সেগুলো তেমন কিছু নয়। য়্যাব্‌নর্মাল মনের

লোকেরা খুন করে আনন্দ পায়, পকেট মেরে, চুরি করে খুসী হয়, ওটা রীতিমত একটা মানসিক ব্যাধি।

—কিন্তু অমন ছেলে ...

—'ডাক্তার জিকিল্ আর মিষ্টার হাইড্' বইখানা পড়েছেন তো? ঠিক সেই ব্যাপার। সামনে এক রকম, পিছনে আর এক রকম। ওর সঙ্গে আপনি একটু সাবধানে মিশবেন। আমরা ওর ওপর নজর রেখেছি, যথা সময়ে ওকে গ্রেপ্তার করবো।

—তা করুন, কিন্তু আজকে যে বাড়ীতে আমি লাঞ্ছিত হলাম সেখানে একবার গেলে ভালো হোতো না কি?

—এখন গিয়ে কোন লাভ নেই, কারণ যে বাড়ীটার কথা আপনি বললেন, ওদিক্‌কার ওই সব বাড়ীগুলো এখন খালি পড়ে আছে, বাসিন্দারা বোমার ভয়ে পালিয়েছে। গিয়ে দেখবো কেউ কোথাও নেই, ফ্ল্যাটগুলো খাঁ খাঁ করছে। সুতরাং যাবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকুন, যথা সময়ে দেখবেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

—কিন্তু আপনাদের এই 'যথাসময়'টা কখন আসে বলতে পারেন? আমি তো আজ অবধি ও কথাটার কোন মানে খুঁজে পেলাম না। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া থেকে সুরু করে চালের দাম কমানো পর্য্যন্ত সব কিছুর সঙ্গেই ওই 'যথাসময়' কথাটা যোড়া আছে।

—যথা সময়ে ও কথাটার অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন।

—এবার সত্যই সত্যেন হেসে ফেললো।

রমেশ বাবু সত্যেনের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—'চিয়ারিও মাই ল্যাড!' এত সহজে এত 'ডিপ্রেস্‌ড্' হলে চলবে কেন! রাত অনেক হোল, চলুন আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি। খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন গে, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সত্যেনের হাত ধরে রমেশ বাবু পথে নামলেন। (ক্রমশঃ)

তোমার ঋতুর দ্বৈমাসিকে গল্প, গান ও ছবি—
একাই তুমি, চিত্রকর আর লেখক, কবি,—সবি।
আমরা পড়ি, পড়ে' কতই নকল করে লিখি,
তোমায় শুধাই—তোমার মত লিখতে কিসে শিখি?

শ্রীকানাই দীর্ঘাঙ্গী

অভিযাত্রীর পত্র

শ্রীবিশ্বপতি দাশগুপ্ত

রামধনুর ভাইবোনেরা,

এর আগের বারে তোমাদের আগ্রা-দিল্লীর গল্প বলেছি। এবারে করাচী। করাচীতে এসে যে হোটেলটায় উঠলাম তার নাম কার্লটন্ হোটেল।

করাচীতে নানা জাতির বাস। পাঠান, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী, ইহুদী, পার্শী, কাফ্রী, আরববাসী—সবই আছে। করাচী হচ্ছে ইয়োরোপের সব চেয়ে কাছাকাছি ভারতীয় বন্দর, এডেন থেকে ১৪৫০ মাইল।

শ' খানেক বছর আগেও কিন্তু করাচী একটা নগণ্য জায়গা ছিল, অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজারেরও কম। কিন্তু এরই মধ্যে এর অসম্ভব উন্নতি হয়েছে এবং আজ এর লোকসংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশী।

বন্দরের প্রবেশপথের কিছু দূরে একটি দ্বীপ। এর কিয়ামারী নামক জায়গাটী করাচী সহরের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজ-অধিকারের আগে কিয়ামারীর লোকসংখ্যা ছিল কয়েক শ', আর তাদের প্রধান ব্যবসা ছিল মাছ ধরা। কিয়ামারী থেকে করাচী আসতে হ'ত নৌকায়। স্যর্ চার্লস্ নেপিয়ার এই দু' জায়গা সংযুক্ত করার জন্য একটা বাঁধ তৈরী করতে সুরু করেন। এখন বাঁধের পরিবর্ত্তে নতুন সেতু নির্ম্মিত হয়েছে।

করাচীর ব্রেক্ ওয়াটার জলের ভিতর মাথা তুলে আছে। যাতে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ বন্দরের পাড় ভেঙ্গে না দেয় তারই জন্য ব্রেক্ ওয়াটারের সৃষ্টি। তরঙ্গবেগ রোধ করবার জন্য বন্দরের ভিতরে প্রাচীরের রক্ষা-ব্যবস্থা—তাকেই বলে ব্রেক্ ওয়াটার। ভীষণ বায়ুপ্রবাহের সময়ে

প্রচণ্ড ঢেউগুলি যখন বার বার এর ওপর আছড়ে পড়ে তখন বোঝা যায় এর মহান্ উপকারিতা।

বন্দরের প্রবেশ-পথের সামনে একটা চরা থাকার দরুণ আগে করাচীতে বড় বড় জাহাজ আসতে পারত না। এখন সে বাধা দূর হয়েছে।

বন্দরের প্রবেশ-পথের পশ্চিম দিকে শেষ কিনারায় ম্যানোরা দুর্গ। প্রবেশ-পথের কাছের উপকূল ঢালু ও বালুকাপূর্ণ। সকালে ও সন্ধ্যায় বহু লোক এখানে বেড়াতে আসে; আমিও আসতুম।

করাচীর কাজ সেরে সোজা চলে এলুম জয়পুরে। জয়পুর রাজপুতানার একটি প্রধান দেশীয় রাজ্য। রাজধানী জয়পুর সহর। পর্য্যটকেরা প্রায়ই এখানে আসেন। গার্ণেট প্রভৃতি মূল্যবান্ পাথর এখানে পাওয়া যায়। এই সব পাথর কেটে সুচারু রূপে অলঙ্কারে বসান এখানকার একটি প্রধান শিল্প। এখানকার হীরাজহরতের কাজ, মিনার কাজ ও মসলিন কাপড় খুব প্রসিদ্ধ।

জয়পুরের রাজপ্রাসাদটি খুব সুন্দর। রেসিডেন্টের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে দেখতে গেলুম। প্রাসাদটি সহরের অনেকখানি জায়গা যুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় আধ মাইল জায়গা যুড়ে তার বাগান—অতি মনোরম সে দৃশ্য।

প্রাসাদের এক অংশের নাম চন্দ্রমহল। এরই পূব দিকে বিখ্যাত মানমন্দির। এটি রাজা-জ্যোতিষী জয়সিংহের কীর্ত্তি; প্রায় দু'শ' বছরের পুরোনো। জয়সিংহ সবশুদ্ধ ৫টি মানমন্দির স্থাপন করেন, তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়। অন্যগুলি যথাক্রমে দিল্লী, বারাণসী, মথুরা ও উজ্জয়িনীতে স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ মানমন্দির বলতে আমরা যা বুঝি এ তা নয়। উন্মুক্ত ভূমির ওপর জয়সিংহের আবিষ্কৃত নানা কৌতূহলোদ্দীপক জ্যোতিষ-যন্ত্র স্থাপিত রয়েছে। জয়পুরের রাজারাই বারবর এর তত্ত্বাবধান করে আসছেন।

আর একদিন গিয়েছিলাম জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বর দেখতে। ১১শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অম্বর ছিল জয়পুর রাজ্যের রাজধানী। এখন এ নগর পরিত্যক্ত কিন্তু তবুও অম্বরে অনেক কিছু দেখবার জিনিষ আছে।

জয়পুর থেকে অম্বর ৫ মাইল। মোটর এগিয়ে চল্‌ল। নীরস, শুষ্ক রাজপুতানার রুক্ষ দৃশ্য চোখে পড়তে লাগ্‌ল। বাঁ দিকেও রুক্ষ কঠিন পাহাড়ের শ্রেণী। তাকে দৃঢ়তর করা হয়েছে বহু দুর্গ দ্বারা। শিলাময় পাহাড়ের ওপর একটি হ্রদের পাশে রাজপ্রাসাদটি দাঁড়িয়ে। এর সুন্দর অবস্থিতি দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ ক'রে তোলে। এই রাজপ্রাসাদের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মহারাজ মানসিংহ। শুনলাম, স্থাপত্য-নৈপুণ্যের দিক্ দিয়ে এটি নাকি ভারতে দ্বিতীয় স্থান পায়। প্রথম নাকি গোয়ালিয়র রাজপ্রাসাদ।

ডাক্তার লাহিড়ীর বাগান

(বড় গল্প)

শ্রীকুঞ্জনাথ

ডাক্তার ভবানী লাহিড়ী লোকটি মনে প্রাণে নাস্তিক। ভারি অমায়িক ভদ্রলোক, কিন্তু ভগবানের নামে, ধর্ম্মের নামে একেবারে ক্ষেপে যান। এমনও শোনা গেছে যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যে কেউ তাঁর কাছে চাঁদা চাইতে গেলে তিনি তাকে মেরে তাড়িয়েছেন; অথচ সৎকাজে তাঁর অযাচিত দানের খ্যাতি আছে।

ডাক্তার লাহিড়ীর জন্মতিথির উৎসব। নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবরা সন্ধ্যে থেকেই আসতে সুরু করেছেন, কিন্তু ডাঃ লাহিড়ীই তখন পর্য্যন্ত বাড়ীতে অনুপস্থিত। ডাঃ লাহিড়ীর বাপের আমলের বুড়ো চাকর মাধব জানিয়েছে, ডাক্তার সাহেব কলেজের হাসপাতালে একটা জরুরী অস্ত্রোপচারের জন্য আটকা পড়েছেন; টেলিফোনে জানিয়েছেন, দশ মিনিটের ভেতরে এলেন ব'লে। অস্ত্রচিকিৎসায় ডাঃ লাহিড়ীর সুখ্যাতি দেশময়; ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে বন্ধুরা রাগ করতে পারেন নি।

ডাঃ লাহিড়ীর বাড়ীখানার বেশ একটা বিশেষত্ব আছে। চারদিকে উঁচু পাঁচীল দিয়ে ঘেরা; বড় বড় ঝাউগাছে ছায়াশীতল। এ ছাড়া পুলিশের চোখে বাড়ীখানার গঠন-বৈচিত্র্যের একটা মস্ত বড় বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, একমাত্র সদর দরজা দিয়ে ছাড়া অন্য কোন দিক্ দিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকবার অথবা বাড়ী থেকে বেরোবার কোন পথ নেই। নিতান্ত অভ্যাসের বশেই সারাদিন ধ'রে মাধব সদর দরজায় সতর্ক হ'য়ে বসে পাহারা দেয়। বাড়ীর পেছন দিকে বাগান। বেশ বড় বাগান, অনেক ফুলের গাছ তাতে রয়েছে। বাড়ীর ভেতর থেকে বাগানে যাবার দুটো তিনটে পথ রয়েছে কিন্তু বাগান থেকে বাড়ীর বাইরে যাবার কোন পথ নেই। বাগানকে ঘিরে রয়েছে জেলখানার পাঁচীলের মত উঁচু মসৃণ পাঁচীল; পাঁচীলের মাথায় তীক্ষ্ণাগ্র লোহার কাঁটা। ডাক্তার লাহিড়ীর বাবা ছিলেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একজন বড় কর্ত্তা; বদমায়েসদের শত্রুতা থেকে নিরাপদে থাকবার জন্যে বাড়ীখানা তিনি তাঁর মনের মত ক'রে তৈরী করিয়েছিলেন।

মিনিট দশেক পরেই ডাঃ লাহিড়ী এসে উঠলেন। মাঝারি আকারের চামড়ার হাত-ব্যাগটি নিজেই হাতে নিয়ে মোটর থেকে নেমে তিনি সোজা তাঁর বসবার ঘরে এসে দাঁড়ালেন। খোলা দরজার ভেতর দিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দেখলেন, চাঁদের আলো সেখানে তখন ঝলমল করছে। সেই দিকে চেয়ে ডাক্তার লাহিড়ী এক মুহূর্ত্তের জন্যে হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন, কিন্তু তৎক্ষণি তাঁর মনে পড়ল তাঁর ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং নিমন্ত্রিতরা ইতিমধ্যেই

অনেকেই এসে গেছেন। আর মুহূর্ত্ত মাত্র দেরি না ক'রে ডাক্তার লাহিড়ী তাঁর ড্রইং রুমের দিকে পা বাড়ালেন।

ড্রইং রুমে তখন আমোদ-আহ্লাদ সুরু হয়ে গেছে। এক নজরেই ডাঃ লাহিড়ী দেখে নিলেন যে, বিশেষ ক'রে যাঁকে নেমন্তন্ন করবার জন্যে তাঁর আজকের এই উৎসবের আয়োজন তিনি তখন পর্য্যন্ত এসে ওঠেন নি। এসেছেন বৃদ্ধ অধ্যাপক গজানন পাকড়াশী, তাঁর দুই অতি-আধুনিকা নাত্‌নী, চোখে পুরু কাঁচের পাশ্‌নে আঁটা ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ী-মুখো বৈজ্ঞানিক ডাঃ সেন, নতুন পাশ-করা ব্যারিষ্টার মিঃ তলাপাত্র এবং তাঁর স্ত্রী, গেরুয়াধারী টেকো-মাথা ফণী রায় আর খড়্গ বাহাদুর। খড়্গ বাহাদুর নেপালী, সৈন্যবিভাগে বড় চাকরী করেন, বাংলা হালচাল এখনো ভালো করে আয়ত্ত ক'রে উঠতে পারেন নি। সামরিক পোষাকে গলায় কুকরি ঝুলিয়েই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছেন। ডাঃ লাহিড়ী সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে সকলের সঙ্গেই একে একে নমস্কার বিনিময় করলেন।

যাঁর জন্যে ডাঃ লাহিড়ী সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন একটু পরেই তিনি এলেন। শ্রীযুক্ত ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতনামা লোক। হাজারিবাগ অঞ্চলের এক বিরাট অভ্রের খনির তিনি একমাত্র মালিক, কোটিপতি লোক। সকল ধর্ম্মমতের ওপরেই ধরণী বাবুর অগাধ বিশ্বাস এবং প্রতিটি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানেই তিনি দান ক'রে থাকেন মুক্ত হস্তে। ধরণী বাবু দীর্ঘদেহ প্রৌঢ়, বিয়ে করেন নি, তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও কেউ নেই। ডাঃ লাহিড়ী পুরো নাস্তিক হলেও তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু। কালো রঙের ইউরোপীয় সান্ধ্য পোষাকে তাঁকে মন্দ দেখাচ্ছিল না।

প্রথম কিস্তি চা পানের পর ধরণী বাবু ডাঃ লাহিড়ী আর খড়্গ বাহাদুরের সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করলেন,—বোধ করি বাগানেই গেলেন বেড়াতে। অধ্যাপক পাকড়াশীর নাত্‌নী দু'জন বাগানে চাঁদের আলোয় বেড়াবার জন্যে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পর অধ্যাপকও তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে কক্ষ ত্যাগ করলেন। ঘরের বাইরে বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে চেয়ে অধ্যাপক খুসিতে ভরপুর হয়ে উঠলেন। ঘরের ভেতরে তখন বৈজ্ঞানিক ডাঃ সেন আর ফণী রায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাদ প্রতিবাদ চলছে। ডাঃ সেন দস্তুরমত চেঁচামিচি করছেন আর বেচারা ফণী রায় নিতান্ত মিন মিন করেই তাঁর প্রতিবাদ জানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। অধ্যাপক বাগানে নামলেন।

একটা কৃত্রিম ঝোপের আড়াল থেকে তাঁর বড় নাতনী রেবা প্যাঁচার মত মুখ ক'রে হঠাৎ বেরিয়ে এসে তাঁর সম্মুখ দিয়েই সোজা ড্রইং রুমের দিকে চ'লে গেল। অধ্যাপক তাকে ডাকলেন

না। তিনি তখন ঝলমলে চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছেন, দূরে একটা মরশুমি ফুলের কেয়ারির ধারে খড়্গ বাহাদুর অস্থির ভাবে কেবলই পায়চারি করছেন। মিনিট দুয়েক পায়চারি ক'রে খড়্গ বাহাদুর দ্রুতপদে অন্য পথে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন, তারপর চ'লে গেলেন ডাঃ লাহিড়ীর লাইব্রেরী ঘরের দিকে। অধ্যাপক একটু বিস্মিত হলেন। ব্যাপারটা কি! তিনিও তখন ফুলের কেয়ারির দিকে যাবার পথ ধ'রে দ্রুতপদে খড়্গ বাহাদুরের অনুসরণ করলেন। কেয়ারির কাছে আসতেই অধ্যাপক হঠাৎ কি যেন একটা পায়ে লেগে বিষম এক হোঁচট খেলেন। পাথর কিংবা গাছের গুঁড়ি কিছু একটা হবে ভেবে প্রথমটা বিরক্ত হয়ে তারপর কৌতূহল বশে নীচের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে সেটাকে পরীক্ষা করে' বৃদ্ধ অধ্যাপক আকাশ-ফাটানো এক চীৎকার দিলেন। তারপরেই দেখা গেল, 'খুন খুন' ব'লে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ড্রইং রুমের দিকে ছুটে চলেছেন! তাঁর চীৎকার শুনে ড্রইং রুম থেকে ডাঃ সেন এবং আর সকলে ছুটে এলেন। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অধ্যাপক কোন রকমে তাঁদের বললেন, ভয়ানক ব্যাপার! একটা মড়া,—বাগানে ঘাসের ওপরে একটা মড়া,—একেবারে রক্তগঙ্গা!

পলকের মধ্যে যেন একটা প্রলয় হ'য়ে গেল। খবর পেয়ে ডাঃ লাহিড়ী ছুটে এলেন; ব্যাপার শুনে তাঁর মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল। অধ্যাপক পাকড়াশীর নির্দ্দেশে তাঁরা সকলে মিলে মৃতদেহের কাছে এসে দাঁড়ালেন। পথের ওপরেই দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ গঠন মৃতদেহটি উপুড় হ'য়ে পড়ে রয়েছে। পরনে কালো রঙের ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, মুখের নীচে থেকে রক্তের একটা ধারা সাপের মত এঁকে বেঁকে বেরিয়ে এসেছে।

দেখে শুনে ডাঃ সেন বললেন, লোকটা আমাদের কেউ নয় নিশ্চয়! এখনো বেঁচে রয়েছে কি ডাঃ লাহিড়ী? দেখুন তো!

ডাঃ লাহিড়ী মৃতদেহটিকে স্পর্শ ক'রে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন, এখনো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি, তবে আমার বিশ্বাস বেঁচে নেই। আপনারা কেউ আমায় একটুখানি সাহায্য করলে চিৎ করে শুইয়ে ভালো ক'রে দেখতে পারি।

ডাঃ সেনের সাহায্যে দেহটাকে চিৎ করতেই ভয়ঙ্কর ভাবে জানা গেল যে দেহে প্রাণ নেই, থাকতে পারে না। দেহের সঙ্গে মাথাটা চিৎ হ'ল না, যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পড়ে রইল। বোঝা গেল, ধড় থেকে মাথাটাকে কেটে আলাদা ক'রে ফেলা হয়েছে। নিত্য-মড়া-ঘেঁটে-ঘেঁটে-হদ্দ ডাঃ লাহিড়ী পর্য্যন্ত এ দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন। ডাঃ সেন একটা শুকনো ডাল দিয়ে মাথাটাকে চিৎ করে দিলেন। ভীষণ বলিষ্ঠ লোকের মাথা, বাজপাখীর মত নাক, পুরু ঠোঁট, তামাটে

রং, কাঁধ ঘেঁষে কাটা; চোয়ালের কাছে একটা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু মুখখানা একটুও বিকৃত হয় নি। ডাঃ সেন যা বলেছিলেন সে কথা সত্যি,—অর্থাৎ তাঁদের কেউ ন'ন; কিন্তু পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়, তাঁদের এই সান্ধ্য উৎসবে যোগ দেবার জন্যই তিনি এসেছিলেন।

লাহিড়ীর বাবা ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি গোয়েন্দা; তাঁর অনুসন্ধান-পদ্ধতি ছিল ডাঃ লাহিড়ীর জানা। তিনি নিজেও অনেক বার অনেক অপরাধীকে খুঁজে বের করবার জন্য পুলিশকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি আশপাশের প্রায় বিশ গজ পরিমাণ জমি হামা দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করলেন। কাছাকাছিতে পাওয়া গেল টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটা একটা গাছের গোটাকত কচি ডাল। ডাঃ লাহিড়ী সেগুলো নিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর অবজ্ঞাভরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন,—নাঃ, কিছু বোঝা গেল না। কে এ লোকটা! আশ্চর্য্য!

অধ্যাপক পাকড়াশী হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন,—ও কে! পাঁচীলের ওপর ওটা কে?

চমকে উঠে সকলে একসঙ্গে চাইলেন পাঁচীলের দিকে। চাঁদের আলোয় দেখা গেল, বেয়াড়া রকমের মাথা-মোটা বেঁটে আকারের একটা লোক পাঁচীলের ওপর থেকে নেমে ভূতের মত ধীরে ধীরে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে স্পষ্ট চেনা গেল, যাঁকে ড্রইং রুমে ছেড়ে এসেছিলেন ইনি সেই বেচারা নিরীহ ফণী রায়।

(ক্রমশঃ)

কলির দিব্যচক্ষু

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

ভূপেশ বাবু জমিদার মানুষ। জমিদারীর আয় যাই হোক্ না কেন, পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত দুষ্প্রাপ্য হীরা-জহরৎ তাঁর কাছে যা আছে সে রকম নাকি কমই শোনা যায়। সবাই বলে, 'এ আপনি করছেন কি? বিংশ শতাব্দীতে কেউ এত দামী দামী জিনিষ ঘরে রাখে? ব্যাঙ্কের নিরাপদ ঘরে জমা দিন—নইলে চোর আছে, ডাকাত আছে, গুণ্ডা আছে—ও-সব 'মহাপুরুষের' অভাব নেই তো এ যুগে!' ভূপেশ বাবু হাসেন। ভদ্রলোক বার কয়েক আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়াছেন, এ সবকে তিনি 'থোড়াই' গ্রাহ্য করেন। মৃদু মৃদু হাসিয়া বলেন, "ঠিক আছে।"

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভূপেশ বাবুর বাড়ীতে একদিন সত্য সত্যই চোর ঢুকিল। আধুনিক শিক্ষিত চোর। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চুরি করার কৌশল সে ভাল করিয়াই শিখিয়াছে। ভূপেশ বাবুর

বাড়ীর নক্সা সে আগেই সংগ্রহ করিয়াছে, লোহার সিন্ধুক গলাইবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম সঙ্গে আনিতেও ভোলে নাই। তা ছাড়া আজ দোলের দিন, বাড়ী শুদ্ধ লোকই একটু শ্রান্ত হইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িবে এবং দ্বারোয়ানজীও হোলি উপলক্ষ্যে একটু অতিরিক্ত পরিমাণ "সিদ্ধি-লাভ" করিবেন এ সব খবরও তার অজানা ছিল না। সুতরাং আজ আর ভূপেশ বাবুর রেহাই নাই।

কিন্তু এ কি কাণ্ড ঘটিল! চোর দরজা ডিঙ্গাইয়া এক পা ভিতরে দিয়াছে অমনি কথা নাই, বার্ত্তা নাই, খটাস্ করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানা হইতে লরী বোঝাই পুলিশ বাহিনী ভূপেশ বাবুর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। তাদেরই বা খবর দিল কে? বাড়ী শুদ্ধ লোক তো অঘোরে ঘুমাইতেছে!

বলা বাহুল্য চোর বাবাজী ধরা পড়িলেন এবং রুদ্ধ ভ্যানে চড়িয়া হাজতের দিকে রওনা হইলেন। ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই এত কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় এবং কিছুটা রোমাঞ্চকরও মনে হইতেছে। ডিটেক্‌টিভ্ গল্পে অবশ্য এ রকম ব্যাপার হামেশাই ঘটিয়া থাকে কিন্তু আসল বাস্তব জগতে এত দিন এ রকম কাণ্ড বিশেষ শোনা যায় নাই—বিশেষত: আমাদের দেশে। কিন্তু কলি বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে যেমন সহজে দুষ্কর্ম্ম করা যায় তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই অপরাধীকে সায়েস্তা করা চলে। এই ঘটনাটিও তারই নমুনা।

রহস্যের গোড়ায় আছে ছোট্ট একটি যন্ত্র। বৈজ্ঞানিকেরা তার নাম দিয়াছেন 'ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেল্'। আমরা একটু কাব্য করিয়া বলিব—'কলির একটি দিব্যচক্ষু'। যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা বেতার যন্ত্রের ভাল্‌ভের মত, কিন্তু গুণ অসীম। প্রধান গুণ, আলোর সাহায্যে এর বিদ্যুৎ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা। যন্ত্রটির গায়ে একটা বিশেষ ভাবে তৈরী ধাতুর পাত আছে। সেই পাতের উপর একটু আলো আসিয়া পড়িলেই অমনি তার সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ (যাকে ইংরাজীতে আমরা বলি ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট') বদলাইয়া যায়; আর মজা এই, আলো কম-বেশী হইলে ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহও ঠিক সেই অনুযায়ী কম-বেশী হইতে থাকে। শুধু সাধারণ আলোই নয়, যে সব অদৃশ্য আলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না (যেমন 'ইন্‌ফ্রা-রেড্' প্রভৃতি) তাদের বেলায়ও ঠিক ঐ রকম ব্যাপার হয়।

এই হইল যন্ত্রটির মূল কৌশল, খুঁটিনাটি বিবরণ তোমরা বড় হইয়া বুঝিবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটানো সম্ভব এবার তাই শোন।

প্রথমে ভূপেশ বাবুর বাড়ীর ব্যাপারটাই ধরা যাক্। যে ঘরে লোহার সিন্ধুক ছিল সে ঘরে

সিন্ধুকের সামনে বসানো ছিল একটা ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেল্। আর তার অদূরে অপর একটা যন্ত্র হইতে খানিকটা ইন্‌ফ্রা-রেড আলো আসিয়া পড়িতেছিল ঐ ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেলের উপর। ব্যস্, ঘরের ভিতর আর কিছু নাই। ঘর অন্ধকার, কাজেই ভিতরে এ সব কি ফাঁদ পাতা আছে বাহিরের লোকের পক্ষে তা জানা, বা ভিতরের রহস্য না জানিলে চোখে দেখিলেও কিছু অনুমান করা, সম্ভব নয়। চোর ঘরে ঢুকিল, তার শরীরে বাধা পাইয়া অদৃশ্য আলোর গতিও রুদ্ধ হইল। ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেলে যে আলো এতক্ষণ পড়িতেছিল তা অকস্মাৎ কমিয়া যাওয়ায় তার ভিতরও দেখা দিল পরিবর্ত্তন। এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি তা আগেই বলিয়াছি। সে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আটকান বৈদ্যুতিক সুইচে ঘা পড়িল। বিদ্যুৎ-চালিত স্প্রিংএর দরজা সঙ্গে সঙ্গে সজোরে বন্ধ হইয়া গেল। এদিকে অনুরূপ আর একটি সুইচেও ঐ সঙ্গে ঘা পড়িয়াছিল। এই সুইচ্‌টির সঙ্গে নিকটবর্ত্তী থানার বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল, সুইচে ঘা পড়িতেই থানায় বিপদ্-সূচক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কাজেই ভূপেশ বাবুর বাড়ীর কারও ঘুম না ভাঙ্গিলেও পুলিশের কাছে বিপদের খবর পৌছিতে দেরী হইল না। তার পরের ব্যাপার তো জানই।

ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেল্‌কে ছোট বড় আরো হাজারো রকম কাজে লাগানো হইতেছে। আরও ২।১টি উদাহরণ দিতেছি। ধর, ঘরের মধ্যে বসিয়া গল্প করিতেছ। বাহিরে ভীষণ ঠাণ্ডা, ঘরের দরজা বন্ধ না করিয়া উপায় নাই। অথচ ঘন ঘন ঘরে লোক ঢুকিতেছে, শীতের মধ্যে বার বার উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেওয়া বিরক্তিকর। ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেলের উপরই সে ভার দাও না কেন! কাজটা এইভাবে হইতে পারে: দরজার একদিকে রহিল একটা ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেল্, অপর দিক্ হইতে একটা আলো তার উপর পড়িতেছে। কোন আগন্তুক দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেই তার শরীরে বাধা পাইয়া আলোর গতি রুদ্ধ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেল্ কাজ সুরু করিবে, এবং বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় দরজা খুলিয়া যাইবে। লোকটি ভিতরে ঢুকিলে আবার আলোর পথ মুক্ত হইবে, দরজাও বন্ধ হইয়া যাইবে।

বড় কারখানায় কাজ হইতেছে। হাজার হাজার প্যাকেট গণিতে হইবে। লোক দিয়া করাইতে গেলে অনেক লোকের দরকার, ভুলচুক হওয়ারও আশঙ্কা আছে। লাগাইয়া দাও ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেল্‌কে। চলন্ত চওড়া ফিতার উপর প্যাকেটগুলি বসানো আছে। তার পথের মাঝখানে এক জায়গায় একদিকে একটা ফোটো ইলেক্‌ট্রিক্ সেল্ বসানো, অপর দিক্ হইতে একটা আলো আসিয়া পড়িতেছে তার উপর। চলিতে চলিতে যেমন একটি প্যাকেট্ আসিয়া দুইএর

মাঝে দাঁড়াইল, অমনি আলোর গতি রুদ্ধ হইয়া যন্ত্রে সাড়া জাগাইল; সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় গণিবার যন্ত্রের কাঁটাও এক ঘর সরিয়া গেল। এমনি ভাবে ক্রমাগত—বিদ্যুৎ-গতিতে কাজ আগাইয়া চলিল। ভুল হইবার ভয় নাই।

আর একটি ব্যাপারে ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেল্ খুব কাজে আসিয়াছে। তোমরা যারা ফটো তুলিতে জান, তারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ আলো অনুযায়ী ক্যামেরায় ঠিক ঠিক 'এক্সপোজার' দেওয়া কি রকম হাঙ্গামার ব্যাপার। সিনেমার ছবি তুলিতে গেলে এই ব্যাপারটি হয় আরও গোলমেলে—কেননা সেখানে এক্সপোজারটা একেবারে নিখুঁত হওয়া দরকার। আজকাল তাই ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেলের উপরই এই দুরূহ কাজটির ভার চাপানো হইতেছে। বাহিরের আলোর তারতম্য অনুযায়ী কতটা এক্সপোজার দিতে হইবে এই যন্ত্রই তা আপনা হইতে ঠিক করিয়া দেয়—এবং, বুঝিতেই পারিতেছ, ফল হয় নির্ভুল।

এমনি ধারা আরও কত কি!

পূর্ণিমা

গীতিনাট্য

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার এম্.এ.,বি.এল্

প্রথম দৃশ্য

[বৃন্দাবন। যমুনাতীর। দিবা অবসানপ্রায়। যমুনার কালো জলের উপর সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। আকাশের প্রান্তে পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হইতেছে।

ললিতা, বৃন্দা, বিশাখা, চম্পকলতিকা প্রভৃতি সখীগণ সহ শ্রীরাধিকা। সকলের কাঁখে কলসী]

— গান —

আজি এ সাঁঝ বেলাতে যাবি কে তোরা
আনি চল যমুনা-বারি।
যেন লো মনের ভুলে যাসনে ফেলে গাগরি।

বকুল ছড়ানো বনের পথে
চল্‌বি হেসে সবার সাথে,
কাঁকন নূপুর বাজবে মধুর
নাচবে যমুনা-লহরী। (সাথে)
ঘাটেরি ধারে তমাল-ছায়ায়
নামিস্ জলে সাধ যদি যায়,
এই অবেলায় জলখেলায়
দেখিস ভেজে না কবরী। (ও তোর)

[গানের শেষে সকলে কলসী নামাইয়া রাখিয়া যমুনাতীরে বসিলেন]

ললিতা। ওলো, আয় লো তোরা, কলসী ভরে নিয়ে বাড়ি যাই চল।

চম্পক। এত তাড়া কিসের ললিতা? আর একটুখানি বস্ না।

ললিতা। আর কি দেরী করা চলে ভাই? দেখছিস না সন্ধ্যে যে হয়ে এলো!

চম্পক। হলই বা সন্ধ্যে। আজ তো আর আঁধার রাত নয়। চেয়ে দেখ, ভরা পূর্ণিমার চাঁদ ওই উঠছে। চাঁদের আলোই আজ আমাদের পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে।

ললিতা। শুধু পথ দেখতে পেলেই তো হল না চম্পকলতা! বিজন বনের পথে যে অনেক ভয়।

চম্পক। ভয়! আমাদের আবার ভয় কিসের? সর্ব্বভয়হারী শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের সহায়।

ললিতা। থাক, থাক, তার নাম আর করিস নে।

চম্পক। কেন রে? তার ওপরে তোর আবার এত রাগ হল কেন?

ললিতা। কেনই বা হবে না? নিত্য আমরা যমুনায় জল নিতে আসি আর তার আশায় বসে থেকে থেকে হতাশাই শুধু সার হয়। এমনি চলেছে তো কতদিন!

চম্পক। তা সত্যি। কিন্তু আজ আমার মন বলছে যে আজকের পূর্ণিমার রাতটি আমাদের বিফলে যাবে না। আজকে তাঁর দর্শন আমরা পাবই পাব।

বিশাখা। ও ভাই চম্পকলতা, ওই কথা বলে বলে তো রোজই আমরা নিজের মনকে ভোলাই। ক'দিন থেকে ঘরে ফিরতে দেরী হয় আর গুরুজনের গঞ্জনা সইতে হয়। আজকে আর দেরী করে কাজ নেই ভাই, এখন চল।

বৃন্দা। হাঁ ভাই, তাই চল।

ললিতা। আর শুধু আমরাই কেন তার জন্তে প্রতিদিন ছুটে ছুটে আসব। আমাদের কি কোন মান অপমান নেই?

অন্য গোপিনীগণ। সত্যই তো।…ঠিকই তো।…আমাদের কি মান অপমান নেই? …তাই তো, ঠিক কথা।…মান অপমান কি আমাদের নেই?

ললিতা। তা হলে চল্। আর আমরা একটুও বসে থাকব না এখানে।

সকলে। হাঁ হাঁ, তাই চল্।…আর বসে থাকব না। ও মঞ্জরী, চল ভাই।

[সকলে উঠিবার উপক্রম করিল]

রাধা। তোমরা সবাই চলেছ? আচ্ছা, এস তা হলে।

ললিতা। সে কি রাধা, তুমি যাবে না?

রাধা। না ভাই, আমি এখন যাবো না।

বৃন্দা। ওমা, সে কি কথা! আমরা সবাই চলে যাব আর তুমি এই নির্জ্জন নদীর ঘাটে একলাটি বসে থাকবে!

রাধা। ভাই বৃন্দা, তাঁর যদি সেই ইচ্ছাই হয় তবে আমাকে একলাই থাকতে হবে বই কি।

বিশাখা। না না, তাও কি কখনো হয়?…সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে।…তুমি একা নারী…

ললিতা। তা ছাড়া, তোমার শ্বাশুড়ী আর ননদ। তাঁদের কথা ভুলে যেও না। তোমার দেরী দেখ্‌লে হয়তো তারা এখানেই এসে হাজির হবে। তখন তাদের হাতে তোমার কি রকম লাঞ্ছনা হবে ভাব্ দেখি? না না, চল তুমি আমাদের সঙ্গে।

রাধা। না ভাই, আমি যাব না।…তোমরা যাও ভাই…আমাকে যেতে ব'লো না।

চম্পক। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে না ফের, আমরা তবে ঘরে গিয়ে কি বলবো?

রাধা। ব'লো তোমাদের যা ইচ্ছে। না হয় ব'লো যে তোমাদের রাধা কালিন্দীর কালো জলে ডুবে মরেছে।

সকলে। ছি ছি।… বালাই বালাই। ওকি অলক্ষুণে কথা?…কি যে বল রাধা দি!

ললিতা। এ কি পাগলামি তোমার রাধারাণী? আমরা সবাই বলছি সে আস্‌বে না— আস্‌বে না।

রাধা। না না, ওকথা ব'লো না ললিতা। সে আস্‌বে, আস্‌বে।… সে যে এসেছে… এসেছে।…ঐ যে যমুনার নীল জলে আমি সেই শ্যামসুন্দরের ছায়া দেখ্‌তে পাচ্ছি।…ঐ পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁর স্নিগ্ধ হাসিখানি।…ওই মৃদু বাতাস বয়ে আন্‌ছে তাঁর শ্রীঅঙ্গের সৌরভ…

[সখীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।] (ক্রমশঃ)

সোভিয়েটের ছেলেমেয়ে

রঞ্জিৎ ভাই

আমার দূর দেশের পারুল দিদি, ১লা মে, মস্কো, রাশিয়া।

আজ আমাদের মে-দিবস। বিশ্বমানবের কল্যাণে আমাদের মুক্তিকামী দেশ এই প্রার্থনা জানায়: পৃথিবীর সব দেশের কিশোর দল আজ বাঁচুক, প্রীতি ও ভালবাসার বাঁধনে ধন্য হোক্।

রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের কথা আজ কিছু বল্‌ব। প্রথমে শোন এখানকার স্কুলের কথা। রাশিয়ার সাধারণ স্কুলকে গৃহ বলা চলে। এই সব গৃহতে দেশের অনাথ ও আশ্রয়হারা ছেলেমেয়েরা পরম আনন্দে গুলজার করে দিন কাটায়। মস্কোতে এমনি অনেক স্কুল আছে। এই সব স্কুলে (ঘরোয়া-স্কুল) ১৪ থেকে ১৮ বছরের মাত্র ১০০ জন ছেলেমেয়ে থাকে। দিনের বেলা আশে পাশের আরো ১০০ জন গরীব ঘরের ছেলেমেয়ে—যাদের স্কুলে পড়বার মতো অবস্থা নয়— এদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়, খেলা করে, গল্প শোনে,—আবার সন্ধ্যাবেলা নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যায়। এমনিভাবে প্রতিদিন প্রায় ২০০ ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে এক একটী ঘরোয়া-স্কুলেতে খেলাধূলা করে। এ ছাড়াও আরো ৪০টি ক'রে দুঃস্থ পরিবার এই সব স্কুলের পরিচালনায় সুখশান্তিতে বাস করে। এ থেকে মস্কো-স্কুলের আয়তন ও সংখ্যা কিছুটা বুঝতে পারবে।

স্কুলের লেখাপড়ার নিয়মকানুন ভারি মজার। ভোর বেলা সাড়ে সাতটায় ক্লাস বসে। সকাল আটটার মধ্যেই সব প্রাতরাশ শেষ হয়ে যায়। তারপর অনেক বেলা পর্য্যন্ত স্কুল-কারখানায় কেউ ছুতোরের কাজ, কেউ মুচির কাজ, কেউ কামারের কাজ, আরো নানা বিভাগের কাজ শেখবার জন্য যায়। বেলা ১টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম। ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত আবার স্কুল। বিকেল ৫টায় জলখাবার। কফি খেয়ে রাত ১০টা পর্য্যন্ত ক্লাবে গান-বাজনা চলে। মাঝখানে সন্ধ্যা ৭টায় নৈশ ভোজন শেষ করে নিতে হয়। তারপর ক্লাবে গিয়ে আলাপ-আলোচনা ও মজলিস জমে। বিকেল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত যে সময়, তাকেই বলে 'ক্লাব'। এখানে খেলার ক্লাব, গানের ক্লাব, অভিনয়ের ক্লাব, আবার রাজনৈতিক ক্লাবও আছে। ছেলেমেয়েরাই সংঘ গড়ে, তারা নিজেরাই সভা-সমিতি করে সংঘের কাজ চালায়। শিক্ষকেরা কোনো কাজেই মধ্যস্থ হন না, শুধু দূর থেকে পরিচালনা করেন মাত্র। তাই অবাধ স্বাধীনতা ও অজস্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা জীবনের যাত্রাপথে পাড়ি জমায় দূর দূরান্তরে।

রাশিয়ায় শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক বড় মধুর, বড় সুন্দর। প্রত্যেক স্কুলে ছাত্র ও

শিক্ষকদের ইউনিয়ন আছে। তাদের বৈঠকে স্কুলের বিষয়ে নানা আলোচনা হয়—দু'দলের সভ্যেরাই যোগ দেয়। তা ছাড়া প্রত্যেক স্কুলেই 'প্রচার-পত্র' (Wall newspaper) আছে—তার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা আলোচনা ও প্রতিবাদের সুবিধা পায়।

আধুনিক রাশিয়ায় শিশু-শিল্প-শিক্ষার জন্য ১৫০টি প্রতিষ্ঠান আছে। মস্কো আর লেলিনগ্রাদে ১০ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য সুন্দর নাচ-গানের ক্লাব আছে। সেখানে একসঙ্গে ৫০০ ছেলেমেয়ে গানের আসর জমিয়ে তোলে। এ দেশের ছেলেমেয়েকে কোনো দিন পড়ার শেষে চাকুরির জন্য ভাবতে হয় না। কেন না, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট থেকে মস্কো, খার্কভ ও লেনিনগ্রাদে নতুন শিল্প-স্কুল তৈরী করা হয়েছে। সেখান থেকে পড়া শেষ করে ছাত্রেরা শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী নানান্ দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আজ রাশিয়া কাজ চায়—স্বপ্ন চায় না।

রাশিয়ার পায়োনিয়ার্স কম্যুনের কথা নিশ্চয় জানো। লেলিনগ্রাদের Tsarist Anitshkinএর রাজপ্রাসাদে সোভিয়েট কিশোর দলের মস্ত এক আস্তানা। নাচের স্কুল, সন্তরণাগার, ব্যায়ামাগার থেকে আরম্ভ ক'রে শিল্পালয়, কৃষি-কারখানা, ছোটদের পাঠাগার—সবই এখানে রয়েছে। আজকের রাশিয়ায় এমনি কম্যুন প্রায় হাজার হবে।

শুনলে অবাক্ হবে, আজ সোভিয়েট ইউনিয়নে ৩৯টা শিশু ও কিশোর-পরিচালিত রেল-কোম্পানী আছে—তাতে প্রায় ১০০০০০ কিশোর বীর নিজেদের খুসী মতো কোম্পানীর যাবতীয় ভার বহন করে। সেখানকার কিশোরেরাই টিকেট চেকার, ষ্টেশন-মাষ্টার, এঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার, গার্ড ও কুলি। ছোটদের জন্য ৫৩টা নিজস্ব দৈনিক কাগজ আছে—তা ছাড়া অজস্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, গল্প, উপন্যাস, ধর্ম্ম, রাজনীতি, ইতিহাস ও ভূগোলের হাজার হাজার বই ছাপা হয়। ১৯৩৫ সালে এ দেশে ছোটদের জন্য ৩৯০ লক্ষ গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছিল।

রাশিয়ার যেটা সব চেয়ে বড় বেতার কেন্দ্র, সেখানে প্রতিদিন তিনবার করে ছোটদের আসর বসে। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই বেতার অনুষ্ঠান চালায়। তা ছাড়া এখানে ১৩০টা নাট্যগৃহ আছে—সেখানে শিশু-নাটক অভিনীত হয়। সিনেমা ষ্টুডিয়োতে ছেলেমেয়েরা ছায়াচিত্রে গল্প ও নাটকের রূপদান করে। এমনি ভাবে আজ আমাদের দেশ আমাদের বাঁচবার অধিকার দিয়েছে, চলার পথের দাবী দিয়েছে অবাধ মেলামেশায়। আমরাও ভাই, স্বপ্ন-মৌমাছির মতো আকাশ-বনের ফুলবাগানে মধু আহরণ ক'রে বেড়াব। সোনালী গমের ক্ষেতের ওপারে দ্বিগ্বলয়ের ধারে—পাইন ও দেওদারের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের মন নেচে বেড়াবে পথ-চলার আনন্দে।—আমরা সেই সুরে গাইবো: আমার সোনার দেশ, তোমায় আমি ভালবাসি—সবুজ অগাধ ভালবাসা!*

তোমার হারানো দিনের ভাই

মাইকেল নিকোলভ্

---

*লেখকের যন্ত্রস্থ বই "সাত ভাই চম্পার" প্রথম অধ্যায়ের কিছু অংশ এখানে দেওয়া হোলো।

শিমুলের শাস্তি

(পৌরাণিক গল্প)

শ্রীসীতা দেবী

অতি প্রাচীন কালে হিমালয়ের উপর ছিল এক বিরাট্ শাল্মলী (শিমুল) গাছ। এখনকার শিমুল গাছে যেমন পাতা-টাতা কিছু থাকে না এ গাছটি মোটেই সে রকম ছিল না। ঘন পাতায় ছাওয়া ছিল এর সমস্ত শরীর। পাহাড়ের উপর অনেকখানি জায়গা যুড়ে ছায়া বিছিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকত আর বনের যত পশুপাখী শ্রান্ত হ'লে তার নীচে এসে বিশ্রাম করত। পাহাড়ের উপর যখন তখন ঝড় উঠ্ত, ঝড়ের দাপটে আশপাশের অন্যান্য গাছপালা ভেঙ্গে তছ্নছ হয়ে যেত, কিন্তু শিমুলের একটি ডালও খস্ত না।

দেবর্ষি নারদ একদিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ব্যাপার দেখে তাঁর ভারী অবাক্ লাগল। তিনি শিমুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, তোমার সঙ্গে বুঝি পবন দেবের খুব ভাব আছে তাই তিনি কখনও তোমার ক্ষতি করেন না, নয় কি?"

শিমুল গাছটি ছিল ভারী অহঙ্কারী। সে তক্ষুণি জবাব দিলে, "কি যে বল ঠাকুর! পবনের সাধ্য আছে আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারে? অন্য গাছের সঙ্গে যাই করুক্, আমার ধারে-কাছেও সে আসতে সাহস পায় না।"

নারদ গিয়ে কথাটা টুক ক'রে পবন দেবের কাছে লাগালেন। শুনে পবন তো রেগেই অস্থির। "কী, এত বড় স্পর্দ্ধা! পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা একদিন ঐ গাছের ছায়ায় ব'সে বিশ্রাম ক'রেছিলেন ব'লে আমি ওকে কিছু বলি না, সাবধানে বাঁচিয়ে যাই, আর ও কিনা উল্টে আমারই অপমান কর্‌ল! আচ্ছা দেখে নেব।"

পবন দেব গিয়ে শিমুল গাছকে শাসিয়ে এলেন,—"কালই তুমি আমার বিক্রম দেখবে।" শিমুলও জানাল যে সে কারও তোয়াক্কা করে না।

কিন্তু পবন চলে গেলেই তার হ'ল ভীষণ ভয়। সত্যিই তো পবনের সঙ্গে এঁটে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়! ভেবে-চিন্তে সে ঠিক কর্‌ল পবনকে আর এক ভাবে জব্দ করবে। এই ভেবে সে নিজের সমস্ত ডালপালা ছেঁটে নেড়া হ'য়ে বসে রইল।

পর দিন পবন দেব ভীম বেগে চারদিকে ধুলো উড়িয়ে এসে হাজির। কিন্তু শিমুলের উপর বিক্রম দেখাবেন কি, তার চেহারা দেখে তিনি হেসেই অস্থির। বল্লেন, "আমি তোমার যে দশা ঘটাতাম তুমি নিজেই দেখছি সে দশা বেছে নিয়েছ! বেশ, এখন থেকে ঐ চেহারা নিয়েই থাক।" হাসতে হাসতে পবন চলে গেলেন। সেই থেকে শিমুল গাছ ঐ রকম নেড়া।

কুশ্রীর শ্রী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কুরূপ স্বরূপ হয় গুণ যদি ধরে,
সোনালী বোল্‌তা ফেলে ভ্রমরে আদরে।
দারিদ্র্য কুৎসিত, কিন্তু তারি শোভা কত,
হয় যদি বিদুরের দারিদ্র্যের মত।
দস্যুতাও সহনীয়, নহে তা ঘৃণার—
শেষে যদি বাল্মীকিত্বে দাবী হয় তার।
অতি ভাগ্যবান্‌ও চায় রসাতলে যেতে
হরি-পাদপদ্ম যদি পায় মস্তকেতে।
এক চক্ষুহীন হওয়া অভিশাপ নয়,
‘রণ্‌জিৎ সিংহে’র মত ভাগ্য যদি হয়।
নিরক্ষরও পণ্ডিতের চেয়ে পায় দর,
প্রতিভা তাহারে যদি করে ‘আকবর’।

অবনত হতে নাই বিন্দুমাত্র ব্যথা,
যদি শ্রীগুরুর পদে ঠেকে গিয়া মাথা!
অন্ধতাও সাধুদের কাম্য নিরবধি,
হয় তাহা বিল্বমঙ্গলের মত যদি।
মানুষ হওয়াই ভাল না হয়ে অমর,
শ্যামা মা আসিয়া যদি শিরে দেন কর!
কন্যা হয়ে হৈমবতী বেড়া বাঁধে যাঁর,
সম্রাট্ না হয়ে ভাল ভৃত্য হওয়া তাঁর।
দণ্ডধর হওয়া চেয়ে ধন্য যে দণ্ডিত,
জগতের পূজ্য যীশু—পাইলেট ঘৃণিত।
জাতি যাক ভস্ম হয়ে, দুঃখ কে বা করে,
স্বর্গ থেকে গঙ্গা নামে যদি তারি তরে।

চিঠিপত্র

নানা বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ হয়ে রামধনু এ মাসে সতেরো বছরে পড়্‌ল। এই সুযোগে রামধনুর পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৩৫০ সালের অবসান হয়েছে। বাংলার ইতিহাসে এ রকম দুর্ব্বৎসর খুব বেশী আসে নি—আমাদের জীবিত কালে তো আসেই নি। তাই ১৩৫০ এর অবসান বাঙ্গালী স্বস্তির সঙ্গেই কামনা করবে। এর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দিনেরও অবসান হোক—আজকের দিনে এই আমাদের সব চেয়ে বড় কাম্য।

নতুন রামধনু কেমন লাগ্‌ল জানিও। রামধনুর পৃষ্ঠা-সংখ্যা এবার আরও কিছু বাড়াবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কাগজ সংগ্রহ করতে না পারায় এ সংখ্যায় তা তেমন সম্ভব হ'ল না। ঠিক ঐ কারণে ছবিও দেওয়া গেল না। ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় বাধ্য হয়েই আমাদের বসে থাকতে হবে। —রাঃ সঃ।

ছোটদের চিত্রশালা

বন-বালা

শিল্পী—শ্রীসুলেখা চক্রবর্ত্তী

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখা)

জেনে রাখ

শ্রীউপগুপ্ত রায়

ট্রাইসাইকেলের আবিষ্কারক একজন জার্ম্মান্—ভেলসিপিড্। এঁর আবিষ্কারের উপরই রং ফলিয়ে বাইসাইকেল্ আবিষ্কৃত হয়।

ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট্ টেষ্ট ম্যাচ্ আরম্ভ হয় ১৮৭৬ সাল থেকে।

পৃথিবীতে আর্য্য-ককেশীয় জাতের লোকই বেশী—এদের সংখ্যা ৭২ কোটির ওপর। তারপর মোঙ্গোলিয়, এদের সংখ্যা প্রায় ৬৮ কোটি।

হাসিখুসি

কুমারী সুরঙ্গমা বসু

১ম ব্যক্তি—বলি ওহে মহেন্দর, কোথায় চলেছ? চেহারাটা তোমার কেমন বদলে গেছে মনে হচ্ছে!

২য় ব্যক্তি—আজ্ঞে আমার নাম তো মহেন্দ্র নয়, সুরেশ।

১ম ব্যক্তি—বল কিহে! শুধু চেহারাটাই নয়, নামটাও তা হলে বদলে ফেলেছ?

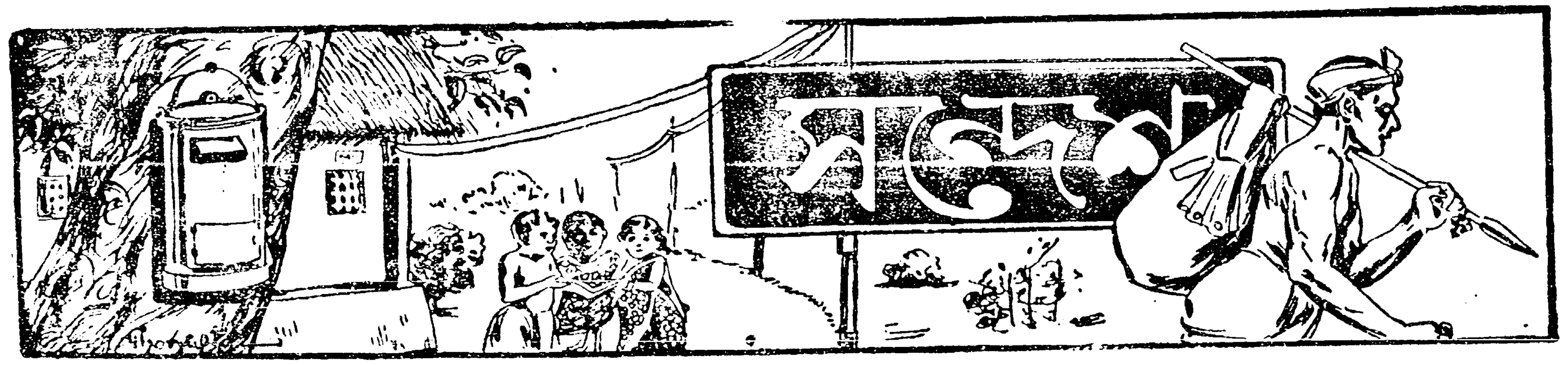

যুদ্ধের গতির আবার কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। ক্রমেই কাবু ক'রে আনছে। সম্প্রতি কৃষ্ণ ইয়োরোপের রণাঙ্গনে রুশ বাহিনী জার্ম্মান্‌দের সাগরের তীরে বিখ্যাত ওডেসা বন্দরও তারা

আবার দখল ক'রে নিয়েছে। পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সীমান্ত ভেদ ক'রেও তারা ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

এ দিকে জাপ বাহিনী ব্রহ্ম সীমান্ত ছাড়িয়ে ভারতের দরজায় এসে হাজির হয়েছে। মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল, কোহিমা, টিড্ডিম প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সংঘর্ষ চলেছে। আরাকান সীমান্তেও সমানে লড়াই হচ্ছে।

* * *

বোম্বাইএ রণজী ক্রিকেট্ প্রতিযোগিতার ফাইনাল হ'য়ে গেল—পশ্চিম ভারত দলের সঙ্গে বাংলা দলের। এই শেষ খেলায় বাংলা দল অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে এক ইনিংস্ ও ২৩ রানে পরাজিত হয়েছে। বাংলার রান্ হয়েছিল ১ম ইনিংস্এ ২৩৪ ও ২য় ইনিংসএ ১৭৬। পশ্চিম ভারত দলের ১ম ইনিংস্এই হয় ৪৩৩। এই দলের কিষেণচাঁদ শতাধিক রান্ করেন। বাংলা দল এই নিয়ে তিন বার ফাইনালে উঠল, তার মধ্যে মাত্র একবার (১৯৩৮-৩৯ সালে) তারা বিজয়ী হতে পেরেছে।

* * *

সম্প্রতি ভিসুভিয়াস্ পর্ব্বত আবার ভীষণ ভাবে অগ্নি উদ্গীরণ করতে সুরু করেছিল। ফলে অনেক গ্রাম লাভা-স্রোতে চাপা পড়ে গেছে, এবং কাছাকাছি সহরগুলি থেকেও অধিবাসীদের পালাতে হয়েছে। ভিসুভিয়াস্ ক্ষেপে উঠলে যে কী ভীষণ প্রলয় কাণ্ড ঘটাতে পারে তা তোমরা পম্পেয়াই প্রভৃতি নগরের ধ্বংস-কাহিনী থেকেই জান। ভিসুভিয়াস্ ক্ষেপে উঠলে তাই ওখানকার লোকেদের আতঙ্কের সীমা থাকে না।

* * *

এদিকে মেক্সিকোতে অপর একটি নতুন আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গেছে। সমুদ্রতীর থেকে ৬৮০০ ফুট উঁচুতে সাধারণ চষা জমি ফুঁড়ে নাকি এটির আবির্ভাব হয়েছে। এই নতুন আগ্নেয়গিরিটি প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ১০০ মাইল দূরে। এর উচ্চতা প্রায় ৯০০ ফুট, এবং গহ্বরটি চওড়ায় ৩০০ ফুট্। গত বছর জুন মাসে এটি প্রথম অগ্নি উদ্গীরণ করে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

নোনা (No, না)।

উত্তরদাতাদের নাম

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (বাতূ) (হাওড়া); প্রফুল্লবালা সাধু খাঁ (উত্তরপাড়া); বড়দি, বঙ্কু, ল্যান্টু, বান্টু, কাজল (কলিকাতা); ছবি রায় ও ছায়া রায় (নিউ দিল্লী); অমরেন্দ্রনাথ সরকার (কুড়িগ্রাম); সরোজকুমার রায় (সিকান্দ্রাবাদ); অতীন্দ্রনাথ দত্ত (তেজপুর); কমলা রাহা (স্বর্ণঘোষ); বিজলী ঘোষ (মহেশতলা); গায়ত্রী দেবী, অর্চ্চনা দেবী, তনু, উমা, খোকন, তোজা, টুলু (নীলফামারী)।

নূতন ধাঁধা

হেঁয়ালী

(১) সে কোন্ অদ্ভুত জানোয়ার যার সাম্‌নে কাচ ধরলে দেখা যাবে এক আজব সহর?

(২) সে কোন্ আজব সহর যার মধ্যে গোটা পৃথিবীটাই ভ'রে রাখা যায়?

(৩) সে কোন্ লাল সহর যেখানকার মাটীও রক্তের মত লাল?

বাহির হইয়াছে

—নতুন বই—

রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

দাম বারো আনা।

শ্যাম্পন

সুগন্ধ তরল শ্যাম্পু

কেশশ্রীর পূর্ণ বিকাশে সহায়ক

ব্যবহারে কেশ মসৃণ ও নমনীয় হয় এবং খুস্‌কি, মরামাস প্রভৃতি কেশরোগ নিবারিত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

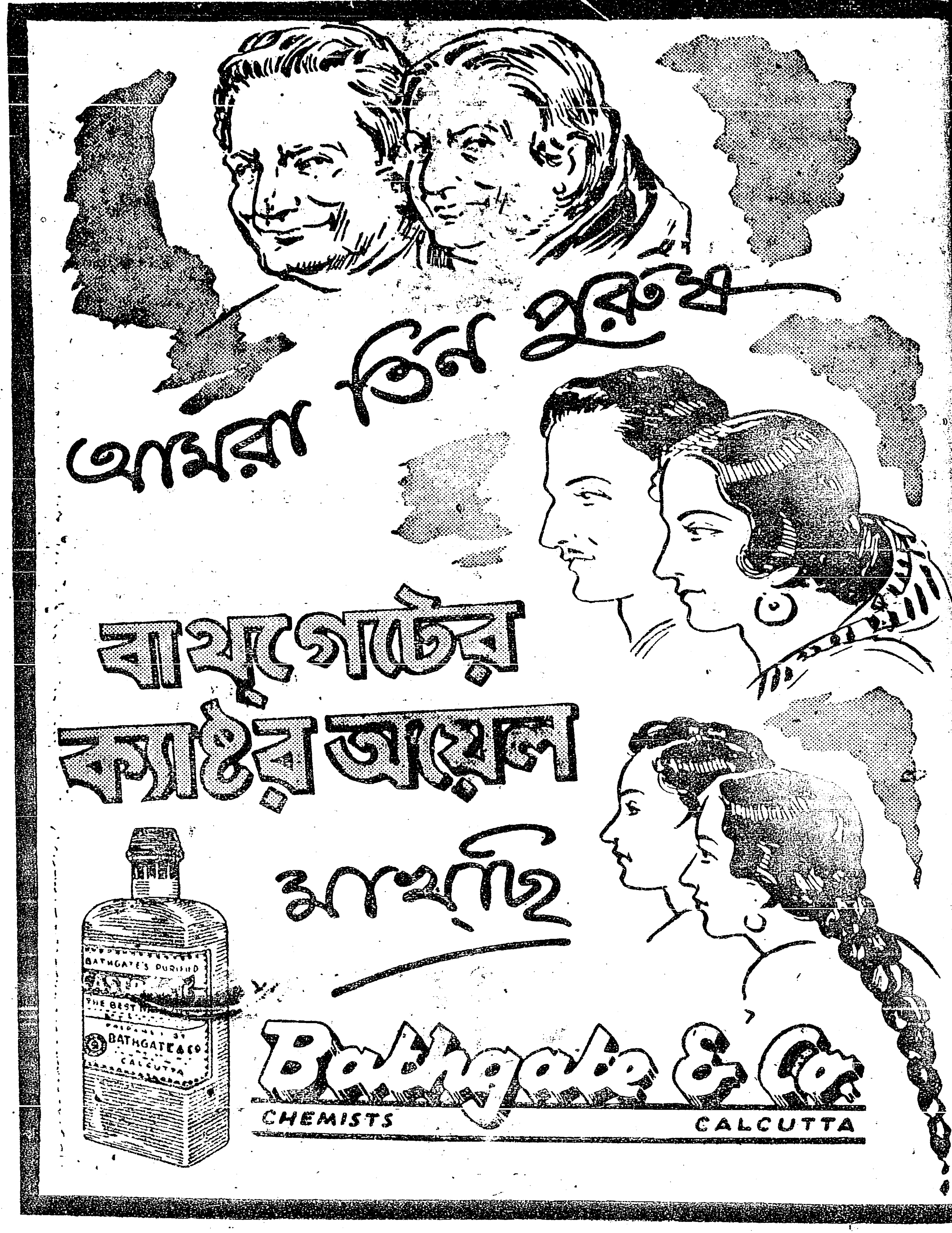

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

...শ বর্ষ
...য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ,
১৩৫১

আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেস ও পুস্তক সহ

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক
১৷৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

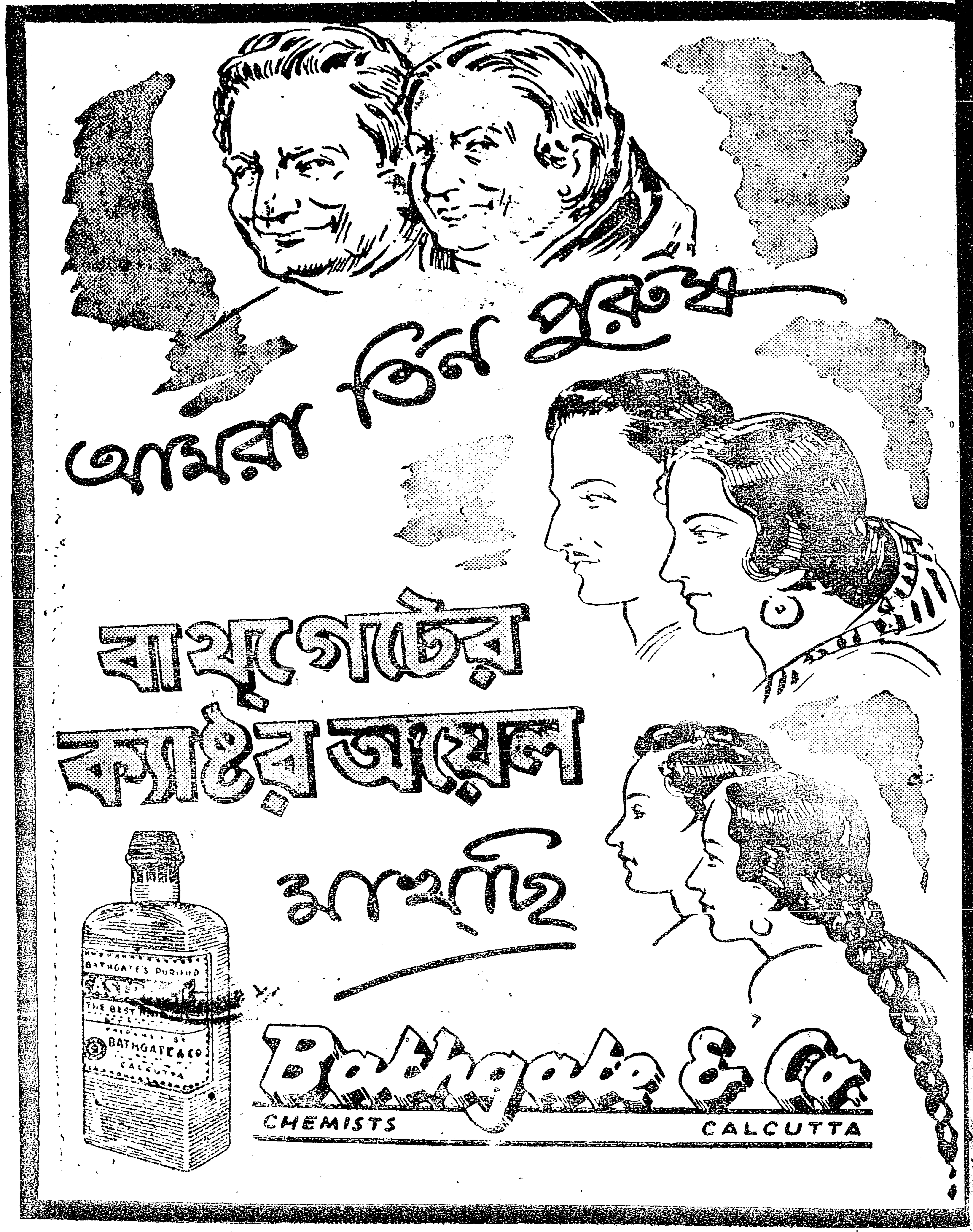

রামধনু

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

৭শ বর্ষ
য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ,
১৩৫১

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেস ও পুস্তক সহ

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক
১৸৹
প্রতি সংখ্যা
।৹

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSUR

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনেকেই আমাদের লিখে জানিয়েছিলেন

—“কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের” মতো [illegible] সমৃদ্ধ ‘সিরিজ’ প্রকাশ যদি এ-দুর্দ্দিনে সম্ভব না হয় তবে খুব ‘থ্রীলার’, ‘রোমাণ্টিক’ ও শিক্ষাপ্রদ ‘ডিটেক্‌টিভ’ গল্পের একটী সাধারণ ১৲ এক টাকা সংস্করণ মাসিক সিরিজ পেলে আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে সম্মত আছি”—

তাই [illegible] নূতন অভ্যুদয়

প্রহেলিকা সিরিজ

বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র কাগজের উৎকর্ষ সাধনই আমাদের পক্ষে অসম্ভব। নইলে এর ছবি, ছাপা ও রচনা-ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ অতুলন পরিকল্পনা।

বিজ্ঞপ্তি

প্রথম প্রকাশ: শুভ নববর্ষ ১৩৫১ সাল।

পরিচয়: প্রতিমাসে রহস্য-ঘন রোমাঞ্চকর-ডিটেক্‌টিভ-গল্প।

রচয়িতা: ছদ্মনামে স্ব-প্রকাশ ‘সব্যসাচী’।

সমৃদ্ধি: চার-পাঁচখানি চিত্র-বিচিত্র হাফটোন ছবি।

মূল্য—প্রত্যেকখানি ১৲।

“সব্যসাচী” সিরিজের প্রথম বই

মুখোশের অন্তরালে

কেমন সেই মুখোশ? আর কে তার অন্তরালে থেকে কোন্ রহস্যের সৃষ্টি করে যাচ্ছে?—তাই ভেবে সকলেই উদ্‌গ্রীব!

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৭শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ { ২য় সংখ্যা

ছড়া

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

খুকুমণি, খুকুমণি,
রাগ করেছ কেন ?
মুখ শুকিয়ে চুপটি করে
বসে আছ হেন।
খুকু, রাগ করেছ কেন ?
মা বুঝি আজ বকেছে
ওই মিনি বেড়ালটিরে ?
বাবা বুঝি দেয় নি চুমু
আপিস থেকে ফিরে ?

ভুলো কুকুর তোমার সাথে
করেছে কি আড়ি ?
পারুল দিদি তোমায় ছেড়ে
গেছে শ্বশুর-বাড়ী ?
চাঁদের মতন মুখখানিতে
দুখের ছায়া হেন—
রাগ করেছ কেন খুকু,
রাগ করেছ কেন ?

ডাক্তার লাহিড়ীর বাগান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীকুঞ্জনাথ

অত্যন্ত শান্তভাবে ফণী রায় জিজ্ঞেস করলেন, বাগানের কোন ফটক নেই, না ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ লাহিড়ী ফণী রায়ের দিকে চাইলেন ; বললেন, ঠিক বলেছ সন্ন্যাসী ঠাকুর ! লোকটা কেমন ক'রে মারা গেল তা জানবার আগে আমাদের জানা দরকার লোকটা কেমন ক'রে বাগানে ঢুকল। কেমন ? বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এ একটা হত্যাকাণ্ড। এর জন্য পুলিসের কাছে আমায় জবাবদিহি করতে হবে ; সুতরাং অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও আমার মনে হয় আপনাদের কারো এখন স্থানত্যাগ না করাই ভাল। আমার বাসায় আপনাদের রাত্রিবাসের কোন অসুবিধা হবে না। আমি এখনই পুলিশে খবর দিতে চাই। আপনাদের নিরাপত্তার জন্যই আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা আমাদের এখানেই থাকুন। ডাঃ সেন, আপনি দয়া ক'রে আমার চাকর মাধবকে এখানে একবার পাঠিয়ে দেবেন, সদরে আর কাকেও পাহারায় রেখে সে যেন অবিলম্বে আসে। আর মিঃ পাকড়াশী, মেয়েদের খবরটা আপনিই জানান। তাঁরা যেন ভয় না পান। আজ রাতের মত তাঁরাও এখানে থাকবেন, আমি তার নিখুঁত বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আপনারা যান তা হ'লে ; সন্ন্যাসী ঠাকুর আর আমি মৃতদেহের পাহারায় রইলাম।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ডাঃ লাহিড়ী তৎপর হ'য়ে উঠলেন।

খবর পেয়ে মাধব হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এল। মৃতদেহটির পানে তাকিয়ে বললে, মুখখানা একবার দেখতে পাই নে বাবু ?

ডাঃ লাহিড়ী বললেন, দেখ না !

মাধব মাথাটা হাতে তুলে নিয়ে এক নজর দেখেই ধপ্ ক'রে সেটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ব'লে উঠল, এ কি ! এ যে দেখছি—না না, এ নয়, এ হ'তেই পারে না ! আপনি একে চেনেন বাবু ?

উদাসীন ভাবে ডাঃ লাহিড়ী বললেন, না। চল, লাশটাকে ঘরে তুলে রাখা যাক।

তিন জনে মিলে ধরাধরি ক'রে লাশটাকে লাইব্রেরী ঘরে এনে একটা সোফার ওপরে রাখা হ'ল ; তারপর সকলে আবার ড্রইংরুমে এসে বসলেন।

থানায় একটা ফোন ক'রে দিয়ে ডাঃ লাহিড়ীও গম্ভীর হ'য়ে এসে বসলেন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন কি ?

মিঃ তলাপাত্র বললেন, একমাত্র ধরণী বাবু নেই।

অধ্যাপক পাকড়াশী বললেন, আরো একজন নেই, খড়্গ বাহাদুর। লাশটা যখন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি তখন পর্য্যন্ত আমি তাঁকে বাগানে পায়চারী করতে দেখেছি।

ডাঃ লাহিড়ী মাধবকে ডেকে বললেন, ধরণী বাবু আর খড়্গ বাহাদুরকে ডেকে আনো। ধরণী বাবু ড্রইং রুমে বসে সিগার টানছেন আর খড়্গবাহাদুরকে বাগানের ভেতরেই কোথাও দেখতে পাবে। মাধব চ'লে গেল।

কেউ কিছু বলবার আগে ডাঃ লাহিড়ী বললেন, আপনারা সকলেই দেখেছেন বাগানে একটা লাশ পাওয়া গেছে, তার মাথাটা কাটা। আমি লাশ পরীক্ষা করেছি, ডাঃ সেনও করেছেন। ডাঃ সেন, আপনি কি মনে করেন ও ভাবে মাথাটা কাটতে খুব বেশী জোর লেগেছে ? না ধারাল একখানা ছুরিতেই কাজ হ'য়েছে ?

ডাঃ সেন বললেন, আমার মনে হয় ছুরির কাজই নয়।

ডাঃ লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলেন, কি ধরণের অস্ত্র দিয়ে ও ভাবে কাটা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা হয়েছে ?

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে ডাঃ সেন বললেন, খুব ভারি ধারাল অস্ত্র ছাড়া অমন পরিষ্কার ক'রে এক কোপে কাটা সম্ভব নয়। রাম-দা হওয়া বিচিত্র নয়।

মিসেস্ তলাপাত্র চমকে উঠে বললেন, ও মা ! বাগানে রাম-দা আসবে কোত্থেকে ! সে

কথায় কান না দিয়ে ডাঃ লাহিড়ী ভুরু কুঁচকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কুক্‌রি দিয়ে সম্ভব বলে আপনার মনে হয় ?

ডাঃ সেন বললেন, কুক্‌রি ?—তা হ'তে পারে।

খড়্গ বাহাদুরকে নিয়ে মাধব এসে উপস্থিত হ'ল ; দেখে মনে হ'ল খড়্গ বাহাদুরের মেজাজ খুব ভাল নেই।

নির্জীব কণ্ঠে খড়্গ বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে আপনি কি চান ডাঃ লাহিড়ী ?

কোমল স্বরে ডাঃ লাহিড়ী বললেন, বসুন খড়্গ বাহাদুর। এ কি ! আপনার হাতিয়ার কোথায় ?

খড়্গ বাহাদুর বললেন, লাইব্রেরী ঘরের টেবিলের ওপরে খুলে রেখেছি ; ভারি বিশ্রী লাগছিল।

ডাঃ লাহিড়ী মাধবকে হাতিয়ার আনতে পাঠিয়ে খড়্গ বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলেন,—মিঃ পাকড়াশী বলছিলেন, লাশ তাঁর নজরে পড়বার আগের মুহূর্ত্তেই আপনি বাগান ছেড়ে গেছেন। বাগানে আপনি কি করছিলেন বলুন তো ?

খড়্গ বাহাদুরের মুখখানা চোখের পলকে কালো হয়ে উঠল, মরিয়া হয়েই যেন তিনি একখানা চেয়ারে ব'সে পড়লেন। তারপর কষ্টে মুখের কোণে একটুখানি হাসি টেনে বললেন, এই—চাঁদের শোভা দেখছিলাম।

মাধব এল ; হাতে তার কেবল চামড়ার খালি খাপটা। বললে, এইটেই কেবল ছিল, হাতিয়ার নেই।

স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলেই খড়্গ বাহাদুরের দিকে চেয়ে ভয়ে শিউরে উঠলেন। কি সাংঘাতিক নরঘাতক ঐ লোকটা ! আতঙ্কে ওর চোখ দুটো কপালের ওপরে ঠেলে উঠেছে, বোধ করি নিজের অপরাধ স্বীকার করবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘরের একটি কোণ থেকে একটা মৃদু মিষ্টি অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—খড়্‌গ বাহাদুর তখন বাগানে কি করছিলেন, আমি বলতে পারি।

সকলে চমকে উঠে সেই দিকে চাইলেন।

রেবা বললে,—খড়্‌গ বাহাদুর যখন বলতে পারছেন না তখন আমিই বলি। বাঙ্গালীর মেয়েকে বিয়ে করবার খুব সখ হয়েছিল ওঁর, আমাকে তাই বলেছিলেন। আমি ওঁকে অন্যত্র চেষ্টা করবার উপদেশ দিয়েছিলাম। তাতে উনি আমার ওপরে বেশ একটু বিরক্তই হয়েছিলেন ; কিন্তু আমি বাগান থেকে চ'লে আসবার পর উনি যে ওঁর নির্বুদ্ধিতার জন্যে বেশ অনুতপ্ত হয়েছিলেন

সে আমি দূর থেকে ওঁর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। নরহত্যা যে ওঁর দ্বারা হয় নি এ কথা আমি হলফ্‌ করে বলতে পারি।

ভৎর্সনার স্বরে অধ্যাপক পাকড়াশী ডাকলেন, রেবা !

রেবা দৃপ্ত কণ্ঠে জানালে,—না দাদু ; এ অবস্থায় আমি চুপ ক'রে থাকতে পারব না। প্রাণ গেলেও খড়্‌গ বাহাদুর তাঁর নির্বুদ্ধিতার কথা তোমাদের জানাতে পারবেন না, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী একজন ভদ্রলোককে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হ'তে দেখেও চুপ ক'রে থাকলে আমার মহাপাপ হবে। যতক্ষণ উনি বাগানে ছিলেন আমিও ওঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি জানি এ কাজ উনি করেন নি।

আবার একটা বিস্ময়ের চমক লাগল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে খড়্‌গ বাহাদুর একবার রেবার দিকে চাইলেন। রেবার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তার ভাব ছিল যে মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে খড়্‌গ বাহাদুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যেন একটা ক'রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। স্তব্ধ হয়ে সকলে ভাবতে লাগলেন, তবে এ কাজ করলে কে ?

নিরীহ কণ্ঠের একটা অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত খাপছাড়া প্রশ্নে স্তব্ধতা ভাঙ্গল,—সিগারটা কি খুবই লম্বা ?

প্রশ্নটা এমনি বিদ্‌ঘুটে আর খাপছাড়া যে সকলে গলা তুলে কোণের দিকে প্রশ্নকর্ত্তাকে খুঁজতে লাগলেন।

এক কোণ থেকে ফণী রায় জিজ্ঞেস করলেন, ডাইনিং রুমে ব'সে ধরণী বাবু যে সিগার টানছেন সেইটের কথা বলছি। সেটা আমার এই ছড়িগাছটার মতই লম্বা বলে মনে হচ্ছে।

বিরক্ত হ'লেও ডাঃ লাহিড়ী প্রশংসার দৃষ্টিতে ফণী রায়ের দিকে চেয়ে বললেন, ঠিক বলেছ ঠাকুর ! সিগারটা অনেকক্ষণ শেষ হবার কথা ! মাধব, যাও তো, চট্‌ ক'রে ধরণী বাবুকে এখানে ডেকে আন তো !

এক মিনিটের ভেতরে মাধব ফিরে এসে জানালে, ধরণী বাবু চলে গেছেন। (ক্রমশঃ)

হরিশ মুখার্জীর রোড

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

কলিকাতার রাস্তাঘাট দিয়া চলিবার সময়ে দেওয়ালের গায়ে কত রকমারি নাম দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল হয়। এখানে 'বাজারে'রও অন্ত নাই, 'বাগানের'ও সীমা নাই! কিন্তু এই সব নামের অর্থ ধরিয়া এখন আর কোন লাভ নাই; কারণ শ্যামবাজার, রাধাবাজার, বউ-বাজার প্রভৃতির অর্থ এ নয় যে, এই সব বাজারে শ্যাম, রাধা প্রভৃতি মিলিতে পারে। হয়ত' কোন কালে শ্যাম, রাধা নামীয় কোন লোক বা 'বউ' বলিয়া পরিচিত কোনও মহিলা এই বাজারগুলি বসাইয়াছিলেন। যেমন জগুবাবুর বাজার বলিতে আমরা বুঝি, জগুবাবু বলিয়া কেহ এই বাজার বসাইয়াছেন। অবশ্য এক জায়গায় অনেকগুলি বাজার থাকার দরুণ 'বহুবাজার' নামের উৎপত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু 'মেছো বাজার' বলিতে আমরা বুঝিব, এক কালে এই স্থানে মাছ বিক্রীর স্থান ছিল। আবার গুয়াবাগান, সুপারীবাগান, নেবুতলা, চালতে-তলা প্রভৃতি নামে বুঝিতে হইবে এখানে এককালে হয়ত এই সব বৃক্ষের সমাবেশ ছিল এবং তাহা হইতেই কতকগুলি পাড়ার নামকরণ হয়।

কলিকাতার জন্ম-ইতিহাস তোমরা সকলেই কিছু কিছু জান। আড়াই শ' বৎসর আগেও এখানে কয়েকখানি মাটির দেওয়ালের চালাঘর মাত্র ছিল। এর বহু স্থান তখন অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তারপর দুই একখানি করিয়া ইটের ঘর। এখন সেই কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গাঁয়ের পরিণতি—ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী এই কলিকাতা!

কলিকাতার রাস্তাঘাটের নামগুলি কি ভাবে তৈরী হইয়াছে তার ইতিহাস সামান্য নয়। তাহার কতকগুলি নামের অর্থবোধ সহজেই হয় আবার কতকগুলি নামের অর্থবোধ সহজে হয় না; কিন্তু যে সকল লোকের নামে রাস্তা তৈরী হইয়াছে, তাঁহারা যে সকলেই কীর্ত্তিমান্ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবসার দ্বারা, বীরত্ব ও তেজস্বিতার দ্বারা, সততা শিক্ষা দ্বারা, সাহিত্য প্রচার দ্বারা, অর্থ দ্বারা—যে কোন উপায়ে যাঁহারা সমাজ বা দেশসেবা করিয়াছেন তাঁহাদের নামানুসারে এই সব রাস্তাঘাটের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিবার আগ্রহ হওয়া আমাদের স্বাভাবিক। আমি ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জীর রোডের কথা বলিতেছি। আশু মুখার্জীর রোড যাঁর নামানুসারে হইয়াছে তাঁর সম্বন্ধে আমরা সকলেই কিছু না কিছু জানি, কিন্তু এই হরিশ মুখার্জী কে?

ইনি হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ ছিলেন না—দারিদ্র্য বশতঃ অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়া তিনি এক অফিসে মাত্র দশ টাকা মাহিনার চাকরীতে প্রবেশ করেন। তখনকার দিনে কুলীনরা

অনেক বিবাহ করিতেন। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের পিতাও সাতটি বিবাহ করেন। হরিশ ছিলেন তাঁহার পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠা স্ত্রীর সন্তান। ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের সন্নিকটে তাঁর জন্ম হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। এই হরিশ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই কিন্তু অবসর সময়ে তিনি আত্মচেষ্টায় বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বড় হইয়া তিনি গিবন ও কান্টের দর্শন গ্রন্থ হইতে অনেক যায়গা মুখে মুখে অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন! অল্প বয়সে দশ টাকা মাহিনার কেরাণীপদে যিনি প্রবেশ করেন সেই কর্ম্মবীর হরিশে বেতন ৪০০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তখনকার হিসাবে এই বেতন সামান্য নয়। স্কুলে যিনি লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই সেই হরিশ, তখনকার দিনের নামকরা পত্রিকা 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'বেঙ্গল রেকর্ডার' প্রভৃতিতে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন! আরও শুনিবে? বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন এই হরিশ মুখোপাধ্যায়। তোমরা বড় হইলে জানিতে পারিবে—কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি তৎকালের বড় বড় পণ্ডিত লোক এই হিন্দু পেট্রিয়টের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হরিশ ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক। তাঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ লর্ড ক্যানিংএর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের দিক্ দিয়া তিনি কত বড় ছিলেন তাহা বুঝিতে পারিতেছ। এইবার তাঁহার স্বদেশানুরাগের কথা কিছু বলিব।

এক সময়ে নীলকর সাহেবরা আমাদের দেশে খুব অত্যাচার করিত। দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণ' নামক নাটকে এই অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিয়া আজও অমর হইয়া আছেন। হরিশ্চন্দ্রও সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকরদের উৎপীড়নের করুণ কাহিনী জীবন্ত অক্ষরে প্রকাশ করিতেন। ইহা দেশবাসীদের অন্যায় দমনে প্রণোদিত করিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র নির্য্যাতিত দেশবাসীর করুণ কাহিনী কেবল প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—তিনি তাহাদের আবেদন পত্রগুলি পর্য্যন্ত নিজে লিখিয়া দিতেন—এমন কি নিজে মোকর্দ্দমার ব্যয়ভার পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৩৭ বৎসর।

অতি দুরবস্থা হইতে কেবল অক্লান্ত যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা হরিশচন্দ্র একদিন দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভবানীপুরের রসা রোডের সন্নিকট রাস্তাটিকে তাই দেশবাসী 'হরিশ মুখার্জীর রোড' নামকরণ করিয়া এই মনীষীর সম্মান কিছুটা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব কীর্ত্তিমান্ দেশ-সেবকগণের নাম কীর্ত্তনেও পুণ্য হয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

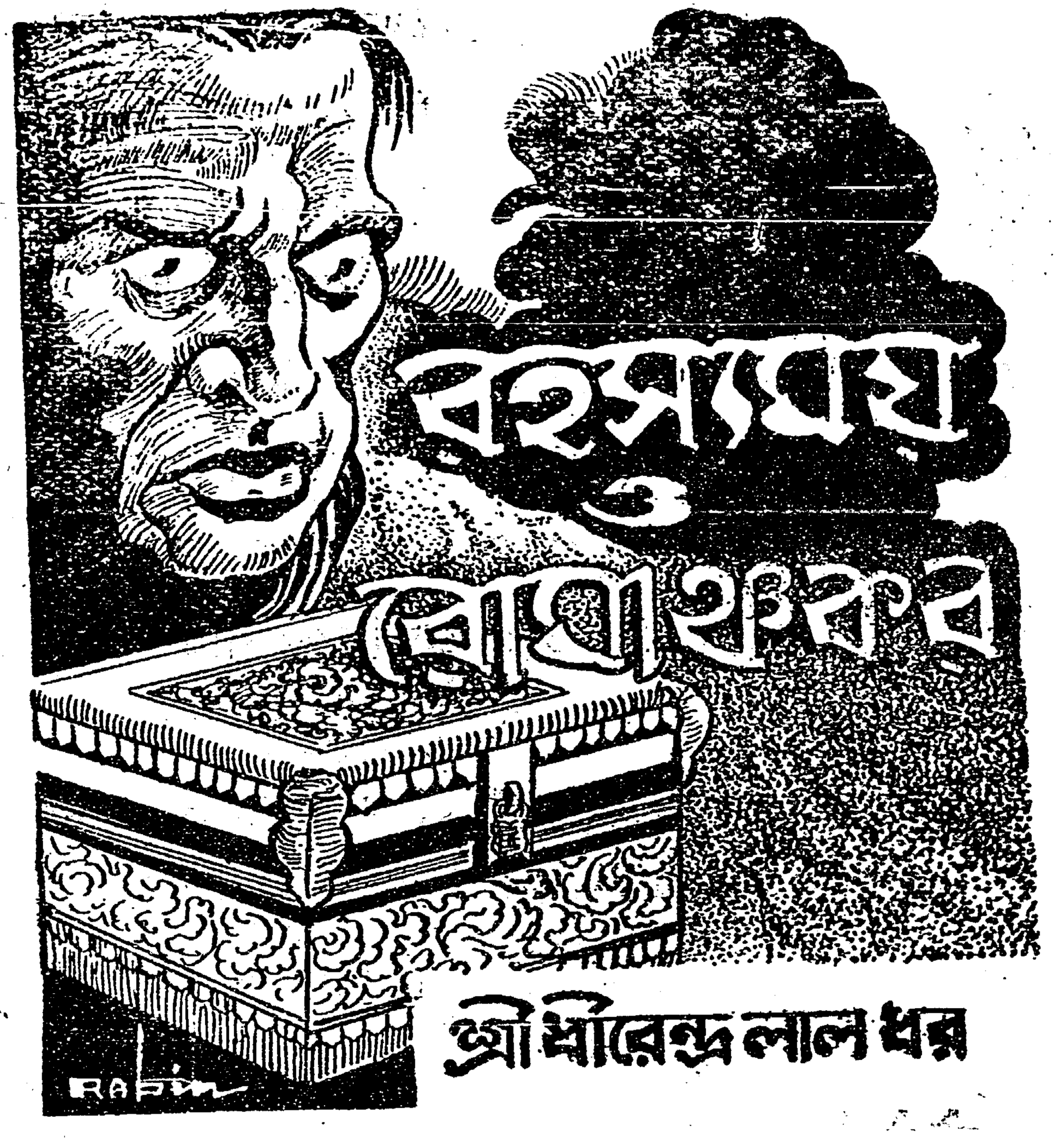

অষ্টম কাণ্ড

সাতটা বাজে।

ঘড়ি এক ঘণ্টা ফাষ্ট থাকলেও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সাতটার আগেই। আলোর আকাশ কালোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। সুষুপ্তির বিষ উপ্‌ছে পড়তে থাকে পৃথিবীর পাত্রে। অন্ধকার বরফের মত জমে চারিপাশে।

সত্যেন একটা সুতো বেঁধে ছবি আঁকা পোষ্টকার্ডখানি জানালা দিয়ে বাইরে ঝুলিয়ে দিলে গলির দিকে। রমেশ বাবু এই রকমই বলে দিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ সত্যেন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। ইচ্ছা ছিল, কে এসে কার্ডখানি নিয়ে যায় একবার দেখবে। রমেশ বাবু বলেছেন মনুসিংই এ কাজ করবে, সে ধারণা সত্যি কিনা তা পরখ্ করা যাবে। কিন্তু যা অন্ধকার। এদিকে আবার রমেশ বাবু বলেছেন টর্চের আলো ফেলে সত্যেন যেন কোন গোলযোগের সৃষ্টি না করে, তাতে নাকি সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হবে বেশী।

এই সব ভেবে সত্যেন জানালার সামনে থেকে সরে এলো।

গলিটা সরু। বালীগঞ্জ অঞ্চলে এই ধরণের সরু গলি বেশী নেই। লোকজনের যাতায়াতও কম। তার উপর আজকালকার যা অন্ধকার, নেহাৎ দরকার না থাকলে বড় রাস্তা ছেড়ে কোন ভদ্রলোক সন্ধ্যার পরে গলি পথে সহজে পা বাড়ায় না। তথাপি—

একটু পরে জন চারেক ছোকরা হৈ-চৈ করতে করতে গলির মধ্যে ঢুকলো। সত্যেনের জানালার নীচে এসে একজন দাঁড়ালো,—ইস্, কপালে কি একটা লাগলো ঠক্ করে!

ফস্ করে একজনের হাতে টর্চ জলে উঠলো। দেখা গেল জানালার গরাদে সুতো বাঁধা এক টুকরো ঝুলন্ত কার্ডবোর্ড। ছোকরা নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—একটা ছেলেদের ঘুড়ি। এইটে লেগেই তুই অজ্ঞান হয়ে গেলি, তা হলে বোমা পড়লে কি করবি?

—সে তো দেখতেই পেলি। সাইরেন শুনলেই তো তোরা সব শেল্‌টারে ঢুকিস্, আমি কি ফার্ষ্ট-এড্-পোষ্ট ছেড়ে এক পা নড়েছি, এই যে তিন দিন বোম্‌বিং হয়ে গেল?

—ওটা কোনও বীরত্ব নয়, ওটা বোকামী।

—আরে ও সব বাজে তর্ক রাখ্,—আর একজন বললে। একটু দাঁড়া, একটা মজা করা যাক্। নরেন, তোর পকেটে তো লজেঞ্চুস আছে, দে তো গোটা চারেক, বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপনের কাগজখানায় মুড়ে এর সঙ্গে বেঁধে দিই। ছেলেটা কাল সকালে ঘুড়ি টেনে দেখবে লজেঞ্চুস, অবাক্ হয়ে যাবে, কী বলিস্?

—তোর যত সব বিদ্‌ঘুটে খেয়াল—বলে নরেন পকেট থেকে লজেঞ্চুস বের করে দিলে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে লজেঞ্চুস-পর্ব্ব শেষ হোল। সকলে হৈ-চৈ করে উঠলো—ও. কে.।

দলটা গলি পার হয়ে গেল।

গলির দু'মুখ থেকে দুটি ভিখারী এবার এগিয়ে এলো। এতক্ষণ তারা বসে ভিক্ষা করছিল। জানালার নীচে এসে হাত-বিজলীর আলো ফেললো পেষ্টবোর্ডখানির উপর। দেখে একজন বললে—সব ঠিক আছে।

অপর জন বললে—তবু একবার দেখে নেওয়া ভালো।

কার্ডবোর্ডখানি আলোর সামনে ধরে ভালো করে দেখতে গিয়েই সে চমকে উঠলো—আরে সর্ব্বনাশ!

—কি হোল?

—এটা সেটা নয়, অন্য—একদম সাদা। এই দেখ!

—বলিস্ কি?

পেষ্টবোর্ডখানি আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দু'জনে কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তার পরেই ছুটে গেল গলির মুখে, রাস্তার দু'পাশে বরাবর টর্চের আলো ফেললো,—যতদূর দৃষ্টি যায় ছোকরার দলটাকে কোথাও দেখা গেল না। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা মুছে গেছে পথের মধ্যে থেকে।

প্রথম ভিখারী বললে—ইস্, কি ভুলই করেছি! ভেবেছিলাম একদল ফাজিল ছেলে···

—আমারও তাই মনে হয়েছিল, অপর জন বললে। যাক্‌গে, বাজে কথায় এখন আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, এখনই রমেশ বাবুকে একটা ফোন করি গে চল্—

দু'জনে তাড়াতাড়ি সত্যেনের বাড়ীতে এসে ঢুকলো।

নবম কাণ্ড

আবার সেই চাঁদনীর দোকান।

শশধর ঢুকতেই সোলার সাহেব বললে—কি খবর মিষ্টার শশা, সব ভেস্তে গেছে তো?

—একেবারে তাজ্জব ব্যাপার সাহেব!

তোমার কাছে সবই তাজ্জব। প্রতি পদে ঠেকছ, তবু কোন কাজ আজ পর্য্যন্ত তুমি গোড়া বেঁধে-করতে শিখলে না। আর কবে শিখবে বল তো?

—আহাঃ, আগে সব শোনো?

—নতুন কি আর শুনবো? কেবল হা-হুতাশ করবে তো!

—হা-হুতাশ করি কি সাধে? এত করেও যে শেষ রক্ষে হচ্ছে না!

—সে হবেও না কোনদিন। যার মাথাটা সবই গোবরে ভরা, সে কখনও কোন কাজ করতে পারে কোনদিন?

—আমার মাথা না হয় গোবরে ভরা মানলাম, কিন্তু তোমার বুদ্ধিই যে এবার বানচাল হয়ে গেল!

—তার মানে?

—মানে তোমার বুদ্ধিমত কাজ করে কার্ডখানি আমাদের হস্তগত হবার আগেই আর একজন সেটা হস্তগত করেছে।

—সে কে?

—সেই কথাই তো বলতে এলাম। সে লোকটা যে কে তা তো আমিও বুঝতে পারছি না। তোমার কথামত করিমের আড্ডা থেকে চারজন পকেটমারকে পাঠিয়েছিলাম। সব শেখানো-পড়ানো ছিল, লজেঞ্চুস বেঁধে দেবার ভান করে তারা আসল কার্ডখানি খুলে নিয়ে আসে। পরে দেখি সেখানা একদম বাজে একখানা চিঠি লেখা পোষ্টকার্ড।

—আশ্চর্য্য! এ-ব্যাপারটা তুমি এখনও বুঝতে পার নি? সত্যেন তা হলে আসল কার্ডখানি ঝুলিয়ে দেয় নি।

—আরে না না। আমি তার আগে দু'বার সেই গলি দিয়ে গেছি, দু'বারই ভাল ক'রে দেখেছি যে আসল ছবি-আঁকা পেষ্টবোর্ডখানি ঝুলছে, তারপরে ছোকরাদের পাঠিয়েছি।

—তা হলে তুমি বলতে চাও যে ছোকরারা যাবার আগে আর একজন কেউ সেই পোষ্ট-কার্ডখানি বদলে নিয়েছে?

—কিন্তু আর কাউকেই তো ইতিমধ্যে আমি গলির মধ্যে ঢুকতে দেখি নি। আমি গলি

থেকে বেরিয়ে এসে ইসারা করতেই ছোকরার দল হৈ-চৈ করতে করতে গলির ভিতরে ঢোকে। তারাও তো গলির মধ্যে আর কাউকে দেখে নি।

—অর্থাৎ, তুমি কি বলতে চাও? সত্যেন কার্ডখানি বদ্‌লালো না, গলির মধ্যে কেউ ঢুকলো না, তা হলে কি কার্ডখানি পাখা মেলে উবে গেল নাকি?

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, কি আর বলব?

—হুঁ। বলে সোলার বিরক্তি-ভরা দৃষ্টি ছুড়ে মারলো শশধরের মুখের উপর। আঁক-কষতে-না-পারা ছাত্রের মত শশধর অপ্রতিভ হয়ে পড়লো।

(ক্রমশঃ)

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মনে করছ যে শুধু টাকাকড়ির দিক দিয়ে উন্নতি করলেই বুঝি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। এ কিন্তু খুব ভুল ধারণা; শুধু টাকাপয়সা নয়, পার্থিব যে কোন বিষয়ে উন্নতি করার নামই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতি। সম্প্রতি সমস্ত পৃথিবী যুড়ে যে কুরুক্ষেত্র চলেছে তাতে প্রত্যেক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। যুদ্ধের পর শুধু এই সব ভাঙ্গাগুলি যোড়া দিলেই চলবে না, অতি দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে। এর দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ পৃথিবীতে বাঁচতে হলে পশুর মত বাঁচ্‌লে চল্‌বে না, মানুষের মত বাঁচতে হবে; দ্বিতীয়তঃ জীবন সংগ্রামে সে জাতিই জয়ী হবে যে জাতি এগিয়ে চল্‌বে। যে পিছিয়ে পড়্‌ল সে যে হেরে গেল তাই নয়, বুঝে নিতে হবে তার মৃত্যুও ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং পৃথিবীর সব দেশ এখন থেকেই নানা পরিকল্পনা সুরু করেছে যাতে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যত দূর সম্ভব উন্নতি করতে পারে। আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার কথা ছেড়ে দাও; এরা বহু পূর্ব্বেই আমাদের চেয়ে প্রত্যেক বিষয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু যে সব দেশ ভারতবর্ষ থেকে খুব উন্নত নয়—যেমন চীন, মিশর প্রভৃতি—এরাও এমন সব পরিকল্পনা আরম্ভ করেছে যে ঐ সব পন্থা অনুযায়ী কাজ করলে তারা অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের দেশের চেয়ে ঢের বেশী এগিয়ে যাবে। পৃথিবীর সব দেশ যখন এ রকম ভাবে উন্নতির পথে ছুটে চল্‌তে কোমর বাঁধ্‌ছে তখন আমরাই কি পড়ে থাকব?

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পৃথিবীর সুসভ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ নানাদিকে বিশেষ অনুন্নত। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা আমাদের দেশে নেই বল্‌লেই চলে। আর যে দেশের দরিদ্রেরা পেট ভরে দু'বেলা খেতে পায় না, শীত নিবারণের জন্য যারা এক টুক্‌রো কাপড় পর্য্যন্ত গায়ে দিতে পারে না, দারুণ গ্রীষ্ম আর প্রচণ্ড শীতে মাথা বাঁচাবার জন্য যাদের ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরও জোটে না তাদের শিক্ষাই বা কি করে দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে? বেঁচে থাকতে গেলে সাধারণ মানুষের যে অত্যাবশ্যক উপকরণগুলির দরকার, ভারতের জনসাধারণ যাতে সেগুলি পেতে পারে সে জন্য আমাদের দেশের সাতজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং হিতৈষী নেতা এক পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। এতে শুধু যে জনসাধারণের উন্নতির উপায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি করতে হ'লে কি করা দরকার এবং সেজন্য কত টাকা আবশ্যক তারও মোটামুটি একটা খসড়া এঁরা দিয়ে দিয়েছেন। এই পরিকল্পনার সব কথা তোমরা এখন বুঝবে না। কিন্তু দেশের সমৃদ্ধির উপায় কে জানতে না চায়? সুতরাং এঁদের পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কতকগুলি বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের মোটামুটি একটা পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

এঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটানা পনের বৎসর কাজ হলে তবে সম্যক ফল পাওয়া যাবে। অবশ্য এর জন্য বহু টাকা ব্যয়ও করতে হবে। মোট দশ হাজার কোটি টাকা খরচ না করলে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পর্য্যবসিত হবে না। এর মধ্যে শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য খরচ করতে হবে ৪,৪৮০ কোটি টাকা, কৃষির জন্য ১,২৪০ কোটি টাকা, পথঘাট ও যানবাহন ইত্যাদির জন্য ৯৪০ কোটি টাকা, শিক্ষার জন্য ৪৯০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্যের জন্য ৪৫০ কোটি টাকা, ঘরবাড়ীর জন্য ২,২০০ কোটি টাকা এবং অপরাপর বিষয়ে উন্নতি করবার জন্য ২০০ কোটি টাকা।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হ'লে পনের বৎসর পর আমরা দেখতে পাব যে প্রত্যেক লোক দু'বেলা মোটামুটি খাদ্য পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, প্রত্যেক গ্রামে একটি করে চিকিৎসালয়, একজন ক'রে ডাক্তার এবং দু'জন করে শুশ্রূষাকারী রয়েছে; এ ছাড়া প্রত্যেক সহরে একটি কি দু'টি হাসপাতাল এবং প্রসূতিদের জন্য শুশ্রূষাগৃহ রয়েছে। আমরা আরও দেখব যে প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্য অন্ততঃ একটি করে বিদ্যালয় রয়েছে এবং দশ বৎসর বয়স্ক যে কোন ছেলে বা মেয়ে লিখতে এবং পড়তে পারছে। জনসাধারণের উন্নতির জন্য আরও অনেক উপায় এই পরিকল্পনায় দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা-মত কার্য্য করলে প্রত্যেক লোক নিজ ব্যবহারের জন্য ত্রিশ গজ করে কাপড় পাবে, বাসের জন্য প্রত্যেকে ১০০ বর্গ ফুট স্থান পাবে এবং প্রত্যেক গ্রামবাসী পানের জন্য বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল জল পাবে। অবশ্য সহরবাসীর জন্য আরও অনেক সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক সহরে এখনকার চেয়ে বেশী স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, জলের

কল, বিদ্যুতের আলো প্রভৃতি থাকবে। সহর ও গ্রামের রাস্তাঘাট সব পাকা হয়ে যাবে। রাস্তার সংখ্যা এখনকার দ্বিগুণ হবে। রেলের রাস্তা এখন সারা ভারতবর্ষে আছে ৪১,০০০ মাইল—তাকে বাড়িয়ে করা হবে ৬২,০০০ মাইল। তা ছাড়া নদীপথে এবং উপকূলপথে এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ষ্টিমার, নৌকা প্রভৃতি চল্‌বে। পথঘাট এবং যানবাহনের এই উন্নতি হলে লোকের যে কেবল যাতায়াত করতে সুবিধা হ'বে তা নয়, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষিরও প্রভূত উন্নতি হবে।

এই পরিকল্পনামত কায হলে পনের বৎসর পর ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য হয়ে যাবে এখনকার দ্বিগুণ এবং শিল্পজাত দ্রব্য এখনকার পাঁচগুণ। এখন আমরা যত জমিতে ফসল ফলাচ্ছি তাতে হবে না, আরও বহু সহস্র বিঘা জমি ভেঙ্গে ব্যবহারের যোগ্য করে নিতে হবে; ভাল সারের প্রচুর ব্যবহার চাষাদের ভেতর প্রচলিত করতে হবে, টুকরো টুকরো জমিগুলি একসঙ্গে চাষ করতে হবে এবং জমিতে খুব ভাল করে জলসেচনের বন্দোবস্ত করতে হবে। জলসেচের জন্য আরও বহু পুকুর, খাল, ইঁদারা প্রভৃতি তো কাটতে হবেই, তা ছাড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করতে পারলে শুধু জলসেচের সুবিধা হবে না, নাম মাত্র খরচে বিদ্যুৎ তৈরী করে কারখানার কাজেরও বিশেষ সুবিধা হ'বে।

শিল্প এবং কারখানার উন্নতি বিষয়ে দুটি পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম হচ্ছে যন্ত্রশিল্প। জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কিছু কিছু জিনিষ আমাদের দেশে তৈরী হলেও যন্ত্রপাতি প্রায় কিছুই আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় না। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী। পরিকল্পনাকারেরা জোর দিয়ে বল্‌ছেন যে যন্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সব চেয়ে বেশী টাকা খরচ করতে হবে। আবশ্যক মত বিদেশ থেকে এঞ্জিনিয়ার নিয়ে এসে কলকব্জার যে সব কাজ আমরা জানি না সেগুলো শিখে নিতে হবে। যন্ত্রশিল্পের উন্নতি করতে হলে মোটামুটি কতকগুলি শিল্পকে বিশেষ সমৃদ্ধ করতে হবে—সেগুলি হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ প্রস্তুত করা, খনিজ এবং ধাতব দ্রব্যের—যথা লোহা, ইস্পাত, এলুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির প্রস্তুত করা এবং রেলওয়ে এঞ্জিন, মালগাড়ি, জাহাজ, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতি এ দেশে নির্ম্মাণ করা। যন্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য পনের বৎসরে পরিকল্পনাকারেরা মোট ৪,৪৮০ কোটি টাকা খরচ করতে উপদেশ দিচ্ছেন।

এ ছাড়া আরও অনেক শিল্পের উন্নতির উপায় পরিকল্পনায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার অনেক কথাই তোমরা এখন বুঝবে না।

এই পনের বৎসরের পরিকল্পনাটিকে পাঁচ বৎসরের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পাঁচ বৎসরে যত খরচ করা হবে, দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে খরচ করা হবে তার প্রায় দ্বিগুণ এবং তৃতীয়

পাঁচ বৎসরে আবার এর দ্বিগুণ খরচ করা হবে। এ রকম করার মানে হচ্ছে এই যে একবারে খুব বেশী খরচ করলে জিনিষপত্রের মূল্য এবং কর বৃদ্ধির দরুণ সাধারণ লোকের ওপর অত্যন্ত চাপ দেওয়া হবে।

তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার এত টাকা আসবে কোথা থেকে? পরিকল্পনাকারেরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিছু দেশের পাওনা টাকা, কিছু আমাদের নিজেদের জমা টাকা, কিছু বিদেশ থেকে ধার করে এবং চল্‌তি টাকা কিছু বাড়িয়ে—সব একত্র করলে আমাদের আবশ্যক দশ হাজার কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে অনেক মতদ্বৈধ রয়েছে এবং যখন পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত করা হবে তখন টাকাকড়ির বাজারের কি অবস্থা থাকে তারই ওপর এর কৃতকার্য্যতা খুব বেশী নির্ভর করবে।

আর একটি কথা তোমাদের জেনে রাখা দরকার। পরিকল্পনাকারেরা বলে রেখেছেন যে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে এই সার্ব্বজনীন উন্নতির কোন আশা নেই; সুতরাং যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীন দেখতে তোমরা নিশ্চয়ই অতি আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করে থাকবে।

পূর্ণিমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার, এম্.এ,বি.এল্

রাধা। (সচকিত) ঐ যে·· ললিতা···বিশাখা···ঐ শোন্।

ললিতা। কি?

রাধা। ঐ যে বাঁশী। বৃন্দা, চম্পকলতিকা, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? ··· ঐ যে দূর বনে বাজছে।

বৃন্দা ও চম্পক। কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি নে!

রাধা। ঐ যে! কি প্রাণ মাতানো সুর! ঐ যে আরো কাছে···আরো···। না না, ও তো দূর বনে নয়, ···এই যে এইখানে, আমার মনের মাঝে।···আমার অন্তরের মাঝে তিনি উদয় হয়েছেন।···ললিতা, ললিতা, আজকের পূর্ণিমার রাতটি আমার বিফল হয় নি।

— গান —

চিত-মন্দিরে এলে নন্দকিশোর,
ব্রজের জীবন ধন গোপী-মন-চোর।
মোহন বাঁশরী-তানে পরাণ বিভোর।
অপরূপ রূপরাশি
ভুবন ভোলানো হাসি
উজল করিল আসি অন্তর মোর;
মোহন বাঁশরী-তানে পরাণ বিভোর।
ভক্তির পুষ্পেতে সাজায়ে ডালা
কণ্ঠে দোলাব প্রীতি মালতীমালা।
ধ্যান প্রদীপ জ্বালি
সঙ্গীত অঞ্জলি
ধোয়াব চরণ ঢালি নয়নেরি লোর।
মোহন বাঁশরী-তানে পরাণ বিভোর।

বিশাখা। কিন্তু দয়াময়, আমরা কি তোমার চরণে এতই অপরাধ করেছি যে তুমি আমাদের দেখা দিলে না?

চম্পক। ভাই রাধা, তুমি আমাদের কৃষ্ণপ্রেম শিখিয়ে দাও। তুমি বলে দাও কিসে আমরা তাঁর কৃপাকণা পাবার অধিকারী হব।

রাধা। তাঁর চরণে প্রার্থনা কর ভাই, তিনিই সে মন্ত্র শিখিয়ে দেবেন। জান না, তিনি যে ভক্তের হরি, ভক্তির ডোরে বাঁধা থাকেন। ভক্তিভরে ডাকলে তিনি না শুনে থাকতেই পারবেন না।

বিশাখা। সত্যিই তো। ভক্তির টানে পাঁচ বছরের শিশু প্রহ্লাদ তাঁকে টেনে এনেছিল আর আমরা কি পারব না? কোথায় ভক্তের হরি, একবার দেখা দাও। দয়া কর প্রভু!

সকলে। হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে,
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্ততে।

[সহসা দূর বনে বংশীধ্বনি শোনা গেল। সকলে সচকিতভাবে তাহা শুনিল ও পরে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল]

— গান —

বাঁশীতে কে ডাকে মোরে
চল লো সই, দাঁড়িয়ে ওই।
বাঁশী তানে বন পানে
মন টানে, কেমনে রই?
বিফল আজ ঘরেরি কাজ
টুটিল লাজ, উদাস হই,
দেরী হলে আঁখি-জলে
যাবে চলে আয় লো যাই।
যমুনা-জল হল উছল
কুসুমদল ঝরিছে সই,
আজি বিভোর পরাণ মোর
শ্যাম কিশোর কই লো কই!

[গীতরব ক্রমশঃ দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেল। ক্ষণপরে কুটিলা ও তৎপরে যষ্টিতে ভর দিয়া জটিলার প্রবেশ]

কুটিলা। ও মা, এদিকে এস। শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর।

জটিলা। (অগ্রসর হইয়া) কিরে, কি? কি?

কুটিলা। যা ভেবেছি তাই।...ওই দেখ কলসীগুলো ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর মেয়েগুলো সব পগার পার।

জটিলা। তাই তো আবাগের বেটিরা সব গেল কোথায়?

কুটিলা। আঁ', তাও জান না! তবে আর তোমাকে বলছি কি? ঐ যে নন্দ ঘোষের ছেলেটা বনের ভেতরে বসে বাঁশী বাজায়। সেই বাঁশীর বাজনা একবার কানে ঢুকলে আর রক্ষে নেই। পাগল হয়ে সেইদিক্ পানে ছোটে।

জটিলা। ও, তা বৌ-ও বুঝি ওদেরই সঙ্গে গেছে?

কুটিলা। তা আর বলতে! সেই তো হ'ল দলের সর্দ্দারণী। আমায় বললে কিনা, "ও ঠাকুরঝি, উনুনের জালটা একটু দেখো, আমি জল নিয়ে এই এলেম বলে।...ভাত ফুটতে না ফুটতেই চলে আসব।"...ও মা...কোথায় কি ...উনুনে জাল দিতে দিতে দিতে এত বড় একবোঝা কাঠ ফুরিয়ে গেল তাও রাজরাণীর ঘাট থেকে ফিরবারই সময় হ'ল না।

জটিলা। তারপর? ভাতের কি করলি?

কুটিলা। ভাতের আর কি করব! জল শুকোয় আর ঢালি, জল শুকোয় আর ঢালি। শেষটায় আর না পেরে উনুনের আঁচ নিবিয়ে রেখে চলে এলাম।

জটিলা। কেন বাপু, ভাতের হাঁড়িটা নামাতে পারলি নি?

কুটিলা। শোন কথা! আমি এই কাহিল মানুষ! আমি কি অত বড় হাঁড়িটা নামাতে পারি? এমনিই তো খেটে খেটে আমার শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেছে।

জটিলা। আহাহা, তাই তো, তাই তো। তুই বাছা, আর কতই করবি। বৌয়ের ঘর-সংসার বৌ নিজেই যদি না দেখে—

কুটিলা। হাঁঃ, আর দেখেছে!

জটিলা। হুঁ, ছেলেটাকে আজ এমন শিক্ষা দেব যে বাছাধন গ্রামছাড়া হতে পথ পাবে না।

কুটিলা। তবে চল, দেখি গে ওরা কোথায় গেল। (ক্রমশঃ)

গুলমুখ সিংএর ঘোড়া

শ্রীমানসমোহন রায়

প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। পাঞ্জাবের বীর সন্তানগণ সব দেশে ফিরে আসছেন। হারীয়া পাঞ্জাবের একটি ছোট, অখ্যাত গ্রাম। সেখানেও আজ সাড়া পড়ে গিয়েছে।

হারীয়া গ্রামের যে সব ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এলেন তাঁদের মধ্যে রিসালদার গুলমুখ সিং একজন। তিনি গিয়েছিলেন একলা, কিন্তু ফেরবার সময় তাঁর সঙ্গে এল একটি অশ্বিনী—বেলা। পাঞ্জাব যোদ্ধার দেশ। সেখানে আর যা' কিছুর অভাব থাক, সুন্দর অশ্বের অভাব ছিল না। কিন্তু বেলাকে দেখে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে স্বীকার করতে হ'ল যে তাঁরা কখন এমন ঘোড়া দেখে নি।

তার উচ্চতা অন্যূন আঠার হাত হবে (এখানে বলে রাখা ভাল যে অশ্বের মাপ যে হাতে হয় সে হাত চার ইঞ্চি)। বাদামী রঙ। ঘাড় ও লেজের রোম ঘন ও কালো। সব চেয়ে সুন্দর ওর চোখ। প্রশান্ত কালো চোখ দুটি দেখলেই অতলস্পর্শী সমুদ্রের কথা মনে হয়। ঘন কৃষ্ণপক্ষ্ম তুলে যখনই তাকায় তখনই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

রিসলদারজীর বাড়ীতে সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। সকলেই তাঁকে সম্মান

করে, ভক্তি করে। তিনি সকলের কাছে গল্প করছেন কি করে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে ভয়ানক বিপদ্‌কে মাথায় করে একটা ব্যাটেলিয়নকে উদ্ধার করেছিলেন। তার পুরস্কার স্বরূপ কর্ণেল স্মিথ তাঁকে তাঁর নিজের অশ্বিনী বেলাকে উপহার দেন, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কারুর আর বেলাকে দেখতে, আর দেখে ভালবাসতে বাকী রইল না।

বছর পাঁচেক পরের কথা। বেলা এখন আর কেবল রিসালদারজীর সম্পত্তি নয়। গ্রামের প্রত্যেকটি লোক তাকে ভালবাসে। যে যখন সহরে যায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেলার জন্যেও একটা কিছু কিনে নিয়ে আসে। বেলাও সকলেরই অনুগত। বেলার সঙ্গে দৌড়ে আর কোন ঘোড়া পারে না। নেজাবাজীর * দিনে আশপাশের দশখানা গ্রামের সমস্ত লোক জানে যে বেলাকে যে নেবে সেই জিতবে। বেলা এখন হারীয়া গ্রামের বিশিষ্ট সম্পত্তি। রিসালদারজীর এগার বৎসর বয়স্ক পুত্র গ্রীডয়াল সিং তাকে নিয়ে রোজ সকালে হাওয়া খেতে বেরোয়। ক্ষেতের মধ্যে গুলমুখ সিংএর প্রজারা প্রভুপুত্রকে সম্মান দেখায়—"সৎশ্রীকাল জী" ("সৎ শ্রী আকাল" এর অপভ্রংশ)। গ্রীডয়াল সিং বেলার ঘাড়ে হাত চাপড়ে ইসারা করে, আর সে সামনের দুটো পা তুলে নমস্কারের প্রতিদান দেয়। গ্রীডয়াল সিং নিজে যদি নমস্কার করত তা হ'লেও তাদের এত আনন্দ হ'ত না। সকলে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখে। কেউ হয় ত' এসে গায়ে একটু হাত বুলায়, কেউ হয় ত' এক মুঠো কচি ঘাস এনে মুখে তুলে দেয়। বেলাকে আদর ক'রে, বেলাকে খাইয়ে, বেলাকে সাজিয়ে সকলেরই তৃপ্তি।

আরও বছর আষ্টেক পরের কথা। বেলার বয়স এখন আঠার বছর। ইতিমধ্যে তার একটা বাচ্চা হয়েছে। তারই বয়স এখন ছ' বছর। তার নাম লিলি। ছয় বৎসর বয়স—যৌবনের চাপল্য ও তৎপরতা দেহের প্রতি ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। রঙ মায়ের চেয়ে বেশী গাঢ়—একটু কালোর দিক ঘেঁসে গিয়েছে। মায়ের সৌন্দর্য্য সব পায় নি তবু চলবার ধরণটা দেখলে কখন কখন বেলার কথা মনে পড়ে যায়। লিলির মধ্যে মায়ের তেজ আছে, কিন্তু মহিমা নেই। ঔদ্ধত্য আছে কিন্তু কমনীয়তা একটু কম। দুইটী বিপরীত গুণের যে সংমিশ্রণ বেলার মধ্যে দেখা যায় তার একটু অভাব।

রিসালদারজীর নিষেধে বেলাকে এখন আর জোরে দৌড় করান হয় না। গ্রীডয়াল সিং এখন

---

* নেজাবাজী পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত খেলার প্রতিযোগিতা। এই খেলাতে মাঠের মধ্যে একটি কাঠি পোঁতা থাকে, আর অশ্বারোহী দূর হতে এসে বর্শায় করে সেটিকে বিঁধে তুলে নেন। খেলার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে সোজা ঘোড়ার দৌড়ানর উপর আর কাঠির কাছে এসে ঠিকমত নীচু হওয়ার উপর।

উনিশ বছরের যুবক। সে এখন লিলিকে নিয়েই সমস্ত দিন থাকে। তার ছোট ভাই দশ বৎসর বয়স্ক হরি সিং রোজ বেলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়।

একদিন সকাল বেলা হরি সিং নিয়মমত বেলার পিঠে চড়ে বেরিয়েছে। গ্রামের ঠিক বাইরেই গভর্ণমেন্টের নতুন "কলনী" হচ্ছে—অনেক খোলা মাঠ পড়ে আছে। সে দিকে খোলা হাওয়া পাবে মনে করে বেলাকে নিয়ে সেই মাঠের মধ্যে নামল। হঠাৎ পেছন থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল—আর মুহূর্ত্ত মধ্যে লিলিকে নিয়ে গ্রীডয়াল বেলা ও হরিসিংএর পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেল। হরিসিং ব্যাপারটা ঠিক বুঝবার আগেই বেলা বিদ্যুৎবেগে ছুটতে আরম্ভ করল। তার যৌবনের তেজ গর্ব্ব এখনও লুপ্ত হয় নি। যে বেলার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একদিন সমস্ত পাঞ্জাব হেরে গিয়েছে তাকে এগিয়ে যাবার স্পর্দ্ধা করে লিলি? —আজ প্রায় তিন বৎসর পরে বেলা দৌড়োচ্ছে—যাকে দৌড়ান বলে। তার যৌবনের ক্ষমতা ফিরে এসেছে। হরি সিং দশ বৎসরের বালক। সে কখনও এত দ্রুত ধাবমান ঘোড়ায় চড়ে নি। তবু সে রিসালদার গুলমুখ সিংএর ছেলে—সে ভয় পাবে? সে পাকা সওয়ারের মত ঘোড়ার গায়ের উপর শুয়ে পড়ল প্রাণপণ শক্তিতে রাশ টেনে ধরে। বেলা লিলিকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ধরে ফেলল। এইবার দু'জনে ছুটছে প্রায় সমান সমান। একবার বেলা একটু এগোচ্ছে, একবার লিলি। গ্রীডয়াল সিং ছোট ভাইয়ের জন্য একটু ভয় পেয়েছেন। তিনি চীৎকার করে বলছেন—"ঘোড়া থামাও হরি, ঘোড়া থামাও।" হরি সিং বেলাকে থামাতে চেষ্টা করতেও পারছে না ঐ বিদ্যুৎগতির মুখে—বেলা অন্ধবেগে ছুটছে। হঠাৎ তারা একটা হাত চারেক চওড়া খালের সামনে এসে পড়ল। এইখানে এসে লিলি থমকে দাঁড়াল। কিন্তু বেলা হরিসিংকে নিয়ে সেই বেগের ওপর খাল লাফিয়ে পার হয়ে গেল। প্রায় পঞ্চাশ গজ আন্দাজ গিয়ে সে যখন বুঝলে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আসছে না, তখন সে সন্তুষ্ট হয়ে থামল। তার নাসারন্ধ্র, বিস্ফারিত, দেহ ঘর্ম্মাক্ত, পা প্রায় কাঁপছে—কিন্তু তবু আজ তার সুখের সীমা নেই। বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌঁছেও আজ সে যৌবনের সম্মান বজায় রাখতে পেরেছে।

গুলমুখ সিং ঘটনাটা শুনলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি হরিসিংকে কোলে করে নামালেন—বেলার আর সেদিন আদরের সীমা রইল না।

আরও বছর আষ্টেক কেটে গেছে। বেলার জীবনের সূর্য্য এবার পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। তার দেহ আর সে রকম মসৃণ নেই। চলনের সে দৃপ্তভঙ্গী অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে।

সামরিক কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ ঘোড়ার বয়স বেশী হয়ে গেলে মেরে ফেলেন। গুলমুখ সিং ঠিক করলেন, পাশের গ্রামে যে অথর্ব্ব অশ্ব পালনের প্রতিষ্ঠান আছে বেলাকে সেখানে পাঠিয়ে

দেবেন। সেখানে গিয়ে তিনি নিজে বেলাকে রোজ দেখতে পারবেন—আর তাঁর খাতিরে বেলার আদর-যত্নও যথেষ্ট হবে। কিন্তু হারীয়া গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক ভিড় করে তাঁর বাড়ীতে এসে বলল—"সর্দ্দারজী, বেলা শুধু আপনার নয়, সে আমাদের সকলের। আপনি ওকে ছেড়ে দেবেন, ও গ্রামের যে বাড়ীতে যাবে সে বাড়ীতেই সকলে আদর করে রাখবে। ও যে ক্ষেতে ইচ্ছা গিয়ে শস্য খাবে, কেউ কিছু বলবে না। আপনি ওকে আমাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবেন না।"

গ্রামেই রয়ে গেল বেলা, এবং বার্দ্ধক্যের দিকে আরও এগিয়ে চল্‌ল। হঠাৎ একদিন তার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হ'ল। এক একবার যন্ত্রণার বেগ আসে, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক থাকে। কখনও অস্থির হ'য়ে দৌড়ে বেড়ায়, কখন সহ্য করবার চেষ্টা করে—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শুধু চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা পড়তে থাকে। গ্রাম শুদ্ধ লোক বেলার অসুখের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার ঘরের দরজার সামনে সমস্ত দিন ভিড় হয়েই রয়েছে।

গুলমুখ সিং সহর থেকে বড় ডাক্তার আনালেন। ডাক্তার বল্‌ল যে অসুখ সারবার নয়—এই যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে যত দিন বাঁচে। গুলমুখ সিং সমস্ত দিন খান নি, বসেন নি, কেবল ছটফট করে বেড়িয়েছেন। তিনি শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করেলন—"এর কি কোন উপায় নেই ডাক্তার সা'ব?" ডাক্তার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

সেদিন সমস্ত রাত গুলমুখ সিং ঘুমোতে পারলেন না। খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও পাশ করলেন। তারপর উঠে চেয়ারে বসলেন। শেষে বাইরে এসে বেলার ঘরের চারিপাশে পায়চারী করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে রাত শেষ হয়ে এল। তারারা সব এক এক ক'রে নিবতে আরম্ভ করেছে। পূর্ব্বদিকে একটু আলোর আভাস দিয়েছে। সেই সময় গুলমুখ ঘরে ফিরে গেলেন। আজ প্রায় বিশ বৎসর পরে তিনি আলমারী খুলে তাঁর সামরিক পোষাক বার করলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে, হঠাৎ তাড়াতাড়ি সেই সব পোষাক পরতে আরম্ভ করলেন। পায়ে কাঁটা লাগান বুট পরলেন। সাদা ধবধবে দাড়িগোঁফ ভাল করে আঁচড়ালেন, বেণী রচনা করে সুন্দর এক পাগড়ী মাথায় বাঁধলেন। তাঁর যুদ্ধের যত সম্মানচিহ্ন সব যথাস্থানে লাগালেন। সবশেষে তিনি তাঁর রিভলবার বার করে নিলেন।

দৃঢ় পদবিক্ষেপে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত রাত্রি প্রবল বিক্ষোভের পর তিনি মনকে সংযত করে এনেছেন। এখন তাঁকে শান্ত কিন্তু একটু অবসন্ন দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তিনি বেলার ঘরে ঢুকলেন। সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করে এখন বেলা একটু ঘুমোচ্ছে। গুলমুখ সিং গিয়ে বেলার গায়ে হাত দিলেন। বেলা জেগে উঠে প্রভুকে দেখে প্রভুর

গায়ে মুখ ঘষে আনন্দ জানাল। বেলাকেও এখন ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে। রিসালদারজী স্বহস্তে বেলাকে সাজ জিন সব পরালেন। পরিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বা'র করে নিয়ে এলেন।

চারিদিক্ শান্ত। এখনও খুঁজলে আকাশে দু' একটা তারা দেখতে পাওয়া যায়। পূব দিকের আকাশ অনেকটা লাল হয়ে উঠেছে।

গুলমুখ সিংকে আজ বহুদিনের পর পিঠে নিয়ে বেলার আনন্দের সীমা নেই। ঝিরঝিরে বাতাসে গুলমুখ সিংএর শ্বেতশ্মশ্রু উড়ছে। তাঁর আজ মনে পড়ছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কথা, যেদিন তিনি প্রথম বেলার পিঠে চড়েন। কে জানে, বেলারও হয়ত' আজ তাই মনে পড়ছে!

ধীরে ধীরে বেলাকে নিয়ে তিনি সেই খালের পাশে গেলেন, যেখানে বেলা হরিসিংকে নিয়ে খাল লাফিয়ে পার হয়েছিল।

সেখানে গিয়ে তিনি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন—তারপর নেমে বেলার গলা জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ যেন চমকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বেলাকে একবার চুমো খেয়ে সামরিক কায়দায় দশ পা এগিয়ে গেলেন। গিয়ে বেলার সামনাসামনি দাঁড়ালেন। তারপর রিভলভার তুলে বেলার দিকে লক্ষ্য করলেন।

এতক্ষণে বেলা বুঝতে পারল কি হতে যাচ্ছে। তার চোখ জলে ভরে এল। সে সেই বিশাল জলভরা চোখ দু'টি তুলে একবার প্রভুর দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে গুলমুখ সিং পর পর দুটো গুলি ছুঁড়লেন—একটা কপালে আর একটা গ্রীবায়। একটিও শব্দ না করে বেলা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানে পড়ে গেল—সামনের পা দুটি শূন্যে তুলে যেন কোথায় একবার আশ্রয় খুঁজল, তারপর সব নিস্পন্দ হয়ে গেল।

গুলমুখ সিং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেললেন। পাঞ্জাবী বীরের জাতি, একটা ঘোড়ার জন্য বিচলিত হওয়া কি রিসালদার গুলমুখ সিংএর সাজে?

পাঞ্জাবী বীরের জাতি কিন্তু সেদিন সমস্ত হারীয়া গ্রামে কারুর চোখ শুষ্ক ছিল না।

ভ্রম সংশোধনঃ—চৈত্র সংখ্যা রামধনুতে 'অভিযাত্রীর পত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে অনবধানতার জন্য কয়েকটী ভুল ছাপা হইয়াছে। পৃঃ ২৯৭—নীচের দিক্ হইতে ৩য় লাইনে 'আফজল করীম' স্থলে 'আবদুল করীম' হইবে। পৃঃ ২৯৮—উপর হইতে ১৮ ও ২১ লাইনে 'মানুয়া' স্থলে 'থানুয়া' হইবে।

বাদুড় কেন নিশাচর

শ্রীরাধারাণী দেবী

পাখীদের সঙ্গে পশুদের ভীষণ লড়াই বেধে গেছে। কি হয় বলা যায় না। তবে পশুদের গায়ে জোর বেশী, পাখীরা পেরে উঠবে কি?

বনের মধ্যে পশুরাজ সিংহ সভা বসিয়েছেন, কি ভাবে যুদ্ধ করতে হবে সে সম্বন্ধে পরামর্শ করবেন। বনে যত রকম পশু আছে সবাই জড় হয়েছে। সিংহ হাঁকলেন, 'সবাই হাজির তো?' শেয়াল বল্লে, 'আজ্ঞে মহারাজ, বাদুড় ভায়াকে তো দেখছি না! সে কি তবে পাখীদের দলে যোগ দিল?' সিংহ ক্ষেপে উঠে বল্লেন, 'বটে?' আচ্ছা, দেখা যাবে।' বলতে বলতেই বাদুড় এসে হাজির। সব কথা শুনে সে বল্লে, 'মহারাজ, জেনে শুনে আমাকে এত বড় অপমানটা করলেন? আমি পাখীর দলে যাব কোন্ দুঃখে? আমি কি ডিম পাড়ি, না আমাদের বাচ্চারা মায়ের দুধ খায় না?' সবাই সায় দিল, 'তা বটে তা বটে, বাদুড় ভায়া তো স্তন্যপায়ী, তবে ও আবার পাখী হবে কি করে?' বাদুড় পশুদের দলেই রয়ে গেল।

কিন্তু পাখীরা ভীষণ জাত। হাওয়ার বুকে ভেসে বেড়ায়, অন্তরীক্ষে থেকে আক্রমণ করে। তাদের নাগাল পাওয়াই দায়, তাদের সঙ্গে লড়াই করবে কি ক'রে? পশুরা ক্রমেই কাবু হ'য়ে পড়ল।

বাদুড় দেখল, ব্যাপার তো ভাল নয়। পরাজিতের দলে থেকে লাভ কি? ভেবে-চিন্তে সে পাখীদের রাজার কাছে গিয়ে হাজির হ'ল—বল্লে, 'দেখুন মহারাজ, দুষ্টু পশুগুলো আমাকে ওদের দলে আটকে রেখেছিল। কিন্তু আমি পশু হ'তে যাব কেন—আমি তো পাখী। পশুরা কি কেউ আমার মত উড়তে পারে? উড়ুক তো!'

পক্ষিরাজ মৃদু মৃদু হাসলেন। বাদুড় পাখীদের দলে এসে যোগ দিল।

কিছু দিন পরে দুই দলে সন্ধি হয়ে গেল।

আজ আবার বনের মধ্যে সভা বসেছে। এবারে পশুদের সঙ্গে পাখীরাও এসে সভায় যোগ দিয়েছে। বাদুড়কে ডেকে পাঠান হ'ল।

পশুরাজ হেঁকে বল্লেন, 'কিরে, তুই পশু না পাখী?' পক্ষিরাজ বল্লেন, 'কই হে, বল না তুমি কাদের দলের?' বাদুড় মাথা নীচু ক'রে রইল।

সবাই মিলে তখন এই না-পশু না-পাখী অদ্ভুত জীবকে ঘাড় ধরে সভা থেকে বার করে দিল।

সেই থেকে বাদুড় দিনের বেলা কাউকে মুখ দেখাতে চায় না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

আজকাল যুদ্ধের খবরের মধ্যে তোমরা লেফ্‌টেন্যান্ট, কম্যাণ্ডার, ক্যাপটেন্ প্রভৃতি হরেক রকম নামের উল্লেখ পাও। সৈন্যবিভাগে বিভিন্ন পদের অফিসারদের এই সব নামে অভিহিত করা হয় এও হয়ত জান। কিন্তু কোন্ পদটা কার উপরে তা জান কি? এখানে বৃটীশ নৌবিভাগের প্রধান পদগুলি পর পর দেওয়া গেল: (১) য়্যাড্‌মিরাল্ অব্ দি ফ্লীট্ (২) য়্যাড্‌মিরাল্ (৩) ভাইস্ য়্যাড্‌মিরাল্ (৪) রিয়ার য়্যাড্‌মিরাল (৫) কমোডোর (৬) ক্যাপ্‌টেন্ (৭) কম্যাণ্ডার (৮) সিনিয়র লেফ্‌টেন্যান্ট্ (৯) লেফ্‌টেন্যান্ট্ (১০) সাব্ লেফ্‌টেন্যান্ট্।

* * * *

টোম্যাটোকে (চলতি কথায় কেউ কেউ যাকে বলেন বিলিতী বেগুন) আজকাল খুব উপকারী খাদ্য ব'লে সবাই জানে। জিনিষটায় আছে প্রচুর ভিটামিন্ এবং সিদ্ধ করলেও নাকি তার সবটা নষ্ট হয় না। কিন্তু টোম্যাটো সম্বন্ধে আগে লোকের এমন ধারণা ছিল না। কয়েক শ' বছর আগে লোকে একে অত্যন্ত বিষাক্ত ফল বলেই জান্‌ত। সে আমলের টোম্যাটো দেখতেও এত বড় বা সুপুষ্ট হ'ত না। উনবিংশ শতাব্দী থেকে লোকে টোম্যাটো খেতে শেখে এবং চেষ্টা ক'রে ক'রে এর চেহারার উন্নতি করে। নামে 'বিলিতী' বেগুন হলেও টোম্যাটোর আসল বাড়ী কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা।

* * * *

শব্দ ব্যাপারটা আসলে বাতাসের একটা কাঁপুনি তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। বাতাসের এই কাঁপুনি যদি তেমন জোরে হয় তবে কি তা দিয়ে জানালার কাচ বা কাচের গ্লাস ভাঙ্গা যায়? যায়। বজ্রাঘাতের শব্দে জানালার শার্শি ভেঙ্গে গেল এ রকম অনেক শোনা গেছে। আজকালকার যুদ্ধের বোমা বিস্ফোরণের শব্দে তো দালান-বাড়ীও ভেঙ্গে পড়তে দেখা গেছে। তেমন তেমন ওস্তাদ্ গাইয়েরা নাকি গানের কাঁপুনি দিয়ে পাৎলা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলতে পারেন।

* * * *

বুড়ো হ'লে লোকের চামড়া কুঁচকে যায় এবং মুখে, কপালে ও শরীরের অন্যান্য অংশে দেখা দেয় লম্বা লম্বা রেখা। এর কারণ শোন। আমাদের চামড়ার নীচেই আছে একটা চর্ব্বির আস্তরণ, আর আছে মাংসপেশী। বয়স হ'লে এই মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে পড়ে আর চর্ব্বিও যায় শুকিয়ে। কাজেই তার ওপরকার চামড়া আর আগেকার মত টান টান হয়ে থাকতে পারে না—তাকেও সংকুচিত হয়ে যেতে হয়। ডাক্তারেরা বলেন নিয়মিত দলাই মলাই করে এবং চামড়াকে তাজা রাখে এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করলে এই কুঞ্চন-রেখাকে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যায়।

সন্দেশ

২৫শে বৈশাখ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তিথি—বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় পুণ্য-তিথি। এবারেও এই তারিখটি উপলক্ষ্য করে নানাস্থানে কবির জন্মোৎসব হয়ে গেছে। এর মধ্যে 'কিশোর বাংলা', 'কৈশোরক', 'পাঠশালা', 'রংমশাল', মৌচাক', 'রামধনু' প্রভৃতি কিশোর-পত্রিকা ও কয়েকটি কিশোর-প্রতিষ্ঠানের মিলিত উদ্যোগে যে উৎসব হয়েছিল তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মা গান্ধী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সম্প্রতি তাঁকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজীকে অনেকেই বর্ত্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব বলে মনে করেন। সারা দেশ তাঁর আরোগ্য-সংবাদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করবে।

কলিকাতার হকি মরশুম শেষ হয়েছে। এবার প্রথম বিভাগে লীগ্ বিজয়ী হয়েছে পোর্ট কমিশনার্স্ দল ও বেইটন কাপ্ বিজয়ী হয়েছে বি. এন. আর দল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। গো (গ্লাস্গো) ২। মেদিনীপুর ৩। রাঙ্গামাটী।

উত্তরদাতাদের নাম

শান্তি সেন, শোভা, নীলিমা, নণ্টু, বিশু (খুলনা); চৈতন, বুদো, বইনা, শুকু, গীতা ও গৌর বন্দ্যোঃ (বালি); অহিভূষণ চৌধুরী (রাজসাহী); উৎপলা সরকার (পুরুলিয়া); মনীষা সেন, সুভাষ, শান্থু, নীপা, ভেনি, মেনি, শঙ্কর (খুলনা); নারায়ণদাস মুখার্জ্জি, গায়ত্রী, সাবিত্রী, সতী দেবী, ধূর্জ্জটী মুখার্জ্জি (মুন্সীগঞ্জ); বিশ্বজিৎ রায় (শান্তিনিকেতন); গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভাগলপুর); অর্চ্চনা, গায়ত্রী, গীতা, উমা, টুলু, খোকন (নীলফামারী); সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); অতীন্দ্রনাথ দত্ত ও ধ্রুব দত্ত (তেজপুর); বিজলী ঘোষ (মহেশতলা); অংশুরঞ্জন সেন (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, বি এ. বি.টি

এক গয়লার ৮১টি গরু ছিল। প্রত্যেক গরুর গায়ে সে ১ হইতে ৮১ পর্য্যন্ত ক্রমিক নম্বর আঁটিয়া দিয়াছিল, আর এমনি মজা, যে গরুর গায়ে যত নম্বর আঁটা ছিল সে গরুটি ঠিক তত সের দুধ দিত। গয়লার ৯টি ছেলে। মৃত্যুকালে গয়লা বড় ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, "আমি চল্লাম, তোমরা ৯ ভাই গরুগুলিকে সমান ভাগ করে নেবে, এবং শুধু তাই নয়, এমন ভাবে ভাগ করবে যে প্রত্যেকে এমন নম্বরের গরু পাবে যাতে সকলে সমান পরিমাণ দুধ পায়।"

বল দেখি গরুগুলিকে কি ভাবে ৯ ভাইএর মধ্যে ভাগ করা হইবে?

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸৹

আকাশের গল্প

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট. দাম ৷৷৵৹

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—৸৹

ক্ষিতীন্দ্র ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

গল্পসল্প...।৹ **ছুটীর গল্প**...।৹

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প

মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির" কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ৷৷৵৹

শ্রীলীলা মজুমদার এম্.এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সরস মজাদার হাসির গল্প ... ৷৷৵৹

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৸৹

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৷৷৵৹

কলকাতার হালচাল ... ১৵৹

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

ধূমকেতু (উপন্যাস) ... ৸৹

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ ... ১।৹

সোনার হরিণ ... ১।৹

হাস্য ও রহস্য (গল্প) ... ৸৹

নূতন পুরাণ ... ৸৹

চায়ের ধোঁয়া ... ৷৷৵৹

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৸৹

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।৹

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু ... ৸৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

Regd. No. C—1641

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা

চাই-ই...

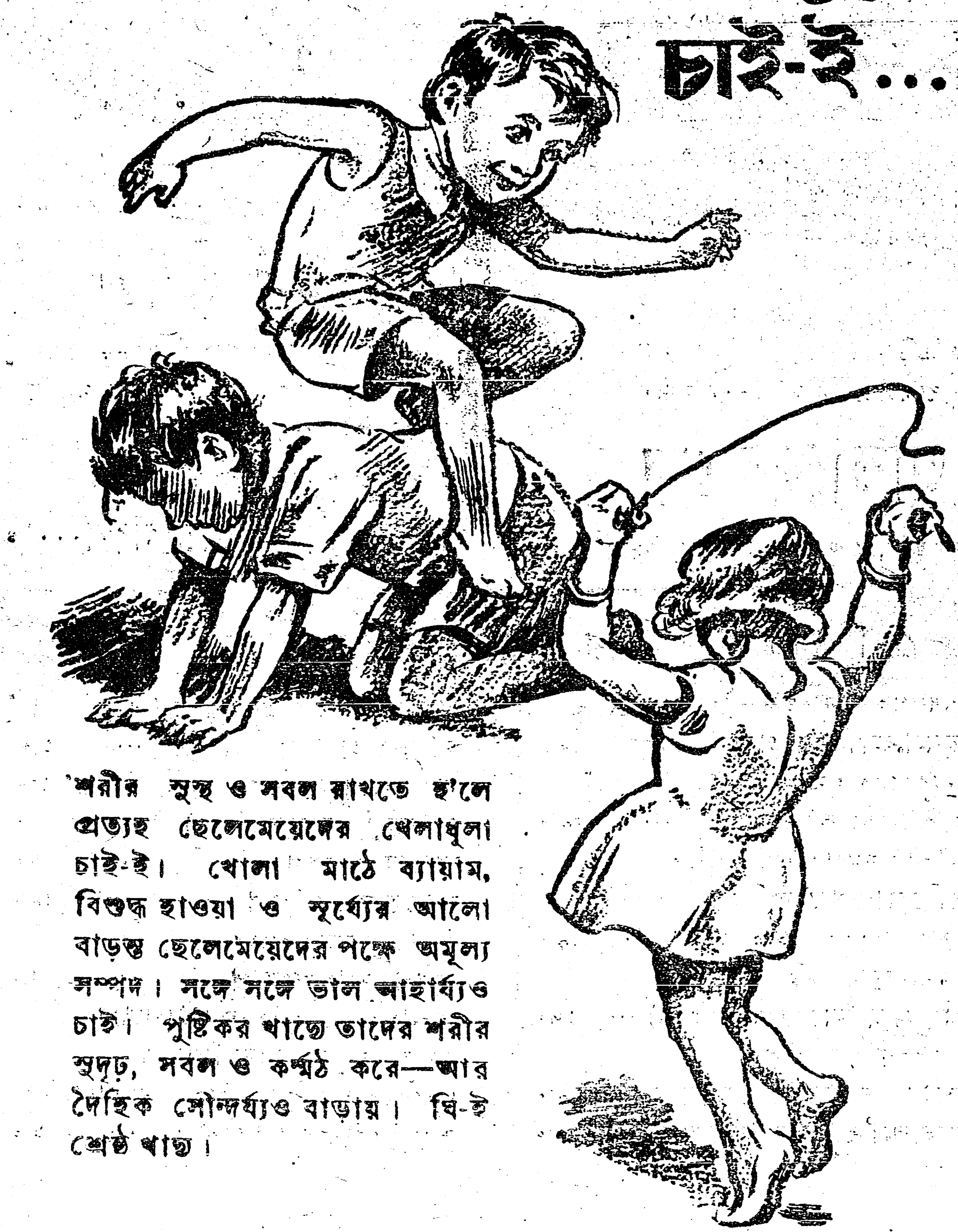

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সঙ্গে সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—আর দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়। ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

লক্ষ্মী ঘি

Regd. No. C—1641

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৭শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
আষাঢ়,
১৩৫১

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক
১৸৵০
প্রতি সংখ্যা

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭ টী ঔষধ | মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৲ টাকা | মূল্য ৮৲ টাকা

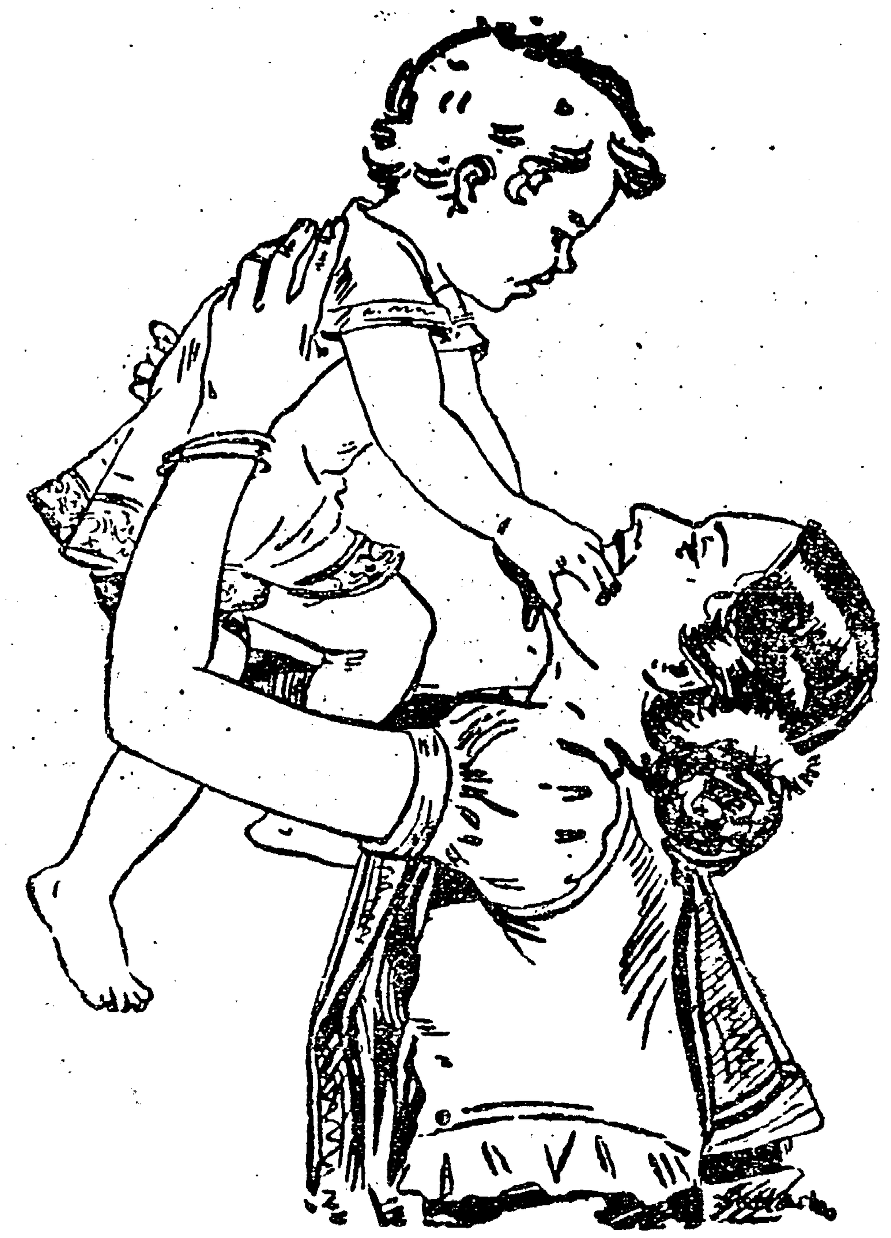

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে

=রোমহর্ষণ শিহরণ পরিপূর্ণ ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী=

ছদ্মনামে স্বপ্রকাশ

—সব্যসাচী বিরচিত—

প্রথম গ্রন্থ : সুখোশের অন্তরালে এক টাকা

দ্বিতীয় গ্রন্থ : - - মৃত্যুদূত - - এক টাকা

তৃতীয় গ্রন্থ : - ব্লাড্‌ হাউণ্ড - এক টাকা

চতুর্থ গ্রন্থ : - কালের কবলে - (যন্ত্রস্থ)

প্রতি মাসের ১লা তারিখে একখানি করিয়া বাহির হয়।

= বিশ্বপ্রতিভা সিরিজের = বাহির হইল। বাহির হইল ॥

নূতন গ্রন্থ

বনদর্পী হিটলার (যোগেশচন্দ্র) ১৷৹

যাদুকর মার্কনী (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ) ১৷৹

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস্ (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন

মূল্য—পাঁচ সিকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর ঃ ৯ ঃ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৭শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৫১ { ৩য় সংখ্যা

বর্ষার গান

৺ফাল্গুনী রায়

সরবৎ! সরবৎ! বৈশাখে আই ঢাই,
বই থাকে বহু দূরে, দিল করে যাই যাই।
তেষ্টায় শেষটায় প্রাণ আসে কণ্ঠায়,
চুপচাপ ছটফট ঘুপটির কোণটায়।
নাই মেঘ—সব ফাঁকা জ্যৈষ্ঠের গগনের,
ধুধু হাওয়া হল্‌কায়—বাণ যেন আগুনের!
চিৎকার কাৎরানো মাঠ ঘাট প্রান্তরে,
দাও দাও সুধা ধারা এই ধরা শ্রান্তরে।

আষাঢ়ের আকাশের পেয়ালায় ভর ভর,
বিষ্টির বেহালার সুর ঝরে ঝর ঝর।
কেয়া গায় আয় আয় আয় কবি খেয়ালী,
শেয়ালায় জ্বলে যায় সবুজের দেয়ালি।
ঘাসেদের দেয়ালায় বনতল উজ্জ্বল,
তালপাতা পিয়ালের বাদলায় উচ্ছল।
হাসি হাসি হাসিতেই দিক্‌দেশ ভেসেছে,
সাপলার হাসি দেখে সাপরাও হেসেছে।

ধরণীবাবু কি লোকটাকে এতই ঘৃণা করতেন যে মাথাটা কেটে ফেলবার পরও রাগ সামলাতে না পেরে সেই কাটা মাথার ওপরেই বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বার বার আঘাত করেছেন ?

শিউরে উঠে খড়্গ বাহাদুর বললেন, কি ভয়ানক !

নিতান্ত মুখচোরা ফণী রায় চুপটি ক'রে পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাঃ সেনের কথা শুনছিলেন, এইবার বেখাপ্পা ভাবে বলে উঠলেন, আপনাদের আলাপে বাধা দিতে হ'ল ব'লে আমি দুঃখিত। আমাকে ওঁরা খবরটা আপনাদের দিতে বললেন।

বিস্মিত হয়ে ডাঃ সেন ফণী রায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন খবর ?

ফণী রায় বললেন, আজ্ঞে হাঁ, আরো একটা খুন হয়েছে।

শুনে' ডাঃ সেন আর খড়্গ বাহাদুর দু'জনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন ; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে এক গোছা রডোডেনড্রনের দিকে উদাসীনভাবে চেয়ে ফণী রায় বললেন, কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এও সেই মাথা কাটার ব্যাপার। মাথাটা পাওয়া গেছে ধরণীবাবুর পালিয়ে যাবার পথের ধারেই ; সুতরাং ওঁরা মনে করছেন—

খড়্গ বাহাদুর ব'লে উঠলেন, কি সর্ব্বনাশ ! মিঃ ব্যানার্জ্জীর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

ফণী রায় বললেন, ওঁরা আপনাদেরকে লাইব্রেরী ঘরে ডাকছেন মাথাটা দেখবার জন্য।

তিন জনে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে দেখলেন, একটা টেবিলের ওপরে বাগানের মৃতদেহটা একেবারে অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, আর তার পাশেই রয়েছে আর একটা মাথা। ফণী রায় এগিয়ে গিয়ে চোখ মিট্‌মিটিয়ে দ্বিতীয় মাথাটা বেশ করে দেখলেন ;—একেবারে সাদা চুলের পাকা মাথা, ওপর থেকে পাথর বাঁধা পথের ওপরে পড়ে একটু থেঁৎলে গেছে, রংটা ফর্সাই বলতে হবে, বেশ খাড়া নাক।

ডাঃ লাহিড়ী বললেন, ধরণীবাবুর দু'নম্বর মানুষ জবাইয়ের কথা শুনেছেন বোধ হয় আপনারা ?

ফণী রায় তখন পর্য্যন্ত সাদা চুলের মাথাটাকে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন, চোখ না তুলেই বললেন, আমার মনে হয় এ মাথাটাও ধরণীবাবুই কেটেছেন।

ডাঃ লাহিড়ী জানালেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ওই কুক্‌রিখানা দিয়েই কেটেছেন। সায় দিয়ে ফণী রায় বললেন, তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু তবু ভাবছি সত্যিই ধরণীবাবু এ মাথাটা কাটতে পারতেন কিনা !

ভুরু কুঁচকিয়ে ডাঃ সেন জিজ্ঞাসা করলেন, কেন পারতেন না ?

মিটমিট ক'রে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে ফণী রায় বললেন, নিজের মাথা কেউ নিজে এ ভাবে কাটতে পারে ডাক্তার ? আমি তো জানি নে'।

খড়্গ বাহাদুরের মনে হ'ল গোটা দুনিয়াটা পাগল হ'য়ে তাঁর কানের কাছে হৈ-চৈ করছে।

ডাঃ সেন এগিয়ে এসে দুই হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ফণী রায়ের দিকে চাইলেন।

ধীর শান্ত কণ্ঠে ফণী রায় বললেন, মাথাটা ধরণীবাবুর। তাঁর বাঁ কানের গোড়ায় ঠিক এমনি কাটা দাগ ছিল।

ডাঃ লাহিড়ী এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফণী রায়কে লক্ষ্য করছিলেন, এইবার তীব্রকণ্ঠে বলে' উঠলেন, ধরণীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথাই তুমি জানো দেখছি ঠাকুর !

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ফণী রায় জবাব দিলেন, হাঁ, কিছু কিছু জানি। কয়েক হপ্তা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। আমাদের আশ্রমে তিনি যোগ দেবেন বলেছিলেন।

প্রচণ্ড নাস্তিক ডাঃ লাহিড়ী চাপা আক্রোশে যেন ফেটে পড়লেন ; ফণী রায়ের সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে দুই হাতে মুঠো পাকিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, চমৎকার। তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকাও বোধ করি তোমাদের মত নির্ব্বোধ ভগবান্-পাগলা কতকগুলো অপোগণ্ডের সেবায় লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

নির্ব্বোধের মতই ফণী রায় জবাব দিলেন, খুব সম্ভব তাই।

ভয়ঙ্কর হাসি হেসে ডাঃ লাহিড়ী বললেন, তা হ'লে অনেক কথাই তুমি তাঁর সম্বন্ধে জানো, নয় ? তাঁর জীবন সম্বন্ধে এবং তাঁর—

বাধা দিয়ে খড়্গ বাহাদুর বললেন, এ সব কি বলছেন মিঃ লাহিড়ী ! আপনি শান্ত হোন। মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত ক'রে ডাঃ লাহিড়ী বললেন, বন্ধুগণ ! আপনারা কথা দিয়েছেন যে আজ রাতের মত আপনারা এখানে থাকবেন। মাধব আপনাদের কাছে রইল ; যখন যা দরকার, ওকে জানাবেন। আমি থানায় একটা ফোন করে দি'। এই মুহূর্ত্তে পুলিশের আসা দরকার।

ডাঃ লাহিড়ী ব্যস্ত হয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন। (ক্রমশঃ)

অর্থের হানি হানি নাহি মানি, কিছুই আসিয়া যায় না তাতে ;
কাল ছিল তার, আজিকে আমার, পর্শু যাবে তা অন্য হাতে।
সুনাম সে মোর হৃদয়ের ধন—যতনে সে ধন আগুলি' রাখি—
কলঙ্ক তায় যদি লাগে হায় দারিদ্র্যের আর কী রহে বাকী ?

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

দশম কাণ্ড

কিছুক্ষণ শশধরের মুখের পানে তাকিয়ে থাকার পর সোলার কাপড় কাটার ধরণে শূন্যে বার কয়েক কাঁচিটা কুচ্ কচ্ করে নিল, তার পর সশব্দে কাঁচিখানা টেবিলের উপর রেখে বললে— কই দেখি ?

—কী ?—শশধর জিজ্ঞেস করলো।

—সেই পোষ্টকার্ডখানা, যেটা ছোকরার দল খুলে এনেছে।

শশধর পোষ্টকার্ডখানি বের করে দিলে। কার্ডখানিতে আগাগোড়া চিঠি লেখা। অনেকক্ষণ ধরে সোলার সেটাকে নিরীক্ষণ করে দেখলো, তারপর সহসা শশধরের পানে ফিরে জিজ্ঞেস করলো—কি এতে লেখা আছে পড়েছ ?

—না।

—সে তো পড়বে না, না পড়েই যারা পণ্ডিত হয় তুমি তাদেরই একজন। শশা নামটা আমি ঠিকই দিয়েছি, উপরটা খুবই লম্বা চওড়া, আর ভিতরটা সবই জলো।

শশধর গুম্ হয়ে উঠলো।

সোলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না, আপন মনেই বলে চল্‌লো—খালি কবিতা লিখলেই হয় না, চিঠিখানা হাতে এসে পড়লো, তখনই একবার পড়ে দেখা উচিত ছিল। তা তুমি না পড়ে এক প্রকার ভালই করেছ, যা ভীতু লোক তুমি! ব্যাটা আমাকে শাসিয়ে চিঠি লিখেছে! আরে মিষ্টার সোলার সে চীজ নয়! পড়ি শোন, কেমন মজার চিঠি ঃ

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, পুলিশই সব নয়। পুলিশের চোখকে হয়তো আপনি ফাঁকী দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে ফাঁকী দেওয়া তত সহজ নয়। যে টাকাটা পাবার জন্য আপনারা চেষ্টা করছেন, সে টাকা আপনারা পাবেন না পাব আমরা। তার কারণ জন-বলে ও মনোবলে আমরা আপনাদের চেয়ে বেশী শক্তিমান্। প্রমাণ স্বরূপ আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে কার্ডবোর্ডে আঁকা আসল

ছবিখানি আমরা নিয়ে যাচ্ছি, এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'লে আমাদের শক্তিমত্তার আরো পরিচয় আপনারা পাবেন। এ সব দেখেও যদি আমাদের শক্তি সম্পর্কে আপনাদের সন্দেহ হয় এবং আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবার ইচ্ছা থাকে তা হ'লে প্রস্তুত হয়েই নামবেন, কারণ যুদ্ধকালে শত্রুর দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করাই নীতি, এবং আপনাদের দুর্ব্বলতাও আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। কাজেই সাবধান, স্বেচ্ছায় বিপদ্ ডেকে আনার আগে ভালো করে আগু-পিছু ভেবে অগ্রসর হবেন,। ইতি—

বিনীত ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী দল।

শুনতে শুনতে শশধরের মুখের মেঘালুতা কেটে গেল, টেবিলের উপর চাপড় মেরে সে বললে—সত্যেনের চালাকী! আমি বরাবর নজর রেখেছিলাম, আর বলছে কিনা…

—সে যাই হোক—সোলার গম্ভীরমুখে বললে—একটু সাবধানে চলতে ক্ষতি কি ?

শশধরের মুখের উপর আবার কুয়াসা ঘনিয়ে এলো।

একাদশ কাণ্ড

দোতালার বারান্দায় বসে বসে সত্যেন ভাবছিল। ভাবছিল সে কত একা। সংসারে আপনার জন বলতে তার কেউ নেই। পয়সা থাকলে যদি-বা সেদিকটা পুষিয়ে যেত, তাও নেই। পিতা রেখে গেছেন একখানি বাড়ী অর একখানি গাড়ী। কিন্তু ব্যাঙ্কে যা আছে তাতে সেই বাড়ীর ট্যাক্স আর গাড়ীর পেট্রোল জোগান যাবে না। এই যুদ্ধের বাজারে যদি বা কোন রকমে সে সমস্যা সমাধান করা চলতো, তার উপর আছে এক অশান্তিকর উপসর্গ—অজ্ঞাত শত্রুর গুণ্ডামি।

সত্যেন ভাবে। নিজেকে আজ বড় একা, একান্ত নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়। লেকের কিনারে ওই বড় আম গাছটির মত নিজের পরিবেশের মধ্যে সে একক। অনিবার্য্য বিকাশের বেগে আকাশের পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শাখাগুলি দুলে দুলে বাতাসকে গান শোনায়, আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টে বোধ হয় কিছু নড়ে চড়ে সচল হবার কামনা করে। সবুজ পাতাগুলি কচি কচি চোখ মেলে আকাশের পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু নির্ম্মম বিধি কোনদিনই গাছকে নিশ্চল পরিবেশ থেকে রেহাই দেয় না। কিশোর কামনার ব্যর্থতায় কিশলয়ের কচি চোখ ম্লান হয়ে আসে, তথাপি বিধান ঢিলা হয় না, নিঃসঙ্গতা ঘোচে না।

—এক মুঠো ভাত দিবি মা ?

সত্যেনের চিন্তাধারায় ছেদ নামে। চাঁদনী রাত, আম গাছ, লেকের জল, নিঃসঙ্গতা সব ছাপিয়ে

ওঠে ক্ষুধাতুরের আর্ত্তনাদ। সেই সৌধমালার সমৃদ্ধির দ্বারে দ্বারে নিঃস্ব মানুষ শব্দাঘাত করে ফিরছে—এঁকমুঠো ভাত দিবি মা!

সত্যেন নীচের পানে তাকায়। এক নারী কোলে একটি শিশু নিয়ে এগিয়ে চলেছে, পিছনে আরো দুটি ছেলে। ছেলেগুলি উলঙ্গ, মাকেও নির্বেশী বলা চলে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে ওই কঙ্কালজীর্ণ মানুষগুলি এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল সত্যেন তাই ভাবে। হঠাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত কোন্ ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে কলকাতার বিলাসী আকাশ তারা শব্দায়িত করে তুলেছে। স্থির নাগরিক জীবন চঞ্চল হয়ে উঠেছে এদের পদক্ষেপে।

দরজার সামনে এসে তারা দাঁড়ালো।

দরোয়ান বললে—ফ্যান নিবি? ফ্যান?

—শুধু ফ্যান আর কত খাব বাবু, হাত-পা ফুলে গেছে। একমুঠো ভাত দাও না বাবু?

—কত দেব? একজনকে দিলে তো হবে না, তোরা চারজন আছিস্।

মেয়েটী ঝুপ্ করে বসে পড়লো, বললে—যা তোমাদের দয়া হবে দাও, হেঁটে হেঁটে আর পারি না, কাল থেকে জ্বর হয়েছে···

ছোট একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে—দাও না বাবু, চাট্টি ভাত, অনেক দিন ভাত খাই নি···

সত্যেন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলো না, নীচে নেমে এল। বললে—ঠাকুর, আমি আজ আর খাব না, আমার ভাতগুলো ওদের দিয়ে দাও—

—আজ সকালেও তো···

—তুমি দাও না ঠাকুর, আমি বলছি···

ঠাকুর আর প্রতিবাদ তুলতে সাহস পেল না, গজ্‌গজ্ করতে করতে থালা ভরা ভাত এনে মেয়েটীর মাল্‌সায় ঢেলে দিলে।

—একটু নুন্, বাবু?—ছেলেটী চাইলে।

—নুন্ কেন, তোদের তরকারী দিচ্ছি—ঠাকুর!···

ঠাকুর তাদেরকে তরকারী দিচ্ছে এমন সময় একটি লোক এসে দাঁড়ালো। ভিখারীদের পানে একবার তাকিয়ে বলে উঠলো—এদের খেতে দিস্ নে দেবেশ, দিস্ নে। এদের লুট করে খেতে বলে দে, যারা এদ্দিন এদের লুটে খেয়েছে আজ এরা তাদের লুটে খাক্···

হঠাৎ সত্যেনের পানে চোখ পড়তেই লোকটী থম্‌কে গেল, বললে—আমি তোমাকে দেবেশ ভেবেছিলাম। দেবেশ কোথায়?

—বাবা? বাবা মারা গেছেন।

—মারা গেছেন হঠাৎ? কি হয়েছিল?

সত্যেন সংক্ষেপে বললে।

—তুমিই তার একমাত্র পুত্র সত্যেন? বেশ বেশ! তা একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার পিতৃবন্ধু শৈলেন বাঁড়ুয্যেদের তুমি চেন?

—যদ্দূর জানি, ভারতরক্ষা আইনে তিনি জেলে আছেন।

—তা আমি জানি, কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা এখন কোথায় আছে জান?

—না। তাদের কারুর সাথে আমার কোন পরিচয় নেই।

লোকটি কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভেবে নিলে, তার পর বললে—তুমি শশধর সেনকে জান? বই-টই লেখে?

—এই প্রথম শুনলাম।

—আচ্ছা, রবি ঘোষকে চেন?

—খুব ভালো চিনি। বাবা মারা যাবার ক'দিন পরে তিনি এখানে এসেছিলেন; এখান থেকে একদল গুণ্ডা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়, তারপর···

লোকটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে সত্যেনের ধারণা হলো আগন্তুক সম্ভবতঃ কোন বিশিষ্ট গোয়েন্দা ছদ্মবেশে বেরিয়েছে। কৌতূহলী মন নিয়ে শেষে সে-ই প্রশ্ন করে বসলো—আপনার পরিচয় তো পেলাম না।

—প্রয়োজন নেই—ব'লে ক্ষিপ্রপদে লোকটি পথে অগ্রসর হোল। (ক্রমশঃ)

অভিযাত্রীর পত্র

শ্রীবিশ্বপতি দাশগুপ্ত

রাজপুতানা থেকে বোম্বাই, বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ। বোম্বাই ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় বন্দর—উপকূলের কাছে একটা ছোট দ্বীপে এর অবস্থান। বাঁধ দিয়ে প্রধান ভূ-ভাগের সঙ্গে একে সংযুক্ত করা হয়েছে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ দু'টিই আধুনিক নগর—এবং বেশ জমকালো। বৃটীশ রাজত্বের সাথে সাথেই এরা গড়ে উঠেছে। বোম্বাইএর বড় বড় ইমারত, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশন, সেক্রেটারিয়েট, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ছাড়া আমার ভাল লেগেছিল মালাবার পর্ব্বতের ওপর থেকে ব্যাক্ বে উপসাগরের দৃশ্য। মাদ্রাজে তেমনি ভাল লেগেছিল প্রধান রাস্তা মাউণ্ট রোড

আর সমুদ্রতীরে সেন্ট জর্জ্জ দুর্গ। এই দুর্গ নিয়ে ফরাসী ও ইংরাজে অনেক লড়াই হয়ে গেছে। ইংরাজেরাই এ দুর্গ তৈরী করেছিল, পরে ফরাসীরা দখল করে। কিন্তু ফরাসীরা তা ধরে রাখতে পারে নি, শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজের হাতেই আবার তা চলে আসে। দুর্গটির সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে। ভারতবর্ষের প্রথম তৈরী গীর্জ্জা সেন্ট মেরীজ্ চার্চ্চ ও এই দুর্গের মধ্যেই।

মাদ্রাজে দু'টি ব্রেক্ ওয়াটার—যার কথা করাচী ভ্রমণের সময়ে তোমাদের বলেছি। মাদ্রাজের 'য়্যাকোয়েরিয়াম্' বা সামুদ্রিক জীবের পশুশালাও একটা দেখবার জিনিষ। তা ছাড়া এখানকার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনটি নাম করার মত—কারণ ভারতের মধ্যে এটিই প্রাচীনতম কর্পোরেশন্,—সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা ২য় জেম্‌সের সনন্দ অনুযায়ী স্থাপিত।

মাদ্রাজ থেকে এলাম উট্‌কামুণ্ডে। নীলগিরি পর্ব্বতের প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচু জায়গায় এর অবস্থান। বিদেশীয়া উট্‌কামুণ্ডকে 'পাহাড়ী সহরদের রাণী' (কুইন্ অব হিল্ ষ্টেশন্‌স) ও 'বন ও ফুলের স্বর্গপুরী' (প্যারাডাইস্ অব্ ফরেষ্টস্ এণ্ড ফ্লাওয়ারস্) বলে থাকেন। এখানকার আবহাওয়া অতি স্বাস্থ্যকর ও চমৎকার। এখানে দিন কতক থাকতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু সম্মুখে আমার পড়ে আছে বিস্তীর্ণ ধরিত্রীর বুক। তার নূতনত্ব আমায় পাগল করে তুলেছিল। বসে থাকবার মত অবকাশ আমার কোথায়? আবার মাদ্রাজে এসে গোছগাছ করে গাড়ীতে উঠলাম।

কয়েকটা ছোট ষ্টেশন পেরিয়ে পৌছলাম চিংলেপুট জংশনে। পথের সহযাত্রী এক বৃদ্ধের অনুরোধে দু' দিন চিংলেপুটে কাটিয়ে তাঁর সাথে গেলাম সাত মাইল দূরের ত্রিকালিকুন্দ্রম ও মহাবল্লীপুরম্ দেখতে! এ দু' জায়গার প্রধান দেখবার জিনিষ পাহাড় কেটে তৈরী করা মন্দির। জিনিষটী বোধ হয় ঠিক বুঝলে না। একটী ক্ষুদ্র পাহাড়কে কেটে মন্দির করা হয়েছে। অর্থাৎ পাহাড় কেটে খোদাই ক'রে ঐ পাহাড়কেই রূপান্তরিত করা হয়েছে এক মন্দিরে। আশ্চর্য্য! এর শিল্পচাতুর্য্য দেখে অবাক্ হ'তে হয়।

এ ছাড়া মহাবল্লীপুরমে আছে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা নানা পৌরাণিক কাহিনী। পাশাপাশি খোদাই ক'রে এঁকে দেওয়া হয়েছে বহু পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র। কোথাও আঁকা রয়েছে অর্জ্জুন ঊর্দ্ধে হাত তুলে ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কোথাও হরপার্ব্বতী আসছেন অর্জ্জুনের ধ্যান ভঙ্গ করতে। আবার কোথাও চলছে কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ। এ সব পৌরাণিক কাহিনী যাঁরা এঁকেছিলেন তাঁদের চিহ্ন পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে, কিন্তু তাঁদের অসাধারণ শিল্পপ্রতিভা তাঁদের করে রেখেছে অমর।

দু' একদিন পরেই ট্রেন আমাকে নিয়ে বিপুল বেগে ছুটে চল্লো তাঞ্জোর অভিমুখে। পথে পড়্লো চিদাম্বরাম্ ও কুম্ভকোণাম ষ্টেশন। এ দু'টী জায়গা দক্ষিণ ভারতের বড় তীর্থস্থান।

কুম্ভকোণাম্‌কে "মন্দির-নগরী" বলা হয়। ব্রহদেশ্বর মন্দির তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল একাদশ শতাব্দীতে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চোল বংশীয় একজন রাজা। মন্দিরের গঠননৈপুণ্য ও শিল্পচাতুর্য্য অতি সুন্দর। চারদিক্ প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে ঘেরা। ফটক বা গোপুরম্‌গুলি খুব উঁচু। মাঝখানের গম্বুজটী অন্যগুলিকে ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধে মাথা তুলে আছে। আশ্চর্য্য তার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য! নগরের মাঝখানে দুর্গের উপর রাজপ্রাসাদ।

তাঞ্জোর থেকে এলাম ত্রিচিনোপল্লী। এখান থেকে শ্রীরঙ্গম্ তিন মাইল দূরে। এখানে একটী বিখ্যাত বৈষ্ণব মন্দির আছে। সেটি দ্রাবিড়ী শিল্পকলার একটী সুন্দর নিদর্শন।

জম্বুগেশ্বরম্‌ও ত্রিচিনোপল্লী হ'তে মাইল তিনেক দূরে। জম্বুগেশ্বরম্ একটী শৈব তীর্থস্থান। এর মন্দিরের স্থাপত্য ও শিল্পসৌন্দর্য্য শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণব মন্দির থেকেও সুন্দর। এটীও খুব প্রাচীন।

ত্রিচিনোপল্লী হ'তে চ'লে এলাম মাদুরায়। এখানকার মীনাক্ষি-মন্দিরের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। অনেক বিদেশী ভ্রমণকারী (যেমন বিখ্যাত সাহিত্যিক আলডাস্ হাক্সলি) এর ভাস্কর্য্যকে তাজমহলের চেয়েও ওপরে স্থান দেন। মন্দিরটী পাথরের তৈরী। এর কারুকার্য্য অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। মীনাক্ষি-মন্দিরের ক্ষোদিত লিপি দেখে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেকাংশ রচিত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মাত্রের কাছেই এই মীনাক্ষি-মন্দিরের লিপিগুলি অতি মূল্যবান্ সামগ্রী। মীনাক্ষি-মন্দির ছাড়া তিরুমালাই নায়েকের প্রাসাদ ও টেপাকুলম সরোবরও এখানকার দেখবার জিনিষ।

এই মাদুরা প্রাচীনকালে পাণ্ড্য রাজ্যের প্রধান নগর ছিল। পাণ্ড্যরাজগণ বিখ্যাত রাজা ছিলেন। এমন কি রোমান্ ও গ্রীকরা পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজ্যের সাথে বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। ভূমধ্যসাগরের অনেক বন্দরের সাথে পাণ্ড্যরাজ্যের বাণিজ্য চলত। মার্কো পোলোর লিখিত গ্রন্থে মাদুরার উল্লেখ আছে।

মাদুরার প্রাচীন নাম কদম্ববন। আগে মাদুরার বিশেষত্ব ছিল কদম্বগাছ। মন্দিরের কাছে একটী কদম্ব গাছ এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। মাদুরা সম্বন্ধে একটী তামিল প্রবাদ আছে—"যে জন্মে মাদুরা দেখে নি সে পরজন্মে গাধা হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবে।" মাদুরা দেখে পরজন্ম-ভীতি হ'তে নিস্তার পেলাম। বিদেশী পর্য্যটকেরা মাদুরাকে "উৎসব-নগরী", "ভারতবর্ষের এথেন্স" ইত্যাদি নানা নাম দিয়ে গেছেন।

মাদুরা হ'তে চলে এলাম তুতিকোরিনে (তুঁতকড়ি)। তুতিকোরিন মান্নার উপসাগরের তীরে দক্ষিণ ভারতের একটী বন্দর। মুক্তা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। তুতিকোরিন বন্দরের নিজস্ব ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় চেম্বার অব্ কমার্স্ আছে। পৃথিবীর নানা জায়গার সঙ্গে চলে এর বাণিজ্য। দক্ষিণ

ভারতের তিন্নভল্লী জেলার তাম্রপর্ণী নদী হ'তে কর্ম্মমুখর তুতিকোরিন মাত্র কয়েক মাইল দূরে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই বন্দর পর্ত্তুগীজদের অধিকারে আসে। প্রায় একশ' বছর পরে এক ওলন্দাজ নৌবহর এই বন্দর অধিকার করে। তারও প্রায় একশ' বছর পরে ইংরেজরা তুতিকোরিন অধিকার করলো। তারপর ওলন্দাজেরা তুতিকোরিন পুনরধিকার করেছিল; এখন অবশ্য তুতিকোরিন স্থায়ীভাবে বৃটীশ অধিকারভুক্ত হয়ে আছে।

তুতিকোরিন হ'তে চলে এসেছি রামেশ্বরম্। ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জম্বন দ্বীপে এর অবস্থান। রামেশ্বরমে বিখ্যাত হচ্ছে শিবমন্দির। উঁচু জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। তিনটী স্তম্ভশ্রেণী মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে। সামনে বিস্তৃত রাজপথ। ত্ব'পাশে নারকেল গাছের সারি। মন্দিরের বাইরের দিকে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য অতি চমৎকার। বিশাল মন্দিরের ভিতর অসংখ্য স্তম্ভরাজি। ভিতরটা সর্ব্বদা আলোকিত থাকে। ছাদের নীচের কারুকার্য্যও তেমনি অপূর্ব্ব। আধুনিক যুগে এমন শিল্প-নৈপুণ্য বিরল।

এই মন্দিরে ত্ব'টী শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ সম্বন্ধে গল্প আছে, শ্রীরামচন্দ্র একটীর প্রতিষ্ঠাতা ও অপরটীর প্রতিষ্ঠাতা হনুমান। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে হনুমান গিয়েছিলেন মূর্ত্তির সন্ধানে। হনুমানের আসতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র নিজ হাতে বালির শিবমূর্ত্তি গড়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর হনুমান উপস্থিত হয়ে দেখেন আর এক মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেছে। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করা হ'ল, ও শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে হনুমান আনীত মূর্ত্তির পূজা আগে হ'ল। সেই হ'তে হনুমান আনীত মূর্ত্তির পূজাই আগে হয়ে আসছে। মন্দিরের অতটা প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিন্তু পাশ্চাত্য গবেষকরা সন্দিহান। খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী কালে এর সৃষ্টি বলে তাঁদের ধারণা। তার পরেও অবশ্যি এর যথেষ্ট সংস্কার হয়েছে।

জম্বন দ্বীপের জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গেও রামায়ণের একটা মজার গল্প জড়ান হয়েছে। রাবণ যখন লক্ষ্মণকে শক্তিশেল দ্বারা আহত করেন তখন লক্ষ্মণের জীবন রক্ষার জন্য হনুমান গিয়েছিলেন বিশল্যকরনী ওষুধ আনতে। এই ওষুধ গাছ ছিল গন্ধমাদন পর্ব্বতে। হনুমান গাছ চিনতে না পেরে গোটা পর্ব্বতটাকেই তুলে আনলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের ওষুধ সংগ্রহের পর আবার সেটিকে রেখে আসতে যান নি; সেইখানেই তাকে সাগরের জলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু পর্ব্বত ডুবলো না। সাগরের মাঝে দ্বীপের মত জেগে রইল। এই ক'রে নাকি জম্বন দ্বীপের জন্ম।

রামেশ্বরের পরই আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করি। তার কাহিনী আর একদিন বল্‌ব।

যুদ্ধে ছদ্মবেশ বা ক্যামোফ্লেজ

শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত

আধুনিক যুদ্ধে কত মারাত্মক রকমের অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী হয়েছে তার খবর কিছু কিছু তোমরা সকলেই রাখ। কিন্তু আজ যে অস্ত্রের কথা বলব তা একেবারেই অন্য রকমের। এর সংঘাতের শব্দে কান বধির হয় না; তপ্ত রক্ত গড়িয়ে পড়ে না এর আঘাতে। এর কাজ শুধু শত্রুর চোখে ধূলো দেওয়া। সামরিক ভাষায় একে বলা হয় ক্যামোফ্লেজ—বাংলায় বললে ছদ্মবেশ কথাটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্যামোফ্লেজের সূচনা হয়েছিল কিন্তু গতবারের মহাযুদ্ধেই। সে ১৯১৫ সালের কথা। কয়েক জন ফরাসী সৈন্য এসে নাম লেখায় গোলন্দাজ বাহিনীতে। যুদ্ধে যোগ দেবার আগে এরা সবাই ছিল চিত্রকর—বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পিকাসোর সহকারী। যারা চিত্রকলা সম্বন্ধে একটু আধটু খোঁজ-খবর রাখ তারা চিত্রে 'কিউবিক্ পদ্ধতির' নাম শুনে থাকবে। এরাও ছবি আঁকত সেই পদ্ধতিতে।

গোলন্দাজ বাহিনীতে ঢুকে এরা দেখল বিপক্ষের কামান বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা ব্যাপারটা নেহাৎ সহজ নয়। এর কি কোন প্রতিকার নেই? ভেবে ভেবে শেষটা তাদের মাথায় এল—যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের চিত্রবিদ্যাটা কাজে লাগালে কেমন হয়! ধর, যদি নিজেদের সাজসরঞ্জাম কৌশলে রং করে বা রং করা কাপড়ে ঢেকে কিংবা দরকার হলে লতাপাতা ডালপালার সাহায্য নিয়েও শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য করে ফেলা যায় তা হ'লে কি কার্য্যোদ্ধার হয় না? এইভাবে এদেরই চেষ্টায় যুদ্ধে ছদ্মবেশ বা ক্যামোফ্লেজের চলন সুরু হ'ল এবং ব্যাপারটার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি ক'রে ক্রমে তার নানা উন্নতি হ'তে লাগল। এবং এবারকার মহাযুদ্ধে এটা তো হয়ে দাঁড়িয়েছে সমর-কলার একটা বড় অঙ্গ।

শুধু সামরিক বস্তু নয়, অনেক বিখ্যাত স্থান বা অট্টালিকা, যেগুলো শত্রুর বোমার আঘাতে ধ্বংস হতে পারে, সেগুলোকেও আজকাল ক্যামোফ্লেজ করার রেওয়াজ হয়েছে। কাজটি শুনতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আসলে ততটা নয়—দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এ কাজ হাসিল করতে হয়। বিশেষ করে দৃষ্টি দিতে হয় কতকগুলো বিষয়ে—যেমন যে বস্তুতে ছদ্ম রূপ দিতে হবে তার আকৃতি, গঠনপ্রণালী, রং, তার ওপর আলোর প্রভাব, তার বিশেষত্ব ইত্যাদি। বস্তুটিকে এমন আকার দেওয়া চাই যা নাকি শত্রুপক্ষের বৈমানিকেরা ধরতে না পারে। নানা রংএর আল্‌পনার সাহায্য তো নিতে হয়ই, বস্তুটির ছায়া সম্বন্ধেও সতর্ক হতে হয়। কেননা অনেক সময় যে

জিনিষটাকে আকার বা আয়তন দেখে চেনা যায় না তীব্র আলোক-রশ্মিতে প্রতিফলিত তার ছায়া দেখে তাকে চিনে ফেলা যায়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন আল্পনার রেখাগুলি সব সময়েই আড়াআড়িভাবে হওয়া দরকার—অর্থাৎ ওপর এবং পাশের রং লম্বালম্বি ভাবে পারস্পরিক বিপরীত দিকে করা উচিত।

সহর এবং গাঁয়ের বস্তুকে ছদ্মবেশী করার উপায় সম্পূর্ণ আলাদা—কারণ সহর আর গাঁয়ের দৃশ্য—অর্থাৎ রংএ কোন সামঞ্জস্য নেই। গাঁয়ের বেলা প্রকৃতির পটভূমিকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে রং করা দরকার। তা ছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হয়, ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

কোন্ বস্তুকে কি রকম রং দিয়ে রঞ্জিত করতে হবে তার কতকগুলি নিয়ম আছে। দূরের বস্তুর রং ফিকে, সে জন্য পারস্পরিক বিপরীত রং নিয়ে সেখানে আলপনা আঁকা প্রয়োজন। তাতে শত্রু দূর থেকে আবছা রং দেখে চট্ ক'রে ধরতে পারে না। হলুদ, নীল এবং ধূসর রং বেশী অস্পষ্ট। এই তিনটি পৃথক্‌ভাবে কিংবা এক সঙ্গেও দেওয়া যেতে পারে। দূরের বস্তুর জন্য পৃথক্ ভাবে হলুদ ও ধূসর রং ব্যবহার করা হয়। খুব কাছের হ'লে ব্যবহার করা হয় নীল রং।

যুদ্ধের সময় মিলিটারী মোটরগাড়ী, বাস্, লরী ও খাদ্য সরবরাহের গাড়ী প্রভৃতিকে ক্যামোফ্লেজ করা খুবই দরকার। এগুলোর আল্পনা দেওয়ার নিয়ম সাধারণতঃ এই রকম: সম্মুখভাগে লাগানো হয় গাঢ় রং—কিন্তু এমন ভাবে যাতে ওর ঔজ্জ্বল্য ভাবটা দূর থেকে ফ্যাকাসে দেখায়। তারপর দু'পাশের এবং পেছনের অংশ লম্বালম্বি ভাবে রং করে দু'এর মিলনস্থানকে ক্রমশঃ আবছা করা চাই। ছাদের ওপরটা রং করতেও এই নিয়ম। এই রকম ক্যামোফ্লেজ করা মিলিটারী গাড়ী আজকাল কলকাতায় ও অন্য অনেক সহরে হামেশাই দেখা যায়। সম্মুখের চক্‌চকে অংশ এবং বায়ুরোধী কাচকেও কালো এবং খাকী রংএ ঢেকে ফেলা হয়। এ সত্ত্বেও কিন্তু সময় সময় আলোতে ওর ছায়ার প্রতিফলন দেখে বিপক্ষ দল ওর অস্তিত্ব ধরে ফেলে। এর প্রতিবিধান হচ্ছে, গাড়ী দাঁড় করাবার সময় এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যার চারপাশে ছোট ছোট পাথরের স্তূপ বা অন্য কোন ভাঙ্গা বস্তুর ঢিপি আছে। কারণ এ সবের ওপর ছায়া প্রতিফলিত হয় আঁকাবাঁকা ঢেউ খেলানো ভাবে, বিপক্ষকে সহজেই তা দিয়ে প্রতারিত করা যায়।

ব্লক হাউস বা কাষ্ঠদুর্গকে ছদ্মবেশে ঢাকবার সময় পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সঙ্গে এক রকম করে মিশিয়ে দিতে হয়। আকৃতির সামঞ্জস্য থাকলে তা নষ্ট করা হয় চারদিকে কায়দা মত কাঠের স্তম্ভ সাজিয়ে। বিরাট্ দড়ির জাল বিছিয়ে আগাগোড়া ঢেকে তার ওপর ডালপালা সাজিয়ে দেওয়ার রেওয়াজও আছে। এতে করে জিনিষটা দেখতে জঙ্গলেরই একটা অংশ বলে মনে হবে।

আজকাল বাংলার বিভিন্ন সহরে বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল স্বরূপ স্লিট্ ট্রেঞ্চ কাটা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ স্লিট্ ট্রেঞ্চের জন্য জায়গা বেছে নেওয়া হয় গাছের ছায়ায়। এর কারণও আর কিছু নয়—গাছের আড়ালে ট্রেঞ্চকে লুকিয়ে রাখা।

সৈন্যদের দেহকেও ক্যামোফ্লেজ করা হয়ে থাকে। মাথার হেলমেট কালো বা মহিষের গায়ের মত ধূসর রং ক'রে কিংবা তার ওপর সুতোর জাল দিয়ে তাতে পাখীর পালক বা গাছের পাতা এঁটে দেওয়া হয়। হেলমেট্‌টাই আগে চোখে পড়ে কিনা! দেহের অনাবৃত অংশ রং করারও রেওয়াজ হয়েছে।

ধূম্রজাল বিস্তার করা ক্যামোফ্লেজের আর একটা অঙ্গ। সমুদ্রবক্ষে জাহাজের কন্‌ভয়, আকাশে বিমান বহর—এ সব আড়াল করার জন্য ধোঁয়ার আবরণ ব্যবহার অনেক দিন থেকেই চলছে। আজকাল রেলওয়ে ষ্টেশন, সেতু ও অন্যান্য সামরিক লক্ষ্যবস্তুও ধোঁয়ার আড়ালে গোপন করা হচ্ছে। এমন কি কল কারখানাগুলো শুদ্ধ। আক্রমণ করার সময়ও ধোঁয়ায় আত্মগোপন ক'রে সুফল পাওয়া গেছে।

নিষ্প্রদীপ বা ব্ল্যাক্ আউট্ জিনিষটাও যে ক্যামোফ্লেজেরই একটা অঙ্গ তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। আর সৈনিকদের খাকী পোষাকটাকেও ক্যামোফ্লেজের অংশ বলা যেতে পারে। খাকী রংকে দূর থেকে আবছা ধূসর দেখায় এবং জঙ্গলের মধ্যে বা মাঠের ঘাসবন দিয়ে চলবার সময় সে রং আত্মগোপন করতে খুবই সাহায্য করে।

আজাকাল গেরিলা যুদ্ধের রেওয়াজ খুব বেড়েছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন গেরিলা যুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হ'লেও ক্যামোফ্লেজই একটা বড় উপায়।

পূর্ণিমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার, এম্.এ,বি.এল্

জটিলা। একটু সবুর কর বাছা। এতটা পথ এসেছি—একটুখানি বসে কোমরটা জিরিয়ে নি।

কুটিলা। আর সেই সুযোগে ওরা বনের ভেতরে লুকিয়ে থাক্। না না, এখন আর বস্‌তে হবে না। চল এক্ষুনি।

জটিলা। তবে বাছা, তুই আমার কোমরটা একটু টিপে দে তো। (কুটিলার তথাকরণ) এ দিকে, এই দিকে ··· আর একটু ওপরে ··· আর একটু জোরে ··· উহুহু অত জোরে নয় ··· আর একটু আস্তে।

[নেপথ্যে গান—"আজি বিভোর পরাণ মোর শ্যাম কিশোর কই লো কই!"]

কুটিলা। (সরিয়া গিয়া) ওই শোন, ওই যে মেয়েগুলো যাচ্ছে। ··· চলো, চলো, শীগ্‌গীর।

জটিলা। কেষ্টা কি ওদেরই সঙ্গে আছে?

কুটিলা। তা কি করে বলব? ··· যদি সঙ্গে না-ও থাকে, তারি কাছেই ওরা যাচ্ছে নিশ্চয়। একটু আড়ালে থেকে ওদের পিছু পিছু যাই চলো।

জটিলা। আঃ, একবার যদি নাগাল পাই তবে এমনি সাজা দেব। ··· এই এমনি করে ··· (লাঠি উঠাইতেই কোমরে টান লাগিল) উহুহু, ··· এই পাশটা বুঝি আবার বিগ্‌ড়ে গেল রে কুটিলা! ··· আর একবার টিপেটুপে ঠিক করে দে না বাছা।

[কুটিলা আবার নিকটে আসিয়া টিপিতে লাগিল]

কুটিলা। (টিপিতে টিপিতে) সাজা যা দেব তা আমার মনেই আছে। উঃ··· বাঁশী বাজায়··· দাঁড়াও না, বাঁশী বাজানোর মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি। ··· একবার যদি ধরতে পারি··· তা হলে এই, এমনি, এমনি, এমনি করে··· (জটিলার কোমরের উপর মুষ্টি প্রহার)।

জটিলা। উহুহুহুহু! করলি কিরে মুখপুড়ী? আমার ভাঙ্গা কোমরটা যে আরও বেশী করে ভেঙ্গে দিলি!

কুটিলা। ওহো তাই তো, কেমন যেন বেভুল হ'য়ে গেছে।···তা কিছু মনে করো না মা। সেই হতভাগাটার কথা মনে হ'লে রাগে আমার শরীর এমনি জ্বল্‌তে থাকে যে তখন আর জ্ঞান টান কিছু থাকে না।

জটিলা। কিন্তু তুই যে আমার ব্যথাটা আরও দশগুণ বাড়িয়ে দিলি রে! এখন যে আর চল্‌তেই পারছি নে।

কুটিলা। একটু কষ্ট করে কোন রকমে এস মা, নইলে ওকে ধরবার এমন সুযোগ আর পাবে না।

জটিলা। ওহো, তাই তো তাই তো, চল বাবু, চল।

কুটিলা। (অগ্রসর হইতে হইতে পশ্চাতে দেখিয়া) একটু পা চালিয়ে এস মা—দেখ তো ওরা কত দূর চ'লে গেল!

জটিলা। পা তো চলে রে বাছা, কিন্তু কোমর যে চলে না। [উভয়ের প্রস্থান]

— দৃশ্য শেষ — (ক্রমশঃ)

কবি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

আচ্ছা, তোমরাই বল, এ অবস্থায় তোমরা কি করিতে? নিশ্চয় বসিয়া বসিয়া কবিতা লিখিতে। ও অবস্থায় কবিতা না লিখিয়া আর কিছু করা অসম্ভব—তা তোমার ছন্দজ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক। তা ছাড়া বাপ্পা তো সেই পাঁচ বছর বয়স হইতে কবিতা লিখিয়া আসিতেছে, তার কথা তো একেবারেই স্বতন্ত্র।

মনে রাখিও জায়গাটি তোমার কলিকাতা নয়। ধোঁয়া আর কালি, গাড়ী আর ফিরিওয়ালা, অমুক আর তমুক তোমাকে বিরক্ত করিতে পারিতেছে না। তুমি বসিয়া আছ হিমালয়ের বুকে একেবারে দার্জ্জিলিং পাহাড়ের উপর।—অর্থাৎ কলিকাতা হইতে স্বর্গের কম-সে-কম সাত হাজার ফুট কাছে। যে বাড়ীটায় তুমি বসিয়া আছ তার নামটা কিছু লম্বা, কিন্তু তার মধ্যেও বেশ একটু কবিতা কবিতা গন্ধ আছে—"শাল-তাল-পিয়াল-তমাল-বীথি"। তার পর আরও শোন। তোমার সামনে আছে একখানা ছোট টেবিল, তার উপর আছে একখানা খাতা আর কচি কলাপাতা রং-এর একটি পেন্সিল। টেবিলের পিছনেই জানালা—তার ভিতর দিয়া এক ঝলক কাঁচা রোদ তোমার পায়ের কাছে লুটোপুটি খাইতেছে। সেই সঙ্গে এক ঝলক নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ। জানালা দিয়া দৃষ্টি বিছাইয়া দিলে দেখা যায় দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভোরের সোনালী আলোয় ঝকমক করিতে করিতে আকাশের কোলে গা এলাইয়া দিয়াছে। আর এদিকে সেদিকে পেঁজা তুলার মত সাদা সাদা কচি কচি কয়েকটা মেঘের ছানা আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এবার? দেখি, কবিতা না লিখিয়া কেমন থাকিতে পার!

কাজেই যা নিতান্ত স্বাভাবিক তাহাই ঘটিতেছিল; বাপ্পা কবিতা লিখিতেছিল। বাপ্পা একজন স্বভাব-কবি। বয়স যদিও তার এখনও আট পূর্ণ হয় নাই কিন্তু এরই মধ্যে সে একটা মোটা দশ পয়সা দামের খাতা (যুদ্ধের চড়া দামে কেনা নয়, তার অনেক আগে কেনা—সুতরাং বেশ মোটা) কবিতা দিয়া ভরাইয়া ফেলিয়াছে।

কবিতা গড় গড় করিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে, ছাদের নালা বাহিয়া বৃষ্টির জল যেমন গড়াইয়া চলে, তেমনি বাধাহীন গতি তে—

একটা ছিল হাঁস;
ডিম পাড়ত বড় বড় লাফিয়ে খেত ঘাস।
সবুজ কাঁচা ঘাস, নধর কচি ঘাস—
খেত বারো মাস।
আফ্রিকাতে কাফ্রী-গাঁয়ের জিরাফ বা জেব্‌রা,
কঙ্গো দেশের বঙ্গো হরিণ, বেবুন সাহেবরা
যে ঘাস খেয়ে হ'ল মোটা সে ঘাস এ তো নয়,
টাটকা তাজা দূর্ব্বা ঘাস এ—বাংলা দেশে হয়।

এইবার বাংলা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটু মুখরোচক বর্ণনা দিয়া তাকে উদ্দেশ্যে নমস্কার

জানাইতে পারিলেই কবিতাটি বেশ লোভনীয় হইয়া পড়িবে। বাপ্পা তাই তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল। হঠাৎ—

'হঠাৎ কাব্যলোকের দরজায় ঘা পড়িল। বিরাট্ একটি ফুটবল হাতে মূর্ত্তিমান্ ঝড়ের মত দেখা দিলেন শ্রীমান্ অমিতাভ, সংক্ষেপে কুশী। বাপ্পার কাঁধে সজোরে দুই ঝাঁকুনি দিয়া সে হাঁক দিল, "এই বাপ্পা, আয় তো। ঘোঁতন আর খোকন চ্যালেঞ্জ করেছে আমাদের নাকি গুণে গুণে সাত গোল দেবে। তুই গোলে দাঁড়াবি, ভাইয়া হাফব্যাকে থাকবে, আমি আর লবি যাব ফরোয়ার্ডে। দেখি ওদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করতে পারি কিনা।" উত্তেজনায় কুশীর টকটকে লাল মুখ আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে, নাক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। আবার সে বাপ্পার কাঁধে প্রবল এক ঝাঁকুনি লাগাইল।

ব্যাপারটার গুরুত্ব তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পার নাই! মনে কর কবি কালিদাস শিপ্রা নদীর ধারে একখানা বেতস লতার তৈরী চাটাই বা মোড়া পাতিয়া বসিয়া বন্ধুজীব ফুলের রসের মধ্যে নলখাগড়ার কলম ডুবাইয়া ডুবাইয়া ভূর্জ্জপাতায় কবিতা লিখিতেছেন। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, তার মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছে ক্ষুদে ক্ষুদে জলকণা—ভাল কথায় যাকে বলে শীকর, আর সেই সঙ্গে এক ঝলক কদম ফুলের রেণু। তা ছাড়া প্রজাপতি, ভ্রমর, বন্য বলাকা, হরিণ-শিশু, এমন কি করভ অর্থাৎ কিনা হাতীর বাচ্চা পর্য্যন্ত—এক কথায় কবিতা লিখিবার অনুপ্রেরণা পাইতে যা যা দরকার হয় সবই কাছাকাছি রহিয়াছে। কবি লিখিয়া চলিয়াছেন—মিষ্টি মধুর মন্দাক্রান্ত ছন্দে। তিন পংক্তি শেষ হইয়াছে, আর একটি মনের মত শব্দ বসাইতে পারিলেই একটা শ্লোক সম্পূর্ণ হয়, এমন সময় নবরত্নের আর এক রত্ন বরাহমিহির আসিয়া তাঁর কাঁধে এক প্রবল নাড়া দিয়া বলিলেন, "এই কালু দা, এই ত্রৈরাশিকের অঙ্কটা চট্ করে কষে দাও তো, বররুচির থোঁতা মুখটা ভোঁতা করে দি।" কবিবরের সেই অবস্থাটা ভাবিয়া দেখ। ঠিক ধরিতে পারিলে না? বড্ড দূরে চলিয়া গেলাম? আচ্ছা, আরও কাছাকাছি আসা যাক্। রবীন্দ্রনাথ?—থাক্, তাঁকে আর টানিব না, তাঁর চেয়েও আধুনিক ও সহজলভ্য কবি বা গল্পলেখকের উদাহরণ দেওয়া যাক। এই ধর শিবরাম বাবু, প্রেমেন বাবু, বুদ্ধদেব বাবু, ধীরেন বাবু। আচ্ছা, শেষেরটিকেই ধরা যাক। মনে কর ধীরেন বাবু গল্প লিখিতেছেন। বাদুড়বাগানের এক গলির মধ্যে জানালার ধারে চেয়ার পাতিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে যুদ্ধের গল্প লিখিতেছেন। বাতাসে ফর্ ফর্ করিয়া পর্দ্দা উড়িতেছে, তাঁর ঝরণা-কলমও তেমনি ফর ফর করিয়া ছুটিয়াছে। 'জাপানী বোমারুরা চুংকিং সহরের উপর আসিয়া পড়িল। ভয়ত্রস্ত নগরবাসী 'শেল্টারে' ঢুকিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। নির্ভীক চীনা এ. আর. পি'র দল এক হাতে ষ্টিরাপ পাম্প লইয়া অপর হাতে দাড়িশূন্য দাড়ি চুল্কাইতে চুল্কাইতে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতেছে। আকাশে বাতাসে একটা ভীষণ থম্থমে ভাব—পরীক্ষার হলে কোশ্চেন পেপার দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ঠিক যেমনটা হয়। তারপর সহসা—বুম্ বুম্ বুম্—' ধীরেন বাবু এইটুকু পর্য্যন্ত লিখিয়া উত্তেজিত ভাবে চায়ে ঘন ঘন চুমুক দিতেছেন, এমন সময় শিবরাম বাবু আসিয়া তাঁর কাঁধে এক ঝাঁকুনি দিয়া হাঁকিলেন, "চল হে, একটু কুস্তি করে আসা যাক্। রবি বাবু চ্যালেঞ্জ করে গেছেন, একটু তালিম দিয়ে রাখি। ওঠ ওঠ।"

বাপ্পার অবস্থাটিও ঠিক ঐ রকম, অর্থাৎ সেকালের কালিদাস অথবা একালের ধীরেন বাবুর মত হইল। রাগ হইলেও বাপ্পা কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লইল। মনের মধ্যে যে ভাবটা তোলপাড় করিতেছে সেটুকুকে সে থিতাইয়া যাইতে দিবে না। আস্তে কুশীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া সে শুধু কহিল, "এখন যা, পালা, বিরক্ত করিস নে। আমি কবিতা লিখছি।" কুশী নাছোড়বান্দা। কবিদের সে অত্যন্ত কৃপার চোখে দেখে। তার মতে নবীন সেন বা মাইকেলের চেয়ে গোষ্ঠ পাল বা বলাই চাটুয্যে অনেক প্রতিভাবান্ পুরুষ। বাপ্পা যে তার চোখের সামনে এমন অধঃপাতে যাইতেছে সে তার সহ্য হইল না। সে এবার বলপ্রয়োগ করিল—নিঃশব্দে বাপ্পার খাতাখানি লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

ইহার পর যে দৃশ্য দেখা গেল তা কলিযুগে আর কখনও দেখা গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। সে দৃশ্য একবার দেখা গিয়াছিল ত্রেতাযুগে বালি ও সুগ্রীবের মধ্যে, আর একবার দেখা গিয়াছিল দ্বাপর যুগে দুর্য্যোধন ও ভীমের মধ্যে।

যুদ্ধ হয়তো সহজে থামিত না, কিন্তু অতর্কিতে থামিতে বাধ্য হইল। শান্তিদূত রূপে দেখা দিল কুশীর যমজ ভাই লব। গম্ভীর কণ্ঠে সে জানাইল—"মা তিনবার ডেকেছেন। আবার ডাকছেন। আজ নাইবার দিন। তিনি আর তিন মিনিট অপেক্ষা করে আর একবার ডাকবেন। তারপর—" বাকীটা শেষ করিবার প্রয়োজন ছিল না। শান্তিদূতও সে প্রয়োজন বোধ করিল না।

শব্দ যে ব্রহ্ম এ কথা পণ্ডিত লোকদের মুখে মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু কথাটা যে বাস্তবিকই কতটা সত্য তা সেই মুহূর্ত্তেই বোঝা গেল। লবের মুখনিঃসৃত সেই অসমাপ্ত শব্দব্রহ্ম কানে যাইবামাত্র রণক্লান্ত কবি ও খেলোয়াড় সভয়ে পরস্পরকে ছাড়িয়া দিল। বাপ্পা হয়তো কয়েক মিনিট হাঁপাইতে পারিলে সুখী হইত। কিন্তু তার উপায় ছিল না। বৌদি অর্থাৎ জ্যেঠাইমা, বাপ্পা যাকে বাপ্পার অনুকরণে বৌদি বলিয়াই ডাকে, ভয়ানক কড়া লোক অর্থাৎ কড়া স্ত্রীলোক। বাবা বলেন তাঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। বাপ্পা যদিও বাঘও নয়, গরুও নয়, কিন্তু তাকেও বৌদির পাল্লায় পড়িয়া অনেকবার অনেক অবাঞ্ছিত জীবের সঙ্গে এক ঘাটে জল খাইতে হইয়াছে। বাপ্পা অনিচ্ছায় শামুকের মত গুটি গুটি রওনা হইল। কুশী খেলোয়াড় মানুষ, যুদ্ধের পর বিশ্রামের ধার সে ধারে না। সে আগেই চলিয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিং সহরের সবটাই ভাল। যেমন—ভোরে উঠিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর সূর্য্যের আলোর খেলা দেখিবার জন্য হুড়াহুড়ি করা হইতে আরম্ভ করিয়া এলোমেলো পাথরে পা ফেলিয়া ফেলিয়া অবজারভেটারি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া ওঠা। অথবা ম্যালের ধারে গাধার পিঠে (গাধা অবশ্য সেখানে 'ডঙ্কি' হইয়া গিয়াছে) ফুটফুটে মেমের ছানাদের হুটোপুটি দেখিতে দেখিতে জনশূন্য ক্যাল্কাটা রোড ধরিয়া আগাইয়া যাওয়া। তারপর মেঘের খেলা দেখিতে দেখিত ঘুম গুম্বা বা সুদূর সিঞ্চল লেক্ পর্য্যন্ত হাজির হইতে পারিলে তো কথাই নাই। সন্ধ্যার পর ঝুপঝাপ বৃষ্টির মধ্যে বিলাতী কায়দায় চুল্লীর পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতে পোহাইতে ভূতের গল্প শোনা আর কুড়মুড় করিয়া কাবলী মটর চিবানো—সে তো এক স্বর্গীয় সুখ। কিন্তু যত গোলমেলে হইতেছে এখানকার দুপুরের ঐ স্নানপর্ব্বটা। বেশ আছে ঐ ভুটিয়ার ছেলেগুলি। বছরে গোণা গুণতি একদিন স্নান করিলেও

কেউ কিছু বলিবার নাই—গায়ে একটু যা গন্ধ হইবার আশঙ্কা। তা নিজের গন্ধ কি কেউ নিজে টের পায়? বোধ হয় না। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই না। তা হইলে তো ছারপোকা, গাঁধিপোকা, গুবরে পোকা—এদের টিকিয়া থাকাই অসম্ভব হইত! কিন্তু বৌদির অর্থাৎ জ্যেঠাইমার মত লোকের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়িয়া এইখানেই যত মুশ্‌কিল। একদিন অন্তর স্নান করিতেই হইবে, যত ঠাণ্ডাই পড়ুক। আর স্নান মানেই তো গায়ের জামা খুলিয়া ফেলা। আল্‌ষ্টার গায়ে দিয়া স্নান করার নিয়ম যে কেন প্রচলিত হয় নাই, বিশেষতঃ উত্তর মেরুর স্বজাতীয় এই সব দেশে, বাপ্পা তা আজও ভাবিয়া পায় না।

যাক্, যা বলিতেছিলাম। স্নান হইয়া গিয়াছে। এখন দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টার মত মুক্তি। খাইতে বসিয়া বাপ্পা আবার মনে মনে কবিতা লিখিতে বসিল। দার্জ্জিলিংএর স্নানকে আক্রমণ করিয়া সে একটা কবিতা লিখিবে। কয়েকটি চরণ তো এখনই ঠিক হইয়া গিয়াছে—

ওরে স্নান, ওরে স্নান!—ওরে দার্জ্জিলিংএর স্নান,
তোরে কর্‌ব অপমান, তুই বড্ড রে বেইমান।
কলকাত্তাতে গঙ্গা বিরাট, ঠাণ্ডা লেকের জল,
কিংবা বাড়ীর বাথরুমেতে 'শাওয়ার বাথের' কল,—
তার তলাতে বসলে পরে—আঃ কি আরাম ভাই,
কার সাথে কার দিই তুলনা—দূর্ দূর্ দূর্ ছাই!

মনের খাতায় খস্ খস্ করিয়া কবিতা লেখা হইতেছিল, এমন সময়ে, উঃ, গলায় হঠাৎ একটা কাঁটা বিঁধিয়া গেল। বাপ্পা কবিতা ভুলিয়া গিয়া তিড়িং তিড়িং করিয়া লাফাইতে লাগিল। বৌদি অর্থাৎ জ্যেঠাইমা কাছেই ছিলেন—"কি হ'ল কি হ'ল" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। কুশী টিপ্পনী কাটিল, "কি আর হবে, বাবু বোধ হয় কবিতা ভাবছিলেন, মাছের কাঁটা কবিতায় ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে এসে গলায় বিঁধেছে।"

কাঁটা গিলিতে গিয়া জল ও বিষম খাইয়া কাসিতে কাসিতে বাপ্পা চেঁচাইয়া উঠিল—"খবর্দ্দার!" কুশী ভ্যাংচাইয়া বলিল, "ইস্, কি করবি তুই আমার? গায়ের জোরে তো পারবি না, বড় জোর আমার নামে একটা কবিতা লিখবি। কবিতা আবার মানুষে পড়ে! ফুঃ!" বাপ্পার বিষম তখনও হজম হয় নাই; সে নীরবে গুমরাইতে লাগিল।

কিন্তু কুশী আজ ভীষণ প্রতিশোধ লইবে ঠিক করিয়াছে। কোন্ দিক দিয়া সে বাপ্পাকে ঘায়েল করিবে তাও সে জানাইতে ভুলিল না—"তোমার কবিতা লেখা আমি বের কর্‌ব। মাষ্টার মশাই আসুন না! অঙ্কের খাতায় অঙ্ক না কষে তুমি কবিতা লিখেছ। আমি সব জানি। দাঁড়াও না হুঁ।"

ব্যাপারটার একটু ইতিহাস আছে। গরমের ছুটীতে তাহারা দার্জ্জিলিং আসিয়াছে। কিন্তু বেড়াইতে আসিয়াছে বলিয়াই যে সারা ছুটীটা সর্ব্বক্ষণ বাঁদরামি করিয়া কাটাইতে হইবে বৌদি অর্থাৎ জ্যেঠাইমার তা মনঃপূত হয় নাই। তাই সম্প্রতি তিনি এখানকার স্কুলের একজন মাষ্টার মশাই—নীলধ্বজ বাবুকে ছেলেদের গৃহশিক্ষকের কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। রোজ দুপুরে দু'ঘণ্টা তাঁর কাছে ছেলেদের বিদ্যাভ্যাস চলে।

বাপ্পার দুর্ভাগ্য, নীলধ্বজ বাবু লোকটি বড় কড়া। আর শুধু তাই নয়, অঙ্ক জিনিষটা বাপ্পা মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না, আর নীলধ্বজ বাবুর অঙ্কের নামে জিভ দিয়া যেন জল গড়াইয়া পড়ে। অথচ বাপ্পার যেদিকে প্রতিভা (হ্যাঁ, বাপ্পা তাহাকে প্রতিভা বলিয়াই মনে করে, এবং মনে মনে সেজন্য বেশ গর্ব্ব অনুভব করে) তা তিনি মোটেই বরদাস্ত করিতে চান না। প্রথম প্রথম বাপ্পা ভাবিয়াছিল মাষ্টার মশাই তার কবিতার খাতাখানি একবার দেখিলে মুগ্ধ হইয়া বরফের মত গলিয়া যাইবেন—তাকে যতটা সম্ভব খাতির করিয়া চলিবেন। এবং সেই আশা করিয়া সে প্রথম সুযোগেই তাঁকে খাতাখানি পড়িয়া শুনাইয়াছিল। মাষ্টার মশাই আধ ঘণ্টা ধরিয়া একটি একটি করিয়া সবগুলি কবিতা মন দিয়া শুনিয়াছিলেনও। তারপর বলিয়াছিলেন—"আটের ঘরের নামতা মুখস্থ বল তো?" বাপ্পা পারে নাই। পাঁচ আটে আটচল্লিশ এবং আট আটে ছিয়ানব্বই বলিয়াছিল। মাষ্টার মশাই সম্পূর্ণ এক মিনিট বাপ্পার মুখের দিকে এবং তারপর পূরা দু'মিনিট তার কবিতার খাতাখানির দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন—যেন চোখের আগুন দিয়া খাতাখানি তখনই পোড়াইয়া ফেলিতে চান। বাপ্পা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছিল এবং বুঝিতে পরিয়াছিল এ হেন ঘোরতর কবিতাবিদ্বেষী লোকের নিকট হইতে তার কবিতার খাতাখানিকে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিতে হইবে।

ক্রমে বাপ্পা আরও বুঝিতে পারিল, মাষ্টার মশাই শুধু কবিতাবিদ্বেষীই ন'ন, লোকটীও তিনি তেমন সুবিধার ন'ন। সেই যে সেই দিন হইতে তিনি বাপ্পাকে অজগরের মত অঙ্কের পেষণে চাপিয়া ধরিয়াছেন তার হাত হইতে আজও সে রেহাই পায় নাই। রোজ তাকে গণিয়া গণিয়া চৌদ্দটি অঙ্ক কষিয়া রাখিতে হয়—তার মধ্যে অর্দ্ধেক নাকি বুদ্ধির অঙ্ক। নামে বুদ্ধির অঙ্ক কিন্তু আসলে সেগুলি এক একটি ছোটনাগপুরের বিচ্ছু। বাপ্পা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে তার অত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়াও তার ধারে কাছে ঘেঁষা যায় না। কুশীর সঙ্গে বাপ্পার ঠোকাঠুকি একটু বেশী হয়। বাপ্পার অঙ্ক ভীতি কুশী খুব আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করে, এবং সময়ে অসময়ে, বিশেষ করিয়া আড়ির সময়ে, তার সুযোগ লইতে কুণ্ঠিত হয় না। অথচ কুশী নিজেও যে অঙ্কশাস্ত্রে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তা যেন মনে করিও না। অঙ্কে সেও প্রায় বাপ্পারই মত। তবে হ্যাঁ, তার ভাই লব এদিক্ দিয়া অনেক উন্নত। দেখিতে হাবাগোবা, গোলগাল, গণেশ ঠাকুরের মত হইলে কি হয়, মগজের ভিতরটা নাকি তার 'ডিষ্টিল্‌ড্ ওয়াটারের' মতই পরিষ্কার। বড় বড় অঙ্ক সে এমন টক্ টক্ কষিয়া দেয় যে মাষ্টার মশাই শুদ্ধ অবাক্ হইয়া যান। আর আশ্চর্য্য, একটা অঙ্কও ভুল হইতে চায় না!

ঐ দেখ, আসল কথা ছাড়িয়া আবার কোন্‌দিকে চলিয়া যাইতেছি! কি বলিতেছিলাম? হ্যাঁ, সেই ইতিহাসের কথা। আজ সকালে উঠিয়া বাপ্পা যথারীতি অঙ্ক কষিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু আজকের দিনটা বাস্তবিকই ছিল অন্য রকম—যেন বিশেষ করিয়া কবিতা লিখিবার জন্যই ভগবান্ এ দিনটিকে পাঠাইয়াছিলেন। স্বভাব-কবি বাপ্পা তার অন্তরের অনুপ্রেরণাকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই, কোন কবিই তা পারে না। বাপ্পার নতুন অঙ্কের খাতাটা আবার দেখিতে হুবহু তার কবিতার খাতাটার মত। তাই বাপ্পা ভুল করিয়া—হ্যাঁ, ইচ্ছা করিয়া নয়, ভুল করিয়াই অঙ্কের খাতাটিতেই কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছে। সামনে ৫।৭টি পৃষ্ঠা যে অঙ্কে ভর্ত্তি ছিল অনুপ্রেরণার মুখে সেদিকে আর তার নজর পড়ে নাই। এখন উপায়? খাতার পাতা ছেঁড়া মাষ্টার

মশাইএর মতে চুরি-ডাকাতির মতই ভয়ঙ্কর অপরাধ। আবার অঙ্কের খাতায় কবিতা লেখাটাও তার-চাইতে নিশ্চয় কম সাংঘাতিক অপরাধ নয়। বিশেষতঃ বাপ্‌পা এই বয়সে লেখাপড়া ছাড়িয়া কবিতা লিখিবে এ তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। ইংলণ্ডের বালক কবি আলেক্‌জাণ্ডার পোপ্‌ ছেলেবেলা এই রকম কবিতা লিখিতেন বলিয়া তাঁর বাবা একবার তাঁকে কি রকম বেত মারিয়াছিলেন ইংরাজী পড়াইতে গিয়া একদিন মাষ্টার মশাই সে গল্পও বাপ্পাকে শুনাইয়া দিয়াছেন। বাপ্‌পা অবশ্য অরুণদা'র কাছে শুনিয়াছে যে বেত খাইয়াও নাকি পোপের কবিতার ঝোঁক কমে নাই। বেত খাইতে খাইতেও তিনি চেঁচাইয়া বলিয়াছিলেন—"ফাদার ফাদার, পিটি টেক্‌, পোয়েটি শ্যাল্‌ আই নেভার মেক!" সত্যি কিনা কে জানে!

কিন্তু বাস্তবিক এখন কি করা? অঙ্কের খাতা হইতে কি করিয়া কবিতাটিকে উৎপাটিত করা যায়? তার উপর মুশ্‌কিল, কাজটা করিয়া বাপ্পা সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কুশীকে বলিয়া ফেলিয়া তার পরামর্শ চাহিয়াছিল। কুশী এখন তার সুযোগ লইতে দ্বিধা করিবে না। ভয়ঙ্কর ছেলে এই কুশী। আজ আবার দিন বুঝিয়া একটা অঙ্কও কষা হইয়া উঠে নাই। মাষ্টার মশাই আসিতে যেটুকু দেরী আছে তা'তে বড় জোর তার একটি কি দু'টি অঙ্ক শেষ হইতে পারে। তাও রাইট্‌ হইবে কিনা কে জানে? অঙ্ক তো নয়, এক-একটা জিলেপির প্যাঁচ! তবু যদি জিলেপির মত মিষ্টি হইত!

বেলা দেড়টা। আর আধঘণ্টার মধ্যেই মাষ্টার মশাই আসিয়া পড়িবেন। বাপ্‌পা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। মা, পিসিমা, দিদি, বৌদি অর্থাৎ জ্যেঠাইমা ভিতরের লনে বসিয়া বসিয়া রোদ পোহাইতেছেন। দস্যি পম্পাটাও তার মধ্যে আছে। ও ঘরে দাদু পাশের বাড়ীর চাটুয্যে মশায়ের সঙ্গে দাবা নিয়া মশ্‌গুল। সামনে বোমা পড়িলেও হয়তো তাঁর চোখ দাবার ছক হইতে ফিরিবে না। ঠাকুরমার নাকি সারা রাত ঘুম হয় না। তিনি তাই সাধারণতঃ বেলা ন'টার আগে ওঠেন না; আবার বেলা ১২।১টার মধ্যেই লেপের তলায় ঢুকিয়া পড়েন। জাগিয়াই থাকেন নিশ্চয়, তবে চোখটা কেমন বোঁজা বোঁজা মনে হয়,—কোন দিকে হুঁশও থাকে না। আজও তাঁর সেই অবস্থা। কুশী ম্যাচের সঙ্গী জোটাইতে পাশের বাড়ী গিয়াছে, লবও গিয়াছে—ঘুড়ি আর মাঞ্জার খোঁজে। এমন সুযোগ আর হইবে না। বাপ্পা তার সাধের খাতাখানি আর কচি কলাপাতা রংএর পেন্সিলটি লইয়া টুক্‌ করিয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ফুরফুরে হাওয়া বহিতেছিল। ঠাণ্ডা, কিন্তু তবু বেশ মিষ্টি। হয়ত তিব্বত হইতেই আসিতেছে! পাইন বনের ফাঁকে ফাঁকে একটা ছোট পায়ে-চলা পথ নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। পাহাড়ীরা ছাড়া এ পথ বড় একটা কেউ ব্যবহার করে না। বাপ্‌পা ধীরে ধীরে সেই পথে অগ্রসর হইল। আকাশে সামান্য মেঘ আছে, কিন্তু এখন নিশ্চয়ই বৃষ্টি আসিবে না। সামনে একটি নীল রংএর ছোট্ট পাখী গাছে বসিয়া কি ঠোকরাইতেছিল, বাপ্পা তাহাকে বিরক্ত না করিয়া সন্তর্পণে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। কবির সেই লাইনটি মনে পড়িল,—"ছোট্ট সে নীল পাখী চেন তায়?" না, বাপ্পা তাকে চেনে না, কিন্তু তবু যেন কেন ভারী ভালবাসে। হ্যাঁ, সে কবি, সবাইকে সে ভালবাসে। এই পাইন বন, নীল পাহাড়, সবুজ প্রকৃতি, এমন কি তার বুকের উপরকার অদ্ভুত মানুষগুলাকে পর্য্যন্ত। এক কুশী ছাড়া।

একটা ছোট্ট ঝর্ণা কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। তার পাশেই খানিকটা ঘাস-বন। বাপ্পা সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। বাড়ীর কথা, মাষ্টার মশাইএর কথা, কুশীর কথা, লবের কথা। লবটাকে সবাই পছন্দ করে। বাপ্পাও করে। ছেলেটা একটা বোম্‌ ভোলানাথ—কারও সাতেও নাই, পাঁচেও নাই। একমাত্র তার নেশা ঘুড়ি আর মাঞ্জা। বাপ্পাকে সে শ্রদ্ধা করে—বাপ্‌পার কবিতাকেও।

মনে আছে কলিকাতায় থাকিতে একবার এই ঘুড়ি লইয়া পাশের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে লবের ঝগড়া হইয়াছিল। সে বাড়ীতে তিনটি ছেলে। লব তাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া ঘুড়ি কাটিয়া দিয়াছিল বলিয়া ছেলেগুলির কি রাগ! শেষে আর কিছু না পারিয়া তারা দূর হইতে মুখ ভ্যাংচাইতে লাগিল। কুশী হইলে হয়তো তখনই তাল ঠুকিয়া তাদের এক হাত লড়িয়া যাইতে চ্যালেঞ্জ করিত। কিন্তু লব সে সব কিছু করে নাই। সে বাপ্‌পার কাছে গিয়া বলিয়াছিল, "দে তো বাপ্পা, ওদের নামে একটা কবিতা বানিয়ে!" বাপ্‌পা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দিয়াছিল—

তিনটে বাঁদর ঘুরছে চালে   উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালে।
হোঁৎকা মুখো ঢ্যাপ্‌সা ভুঁড়ি—   জানে না ওড়াতে ঘুড়ি।
কুচ্‌কুচে তিন হাতীর ডিম,   সা রে গা মা—তেরে নিম্‌।

শেষের লাইনটা অবশ্য সে তাড়াতাড়িতে মিল খুঁজিয়া না পাইয়া ঐ রকম লিখিয়াছিল কিন্তু লবের ভাল লাগিয়াছিল ঐটুকুই সব চেয়ে বেশী। সপ্রশংস দৃষ্টিতে বাপপাকে অভিনন্দিত করিয়া তখনই সে শত্রুপক্ষকে সুর করিয়া সে কবিতা শুনাইয়া দিয়াছিল। তারা তো কেউ কবিতা লিখিতে জানে না তাই জবাবও দিতে পারে নাই। খাসা ছেলে এই লব! আর কুশী? না, সে বিশ্বাসঘাতকের কথা বাপ্পা আর ভাবিবে না। কিন্তু ভাবিব না মনে করিলেই তো আর ভাবনা থামান যায় না। বিশষতঃ এই রকম নির্জ্জন জায়গায় বসিয়া। অগত্যা বাপ্পা ভাবিতে লাগিল,—নানারকম কথা! ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে বাপ্পা সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িল।

হঠাৎ প্রচণ্ড শীতে বাপ্পার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বাতাস। এদিকে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বোধ হয় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শীতে, আতঙ্কে জড়সড় বাপ্পা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কিন্তু কোথায় চলিয়াছে সে? এ কি দার্জ্জিলিং পাহাড়, নাকি মেরুর কাছাকাছি কোথাও সে আসিয়া পড়িল! এখনই বোধ হয় অজ্ঞান হইয়া যাইবে!

প্রায় দশ মিনিট কি ভাবে কাটিয়া গেল বাপ্‌পার কিছুই মনে নাই; হঠাৎ মনে হইল দূরে অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যাইতেছে এবং গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়া লণ্ঠনের আলোর ক্ষীণ রেখা ভাসিয়া আসিতেছে। বাপ্‌পা আছাড় খাইতে খাইতে সেই দিকে ছুটিল। আরও মিনিট খানেক পরে দেখা গেল ভয়ে এবং শীতে অবসন্ন কবিবরকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া অরুণ দা ছুটিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেম্বল দা', রামু দা প্রভৃতি 'পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে' বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাঁর পিছু নিয়াছে।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এই রকম। মাষ্টার মশাই আসিতেই বাপ্‌পার খোঁজ পড়ে, কিন্তু তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কুশী বলিয়াছিল, বাপ্‌পা অঙ্কের ভয়ে কাছেই হয়ত কোথাও লুকাইয়া আছে, মাষ্টার মহাশয় বিদায় না লওয়া পর্য্যন্ত বাহির হইবে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাষ্টার মশাই

যথাসময়ে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তখনও বাপ্পার খোঁজ পাওয়া গেল না। জলযোগের সময় চলিয়া গেল, শেষে বেড়াইবার সময়ও আসিয়া পড়িল, কিন্তু বাপ্পা তখনও অনুপস্থিত। এবার সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং বাড়ীর বাহিরে চারিধারে খোঁজ পড়িল। মা, পিসীমা, দিদি দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, ঠাকুরমা চীৎকার করিয়া মা কালীকে ডাকিতে লাগিলেন, আর বৌদি অর্থাৎ জ্যেঠাইমা তো কাঁদিতেই সুরু করিয়া দিলেন। যে ভাল্লুকের দেশ এই দার্জ্জিলিং! ক্রমে সন্ধ্যা হইল, কিন্তু তখনও বাপ্পার দেখা নাই। তখন লাঠি, ছাতা ও লণ্ঠন লইয়া চাকর, দ্বারোয়ান্ এবং বাড়ীর বড়রা বাহির হইয়া পড়িল। দাদু শুদ্ধ দাবা ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন। এমন কি রামু দা' পর্য্যন্ত মালকোছা আঁটিয়া ওভারকোট গায়ে চাপাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তারপর? তারপর দার্জ্জিলিং সহর প্রায় ওলট পালট করিয়া অবশেষে বাপ্পাকে উদ্ধার করা হইল।

সে রাত্রে বাপ্পার যেন সবই কেমন আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। গা-হাত-পা মোছাইয়া, আগুনে সেঁকিয়া, গরম দুধের সঙ্গে ব্রাণ্ডি মিশাইয়া স্বয়ং বৌদি অর্থাৎ জ্যেঠাইমা যখন খাওয়াইয়া গেলেন, একটা ধমক পর্য্যন্ত দিলেন না। একটু চাঙ্গা হইতেই যে ছেলেটি ছলছল চোখে তার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল সে লব নয়, কুশী। তার চোখ-মুখ দেখিয়া বোঝা গেল এতক্ষণ সে সমানে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া এইবার শান্ত হইয়াছে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য হইল যখন লব তার হাতে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট দিয়া বলিল, 'মাষ্টার মশাই তোকে এটা দিয়ে গেছেন।' মোড়ক খুলিতেই দেখা গেল ভিতরে একখানা চক্‌চকে বাঁধান কবিতার বই। তার গ্রন্থকারের নাম? এ কি, নীলধ্বজ রায়! সে তো মাষ্টার মশাইএর নাম! তবে কি মাষ্টার মশাই নিজেই একজন কবি? য়্যাঃ, এও কি বিশ্বাস করিতে হইবে?

কিন্তু এর চেয়েও বড় আশ্চর্য্য তখনও বাপ্পার দেখিতে বাকী ছিল। তা দেখা গেল বইটির আর এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া উৎসর্গের পাতা খুলিতে। সেখানে জ্বলজ্বলে অক্ষরে—হ্যাঁ, ছাপার অক্ষরে এবং মোটা মোটা অক্ষরে লেখা—"আমার পরম স্নেহের কবি-ছাত্র শ্রীমান্ বাপ্পাকে স্নেহোপহার!"

না, না, না, বাপ্পা এ বিশ্বাস করিতে পারে না। ছাপার অক্ষরে থাকিলেও না।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

আফ্রিদী সীমান্তে—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। বেঙ্গল পাব্লিশার্স্, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম ৻৹।

শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চে—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। এম্, সি, সরকার য়্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৲। যুদ্ধের দরুণ নতুন বই আজকাল অল্পই বেরোবার সুযোগ পায়। তার মধ্যে ভাল বইএর সংখ্যা আরো কম। এই সময়ে ধীরেন বাবুর লেখা দু'খানি সত্যিকারের ভালো বই একসঙ্গে পেয়ে তোমরা নিশ্চয়ই খুসী হবে। প্রথমটি একটি রোমাঞ্চকর উপন্যাস; ২য়টি পুরোপূরি যুদ্ধের গল্প—যাতে নাকি ধীরেন বাবু প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী!

খেলার মাঠ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পি, ৬৫১, মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা। দাম ২৲। কৈশোরক-সম্পাদক প্রথিতযশা প্রবীণ সাহিত্যিক যোগেন্দ্র বাবুর পাকা হাতের লেখা এই সুবৃহৎ কিশোর-পাঠ্য উপন্যাসখানি তোমাদের নিশ্চয় ভাল লাগবে। এর গল্পাংশ যেমন সুন্দর, তেমনি স্বচ্ছ এর ভাষা। ভিতরে ছবি না থাকলেও রঙ্গিন মলাটটি সুরুচির পরিচায়ক।

অভিযাত্রী— ১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীবিজয়ভূষণ মজুমদার। হাতে-লেখা মাসিক পত্রের যা মূল উদ্দেশ্য অভিযাত্রীর পরিচালকবর্গ তা অনুসরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। পত্রিকাখানির অঙ্গসৌষ্ঠবও সুন্দর। এর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সন্দেশ

ইয়োরোপের যুদ্ধে এক নতুন পর্ব্ব সুরু হ'ল। মিত্রপক্ষ এক বিরাট্ বাহিনী নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে জার্ম্মান্-অধিকৃত ফরাসী রাজ্যে অবতরণ করেছে এবং জলে, স্থলে ও আকাশে একসঙ্গে সুরু হয়েছে তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ। অনেকেই আশা করেছন এটাই হয়তো এবারকার যুদ্ধের শেষ পর্য্যায় এবং এই নতুন রণাঙ্গনেই এবারকার মহাযুদ্ধের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

ওদিকে ইতিহাসবিখ্যাত রোম নগরীর পতন হয়েছে। মিত্রপক্ষ রোম দখল করে আরও কিছু দূর এগিয়ে এসেছে। ভারতের সীমান্তে জাপানীদের সঙ্গে সংঘর্ষ এখনও চলছে।

সম্প্রতি বঙ্গজননী পর পর কয়েকটি সুসন্তানকে হারিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা-সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক প্রফুল্লকুমার সরকার, ভারতবিখ্যাত মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও সুকবি অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র—এঁদের কথাই বলছি। এঁদের অভাব সহজে পূর্ণ হবার নয়।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

কথা ও কাজ

শ্রীরেণুকণা কুমার

অল্প কথা, বেশী কাজ যে জন দেখায়
কর্ম্মী সেই, শক্তি তার যায় না বৃথায়।
বেশী কথা বলে থাকে যে জন অসার
নিষ্ফল হয়েই থাকে কথা কাজ তার।

মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

চৈত্র সংখ্যা রামধনুতে প্রকাশিত হাসির গল্পের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলেন—
শ্রীশচী বন্দ্যোপাধ্যায়, রমনা, ঢাকা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

গরুগুলি এইভাবে ভাগ হইবে :—

১ম ভাগে—১, ১১, ২১, ৩১, ৪১, ৫১, ৬১, ৭১, ৮১। ২য় ভাগে—২, ১২, ২২, ৩২, ৪২, ৫২, ৬২, ৭২, ৭৩। ৩য় ভাগে—৩, ১৩, ২৩, ৩৩, ৪৩, ৫৩, ৬৩, ৬৪, ৭৪। ৪র্থ ভাগে—৪, ১৪, ২৪, ৩৪, ৪৪, ৫৪, ৫৫, ৬৫, ৭৫ ; ৫ম ভাগে—৫, ১৫, ২৫, ৩৫, ৪৫, ৪৬, ৫৬, ৬৬, ৭৬ ; ৬ষ্ঠ ভাগে—৬, ১৬, ২৬, ৩৬, ৩৭, ৪৭, ৫৭, ৬৭, ৭৭ ; ৭ম ভাগে—৭, ১৭, ২৭, ২৮, ৩৮, ৪৮, ৫৮, ৬৮, ৭৮ ; ৮ম ভাগে—৮, ১৮, ১৯, ২৯, ৩৯, ৪৯, ৫৯, ৬৯, ৭৯ ; ৯ম ভাগে—৯, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০।

উত্তরদাতাদের নাম

রামরতি চক্রবর্ত্তী ও সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ) ; গায়ত্রী, গীতা, টুলু, খোকন, উমা, মাষ্টার মশাই, অর্চ্চনা (নীলফামারী) ; হরেন্দ্রনাথ পাত্র ও শৈলেন্দ্রনাথ সরকার (ধানবাদ) ; বিজয়েশ্বর রায়, নারায়ণ, অরুণ, বাদল (উলানিয়া) ; গৌরী মুখার্জ্জী (বাঁকুড়া) ; বাবুল পাইন (ঘাটশীলা) ; সাবিত্রী, বিন্টু, বেবী, করুণা, রেণু ও সতী মৈত্র (রাজসাহী) ; চিন্ময় ঘোষ, (জয়পুর) ; স্বপন, কল্পনা, বাবু ও ভাদু (গোরক্ষপুর) ; সত্যনারায়ণ গোস্বামী (কুড়মুন) ; বারিদ, অমল, নীরদ ও ইলা রায় (রসা রোড) ; অহিভূষণ চৌধুরী (রাজসাহী) ; অতীন্দ্র, ধ্রুব ও শমীন দত্ত (তেজপুর) ; বিমলচন্দ্র দত্ত (জলপাইগুড়ি) ; হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ও রেণুপদ দাস (বাণীমন্দির-মুড়াগাছা) ; রবীন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী) ; মীরা, আরতি, উদ্ধারণ, দেবু ; নরোত্তম, বুড়ি, মিলন দত্ত (বেলফুলিয়া) ; রমেশচন্দ্র মজুমদার (রায়পুর) ; অশোককুমার নাহার (ডুমকা)। একটি উত্তরে প্রেরকের নাম নাই।

নূতন ধাঁধা

নীচের সংখ্যাগুলি ঠিকমত এক-একটি শব্দ দিয়া পুরাইতে পারিলেই লেখাটি পড়া যাইবে। কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার জন্য প্রতি বার একই শব্দ বসাইতে হইবে। পড় তো :—

১ বি২ ৩, প৩ দেবের ৪য় ম২ ৪ই৫ও উ৬ নাই। কোন প্র৭ খানি৮ ৯ অঙ্ক৭ ৬ হো১০ লা৯ গেল। ১০ করিয়া ১১ পড়িল, আমি ১বারে স১২হীন, সঙ্গে এ৮ ১৩ও নাই। ১২, বা১১র এ চাঁদে যাই৫ ১৩ক কেন ?

হাতের কাছে থাকা দরকার

স্নিগ্ধ রোগবীজনাশক
উদ্ভিজ্জ মলম

কাটা, পোড়া, মচকানো, পোকা মাকড়ের দংশন প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনায় ও বিবিধ চর্ম্মরোগে প্রত্যক্ষ ফল দান করে।

ইহাতে কোন রূপ
জন্তু জানোয়ারের চর্ব্বি নাই

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
হুকাকাশির গল্প
মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির"
কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম. এ প্রণীত
বদ্যিনাথের বড়ি
সরস মজাদার হাসির গল্প ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৸০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৵০
কলকাতার হালচাল ... ১৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
ধূমকেতু (উপন্যাস) ... ৸০

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
পদ্মরাগ ... ১।০
সোনার হরিণ ... ১।০
হাস্য ও রহস্য (গল্প) ... ৸০
নূতন পুরাণ ... ৸০
চায়ের ধোঁয়া ... ॥৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা
(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
নতুন কিছু ... ৸০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্‌ কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই...

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সঙ্গে সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—আর দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়। ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

লক্ষ্মী ঘি
স্বাস্থ্য ও শক্তি দান করে

রামধনু

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৭শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ,
১৩৫১

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক
১॥৵৹
প্রতি সংখ্যা
।৵৹

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪। আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } { মূল্য ৮ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে-
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রামধনু
১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৫১

মাণ্ডব্য ঋষি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শিশুকালে খড়ের ফাঁদে
চুপি চুপি ফড়িং ধরা—
বন্ধ, তোমার উপাখ্যানে
ভীতি এবং ভক্তি ভরা।
হে মুনিবর, অম্‌নি করে
কষ্ট দিলে ফড়িং ধরে'
হল তোমায় উঠতে শূলে
যায় না এ তো তুচ্ছ করা।

তুমিও যে মোদের মত
ছেলেবেলায় ছেলেই ছিলে,
দুষ্টামিতে একই রকম
উপাখ্যান তা জানিয়ে দিলে।
জানিয়ে দিলে এই যে ধারা,
নয়কো মোটেই সৃষ্টিছাড়া,
চলে গেছে এই পথেতে
মুনি ঋষি সবাই মিলে।

প্রথম থেকেই করতে নাকো
যপ তপ এবং আরাধনা,
অগ্নিহোত্রী—হোমের পরেই
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।
সময় পেতে ফড়িং ধরার,
ঘুড়ি এবং পুতুল গড়ার,
ফল ফুলও সব পাড়তে পাড়ার
সঙ্গী ছিল দু'চার জনা।

এমনি ছেলেই সঙ্গগুণে
সাধন জোরে হয় যে ঋষি,
রয়—যে ধরা ধরবে শিরে
নাগ শিশুদের সঙ্গে মিশি।
ঝিনুক দেবে মুক্তা যারা—
এই ঝিনুকের মতই তারা,
কি হবো যে ঠিক ত নাহি
ভেবেই খুসী অহর্নিশি।

তারা দি'

শ্রীসুবোধ বসু

খুকী টেলিফোনে নতুন কথা বলিতে ও কথা শুনিতে শিখিয়াছে। কিন্তু বাড়ির লোকের হুঁসিয়ারির আর অন্ত নাই। 'শক্ত ক'রে ধরো', 'না, না, হাত ছাড়ব না', 'তুমি ওই সঙ্গেই ধরো নইলে ভেঙে ফেলবে', 'দুষ্টু মেয়ে, এই রকম করলে আর তোমাকে টেলিফোন ছুঁতে দেওয়া হবে না।' এই সকল অন্যায় বাধা নিষেধ ও সতর্ক শাসন এড়াইয়াই খুকী টেলিফোনের চোঙের উপর মুখ লইয়া, কোঁকড়া-চুলে ঢাকা অদেখা কানে বেকেলাইটের রিসিভারটা চাপিয়া ধরিয়া সহাস্য

মুখে বলে, 'রাঙা পিসি, তুমি চলে এস না ভাই ; চট্ ক'রে তারের ভিতর দিয়েই চলে এসো না।' 'নণ্টু দা, আমাদের পুষি আজ দুধ খায় নি, ও রাগ করেছে ; এমন দুষ্টু হয়েছে, পিঠ ফুলিয়ে সব্বার সঙ্গে ঝগড়া করছে।—তুমি যে ঘুড়ি দেবে বলেছিলে, তবে দিচ্ছ না কেন? তবে, আসি ভাই?' 'ওমা, রিণা মাসি! গলা শুনে আমি তো তোমাকে চিনতেই পারি নি? মীরা কোথায়? ফিরে এলে আমার কাছে নিশ্চয় নিশ্চয় ফোন করতে বলো ; ভারি জরুরি দরকার। যা বিচ্ছিরি শাড়ী দিয়েছে, অমন শাড়ী ডল্-মণিকে পরাতে গেলাম আর কি? বলে দিও, এবার যেন একটু ভালো করে তত্ত্ব করে?' 'কে ও, মিণ্টু কাকু? কি মোটা তোমার গলাটা, সাহেবদের মতো বিচ্ছিরি গলা—এগুস ব্যাগুস্! বাবা নেই। মা আছে—বাথরুমে। তিন ঘণ্টা যদি ধরে' বসে থাকতে চাও, বসে থাক। আমাকে বল্লেই তো চুকে যায়, বাপু। হি হি, আচ্ছা বাপু, নাই বল্লে ; পরেই করো। আর আমি ধরতে পারছি না, যতই বেশিক্ষণ ধরে রাখবে, ততই মিছিমিছি বেশি খরচ।'

টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিলে আর রক্ষা নাই। খাওয়া-পরা ফেলিয়া খুকী ছুটিবে সেদিকে। মনে মনে প্রার্থনা করিবে, বড়-রা যেন পূর্ব্বেই আসিয়া পড়িয়া তাহাকে এই অপূর্ব্ব সুযোগ ও প্রথমেই টেলিফোন ধরিবার গৌরব হইতে বঞ্চিত না করে।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, কেহ টেলিফোন করিবার পর, তবেই তাহাকে কথা বলিতে হয়। নিজ ইচ্ছামত যাহাকে খুসি ডাকিবার কৌশলটা তার আয়ত্ত হয় নাই। কাহাকেও ডাকিবার পূর্ব্বে মোটা ইংরেজি বইটা হইতে কি দেখার আছে সে ভাবিয়াই পায় না। চেনা লোকের নাম আবার বই হইতে জানিয়া লইতে হইবে নাকি? যাকে চিনি না, জানি না, হঠাৎ তার সাথে যদি একদিন গল্প করিতে ইচ্ছা হইল, তবে না হয় যত খুসী বই দেখ। তা ছাড়া চোঙটা মুখে তুলিয়া অঙ্ক বলিয়া যাওয়াটাও খুকীর হাস্যকর মনে হয়। ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর—মাথামুণ্ডু, কত কি! খুকী যদি একদিন সরাসরি টেলিফোন করিবার সুযোগ পায়, তবে সে কক্ষণো আবোল তাবোল নামতা আওড়াইবে না। সরাসরি ডাকিবে—"হ্যালো, হ্যালো, রাঙা পিসি, আমি খুকু। জিগেস রথি চ তুমি দুপুরে ঘুমুচ্চ কিনা। তোমাদের জেনির বাচ্ছা হলেই আমাকে জানিও। একট আমাকে দিতেই হবে।"

কিন্তু সুযোগ খুকীকে দেওয়া হয় না। তবে দুপুরে টেলিফোন আসিলে সবার আগে দৌড়াইয়া গিয়া খুকীই সে সব ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন বেয়ারা রামরূপ পূর্ব্বেই আসিন্দ টেলিফোন ধরায় খুকীর কাছ হইতে তাহাকে প্রচণ্ড খিমচি-আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। দু' একদিন বাবা মা'র কাছ হইতে অধৈর্য্যের জন্য তাহাকেও যে চড় চাপড়টি খাইতে হয় না এমন নয়। তবে পরিচিত লোকের কাছ হইতে টেলিফোন আসিলে কথা-শেষে খুকীকেও আলাপের অবকাশ দিতে হইবে, খুকীর এই অধিকার প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এমন সময় একদিন দুপুর বেলায় খুকী তাহার প্রথম সুযোগ পাইল। বাবা অফিসে, মা ঘুম দিয়াছে, ছোট কাকা বগলে লম্বা লম্বা খাম লইয়া উমেদারীতে বাহির হইয়াছে রামরূপ চাচাকে দেখিতে যাইবার নাম করিয়া ছুটি লইয়া চিড়য়াখানা দেখিতে গিয়াছে, সদু ঝি ওদিকের বারান্দায় বসিয়া ডালের বড়ি শুকাইতেছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ খুকী উপেক্ষা করিল না। চারিদিকে সন্ত্রস্তভাবে চাহিয়া, বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়া টিপিটিপি করিয়া হাঁটিয়া, ঘাড় ফিরাইয়া বার বার পিছনে চাহিয়া দেখিয়া খুকী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে।

কতক্ষণ ধরিয়া হাঁপাইয়া, ঢোঁক গিলিয়া, দরজার দিকে বার বার তাকাইয়া দেখিয়া তবে খুকী প্রকৃতিস্থ ও নিশ্চিন্ত হইল।

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া একদিক্ কানে চাপিয়া ধরিয়া চোঙের উপর ছোট মুখখানা লইয়া কহিল, 'হ্যালো, হ্যালো, রাঙা পিসি! আমি খুকু। আমি খুকু কথা বলছি, শুনচ রাঙা পিসি?'

কানের মধ্যে কিড়কিড় করিয়া শব্দ আসিল, 'নাম্বার প্লিজ্?'

'কে রাঙা পিসি? ও রকম করে কি বলছ? আমি খুকু।'

'খুকু?' তারের ওদিক্ হইতে এক বাঙালী মেয়ের কণ্ঠে জবাব আসিল, 'কত নম্বর চাও?'

'তুমি কি রাঙা পিসি?'

'না, আমি এক্সচেঞ্জ?'

'এক্‌চেন! তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনিই না। রাঙা পিসিকে একটু ডেকে দাও না, ভাই!'

'নম্বর বলো।'

'বাঃ রে, নম্বর দিয়ে আবার কি হবে! খুকু বললেই রাঙা পিসি বুঝতে পারবে।'

কানের মধ্যে আবার কিড়কিড় করিয়া একটা মৃদু হাসির শব্দ ও ইংরাজীতে অস্ফুটস্বরে কতগুলি কথা শোনা গেল। ইহার পর নারীকণ্ঠের কতগুলি মিলিত হাস্য স্পষ্ট হইয়া খুকীর কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। অনেকগুলো মেয়ে না? রাঙা পিসির বাড়িতে আজ নেমন্তন্ন বুঝি, নইলে এতগুলি মেয়ে আসিল কোথা হইতে?

'হ্যালো?' 'শুনচ খুকু, তোমার রাঙাপিসিকে তো খুঁজেই পেলাম না। বরঞ্চ আমার সঙ্গেই একটু গল্প করো না?'

'কি গল্প করব? তোমাকে তো আমি চিনিই না। কি নামই তোমার বাপু, এক্‌চেন্! ওরকম বুঝি আবার কারুর নাম হয়?'

'নামটা তোমার পছন্দ হলো না বুঝি,' একটা অবরুদ্ধ হাসির পশ্চাতে জবাব আসিল, 'তা তোমার পছন্দ না হলে না হয় একটু বদ্‌লেই রাখলাম। বদ্‌লে আমার নাম হলো তারা দি ; তারের এধারে আছি কিনা।'

তবে বেশ। তুমি একদিন তবে আমাদের বাড়ী এসো। আমার ডল্-মণির সঙ্গে চেনা করিয়ে দেব। এমন লক্ষী মেয়ে, কথা বলে' কক্ষনো জ্বালাতন করে না। আমাদের পুষিটা এমন দুষ্টু, একটু যদি কিছু বলেছ, অমনি রাগ করে' মুখ ভার করে থাকবে। জেনির একটা বাচ্চা হলেই আমাকে দেবে, রাঙা পিসি বলেছে।'

'ওঃ, তাই বুঝি জেনির বাচ্চা হচ্চে না কেন সেজন্য রাঙা পিসিকে তাগাদা লাগাতে যাচ্ছিলে?'

'দূর, তা নয়। আমচুর আর আছে কিনা তাই জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। তোমাদের ওখানে কি আমচুর আছে?'

'ঢের ঢের। আমরা ও খাই না ; যুদ্ধে পাঠিয়ে দিই। ওগুলো শত্রুর মুখের ভিতর ছুঁড়ে

মারা হয়। পরের দিনই তারা ম্যালেরিয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খতম্। বোমা, বারুদ, কামান, কিছুই আর দরকার হয় না। আমরা ওর নাম দিয়েছি আম-গুলি।'

'না বাপু, তোমাদের গুলি টুলি আমি খেতে চাই না', সভয়ে খুকী বলিল, 'তুমি পার তো আমায় একটু চকোলেট পাঠিয়ে দিও—আর শুনচো, রাঙা পিসিকে দেখতে পেলেই ডেকে দিও।'

'নিশ্চয় দেবো। আর চকোলেট এনে রাখব। কাল আবার আমার সঙ্গে কথা বলো, কেমন! তবেই চকোলেট পাবে। ঠিক এমনি সময়ে টেলিফোন করো, নইলে আমাকে ডেকেই পাবে না।'

'আচ্ছা বাপু, আচ্ছা। তবে চকোলেট বাপু তুমি তারের মধ্যে দিয়েই পাঠিও। লোক দিয়ে পাঠালে অমনি মায়ের চোখে পড়ে' যাবে। তা হলেই হয়েছে। এক রাশ জবাবদিহি। তারপর পিঠে—দুম্।'

টেলিফোনে আবার মিলিত অস্ফুট হাস্য শোনা গেল।

'আজকে তবে চলি, খুকু? কালকে ডেকো।'

'আচ্ছা তারা-দি। থ্যাঙ্ক ইউ। টা টা।'

কিন্তু পরের দিন ঠিক সময়মত টেলিফোন করিয়াও তারা-দিকে পাওয়া গেল না।

'হ্যালো, হ্যালো, কে? তারা-দি?'

'হোয়াট নাম্বার ডু ইউ ওয়াণ্ট?'

'আমি খুকু! খুকু। তুমি চিনতে পাচ্ছ না। এগুস ব্যাগুস বলচ কেন?'

'নাম্বার প্লিজ?'

'কে তুমি? তারা-দি নও? অমন ক্যানকেনে গলায় কথা বলচ কেন?'

'দিস্ ইস্ এক্স্চেঞ্জ? স্পিক আউট।' তারপর অস্ফুট গলায় যেন পাশের কারুর কাছে বলিল, 'শি মাষ্ট বি আ নটি গার্ল মাংকিয়িং উইথ দা টেলিফোন …।'

ব্যস্, তারপর আর জবাব নাই। খুকু প্রাণপণে অসীম ধৈর্য্য সহকারে যতই বলিতে লাগিল, 'হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো তারাদি', টেলিফোন হইতে আর টু শব্দটি বাহির হইল না। 'তা-রা-দি' বলিয়া খুকী প্রাণপণে চীৎকার করিল; তবু কোনও সাড়া মিলিল না। রাগিয়া খুকী সজোরে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিল। বলিল, 'কি মিথ্যুক তারা-দিটা। একটা সময় আমাকে দিয়ে তারপর নিজেই সময় রাখলে না। একটা ক্যানকেনে গলার মেমকে লেলিয়ে দিয়ে য়্যাগুস্ ব্যাগুস্ বলিয়ে দিলে। ভারি তো; চকোলেট না দিলে আমি যেন মরে যেতাম! না দিতে না দিতে তা পালিয়ে থাকা হলো কেন?'

কিন্তু মনটা খুকীর খারাপ হইয়া গেল। টেলিফোনের মধ্যে এক অচেনা দিদির সাক্ষাৎ পাইয়া তার বড় ভালো লাগিয়াছিল। তার নিজের তো একটাও দিদি নাই। বেশ পাওয়া গিয়াছিল একটা দিদি। কিন্তু সে দিদিটাও তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিল না। না দেখা গেল তার চেহারা, না পাওয়া যাইবে তার হদিস। এমন দিদি থাকিয়াই বা লাভ কি? অথচ এমন তাবে কাল কথা বলিল, যেন তোমাকে সে কতই ভালোবাসে। কি আমার ভালোবাসা রে! অভিমানে খুকীর দু'চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

খুকী স্থির করিল, নিজের দায়িত্বে টেলিফোন করিয়া এমন বিভ্রাট আর সে ঘটাইবে না। যাকে চাও না সে গায়ে পড়িয়া আসিয়া কথা বলিবে, এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা টেলিফোনের! তুমি চাহিলে রাঙাপিসিকে; উপস্থিত হইলেন তারা দি। চাহিলে তারা দিকে, তার জবাব দিল কোথাকার আর একটা নেকী মেয়ে! টেলিফোনের উৎপাতে কারুর সঙ্গে আর ভাব রাখিবার জো নাই। 'ভারি তো আমার দিদি, তারা দি! চকোলেট দেবার ভয়ে আর সাড়াটুকু দেওয়া হলো না। এমন দিদিকে দিদি বলতে আমার বয়ে গেল!'

সেদিন বিকাল বেলায়ই টেলিফোন কোম্পানীর এক চাপরাশী মিসেস্ মুখার্জ্জির নামে একটা চিঠি ও একটা প্যাকেট লইয়া উপস্থিত হইল। খুকীর মা মিসেস্ মুখার্জ্জি বিস্মিত হইয়া চিঠি খুলিলেন। তাতে লেখা: 'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তবে আপনি খুকীর মা, এই পরিচয়ই যথেষ্ট। আমি খুকীর 'তারা দি'। খুকীর জন্য এই সঙ্গে এক বাক্স চকোলেট পাঠালাম। দেখবেন, ওর পিঠে যেন দুম্ করে' কিছু না পড়ে। কাল দুপুর বারোটায় আমি টেলিফোন করব।'

'হ্যালো? কে? তারা দি? তুমি এমন লক্ষ্মী মেয়ে! এই তোমাকে আমি কিসি পাঠিয়ে দিলাম। না গো, পিঠে দুম্ ক'রে মোটেই পড়ে নি, শুধু কট্মট্ ক'রে তাকিয়ে ছিলেন। এমন তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। একদিন এসো না ভাই!'

'ওরে সর্ব্বনাশ! আমাকে দেখলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে যে!' 'কেন? ধ্যেৎ।'

'আমি যে কালো মেম সাহেব। কালো রঙের উপর স্কার্ট পরে' গটগট ক'রে ইংরিজিতে কথা বলি। আমি তো আর বাঙালী নই।'

'দূর্, এমন মিথ্যে কথা তুমি বলতে পার। তা হবে না ভাই, তারা দি! তোমাকে একদিন আসতেই হবে। আমার যে একটাও দিদি নেই। এসো, নিশ্চয়ই এসো কিন্তু। নইলে আমি যা রাগ করব। জেনির বাচ্চা হয়েছে। কি সুন্দর বাচ্চারে! দু'তিন দিন পরেই পিট পিট ক'রে তাকাবে। আমাকে এখনও দেয় নি, তবে দেবে বলেছে। তুমি এসো কিন্তু ভাই তারা দি! এখন তবে আসি। বাই বাই, টা টা।…'

ডাক্তার লাহিড়ীর বাগান

শ্রীকুঞ্জনাথ

মাধবের দিকে চেয়ে ডাঃ সেন বললেন—কোন নতুন খবর পেলে?

মাধব মাথা চুলকিয়ে বললে, খুব সামান্য খবর হুজুর! বাগানের লাশটাকে আমরা চিনতে পেরেছি। চমকে উঠে ডাঃ সেন জিজ্ঞেস করলেন, বল কি! কে লোকটা?

মাধব বললে, লোকটার নাম নগেন দাস। বুড়ো কর্ত্তার আমলে চাকরির উমেদারিতে অনেক দিন এখানে ঘোরাফেরা করেছিল। এদিকে অনেক দিন ওকে দেখি নি। শুনেছিলাম বাঁকিপুরে না কোথায় যেন কাজ করছিল। ওর একটা যমজ ভাই ছিল, অবিকল ওরই মত দেখতে; এখানে কোন্ কারখানায় যেন কাজ করত! আজ বিকেলেই বেচারা বেটক্করে কলের ছুরির তলায় পড়ে কাটা গেছে। ধড় থেকে মাথাটা প্রায় আলাদাই হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে আনা হ'ল, কিন্তু আমাদের বাবু ছুরি ধরতে না ধরতেই সব ফর্সা। হাসপাতালে ওকে

চোখের ওপরে মরতে না দেখলে বাগানের লাশটা দেখে আমি তো নগেনের ভাই যোগেন বলেই ভেবেছিলাম। নগেনের খোঁজ নিয়ে জানলাম—

বলতে বলতে মাধব হঠাৎ থেমে গেল ; কারণ তার কথায় কেউ সাড়া দিচ্ছিল না, সকলেই তখন অবাক্ হয়ে এক দৃষ্টে ফণী রায়ের দিকে হাঁ ক'রে চেয়েছিলেন। ফণী রায় তখন কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে শক্ত করে' নিজের কপালটাকে টিপে ধরে রয়েছেন,—কপালে যেন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হচ্ছে। এক মিনিট পরেই ফণী রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন,—চুপ্, চুপ্, চুপ্,—এক মিনিট চুপ্ করো তোমরা ; দোহাই তোমাদের, এক মিনিট ; কেবল আধখানা আমি দেখতে পাচ্ছি,—মাত্র আধখানা! ভগবান্, আমায় শক্তি দাও,—মগজখানা আমার একটা লাফ দিতে পারলেই পূরোপূরি দেখতে পাবে। আধখানা মাত্র—আধখানা দেখতে পাচ্ছি!

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফণী রায় যেন অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন ; তারপর মুখের ওপর থেকে যখন হাত সরালেন, শিশুর মত সহজ সরল হাসিতে মুখখানা তখন তাঁর ছেয়ে গেছে। মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, বাঁচা গেল। ডাঃ সেন, বাগানের এই খুনটা সম্বন্ধে কিছু আগে আপনি খড়্গ বাহাদুরকে পাঁচটা জটিল ধাঁধার কথা বলছিলেন না? সেই পাঁচটি প্রশ্ন যদি আমায় করেন, আমি তার জবাব দিতে পারি। (ক্রমশঃ)

রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

একাদশ কাণ্ড

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বেশভূষা পরে সত্যেন মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিল। এই সময়ে সান্ধ্য-ভ্রমণ করা তার প্রতিদিনের অভ্যাস।

সহসা হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো মন্নু সিং। একখানি চেয়ারের উপর ঝুপ করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলো। সত্যেন হতচকিত হয়ে পড়েছিল, জিজ্ঞেস করলো—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার ঘোরালো। গুণ্ডা লেগেছিল পিছনে,…

—তোমার পিছনেও গুণ্ডা? সত্যেনের আর বাহির হওয়া হোল না, সে মন্নুর সামনের চেয়ারখানি দখল করে বসলো।

খানিক বিশ্রাম নিয়ে, এক গ্লাস জল খেয়ে মন্নু সুরু করলো: হাওড়া থেকে ফিরছিলাম। ষ্টেশন থেকেই দুটি লোককে যেন সন্দেহ হোল। বড়বাজারে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম, লোক দু'টি কিন্তু কিছুতেই হারায় না। শেষে বাসে উঠলাম, তারাও উঠলো। রাসবিহারী এভেনিউর মোড়ে বাস্ থেকে নামলাম, তারাও নামলো। আমি যে পথে যাই তারাও সেই পথে আসে। আমি খুব জোরে জোরে হাঁটতে সুরু করলাম তবুও তারা ক্রমশঃ কাছাকাছি হতে লাগলো। হাতে কোন হাতিয়ার নেই, হঠাৎ তারা আক্রমণ করলে কি করবো? কাজেই ছুটতে সুরু করে দিলাম। তারাও ছুটলো। পথে যে কারুর কাছ থেকে একটু সাহায্য পাবো—তাও জনশূন্য। ভালো আলো জ্বলে না বলে সন্ধ্যার পর থেকে এ অঞ্চলে লোক চলাচল করে না, যা-ও-বা চলে

তা ট্রামে বাসে। তোমার বাড়ীটা কাছাকাছি না থাকলে কি বিপদ্ যে ঘটতো কিছুই বলা যায় না। ভাগ্যিস ফটক খোলা ছিল, ভিতরে ঢুকে ওদের মুখের উপরেই ফটক বন্ধ করে দিয়েছি। চাকরটা যা হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল! (ক্রমশঃ)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। খবরটি ছোট, কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে এত বড় দুঃসংবাদ ইদানীং খুব কমই আসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর যে কয়টি মহামানব পৃথিবীর সম্মুখে বাংলাকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শেষ ব্যক্তিটিও চলিয়া গেলেন। এ আঘাত সামলাইতে বাঙ্গালীর অনেক দিন লাগিবে।

প্রফুল্লচন্দ্রের মত এত বড় আদর্শ জীবন বিদ্যাসাগরের পরে বোধ হয় আর বাংলাদেশে দেখা যায় নাই। বড় বৈজ্ঞানিক, বড় সাহিত্যিক, বড় শিক্ষক, বড় দেশসেবক, সমাজ-সংস্কারক, দানবীর বা মানবপ্রেমিক আমাদের দেশে আরও হইয়াছেন কিন্তু একাধারে এতগুলি গুণের সংমিশ্রণ আর কাহারও মধ্যে দেখা গিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এদিক্ দিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের তুলনা হয় না।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলায় রাড়ুলি গ্রামে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন বিখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর প্রিয় ছাত্র। দেশের জ্ঞানী, গুণীর মধ্যে তাঁর যেমন নাম ছিল তেমনি মতামতও ছিল তাঁর খুব উদার। বড় হইয়া প্রফুল্লচন্দ্রের যে সমাজ-সংস্কারক রূপ আমরা দেখি তার মধ্যে তাঁর পিতার প্রভাব বড় কম ছিল না।

হরিশচন্দ্রের একটি ভারী চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। অতি অল্প বয়সেই প্রফুল্লচন্দ্র লাইব্রেরীর সমস্ত ভাল ভাল বই পড়িয়া ফেলেন,—বড় বড় লোকদের জীবনী, দেশবিদেশের কথা, বিজ্ঞানের গল্প, আরও কত কি! এই সময় হইতেই বিজ্ঞান জিনিষটি তাঁর বড় ভাল লাগে এবং বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক হইবার সাধ হয়। তিনি যখন মেট্রোপলিটন্ কলেজে এফ্.এ পড়িতেন তখন বিখ্যাত রাসায়নিক স্যর আলেক্‌জাণ্ডার পেডলার ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। প্রফুল্লচন্দ্র বাহিরের ছাত্র হিসাবে তাঁর ক্লাসে যোগ দিবার অনুমতি চাহিয়া নেন, ভাল করিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবার জন্য এক বন্ধুর বাড়ীতে ছোটখাট একটি ল্যাবোরেটরী তৈরী করিতেও ছাড়েন না।

তার পর? পরীক্ষা দিয়া গিল্‌ক্রিষ্ট বৃত্তি পাইয়া তিনি গেলেন বিলাত। এডিনবরা হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে ডি-এস্-সি উপাধি লাভ করিয়া দেশে আসিয়া হইলেন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নের অধ্যাপক। তার পর সুরু হইল তাঁর নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা। দেখিতে দেখিতে তাঁর নাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র দেখিলেন, একা একা বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তিনি আর কতটা অগ্রসর হইবেন! তার চেয়ে যদি দেশের মধ্যে একদল বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলেই কাজ হইবে অনেক বেশী। এই দিক্ দিয়াই প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতিত্ব সব চেয়ে বেশী। তিনি দেশের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার স্রোত বহাইয়া দিলেন এবং এমন একদল ছাত্র তৈরী করিয়া গেলেন যারা প্রতিভায় পৃথিবী শুদ্ধ লোককে অবাক্ বানাইয়া দিল। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর মেঘনাদ

সাহা, ডক্টর নীলরতন ধর, ডক্টর সত্যেন্দ্র বসু—কত নাম করিব? ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রি ডেভি যেমন বলিতেন—'আমার সব চেয়ে বড় আবিষ্কার আমার শিষ্য মাইকেল ফ্যারাডে', প্রফুল্লচন্দ্রও তেমনি বলিতে পারিতেন—'আমার সব চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমার বৈজ্ঞানিক ছাত্রদল।'

কিন্তু শুধু ছাত্রদল সৃষ্টিই প্রফুল্লচন্দ্রের একমাত্র কাজ ছিল না। বাঙ্গালীকে সব দিক্ দিয়া উন্নত করাও ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিমুখতা তাঁকে বড় কষ্ট দিত। বিজ্ঞানকে ব্যবসায়ে খাটাইয়া বাঙ্গালী যাতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে এজন্য তিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে,—বাঙ্গালীর সব চেয়ে বড় রাসায়নিকপ্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'। অতি সামান্য মূলধনে প্রফুল্লচন্দ্রই ইহা গড়িয়া তোলেন।

এ ছাড়া তাঁকে আমরা পাই দেশপ্রেমিক হিসাবে, সাহিত্যিক হিসাবে এবং বিশেষ করিয়া জনসেবক হিসাবে। কোথায় দুর্ভিক্ষ বাধিয়াছে, বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছে, প্রফুল্লচন্দ্র দল গড়িয়া তার সেবাকার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। পরাধীনতার পাপ দেশকে দলিত করিতেছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে রহিয়াছেন প্রফুল্লচন্দ্র। কোথায় সাহিত্য সম্মেলন হইতেছে, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ক্ষুরধার ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ পড়িতেছেন। বিদেশে ভারতীয়ের মর্য্যাদা নাই?—প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে রচনা করিলেন 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস'। বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেল—কি অদ্ভুত দেশ এই ভারতবর্ষ!

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক রূপে যোগ দিলেন। এই সময় হইতে তিনি বিজ্ঞান কলেজকেই তাঁর ঘরবাড়ী করিয়া লইলেন। বিজ্ঞান কলেজেরই দোতালার একটি ঘরে তিনি থাকিতেন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাসও তিনি সেইখানেই ফেলিয়া গিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র চিরজীবন অবিবাহিত ছিলেন—ছাত্রদের লইয়াই ছিল তাঁর সংসার।

প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি.এস্-সি পাশ করিয়া আমরা যখন বিজ্ঞান কলেজে এম্.এস-সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম তখন তিনি ক্লাস্ নেওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু তখনও তিনি রসায়নের প্রধান অধ্যাপক। আমিও রসায়ন শাস্ত্রেরই ছাত্র ছিলাম, কাজেই প্রত্যহ প্রফুল্লচন্দ্রের সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। দোতালায় রসায়ন বিভাগের লাইব্রেরীর ঠিক পাশের ঘরেই তিনি থাকিতেন। দিনের মধ্যে বহুবারই ঐ লাইব্রেরীতে আমাদের যাইতে হইত এবং প্রফুল্লচন্দ্রের নজরে পড়িলে সেই বৃদ্ধের হাতের একটি বজ্রমুষ্টি বা কিল কাঁধে বা পিঠে না খাইয়া কাহারও ভিতরে ঢোকার উপায় ছিল না। কাহারও চোখে পুরু চশমা থাকিলে তো কিলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইত—'চোখের মাথা এরই মধ্যে খাওয়া হয়েছে—ঁ্যা?' প্রায়ই দেখিতাম বারান্দায় খদ্দরের লুঙ্গি পরিয়া চটি পায়ে খালি গায়ে প্রফুল্লচন্দ্র চলিয়াছেন, কাঁধের উপর ভিজা কাপড়—স্নান সারিয়া নিজেই কাপড় মেলিয়া দিতেছেন। অথচ প্রফুল্লচন্দ্র জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। ঐ টাকা হইতে অত্যন্ত সাধাসিধা ভাবে জীবনধারণের জন্য যতটুকু দরকার তার একটুও বেশী তিনি নিজের জন্য রাখিতেন না—সবই নানা সৎকাজে—বিশেষতঃ শিক্ষার উন্নতির জন্য দান করিতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে যা বেতন পাইতেন তার এক কপর্দ্দকও তিনি নেন নাই, সবই ফিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কেই দান করিয়াছেন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। ক্লাস বসিবার ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে। বাস্ হইতে নামিয়া হন্তদন্ত করিয়া ছুটিয়াছি—এই বুঝি পার্সেণ্টেজ্‌টি ফস্‌কাইল! হঠাৎ সিঁড়ির নীচে কে যেন জামা ধরিয়া টান দিল। ফিরিয়া দেখি স্বয়ং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। 'খুব তো ছুটেছিস্, সব ফুরিয়ে গেল, না?' বলিয়া তিনি হাসিলেন, তার পর হঠাৎ পিছন দিক্ হইতে দু'হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পা দু'টি গুটাইয়া (আমার চেয়ে তিনি লম্বায় বড় ছিলেন) ঝুলিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'চল্ দেখি, আমাকে পিঠে ক'রে দোতলায় নিয়ে চল্ তো, দেখি তোর গায়ে কেমন জোর?' ছাত্রদের তিনি এত ভালবাসিতেন যে কাহাকেও প্রায় 'তুই' ছাড়া 'তুমি'ও বলিতেন না। তোমরা হাসিও না, বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে সেই অবস্থায় আমার পিঠে চড়িয়া দোতালায় উঠিয়া তবে ছাড়িলেন এবং যাইবার সময়ে পুরস্কার স্বরূপ আমার পিঠে আরও গোটা দুই ঘুঁষি বসাইয়া বলিলেন, 'সাবাস্।' এ সব ঘটনা আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

বাংলার দুর্ভাগ্য, এমন সঙ্কটের দিনে এ হেন মহামানবটিকে আমরা ভাগীরথী-তীরে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি।

সন্দেশ

সহযোগী 'মৌচাকের' বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি তার রজত-জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে। এ পর্য্যন্ত আর কোন ভারতীয় শিশু-মাসিকের পক্ষে এত বড় গৌরব অর্জ্জনের সৌভাগ্য ঘটে নি। এ দিক্ দিয়ে শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসে মৌচাকের কৃতিত্ব অসাধারণ। আমরা মৌচাক আর তার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়কে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সম্প্রতি বাংলার বিভিন্ন শিশু-মাসিকের সম্পাদক, লেখক ও শিশুসাহিত্য-প্রকাশকদের নিয়ে, এঁরা যাতে বিভিন্ন ব্যাপারে এক যোগে কাজ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে, "শিশুসাহিত্য-পরিষদ্" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। কৈশোরক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই পরিষদের সভাপতি, এবং রামধনু-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও রংমশাল-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এর যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এর কার্য্যালয় হয়েছে—৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুদ্ধের খবর মিত্রপক্ষেরই অনুকূলে চলেছে। পশ্চিম ইয়োরোপে তারা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে, ওদিকে পূবেও রুশরা প্রায় জার্ম্মানীর সীমান্তে এসে হাজির হয়েছে।

এ মাসের রামধনুর আকার দেখে তোমরা হয়তো বিস্মিত হবে। কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়ই অজানা নেই যে গত ১২ই জুন থেকে ভারত সরকার অত্যন্ত কঠোরভাবে কাগজ নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেছেন। এই আদেশ অনুসারে দেশের সমস্ত সাময়িক পত্রিকাকে তাদের পত্রিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ কমাতে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে রামধনুর পৃষ্ঠা-সংখ্যা, এত দিন যা ছিল তার, এক তৃতীয়াংশেরও কম করতে হবে। কাগজের অভাবে ইতিপূর্ব্বেই আমরা রামধনুর কলেবর অসম্ভব রকম কমাতে বাধ্য হয়েছিলাম, এই আদেশের ফলে পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। সমস্ত দেশ যুড়ে এই নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলছে। আমরাও, সমস্ত শিশু-মাসিক একত্র হয়ে, শিশু-মাসিকগুলোকে (যাদের একটা বড় কাজ ছোটদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার) সরকারের এই কঠোর আদেশ থেকে রেহাই দেওয়াবার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু এখনও কোন ফল পাই নি। কয়েক দিন অপেক্ষা ক'রে শেষ পর্য্যন্ত আমরা আইন অনুযায়ী পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমিয়েই এ সংখ্যা প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমানোর জন্য এবারে অনেক কিছুই দেওয়া সম্ভব হ'ল না। এমন কি ধাঁধা এবং তার উত্তরও নয়। সেগুলি বারান্তরে বেরোবে। আশা করি তোমরা ব্যাপারটি ভুল বুঝবে না, এবং এ ক্ষেত্রে তোমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতিই আমরা পাব।—রাঃ সঃ

=রোমহর্ষণ শিহরণ পরিপূর্ণ ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী=

ছদ্মনামে স্বপ্রকাশ

—সব্যসাচী বিরচিত—

প্রথম গ্রন্থ :	মুখোশের অন্তরালে	এক টাকা
দ্বিতীয় গ্রন্থ :	- - মৃত্যুদূত - -	এক টাকা
তৃতীয় গ্রন্থ :	- ব্লাড্‌ হাউণ্ড -	এক টাকা
চতুর্থ গ্রন্থ :	- কালের কবলে -	(যন্ত্রস্থ)

প্রতি মাসের ১লা তারিখে একখানি করিয়া বাহির হয়।

= বিশ্বপ্রতিভা সিরিজের =

নূতন গ্রন্থ

বলদর্পী হিটলার (যোগেশচন্দ্র) ১৲

যাদুকর মার্কনী (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ) ১৲

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস্‌ (যন্ত্রস্থ)

বাহির হইল ! বাহির হইল !!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন

মূল্য—পাঁচ সিকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর ঃ * ঃ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই...

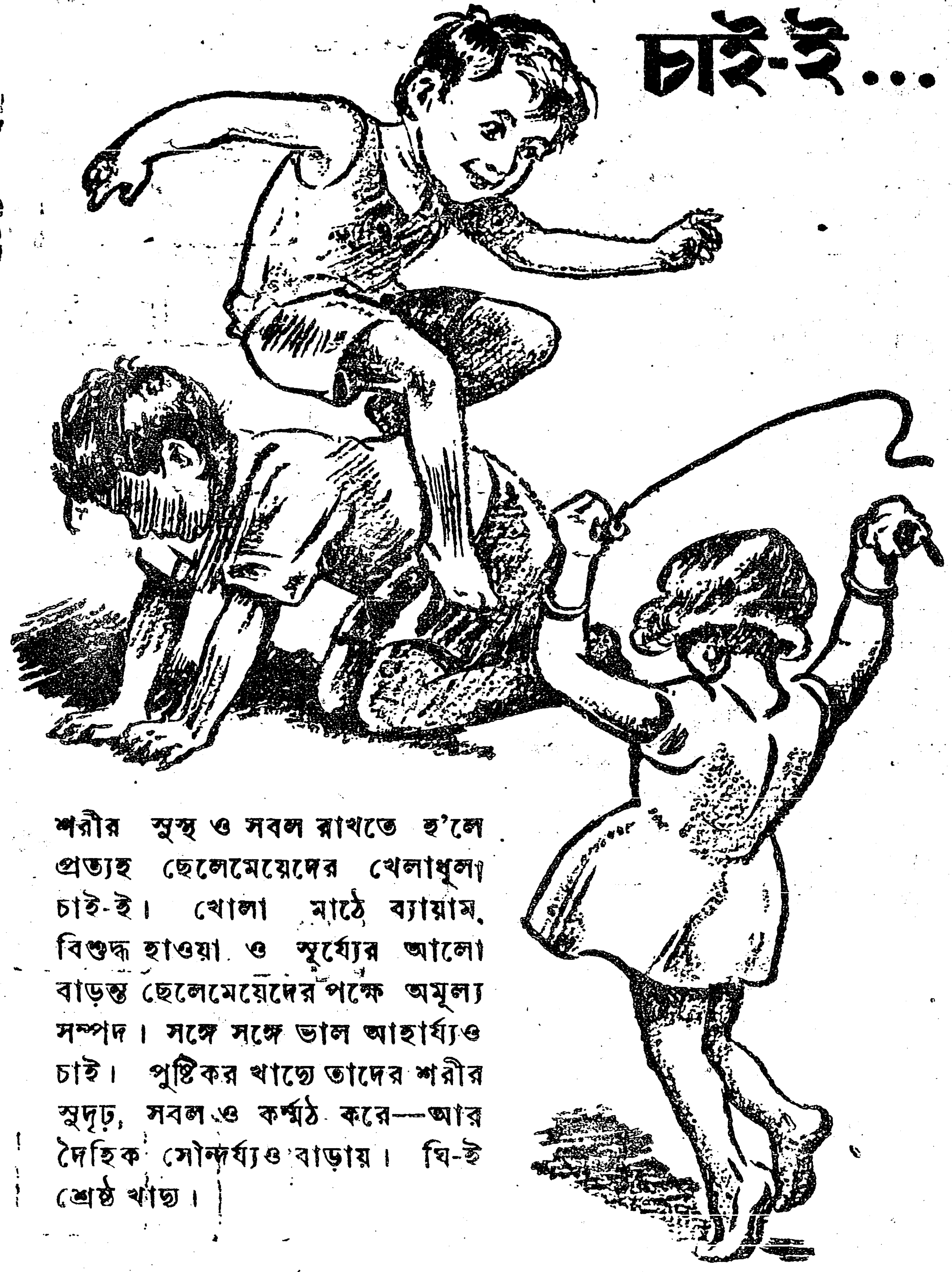

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সঙ্গে সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—আর দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়। ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

লক্ষ্মী ঘি

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৭শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
ভাদ্র,
১৩৫১

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ / মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা / মূল্য ৮ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

বার্ষিক ৩
ষান্মাসিক ১৷৵০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

Regd. No. C—1641

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই...

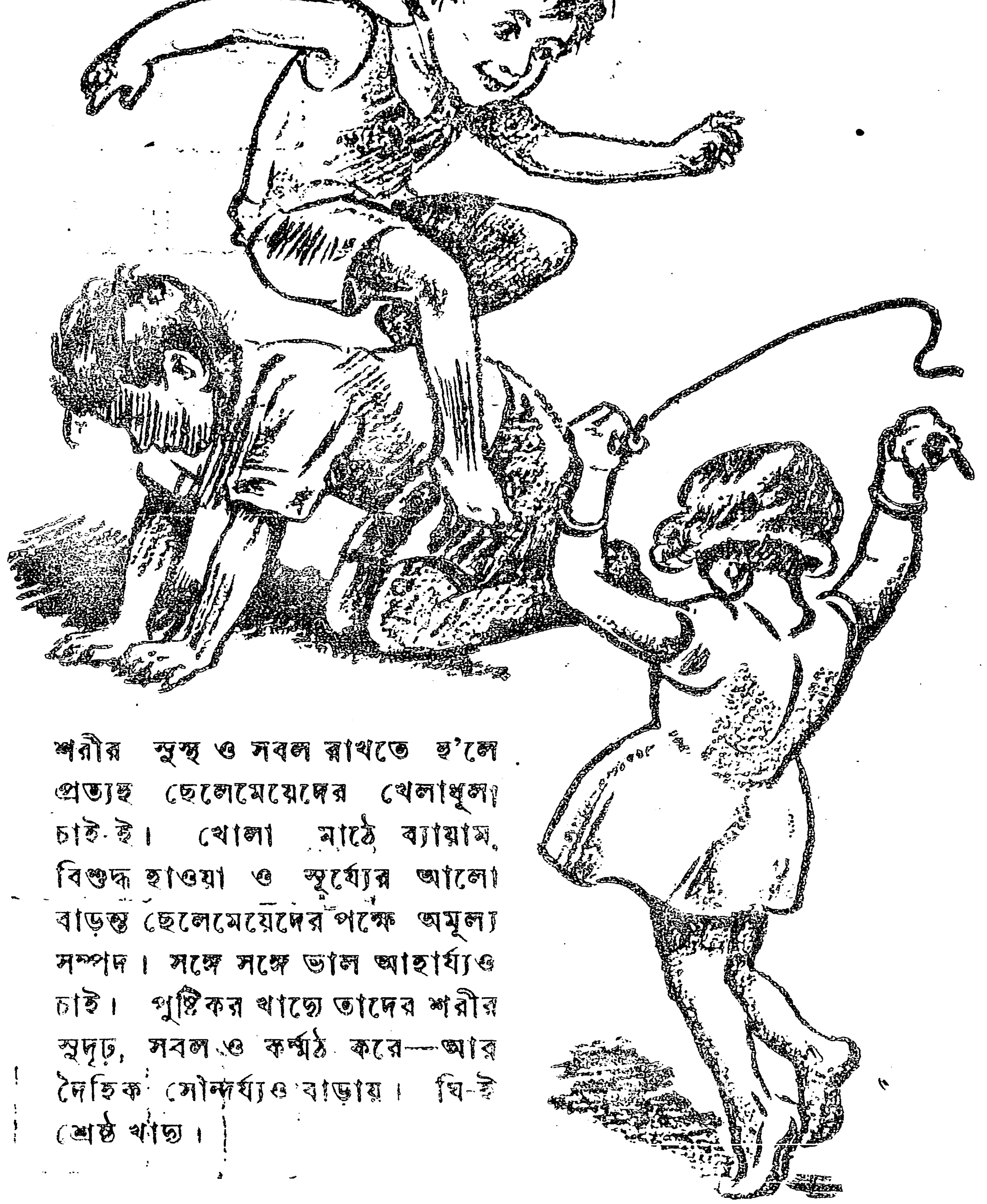

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সঙ্গে সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—আর দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়। ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

লক্ষ্মী ঘি

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক: শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৭শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
ভাদ্র
১৩৭১
২

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৮ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১৷৶৹
প্রতি সংখ্যা ।৶৹

INTENTIONAL DUPLICATE EXPC

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তেল ব্যবহার করুন
২৪৩ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা
ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৫১

চন্দ্রমাণিক ইন্দ্রমাণিক

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

"না খেলিও দাবা রে
না খেলিও দাবা",
মানা দিয়ে বলেছিলেন
চন্দ্রনাথের বাবা।
দাবা খেলায় মগ্ন ছিলেন
উদয়গড়ের রাজা,
শত্রু এসে রাজ্যি নিল
রাজা পেলেন সাজা।
চন্দ্রমাণিক বলে, "ভাই
ইন্দ্রমাণিক রে,
বাবা যখন আপিস যাবে
খেলব খানিক রে।"
ইন্দ্রমাণিক বলে, "দাদা,
দোষ দিয়ো না শেষে।"
চন্দ্র বলে, "জানবে না কেউ
দেখবে না কেউ এসে।"
খেলা যখন উঠল জমে
ইন্দ্র মারে ঘোড়া,
চন্দ্র তার মন্ত্রীটাকে
করে দিল খোঁড়া।
মন্ত্রী-শোকে অন্ধ হয়ে
ইন্দ্র মারে চাঁটি,
চন্দ্র তখন তুলে নিল
মস্ত এক লাঠি।
ইন্দ্র পালায়, চন্দ্র তাড়ায়,
পাড়ার লোক জোটে,
"কী হয়েছে" বলে সবাই
দিগ্‌বিদিকে ছোটে।
পুলিশ এসে নিয়ে গেল
ভাই দু'টিকে থানায়,
কেবলরাম চাকর গিয়ে
বাপকে তাদের জানায়।
"না খেলিও দাবা রে
না খেলিও দাবা",
থানার থেকে আনার সময়
বলেছিলেন বাবা।

আমসত্ত্ব-শিকার

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"দাদা, দাদা! আমসত্ব!!" বিনি লাফাতে লাফাতে এসে বলল। আমিও লাফিয়ে উঠ্‌লাম—"কোথায় রে?"

"গোকুলদা'র দোকানে।" জানাল বিনি। "আইভিদি কিনে এনেছে দেখলাম। এই মাত্র।"

এখন, আমসত্ত্বের নামে আমার লাল পড়ে। আম আমি ততটা ভালবাসি নে—আম আমার সহ্য হয় না। আম নিজে ঠিক অসহ্য না হলেও, আম খেলে আমার সর্দ্দি হয়—আর সর্দ্দি হলেই হাঁচি আসে—দু' হাজার পাঁচ হাজার হাঁচি—সেটা এক অসহ্য ব্যাপার। যেমন আমার, তেমনি আশে পাশের আর সবাইকার। আশ্চর্য্য কি? আমার হাঁচির ধাক্কা আমি নিজেই সইতে পারি না—যারা পর, যারা আমার হাঁচির আপনার নয়, তারা কেন সইতে যাবে?

অতএব, আমসত্ত্বকে আমি ভালোবাসি। ও আমাকে হাঁচায় না। আমের মধ্যে যেটুকু সত্য, যেটুকু আমার প্রথমার্দ্ধ, আর যেটুকু সুন্দর, আঁঠি, আঁশ আর খোসা বাদে তাই যেন ঘন হয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে, অপরূপ আমসত্ত্ব-রূপ নিয়েছে। অতি উপাদেয় আমসত্ত্ব।

গোকুলদা'র দোকানে গিয়ে পড়লাম। গোকুল, গোকুলের বাবা, মা আর ছোট বোন সবাই মিলে আড়ালে বসে কি যেন চাখছিল, আমি যেতেই লুকিয়ে ফেল্‌ল ফস্‌ ক'রে। লুকিয়ে মুখ মুছে গম্ভীর হয়ে গেল সকলে। সারা গোকুলপুরী আমার আগমনে অন্ধকার দেখা গেল।

"গোকুল, আমাকে একটু আমসত্ব দেবে?" আমি বল্লাম। "কোথায় পাবো আমসত্ব? বলে, আমই চোখে

দেখতে পাই না—" গোকুল ভালো ক'রে মুখটা মুছে ফেলল।

"দেখবে কি ক'রে? আমসত্ব হয়ে গেলে তার পরে আমকে কি আর দেখা যায়? আমের আমত্ব লোপ পেয়েই তো আমসত্ব হয়। যেমন দুধ মরে গিয়ে—দুধ মরে গিয়ে—"

দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আমি মুস্কিলে পড়ি। দুধ মরে গিয়ে কী যে হয় কিছুতেই আমার মনে পড়ে না। মানুষ ভূত হয় জানি, মুরগী মারা পড়লে কাট্‌লেট্‌ হয় তাও জানা আছে, কিন্তু দুধ মরে গিয়ে—যাচ্চলে!

কিন্তু দুধকে আর বেশীক্ষণ মৃত্যুমুখে ফেলে রাখা যায় না। কিছু একটা বিহিত করতে হয়। অগত্যা...

"—দুধ মরে গিয়ে যেমন রসগোল্লা, পান্তুয়া, জিবেগজা, জিলিপি আর ছানার পায়েস হয় তেমনি—"

"দুধ মরে গিয়ে জিলিপি হয় না।" গোকুলের মা তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন।

"জিবেগজাও না।" গোকুলের বোন আমাকে জানায়।

কিন্তু আমি কি তেম্‌নি ছেলে যে বাধা পেলেই 'তেমনি'তে গিয়ে ঠেকে থাকব? আমিও বলে' নিই—

"—তেমনি আমের আশা পূর্ণ হলে, যদি নিতান্ত আমাশা হয়ে না দাঁড়ায়, যদি সেই আম কোনগতিকে অন্যের পাকস্থলীর বাইরে নিজেকে নিজগুণে হজম করতে পারে তা হলেই অনিবার্য্য রূপে আমসত্ব হয়ে দাঁড়ায়। আমের সেই নিজেকে আত্মসাৎই হচ্চে আমসত্ব।"

গোকুলের বাবা এতক্ষণ কিছু বলেন নি। দুধ মরে ছানার পায়েস হওয়ার বিষয়ে ওঁধার থেকেও হয়ত একটু আপত্তি আসবে আমি আশা করেছিলাম, কিন্তু ততক্ষণ তিনি নীরবে মুখ টিপে—টিপে টিপে কি যেন চিবুচ্ছিলেন; কিন্তু এবার কোঁৎ ক'রে গিলে নিয়ে একটী কথা বল্লেন—"তোমার মুণ্ডু।" সাধারণতঃ বেশী কথা তিনি বলেন না।

"দাও আমাকে সেই আমসত্ব।" আমিই বলি অবশেষে।

"কোথায় পাবো? আমসত্ব আমি কখনো চোখেই দেখি নি—" গোকুল বলতে থাকে।

"কি ক'রে দেখবে? ও তো চোখে দেখার বস্তু নয়, চেখে দেখার জিনিষ। এতক্ষণ ধরে তোমরা ত চেখে চেখে দেখেছ—এবার আমিও একটু দেখতে চাই।"

"স্বচ্ছন্দে। আমার দোকান তো পড়েই আছে. মিছে খুঁজে পেতে দেখ, যদি দেখতে পাও। আমরা কি মিথ্যে বলছি—?" গোকুল এবার একগাদা লবঙ্গ নিজের মুখে ফেলে দিল। আমি কি ওর মুখের মধ্যে গিয়ে আমসত্বর খোঁজ করব, ভেবেছিল নাকি?

আমি পাঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলাম। আর তেমন তেমন ক'রে খুঁজলে কী আর না মেলে? ছাইয়ের ভেতরের লুকানো রতন থেকে আরম্ভ ক'রে বড় বড় চোর, ডাকাত, খুনের আসামী—এমন কি ভগবান্ অবধি অনেক যত্নেরই দর্শন পাওয়া যায়। একটু খুঁজ্‌তেই আমসত্ত্বর চাপড়াটা আমার হাতে এসে গেল, যেমন ক'রে মানুষ হাতে স্বর্গ পায়—অবিকল সেই রকম।

"আচ্ছা, এখন আমি চল্লাম। দামের কথা পরে বিবেচ্য।" চাপ্‌ড়াটা আঁকড়ে নিয়ে আমি দোকানের প্রতি পিঠ ফেরাই। "যা হয় দেখা যাবে'খন পরে।"

গোকুল হাঁ হাঁ ক'রে হাঁকড়ে এল—"ও কি! কি হচ্চে? পালাচ্ছ যে বড়? বলছি না যে আমার আমসত্ব নেই? আর থাক্‌লেও আমি তা' বেচব না?" গোকুল গাল ফুলিয়ে চ্যাচাতে থাকে। এবং ওর তিনকুল —বাবা, মা আর বোন—আকুল হয়ে হাঁস্ ফাঁস্ করে; কি করবে ভেবে পায় না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গোকুলের চেহারা বদ্‌লে গেল। তার মারমূর্ত্তি দেখলাম। কপালের দু' পাশের রগ্ ফুলে উঠেছে—চোখ টকটকে লাল। তার দু' হাতের মাশুল—দ্বিগুণ বেড়ে গেছে—ডাকের মাশুল বেয়ারিং হলে যেমন বেড়ে যায়। জামার হাতা গুটিয়ে, বুক ফুলিয়ে আমার সম্মুখে সে এগিয়ে এল। খুন করবার সময়ে মানুষের চেহারা নাকি এই রকম বদ্‌লে যায় শোনা গেছে।

আমি তো সাম্‌নে গোকুলের স্থলে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম। কিন্তু দেখলে কি হবে, এত কষ্টের আমসত্ত্বকে তো ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসা যায় না! আমি ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করি।—

"দেখ গোকুল, এই জন্যেই আমাদের বাঙালীর কখনো উন্নতি হয় না। সামান্য একটু আমসত্ত্বের জন্য তুমি কিরূপ আচরণ করছ—ভেবে দেখ একবার।

ভাবলে তুমি নিজেই লজ্জিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছেন 'বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে কে আর দেখিবে?' অথচ তুমি আমাকে মোটেই দেখচ না—তার বদলে তুমি তোমার আমসত্ত্বকেই শুধু দেখচ। কিন্তু আমসত্ব কি তোমার বাঙালী? আর বিবেকানন্দ বলেছেন—'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।' তিনি আরো বলেছেন, 'জীবে দয়া ক'রে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' ভেবে দেখ, আমসত্ব কিছু চালাকি নয়—এবং তার দ্বারা জিব বা জিবের প্রতি দয়া করা যায়—আমসত্ত্বের দ্বারাই এই মহৎ কাজ করবার সুযোগ তুমি পেতে পারো। তুমি যদি চালাকি না ক'রে আমসত্ত্বটা দিয়ে দাও তা হলে সত্যই জিবে দয়া করা হল—এবং আমার জিবের প্রতি দয়া করে তোমার ঈশ্বরের সেবা হয়ে যাবে। জিভের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন বলে গেছেন বিবেকানন্দ। আজ কত শত শত—কত লক্ষ লক্ষ—কত না মর্ত্ত্যবাসী—কত না আমাদের ভারতবাসী যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে—আর তুমি সামান্য এই আমসত্ত্বকে আমাকে দিতে পারচ না? ছিঃ গোকুল, ছিঃ! তুমি সভ্য সমাজের কলঙ্ক। এ কাজ তোমার যোগ্য নয়। তোমার উপযুক্ত কাজ না। এমন ব্যবহার তোমার কাছে আমরা আশা করি নি—" এর পরে মেদিনীপুরের ঝড়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, মহামারী, সেদিনের সাইরেন-ধ্বনি—সমস্ত আমি এনে ফেল্লাম—এবং তখনো আমার হাতে প্রফুল্লচন্দ্রের চাঁছা চাঁছা কথা আর রবীন্দ্রনাথের 'হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে' সম্পূর্ণ মজুদ্। সেই সঙ্গে 'অন্ন চাই প্রাণ চাই' তাও তৈরী রয়েছে, ছাড়ি নি তখনো। কিন্তু আর দরকার হ'ল না ছাড়বার—আমিই জিতে গেলাম। যখন এই সব আমি ঝড়ের মত বয়ে চলেছি—বলে চলেছি—

গোকুলের বাবা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লেন—"দোহাই বাবা, রক্ষে কর! ভগবানের দোহাই! বাবা গোকুল, হতভাগাটাকে আমসত্ত্বটা দিয়ে বিদায় ক'রে দাও। মেরে তাড়াও—না যদি যায়। আর তো সহ্য হয় না।"

কিন্তু আমাকে মেরে তাড়াতে হ'ল না—আমসত্ত্বের তাড়াতেই আমি চলে এলাম।

ডাক্তার লাহিড়ীর বাগান

শ্রীকুঞ্জনাথ

ফণী রায়ের কথা শুনে ডাঃ সেনের নাকের ওপর থেকে চশমাখানা ঝুপ করে খসে পড়ে গেল; তবু বললেন, 'প্রথম প্রশ্ন, ছুরি দিয়ে খুন করা যেতে পারলেও হত্যাকারী কুকরী ব্যবহার করলে কেন?'

শান্ত ভাবে ফণী রায় বললেন, 'ছুরি দিয়ে মাথা কেটে ফেলা যায় না বলেই কুকরী ব্যবহার করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেহ থেকে মাথাটাকে আলাদা করবার দরকার হয়েছিল।'

খড়্গ বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' সে কথার জবাব না দিয়ে ফণী রায় ডাঃ সেনকে বললেন, 'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?'

ডাঃ সেন বললেন, 'লোকটা চেঁচায় নি কেন?' ফণী রায় বললেন, 'এর উত্তর ওই কচি ডালের টুকরো ক'টা। ওগুলোর কথা ভুলে গেলে চলবে না। গাছপালা থেকে দূরে ফাঁকা জায়গায় ওগুলো পড়ে রয়েছে কেন? ওগুলো হাত দিয়ে ছেঁড়া নয়, অস্ত্র দিয়ে কাটা। হত্যাকারী ওগুলোকে শূন্যে ছুড়ে ছুড়ে টুক্‌রো ক'রে কুক্‌রিতে তার পাকা হাতের খেলা দেখিয়ে লোকটাকে বুঝতে দেয় নি যে তাকে খুন করা হবে। তারপর যেই সে লোকটা কাটা ডালের টুকরোগুলোকে লক্ষ্য করবার জন্য একবার উবু হয়েছে অমনি এক কোপেই শেষ।'

ডাঃ সেন মাথা চুলকে বললেন, 'তা হয়ত হ'তে পারে, কিন্তু অচেনা লোকটা বাগানে এল কি ক'রে?' ফণী রায় বললেন, 'বাগানে কোন অচেনা লোক আসে নি।'

হঠাৎ হা-হা ক'রে হেসে উঠে মাধব বললে, 'বলেন কি ঠাকুর মশায়! তা হলে বাগানের এই লাশটা মিছে কথা? বাগানে কেউ ঢোকে নি?'

নিজের মনে চিন্তা করতে করতে ফণী রায় বললেন, 'বাগানে ঢুকেছিল! না, কথাটা বোধ হয় পুরোপুরি সত্যি নয়।' ডাঃ সেন বললেন, 'সে আবার কি! হয় বলুন ঢুকেছিল, নয় বলুন ঢোকে নি। দুটোর একটা হবে তো?'

মাথা নেড়ে ফণী রায় বললেন, 'সব সময়ে তা হয় না। আপনার চতুর্থ প্রশ্নটা কি ডাক্তার?'

ডাঃ সেন বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনার কোন অসুখ

TIGHT BINDING

বেছে ; কিন্তু শুনতে চান যখন, বলছি। আমার চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে ধরণীবাবু সকলকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন কি ক'রে ?'

বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না ক'রে ফণী রায় বললেন, ধরণীবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান নি।'

ডাঃ সেন চমকে উঠলেন, 'বেরিয়ে যান নি!' ফণী রায় আগের মতই জানালেন, 'না ; পুরোপুরি যান নি।'

ভুরু কুঁচকিয়ে ডাঃ সেন বললেন, 'মাথা খারাপ! হয় বলুন গেছেন, নয় বলুন যান নি। 'পুরোপুরি যান নি'— এ আবার কি কথা! এ সব আজগুবি কথা শুনে নষ্ট করবার সময় আমার নেই ; আমি চল্‌লাম।'

সবিনয়ে বাধা দিয়ে ফণী রায় বললেন, 'চটবেন না বন্ধু ; বন্ধুত্বের খাতিরেও আমায় আপনার পঞ্চম প্রশ্নটি ক'রে যান।'

ফিরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়েই ডাঃ সেন জিজ্ঞেস করলেন, 'মাথার কাটা দাগগুলো অদ্ভুত ধরণের কেন? কাটা মাথায় আঘাত করাই বা হয়েছে কেন?'

নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে ফণী রায় বললেন, 'এ সম্বন্ধে আপনারা যা ধারণা করেছেন কেবলমাত্র আপনাদের মনে সেই ভুল ধারণার সৃষ্টি করবার জন্যই এ ভাবে আঘাত করা হয়েছে,—যাতে আপনাদের মনে হতে পারে যে, ধড়টা যার মাথাটাও তার।'

হতবুদ্ধি হয়ে সকলে থ' মেরে রইলেন।

ফণী রায় বলেই চললেন, 'বন্ধুগণ, বাগানে আপনারা নগেন দাসের মৃতদেহ পান নি ; কোন অচেনা লোকেরই মৃতদেহ পাওয়া যায় নি। ডাঃ সেনের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিতে আঘাত লাগলেও আমি বলব নগেন দাস নয়, তার যমজ ভাই যোগেন দাসের মৃতদেহকে আংশিক ভাবে দেখা গেছে। ভাল ক'রে দেখুন আপনারা, টেবিলের ওপরে যে লাশটা পড়ে রয়েছে তাকে আপনারা কেউ চেনেন না ; কিন্তু এই লাশটা দেখুন তো?—' বলেই তিনি অপরিচিত মৃতদেহটার মাথাটা সরিয়ে রেখে তার জায়গায় দ্বিতীয় মাথাটা বসিয়ে দিলেন। চোখের পলকে যেন একটা ভেল্কী খেলে গেল ; সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন টেবিলের উপরে সুপরিচিত ধরণীবাবুর মৃতদেহ শায়িত। (ক্রমশঃ)

রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সত্যেন বললে—রমেশ বাবুকে একটা ফোন করে দিই, পুলিশ যদি কোন কিনারা করতে পারে।

পুলিশের উপর তোমার এখনও অগাধ বিশ্বাস আছে দেখছি!—মন্টু হাসলো। তোমার কেস্‌টা এই ক'মাসে ওরা কি করলো?

—তা বলে তুমি ভেবো না যে ওরা চুপ করে বসে আছে। একজন ভালো গোয়েন্দার হাতে এই কেস্‌টি দেওয়া হয়েছে ক'দিন আগে তার প্রমাণ পেয়েছি। সেদিন রাত্রে ভিখারীর মত দাড়ী-গোঁফওলা এক লোক এসে বেশ ভারিক্কী চালে জিজ্ঞেস করলো—তোমার বাবা কোথায়? রবি ঘোষ কেমন আছেন, শৈলেন বাঁড়ুয্যের ঠিকানা কি?

—তুমি কি বললে?

—বললাম শৈলেন বাঁড়ুয্যে ভারত রক্ষা আইনে বন্দী আছে ; তার ঠিকানা আমি জানি না।

শৈলেন বাঁড়ুয্যে!—মন্টু খানিকক্ষণ কি চিন্তা করলো, তারপর বললে—শৈলেন বাবু ক'দিন আগে জেলখানা থেকে পালিয়েছে। দু'তিন দিন আগে হবিগঞ্জ জেলের মধ্যে কি একটা গোলমাল হয়েছে। সেই গোলযোগের সময়ে শৈলেন বাঁড়ুয্যে আর ক'জন কয়েদী পালিয়েছে।

—কই, কাগজে তো কিছু বেরোয় নি! তুমি এ খবর পেলে কোত্থেকে?

—আমি যে এর মধ্যে ঘুরে এলাম হবিগঞ্জ থেকে। আমার এক আত্মীয় আছেন সেখানে। যেদিন সেখানে গেছি তার আগের দিন রাত্রে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ওই সম্পর্কেই বোধ হয় সেই গোয়েন্দাটী এসেছিল তোমার কাছে খোঁজ নিতে, তোমার কেস্ সম্পর্কে নয়। যাক্ গে, সে যা হয় পরে তো দেখতেই পাওয়া যাবে, এখন আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসবে চল দিকি?

—সেই গুণ্ডাগুলো হয়তো এখনও বাইরে অপেক্ষা করছে...

—বয়ে গেল ; তোমার তো মোটর আছে।

—মোটর থাকলে কি হবে, পেট্রল?

—ওঃ, তা হলে ওটা এখন লোক-দেখানো মোটর গাড়ী? যাক্, আমি তা হলে একাই যাই...

সত্যেন লজ্জা পেলে। বললে, চলো, আমিও যাচ্ছি।

—তারপর একা ফিরতে ভয় করবে না তো?

—করে একটু করবে, তাতে তোমার বাড়ী যাওয়া তো আটকাবে না?

দু'জনে হাসতে হাসতে পথে বেরিয়ে পড়লো।

দ্বাদশ কাণ্ড

পথ 'ঘনমসী-অবলুপ্ত।' তা হোক, দু'জনে যেতে ...য় করে না।

চারিপাশের আলোহীন শব্দহীনতার মধ্যে সব কথা যেন ফুরিয়ে যায়। মনে হয় আমি একাকীই চলেছি ...রণ-নদীর তট ধরে। সঙ্গী আমার মন, আর সম্বল আমার চিন্তা। নিজের পদশব্দের প্রতিধ্বনি কখন বা কানে বাজে, মনে হয় আমার সঙ্গে আরো একজন বোধ হয় অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সে বোধ আমারই প্রেতাত্মা।

সহসা কে যেন পাশে আর্তনাদ করে উঠলো। সত্যেন চকিত হয়ে টর্চের আলো ফেললো। পাশের ফুটপাথে ...ানুষের মিছিল। দলে দলে লোক শুয়ে আছে, ঠাণ্ডায় ...পযুক্ত আবরণের অভাবে মানুষগুলো কুঁকড়ে গেছে ; ...দেরই মধ্যে কেউ হয়তো কেঁদে উঠলো।

টর্চের আলো ওদের বুকের পাঁজরের উপর এসে ...টকে যায়। প্রতি নিঃশ্বাসে পাঁজরগুলি হাঁপাচ্ছে, ...খনি ফেটে পড়বে বুঝি! কিন্তু ফাটে না। ধুক্ ধুক্ ...রে কাঁপতে থাকে পথের ধূলোর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে। ...বনের সব উপেক্ষা আর অপমানকে নিঃশেষে ভোগ না ...রিয়ে এদের হৃদ্‌পিণ্ডের ধড়ফড়ানি থামবে না।

মান্টু সিং বললে—আলোটা নিভিয়ে দাও, ওদের পানে আমি তাকাতে পারি না। (ক্রমশঃ)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

বড়দের জীবনের ছোটখাট গল্প হইতে তাঁহাদের চরিত্র ...ন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ...ন্ধে এই রকম দু'টি গল্প তোমাদের বলিব। আচার্য্য ...মুখে গল্প দু'টি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

স্থান : কোনও এক রেল্-ষ্টেশনের ২য় শ্রেণীর বিশ্রাম-গৃহ (ওয়েটিং রুম্)। সময় রাত্রি। আচার্য্য একখানি ঈজি-চেয়ারে শুইয়া আছেন। শীতকাল। তাঁহার গায়ে আছে মান্ধাতার আমলের এক ওভার কোট্। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে কেউ বুঝি দয়া করিয়া ঐ পুরানো কোটটি দান করিয়াছে। কাছেই ভ্রমণোপযোগী ট্রাঙ্ক ও বিছানার বাণ্ডিল। সাঙ্গোপাঙ্গেরা বাহিরে গিয়াছে।

একজন সাহেবের চাপরাশী কুলির মাথায় মালপত্র দিয়া সেখানে আসিল। জিনিষগুলি সাজাইয়া, কুলিকে বিদায় দিয়া, আচার্য্যের পাশে আর একখানি খালি ঈজি-চেয়ার দেখিয়া সে তাহারই উপর নিজ দেহ এলাইয়া দিল। কিন্তু তাহার ভাবটা সজাগ ও সতর্ক। একটু শুইয়াই উঠিয়া বসিল। আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমারা সাহাব কব্ আয়েগা?" (তোমার সাহেব কখন আসবে?) আচার্য্য তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া কৌতুক অনুভব করিলেন। আচার্য্যের অতি পুরাতন ওভার কোট্, শ্যামবর্ণ শীর্ণ শরীর এবং রুক্ষ শ্মশ্রুগুম্ফ-মণ্ডিত মুখের মধ্যে যে প্রতিভা ও সহৃদয়তার ছাপ ছিল তা বুঝিবার মত শক্তি চাপরাশীর ছিল না। কৌতুক ভরে আচার্য্য বলিলেন, "আবি আবে গা" (এখনি অসবেন।)

চাপরাশীর কান সতর্ক ছিল। একটা শব্দ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহার সাহেবের পদশব্দ। কিন্তু কই, তাহার সহযাত্রী তো উঠিল না! একটু পরেই সে সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখিল তাহার সহযাত্রীটি, তাহার সঙ্গে যেমন হাসিমুখে কথা বলিতেছিল তেমনি হাসিমুখেই, তাহার মনিবের সহিতও সমানে ইংরাজীতে গল্প করিয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় গল্পের স্থান প্রেসিডেন্সী কলেজের ১ম বার্ষিক শ্রেণীর বক্তৃতা-গৃহ। আচার্য্য ছেলেদের লইয়া মজা করিতে ভাল বাসিতেন, তাঁহার ক্লাস্ প্রায়ই থাকিয়া থাকিয়া ছাত্রদের হাস্যকলরবে মুখরিত হইয়া উঠিত। তা ছাড়া তিনি অনেক সময় পড়ানো শেষ হইলে ছেলেদের আটকাইয়া না রাখিয়া ২।৫ মিনিট আগেই ক্লাস্ ছাড়িয়া দিতেন। ছেলেরা ছাড়া পাইয়া প্রচুর কোলাহল করিতে করিতে বারান্দা দিয়া যাইত, তাহাতে কাছাকাছি অন্য ক্লাসের পড়ায় কিছুটা ব্যাঘাত হইত, ঐ সব ক্লাসের অধ্যাপকেরা অস্বস্তি বোধ করিতেন। অবশেষে একদিন

TIGHT BINDIN

ঐ সব অধ্যাপকদের একজন গিয়া তৎকালীন অধ্যক্ষ রো সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলেন। রো পরদিনই আচার্য্য রায়কে সমঝাইয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। এদিকে অন্য একজন অধ্যাপক ঐ কথাবার্ত্তার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বন্ধুভাবে আচার্য্যকে আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিলেন।

পরদিন কিন্তু আচার্য্য একটু বেশী আগেই ক্লাস্ ছাড়িয়া দিলেন। খবর পাইয়া ক্রুদ্ধ অধ্যক্ষ রো উত্তেজিত ভাবে ঘড়ি হস্তে (তখনকার দিনে হাত-ঘড়ি ছিল না) তাঁহার ক্লাসে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই একটা কিসের তীব্র গন্ধ ভাসিয়া আসিল। সাহেব একটু কাসিলেন, কিন্তু না দমিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ক্লাস্ এত আগে ছাড়া হয়েছে কেন?" প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্ব্বেই আবার তাঁহার প্রচণ্ড কাসি আসিল। আচার্য্য বলিলেন, "আপনি কি বলতে চান আমি ছেলেদের মেরে ফেলব?" অধ্যক্ষের তখন অবস্থা কাহিল, দারুণ কাসির বেগে দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সাধ্য নাই। তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। তার পর আর তিনি কখনও আচার্য্যকে ঘাঁটান নাই।

ব্যাপারটা হইয়াছিল কি জান? সেদিন একটা কাবোর্ডের মধ্যে প্রচুর 'সাল্‌ফুরেটেড্ হাইড্রোজেন' গ্যাস ভরিয়া রাখা হইয়াছিল। অত্যন্ত তীব্র এই গ্যাস। যেমনই দুর্গন্ধ তেমনই একবার নাকে ঢুকিলে নাকাল করিয়া ছাড়ে। অধ্যক্ষ রো আসিতেছেন শুনিয়াই আচার্য্যের নির্দ্দেশে কাবোর্ডের মুখটি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আর ঐ তীব্র গ্যাসের গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। রো সাহেব ধমকাইবেন কি, পালাইবার পথ পান নাই।

খাওয়ার রকমফের

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

কিছুদিন আগে তোমাদের অজগরের খানার কথা বলা হয়েছিল। অজগর খাবার গিলে খায়, আর গেলার পর তা হজম করতে ১২।১৪ দিন লেগে যায়। জীব-জগতে খাওয়ার যে কত রকমফের আছে তা ভাবতেও অবাক্ লাগে।

যে সব জীব উদ্ভিজ্জ খাবার খেয়ে থাকে তাদের আমরা নিরামিষাশী বলি এবং খুব নিরীহ ব'লে তারিফ করি। কিন্তু সত্যি ক'রে ভেবে দেখতে গেলে ব্যাপারটা কি রকম? গাছেরা জল-বাতাস, মাটী থেকে নিজের নিজের খাবার তৈরী করে নেয়। সে ভাবে খাবার তৈরী করবার সাধ্য নেই অথচ অবলীলাক্রমে তাদের পরিশ্রমের ফল ছিনিয়ে নেওয়াটা কি রকম ভদ্রতা? মাংসাশী প্রাণীরা আবার সেই সব নিরামিষাশীদের ধরে খায়। অর্থাৎ গাছের খাদ্যের যে সারাংশ নিরামিষাশীরা দখল করেছিল, এরা তাদের দেহ থেকে নতুন করে আবার সেই সারাংশ কেড়ে নেয়। চার্ল্‌স্ ডারুইন সাহেবের ঠাকুরদা' (তিনিও একজন মস্ত পণ্ডিত লোক) বলতেন, "আরে আমরা তো সবাই নিরামিষাশী। মাংস যেটা খাচ্ছি সেটা তো আসলে ঐ শাক-পাতার সাহায্যেই তৈরী হচ্ছে!"

গাছের সবুজ পাতার মধ্যে ক্লোরোফিল নামে একটা জিনিষ আছে। তাই দিয়ে তারা সূর্য্যের আলোর সাহায্যে প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে নিজেদের খাবার তৈরী করে নেয়। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে, কোন কোন প্রাণীও ঠিক গাছের মত ঐ ভাবে সূর্য্যালোকের সাহায্যে নিজেদের খাবার তৈরী করে নিতে পারে। এদেরও শরীরে ঐ রকম ক্লোরোফিল থাকে। সবুজ "বেল্-য়্যানিম্যাল্‌কিউল্", "ইউগ্লেনিড্‌স্" প্রভৃতি এই ধরণের জীব। অবশ্য জীব হলেও এরা যে খুবই নিম্নস্তরের জীব তা তো বুঝতেই পারছ!

আরও কয়েক জাতের ছোটখাট সবুজ প্রাণী আছে। যেমন ধর, সবুজ য়্যামিবা, সবুজ প্রবাল, সবুজ সামুদ্রিক ফুল বা য়্যানিমোন্, সাদা জলের স্পঞ্জ, হাইড্রা প্রভৃতি। এদের অবশ্যি শরীরে কোন ক্লোরোফিল্ নেই, কিন্তু তার বদলে আছে উদ্ভিদ্ বন্ধু। য়্যাল্‌গী নামে এক জাতের ক্ষুদে উদ্ভিদের নাম তোমরা শুনে থাকবে। এই সবুজ প্রাণীরা সব সময়েই সঙ্গে কতকগুলি য়্যাল্‌গী "বন্ধু" নিয়ে বাস করে, তাই ঐ রকম সবুজ দেখায়। এই য়্যাল্‌গী 'বন্ধুরা' সূর্য্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরী করে, আর সেই সঙ্গে ঐ প্রাণীদের অক্সিজেন যোগায়। আর তার বদলে তারা পায় প্রাণী বন্ধুদের দেওয়া কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড আর নাইট্রোজেন। বেশ মজার বন্দোবস্ত নয় কি?

আবার গাছেদের মধ্যে কয়েক জাতের গাছ আছে যারা

জানোয়ারদের মত অন্য প্রাণী ধরে খায়। নেপেন্থাস, ভিনাস্ ফ্লাইট্র্যাপ্ প্রভৃতি গাছের কথা তোমরা আগেই রামধনুতে পড়েছ। এদের কারও বা পাতার সঙ্গে গেলাসের মত থলি ঝুলান থাকে, কোন পোকামাকড় সেই থলির মধ্যে পড়লেই থলির ঢাকনা বন্ধ হয়ে যায়; তার পর গাছ ধীরে ধীরে সে পোকা হজম করে। যেমন নেপেন্থাস্। কারো বা পাতার গায়ে দাঁতের মত খাঁজ কাটা থাকে; কোন পোকা পাতার উপর বসলেই দু'ধার থেকে জাঁতিকলের মত পাতার দু'ধার মুড়ে গিয়ে তাকে বন্দী করে ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে তাকে হজম করলেই হ'ল। যেমন ভিনাস্ ফ্লাইট্র্যাপ্। এই ধরণের মাংসখোর গাছ আরও আছে। কোন কোন ভ্রমণকারী বলেন আফ্রিকার জঙ্গলে নাকি এমন গাছ আছে যারা শুধু পোকামাকড় নয়, বড় বড় জানোয়ার ধরেই খায়। তবে বৈজ্ঞানিকেরা সে রকম কোন গাছের পরিচয় এখনও পান নি।

সামুদ্রিক ঝিনুক, স্পঞ্জ—এরা কি ভাবে খাবার যোগাড করে জান কি? এদের কাজ আর কিছু না, মুখ খুলে চুপ্‌চাপ্ পড়ে থাকা। সমুদ্রের জল অবিরাম এদের শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে যায়। সেই জলে থাকে নানারকম ক্ষুদে (বেশীর ভাগই এত ছোট যে অণুবীক্ষণ দিয়ে তবেই দেখা যায়) প্রাণী বা উদ্ভিদ্। তারাই হচ্ছে ওদের খাবার। সামান্য এক কণা খাবারের জন্য কত রাশি রাশি জল যে তাদের গিলতে হয় তার ঠিক নেই। অবশ্য সে জল আবার সবই বেরিয়ে যায়।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে সেই সব প্রাণীর খাওয়া যারা অপর জীবের শরীরের ভিতরে বাস ক'রে তাদের খাবারের অংশ কেড়ে নেয়। কৃমি এই জাতের প্রাণী। জীবন্ত প্রাণীর (মানুষ, শূয়োর প্রভৃতি) পেটের ভিতর যে অন্ত্র আছে এরা বাস করে তারই মধ্যে, আর সেখান থেকেই নিজেদের খাবার সংগ্রহ করে। ফিতে কৃমির না আছে মুখ, না আছে শরীরের ভিতর খাদ্য গ্রহণের থলি বা পথ। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, এরা যাদের শরীরে বাস করে তাদের কাছ থেকে একেবারে হজম-করা খাবারই আদায় করে নেয়, আর সে খাবার এদের গায়ের চামড়া দিয়ে সটান শরীরের মধ্যে ঢুকে দেহ পুষ্ট করে।

পূর্ণিমা

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার, এম্.এ.বি.এল্

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[গহন বনের মধ্যে একটি নিভৃত নিকুঞ্জ পত্র ও পুষ্পে সুশোভিত। গান গাহিতে গাহিতে রাধা ও সখীগণের প্রবেশ—"আজি বিভোর পরাণ মোর শ্যাম কিশোর কই লো কই!"]

ললিতা। এ কি, কুঞ্জ যে এখনও অন্ধকার! শ্যাম কই?

বিশাখা। এখনই হয়তো এসে পড়বেন। আয় আমরা সবাই এখানে বসে তাঁর প্রতীক্ষা করি। [সকলের উপবেশন] (নেপথ্যে কৃষ্ণের নূপুর-ধ্বনি)

বিশাখা। ওই যে শোন্, ওই আসছেন। [নেপথ্যে কৃষ্ণকণ্ঠে সঙ্গীত।]

ললিতা। আয় ভাই, একটা মজা করা যাক্। আজকে আমরা আগে দেখা দেব না। ঐ কুঞ্জের আড়ালে লুকুই চল্।

সকলে। (উঠিয়া) হাঁ হাঁ, তাই চল্, তাই চল্।

ললিতা। কিন্তু দেখ, একটু বাঁশী বাজলেই বা একবার নাম ধরে ডাকলেই যে সবাই সুট সুট করে বেরিয়ে আসবি তা কিন্তু হবে না। আজ ক'দিন উনি আমাদের যা কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ভাল মত শোধ তুলতে হবে।

সকলে। বেশ তো, বেশ তো, তাই হবে, সে বেশ মজা হবে।

রাধা। শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তর্য্যামী, তাঁর কি জানতে কিছু বাকি থাকবে ভেবেছ?

বিশাখা। জানলেন তো বয়েই গেল। আমাদের দেখা ত' আর পাচ্ছেন না!

বৃন্দা। কিন্তু দেখিস ভাই, সেই ছলনাময়ের সঙ্গে ছলনা করতে গিয়ে আবার উল্টে বিপদে না পড়িস্।

চম্পক। বিপদ্ আবার কি? একবার দেখাই যাক্ না কার জিত হয়।

ললিতা। তোমাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে লুকোতে হবে রাধা! তুমি যে হঠাৎ মাঝখানে দেখা দিয়ে সব গোলমাল করে দেবে তা কিন্তু হবে না।

ললিতা। ঐ যে এসে পড়ল বুঝি। আয় রে, শীগ্‌গীর

TIGHT BINDIN

ায় তোরা। সাবধান, একটি কথাও কইবি না কিন্তু। কেবারে চুপচাপ লুকিয়ে থাকবি।

[সকলে কুঞ্জের অভ্যন্তরে গেল।] (ক্রমশঃ)

এবছরের ফুটবল

কলকাতার ফুটবল মরশুম শেষ হয়ে এল। লীগে থম বিভাগে গত বারের মত এবারেও চ্যাম্পিয়ান্ হয়েছে নপ্রিয় মোহনবাগান দল। ১ পয়েণ্ট কম পেয়ে ২য় য়েছে মহমেডান স্পোর্টিং দল। খেলার প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগানের খেলা দেখে সবাই প্রায় নিঃসন্দেহ ছিল য এবারেও তারা লীগ্ বিজয়ী হবে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে হমেডান স্পোর্টিং এমন ভাল খেলতে লাগ্‌ল যে এই দু'দলের ধ্যে শেষ খেলা না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ বুঝতে পারে নি শেষ পর্য্যন্ত কারা কাপ্ পাবে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে বশেষে এই খেলা সুরু হ'ল। মোহনবাগান ইতিমধ্যে রিয়ান্সের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাওয়ায় হমেডান্ স্পোর্টিং এক পয়েণ্ট এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ দিন যদি খেলা 'ড্র'ও হয় তা হলেও তারাই চ্যাম্পিয়ান্ বে। কিন্তু মোহনবাগানের তরুণ খেলোয়াড়দের ম্মিলিত আক্রমণের কাছে তারা এঁটে উঠতে পারল না।

এরিয়ান্স ছাড়া মোহনবাগান লীগে আর একটি মাত্র খলায় হেরেছে—বি. এণ্ড্ এ. আর দলের কাছে। হমেডান স্পোর্টিং ও ইষ্ট বেঙ্গল দু' বারই মোহনবাগানের াছে পরাজিত হয়েছে। লীগে ৩য় হয়েছে ইষ্ট বেঙ্গল দল বং ৪র্থ হয়েছে বি. এণ্ড্ এ.আর। সকলকার নীচে রয়েছে রঞ্জার্স ও পুলিশ দল। ২য় বিভাগে রবার্ট্ হাডসন দল কানও খেলায় না হেরে চ্যাম্পিয়ান্ হয়েছে।

লীগের পরে আই.এফ্.এ শীল্ড। বাইরের শক্তিশালী লের মধ্যে নাম করবার মত ছিল মহীশূর রোভার্স্ দল মার ২।১টা মিলিটারী দল। এদের মধ্যে রয়াল এঞ্জিনীয়ার্স্ হমেডান্ স্পোর্টিংকে হারিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সেমি ফাইনালে ঠেছিল। ইষ্ট বেঙ্গল লীগে তেমন ভাল না করলেও শীল্ডে াল খেলেছে। সেমিফাইনালে মোহনবাগানকে হারিয়ে তারা ফাইনালে উঠেছিল। তোমাদের হয়তো মনে আছে ত বারেও ইষ্ট বেঙ্গলই শীল্ড পেয়েছিল, এবং তার আগের বারেও তারা ফাইনালে উঠেছিল। পর পর তিন বার ফাইনালে ওঠা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। কিন্তু এবার তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না; বি.এণ্ড.এ.আর তাদের দু' গোলে পরাজিত ক'রে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

বি.এণ্ড এ.আরই একমাত্র রেল দল যারা আই.এফ্.এ শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করল। এদের খেলোয়াড়েরা সকলেই ভারতীয়।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

শক্তি

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নি কহে, "জল, তোর শক্তি কিছু নাই,
মোর কোপে মুহূর্ত্তেই হয় সব ছাই।"
জল কহে, "সেই কোপ হইলে তোমার
তখন দেখাব, ভাই, শকতি আমার।"

চিঠিপত্র

এ মাসের রামধনুর পৃষ্ঠা-সংখ্যা থেকে বুঝবে যে গভর্ণমেণ্টের নতুন কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ থেকে কিছুটা বা সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাবার যে চেষ্টা আমরা করছি তা এখনও ফলপ্রদ হয় নি। সমস্ত সাময়িক পত্রিকাকেই রামধনুর মত পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমাতে হয়েছে। শ্রাবণ সংখ্যায় যাঁরা এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন, ভাদ্র সংখ্যায় তাঁদেরও এ আদেশ মানতে হবে।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মত রেখে যত দূর সম্ভব বেশী লেখা যাতে আঁটান যায় আপাততঃ তাই আমাদের করতে হ'ল। এবারে রামধনুর 'মার্জ্জিন' ও ছাপার ধরণ দেখলেই তা বুঝবে। এইভাবে আমরা এক পৃষ্ঠায় আগেকার প্রায় দেড় গুণ লেখা দিতে পারব। তোমাদের কাছ থেকে যে অজস্র সহানুভূতিসূচক চিঠি পেয়েছি সে জন্য ধন্যবাদ। তোমাদের শুভেচ্ছার জোরে এ দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে পারব ব'লে ভরসা করি। —রাঃ সঃ

সন্দেশ

রুশরা প্রুশিয়ার উপর ক্রমাগত চাপ দিতে সুরু করেছে। জার্ম্মান্‌রা তাদের পরাক্রমে পর্য্যুদস্ত হয়ে ক্রমেই পিছিয়ে আসছে। ইটালীতেও মিত্রপক্ষ ফ্লোরেন্স দখল করেছে। ইটালীর যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যেরা খুব বীরত্ব দেখাচ্ছে। এদিকে নর্ম্যাণ্ডিতেও মিত্রপক্ষ একটু একটু ক'রে এগিয়ে চলেছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে একটা অদ্ভুত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটেছে। একটা ৬০ ফুট উঁচু তিনতলা বাড়ী হঠাৎ মাটীতে বসে যেতে থাকে এবং দু' ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ বাড়ীটা মাটীর তলায় বসে যায়; শুধু চূড়াটা উপরে জেগে থাকে। বাড়ীর বাসিন্দারা সময় থাকতে বেরিয়ে আসায় কোন প্রাণহানি হয় নি। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, বাড়ীর কাছে একটা প্রাচীন কূয়ো মাটী ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বাড়ীর তলাকার ভিতটাও একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছিল, তাই হয়তো এই বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটেছে।

নূতন ধাঁধা

শ্রীঅজিতকুমার সেন

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা পাঁচজন। প্রথম দু'জন যখন ত, সাদা হয়ে গলাগলি ক'রে দাঁড়ায়, তখন তাদের গজায় পাখা, বাকী তিনজনকে আর আমলই দেয় না। বাকী তিনজনও ছাড়বার পাত্র নয়, আলাদা হ'তে তাদেরও নিষেধ নেই, এবং সার বেঁধে দাঁড়ালে ত্রিভুবনের একখানা আসন তাদের জন্য ছেড়ে দিতেই হবে।

পাঁচজন একত্র হ'লে কিন্তু আর রেষারেষি নেই, তখন তাদের কাজ শুধু লোকের উপকার করা। চিনতে পার?

(ধাঁধার উত্তর তোমরা বার ক'র এবং আসছে মাসে উত্তর বেরোলে মিলিয়ে দেখ'। ধাঁধার উত্তর পাঠাবার দরকার নেই—কারণ, দেখছই তো, কাগজে জায়গা নিয়ে কি রকম আঁটাআঁটি!)

<u>আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর :</u>— ১=একে, ২=শাল, ৩=বন, ৪=জালা, ৫=বার, ৬=পায়, ৭=কারে, ৮=কটা, ৯=গিয়া, ১০=চট, ১১=মনে, ১২=হায়, ১৩=বাতি। (উত্তরদাতাদের নাম স্থান সংকুলান হ'লে পরে বেরোবে।)

দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা দিলে
দেহের স্বাস্থ্য ও শ্রী অব্যাহত থাকে
ডেন্টনিক
দিয়া নিত্য দাঁত মাজিলে শুধু যে
দাঁত উজ্জ্বল হয় তাহা নহে, দাঁতের
মূল ও মাঢ়ি শক্ত হয় এবং সর্বপ্রকার
দন্তরোগ নিবারিত হয়।
চার আউন্স প্যাকেটে পাওয়া যায়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

=রোমহর্ষণ শিহরণ পরিপূর্ণ ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী=

ছদ্মনামে স্বপ্রকাশ

—সব্যসাচী বিরচিত—

প্রথম গ্রন্থ : মুখোশের অন্তরালে এক টাকা

দ্বিতীয় গ্রন্থ : - - মৃত্যুদূত - - এক টাকা

তৃতীয় গ্রন্থ : - ব্লাড্ হাউণ্ড - এক টাকা

চতুর্থ গ্রন্থ : - কালের কবলে - (যন্ত্রস্থ)

প্রতি মাসের ১লা তারিখে একখানি করিয়া বাহির হয়।

= বিশ্বপ্রতিভা সিরিজের = বাহির হইল ! বাহির হইল !!

নূতন গ্রন্থ

বলদর্পী হিটলার (যোগেশচন্দ্র) ১৲

যাদুকর মার্কনী (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ) ১৲

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস্ (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন

মূল্য—পাঁচ সিকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর ঃ ❋ ঃ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই...

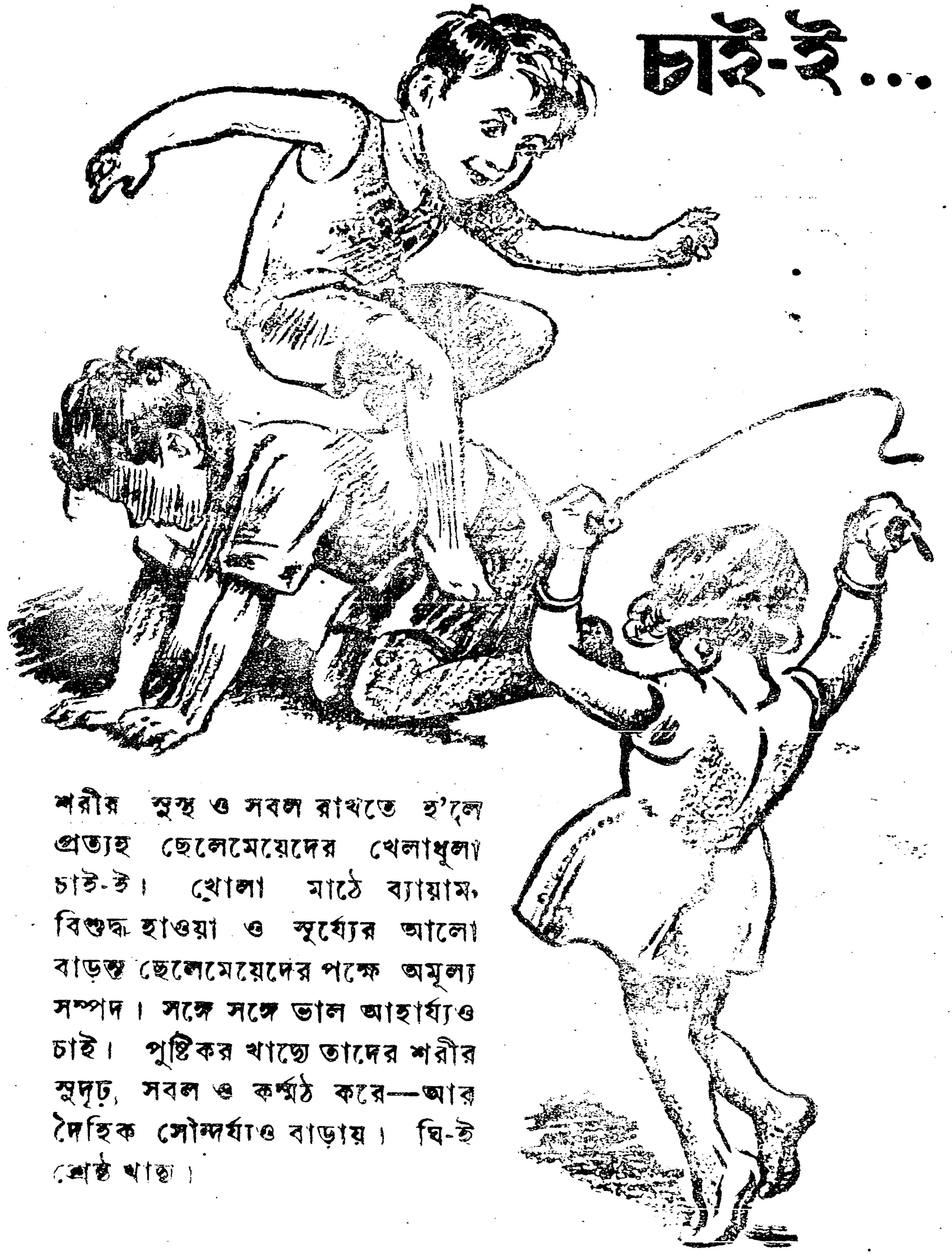

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সঙ্গে সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—আর দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়। ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

লক্ষ্মী ঘি

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস.সি

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷৽ আনা

মাত্র ১৪ টী ঔষধ } { মূল্য ৮ টাকা

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীবিবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
স্মৃতিরঞ্জিত

রামধনু

১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৫১

একটি সন্ধ্যা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

বসে আছি চুপ্‌টি ক'রে কুটীরখানির দাওয়ায় ;
শরীর যেন জুড়িয়ে গেল সন্ধ্যাবেলার হাওয়ায়।
হঠাৎ আঁধার দূর হয়ে যায় চাঁদা-মামার চাওয়ায় ;
ঝিলমিলিয়ে উঠ্‌লো ধরা জ্যোৎস্না-আলো ছাওয়ায়।
গন্ধরাজের গন্ধ আসে স্নিগ্ধ হাওয়ার বাওয়ায় ;
তৃপ্ত হলো রাতের ভোমর ফুলের মধু খাওয়ায়।

সাঁঝের আসর উঠ্‌লো জমে আকুল পাখীর গাওয়ায় ;
ডানায় তাদের শব্দ জাগে আকাশ-পথে ধাওয়ায়।
জোনাক্ পোকার ভিজ্‌লো ডানা শিশির-জলে নাওয়ায় ;
আলো-ছায়ার চল্‌ছে খেলা মেঘের আসা-যাওয়ায়।
আমার চোখে ঢুল লেগে যায় শান্তিটুকু পাওয়ায় ;
বসে আছি চুপ্‌টি ক'রে কুটীরখানির দাওয়ায়।

মহাপুরুষের বাণী

(ওমর খৈয়াম)

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

যে দিন গিয়াছে তার তরে বৃথা ক্ষোভ,
যে দিন আসে নি তার প্রতি বৃথা লোভ।
গত অনাগত দুয়েরেই ভুলে যাও,
আগেও চেয়ো না, পিছেই বা কেন চাও ?
যে দিন এসেছে কর তারে মধুময়,
খতায়ে দেখ এ জীবন ব্যর্থ নয়।
সব দিনগুলি ভর যদি সম্ভোগে,
ধন্য জীবন গড়িবে তা একযোগে।

কণিকা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

মূর্খেরা যেথা বক্তা, সেথায় জ্ঞানীর উচিত্ নীরব থাকা,
বর্ষা-আসরে ভেকেরা মুখর, বৃথাই সেথায় কোকিল ডাকা।

ডাক্তার লাহিড়ীর বাগান

শ্রীকুঞ্জনাথ

ফণী রায় ব'লে চললেন, 'হত্যাকারী বাগানে ধরণীবাবুর মাথা কেটে হাতিয়ারখানা দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ফেলে দিয়েছে। কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে ধরণীবাবুর মাথাটাও দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ফেলে দিতে সে ভোলে নি। তারপর আর একজনের একটা মাথা তাঁর ধড়ের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে দিয়েছে।'

খড়্গ বাহাদুর বলে উঠলেন, 'ননসেন্স! আর একটা মাথা কোত্থেকে আসবে? মাথা তো আর বাগানে হামেসা পাওয়া যায় না!'

জুতোর ডগা দিয়ে 'মাটি খুঁটতে খুঁটতে নিশ্চিন্ত ভাবে ফণী রায় বললেন, 'না; মাথা হামেসা পাওয়া যায় কেবল একটা জায়গাতেই,—সে হচ্ছে ডাক্তারী কলেজের হাসপাতালে। যোগেন দাসের বেওয়ারিশ মাথাটা হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করতে ডাক্তার লাহিড়ীকে বেগ পেতে হয় নি। ভদ্রমহোদয়গণ, আমায় পাগল মনে করে ঠেঙ্গাবার আগে আমার একটা কথা শুনে রাখবেন। ডাক্তার লাহিড়ী মনে-প্রাণে নাস্তিক হলেও একেবারে পাষণ্ড ন'ন। নাস্তিকতায় তাঁকে পাগল করেছে। ধর্ম্মের কুসংস্কার দূর করবার জন্যে তিনি যে কোন পাপ করতেও কুণ্ঠিত ন'ন। চিরকুমার ধরণীবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আশ্রমের নামে লিখে দিয়ে নিজে সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা করেছিলেন। ডাঃ লাহিড়ী কোনমতেই তা সহ্য করতে পারেন নি। অবশেষে এর জন্যে তাঁকে পরম পাপই করতে হয়েছে। এমন পাগল আমি দেখি নি।'

কলকাতা পুলিশের নামজাদা গোয়েন্দা গোলোক চাটুয্যে খোলা দরজার কাছ থেকে ব'লে উঠলেন, 'চমৎকার! অতি চমৎকার! এ একমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব।' সকলে চম্‌কে উঠলেন। পুলিশের উক্তি শুনে খড়্গ

বাহাত্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু মিঃ লাহিড়ী যে খুন করেছেন তার প্রমাণ?' গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'দেখবেন আসুন।'

সকলে গোলোক চাটুয্যের সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে এসে দেখলেন, টেবিলের ওপরে মাথা রেখে মিঃ লাহিড়ী বসে রয়েছেন; সম্মুখে একখানা খোলা চিঠি আর একটা ছোট কাচের গেলাস।

খড়্গ বাহাত্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুমুচ্ছেন নাকি?'

গোলোক চাটুয্যে বললেন, 'হ্যাঁ, শেষ নিদ্রা। এ ঘুম আর ভাঙ্গবে না। বিষ খেয়ে ঘুমুচ্ছেন। সকলে চিঠি খানার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। ডাঃ লাহিড়ী নিজের হাতে লিখেছেন,—

ফণী রায়,

ধরণীবাবুকে কোনমতেই নিরস্ত করতে পারি নি, তাই চরম পাপ করতে হ'ল। এই আমার প্রথম পাপ, এই শেষ। আমার অনুরোধ, আমার জন্য কেউ দুঃখ করবেন না। মৃত্যুর পর অনন্ত নরক ব'লে যদি কিছু থাকে তবে সেখানকার যন্ত্রণা হাসিমুখেই সইতে চেষ্টা করব। বিদায়। ইতি— ডাঃ ভবানী লাহিড়ী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সকলে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ফণী রায় তখন তাঁর বেঁটে ছাতাটি বগলে ক'রে আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে পথে নামছেন।*

— শেষ —

ভজগোবিন্দ রায়

শ্রীশামুক

গোবিন্দপুরের রাজা শ্রীভজগোবিন্দ রায়। ছোট রাজা, রাজত্ব আরো ছোট। আগে নাকি এক সীমানা থেকে অন্য সীমানায় যেতে গেলে সাত বার ঘোড়া বদল করতে হ'ত, আজকাল গাধার পিঠে স্বচ্ছন্দে গিয়ে ফিরে আসা যায়—একদিনে একটি গাধাতেই।

রাজার আয় অল্প, ব্যয়ও সামান্য। হাতীশালে হাতী আর ঘোড়াশালে ঘোড়া আজকাল আর নেই। সবে ধন নীলমণি এক পেট মোটা বেতো ঘোড়া ও রাংতা মোড়া মাথার উপর নিশান উড়ানো এক দু'চাকার এক্কা। [illegible] তা'তে কি এসে যায়? মন্ত্রী আছে, সেনাপতি আছে, কোটাল আছে। খড় জড়ানো পুতুল নয়, সত্যিকারের [illegible] মানুষ। আরো আছে মরচে পড়া কয়েকখানি ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, বল্লম।

আসল কথা এই যে পূর্ব্বপুরুষেরা রাজা ছিলেন সত্যি সত্যি বড় রাজা। কিন্তু তাঁরা পোষা বিড়ালের বিয়ে, ষাঁড়ের লড়াই, হাতীর নাচ দিতে দিতে ফতুর হয়ে গিয়ে বর্ত্তমান বংশধরকে একেবারে পথে বসিয়ে গেছেন। উপাধি [illegible] নামটুকু ছাড়া বাকী আর নেই কিছু। না, আছে আর একটি বিষম দরকারী জিনিষ। ভজগোবিন্দ রায়ের বড় রাজার মত চড়া মেজাজ।

রাজ্যে দেখবার মত ও দেখাবার মতন বিশেষ কি[illegible] নেই। সাধারণ সব জিনিষ—ঘর, বাড়ী, কুঁড়ে, পুকুর, মাঠ, ধানের জমি, আখের ক্ষেত। তবে শোনবার মত আছে অনেক কিছু। গোবিন্দপুরের প্রতিটি বাসিন্দা এক একটি রেডিও বিশেষ। কথা আরম্ভ করলে কিছুতে থামতে চা[illegible] না। আগে কি সোনার রাজ্য ছিল, তাকে ফাঁপি[illegible] ফুলিয়ে একশ' গুণ—দু'শ' গুণ—হাজার গুণ বাড়িয়ে ব'[illegible] ব'লেও ওদের মুখে ব্যথা হয় না। হ্যাঁ, উল্লেখ করবার ম[illegible] আর একটি জিনিষ না বললে গোবিন্দপুরের প্রসঙ্গ শে[illegible] হয় না। সে হ'ল ম্যালেরিয়া। উঃ, কী ভী[illegible] ম্যালেরিয়া! যেমনি জ্বর তেমনি কাঁপুনি। মাথা[illegible] বরফের পুঁটুলি চাপিয়ে দাওয়ায় শক্ত খুঁটির সঙ্গে বেঁ[illegible] রাখতে হয় মানুষকে!

গোবিন্দপুরে খবরের কাগজের বালাই নেই, ত[illegible] খবর ঠিক এসে পৌঁছে গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে[illegible] জাপানীরা আসছে, পূবদিক্ থেকে, মণিপুরে এ[illegible] পৌঁছেছে। আজকালকার লড়াই কি জিনিষ, তার সা[illegible] সরঞ্জাম কত, এই জাপানীরা কারা—এ সমস্ত খবর জানে [illegible] কেউ, তবু রাজ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। রাজা যখ[illegible] যুদ্ধে যেতে হবে বৈকি, হাত পা নিস্‌পিস্ করে [illegible] গণক ঠাকুর এসে খড়ি পেতে জলের মত বুঝিয়ে দে[illegible] ময় দানবের তৈরী এই মণিপুর পাণ্ডবদের আমলের, আ[illegible] ঐ যে জাপানী এরা সব রাবণের বংশধর—মানে [illegible] কাছাকাছি তায় একটু দূর সম্পর্কের—এই আর কি!

[illegible] ঢাল, তলোয়ার, বর্শা ইটের গুঁড়ো দিয়ে মেজে মেজে চকচকে করা হ'ল, শান দেওয়া হ'ল। কি রকম ধার দেখতে গিয়ে কোটালের আঙুল গেল কেটে—ক্যাঁচ। বেশী নয়—তবু সেদিন চামচে ক'রে ভাত খেতে হয়। সেনাপতির বয়স হয়েছে, এক তলোয়ার নিয়ে খুব খনিকটা বন্ বন্ ক'রে ঘুরিয়ে নিলেন। আজকাল দম আর তেমন নেই, টাল সামলাতে গিয়ে হাঁটু গেল ছড়ে।

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত রওনা হয় সকলে দল বেঁধে, কাড়া নাকাড়া, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। পেট মোটা ঘোড়ার এক্কায় মহারাজ স্বয়ং, সৈন্য সামন্ত পায়ে হেঁটে। মেয়েরা উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, খৈ ছড়িয়ে বিদায় দিয়ে গেল।

পূব দিকে সোজা চলে—তিনটি দিন তিনটি রাত। সব সময়ে তৈরী, শত্রু সামনে এলেই—ব্যস্। কে ক'জনার মাথা নেবে হিসাব পর্য্যন্ত হয়ে গেছে অনেক বার।

শেষে একটি বড় শহরের ধারে এসে পৌঁছায়। দেখে সারি সারি তাঁবু ফেলা, সৈন্যদের এক বিরাট ছাউনি। এরাই রাবণের বংশধর? কিন্তু চেহারায় ত' নিজেদের মতনই মনে হয়। ভারতবর্ষেরই লোক! তবে? তবু সাবধানের মার নেই। রাজার রথ, মানে এক্কা, ঘিরে [illegible]ব্যূহ রচনা ক'রে কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোল জোরে জোরে বাজিয়ে গোবিন্দপুরের লোকেরা এগিয়ে যায় বর্শা, তলোয়ার উঁচিয়ে। আশ্চর্য্য যে ঐ সৈন্যরা কোন রকম ভয় না পেয়ে [illegible]বা তৈরী না হয়ে নিজের নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে দেখতে। কয়েকজন একেবারে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'ব্যাপার কি, কি চাও?' তারপর শুনে সে যা বেদম [illegible]হাসি, হোহো—হিহি—হাহা! এ ওকে ডেকে ডেকে দেখায় আর বেদম হাসি হাসে। মহারাজের মুখ লাল, চোখে আগুন। সেনাপতি চেঁচিয়ে ঘোষণা করে—'খবরদার, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে নাও; সামান্য সময় দিচ্ছি, তারপর [illegible]ব কচুকাটা করে দেব।'

ইতিমধ্যে ওদিকের অনেক সৈন্য এসে জড় হয়েছে। [illegible]এদের আস্ফালন শুনে বলে,—'আচ্ছা, যুদ্ধ করছি, দাঁড়াও। [illegible]কিন্তু শেষে পালালে চলবে না।'

কয়েকজন নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে কি সব নিয়ে এল। [illegible]ঢাল তলোয়ার নয়, কি সব লম্বা লম্বা চোঙা, বাক্স—এইসব। [illegible]তারপর বলে,—'রেডি?—গেট্ সেট্ গো!'

এরা তলোয়ার সোজা করে—'জয় ভজগোবিন্দের জয়' ব'লে এগিয়ে যায়। ওরা কতকগুলো কি ছোঁড়ে ফুটফাট আওয়াজ ক'রে। কি যেন কি গ্যাস্!

ওরে বাপরে, সে কী বিষম গ্যাস্! ঝাঁঝালো সরষের তেলের গন্ধ, চোখ জ্বালা ক'রে চোখে জল আসে, আর যেমনি কাসি তেমনি হাঁচি!

ভজগোবিন্দ রথে চড়ে বলে,—'খবরদার, ভয় নেই—হ্যাঁচ্চো—বর্শা চালাও—হাচুই—আমার ঘোড়াকে ধর—ফ্যাঁচ্চো—উরে বাপরে—'

ফিরবার পথে বেতো ঘোড়া ভারি সুন্দর দৌড়েছিল, যেন আসল পক্ষিরাজ। যেতে যা সময় লেগেছিল তার চেয়ে অনেক আগে সকলে গোবিন্দপুরে পৌঁছে গেল। পৌঁছেই ম্যালেরিয়া। যেমনি জ্বর তেমনি কাঁপুনি। থেকে থেকে গোবিন্দপুরে ভূমিকম্প হতে থাকল। গণক ঠাকুরকে ডাকতে হ'ল না, নিজেই এসে হাজির। অনেক হিসাব নিকাশ করে বল্লেন,—'হুঁ, ঠিক যুদ্ধ আরম্ভ হবার ক্ষণে অশ্লেষা ও মঘা বড় কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, তা ছাড়া মহারাজের উপর রাহুর দৃষ্টি বড়ই প্রবল! এর জন্য ভাবনার কিছু নেই। ভাল করে পূজো দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, আর রাজ্যের পুরুষদের দেড় হাত ক'রে টিকি রাখলেই দোষ কেটে যাবে।

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি গোবিন্দপুরে গিয়ে পড়, মেপে দেখো, ঠিক দেড় দেড় হাত টিকি—একচুল বেশী নয়, কমও নয়।

রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সত্যেন বললে,—হাজার হাজার লোক একমুঠা অন্নের জন্য হাহাকার ক'রে মরে গেল, মোটর, রেল, এরোপ্লেন থাকা সত্ত্বেও সময়মত এতটুকু খাবার কোথাও থেকে এলো না। দেখে শুনে মনে হয় আমরা এখনও আদিম যুগেই রয়ে গেছি। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলো এখনও এসে পৌঁছায় নি

মানুসিং বললে,—সভ্যতার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই বন্ধু, এ হচ্ছে পরাধীনতার পাপ…

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে

TIGHT BINDING

ইতিমধ্যে একটি লোক ছায়ার মত কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে,—স্যর, শুনছেন ?

এই ধরণের এক একজন লোক পথে চুপি চুপি ভিক্ষে চায়, সত্যেন জানে। বললে,—কি, কিছু পয়সা চাই তো ?

—আজ্ঞে না, একটা দরকারী কথা ছিল।

দরকারী কথা ? দু'জনেই থামলো।

—আপনার নামই তো সত্যেন বাঁড়ুয্যে ?

—হ্যাঁ। কেন ?

—আপনার পিতৃবন্ধু শৈলেন বাবুকে আপনি চেনেন ? শৈলেন বাঁড়ুয্যে ? আমি তাঁর কাছ থেকে আসছি।

—তিনি তো জেলে আছেন !

—জেলে ছিলেন, এখন আছেন কলকাতায়। হবিগঞ্জ জেল থেকে তিনি পালিয়ে এসেছেন। পিছনে গোয়েন্দা আছে, পথে বড় একটা বেরোন না, গা ঢাকা দিয়ে আছেন। একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনার বাবার উইলের টাকাকড়ি সম্পর্কে কি একটা জরুরী কথা আছে।

—বুঝেছি, তা কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে ?

—এখন তিনি টালিগঞ্জের এক বাড়ীতে আছেন। ইচ্ছা করলে আপনি এখন আমার সঙ্গেও যেতে পারেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন।

—কাল গেলে হয় না ?

—যদি আপনাদের এখন কোন জরুরী কাজ থাকে, বেশ কালই যাবেন।

—কাল সকালে যাব।

সকালে হবে না স্যর ! বাড়ীটায় 'টু লেট্' লাগানো আছে কিনা, দিনের বেলায় যাওয়া চলবে না। যেতে হ'লে সন্ধ্যার পর।

—সন্ধ্যার পর হ'লে এখনই যাওয়া ভালো।

—তিনি তো সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে বলেছেন।

—অল রাইট্, চলুন।

মানু বাধা দিলে, বললে,—ইনি এসে বললেন, আর তুমি চললে ? একে তুমি চেন ? এই অন্ধকারে উনি তোমায় কোথায় নিয়ে যাবেন তার কিছু ঠিক আছে ?

সত্যেন থমকে দাঁড়ালো। মানু বললে,—আমার কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে না, চলো, তোমার সঙ্গে যাই।

—স্বচ্ছন্দে। সত্যেনের ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা এবার ত... হয়ে গেল ; বললে,—এতটা পথ, একা একা ফিরতে ... তবু একজন সঙ্গী থাকা ভালো।

লোকটার সঙ্গে দু'জনে অগ্রগামী হ'ল। মিনি... দু'য়েক চলার পর লোকটি বললে—অনেকটা পথ, হেঁ... যেতে সময় লাগবে, একখানা গাড়ী করলে কেমন হয় ?

— বেশ তো। চলতি গাড়ী দেখলেই ধরে নিন্।

বলতে বলতে একখানি চলতি ট্যাক্সি পাশ দি... বেরিয়ে যাচ্ছিল, দেখে তারা ডেকে নিলে।

ট্যাক্সির ভিতরে সবে উঠে বসেছে, এমন সম... দু'পাশের দুই পা-দানের উপর দুটি লোক উঠে দাঁড়ালো... সত্যেন ও মানু সচকিত হয়ে কোন সাড়া তোলার আগে... চকচকে দু'খানি ছোরা তাদের চোখের উপর ঝক্‌ঝ... করে উঠলো, বজ্রকণ্ঠে আদেশ হোল—চুপ ! (ক্রমশঃ)

অভিযাত্রীর পত্র

(সিংহল)

শ্রীবিশ্বপতি দাশগুপ্ত

রামধনুর ভাইবোনেরা, আমার রামেশ্বরম্ থেকে লে... চিঠি তোমরা পেয়েছ। এবারে সিংহলের গল্প শোন।

রামেশ্বরম্ থেকে আধ ঘণ্টার রাস্তা ধনুস্কোটি। এখা... থেকে ষ্টিমারে ক'রে এগিয়ে চল্লাম। পক্ প্রণালীর সুনী... বারিরাশি ভেদ করে ঘণ্টা দু'এক পর ষ্টিমার আমাদে... পৌঁছে দিল সিংহলের তালাইমান্নার জেটিতে। এখা... থেকে আবার ট্রেন। সাড়ে এগার ঘণ্টা পর শ্রান্তদে... পৌঁছলাম কলম্বো।

কলম্বো সিংহল দ্বীপের রাজধানী। শুধু রাজধানী ন... প্রধান সহর এবং প্রধান বন্দরও বটে। সহরে অনেক দ্রি... দেখবার জিনিষ আছে। মিউজিয়াম, রেস কোর্স... গল্‌ফ্ লিঙ্ক প্রধান দেখবার জিনিষ। সাগর পারে অনে... ভাল ভাল সুদৃশ্য হোটেলও আছে।

কলম্বো পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরগুলির মধ্যে একটি... বন্দরে তিনটি ব্রেক্-ওয়াটার আছে। একসঙ্গে ৪... হতে ৪৭টি জাহাজ এখানে ভিড়তে পারে। এখানক... একটি ডক্ অতি বিরাট—প্রায় ৭০০ ফুট লম্বা। ...টি জেটি ডকে প্রবেশকারী জাহাজকে সাহায্য করে, ...ও ৮০০ ফুট লম্বা।

কলম্বো সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা যেত। কিন্তু এ সব ...বরণ তোমরা নানা জায়গায় পড়ে থাকবে। তাই ...রতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে আমি খুব অল্পই বলছি। সব শেষ ক'রে তোমাদের শোনাব নানা দেশের কথা, বোধ হয় তোমাদের অনেকেই জান না।

কলম্বো হতে বেড়াতে এলাম কাণ্ডী। কলম্বো থেকে ... মাইল দূরে, সাড়ে তিন ঘণ্টার রাস্তা।

কাণ্ডী সিংহলের পূর্ব্ব রাজধানী। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ...ন্দর জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম এই কাণ্ডী।

কাণ্ডীর 'দন্ত-মন্দির' সিংহলী তথা এসিয়াবাসী ...দ্ধদের পক্ষে পরম আকাঙ্ক্ষিত তীর্থস্থান। প্রতি ...গষ্ট মাসে এখানে মহোৎসব হয়ে থাকে। মহোৎসবের ...য় প্রায় হাজার তীর্থযাত্রীর শোভাযাত্রা দেখা যায়।

...থিবী-বিখ্যাত পেরাদেনিয়ার বোটানিক গার্ডেনস্ কাণ্ডী ...ত খুব কাছে। আমি ট্রেনে পেরাদেনিয়া নিউ ষ্টেশনে ...মে বোটানিক গার্ডেনগুলি দেখে মোটরে কাণ্ডী চলে ...লাম।

কাণ্ডী এক সময়ে সিংহলী রাজাদের রাজধানী ছিল। ...রে বৈদেশিক শক্তির অধিকারে যায়। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ...বং শেষে ইংরেজ এখন এর মালিক।

কাণ্ডী থেকে একদিন গেলাম ঐতিহাসিক নগর ...নুরাধাপুরে। প্রাচীনকালে অনুরাধাপুরে ছিল সিংহলের ...জধানী। তখনকার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির ও ...সাদ এখানে আছে।

অনুরাধাপুরে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন স্মৃতি-...হ আছে। বোধিবৃক্ষের শাখা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ...বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন সেই বোধি-...ক্ষের একটি শাখা আশোকের পুত্র মহেন্দ্র নিয়ে ...য়েছিলেন সিংহলে। সেখানে তিনি এটি রোপণ ...রেন। সেই শাখাই হয়ে উঠেছে বিশাল মহীরুহ।

অনুরাধাপুরের ধ্বংসাবশেষের ভিতর 'পিতল-প্রাসাদ' ...ল্লেখযোগ্য। আগে প্রাসাদটি ন'তলা ছিল, আর এর কক্ষের ...খ্যা ছিল এক হাজার। এখন এই প্রাসাদ ভেঙ্গে-চুরে গিয়ে ...বাকি রয়েছে এক হাজার ছ'শ'টি গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ। এই প্রাসাদের ছাদ ছিল পিতলের তৈরী। অপর উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রুয়ানওয়েলি দাগাবা প্রধান। এটি প্রায় ২০০ ফুট উঁচু একটি ত্রিভুজাকৃতি অট্টালিকা। এ ছাড়া ইসুরুমুনিয়া মন্দির এবং মিহিন্তালে প্রস্তর-মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। ইসুরুমুনিয়া মন্দিরটি পাহাড় কেটে খোদাই করে তৈরী হয়েছে। এই মন্দিরের পদ্মপুকুরগুলিতে বহু কুমীর আছে।

অনুরাধাপুর দেখা হয়ে গেলে আর একদিন গেলাম নিউয়ারা-এলিয়া। এই সহরটি খুব ছোট কিন্তু এটিই সিংহলের প্রধান স্যানাটোরিয়াম। নগরের পিছনে তাকালে দেখা যায় সিংহলের উচ্চতম পর্ব্বত পিদুরুটালা-গালা সমুন্নত ভঙ্গীতে মাথা তুলে আছে। এখানকার পার্ক ও বাংলোগুলি বড় সুন্দর। আবহাওয়া খুব চমৎকার। পাহাড় থেকে রেলওয়ে বরাবর কাণ্ডী পর্ব্বতমালার সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। এখানে 'এল্ক' নামে এক রকম বড় জাতের হরিণ পাওয়া যায়। জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগল।

এর পর পোলোনারুয়া। অবিরত প্রবল যুদ্ধের ফলে অনুরাধাপুর থেকে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। সেই প্রাচীন কালের রাজপ্রাসাদ, রাজার স্নানাগার, সভাগৃহ, শ্রোতৃগৃহ প্রভৃতি এখনও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। এখানেও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত বহু সুন্দর মন্দির দেখলাম। এর মধ্যে 'লঙ্কাতিলক' সিংহলের সবচেয়ে বড় মন্দির।

সিংহলের কথা বলতে গেলে মনে পড়ে নারকেল, দারচিনি, কলম্বী লেবুর তেল, চা আর রবারের কথা—সিংহলের যা আসল সম্পদ্। নারকেল গাছকে সিংহলীরা নানা কাজে লাগায়। নারকেল পাতা দিয়ে দাড় ও মাদুর তৈরী হয়। ঘরের চাল দিতেও অনেক জায়গায় এই নারকেল পাতা ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া মাখবার ও খাবার জন্য নারকেল তেল ত' আছেই। টাটকা নারকেল, শুক্‌নো নারকেল, নারকেল তেল, গদির আঁশ, দড়ি প্রভৃতি নারকেলের কত কি যে এখান থেকে দেশ বিদেশে চালান যায় তা কি বলব ! গ্রাফাইটও খুব রপ্তানী হয়। পেনসিলের শীষ তৈরী করতে এই গ্রাফাইট লাগে। গ্রাফাইটের ব্যবসা সিংহলী ব্যবসায়ীদের হাতে।

এ ছাড়া সিংহলে নানা জাতের মূল্যবান্ পাথর আর উপকূলের কাছে দু'-এক জায়গায় মুক্তাও পাওয়া যায়।

TIGHT BINDING

সিংহলের আর একটা নামই তো 'পার্ল অব দি ইষ্ট' অর্থাৎ প্রাচ্যের মুক্তা!

যুদ্ধের যেটুকু ভাল

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

যুদ্ধের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কাহিনী তোমরা অনেক শুনেছ। শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যুদ্ধের ওপর মনটা আপনি বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। শত্রুর আক্রমণের পর সাধারণতঃ যে সব দৃশ্য চোখে পড়ে তার বর্ণনা দেওয়াও কঠিন। যারা মারা গেল তাদের কথা না হয় ছেড়েই দাও, যারা আহত হ'ল তাদের কথা ভাব। কারও হয়তো মুখের বা গালের অর্দ্ধেকটা বোমার টুকরো লেগে উড়ে গেছে—দেখে আগেকার মানুষ বলে কা'রও চিনবার উপায় নেই! কারও হয়তো সমস্ত নাক-মুখটা ভীষণ ভাবে থেঁৎলে গেছে, কারও হয়তো চোখ দু'টো উপড়ে গেছে, কারও হয়তো নাকটাই নেই—তার জায়গায় রয়েছে এক বীভৎস গর্ত্ত! এ ছাড়া হাত-পা উড়ে যাওয়া তো হামেশাই ঘটছে। এই সব আহতরা যদি বেঁচে থাকে তবে সারা জীবন কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় তাদের কাটে ভাবতে পার? বিকলাঙ্গ, পঙ্গু দেহ নিয়ে পরের দয়ার উপর সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর ক'রে তাদের কাটাতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা অমিত বিক্রমে যুঝ্‌ল, মুহূর্ত্তের দুর্ব্বিপাকে তাদের বরাতে কী না ঘটতে পারে!

গতবারের মহাযুদ্ধ যখন শেষ হ'ল তখন যুদ্ধ-ফেরৎ এমনিধারা বিকলাঙ্গ সৈনিকে সমস্ত দেশ ভরে গিয়েছিল। তবু সেবারে বেসামরিক অধিবাসীদের ওপর অতটা অত্যাচার হয় নি এবাকার যুদ্ধে যা হয়েছে।

যে বিপদ্ ঘটেছে তার আর কিছু করবার নেই। এক যদি পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠে যেত তা হলে হয়তো এর একটা সমাধান হ'ত। কিন্তু তা যে হতে পারে না তা তো দেখতেই পারছ—বরঞ্চ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের যত উন্নতি হবে, ভবিষ্যতের যুদ্ধও ততই বীভৎস আকার নেবে।

তবে এর কি কোন প্রতিকার নেই? সম্পূর্ণ প্রতিকার অবশ্যই নেই। তবে মানুষের আবিষ্কৃত যে বিজ্ঞান এই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটাচ্ছে সেই বিজ্ঞানই এর কিছুটা প্রতিকারের চেষ্টা করছে। বৈজ্ঞানিকদের দীর্ঘদি[illegible] গবেষণার ফলে যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার যে নিত্য নূত[illegible] প্রণালী আবিষ্কৃত হচ্ছে তাও কম বিস্ময়কর না। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই অদ্ভুত উন্নতি—যুদ্ধের শত ক্রটীর মধ্যে এইটুকুই যা ভাল বলতে হবে। যুদ্ধের ঠেলায় পড়ে প্রয়োজনের খাতিরেই এ সব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। তা না হলে এর কতটা কি হ'ত বলা কঠিন।

একটা উদাহরণ দেই। বেশী দিনের কথা নয়, কামানের টুকরো লেগে একজন সামরিক অফিসারের একটা কান সম্পূর্ণ উড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার এসে যেখানে তার কান ছিল তার ঠিক পেছনের খানিকটা চামড়া তুলে উঁচু করে, রোগীর পাঁজর থেকে খানিকটা কার্টিলেজ (কার্টিলেজ কি জান বোধ হয়?—একে নরম হাড় বলা যেতে পারে, শরীরের নানা জায়গায় থাকে, কানের ভিতরের সবটাই প্রায় এই কার্টিলেজে গড়া) অস্ত্রোপচার করে তুলে নিয়ে সেটাকে অনেকটা কানের মত ক'রে বেঁকিয়ে সেই চামড়ার ভিতর গুঁজে দিলেন। মাস খানেকের মধ্যেই সেই কার্টিলেজ নতুন জায়গায় দিব্যি জুড়ে গেল। ডাক্তার তখন রোগীর পেটের ওপর থেকে আরও খানিকটা চামড়া চেঁছে এনে সেই কার্টি-লেজের ওপরে এঁটে দিলেন—যাকে বলে গ্রাফ্‌টিং করা। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল সামরিক অফিসারটির ছেঁড়া কানের জায়গায় দিব্যি এক নতুন কান খাড়া হয়ে রয়েছে এবং তা এত স্বাভাবিক হয়েছে যে দু'টি কানের মধ্যে কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা তৈরী করা তা বুঝবার উপায় নেই। শুধু তাই নয়, তৈরী-করা কান দিয়ে শুনতেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

গ্রাফ্‌টিংএর কথা তুলিলাম। চামড়া গ্রাফটিং মানে শরীরের এক জায়গা থেকে চামড়া তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় লাগান। এই গ্রাফ্‌টিংএর কথা তোমরা আগেও রামধনুতে পড়েছ। আজকাল ডাক্তারেরা এই বিদ্যায় এত পটু হয়েছেন যে শরীরের প্রায় যে কোন জায়গার চামড়া নষ্ট হ'লে তাঁরা অন্য জায়গার চামড়া নিয়ে সেখানে যুড়ে দিতে পারেন এবং এই যোড়া চোখে দেখে ধরা অসম্ভব বলা যেতে পারে। একবার এরোপ্লেনে আগুন লেগে একটি পাইলটের চোখের দু'টি পাতাই পুড়ে গিয়েছিল। বেচারা [illegible] কিছুতেই চোখ বন্ধ করতে পারত না। কি ভয়ানক [illegible] বল তো! সম্প্রতি ডাক্তারেরা অন্য জায়গার [illegible]মড়া কাগজের মত পাৎলা ক'রে কেটে এনে তা দিয়ে [illegible]র চোখের পাতা তৈরী করে দিয়েছেন। এখন তার [illegible]চোখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গ্রাফ্‌টিংএর কথা উঠলে [illegible]্যাজেট সাহেবের আবিষ্কারের কথাও বলতে হয়। ইনি [illegible]াতিতে আমেরিকান্। ইনি এক অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার [illegible]রেছেন। রোগীকে অসাড় করে নিয়ে এঁর যন্ত্রের সাহায্যে [illegible]র শরীরের নানা জায়গা থেকে (যেমন পেট, বুক, উরু) [illegible]চ্ছামত (এক ইঞ্চির হাজার ভাগ পর্য্যন্ত) পাৎলা বা পুরু [illegible]মড়া চেঁছে নেওয়া যায়।

[illegible] নকল কান তৈরীর জন্য কার্টিলেজের কথা বলেছি। [illegible]ক্তারেরা এর সাহায্যে নতুন নাক এবং গালও তৈরী [illegible]রে দিতে ছাড়েন নি। একবার বিমান আক্রমণের সময়ে [illegible]মার টুকরো ছিট্‌কে এসে একটি লোকের গাল ভেদ [illegible]'রে, মুখ থেঁৎলে, নাক ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। ডাক্তারেরা [illegible]ই লোকটির গাল, নাক, এমন কি ঠোঁট সমেত মুখটা শুদ্ধ [illegible]তুন ক'রে গড়ে দিয়েছেন—কার্টিলেজ, চামড়া আর [illegible]রই শরীরের সজীব মাংসখণ্ডের সাহায্যে। দেখলেও [illegible]শ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। একজনের শরীরের [illegible]র্টিলেজ নিয়ে অপরের শরীরে লাগাতেও আজকাল [illegible]ন বাধা নেই। তা ছাড়া শরীর থেকে কার্টিলেজ তুলে [illegible]য়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার না ক'রে কিছুদিন ওষুধে ডুবিয়ে [illegible]খেও তাকে কার্য্যক্ষম রাখা যায়—পরে প্রয়োজন মত [illegible]জে লাগালেই হ'ল।

[illegible] কার্টিলেজের মত আর একটি অদ্ভুত জিনিষের সন্ধান [illegible]ওয়া গেছে। এটি কিন্তু মানুষের শরীরের কোন অংশ [illegible], এমন কি কোন জৈব পদার্থও নয়। এটি একটি [illegible]তু—নাম ট্যাণ্টালাম্। অদ্ভুত এই ধাতু! এটি শরীরের [illegible] ঢোকালে কোন রকম অনিষ্ট হয় না—এমন কি [illegible]রের ভিতরে পূরে দিলেও কোন রকম রাসায়নিক বা [illegible] পরিবর্ত্তন আনে না। তা ছাড়া এর অদ্ভুত গুণ, একে [illegible] করলে টেনে চুলের মত সরু করা যায় অথচ [illegible]নও বেশ শক্ত থাকে। আবার ইচ্ছে করলে পিটিয়ে [illegible]জের মত পাৎলা করা যায়, তখনও এ সমান মজবুত। [illegible]রের শিরা-উপশিরা অথবা স্নায়ু দরকার হলে এই

ট্যাণ্টালামের মিহি সুতো দিয়ে সেলাই ক'রে ফেলা যায়, দরকার হ'লে ট্যণ্টালামের পাত দিথে মুড়ে রাখা যায়। এমন কি মাথার খুলি ফেটে গেলেও ট্যাণ্টালাম্ দিয়ে তাকে মেরামত করার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য কার্টিলেজকেও অনেক সময় এ কাজে লাগান হয়।

যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় হাত-পা উড়ে গেলে নকল হাত-পা বা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুড়ে দেওয়ার রেওয়াজ তো আগেই ছিল কিন্তু এবারকার যুদ্ধের মধ্যে এ ব্যাপারটিতেও কম উন্নতি করা হয় নি। আগে যেখানে রোগীর হাত বা পা ছিল এখন হয়তো তা সেখানে নেই, কিন্তু তার গোড়াকার মাংসপেশীতে খানিকটা শক্তি হয়তো রয়ে গেছে। সেই শক্তির সাহায্যে নকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও স্বাভাবিক শক্তি দেওয়ার উপায় ডাক্তারেরা বার করেছেন। এই ভাবে নকল হাতের সাহায্যে টাইপ্ করা, পিয়ানো বাজানো, তাস খেলা, এমন কি নকল পা দিয়ে ফুটবল্ খেলাও নাকি সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমেরিকাই বোধ হয় এ বিষয়ে সব চেয়ে বাহাদুরী দেখিয়েছে। কেবলমাত্র যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করার জন্যই সেখানে এই কয়েক বছরের মধ্যে এমন গুটি পাঁচেক বিরাট্ বিরাট্ হাসপাতাল ও গবেষণাগার তৈরী হয়েছে গোটা পৃথিবীতে যার যুড়ি নেই।

বাজিকরের শেষ বাজি

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

অতি-চালাক লোক অনেক আছে, তাদের সবার 'লাক্' সমান না। পরের চালাকি ধরতে পারা তাদের একটা মস্ত গুণ—এবং এই গুণযোগে তাদের যোগ্যতা অনেক বেড়ে যায় সে কথাও মিথ্যে নয়। কিন্তু সমস্ত যোগ বিয়োগ শেষে ভাগফলে তাদের ভাগ্যটা প্রায়ই খারাপ হতে দেখা যায়।

মোটামুটি চালাক লোক মোটের ওপর মন্দ নয়—অনেক সময়ে বাঞ্ছনীয়ই। কিন্তু অতি-চালাক লোক অতিশয় বিপজ্জনক—যেমন অপরের বেলা তেমনি তার নিজের পক্ষেও। চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ করা যায় না,

বিবেকানন্দ কবে যেন বলেছিলেন। কিন্তু অতি চালাকির দ্বারা কী যে—আরো কত যে বিচ্ছিরি ব্যাপার হতে পারে সে ধারণা তাঁর বোধ হয় ছিল না।

অতি অধুনা আমাদের বিশের সেই বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশের নিজের গুণফলেই যে এই দুর্ঘটনা তা, বলাই বাহুল্য।

একজন বিখ্যাত বাজিকর তাদের মজলিশে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল আর বিশে সেগুলো ধরে ফেলছিল—পটাপট্। তাই থেকেই কাণ্ড'র সূত্রপাত।

বাজিকর বলছিল—"ঢাকনার তলায় কিছু লুকোনো নেই আপনারা তা ভাল ক'রে দেখেছেন—এবার আবার একবার দেখুন তো?" বল্‌তে না বলতে পূর্ব্বোক্ত শূন্যগর্ভ ঢাকনির ঢাকা তুলতেই আস্ত একটা পায়রা বক্‌বকম্‌কম্ ব'লে বেরিয়ে এল।

হল্‌শুদ্ধ লোক বলাবলি করতে লাগল: "অবাক কাণ্ড—বাস্তবিক অবাক কাণ্ড!"

বিশে সামনের আসনেই বসে ছিল, সে পাশাপাশি লোকদের ফিস্‌ফিস্ ক'রে জানাল—"পায়রাটা লোকটার জামার হাতায় লুকোনো ছিল।"

তার ফিস্‌ফিসানি ঘরশুদ্ধ সবার কানে গেল। রহস্যের হদিশ পেয়ে তাদের মুখ জল্ জল্ করে উঠলো, তারা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে—"তা তো বটেই!" এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কানের গোড়ায় বলাবলি করল: "লোকটা লুকিয়ে রেখেছিল হাতার তলায়। বিশে ঠিকই বলেছে।"

"আমার পরের খেলা হচ্ছে রিংয়ের খেলা," বাজীকর বল্ল: "দেখুন আপনারা—রিংগুলো সব আলাদা আলাদা। তাই নয় কি? কারুর সঙ্গে কারু কোন সম্পর্ক নেই। আবার দেখুন, আমি যদি বলি, এক্ষুণি এরা পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি করতে দ্বিধা করবে না।"

এবং করলও না। টিং টুং টাং—কাছকাছি সংস্পর্শে আসতেই, কি কৌশলে বলা যায় না, ওরা পরস্পরের অন্তর্গত হয়ে গেল।

হলশুদ্ধ বিস্ময়ে হতবাক—এটা সত্যিই একটা অদ্ভুত কাণ্ড! এমন সময়ে বিশে চেঁচিয়ে উঠেছে আবার—"এগুলো প্রথমকার রিংগুলো নয়—সেগুলো সরিয়ে ফেলেছে। জোড় লাগানো এগুলো আগেই জামার হাতায় ছিল।"

বিস্ময়বিমূঢ়েরা যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল এবার—সত্যি তো, তা না হলে কখনো হয়? বাজিকরের জামার হাতাটায় তাকাও একবার!—কি রকম ঢিলে ঢালা দেখেছ! মোটেই আশ্চর্য্য নয়। ঘাড় নাড়তে লাগলো সকলে।

"এই টুপিটা আপনারা ভালো ক'রে পরীক্ষা করুন—দেখুন ভালো ক'রে। দেখেছেন?…দেখা হয়েছে?…আচ্ছা, দিন এবার আমায়। এর ভেতর থেকে যত চান্ আপনারা ততগুলো হাঁসের ডিম বেরিয়ে আসবে।" বাজিকর প্রতিশ্রুতি দিল।

এবং সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করল সে। তার তাগাদায় সেই টুপিকে পরের পর সতেরোটা ডিম পাড়তে হ'লো—এবং সাঁইত্রিশ সেকেণ্ড ধরে দর্শকদের কারো কোন শব্দটি নেই! মুর্গীর পক্ষেও অসাধ্য এমন কাজ টুপিকে দিয়ে করানো সত্যিই বিস্ময়কর।

কিন্তু আটত্রিশ সেকেণ্ডের বেলায় বিশের শব্দ শোনা গেছে। আবার সে বলে উঠেছে: "ওর জামার হাতার মধ্যে আস্ত একটা মুর্গী ছিল লুকোনো। সেই পেড়েছে ডিমগুলো।"

আর হল্ শুদ্ধ সবাই কোলাহল ক'রে উঠেছে—"এক পাল মুর্গী লোকটা লুকিয়ে রেখেছে জামার তলায়। তা নইলে কি হতে পারে?"

ডিমের বাজিও শেষে ঘোড়ার ডিমে দাঁড়িয়ে গেল। যে খেলাটাই বাজিকর দেখায়, যেটার দ্বারাই সে দর্শকদের তাক লাগানোর চেষ্টা করে—সেটাই বিশে এক কথায় খোলসা ক'রে বসে আছে। তার সেই একটি কথা—"সব ওর হাতার তলায় লুকোনো।" এইভাবে বাজিকরের সবগুলো খেলার যা কিছু কেরামতি—সেই রিং আর ডিম থেকে সুরু ক'রে কয়েক জোড়া তাস, আ… একখানা চেয়ার, একটা ফারপোর রুটি, অনেকগুলো রূপোর টাকা, জলজ্যান্ত এক বিলিতি ইঁদুর—মায় সেই পায়রা সমেত যা কিছু—সব তার সিদ্ধ হস্তের আর জামার হাতার ফাঁকিবাজি ছাড়া কিছু যে নয় তা প্রতিপন্ন হয়ে গেল।

বাজিকর সত্যিকারের ম্যাজিক একটাও দেখাতে পারল না। তার যশোভাতি ম্লান হয়ে পড়ল। সম্মান প্রতিপত্তিও যায় যায়।

তার শেষ চেষ্টা সুরু হোলো অবশেষে।

"এইবার আমি আপনাদের একটা নামজাদা জাপানী ম্যাজিক দেখাব। এই খেলাটা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের আবিষ্কৃত। আপনাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটা ঘড়ি দিতে পারেন?" ব'লে বাজিকর বিশের দিকে কটাক্ষ করল।

বিশে নিজের সোনার ঘড়িটা খুলে দিল হাত থেকে। হাসিমুখেই বাড়িয়ে দিল। এ সব ম্যাজিক্ তার নখদর্পণে।

"এইবার এই ঘড়িটা আমি আপনাদের সকলের সমক্ষে হামানদিস্তায় গুঁড়ো করব। আপনারা চেয়ে দেখুন।" এই ব'লে বাজিকর একবার তাকালো বিশের দিকে: "কি মশাই, গুঁড়ো করব তো? আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?" বিশে একটু মুচকি হেসে সায় দিল।

বাজিকর সেটাকে হামান্‌দিস্তায় ফেলে কয়েক চোটে আসল বৃহৎ স্বর্ণঘটিত ঘড়িচূর্ণে পরিণত করল। বিশে বল্ল—"আস্ত ঘড়িটা হাতার মধ্যে সরিয়ে ফেলেছে।" ঘরের কারোই সে কথা অবিদিত ছিল না,—বিশে না বল্লেও।

"এইবার আপনার রুমালটা দিন্ তো?" বিশের সিল্কের রুমালটা নিয়ে বাজিকর তক্ষুণি সেটাকে ফর্‌ফর্ করে ছিঁড়ে ফেল্‌ল—"দেখুন, আপনাদের চোখের সামনেই এটাকে ছিঁড়লাম। এই ছিন্ন রুমাল সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো? দেখবার কোন অসুবিধা হচ্ছে না?"

একদম না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এবং বাজিকর যে সেটাকে ফের এক্ষুণি যুড়ে দেবে তাও অচিরে দেখা যাবে, এ কথাও জানার বাকী ছিল না। কিন্তু বিশে স্বয়ং সত্যি এবার একটু অবাক্ হ'ল। এতক্ষণে একটা আসল ম্যাজিকের সম্ভাবনা সে দেখতে পেল। তার রুমালই যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন রূপ নিয়েছে তাতে কোন ভুল নেই, হাতার তলায় যে সরিয়ে ফেলা হয় নি তাতেও সন্দেহ নেই কোনো,—এই রুমাল যে কি ক'রে তার চোখের সম্মুখে পুনরায় আস্ত আকার ধারণ করবে তাই ভেবেই তার তাক লাগছিল।

"আচ্ছা, এইবার আপনার শালটা দিন্। ওটাকে পোড়াব। অবশ্যি যদি আপনি অনুমতি করেন তবেই।"

বিশে অনুমতি এবং দামী শালটা এক সঙ্গেই দিল। …ল পোড়ার সৌরভে সারা হল্ মাত হ'তে লাগল। …কটু একটু ক'রে পুড়ে পুড়ে সকলের চোখের সম্মুখে শেষ পর্য্যন্ত গোটা শালটাই শালভস্মে পরিণত হোলো।

এবার বিশে সত্যিই হতভম্ব হয়েছে। যে শাল তা… চোখের সাম্‌নে পুড়ে গেল, তাকে কেবল যুড়ে দেওয়ার কথা নয়; তার উড়ে এসে জুড়ে বসবার কথা।—তা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে সে ভেবে পেল না। "এবার সত্যি আমার তাজ্জব লাগ্‌ছে। কিছু বুঝতে পারছি না একদম্ না।" মুক্তকণ্ঠেই সে স্বীকার করল এতক্ষণে।

বাজিকরের খেলা শেষ হয়ে এসেছিল। সবাইকে সে সম্বোধন করল অবশেষে—"আপনারা সকলে দেখলেন, আপনাদের চোখের সামনে ওঁর অনুমতিক্রমে আমি ওঁর ঘড়ি ভাঙলাম, রুমাল ছিঁড়েছি, শাল পোড়ানো হোলো—এখন উনি যদি হাতে তুলে দেন্ আমি ওঁর চশমাটারও গতি করতে পারি, এবং আমার কাছে আলকাতরা আছে, বল্লে পরে ওঁর সর্ব্বাঙ্গে স্বহস্তে মাখিয়ে দিতেও আমার আপত্তি নেই। এই ধরণের সত্যিকারের ম্যাজিক দেখিয়ে আপনাদের আনন্দ দিতে আমি একটুও কুণ্ঠিত নই। তবে উনি যদি আর রাজি না থাকেন তা হলে আমার তামাসা আজ এইখানেই শেষ। আচ্ছা, নমস্কার!"

ছোটদের পাতা

রাজা আর মন্ত্রী

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

এক ছিলেন রাজা, তাঁর ছিলেন এক প্রবীণ বিচক্ষণ মন্ত্রী। মন্ত্রী যখন তখন বলিতেন, 'ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্যই।' শুনিয়া শুনিয়া রাজার কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল।

একদিন রাজার ছেলে খেলিতে গিয়া পায়ের একটা আঙুল একেবারে কাটিয়া আসিল। সবাই ব্যাকুল হইয়া পড়িল; মন্ত্রী শুধু বলিলেন, 'ভগবান্ যা করেন ভালর জন্যই।' রাজার আর সহ্য হইল না। বুড়া বড় বাড়িয়াছে, উহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি তখনই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া বন্দী করিতে হুকুম দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই রাজকুমার সঙ্গীদের সঙ্গে শিকার করিতে গিয়া বনে পথ হারাইয়া ফেলিল। একা একা হতাশভাবে ঘুরিতেছে, এমন সময় একদল ডাকাতের হাতে পড়িয়া গেল। ডাকাতেরা কালীপূজা করিতেছিল। বলি

দিবার জন্য একটি সুলক্ষণ মানুষ তাহারা খুঁজিতেছিল, রাজপুত্রকে পাইয়া ভারী খুসী। ডাকাতেরা রাজপুত্রকে স্নান করাইতে লইয়া গেল। তারপর ঠিক বলি দিবার পূর্ব্বে সর্দ্দার একবার তাকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেল—কারণ বিকলাঙ্গ জীব বলির কাজে লাগে না। রাজপুত্রের পায়ে একটি আঙ্গুল নাই দেখিয়া ডাকাতেরা শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিল। কাটা আঙ্গুলের জন্য রাজপুত্র বাঁচিয়া গেল এবং অনেক কষ্টে বাড়ী ফিরিল।

রাজপুত্রের মুখে সব কথা শুনিয়া রাজা তখনই বৃদ্ধ মন্ত্রীকে মুক্তি দিয়া নিজপদে বাহাল করিলেন এবং তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন। রাজা, মন্ত্রী ও পারিষদেরা গল্প করিতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্যই—আপনার এ কথাটা রাজপুত্রের পক্ষে তো বেশ খাটল কিন্তু আপনার পদচ্যুত হয়ে বন্দী হওয়ায় কি ভালটা হয়েছে?' মন্ত্রী বলিলেন, 'হয়েছে বৈকি। দিবারাত্র রাজ্যের ভাবনা ভেবে আমার রাত্রে ঘুম হ'ত না—স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। পদচ্যুত হয়ে আমার ভাবনা ঘুচল এবং বন্দীশালায় বিশ্রাম পেয়ে শরীরও সারল। তা ছাড়া ঐ সময়টা আমি নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের চিন্তা করতে পেরেছি, এটাও মস্ত লাভ বৈকি!' (কুড়ান' গল্প)

চিঠিপত্র

গত শ্রাবণ সংখ্যায় বাংলার নব প্রতিষ্ঠিত "শিশুসাহিত্য-পরিষদের" কথা তোমাদের বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমাদের আগ্রহসূচক চিঠিপত্র পাচ্ছি। তোমরা শুনে সুখী হবে, পরিষদের প্রাথমিক কাজ বেশ ভাল ভাবেই সুরু হয়েছে। পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তারা শিশুসাহিত্যকে 'কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশের' হাত থেকে রেহাই দেওয়াবার জন্য খুব চেষ্টা করছেন এবং ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব স্যর্ আজিজুল হক্ সাহেবের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ক'রে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশে শিশুসাহিত্য বিষয়ক কোন ভাল গ্রন্থাগার নেই। পরিষদ্ এই অভাব দূর ক'রে শীঘ্রই কলকাতায় একটি শিশুসাহিত্য-গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়েছেন। গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি অনুরূপ সংগ্রহশালাও খোলা হবে। বাংলা শিশুসাহিত্যে অনুরাগী সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে এ কাজ সুষ্ঠুভাবেই হতে পারে। গ্রন্থাগারেরর জন্য বই উপহার দিয়ে বা সংগ্রহ-শালার জন্য অন্য কিছু পাঠিয়ে কেউ সাহায্য করলে পরিষদ্ তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট্, কলিকাতায় পরিষদের সম্পাদকের নামে এগুলি পাঠাতে হবে, এবং পাঠালে প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

সঞ্জীবনী সমিতির কলিকাতা শাখার সম্পাদক শ্রীমান্ কল্যাণকুমার রায় জানিয়েছেন যে তাঁরা বেশ ভাল ভাবেই গান, আবৃত্তি প্রভৃতি সহযোগে রবীন্দ্র-স্মৃতি-দি[illegible] পালন করেছেন। শুনে সুখী হবে, রামধনুর গ্রাহকেরা আরও নানাস্থানে ঐ ভাবে ঐ পুণ্যতিথি পালন করেছেন।

সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্য পূজা-সংখ্যা রামধনু এবার বরাবরের মত ক'রে বার করা গেল না।

—রাঃ সঃ

সন্দেশ

জার্ম্মান্‌রা ইয়োরোপের যে সব জায়গা দখল করে নিয়েছিল দেখতে দেখতে তা সবই প্রায় তাদের কবলমুক্ত হয়েছে। ফ্রান্স ও তার বিখ্যাত প্যারিস নগরী এখন মিত্রপক্ষের হাতে। তিন দিক্ থেকে চাপ দিয়ে এখন তারা খাস জার্ম্মেনীর মধ্যেও ঢুকল ব'লে। ওদিকে রুমানিয়া ও বুল্‌গেরিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেছে। জার্ম্মেনীর পরাজয়ের বোধ হয় আর দেরী নেই।

অধুনালুপ্ত "খোকাখুকু" পত্রিকা ও অন্যান্য শিশুসাহিত্যের বিখ্যাত প্রকাশক দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর নেই। তাঁর অভাবে শিশুসাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।

নূতন ধাঁধা (হেঁয়ালী)

(১) জামাইকে কি দিলে সে অঙ্কশাস্ত্রে মস্ত পণ্ডিত হবে?

(২) বর্ষার আকাশ থেকে কোন্ জিনিষ নিয়ে কবিরাজেরা ছেলেদের রোগ সারাবার চেষ্টা করেন?

(৩) মা, বাপ, ভাই এবং ভগবান্—এঁদের মধ্যে মি[illegible] দেখা যায় কিসে? (উত্তর পাঠাতে হবে না।)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—হাঁসপাতাল

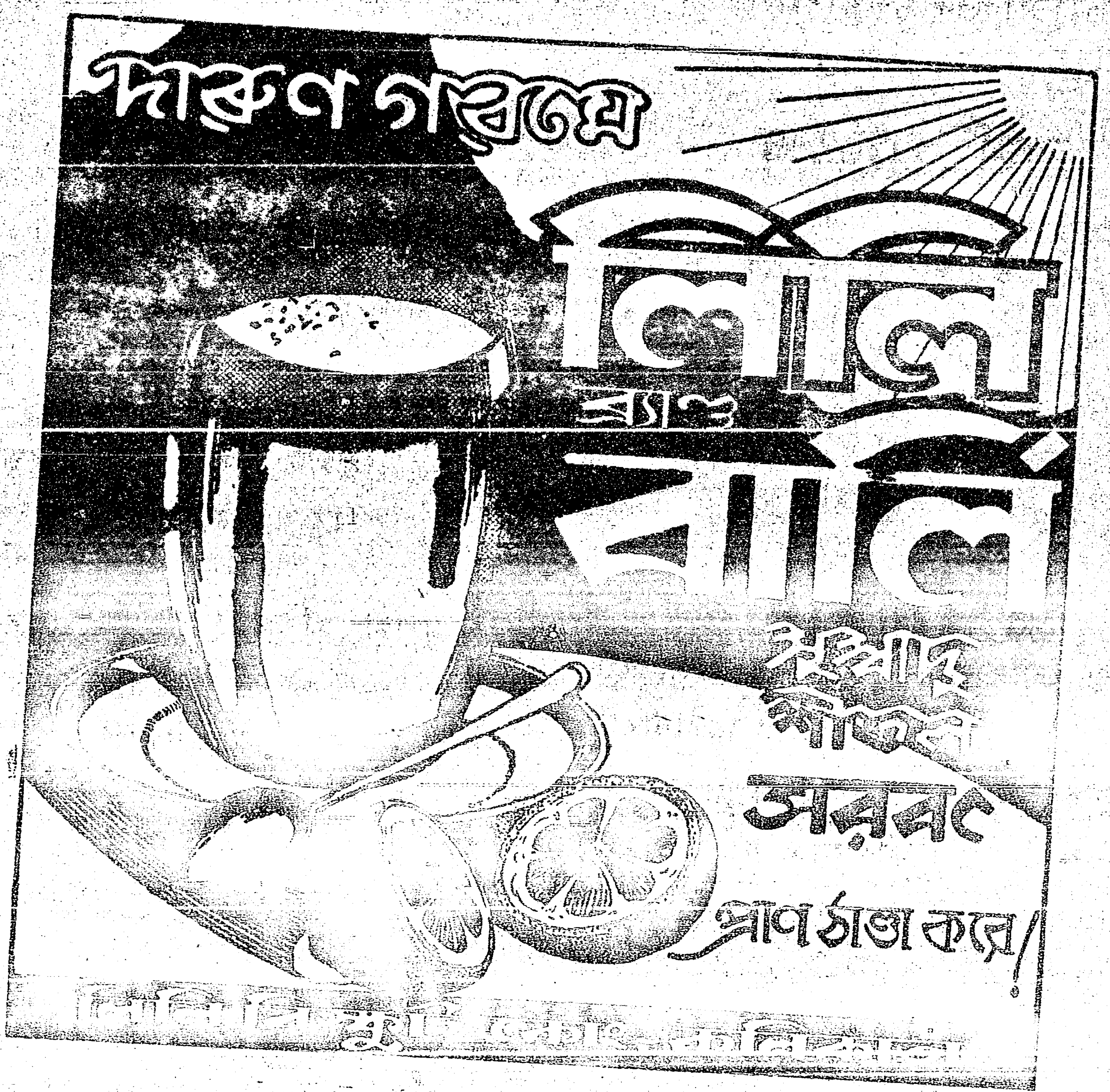

ছেলেমেয়েদের

পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বর্ষ-মঙ্গল

টি গ্রন্থ—অসংখ্য ছবি : এক রং, দুই ও বহু রং—গল্প ও কবিতার ঝরণা—
সুন্দর বাঁধাই—উৎকৃষ্ট ছাপা।

মূল্য ২॥০ মাত্র

ইহাতে লিখিয়াছেন

ীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ব বসু, "বনফুল", নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র-র রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাম চক্রবর্ত্তী, সরোজ রায় চৌধুরী, পতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ভৃতি বিখ্যাত লেখক ও লেখিকাগণ।

বড় নবৃহৎ গ্রন্থ, এত কম দামে—
বর্ত্তমান জগতের পরম বিস্ময়

প্রহেলিকা সিরিজের

চমকপ্রদ ডিটেকটিভ কাহিনী

মুখোশের অন্তরালে	১৲
মৃত্যুদূত	১৲
ব্লাড হাউণ্ড	১৲
কালের কবলে	১৲
শেষ বলি	১৲
নৈশ অভিযান	১৲

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া
বাহির হইতেছে

✻

বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজের

অমূল্য গ্রন্থ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
যাদুকর মার্কণী ১৲

যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বলদর্পী হিট্‌লার ১৲

✻

শিহরণের খনি

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন ১।০

দেব-সাহিত্য-কুটীর ✻ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শিশু-সাহিত্যের যাদুকর হেমেন্দ্রকুমারের
সর্ব্বতোমুখী-প্রতিভার পরিচয় যাঁরা এখনো পান্‌নি,
তাঁরা আমাদের পূজার উপহার
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত

মধুচক্র

সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

একসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমারের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, কথিকা, রূপকথা, জীবনী, নাটিকা, ছড়া, ডিটেকটিভ কাহিনী, গান ও স্বরলিপির এত বড় বই এর আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

রেখাচিত্র ও রঙীন ছবিভরা এই বিরাট গ্রন্থখানির দাম নামমাত্র দুই টাকা।

এক টাকা সংস্করণ 'অনুবাদ সিরিজে' প্রকাশিত হয়েছে :—

হেমেন্দ্রকুমারের নূতন লেখা
মানুষের গড়া দৈত্য
(বাংলায় ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন)

সৌরীন্দ্রমোহনের নূতন লেখা
স্বর্ণ নদী
(কিং অফ্‌ দি গোল্ডেন রিভার)

বার আনা সংস্করণ 'ভারত গৌরব সিরিজে' প্রকাশিত হয়েছে :—
শ্রীদক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

মেঘদূত ও কুমারসম্ভব
শকুন্তলা ও মালবিকাগ্নিমিত্র
রঘুবংশ

প্রতিজ্ঞা স্বপ্নবাসবদত্তা ও অবিমারক
মুদ্রারাক্ষস ও নাগানন্দ
মৃচ্ছকটিক ও মালতীমাধব

এ' ছাড়া নূতন প্রকাশিত হয়েছে :—

হেমেন্দ্রকুমারের
তারা তিন বন্ধু

হেমেন্দ্রলালের
দুর্গম পথের যাত্রী

বনতাড়ুয়ার—বনে বনে যারা ঘুরে বেড়ায়

শরৎ-সাহিত্য-ভবন ✻ ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ ✻ কলিকাতা।

কয়েকখানি নূতন বই

হিমাংশু গুপ্তর—

১। জাপানী ফিফ্‌থ কলম

(জাপানী ষড়যন্ত্রের রোমাঞ্চকর কাহিনী। নরহত্যার অদ্ভুত—অমানুষিক—নৃশংস ছবি। সম্পূর্ণ নূতন রকমের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

ভূধর মুখোপাধ্যায়ের

২। নিশীথের ডাক

৩। ইস্কাবনের টেক্কা

(যশস্বী প্রবীণ লেখকের প্রহেলিকাময় রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস)

প্রত্যেকখানির দাম—১॥০

দে ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজায় অভিনয়ের জন্য

সুবোধ বসুর

বুদ্ধির্যস্য

সেরা হাসির নাটক। স্ত্রী-ভূমিকা নাই। স্কুলে বা ক্লাবে অনায়াসে অভিনয় করা চলে। নাটকটি রেডিয়োতে অভিনীত হইয়াছে। দাম ছয় আনা মাত্র।

গ্রন্থাগার

পি৫৮, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশন, কলিকাতা

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

ধূমকেতু (উপন্যাস) ৵০

জন্মদিনের উপহার (গল্প) ৵০

কোরাল্ আইল্যাণ্ড (উপন্যাস)

যন্ত্রস্থ

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প

মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির" কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম. এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সরস মজাদার হাসির গল্প ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আকাশের গল্প ... ১৲

আবিষ্কারের গল্প ... ॥৵০

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ ... ১।০

সোনার হরিণ ... ১।০

হাস্য ও রহস্য (গল্প) ... ৸০

নূতন পুরাণ ... ৸০

চায়ের ধোঁয়া ... ॥৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু ... ৸০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড, কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

পূজা পার্ব্বণে

উৎসব আনন্দে—

"ভীম নাগ"

সবার প্রথম।

অপরাজেয় ও অপরাজিত।

Regd. No. C—1641

বাংলার

লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

"লক্ষ্মী ঝি"

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ১॥৵০
প্রতি সংখ্যা ।/০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪। আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৮ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
স্মৃতিরঞ্জিত

রামধনু

১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৫১

শরৎ-ভোরের স্বপ্ন

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তেস্কে বসে' সকাল বেলা গ্রামার পড়ে দাদা,
পড়ি আমি একটি কোণে কথামালার বই—
নীল আকাশে ভেসে ভেসে টুকরো মেঘে সাদা
পরীর রাণী যাচ্ছে কোথা ওই !
যায় বুঝি সে দূর দেশে কোন্ সাত সাগরের পার
ঘুম-মহলে সোনার কাঠির পরশখানি দিয়ে—
হাজার যুগের ঘুমখানি আজ ভাঙিয়ে দিয়ে কার
আস্‌বে গলায় গজমোত্তির বরণ মালা নিয়ে।
আলোর পরী !—সাত বরণের বসনখানি পরা,
আল্‌তো পায়ে নেমে এসো আমাদের এই দেশে ;
বাদল শেষে শ্যামল বরণ মোদের সোনার ধরা,
ফুল মেয়েরা পাতার কোণে ফুট্‌বে হেসে হেসে।

শিউলি ঝরে—পুলক ভরে কাশের চামর দোলে,—
আলোছায়ার চপল খেলা খেল্‌তে মোদের ডাকে,
নীল পাখীটী এলো নেমে সবুজ বনের কোলে,
অরূপ রূপে ভুবন আজি স্বপন-ছবি আঁকে।
আছি আমি, আছে দিদি, আছে মায়ের স্নেহ—
তোমার তরে আসন পাতা মোদের আঙিনাতে ;
পেয়ে তোমার পরশখানি উজল হবে গেহ,
ভুলবে দাদা পড়া খানিক গ্রামার নিয়ে হাতে।
পড়া আমার শেষ হ'লে ভাই, গাঁথ্‌ব বসে' মালা,
সন্ধ্যাবেলা তোমার তরে রাখ্‌ব দুয়ার খুলে,
আস্‌বে তুমি চাঁদের দেশের ওগো মানিক মালা,
খেল্‌ব মোরা দু'জনাতে স্বপন-সাগর কূলে।

রাতের কোকিল

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

বিকালে একটি ছোট জার্ম্মান্ সৈন্যদল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করল। গ্রামখানির তখন আর পূর্ব্বেকার সেই গৌরবোজ্জ্বল রূপের কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাড়ী, পথে কালো কালো ভস্মস্তূপ ; আর আগুনের ঝলকে নিষ্পত্র গাছের কঙ্কালগুলি জনহীন বাগানের ওপর বিষণ্নভাবে ঝুলে পড়েছে।

জার্ম্মান্ লেফ্‌টেনাণ্ট বসেছিল ক্ষেতের বাগানের গাড়ীতে। একখানা খোলা মানচিত্র হাতে নিয়ে সে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের চতুর্দ্দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। মনে হয় সে যেন কারুর দেখা পাবার আশা করছিল, কিন্তু জনপ্রাণীর চিহ্নও পাওয়া গেল না সেখানে। শুধু ক্ষেতের বাগানগুলিতে হল্‌দে সূর্য্যমুখী ফুলের সারির ওপর রঙীন প্রজাপতির ঝাঁক ঘুরে ঘুরে উড়ছে দেখা গেল।

কোনখানে না থেমে সৈন্যদলটি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ঘামে আর ধূলোয় মলিন সৈন্যদের মুখগুলি ক্লান্ত বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ; তারা অতি কষ্টে এবং অনিচ্ছুকভাবে পা ফেল্‌তে লাগল তালে তালে।

গ্রামের কিনারে, রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ ঘুরে গেছে দূরবর্ত্তী বনের দিকে, লেফ্‌টেনাণ্ট থাম্‌বার হুকুম দিলে। সমগ্র সৈন্যদলটি উদ্বিগ্ন হয়ে দেখলে যে অফিসার গাড়ী থেকে নেমে দূরবীণ দিয়ে চতুর্দ্দিক্ সতর্কভাবে দেখে নিচ্ছে। হাঁফ্ ছাড়বার এই সময়টুকু পেয়ে সৈন্যরা তাদের ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছে নিল আর অবসন্ন পিঠের ওপর ভারী বোঝাটা ঠিক করে ঝুলিয়ে দিল।

হঠাৎ গ্রীষ্মদিনের নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে শোনা গেল একটি রাতের কোকিলের সুরধ্বনি,—সেই অপরূপ সুমিষ্ট সুরে আকাশ বাতাস যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত্ত থেমে আবার সেই অপূর্ব্ব সুর নব উৎসাহে চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করে দিল।

সৈন্যেরা প্রত্যেকে, এমন কি লেফ্‌টেনাণ্ট পর্য্যন্ত, উৎকর্ণ হয়ে নুয়ে-পড়া ঝোপঝাড় আর বার্চগাছের শাখাগুলির চারিদিকে সন্ধানী চোখে তাকাতে লাগল।

হঠাৎ লেফ্‌টেনাণ্টের নজর পড়ল—খুব কাছেই, একটা ছোট পুকুরের পাড়ে, পা ঝুলিয়ে বসে আছে একটি ছেলে। সবুজ জামা গায়ে আর খালি মাথায় সে পত্রময় পশ্চাদ্‌পটের সঙ্গে যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোলের ওপর এক টুকরো কাঠ নিয়ে একমনে তার ওপর ছুরি চালাচ্ছে, দেখা গেল।

'এই, কে ওখানে?'—নাৎসী দলপতি হাঁক দিলে।

বছর তের বয়সের সেই কিশোরটি তাড়াতাড়ি ছুরিটা পকেটে রেখে দিলে এবং জামা থেকে কাঠের কুচিগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অফিসারের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল।

'শোনো, এখানে এসো। দেখি তোমার কাছে কি আছে?'—স্থানীয় ভাষায় জার্ম্মান্‌টি বললে।

তার মুখের ওপর আনন্দ-চঞ্চল নীল চোখ দুটি তুলে ছেলেটি মুখের ভেতর থেকে কি একটা জিনিষ বার ক'রে তার হাতে দিলে। নাৎসী দলপতি দেখলে সেটি বার্চের ছালের তৈরী পাতার ভেঁপুর মতন একরকম বাঁশী।

'মন্দ নয় তো হে', মাথা নেড়ে লেফ্‌টেনাণ্ট বললে। মুহূর্ত্তের জন্যে তার অপ্রসন্ন রুক্ষ মুখে একটা ক্রুর হাসির ঝিলিক দেখা গেল এবং দেখাদেখি সামনেকার জনকতক সৈনিকের মুখে ফুটে উঠল অনিচ্ছুক হাসি।

'কোথা থেকে অমন ক'রে বাঁশী বাজাতে শিখলে?' অফিসারের মুখের হাসি এখন মিলিয়ে গেছে।

'কেন, আমি নিজেই শিখেছি, স্যর;··· আর আমি বুলবুলির মতনও ডাকতে পারি।'

সত্যিই সে বুলবুলির ডাক আরম্ভ ক'রে দিলে। তারপর আবার বাঁশীটা মুখের মধ্যে পূরে দিয়ে আর ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে' কোকিলের সুরে চারিদিক্‌ কাঁপিয়ে তুললে।

চোখের ওপর দুরবীণ উঠিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'গ্রামে কি তুমি একাই আছ?'

'আপনি কি বল্‌তে চান্‌ আমি একা? একা হব কেন? এখানে তিতির আছে, চটক্‌ পাখী আছে, আর দাঁড়কাকেরাও আছে। তবে রাতের কোকিল শুধু আমি একলা ···'

'এই পাজী ফক্কড় ছোঁড়া, শোন্‌।'—লেফ্‌টেনাণ্ট চটে' উঠে তাকে থামিয়ে দিলে, 'আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি, এখানে আর কোন লোক আছে?'

'ওঃ, যুদ্ধ বাধ্‌বার পর থেকে আর কেউ থাকে না।' ছেলেটি শান্তভাবে জবাব দিলে। যেই গোলাগুলি ছোঁড়া আরম্ভ হ'ল আর গ্রামটা পোড়ানো সুরু হ'ল, সবাই চীৎকার করতে লাগল—পাগলা কুকুরের দল এদিকে আসছে, পাগলা কুকুরের দল এদিকে আস্‌ছে', আর তারপর সবাই পালিয়ে গেল।'

'আর তুই যে বড় পালালি না?'

'ওঃ, আমি? জানোয়ারদের দেখবার জন্য থেকে গেলুম। যখন শহরে থাক্‌তুম, পঞ্চাশ কোপেক দিলে বাছুরের মতন এত বড় একটা বেড়াল দেখতে পাওয়া যেত।'

'ছেলেটার মাথায় ছিট আছে', বিদেশী ভাষায় লেফ্‌টেনাণ্ট তার সৈন্যদের বললে। তারপর বালকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে: 'আচ্ছা সার্মণ্টাস্‌ যাবার রাস্তাটা কোথায় জানো?'

'বা রে, সার্মণ্টাস্‌এর রাস্তা আমি জানি না! জুআন্‌ কাকার সঙ্গে কত দিন ওখানে মাছ ধরতে গেছি—সেই কারখানার কাছের পুকুরটায়। এমন চমৎকার পাইক মাছ আছে ওখানে, আর তারা এত বড় বড় যে ছোট রাজহাঁস দিব্যি গিলে ফেল্‌তে পারে। গেল বছর যখন ওখানে গিয়েছিলুম, আমার বেশ মনে আছে, সেই বাঁধ ভেঙ্গে গেল আর তার পর···'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। আমাদের নিয়ে চল তো সেখানে। যদি আমাদের ঠিক রাস্তা দেখাও, তা হলে তোমায় এই চমৎকার জিনিষটি দেব',—লেফ্‌টেনাণ্ট তাকে সিগারেট জাল্‌বার ঝক্‌ঝকে কৌটোটা দেখাল; কিন্তু যদি ভুল পথে আমাদের নিয়ে যাও, তা হলে এই বাঁশীটার সঙ্গে তোমার মাথাটাও গুঁড়িয়ে দেব; বুঝেছ?'

তারপর সমগ্র দলটি রাস্তা ধ'রে এগোতে আরম্ভ করল। প্রথমে চল্‌ল লেফ্‌টেনাণ্ট এবং তার পাশে ছেলেটি; আর তাদের পেছনে সৈন্যের দল। সে কখনো রাতের কোকিল, কখনো বুল্‌বুলির মত সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, কখনো রাস্তার ধারের ডালপালা টানাটানি ক'রে, কখনো বা রাস্তা থেকে ঢিল তুলে এদিক্‌ ওদিক ছুঁড়ে এমনভাবে নিজের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে চল্‌তে লাগল

যেন সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বা জার্ম্মান্‌ সৈনিকদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

খানিকক্ষণ এইভাবে চলবার পর রাস্তাটি বনের মধ্যে এসে ঢুক্‌ল এবং ক্রমশঃ বন হয়ে উঠল ঘন থেকে ঘনতর। সাপের গতিপথের মতন আঁকাবাঁকা আর ঘাসে ঢাকা সবুজ রাস্তার ওপর শাখা-পত্রাচ্ছন্ন বার্চ গাছগুলির নিবিড় ছায়া পড়েছে; এবং আরো ওপরে ধূসর পাহাড়ের বুকে ঘন সন্নিবিষ্ট ফারগুলির প্রলেপ।

'তোমাদের এখানকার লোকেরা গেরিলা সম্বন্ধে কি বলে বল তো?···আচ্ছা, এই গেরিলাদের কেউ এই বনের মধ্যে আছে নাকি?' লেফ্‌টেনাণ্ট জিজ্ঞেস করলে।

'সে আবার কি? ব্যাঙের ছাতা নাকি? ওঃ, সে সব কোন রকম আমাদের এখানে নেই—শুধু সাইবেরিয়াস-এর ছাতা আর বার্চের ছাতা এখানে আছে'। মাথা নেড়ে কিশোর উত্তর দিলে।

লেফটেনাণ্টের দৃঢ় ধারণা হ'ল যে এর কাছে কোন কিছুই জানতে পারা যাবে না—ছেলেটা বদ্ধ পাগল। তাই আবার সবাই নীরবে পথ চল্‌তে লাগল।

তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে বনের মধ্যে জন কতক লোক পাশাপাশি বসে যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছিল; তাদের বন্দুকগুলো একটা গাছের গায়ে দাঁড় করানো ছিল। ছোট ফার্‌গাছগুলির সরু সরু গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে তারা নজর রেখেছিল রাস্তার বাঁকের ওপর। মাঝে মাঝে তাদের সাংকেতিক ভাষায় আলাপ করতে শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু বরাবর তাদের স্থির লক্ষ্য ছিল রাস্তার দিকে।

'ওই শোনো', তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল। তারপর সে অস্পষ্ট বনমর্ম্মরের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে দূরাগত একটা পাখীর গানের অস্পষ্ট ধ্বনি যেদিক্‌ থেকে আসছিল সেইদিকে তার মাথা ঘোরালে। 'আমাদের কোকিলের সুর!'

'তুমি ঠিক শুনেছ, ভুল হয়নি তো?' আর একজন তাকে জিজ্ঞেস করলে এবং কান খাড়া রেখে নিজে কিছু শুনতে না পেলেও একটা কাটা গুঁড়ির নীচে থেকে চারটে হাতবোমা বার ক'রে সামনে রাখলে।

'এবার শুন্‌তে পাচ্ছ?'

ততক্ষণে সেখান থেকে পাখীর গান রীতিমত স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল এবং যে ব্যক্তি প্রথম তা' শুনেছিল সে মুহূর্ত্তের জন্য পাথরের মতন নিশ্চল হয়ে গেল। তারপর সে আস্তে আস্তে সেই সুরের প্রত্যেকটি বিরামের সময় হাতের তাল দিয়ে গুণ্‌তে আরম্ভ করলে,—'এক, দু তিন, চার···'

'বত্রিশটা নাৎসী', গেরিলা যোদ্ধাদেরই পক্ষে বো ভাষার সেই কোকিলের ডাক শুনে প্রথমোক্ত যোদ্ধা বললে। তারপর কোকিলের গানে পরেই বুল্‌বুলি একটি ডাক শুনে সে যোগ করলে, দু'টো 'মেশিনগান্‌।'

'যেমন করেই হোক্‌ আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে' পিঠের ওর কার্তুজের ফিতা বাঁধা একজন দাড়িওয়াল লোক তা'র বন্দুকটা তুলে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে।

দলের মধ্যে সব চেয়ে কম বয়সী যোদ্ধাটি তার বেল্টে সঙ্গে হাতবোমাগুলি এঁটে রাখছিল; যে প্রথমে কোকিলে ডাক শুনে তা'র সাঙ্কেতিক অর্থ সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছি সে হঠাৎ তার কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে, 'তাড়াতাড়ি নাও আমি আর স্টেপান ওদের এগিয়ে যেতে দেব, আর তুমি আরম্ভ করে দেবার পর আমরা পেছন থেকে আক্রমণ চালাব। যদি আমাদের কিছু ঘটে যায়, কোকিলের দিকে লক্ষ্য রেখো, তাকে বাঁচাতেই হবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠিক ছোট ফার্‌গাছগুলির পেছনে জার্ম্মান্‌ বাহিনীটি উপস্থিত হ'ল। 'রাতের কোকিলের' গান তেমনি শোনা যেতে লাগল, কিন্তু সোভিয়েট গেরিলাদের কাছে তা'র এখন আর কোন নতুন অর্থ রইল না।

জার্ম্মান্‌রা ক্রমে বাঁক পেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়ল। হঠাৎ যেন বালকের কণ্ঠনিঃসৃত সুরের প্রতিধ্বনি হিসাবেই বন-ঝোপের মধ্যে থেকে আর একটি পাখীর ডাক শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ চোখের নিমেষে সচকিত খরগোসের মতন ছেলেটি এক লাফে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এক সঙ্গে অনেকগুলি বিস্ফোরণ এবং বন্দুকের গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকের গভীর নিস্তব্ধতা খান্‌ খান্‌ হ'য়ে ভেঙ্গে গেল। রিভলভারটা বাগিয়ে ধরবার আগেই নাৎসী সেনাপতি রাস্তার ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল। গেরিলাদের হাত-বন্দুকের অব্যর্থ গুলিতে একটার পর একটা জার্ম্মান্‌ সৈনিক প্রাণহীন দেহে ধরাশায়ী হতে লাগল। গোঙানির শব্দ, ক্রুদ্ধ আদেশ, ভয়ার্ত্ত চীৎকারে বাতাস ভরে গেল।

তার পরদিন একটী দগ্ধীকৃত গ্রামের কিনারে, কয়েকটি পথের সংযোগস্থলে এক পুকুর-পাড়ে বসে' তেরো বছরের একটি কিশোর বাঁশীর সুরে চারিদিক্ ভরিয়ে তুলছিল। মাঝে মাঝে সে পেছনের গ্রামের দিকে এমন ক'রে তাকচ্ছিল, যেন সে কারুর জন্য অপেক্ষা করছে।

তার মুখ থেকে যে সুরের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল তাকে অতি অভ্যস্ত কর্ণও কোকিলের কণ্ঠ থেকে পৃথক্ ভাবতে পারবে না।*

বাঙালীরা বাংলা বল

অরূপ

অল্প দিন আগেকার কথা। আমার এক ভগ্নীপতি লাহোরে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম বিমল বাবু। তিনি খুব ওস্তাদ্ গাইয়ে। লাহোরে গিয়ে তিনি দেখলেন সেখানে নওরোজ না কি একটা বিরাট উৎসব হচ্ছে।

উৎসবের একদিন ছিল সঙ্গীতের জন্য। বড় বড় ওস্তাদ্‌রা সব গাইবেন; বাজাবেন। এ সময়ে বিমল বাবুকে সেখানে পেয়ে সেখানকার বন্ধুরা তাঁর নামটিও দিলেন ওস্তাদ্‌দের তালিকার মধ্যে।

কর্ম্মকর্ত্তারা খুব সুন্দর ব্যবস্থাই করেছিলেন। সামিয়ানার নীচে হাজার হাজার দর্শকের স্থান হয়েছে। সভাপতির নাম মনে নেই, তবে তিনি একজন মন্ত্রী বা ঐ রকম উচ্চপদস্থ সম্মানিত কেউ ছিলেন। গায়কদের জন্য মঞ্চে মাইক্রোফোনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাইয়েদের কার্ড নিয়ে সভামণ্ডপে প্রবেশ করতেই সভার সম্পাদক বিমল বাবুকে আদর করে নিয়ে গেলেন গাইয়েদের বিশেষ আসনে। সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, 'বিমল বাবু, আপনি কি গান গাইবেন ?—ধ্রুপদ খেয়াল—'

বিমল বাবু জবাব দিলেন, 'আমি এ সব কিছুই গাইব না। আমি গাইব বাংলা গান।'

একটু আশ্চর্য্য হয়ে সম্পাদক চেয়ে রইলেন বিমল বাবুর মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'বিমল বাবু, আমাকে মাফ করবেন। আপনাকে আমি বন্ধুভাবেই বলছি, আপনি এখানে বাংলা গান গাইবেন না। কেউ বুঝবে না।'

বিমল বাবু স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'হিন্দী গানের যা ভাষা তাও বড় কেউ বোঝে না, হিন্দুস্থানীরাও না। তবুও লোকে গান শোনে। আমি বাংলা গানই গাইব।'

সম্পাদক যেন একটু দুঃখিত হয়েই চলে গেলেন। সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে। ওস্তাদের পর ওস্তাদ্ উঠছেন। হাততালি পড়ছে। যাঁদের এখনও পালা আসে নি, অগণিত দর্শকের দিকে চেয়ে তাঁদের বুকটা মাঝে মাঝে দুরু দুরু করে উঠছে।

পেছন থেকে এসে কানের কাছে ফিস ফিস করে আবার সম্পাদক বললেন, 'বিমল বাবু, আপনি কি বাংলা গানই গাইবেন ?'

—'হ্যাঁ।'

সম্পাদক বললেন, 'তালিকায় গানের কথা লিখে দিতে হবে। আপনার পালার আর বেশী দেরী নেই। এখানে আরও দু'চারজন বাঙালী ওস্তাদ্ গান গাইবেন। সকলেই তাঁরা হিন্দী গান গাইছেন। বিমল বাবু, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি হিন্দী গান করুন।'

আমার ভগ্নীপতি অত্যন্ত তেজস্বী লোক। বাংলা ভাষা ও বাংলা দেশকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁর গায়ের জোর ও মনের জোর দুই-ই দেখবার মত। একবার একটা বিষয় ধরলে সহজে ছাড়বার পাত্র তিনি ন'ন।

তিনি একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দিলেন, 'ধন্যবা[d] সম্পাদক মশাই। তালিকাতে আমার নামের পাশে লিখু[n] বাংলা গান। বাংলা গানই আমি গাইব।'

সম্পাদক আবার বললেন, 'আপনি একটু ভেবে দেখু[n] বিমল বাবু! আমি আপনাকে বন্ধুভাবেই বলছি। ব[হু] দূর থেকে আপনি এখানে এসেছেন। আমি চাই আপনি খুব সুনাম নিয়ে দেশে ফিরে যান।'

বিমল বাবু কিন্তু নিজের গোঁ কিছুতেই ছাড়লেন না দেখতে না দেখতে তাঁর ডাক পড়ল। এবার স্ব[য়ং] সভাপতি তাঁকে অনুরোধ করলেন—শেষ অনুরোধ—'বিম[ল] বাবু, এখানে কেউ বাংলা বুঝবে না। আপনি হিন্দী গা[ন] করলে বেশী নাম পাবেন।'

সভাপতিকে একটা ছোট ধন্যবাদ দিয়ে বিমল বা[বু] একেবারে মঞ্চের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমেই তি[নি] ছোট একটা বক্তৃতা দিয়ে নিলেন। তিনি বললেন, 'সু[...]

*ঋষ সাহিত্য থেকে।

বাংলা দেশ থেকে আমি এসেছি। আপনাদের কি উপহার দেব ? আমাদের দেশের কি জিনিষ দিয়ে আমি আপনাদের আনন্দ দিতে পারি ? আমি আপনাদের কবি রবীন্দ্রনাথের দেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি গান রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া সুরে ডালি নিয়ে এসেছি। এখানে আমার হিতৈষী বন্ধু কেউ কেউ বলছেন, আপনারা বাংলা গান পছন্দ করবেন না। যদি তাই হয়, তা হলে গান গেয়ে আমি আপনাদের বিরক্ত করতে ইচ্ছা করি নে।'

এই সামান্য দু'টি কথায় শ্রোতাদের মাঝে বিপুল উত্তেজনা দেখা দিল। 'আপনি বাংলা গান করুন'—চারদিক্ থেকেই ভয়ানক চীৎকার হতে লাগল।

সভাপতি বললেন, 'আপনি বাংলা গানই করুন।'

বিমল বাবু সেদিন একটি গান গেয়েই অব্যাহতি পান নি; আর তিনি এত হাততালি পেয়েছিলেন যে অন্য কোন গায়কের ভাগ্যেই তা জোটে নি।

তারপর তিনি যে ক'দিন লাহোরে ছিলেন প্রত্যেক দিন নানা জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এবং তোমরা শুনে সুখী হবে যে তার অধিকাংশ নিমন্ত্রণই আসত অবাঙালীদের কাছ থেকে।

আর একটি ছোট ঘটনা বলছি।

আমাদের একটি কিশোর ভাই, নাম হৃষীকেশ ভাদুড়ী, গ্রে ষ্ট্রীটে থাকে। আমাদের বাংলা প্রচার কাজে সে একজন বড় উৎসাহী। বাড়ীতে ধোপা এসেছে কাপড় নিতে। বাবা তার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলছেন। হৃষীকেশ বললে, 'বাবা, এদের সঙ্গে আমাদের বাংলা বলাই ভাল নয় কি ? শুনেছি আমরা যা হিন্দী বলি, তা নাকি সত্যিকার হিন্দী হয় না।'

হৃষীকেশের বাবা খুব ভালমানুষ। ছেলের কথা বেশ মন দিয়ে তিনি শুনতে লাগলেন। সে বললে, 'এরা পেটের দায়ে আমাদের দেশে এসেছে। আমরা যদি বাংলা বলি সবাই তা হলে বাংলা শিখবে। আমাদের মুখে হিন্দী শুনলে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে এরা হাসে।'

ধোপা বললে, 'খোকাবাবু ঠিক বলেছেন, খোকাবাবু ঠিক বলেছেন।'

রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ত্রয়োদশ কাণ্ড

টালিগঞ্জ রোডের শেষ প্রান্তে এসে মোটর থামলো গুণ্ডাদের নির্দ্দেশ মত দু'পাশে দুই ঝকঝকে ছোর[া] আবরণে মানু ও সত্যেনকে মোটর থেকে নামতে হ'ল

বাড়ীর দরজা খোলা ছিল। অন্ধকারের ভিতর থে[কে] সোলার ও শশধর এগিয়ে এল, সাড়ম্বরে অভিন[ন্দন] জানালো—আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক!

সত্যেন ঠিক তেমনই শ্লেষের সুরেই বললে,—আহা করেন কি—করেন কি! এত রাতে এ-ই কষ্ট ক[রে] আবার বাইরে এলেন ? আমরা ঠিকই যেতাম।

সামনেই বসবার ঘর। সোলার সাহেব একখা[না] সোফা ঠেলে দিয়ে বললে—লেডিজ্ ফার্ষ্ট: বসুন শ্রীম[তী] মিনতি দেবী।

—মিনতি দেবী! সত্যেন বিস্মিত হ'ল।

—এজ্ঞে—ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে সোলার মানুর মাথ[ার] ঝুঁটিটী নেড়ে দিয়ে বললে—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মিনতি দেবী।

সত্যেন সত্যই হতবাক্ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ আর তা[র] মুখে কোন কথা জোগালো না।

সোলার বললে—যাক্, আসল কথাটা এবার বলি তোমাদের দু'টিকে আজ নিমন্ত্রণ করে এনেছি কেন জান শুভকাজটা এখানেই শেষ করবো বলে।

— তার মানে ?

—মানে অতি সরল। সেই ছবি-আঁকা কার্ডবোর্ডখানি আমাদেরকে দাও, আর আমরা মহা-সমারোহে তোমাদের দু'টিকে উদ্বাহ-বন্ধনে ঝুলিয়ে দিই। আজ দিন ভালো আছে

শশধর বললে—পরে এই উপলক্ষ্যে চাই-কি আমি একটা পদ্যও ছাপিয়ে দিতে পারি। তোমার বাবার একটা ঠিকানা দিও মিস্ ব্যানার্জ্জি, একটা কপি তোমার বাবার কাছেও পাঠিয়ে দেব।

—ঠিক কথা,—সোলার বললে,—সে মহাপুরুষ তো ক'দিন হ'ল হরিগঞ্জ জেল থেকে পালিয়েছেন। তাঁর এখনকার ঠিকানাটা কি বল ত' ?

ক্ষণে ছদ্মবেশ-ধরা-পড়ে-যাওয়ার বিব্রত-ভাবটা সামলে নিয়েছে, বললে—আমি জানি না।

—নিশ্চয়ই জানো। মেয়ে বাপের ঠিকানা জানে না ই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

—বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা।

—অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। কারণ বাপ মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে আছে, কাজেই আলাদা ক'রে বাপের ঠিকানা জেনে রাখার দরকার মেয়ের হয় না।

বজ্রাঘাতে ঘরখানি যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। বাক্যের অনুসরণে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দরজার উপর: একমুখ দাড়ী-গোঁফ নিয়ে ছিন্নবেশে একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যেন চিনলো। এই লোকটিই ক'দিন আগে এক রাত্রে তার বাড়ীর দরজার সামনে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল; একেই সে মনে করেছিল ছদ্মবেশী গোয়েন্দা।

মিনতি অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—বাবা!

শশধর বিস্ফারিত চোখে বললে—তুমি! শৈলেন!

শৈলেনের মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো, বললে—অত বিচলিত হচ্ছ কেন শশধর? তোমাদের সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব, তাই জেল থেকে বেরিয়েই একবার দেখা করতে এলাম।

—জেল থেকে বেরোও নি—সোলার বললে,—জেল থেকে পালিয়েছ!

—একই কথা। আসলে আমি এখন জেলের বাইরে।

—না, এক কথা নয় মিষ্টার ব্যানার্জ্জী! এখনি পুলিশে খবর দিলে তারা সাদরে তোমাকে আবার জেলের ভিতরে নিয়ে যাবে।

—কিন্তু এবার তো আর আমাকে একা যেতে হবে না, এবার দু'জন পুরানো বন্ধুকে সঙ্গী পাব—শশধর আর তুমি!

—হুঁ! আক্রোশে সোলারের চোখ দু'টি ছোট ছোট হয়ে উঠলো। মাছি তাড়াবার ভঙ্গীতে ডান হাতখানি সে বারেক বাতাসে ছুঁড়ে দিলে। বাইরে দরজার সামনে একজন গুণ্ডা অপেক্ষা করছিল, সোলারের এই হাত নাড়ার অর্থ সে বুঝলো; হাতের ছোরাখানি চকিতে সে ছুঁড়ে মারলো শৈলেনের দিকে।

শৈলেনের দৃষ্টি এড়ায় নি। বাঁ হাত দিয়ে ছোরাখানি সে রুখলো, তবে হাতের খানিকটা কেটে গেল।

সোলার ইতিমধ্যে একটি পিস্তল তুলে ধরলো। দৃষ্টিকে ধারাল করে সে বললে,—এটি একটা খেলনা নয়। ব্যানার্জ্জী বাবু, তুমি এখানে বেশী চলাকী করলে আমি গুলি চালাবো। জেল থেকে পালানো আসামীর উপর গুলি চালালে আইনে আমার কিছুই হবে না তা তুমি জান। সেদিক্ থেকে আমার ভয় পাবার কিছু নেই।

শৈলেন সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বললে,—কিন্তু তোমার পিস্তলটার পাশ আছে তো?

—তার উত্তর পুলিশের কাছে দেব, তোমার কাছে নয়।...নাও, মিষ্টার শশা, আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না, শৈলেনকে চট্ করে বেঁধে ফেল দিকি। ওই ড্রয়ারের মধ্যে দড়ি আছে।

শশা টেবিলের ড্রয়ার খুলে দড়ি নিয়ে এল। শৈলেন ভালো মানুষের মত দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিলে। (ক্রমশঃ)

পূর্ণিমা

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার, এম্.এ, বি. এল্

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। কিছুক্ষণ বাঁশী বাজাইলেন।]

কৃষ্ণ। (স্বগত) সখীরা সবাই আজ ছল করে লুকিয়ে রয়েছে। দেখা যাক্, এই ছলনার লীলায় কে হারে কে জেতে! (প্রকাশ্যে) তাই তো, আজ এত দেরী হচ্ছে কেন? তারা কি আজ আর আসবে না?...কোথায় গেল ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা, চম্পকলতিকা?...নাঃ, কেউ কোথাও নেই।...এখন কি করি?...ফিরে যাব?...হাঁ, তাই যাই। (প্রস্থানোদ্যত...আবার ফিরিয়া) না, যেতেও যে পারছি নে, যদিই আসে। (বংশীবাদন) (স্বগত) নাঃ, আজকে দেখছি এদের সঙ্কল্প দুর্জ্জয়! বেশ, আমিও তবে আজ এক অভিনব লীলায় আত্মপ্রকাশ করি। কোথায় বিশ্বরূপিণী বিশ্ব-বিমোহিনী বিষ্ণুমায়া! এস তুমি। আজকের এই অপূর্ব লীলায় আমার সহায় হও। যে মায়ায় এই নিখিল বিশ্ব মগ্ন হয়ে আছে সেই মায়া আজ শত অংশে বিভক্ত হয়ে বৃন্দাবনের গোপিনীরূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হও।" (অন্তরীক্ষে দিব্য সঙ্গীতধ্বনি)

(প্রকাশ্যে)...কোথা মোর বৃন্দা সখী লীলার আধার,
বৃন্দা বিনা বৃন্দাবন চির অন্ধকার।

[গাহিতে গাহিতে অপর দিক্ হইতে মায়া বৃন্দার প্রবেশ]

বৃন্দা। জয় নিরঞ্জন, বিপদভঞ্জন,
গোপিনীরঞ্জন চিত্তবিহারী।

কৃষ্ণ। ললিত-লবঙ্গ-লতা ললিতা মোহিনী—
এস এস সখী মোর কৃষ্ণ-সোহাগিনী!

[মায়া ললিতার প্রবেশ]

ললিতা। জয় ব্রজেশ্বর, করুণা-নির্ঝর,
শ্যাম পীতাম্বর মুরলীধারী।

কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হৃদে নিত্যবাস কৃষ্ণ সহচরি,
এস এস ভক্তিমতী বিশাখা সুন্দরী!

[মায়া বিশাখার প্রবেশ]

বিশাখা। জয় জনার্দ্দন, নন্দনন্দন,
কৃষ্ণ কেশব যশোদা-জীবন,
কমললোচন মৌলিভূষণ,
ভকতপ্রাণধন কুঞ্জচারী।

কৃষ্ণ। চম্পকের অঙ্গ-আভা রঙ্গে সুরসিকা
এস এস কৃষ্ণ সখী চম্পকলতিকা।

[মায়া চম্পকলতিকার প্রবেশ]

চম্পক। গোপীবল্লভ জয় গোপাল,
গোকুলচন্দ্র ব্রজদুলাল,
গোপশিশুসখা জয় হে রাখাল,
ভকতবৎসল হরি মুরারি।

কৃষ্ণ। আর আর সখী মোর যত ব্রজাঙ্গনা—
ব্রজের মাধুরীরূপী এস সর্ব্বজনা!

[মায়া গোপিনীগণের প্রবেশ]

গোপিনীগণ। শ্রীমধুসূদন, কালিয়গঞ্জন,
মাধব দামোদর কংসনিসূদন,
সৃজন-পালন প্রলয়-কারণ,
কেশীমথন মধুকৈটভারি।

সকলে। জয় বাসুদেব জয় নারায়ণ,
জয় নরোত্তম অনাথ-তারণ,
পাপতাপহর কলুষ-নাশন,
জয় গোবর্দ্ধন গিরিধারী।

কৃষ্ণ। ললিতা, বিশাখা, আজ তোমাদের আসতে এত দেরী হল যে?

ললিতা। আমরা তো ইচ্ছে করে একটুও দেরী করিনি প্রভু! তোমার বাঁশী শুনতে পেয়েই সব কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছি।

বিশাখা। কত যে দূর পথ তা তো জান প্রভু তাই একটু বিলম্ব হয়েছে।

কৃষ্ণ। তবু ভাল। আমি ভাবছিলাম যে হয়তো তোমরা আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে ইচ্ছে করে দেরী করছ ...(বক্রদৃষ্টিতে অন্তরালে চাহিয়া) অথবা বুঝি আমার সঙ্গে ছলনা করে কোথাও লুকিয়ে আছ।

ললিতা। তাও কি কখনো হয়? তোমাকে কষ্ট দেবার কথা কি আমরা ভাবতে পারি?

বিশাখা। এও কি সম্ভব? তোমার সঙ্গে ছলনা করব আমরা!

বৃন্দা। তোমাকে দেখবার জন্যে আমরা যে কত ব্যাকুল তাকি তুমি জান না দয়াময়?

চম্পক। ছলনাময়ের সঙ্গে ছলনা করবে এত বড় সাহস কার?

কৃষ্ণ। বেশ বেশ! শুনে খুব সুখী হ'লাম। তোমাদের মতিগতির যে এ রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে সেটা বাস্তবিকই খুব আনন্দের কথা...এখন তোমরা তবে কি করবে?

ললিতা। আমাদের নিজের ইচ্ছায় আর কি হবে প্রভু! তুমি যা আদেশ করবে তাই হবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা বেশ, তবে চল আগে আমরা বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল তুলে নিয়ে আসি গে।

সকলে। বেশ, তাই চল প্রভু!

[কৃষ্ণ ও সকলের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]
"জয় নিরঞ্জন বিপদ-ভঞ্জন..." (ক্রমশঃ)

মণি-মঞ্জুষা

ওথেলো

(উইলিয়াম শেক্সপীয়ার-রচিত পৃথিবীবিখ্যাত নাটকের গল্পাংশ)

ভেনিস সহরে ব্রাব্যানসিও নামে একজন ধনী লোক বাস করতেন। তাঁর একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছিল, তার নাম ডেস্‌ডিমোনা। ডেস্‌ডিমোনা শুধু রূপেই বড় ছিল না, গুণেও ছিল অসাধারণ। দেশের যত ধনী আর রাজরাজড়ার ছেলেরা তাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু

TIGHT BINDING

ডেসডিমোনা তাতে রাজী হ'ত না। ধন আর রূপের চাইতে সে গুণ আর পৌরুষেরই বেশী ভক্ত ছিল।

সেই সময়ে ভেনিসে ওথেলো নামে একজন বিদেশী বীরপুরুষ বাস করতেন। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের গুণে ও বীরত্বের বলে তিনি সেনানায়কের পদলাভ করেন। ভেনিসে ওথেলোর খাতিরও ছিল খুব। কিন্তু ওথেলো ছিলেন জাতিতে কৃষ্ণকায় মূর। জাতের দিক্ দিয়ে শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে সমকক্ষ মনে করত না। ওথেলোর একটা গুণ ছিল—তিনি খুব চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। তাঁর নিজের মুখে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বীরত্বের গল্প শুনতে অনেকেই ভাল বাসত, এবং ডেস্‌ডিমোনাও ছিল তাদের মধ্যে একজন।

ডেস্‌ডিমোনা মনে মনে ওথেলোকে পতিত্বে বরণ ক'রে নিল। কিন্তু ব্রাব্যান্‌সিও এ বিয়ে বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। কৃষ্ণকায় মূর, তা সে যতই গুণবান্ হোক্ না কেন, তাঁর জামাই সে কিছুতেই হ'তে পারে না। কিন্তু ডেস্‌ডিমোনা সে যুক্তি মান্‌ল না। বাপকে লুকিয়ে গোপনে একদিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল। ব্রাব্যান্‌সিও খবর পেয়ে আদালতে নালিশ করলেন—ওথেলো একজন যাদুকর, যাদুর মায়ায় সে তাঁর মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়েছে। এর শাস্তি প্রাণদণ্ড। তাই ওথেলোকে দেওয়া হোক্।

এদিকে ঠিক সেই সময়ে খবর এল তুর্কীরা সাইপ্রাস্ দ্বীপ দখল করবার জন্য প্রচুর আয়োজন ক'রে এগিয়ে আসছে। তাদের ঠেকাতে হ'লে একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে এখনই সেখানে পাঠাতে হয়। ওথেলো ছাড়া এমন বিচক্ষণ সেনাপতি আর কে আছে? অথচ ওথেলোর বিরুদ্ধে আদালতে দারুণ অভিযোগ ঝুলছে। এখন কি করা যায়! শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা কিন্তু সহজ হয়ে গেল। ডেস্‌ডিমোনা আদালতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌ল। ওথেলো তাকে যাদু করে নি, সে স্বেচ্ছায় ওথেলোকে বিয়ে করেছে, এবং স্বামীকে সে কিছুতেই ত্যাগ করবে না।

ওথেলো সাইপ্রাস রওনা হলেন, ডেস্‌ডিমোনাও হ'ল তাঁর সঙ্গী। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জানা গেল শত্রুদের জাহাজ সব ঝড়ে ডুবে গেছে, আর তাদের আক্রমণের ভয় নেই। ওথেলো মনের সুখে সহরে উৎসব ঘোষণা করলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান্ লোক, উৎসবের সময় সৈন্যরা যাতে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করে তারও ব্যব[স্থা] করলেন। সে ভার দিলেন তিনি তাঁর অনুগত এবং একা[ন্ত] প্রিয় সহকারী সেনানায়ক ক্যাসিওর ওপর।

এখন, ওথেলোর দলে ইয়াগো নামে একজন লো[ক] ছিল, লোকটি ছিল মূর্ত্তিমান্ শয়তান। ক্যাসিও তা[কে] ডিঙ্গিয়ে ওপরে উঠে গেছে দেখে সে হিংসায় ফেটে মরত, আর সেই সঙ্গে হিংসা করত কৃষ্ণকায় ওথেলোকে,—বিশে[ষ] করে তিনি ক্যাসিওর ওপর অনুরক্ত ব'লে। কি ক[রে] এঁদের জব্দ করা যায় তারই সুযোগ সে খুঁজে বেড়াত, আজ তা জুটে গেল।

ইয়াগো কৌশলে ক্যাসিওকে ঐ দিন বেশী মদ খাই[য়ে] দিল, তারপর মোনটানা নামে আর একজন লোকের স[ঙ্গে] (তাকে আগেই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল) দিল তার ঝগ[ড়া] বাধিয়ে। মত্ত অবস্থায় ভাল মানুষও অনেক অপকর্ম্ম করে। ক্যাসিও ঝগড়ার মাথায় মোনটানাকে দিল তলোয়ারে[র] এক ঘা। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল, দুর্গে বেজে উঠল পাগলা ঘণ্টা। বাইরের লোক ম[নে] করল—সৈন্যেরা বোধ হয় বিদ্রোহী হয়েছে। গোলমা[ল] শুনে ওথেলোও বেরিয়ে এলেন। সমস্ত বিবরণ শুনে তি[নি] ক্যাসিওকেই দোষী মনে করলেন এবং তখনই তা[কে] পদচ্যুত করা হ'ল।

পদচ্যুত ক্যাসিও নিজের প্রতিষ্ঠা হারিয়ে অনুতা[প] করছে, এমন সময় ইয়াগো গিয়ে তাকে বোঝালে, 'তোমা[র] ভাবনা কি? প্রভুপত্নী ডেস্‌ডিমোনাও সঙ্গে তো তোমা[র] বেশ আলাপ পরিচয় আছে, তাঁকে গিয়ে ধরলেই তি[নি] এ হুকুম রদ ক'রে দেবেন।' ক্যাসিও যেন হাতে স্ব[র্গ] পেল। সে তখনই চল্‌ল ডেস্‌ডিমোনার খোঁজে।

এদিকে ইয়াগো ওথেলোর মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে [যে] ডেস্‌ডিমোনা তাঁর চাইতে ক্যাসিওকেই বেশী পছ[ন্দ] করে। ক্যাসিও যখন ডেস্‌ডিমোনার কাছে কাকুতি মিনতি করছে তখন ইয়াগো ওথেলোকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি তা দেখাল। ওথেলো ভুল বুঝলেন। ডেস্‌ডিমোনার ওপর তাঁর ভীষণ রাগ হ'ল, আর হ'ল হিংসে। শুধু এ[ই] নয়, দুষ্ট ইয়াগো তাঁকে বল্‌ল যে তিনি ডেস্‌ডিমোনাকে [যে] রুমালটা উপহার দিয়েছিলেন তা সে ক্যাসিওকে দি[য়ে]

দিয়েছে। আসলে কিন্তু ইয়াগোই তার স্ত্রীকে দিয়ে সে রুমাল ডেস্‌ডিমোনার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল,—রুমালের কোণের একটা নক্সা তুলে নেবে ব'লে। আর সে রুমালটা ইচ্ছে করে সে ক্যাসিওর সামনে এমন জায়গায় ফেলে দিয়েছিল যে সে সেটা কৌতূহলের বশেও তুলে নেয়। ওথেলো ডেস্‌ডিমোনার কাছে রুমাল দেখতে না পেয়ে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, এবং সেই রাত্রেই রাগে অন্ধ হয়ে—উন্মাদ হয়ে ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করে বসলেন।

এই ভীষণ ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াগোর স্ত্রীর খেয়াল হ'ল যে তার স্বামী হয়তো ঐ রুমাল নিয়ে কোন অঘটন ঘটাবার মতলবে আছে। সে তখনই ছুটে ওথেলোর কাছে গেল। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। ইয়াগোর স্ত্রী পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে ওথেলোর কাছে সব কথা খুলে বল্‌ল,—ইয়াগোর সামনেই।

ওথেলোর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না, শুধু চোখ দিয়ে দর দর ক'রে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। পরমুহূর্ত্তেই এই হতভাগ্য মূর, নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন।

স্পঞ্জের কাহিনী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

তোমরা অনেকেই স্পঞ্জ দেখে থাকবে। সেই যে রবারের মত জিনিষটা—সারা গায়ে অসংখ্য ফুটো, হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলে রবারের মতই কুঁকরে যায়, আবার মুঠো আলগা করে দিলেই দাঁড়ায় যে কে সেই! জলে ভিজিয়ে দিলে ফুটোর মধ্যে সমস্ত জল টেনে নেয়—ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে জল ধরে রাখতে পারে!

স্পঞ্জ জিনিষটা আসলে কি তা হয়তো সবাই জান না। জিনিষটা হচ্ছে একটা সামুদ্রিক প্রাণী। ঠিক প্রাণী না ব'লে প্রাণীর কঙ্কাল বললে ভাল হয়। অবশ্য অত্যন্ত নিম্ন-স্তরের প্রাণী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? জীবিতাবস্থায় স্পঞ্জ সমুদ্রের তলায় কাদার মধ্যে কিংবা কোন ডোবা-পাথরের গায়ে বাস করে—এক সঙ্গে হাজার হাজার সঙ্ঘ-বদ্ধ হয়ে। শুধু সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া নয়—একটির সঙ্গে আর একটির শরীরও থাকে যোড়া, ফলে বহু স্পঞ্জ মিলে এক বিরাটাকার স্পঞ্জের উপনিবেশ গড়ে তোলে। ঠিক যেমন প্রবালদের বেলায় দেখা যায়। সমুদ্রের জলে যে স[ব] রাসায়নিক পদার্থ মেশান থাকে তারই সাহায্যে তৈরী হ[য়] স্পঞ্জের এই কঙ্কাল। কঙ্কালের ভেতর আসল প্রাণীগুলি কি[ন্তু] খানিকটা চট্‌চটে দুর্গন্ধময় আঠাল জিনিষ ছাড়া কিছু নয়।

জলের তলায় থেকে স্পঞ্জ মাছের মতই অক্সিজেন নি[তে] পারে। কিন্তু সব চেয়ে মজা হচ্ছে ওদের খাওয়ার ধরণটা। স্পঞ্জের সারা গায়ে অসংখ্য ফুটোর কথা আগেই বলেছি। সমুদ্রের জল ক্রমাগত ঐ ফুটো দিয়ে স্পঞ্জের মধ্যে প্রবে[শ] করে, আর সেই জলে থাকে নানারকম খাদ্যকণা; তা গ্রহণ করেই স্পঞ্জকে ক্ষিদে মেটাতে হয়। সমুদ্রের জ[ল] অবশ্য স্পঞ্জের ভিতর ব'সে থাকে না—বড় বড় ফুটোগুলো দিয়ে অল্প পরেই বেরিয়ে যায়। এই বড় ফুটোগুলোকে আসলে এক একটি নালা বলা যেতে পারে। কোন কো[ন] সামুদ্রিক কীট, এমন কি কাঁকড়া পর্য্যন্ত, এই নালার মধ্যে বাসা বেঁধে বাস করে।

স্পঞ্জের ব্যবসা কিন্তু বেশ লাভজনক ব্যবসা, এব[ং] পৃথিবীর মধ্যে গ্রীসের লোকেরাই বোধ হয় এ ব্যবসায়ে সবচেয়ে ওস্তাদ্—কারণ স্পঞ্জের বাসস্থান হচ্ছে বিশে[ষ] ক'রে ভূমধ্য সাগর আর লোহিত সাগর। অবশ্যি আমে[-] রিকার ফ্লোরিডা অঞ্চলেও প্রচুর স্পঞ্জ পাওয়া যায়—এব[ং] সে দেশেও এর ব্যবসা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। ইয়োরোপে[র] বিভিন্ন দেশে স্পঞ্জের চলন হয়েছে গ্রীক্‌দেরই কল্যাণে।

সাধারণতঃ পরিষ্কার সমুদ্রের ৪০।৫০ ফুট জলের নীচে স্পঞ্জ পাওয়া যায়। ডুবুরির পোষাক প'রে জলের ভিত[র] নেমে গিয়ে তা কুড়িয়ে আনতে হয়,—ঠিক অনেকটা মুক্তো সংগ্রহের মত। আজকাল অবশ্যি নানা উন্নতত[র] উপায় বেরিয়েছে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পোষাক প'রে ডুবুরির দল ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরাপদে সমুদ্রের নীচে বসে স্পঞ্জ সংগ্রহ করতে পারে।

জল থেকে তুলে প্রথম কাজ হচ্ছে স্পঞ্জগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে তার ভেতরকার আঠাল জিনিষটাকে (আসল প্রাণ[ী] বস্তু) যতটা সম্ভব বার করে দেওয়া। বন্দরে এনে এগুলিকে আবার অগভীর জলে বেড়া দিয়ে ঘিরে কয়েক দিন ফেলে রাখা হয়। এতে ক'রে আঠাল জিনিষটা প্রা[য়] সবটাই বেরিয়ে আসে। তার পর স্পঞ্জগুলোকে আলাদা আলাদা ক'রে তুলে, নিংড়ে, পিটিয়ে আঠাল বস্তুর শে[ষ]

ক্ষণিকাটুকু পর্য্যন্ত বের করে দেওয়া হয়। তারপর পরিষ্কার করার পালা। এ জন্য সাবান-জল, চূণের জল বা ঐ ধরণের অন্য কোন রাসায়নিক মশলার জল ব্যবহার করা হয়। এর পর ভাল করে শুকিয়ে নিলেই সে স্পঞ্জ বাজারে ছাড়া যেতে পারে।

স্নানের সময় তোমরা কেউ কেউ হয়তো স্পঞ্জ ব্যবহার কর। অফিসে টেবিলে জল রাখার কাজেও (ড্যাম্পার হিসাবে) এর খুব চলন আছে। নানারকম ডাক্তারী ব্যাপারেও আগে প্রচুর স্পঞ্জ ব্যবহার করা হ'ত। এখন তা কিছু কমলেও আরও নানারকম কাজে নিত্য নূতন স্পঞ্জের চাহিদা বাড়ছে। কাজেই স্পঞ্জের ব্যবসা এখনও বেশ লাভজনক সন্দেহ নেই। তবে অনেকে আশঙ্কা করছেন, অতি লাভের চেষ্টায় স্পঞ্জের বংশ না শেষ পর্য্যন্ত উজাড় হয়ে যায়! অনেক জায়গায় স্পঞ্জ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছেও। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও এই আশঙ্কায় বছরের মধ্যে কয়েকটা মাস স্পঞ্জ তোলা সরকার থেকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে স্পঞ্জের চাষের চেষ্টাও চলছে সমানে, এবং এ ব্যাপারে কিছুটা সাফল্য লাভও করা গেছে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

বিজয়ার শুভেচ্ছা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ সকালে ঘুমটা ভেঙ্গেই হঠাৎ শুনি বাজছে দূরে
ভাঙ্গা হাটে বাত্তি ঢাকের বিসর্জ্জনের করুণ সুরে।
শিশির-ধোয়া বকুল-জাগা মৌন মধুর শারদ-প্রাতে
পরিয়ে দিল রঙ্গীন রাখী তরুণ রবি উষার হাতে।
প্রথম হিমের পরশ-কাতর গন্ধ-উদাস হিমেল হাওয়া,
প্রথম মাটীর পরশ-পাগল ভোরের আলোর প্রথম চাওয়া—
সবাই মিলে আজ সকালে গহিন মনের গোপন কোণে
ঘরছাড়াদের চলার বাঁশী বাজিয়ে গেল সঙ্গোপনে।
তাই তো আমার যাত্রা সুরু, তাই চলেছি নিরুদ্দেশে—
দৃষ্টি যেথা সৃষ্টি ছেড়ে অসীম মাঝে আপনা মেশে।
ধোঁয়া বারুদ গ্যাসে ঢাকা পিছনে মোর রইল ধরা—
রক্তপাগল ছিন্নমস্তা রুধির পানে আপন-হারা।
হাস্যমুখী মা চলেছেন উর্দ্ধলোকে সোনার রথে
বিশ্বযোড়া আনন্দ আজ ছিনিয়ে নিয়ে আপন হাতে।
ওরে অবোধ, ওরে পাগল, ধররে মায়ের আঁচলখানি,
আন্ ফিরিয়ে ধরার বুকে আজ অভয়ার অভয় পাণি।
বিবাদ-বিভেদ ডুবিয়ে দে আজ বিসর্জ্জনের মন্ত্র সাথে,
নূতন প্রীতির বোধন বসা আজ বিজয়ার পুণ্য প্রাতে।

সন্দেশ

রামধনুর পাঠকপাঠিকারা আমাদের বিজয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ ক'র।

ইয়োরোপের রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সাফল্যের কথা তোমরা আগেই শুনেছ। জার্ম্মান্‌রা এখন অনেকটা কোণ-ঠাসা হয়ে এসেছে। মিত্রপক্ষ সিগ্‌ফ্রিড্‌ লাইন্‌ ভেদ্‌ ক'রে স্থানে স্থানে খাস জার্ম্মেনীর ভিতর ঢুকে পড়ে লড়াই করছে। রুশরাও বল্‌কানে এবং পূর্ব্ব ইয়োরোপে প্রবল পরাক্রমে এগিয়ে চলেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে চিকিৎসা-শাস্ত্রের কি রকম উন্নতি হচ্ছে তা তোমরা গত বারে শুনেছ। কিন্তু একজন রুশ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি যে অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন তার কাছে কিছুই নয়। এই বৈজ্ঞানিকটি মরা মানুষ বাঁচাবার উপায় বের করেছেন। সম্প্রতি কয়েকটি রুশ সৈন্য মারা যাবার ছ' ঘণ্টা পরে এঁর আবিষ্কৃত প্রক্রিয়ায় বেঁচে উঠেছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) রুচি (বর + রুচি = বররুচি) (২) কালমেঘ (৩) 'তা' তে (মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ধাতা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীসর্ব্বাণী রায়

চোর ডাকাতের সে যম, আবার সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে এক-খানি ধারাল অস্ত্র নিয়ে ঘোরে। অবশ্যি সে অস্ত্র যদি কেড়ে নেওয়া যায় তবে সে শুধু অস্ত্রহীনই হবে না—তার সমস্ত প্রতিপত্তিও পাবে লোপ আর চেহারাও যাবে শুকিয়ে। কে সে বল তো? (উত্তর পাঠাতে হবে না।)

ভ্রমসংশোধন :- ১১৬ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে উপর হইতে ১৩শ ও ১৬শ লাইনে 'মোনটানা' স্থলে 'গোনটানো' হইবে।

কয়েকখানি নূতন বই
হিমাংশু গুপ্তর—
১। জাপানী ফিফ্‌থ কলম
(জাপানী ষড়যন্ত্রের রোমাঞ্চকর কাহিনী। নরহত্যার অদ্ভুত—অমানুষিক—নৃশংস ছবি। সম্পূর্ণ নূতন রকমের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)
ভূধর মুখোপাধ্যায়ের
২। নিশীথের ডাক
৩। ইস্কাবনের টেক্কা
(যশস্বী প্রবীণ লেখকের প্রহেলিকাময় রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস)
প্রত্যেকখানির দাম—১॥০
দে ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজায় অভিনয়ের জন্য
সুবোধ বসুর
বুদ্ধির্যস্য
সেরা হাসির নাটক। স্ত্রী-ভূমিকা নাই। স্কুলে বা ক্লাবে অনায়াসে অভিনয় করা চলে। নাটকটি রেডিয়োতে অভিনীত হইয়াছে। দাম ছয় আনা মাত্র।
গ্রন্থাগার
পি৫৮, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশন, কলিকাতা

রামধনু-সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
ধূমকেতু (উপন্যাস) ৳০
জন্মদিনের উপহার (গল্প) ৳০
কোরাল্‌ আইল্যাণ্ড (উপন্যাস)
যন্ত্রস্থ

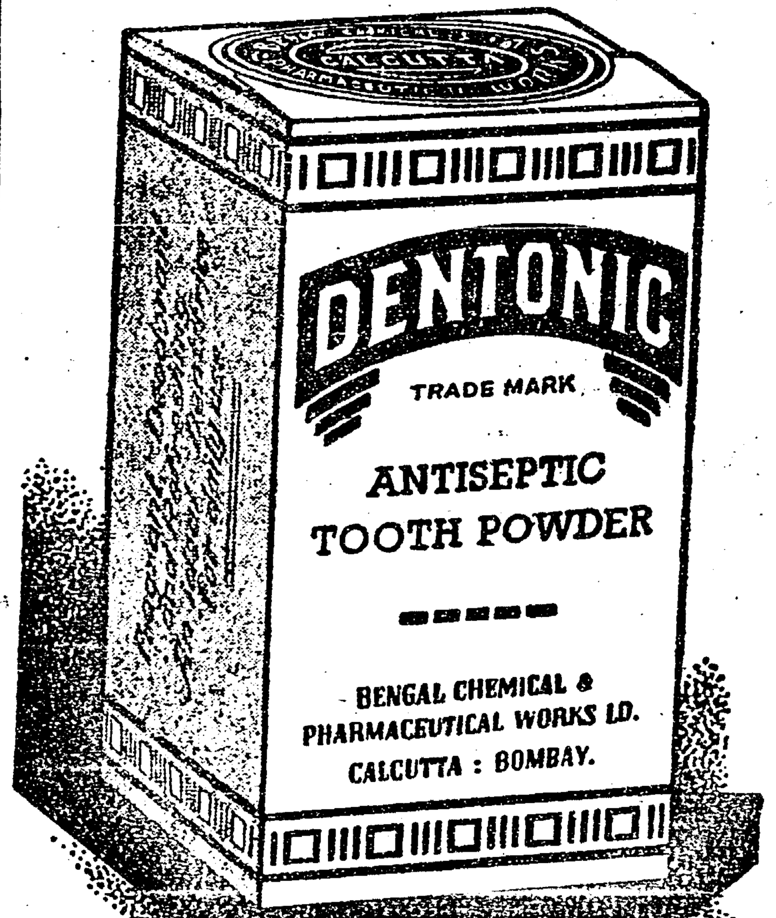

দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা দিলে
দেহের স্বাস্থ্য ও শ্রী অব্যাহত থাকে
ডেন্টনিক
দিয়া নিত্য দাঁত মাজিলে শুধু যে দাঁত উজ্জ্বল হয় তাহা নহে, দাঁতের মূল ও মাঢ়ি শক্ত হয় এবং সর্বপ্রকার দন্তরোগ নিবারিত হয়।
চার আউন্স প্যাকেটে পাওয়া যায়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

ছেলেমেয়েদের

পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

বর্ষ-মঙ্গল

বিরাট গ্রন্থ—অসংখ্য ছবি : এক রং, দুই রং ও বহু রং—গল্প ও কবিতার ঝরণা—সুন্দর বাঁধাই—উৎকৃষ্ট ছাপা।

মূল্য ২॥০ মাত্র

ইহাতে লিখিয়াছেন

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, "বনফুল", নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র-কুমার রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সরোজ রায় চৌধুরী বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রভৃতি বিখ্যাত লেখক ও লেখিকাগণ।

এত বড় সমৃদ্ধ গ্রন্থ, এত কম দামে—বর্ত্তমান জগতের পরম বিস্ময়

প্রহেলিকা সিরিজের

চমকপ্রদ ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী

মুখোশের অন্তরালে	১৲
মৃত্যুদূত	১৲
ব্লাড হাউণ্ড	১৲
কালের কবলে	১৲
শেষ বলি	১৲
নৈশ অভিযান	১৲

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া বাহির হইতেছে

✻

বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজের

অমূল্য গ্রন্থ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

যাদুকর মার্কনী ১৲

যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বলদর্পী হিট্‌লার ১৲

✻

শিহরণের খনি

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন ১।০

দেব-সাহিত্য-কুটীর ✻ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১

আমাদের নতুন বিভাগ

তোমরা শুনে সুখী হবে, এবার থেকে আমাদের একটি নতুন বিভাগ খোলা হ'ল—**আয়ুর্ব্বেদীয় ওষুধের।** বিচক্ষণ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় মতে এ সব ওষুধ তৈরী হচ্ছে। ভাল ওষুধ না পাওয়ার আফ্‌শোষ আর থাকবে না। **চ্যবনপ্রাশ, দ্রাক্ষারিষ্ট, বাসকারিষ্ট, কূটজারিষ্ট, ভাস্কর লবণ, কালমেঘ,** মহাভৃঙ্গরাজ তেল, মহামাষ তেল, নিম তেল, বিরেচিকা (Laxative), প্রলেপিকা (Ointment), দন্তরেণু (Tooth Powder) ইত্যাদি সবই আমাদের কাছে পাবে—এবং দাম মোটেই বেশী নয়।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

১ বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প

মনোরঞ্জনের অমর চরিত্র "হুকাকাশির" কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ গল্প ... ॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদার এম. এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সরস মজাদার হাসির গল্প ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৷৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আকাশের গল্প ... ১৲

আবিষ্কারের গল্প ... ॥৵০

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ ... ১।০

সোনার হরিণ ... ১।০

হাস্য ও রহস্য (গল্প) ... ৸০

নূতন পুরাণ ... ৸০

চায়ের ধোঁয়া ... ॥৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

(ঘরে বসিয়া অল্প খরচে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার প্রণালী) ... ১।০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু ... ৸০

Regd. No. C 1651

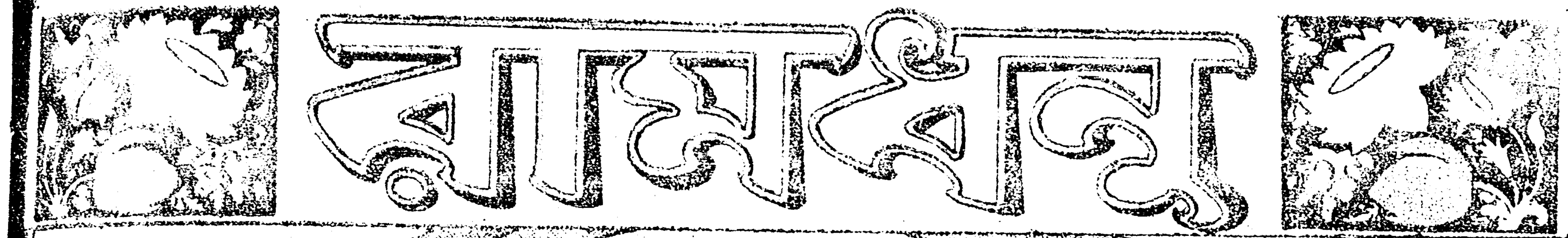

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ | পকেট কেস ও পুস্তক সহ
মাত্র ১৪টী ঔষধ |

প্রতি সংখ্যা

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
স্মৃতিরঞ্জিত

রামধনু

১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

বীর আশানন্দ ঢেঁকী

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ, কাবভূষণ, সাহিত্যরত্ন

(বীরাষ্টমী দিবসে শান্তিপুরে "বীর আশানন্দ-স্মৃতি-স্তম্ভের" পাদমূলে
ছোটদের "পুষ্পাঞ্জলি-উৎসবে" পঠিত।)

বাংলা দেশের মাটির বুকে জন্মেছিলেন বীর
আশানন্দ দৃপ্ত তেজে উচ্চ করি' শির।
দু'শ' বছর আগের হলেও আজও তাঁহার স্মৃতি
গর্ব্ব ভরে করতে স্মরণ জাগছে মনে প্রীতি।
শক্তিতে যে সিংহ ছিলেন—মত্ত করীর বল,
তাহার সাথে হৃদয় ছিল স্নিগ্ধ-শতদল।
অহঙ্কারীর দর্পহারী,—কলির ছিলেন ভীম,
বল দেখাতে যে-ই এসেছে খেয়েছে হিম্‌সিম্‌।

দুর্ব্বলেরে রক্ষা করি' সবল অত্যাচারে,
আত্মভোলা ছিলেন সদাই পরের উপকারে।
একশ' বছর জীবন হ'ত দশটি বছর হ'লে,
নাইকো দেহ, কীর্ত্তি-কায়া প্রবাদ হয়ে চলে।
করছি বীরাষ্টমীর দিনে এমন বীরের পূজা;
এম্‌নি ছেলে হাজার হাজার চাই মা দশভুজা!
বাংলা মায়ের ছেলের দলে চাই মা আজি বীর,
"নূতন আশার" আবির্ভাবে ঘুচুক আঁখির নীর।

রয়্যাল্ সোসাইটি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

প্রায় তিনশ' বছর আগেকার কথা। লণ্ডন সহরের কটি বাড়ীতে একটি অনতিপ্রশস্ত ঘরে কয়েকজন দ্রলোক জমায়েৎ হয়েছেন, এঁদের মধ্যে কয়েকটি তরুণও ছেন। তরুণ হ'লেও তাঁদের চোখে মুখে বুদ্ধি ও তিভার ছাপ সুস্পষ্ট। এঁরা এসেছেন একটা ঘরোয়া ঠকে যোগ দিতে, কিন্তু এ সব বৈঠকে সাধারণতঃ যা খা যায়—তাসের আড্ডা বা খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড় র নামগন্ধও এই বৈঠকে ছিল না। আলোচনা চ্ছিল নানা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ নিয়ে।

আধুনিক বিজ্ঞানের তখন সবে জন্ম হয়েছে, কিন্তু খনও তা ঠিকমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিজ্ঞানকে ন বলা হ'ত "নিউ ফিলজফি" (নতুন দর্শন) বা "এক্স-রিমেণ্টাল্ ফিলজফি" (অর্থাৎ ফলিত,—মানে যা পরীক্ষা রে পাওয়া গেছে, এমন দর্শন)। একদল তরুণ সত্য-নী এত দিনকার যুক্তিহীন অন্ধ কুসংস্কার ভেঙ্গে দিয়ে থিবীকে এই নতুন 'দর্শন' বা সত্যের সন্ধান দিতে তখন ব সুরু করেছেন। এঁদেরই কয়েকজন সেদিন এসে টেছিলেন এই বৈঠকে।

কথা। প্রসঙ্গে একজন বল্লেন, "শুনছি অক্সফোর্ডেও আমাদের মতই একটা সমিতি হয়েছে;—তার সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করলে কেমন হয়?" "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই"—সবাই একবাক্যে বক্তার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। "উদ্দেশ্য যখন এক তখন দলাদলির কথাই ওঠে না।" অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অক্সফোর্ডের সেই সমিতির (ফিলজফিক্যাল সোসাইটি) সঙ্গে লণ্ডনের সমিতির—তার নাম সম্ভবতঃ ছিল "ইন্‌ভিজিবল্ কলেজ"—যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল এবং কিছুদিন পরে সবটাই উঠে এল লণ্ডনে।

এবার থেকে লণ্ডনের গ্রেশাম্ কলেজে সমিতির বৈঠক বসতে লাগল। সভ্য-সংখ্যা খুব বেশী না হ'লেও কিছুটা বাড়ল এবং এর মধ্যে তখনকার নাম-করা পণ্ডিতদের অনেকেই—যেমন বয়েল্, লর্ড ব্রুঙ্কার, স্যর্ রবার্ট মারে, ব্রুস্, হিল্, রেন্, বল্, নিল্, উইল্‌কিন্স্, গডার্ড, পেটি, রুক্ প্রভৃতি এসে জুটলেন।

সেদিন ছিল ২৮শে নভেম্বর, ১৬৬০ সাল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন বলতে হবে। সেদিনকার সভায় ওপরের ঐ বারোজন সদস্যের উপস্থিতিতে ঠিক হ'ল

এই সমিতিকে আরও ভাল ভাবে—আরও বড় করে গড়ে তুলতে হবে। দেশের নাম-করা সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের এতে আনতে হবে। তখনই নিয়ম-কানুনের খসড়া তৈরী হ'ল। এক এক ক'রে ৪৩ জন পণ্ডিতের নাম লিখে ফেলা হ'ল। ঠিক হ'ল প্রতি বুধবার বেলা তিনটের সময়ে একবার ক'রে সভার অধিবেশন হবে। ভর্ত্তি হবার ফি হবে দশ শিলিং আর সাপ্তাহিক চাঁদা এক শিলিং···ইত্যাদি।

পরের বুধবার স্যর্ রবার্ট্ মারে এসে খবর দিলেন স্বয়ং রাজা ২য় চার্লস্ এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং সমিতির নিয়ম-কানুন অনুমোদন করেছেন। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে সভ্যদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে গেল—এবং সমিতির কাজ বেশ জোর ভাবেই সুরু হ'ল। তখনকার মত স্যর রবার্ট্ মারে হলেন সভাপতি।

সমিতির আসল নাম 'রয়্যাল্ সোসাইটি' কিন্তু তখনও ঠিক হয় নি বা চালু হয় নি। সেটা হ'ল ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে—১৫ই জুলাই, স্বয়ং রাজার সিল্ মোহর নিয়ে। প্রথম সভাপতি হলেন লর্ড ব্রুঙ্কার।

তারপর দ্রুতবেগে চল্‌ল রয়্যাল সোসাইটির কাজ। সে কাজের বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বড় দান পৃথিবীতে খুব কম সমিতিই করতে পেরেছে। বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত দিকেই এর উদ্যোগে নানারকম গবেষণার ব্যবস্থা হয়েছে। সূর্য্যগ্রহণের দিন কোথায় পৃথিবীর কোন্ অখ্যাত দুর্গম কোণে পূর্ণ গ্রহণ দেখা যাবে, সমিতি থেকে তোড়জোড় করে পাঠান হ'ল বৈজ্ঞানিকের দল সেখানে—সূর্য্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে। কোথায় কোন্ সময়ে গ্রহ-তারার গতিবিধি সম্বন্ধে নতুন খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ছুটলেন সেখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে সমিতির পণ্ডিতেরা। গভীর সমুদ্রের তলাকার খবর সংগ্রহ করতে হবে, সমিতির উদ্যোগে বিশেষ ভাবে তৈরী সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে নেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক অতল সমুদ্র-গর্ভে। উঁচু আকাশে, পৃথিবীর পিঠ থেকে হাজার হাজার ফুট ওপরে উঠে, আবহাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে হবে, তার ব্যবস্থা, সাজসরঞ্জাম সমিতি থেকেই করে দেওয়া হ'ল। আফ্রিকার দুর্গম অস্বাস্থ্যকর গভীর জঙ্গলে পদে পদে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ঘুম রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করা, চীনদেশে দুরন্ত কালাজ্বর নিয়ে পরীক্ষা করা, ভূমধ্যসাগরে কোন্ এক অদ্ভুত ধরণের জ্বর দেখা দিয়েছে, তাই নিয়ে মাথা ঘামান—সবই হ'ল এই সমিতির কাজের অঙ্গ। এমন কি পৃথিবীর বিভিন্ন অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের কাজেও রয়্যাল্ সোসাইটি কম করে নি। যেমন ধর, ক্যাপ্টেন কুকের অষ্ট্রেলিয়া অভিযান, পেরি, রস্, ফ্রাঙ্কলিন্ প্রভৃতির উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিযান—এ সবেরই ব্যবস্থা হয়েছিল রয়্যাল্ সোসাইটী থেকে। এ ছাড়া পরীক্ষাগারে ব'সে বিজ্ঞানের কত বড় বড় আবিষ্কার যে রয়্যাল্ সোসাইটির সাহায্যে হয়েছে তার হিসাব দেওয়াও কষ্টকর।

বড় হয়ে তোমরা যদি কখনও লণ্ডনে যাও তবে রয়্যাল্ সোসাইটির বাড়ীতে একবার যেতে ভুলবে না নিশ্চয়ই। কত কি সেখানে দেখবার রয়েছে! প্রথমেই ধর, বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা রকম বইএর এক বিরাট্ গ্রন্থাগার। কত দুষ্প্রাপ্য বই সেখানে রয়েছে। তার অনেকগুলির মধ্যে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের স্মৃতি জড়ান রয়েছে। তার পর ধর বৈজ্ঞানিক সংগ্রহশালা। সেও বড় কম নয়। এ ছাড়া পৃথিবীর কত বরেণ্য বিজ্ঞান-বীরেরা সেখানে বসে পরীক্ষা করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন, তর্ক করেছেন—তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের স্মৃতি-মেশান সেই ঘর প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসুরই তীর্থ-ক্ষেত্র নয় কি?

রয়্যাল্ সোসাইটি স্থাপিত হবার পর এই তিনশ' বছরে তার নিয়ম-কানুন, কাজকর্ম্মের ধারা প্রয়োজন মত অনেক বার অদল বদল করা হয়েছে। ১৮৪৭ সাল থেকে এর সভ্য হবার যোগ্যতা খুব কঠোর করা হয়েছে—কেবল মাত্র বিজ্ঞান-জগতের মহামহারথীরাই এর সভ্য বা 'ফেলো' হবার গৌরব অর্জ্জন করতে পারেন। তাঁদের বলা হয় এফ্. আর. এস্ অর্থাৎ ফেলো, রয়্যাল সোসাইটি। তোমরা এই শব্দটির সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত এবং কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে এফ্. আর. এস্ হ'তে পারাটা কত বড় সম্মানজনক তাও হয়তো শুনেছ। ইংলণ্ডের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এই রয়্যাল সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'তে পেরেছিলেন; তাঁদের মধ্যে নিউটন, হাম্‌ফ্রি ডেভি, মাইকেল ফ্যারাডে, লর্ড কেল্‌ভিন্ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক র‍্যামসে, রাদারফোর্ড, হফ্‌ফিন্স্, জীন্‌স প্রভৃতি অনেকের নামই করা যেতে পারে। এঁদের অনেকে রয়্যাল

সোসাইটির সভাপতি—পি. আর. এস্ (প্রেসিডেণ্ট, রয়্যাল্ সোসাইটি) হবার গৌরবও লাভ করে গেছেন।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ওদেশের তুলনায় অত্যন্ত কালে আরম্ভ হলেও, এ পর্য্যন্ত পর পর দশজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এফ্. আর্. এস্ হবার গৌরব লাভ করেছেন। এঁদের নাম তোমরা হয়তো শুনেছ, তবু বলছি শোন: আর্দেশীর কুরশেটজী, এস্. রামানুজম্, জগদীশ বসু, সি. ভি. রামন্, মেঘনাদ সাহা, বীরবল সাহ্‌নী, কে. এস্. কৃষ্ণান্, এইচ. জে. ভব, এস্ ভাটনগর ও সুব্রহ্মণ্য চন্দ্রশেখর।

এঁদের মধ্যে কারো কারো,—যেমন জগদীশচন্দ্র, রামন্ বা মেঘনাদ সাহা—এঁদের নাম তোমাদের কাছে খুবই পরিচিত। এতদিন পর্য্যন্ত সকলের ধারণা ছিল যে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত মাদ্রাজের রামানুজম্‌ই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এফ. আর. এস্। কিন্তু অল্প কিছুদিন হ'ল রয়্যাল্ সোসাইটির সম্পাদক অধ্যাপক হিল্ ভারতে এসেছিলেন। তিনি পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে বার করেছেন যে রামানুজমেরও আগে ১৮৪১ সালে আর্দেশীর কুরশেটজী নামে বোম্বাইএর এক পার্শী বৈজ্ঞানিক প্রথম এ সম্মান পান। অশ্চর্য্যের বিষয়, এত বড় একজন পণ্ডিত লোক, যাঁর প্রতিভার পরিচয় বিদেশী বিদ্বৎ-সভারও অগোচর ছিল না এবং তাঁদের কাছে কিছুটা স্বীকৃতও হয়েছিল, দেশের লোক তাঁর কোন খবরই রাখে নি। অধ্যাপক হিল্ না জানালে বোধ হয় আমরা এঁর কথা কোন দিন জানতেও পারতাম না। অবশ্য হিল্ সাহেবের বিবৃতির পর এঁর সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হয়েছে এবং সম্প্রতি এঁর জীবনী ও আবিষ্কার সম্বন্ধেও কিছু কিছু জানা গেছে। ভারতের কনিষ্ঠতম এফ্. আর. এস্ অধ্যাপক চন্দ্রশেখর অবশ্য এ দেশে থাকেন না—তিনি আমেরিকার সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়র্কস মানমন্দিরের একজন অধ্যাপক। এঁর বয়স মাত্র ৩৩ বছর।

ভারতীয় এফ্. আর. এস্. দের—বিশেষতঃ আর্দেশীর কুরশেটজী ও অধ্যাপক চন্দ্রশেখরের কথা তোমাদের আর একদিন ভাল ক'রে বল্‌ব।

আজব গাছ

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

বিভূতিবাবু বললেন—আমার জীবনেও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ঘটেছিল, কিন্তু এটা এত অদ্ভুত যে আমার ভয় হচ্ছে, আপনারা তা বিশ্বাস করবেন কিনা।

আমরা সবাই মিলে চেপে ধরলুম—বলতেই হবে। অগত্যা বিভূতিবাবু যেন একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই সুরু করলেন:

আমার বয়স তখন আঠার কি উনিশ হবে। হঠাৎ বাবা পশ্চিমের একটা ছোট্ট সহরে একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী কিনে ফেললেন। পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে আমি কলকাতাতেই দাদার কাছে রয়ে গেলুম। মা আর ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বাবা নতুন বাড়ীতে চলে গেলেন।

কলকাতায় বসে বসে ভাইবোনদের পত্রে জানতে পারছিলুম যে বাড়ীখানা খুব সুন্দর এবং সকল রকমের সুবিধে বজায় রেখেই এখানা তৈরী করা হয়েছে। বাগানে নানা রকমের গাছ আছে, আর আছে একটা 'মজার গাছ'। কী যে গাছ আর কী যে তার মজা তা তখন কিছুই জানতে পারলুম না।

বাবার কাছে শুনেছিলুম বাড়ীখানা ছিল এক অবসর-প্রাপ্ত প্রফেসরের। সেখানে নিরিবিলিতে তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চা করতেন। প্রফেসরটীর ছেলেমেয়ে কেউ ছিল না, তাই তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী বাড়ীখানা বিক্রী করে দিয়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন।

কলেজ ছুটী হতেই আমিও গিয়ে পশ্চিমে জুটলাম। গিয়ে দেখি বাড়ীখানা সত্যি মনের মত। নীচের তলায় মস্ত দুটো হলঘর। শুনলুম তার একটা ছিল লাইব্রেরী—অন্যটা ল্যাবরেটারী। ল্যাবরেটারীতে জিনিষ-পত্র বিশেষ কিছু ছিল না, তবে নানা রকমের যন্ত্রপাতি যে সেখানে সাজানো থাকত তার কিছু কিছু চিহ্ন তখনও অবশিষ্ট ছিল। বাগানখানিও প্রকাণ্ড। তাতে নানা-প্রকার দুষ্প্রাপ্য আর মূল্যবান্ ফুল ও ফলের গাছ। অনেক-গুলো গাছ দেখলুম তুলে নেওয়া হয়েছে।

ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলুম—"হ্যাঁরে, কী মজার গাছের কথা লিখেছিলি তোরা?"

TIGHT BINDING

—"হ্যাঁ, এই যে এদিকে"—বলে ওরা সবাই আমাকে একটা ছোট দেবদারু গাছের কাছে নিয়ে গেল। গাছটাকে কেটে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু গোড়া থেকে ডাল বেরিয়ে আবার সেটা বেঁচে উঠেছে। গাছের চারপাশটা বেদীর মত করে বাঁধানো। বোঝা গেল চারপাশে লোহার জালের বেড়া দিয়ে গাছটাকে ঘিরে রাখা হয়েছিল, যদিও এখন সে বেড়া একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে। গাছটাকে দেখে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে এটাকে খুব যত্ন করেই একদিন রাখা হয়েছিল। এত সব ভাল ভাল ফলফুলের গাছ থাকতে সামান্য একটা দেবদারুকে এতটা যত্ন করা হয়েছিল দেখে ভারী অবাক লাগল। জিজ্ঞেস করলুম—"কিন্তু এতে মজার কি আছে ?"

ছোট ভাই বললে—"শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে মেজদা', বাতাসে এ গাছের একটা পাতাও নড়ে না। দেখ না, সব গাছের পাতাই বাতাসে একটু আধটু নড়ছে, কিন্তু এর পাতাগুলো সব একেবারে স্থির !"

তাকিয়ে দেখলুম ঠিক তাই, এতক্ষণ খেয়ালই করি নি।

—"এর আরো একটা মজা আছে মেজদা"—ছোট বোনটা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে মণ্টু বললে, "সে আমরা এখন বলব না, তুমি নিজেই দেখতে পাবে।" মনে মনে আরও কৌতূহলী হয়ে উঠলুম।

তিন চারদিন পরেই ব্যাপারটা ঘটল। দুপুরবেলা দোতালার বারান্দায় বসে বাবা খবরের কাগজ দেখছিলেন, আমি কাছেই ছিলুম। হঠাৎ শুনলুম মণ্টু ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বাবাকে বলছে—"বাবা, গাছটা সেইরকম হচ্ছে আবার!" বাবার পানে চেয়ে দেখলুম তাঁর মুখখানা শঙ্কায় পাণ্ডুর হ'য়ে গিয়েছে।

মণ্টুর সঙ্গে বাবা নীচে নেমে গেলেন, আমিও তাদের পেছনে পেছনে বাগানে গিয়ে হাজির হলুম। সেই দেবদারু গাছটার কাছে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রত্যেকটি পাতা সমেত দেবদারু গাছটা থরথর করে কাঁপছে। তখন বাতাস তেমন ছিল না, আর বাতাস থাকলেও তাতে গাছ কখনো এমন করে নড়ে না। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও এতে ভয় পাবার কী আছে বুঝতে পারলুম না। কিন্তু বাবার দিকে চেয়ে মনে হ'ল তিনি যেন অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন। আপন মনেই বললেন—"আবার কি দুর্ঘটনা ঘটবে কে জানে!"

আমি বললুম—"বাবা, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না!"

বাবা বিচলিত কণ্ঠে উত্তর করলেন—"খোকা, তুই তো জানিস্ নে এ গাছটা এমন করে কাঁপলে তার ফল কী ভয়ানক হয়? আমি এখানে আসবার পরে আরো দু'বার এ গাছটাকে এমনি করে কাঁপতে দেখেছি, আর প্রত্যেক বারই কাগজে দেখেছি যে ঠিক সে সময়েই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

তখন আমি গাছের এই কাঁপুনি আর প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে 'কাকতালীয়বৎ' একটা কিছু বলেই ভেবেছিলুম। কিন্তু দু'দিন পরে খবরের কাগজ দেখে সত্যি বিস্মিত হয়ে গেলুম। দু'দিন আগে ঠিক ওই সময়েই নিউজিল্যাণ্ডের হকস বে-তে এক প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। এই ভূমিকম্পের আক্রমণে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই নেপিয়ার শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

বিভূতিবাবু এখানে একবার থামলেন; কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলতে লাগলেন—তারপর আরো দু'বার এ ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করেছি। একবার ১৯৩৭ সালের মে মাসে, বোধ হয় ত্রিশে মে। গাছের ওই অদ্ভুত কম্পনের পরেই জানতে পারলুম যে ভাল্কান্ ও মেটুপী দ্বীপের আগ্নেয় উৎপাতে নিউ ব্রিটেনের রাজধানী রবাউল নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এর এক বছর পরেই ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে এই গাছটাকে আমি শেষ বার কাঁপতে দেখি। সেবারে আনাতোলিয়াতে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়—প্রায় একঘণ্টাব্যাপী।

আপনারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। প্রথমে আমিও করি নি, কিন্তু বার বার দেখে আমি এ ব্যাপারটা আর অবিশ্বাস করতে পারছিলুম না। আমার মনে দৃঢ় আগ্রহ জন্মাল ব্যাপারটা কী তা ভাল করে জেনে নিতেই হবে। বাবার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু ছিলেন সেখানেই। তাঁকে বলতেই তিনি কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন এবং একদিন দুপুরবেলা এসে বহুক্ষণ ধরে গাছটাকে পরীক্ষা করলেন। বিদায় নেবার সময় বললেন

"ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে আমি লিখে জানাবো।

কিছুদিন পরেই বাবা তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পেলেন: "গাছটা যে অদ্ভুত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি পরীক্ষা করে ঠিকমত কিছু বুঝতে না পারলেও যা অনুমান করেছি তাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

"সিস্মোগ্রাফ্ (Seismograph) বা ভূমিকম্প-লিপি-যন্ত্রের নাম আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন। এ যন্ত্রে পৃথিবীর কম্পন ধরা পড়ে। বহু দূরবর্ত্তী কোন স্থানে ভূমিকম্প হ'লে অথবা সমুদ্র বা নদীর প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে মাটী কেঁপে উঠলে তার কম্পনও এই ভূমিকম্প-লিপি-যন্ত্রে ধরা পড়ে। আমার মনে হয় আপনার বাগানের দেবদারু গাছটা এই ধরণেরই একটা সিস্মোগ্রাফ্, তবে সাধারণ যন্ত্র অপেক্ষা এর ক্ষমতা অনেকখানি বেশী। আপনার এ বাড়ীটা যে প্রফেসারের ছিল তিনিই কোন অভিনব বৈজ্ঞানিক উপায়ে এ যন্ত্র-বৃক্ষটা সৃষ্টি করেছেন। কেমন করে যে এটা সম্ভব হয়েছে তা আমি অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারি নি, তবে মনে হয় যে এই বৃক্ষের একটা মূলকে কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূগর্ভে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে। এ জন্যই পৃথিবীর যে-কোন অংশের মৃত্তিকা কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কম্পিত হ'লে সেই কম্পনের বেগে এই বৃক্ষটাও কম্পিত হ'তে থাকে। আমার মনে হয় উক্ত বৈজ্ঞানিক এই উচ্চস্তরের সিস্মোগ্রাফ্ দিয়ে নতুন কোন পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সময় ফুরিয়ে আসায়, তা আর ক'রে যেতে পারেন নি। এজন্যেই গাছটাকে তিনি কেটে ফেলেছিলেন। হয়তো আপনারাও লক্ষ্য করে থাকবেন যে কাটা গুঁড়ির মধ্য দিয়েই আবার গাছটা বেঁচে উঠেছে। যে বৈজ্ঞানিক মালমশলা দ্বারা গাছটাকে পরিপুষ্ট করা হয়েছিল তার শক্তি শেষ না হওয়ায় কেটে ফেলা সত্ত্বেও গাছটা মরে নি।

"বাইরের বাতাসের বেগে গাছটার পাতা কেন নড়ে না তা আমিও ভাল করে বুঝতে পারি নি। অনুমান হয় যে বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক উপাদান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য গাছের পাতাগুলো তাদের চারপাশে হয়তো এমন কোন গ্যাস নিঃসৃত করে যাতে প্রতিহত হয়ে বাতাস পাতাগুলোকে কাঁপাতে পারে না—যদিও বাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে গাছের কোনও অসুবিধা হয় না। সেই বৈজ্ঞানিক আহার্য্যটা কি এবং ঐ গ্যাসটাই বা কি তা বহু গবেষণার বিষয়।"

বিভূতিবাবু নীরব হলেন, আমরা সাগ্রহে প্রশ্ন করলুম—তারপর সে গাছটার কি হ'ল?

—কিছুদিন পরে আপনা থেকেই গাছটা শুকিয়ে গেল একটু একটু ক'রে। বাবার বৈজ্ঞানিক বন্ধুটাকে এ কথাও জানানো হয়েছিল, তিনি বললেন যে যে-সকল বৈজ্ঞানিক উপাদান দ্বারা গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল বহুদিন ধরে তার অভাব হওয়াতেই গাছটার মৃত্যু ঘটেছে।

যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার কাহিনীর মধ্যে তিনটা জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার।

আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম—কি সে তিনটা?

—প্রথমতঃ বাইরের বাতাসে গাছটার পাতা নড়ত না। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর যে-কোন স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হবার পূর্ব্বেই গাছটা কম্পিত হ'ত। আর তৃতীয় নম্বর হচ্ছে এই যে—এই গল্পটা আমি আধ ঘণ্টা আগে নিজের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভাবিত করেছি।

বলেন কি! আগাগোড়া মিথ্যে?

গম্ভীর হাসি হেসে বিভূতিবাবু বললেন—না, সিস্মোগ্রাফ্ যন্ত্রের কথাটা আর ঐ ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের খবরগুলো সত্যি।

অভিযাত্রীর পত্র

(গ্রীন্ দ্বীপ)

শ্রীবিশ্বপতি দাশগুপ্ত

রামধনুর ভাইবোনেরা,

এবার তোমাদের চিঠি লিখছি গ্রীন্ দ্বীপ থেকে। ব্রহ্মদেশের আমহার্ষ্ট সহর ছাড়িয়ে দক্ষিণে সাগরের বুকে যে কয়টি ছোট ছোট বনাচ্ছন্ন দ্বীপ আছে, গ্রীন্ দ্বীপ তাদেরই মধ্যে একটি।

সিংহল থেকে আমি রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়ে বসেছিলাম। জাহাজ ছাড়লো। ডেকের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত বক্ষ ভেদ করে জাহাজ ক্রমশঃ এগিয়ে চললো। সিংহলের উপকূল ক্রমে দূর হতে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

দিনের পর দিন মহাসাগরের তরঙ্গরাশি ভেদ করে

জাহাজ অবশেষে একদিন এসে ঢুকলো ইরাবতী নদীতে। এই নদীর তীরেই ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহর। দু'টি নদী একত্রে মিলে এই ইরাবতী নদীর সৃষ্টি করেছে। ব্রহ্মদেশের উত্তরতম অঞ্চল হ'তে এই নদী দু'টি উৎপন্ন হয়ে মিটকিয়ানার ত্রিশ মাইল দূরে একত্রে মিলে ইরাবতী নামে পরিচিত হয়েছে। চিন্দুইন এই ইরাবতীরই উপনদী। পাকোক্কু নামে এক জায়গায় চিন্দুইন ইরাবতীর সাথে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মদেশের আর একটি বড় নদী হচ্ছে সালউইন।*

এগিয়ে চলেছি ইরাবতী নদীর ভিতর দিয়ে। পাশের এক যাত্রী হাঁকলে, "ওই যে রেঙ্গুন দেখা যাচ্ছে!" তাকিয়েই যে দৃশ্য দেখলাম তা মোটের উপর চিত্তাকর্ষক নয়। নদীর মোহানা হ'তে কয়েক মাইল দূর পর্য্যন্ত পলি মাটি ক্ষরণের জন্য জল হয়ে উঠেছে ঘোলা বাদামী রঙ এর। নদীর দুই ধারও কাদাভরা। রেঙ্গুনের খুব কাছে এসেও দৃশ্যটা মোটেই আশাপ্রদ মনে হ'ল না। চারদিকে সেই একঘেয়ে দৃশ্য! কিন্তু একটু পরেই আমার ভুল ধারণা মুছে গেল যখন চোখে পড়ল সোয়েডাগন প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ কবি রাডিয়ার্ড্ কিপলিং-এর বর্ণিত সেই "উইংকিং ওয়াণ্ডার" আজ চোখের সামনে। সূর্য্যালোকে তার স্বর্ণচূড়া ঝক্ঝক্ করছে।

সহরের ভিতরে গিয়ে দেখলাম সুন্দর অট্টালিকা, বাগান ও প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি নিয়ে মোটামুটি রেঙ্গুন সহরটি সুন্দর। বেশী দিন থাকা চলবে না তাই দু-'এক দিনেই দেখার জিনিষ সব দেখে নিতে হবে।

হেঁটেই চল্লাম—ভিক্টোরিয়া লেক্ ঘুরে। নগরের সৌন্দর্য্য যা কিছু ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে। রয়্যাল লেক্ সোয়েডাগন প্যাগোডা, উইঙ্গাবার মঠ ইত্যাদি দেখবার মত জিনিষ। রেঙ্গুনে ভাল হোটেলের ভিতর ষ্ট্র্যাণ্ড হোটেল ও হোটেল আলণ্ডালে প্রধান।

রেঙ্গুনের চারপাশে শস্যক্ষেত্রের শোভা বড় চমৎকার। সবুজ ধানের রং পৌঁছেছে সুদূর দিক্‌চক্রবালে মাঝে মাঝে তালগাছ ও ছোট ছোট বাড়ী। ঠিক যেন আমাদের বাংলা দেশের শান্তিময় পল্লী!

* যুদ্ধের কল্যাণে এ সব নদীর নাম আজকাল তোমাদের নখদর্পণে। কিন্তু এ চিঠি যখন লেখা তখন যুদ্ধ সুরু হয় নি।

রেঙ্গুন দেখা হয়ে গেলে মৌলমেন-গামী ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনে চড়ে বসলাম। ট্রেন সিতাং নদী পেরিয়ে গেল, পার্ব্বত্য অঞ্চলের সুন্দর দৃশ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চল্লাম। অবশেষে সালউইন নদীতীরে অবস্থিত মৌলমেনে পৌছলাম। রেল লাইন এর পর চলে গেছে আমহার্ষ্টে। মৌলমেন সহরের পিছনে তাউং ওয়াইং পাহাড়শ্রেণী। আমহার্ষ্ট ছাড়িয়ে দক্ষিণে সাগরে কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, এর বেশীর ভাগই জঙ্গলে ঢাকা। এদের ভিতর গ্রীন্ দ্বীপ ও ডবল দ্বীপ প্রধান। এই দুইটি দ্বীপ লাইটহাউস ষ্টেশন। গ্রীন্ দ্বীপে একটি সুন্দর রেষ্ট হাউস আছে। আমি এখন এখানেই আছি।

তোমাদের হয়তো ধারণা আছে ব্রহ্মদেশের সব লোকই বুঝি এক ধরণের। আসলে এখানে নানা জাতের বাস, যেমন ধর—শান, চিন, কাচিন, আরাকানী, কারেন, তালাইং, ওয়া প্রভৃতি। এদের মধ্যেও অনেক ভাগ আছে।

ব্রহ্মদেশে মোটামুটি তিনটি ঋতু। মে থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্ষাকাল, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত শীত, আর মার্চ্চ থেকে মে পর্য্যন্ত বেশ গরম,—গ্রীষ্মকাল।

ব্রহ্মদেশের দেশীয় নাম "মিয়ানমা।" চীনা "মিয়েন" শব্দ থেকে এ নামের উৎপত্তি। ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র অনেক দিনের।

রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শশধরের লম্বা চওড়া চেহারা শৈলেনকে আড়াল ক'রে দিল দেখে সোলার বিরক্ত-স্বরে বললে—একপাশে সরে দাঁড়াও, আড়াল করছ কেন?

সোলার গুলি চালালে আগে শশধর আহত হবে; শৈলেন এই সুযোগ ছাড়লো না। শশধর সরে দাঁড়াবার আগেই এক প্রচণ্ড ঘুঁষি গিয়ে পড়লো তার মুখের উপর। বেচারা প্রস্তুত ছিল না, সামলাতে পারলো না, সোলারের উপর গিয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি সামলে নিতে সোলারের যেটুকু সময় লাগলো সেই অসতর্ক অবসরটুকুর মধ্যে শৈলেন তার পিস্তল শুদ্ধ হাত চেপে ধরলো। সোলার বাঁ হাতে ঘুঁষি চালালো। শৈলেন 'ডাক্' করলো, মাথার

উপর দিয়ে ঘুঁষি বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই শৈলেন সবলে মুচড়ে ধরলো সোলারের হাত, পিস্তল খসে পড়লো।

যে গুণ্ডাটি একটু আগে ছোরা ছুড়ে মেরেছিল, সে এবার একগাছি লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো। পাকা বাঁশের লাঠি, এক ঘা বসিয়ে দিলে শৈলেনের মাথায়।

সত্যেন যথাসময় নজর করেছিল, এগিয়ে গিয়ে গুণ্ডাটিকে রুখে দিলে। বাধা পাওয়ায় মাথা বেঁচে গেল, আঘাত গিয়ে পড়লো শৈলেনের পিঠে।

তা হলেও আঘাতটা কম গুরুতর হ'ল না, শৈলেন পড়ে গেল মেঝের উপর। সোলার সেই সুযোগে পিস্তলটি কুড়িয়ে নিয়ে বললে—এইবার?

শৈলেনের চোখে হতাশা ফুটে উঠলো, কিন্তু ঠোঁটে বাঁকা হাসি টেনে এনে সে বললে—আমি প্রস্তুত!

—না না, এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হবার দরকার নেই, আগে কার্ডবোর্ডের রহস্যটা শুনে নিই তার পর।...

—বটে?

—নিশ্চয়ই।

—আমার সম্বন্ধে তুমি তো খুব উচ্চ ধারণা পোষণ কর দেখছি!

—তার কারণ তোমার মুখ থেকে কি ক'রে কথা বের করতে হবে তা আমি জানি।

—বটে!

—আজ্ঞে হাঁা। তোমার চোখের উপর তোমার সন্তানকে এমন নির্য্যাতন করবো যে মুখ আপনি খুলবে...

—অতি উত্তম কথা। তবে কি জান সাহেব, টাকাটা আমরা গুণ্ডাদের ভোগে লাগাবার জন্য রাখি নি, রেখেছি দেশের কাজের জন্য।

—মস্ত দেশভক্ত দেখছি! চুরি করা টাকায় তুমি দেশোদ্ধার করবে!

—সেই জন্যই তো চুরি করতাম। তবে আমি ছোট চোর বলে আইনের পাকে পড়ে গেছি, বড় চোর হ'লে ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বলে অক্ষরে আমার নাম লেখা থাকতো—আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়নের মত; আর পৃথিবীশুদ্ধ ছেলেমেয়েরা তাই পড়তো ইস্কুল কলেজের কেতাবে।

—বাহবা! নিজের সাফাই গাইবার জন্য খুব তো বড় বড় কথা জোগাড় করেছ দেখছি!—পাকা কংগ্রেস-কর্ম্মী হ'তে এদ্দিন তোমার ওইটুকু বাকী ছিল, এবার জেলে গিয়ে সেটাও আয়ত্ত করেছ দেখছি!—শশধর বিদ্রূপ করে উঠল।

—কংগ্রেস-কর্ম্মীর নিন্দে করা তোমার সাজে না শশধর! তোমার মত জেলে যাবার ভয়ে আমরা কোনদিন সহকর্ম্মীদের ধরিয়ে দিই নি। কংগ্রেস-ফাণ্ডের টাকা মেরে দিয়ে কলকাতায় বাড়ীও তুলি নি।

—তা হলে ওই টাকাগুলো কিসের জন্য লুকিয়ে রেখেছ, সাধুজী?

—দেশের জন্য, জাতির জন্য।

—ওসব কথা এখন থাক শশধর,—সোলার বললে—সেই টাকাগুলো তুমি আমাদের দেবার ব্যবস্থা কর শৈলেনবাবু।

—সে টাকা দেশের জন্য, তা তোমাকে দেব কেন?

—তোমার সঙ্গে অনাবশ্যক তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই, টাকাটা তুমি আমাদের দেবে কিনা তাই বল?

—ও টাকার মালিক আমি নই, কাজেই ও টাকা আমি তোমাদের দিতে পারব না।

—কিন্তু তোমার সন্তানকে যদি...

বাধা দিয়ে শৈলেন গর্জ্জে উঠলো—আদর্শ আত্মীয়তার চেয়েও বড়।

—অলরাইট্, দেখা যাক!

(ক্রমশঃ)

তাসের প্রচলন

শ্রীঅংশুরঞ্জন সেন (গ্রাহক)

ইউরোপে তাসের প্রচলন হয় ধরতে গেলে ১৩২০ খৃষ্টাব্দ থেকে। এর অনেক আগেই কিন্তু এই খেলা মিশর, আরব ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ছিল। এশিয়া থেকেই ইউরোপে এ খেলা ছড়িয়ে পড়ে।

হরতন, ইস্কাবন, রুহিতন আর চিঁড়েতন—তাসের যে চারটী রঙ আছে, সেগুলো আসলে চারটি বিশেষ বিশেষ 'প্রতীক' বা রূপক-চিহ্ন। 'হরতন', হ'লো 'চার্চ্চের', 'ইস্কাবন' হলো তরোয়াল বা সামন্ত-শক্তির ("Espados"), 'রুহিতন' হ'লো রত্ন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের; আর 'চিঁড়েতন' হলো চাষীদের।

সেকালের রীতিনীতি

শ্রীগৌরী দেবী

ইংরেজ-আমলের প্রথম যুগে আমাদের দেশে—বিশেষতঃ কলকাতায় সাহেবরা কি ভাবে চলাফেরা করতেন তা জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই আগ্রহ হয় ?

সেকালের সাহেবরা নানা বিষয়ে এ দেশীয়দের অনুকরণ ক'রে চলতেন। এমন কি নিজেদের পোষাক ছেড়ে ঢিলে পায়জামা ও মসলিনের কামিজ গায়ে এঁটে তাঁরা হামেশাই ঘুরে বেড়াতেন—যাতে দেশী লোকেদের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ ধরা না পড়ে। অনেকে এ দেশী মেয়েদের বিয়ে ক'রে সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর মত থাকতেও দ্বিধা করতেন না।

তখন অফিস বসত সকাল ৯টা থেকে ১২টা, আবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে তোফা একটা দিবানিদ্রা দেওয়া প্রায় সব সাহেবেরই অভ্যাস ছিল। হুঁকা বা আলবোলায় তামাক খেতেও তাঁরা খুব ভাল বাসতেন। আলবোলায় তামাক খেতে খেতে ইংরেজ জজ্ সাহেব বিচার করছেন এ রকম ছবি অনেক জায়গায়ই দেখা যায়। এমন কি ডিনার টেবিলে বা বল্ নাচের সময়েও হুঁকা হাতে কয়েকজন ক'রে চাকর দাঁড়িয়ে থাকৃত। এদের বলত হুঁকা-বরদার। একটু অবস্থাপন্ন সব সাহেবেরই একজন ক'রে হুঁকা-বরদার থাকৃত। সাহেব কোথাও গেলে হুঁকা-বরদারও সঙ্গে সঙ্গে যেত। অনেক সময় দেখা যেত নিমন্ত্রণ-পত্রে লেখা আছে—"ইচ্ছে করলে আপনি আপনার হুঁকা-বরদারকেও সঙ্গে আনতে পারেন।"

টানা পাখার প্রচলন প্রথমটা হয় নি, তখন খুব বড় বড় তালপাতার পাখা ব্যবহার করা হ'ত। ঠাণ্ডার দেশ থেকে গরম দেশে এসে সাহেবদের পাখার প্রয়োজনটা বড় বেশীই হ'ত। বাতাস করবার জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর চাকর থাকৃত—তাদের বলা হ'ত পাঙ্খাদার। এদের পোষাক-আসাক প্রায়ই খুব বিচিত্র হ'ত।

সাহেবরা প্রায়ই বাঙ্গালীদের সঙ্গে সামাজিক ব্যাপারে যোগ দেবার চেষ্টা করতেন। কোন বাঙ্গালী ধনীর বাড়ীতে বিয়ে, দুর্গাপূজা, নাচ-গান বা ঐ রকম উৎসব হ'লে সাহেবরাও তাতে হাজির হতেন। অনেক সাহেব সময় বিশেষে কালীঘাটে পূজোও দিতেন। এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধে জয়লাভের পর এসে কালীঘাটে পূজো দিতে দেখা গেছে।

তারপর সুরু হ'ল দেশে ইংরাজী শিক্ষার ধুম। এবং, আশ্চর্য্য, তখন নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালীরাই উল্টে সুরু করলেন মনে-প্রাণে সাহেবদের অনুকরণ !

সন্দেশ

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট্ নির্ব্বাচন হয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট্ রুজ্ভেল্ট্ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোটে হারিয়ে আবার চার বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট্ নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এই নিয়ে তিনি পর পর চার বার এই পদ লাভ করলেন—আমেরিকার ইতিহাসে এমনটা আর কোন দিন হয় নি।

রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গভর্ণর ডিউই। রুজভেল্ট্ তাঁর চেয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ সাধারণ ভোট বেশী পেয়েছেন। ডিউইর ভোট হয়েছিল প্রায় ২ কোটি ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার, আর রুজভেল্টের হয়েছিল প্রায় ২ কোটি সাড়ে ৪২ লক্ষ। এই ভোট দেবার ব্যাপারে দেশের লোক অদ্ভুত আগ্রহ দেখিয়েছে। দারুণ শীতের মধ্যে অন্ধকার থাকতে উঠে আট ফুট পুরু বরফের ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সার বেঁধে দাঁড়িয়েও অনেক মেয়ে পুরুষ ভোট দিয়ে গেছে। নিউ-ইয়র্কে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ। ভোট নেওয়া আরম্ভ হওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যেই শোনা গেল এদের ১২ লক্ষ জনের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে !

সম্প্রতি কলকাতায় সমারোহের সঙ্গে আই. এফ্. এ'র (ইণ্ডিয়ান্ ফুটবল এসোসিয়েশন্) স্থবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে। গত ১৯৪৩ সালেই আই. এফ্. এর বয়স ৫০ বছর হয় কিন্তু যুদ্ধের জন্য উৎসবের আয়োজন এক বছর পরে করা হ'ল। ভারতের খেলাধূলার ইতিহাসে আই. এফ্. এর দান ইতিপূর্ব্বেই সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে, তবুও 'স্থবর্ণ জয়ন্তী' অনুষ্ঠান করতে পারা যে কোন সমিতির পক্ষেই মস্ত গৌরবের বিষয়। উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবীণ খেলোয়াড়দের ম্যাচটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু—বহু বছর হ'ল যাঁরা খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন এমন অনেক খেলোয়াড়কেও সেদিন মাঠে নামতে দেখা গিয়েছিল। মোহনবাগানের ... সব খেলোয়াড় ১৯১১ সালে আই. এফ্. এ শীল্ড্ ...পায়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন নেমেছিলেন। ...লহৌসী দলের দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় (অধুনা বৃদ্ধ) লী, যিনি ... বছর আগে ১৯০৯ সালে খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি ...ও খেলায় যোগ দেন। নিখিল ভারতের বাছাই দলের ...ঙ্গে আই. এফ্. এর বাছাই দলেরও একটি খেলা হয়। ...তে আই. এফ্. এ দলই ৩-২ গোলে বিজয়ী হয়।

বিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় ...র নেই। সেন মহাশয় মেডিক্যাল্ কলেজের উত্তীর্ণ ...ক্তার ছিলেন কিন্তু ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রই তাঁকে ...বেশী মুগ্ধ করে এবং তারই অনুশীলন ক'রে তিনি অশেষ ...সিদ্ধি লাভ করেন। শুধু বড় কবিরাজ হিসাবে নয়, নানা ...স্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যও তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল।

আমেরিকার বিখ্যাত জননায়ক ওয়েণ্ডেল্ উইল্কিরও ...প্রতি মৃত্যু হয়েছে। উইল্কির পূর্ব্বপুরুষ জার্ম্মানীতে ...কতেন কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটী আমেরিকান্ এবং ...তন্ত্রের সমর্থক। এর আগের বারে আমেরিকার রাষ্ট্র-...তি নির্ব্বাচনে ইনি রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কিন্তু ...য় লাভ করতে পারেন নি। পরে তিনি রুজভেল্টের ...লেরই একজন বড় কর্ম্মী হয়ে পড়েন। অল্প কিছুদিন ...গে উইল্কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করেন ...বং ফিরে এসে "ওয়ান্ ওয়াল্ড" নামে একখানা বই ...লেখেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অল্প বই-ই 'ওয়ান্ ওয়াল্ড'-...র মত বিক্রী হয়েছে।

এবারে যুদ্ধের খবর বলি শোন: প্রশান্ত মহাসাগরে ...ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আগে আমেরিকান্দের হাতে ছিল, ...কন্তু জাপানীরা তা অধিকার করে নেয়। সম্প্রতি আমে-...রিকান্রা আবার প্রবল আক্রমণের পর তা উদ্ধার করেছে। ...এই যুদ্ধে জাপানীদের এত যুদ্ধজাহাজ মারা গেছে যে ...বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, জাপানীদের পক্ষে এ ক্ষতি সামলে ...নেওয়া কঠিন হবে। ওদিকে ইয়োরোপে জার্ম্মান্রাও আর ...সুবিধা করতে পারছে না। রুশরা তো হাঙ্গেরির বুডাপেষ্ট্ ...সহর পর্য্যন্ত গিয়ে হানা দিয়েছে। ষ্টালিন্ বক্তৃতায় বলেছেন, ...শীগ্গিরই তাঁরা বার্লিনে গিয়ে সোভিয়েট পতাকা ওড়াবেন ...ব'লে ভরসা করেন। পশ্চিম রণাঙ্গনেও সম্মিলিত মিত্রবাহিনী ...জার্ম্মানীর প্রবল প্রতিরোধ উপেক্ষা ক'রে এগিয়ে চলেছে।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

(১) বাদশাহী গল্প (২) গল্পের মজলিশ—এস্. ওয়াজেদ আলী প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী। দাম—প্রত্যেকটীর ৸০। গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। ছোটদের জন্য লিখিত তাঁর এ দু'টি বইও তাঁর সে যশ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই গল্পগুলি আরব্যোপন্যাসের মত মনোহর, লেখকের ভাষার গুণে আরও মনোহর হয়েছে। ভিতরের ছবি ও মলাট লোভনীয়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—দারোগা।

নূতন ধাঁধা

শ্রীঅহিভূষণ চোধুরী

(১) কোন্ খাবার শুধু খেতেই ভাল না, তার দামও ভাল ? (২) কোন্ দেশের অধিবাসীকে আমরা বেশ মনে ক'রে থাকি ? (৩) সে কোন্ তীর্থ যার শেষ প্রান্ত থেকে উল্টো দিকে ফিরে এসে তিন ভাগের দু'ভাগ পার হলেই আর একটি তীর্থ পাওয়া যাবে ?

কয়েকখানি নূতন বই

হিমাংশু গুপ্তর—

১। জাপানী ফিফ্থ কলম

(জাপানী ষড়যন্ত্রের রোমাঞ্চকর কাহিনী। নরহত্যার অদ্ভুত—অমানুষিক—নৃশংস ছবি। সম্পূর্ণ নূতন রকমের ডিটেক্টিভ উপন্যাস।)

ভূধর মুখোপাধ্যায়ের

২। নিশীথের ডাক

৩। ইস্কাবনের টেক্কা

(যশস্বী প্রবীণ লেখকের প্রহেলিকাময় রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস)

প্রত্যেকখানির দাম—১৷৹

দে ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কয়েকখানা ছেলেমেয়েদের গল্পের বই ঃ—

এবারের

পূজা-বার্ষিকী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

বর্ষ-মঙ্গল

বিরাট গ্রন্থ—অসংখ্য ছবি : এক রং, তুই রং ও বহু রং—গল্প ও কবিতার ঝরণা—সুন্দর বাঁধাই—উৎকৃষ্ট ছাপা।

মূল্য ২।৷০ মাত্র

ইহাতে লিখিয়াছেন

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, "বনফুল", নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সরোজ রায় চৌধুরী, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী, জসিমউদ্দিন, ধীরেন্দ্র ধর, প্রভৃতি বিখ্যাত লেখক ও লেখিকাগণ।

এত বড় সমৃদ্ধ গ্রন্থ, এত কম দামে—বর্ত্তমান জগতের পরম বিস্ময়

নব প্রকাশিত

যাদুসম্রাট—**পি. সি. সরকার**

প্রণীত

ম্যাজিকের খেলা

দাম ১৲

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া বাহির হইতেছে

প্রহেলিকা সিরিজের

(চয়কপ্রদ ডিটেকটিভ্ কাহিনী)

১ম গ্রন্থ	মুখোশের অন্তরালে	(সব্যসাচী)	১৲
২য় ,,	মৃত্যুদূত	,,	১৲
৩য় ,,	ব্লাড্ হাউণ্ড	,,	১৲
৪র্থ ,,	কালের কবলে	,,	১৲
৫ম ,,	শেষ বলি	,,	১৲
৬ষ্ঠ ,,	নৈশ অভিযান	,,	১৲
৭ম ,,	কবরের নীচে	,,	১৲

❋

বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজের

অমূল্য গ্রন্থ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

যাদুকর মার্কণী ১৲

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস ১৲

❋

শিহরণের খনি

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন ১।০

দেব-সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১১শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
পৌষ
১৩৫৫

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১৷৷৹
প্রতি সংখ্যা ।/৹

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৲ টাকা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৮৲ টাকা

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে, চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য লিখুন.

Regd. No. C—1641

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৭শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
পৌষ
১৩৫০

বার্ষিক ৩.
ষাণ্মাসিক ১৸০
প্রতি সংখ্যা /০

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ / মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ টাকা / মূল্য ৮. টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।
ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী

কয়েকখানা ছেলেমেয়েদের গল্পের বই ঃ—

এবারের

পূজা-বার্ষিকী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

বর্ষ-মঙ্গল

বিরাট গ্রন্থ—অসংখ্য ছবি : এক রং, দুই রং ও বহু রং—গল্প ও কবিতার ঝরণা—সুন্দর বাঁধাই—উৎকৃষ্ট ছাপা।

মূল্য ২॥০ মাত্র

ইহাতে লিখিয়াছেন

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, "বনফুল", নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সরোজ রায় চৌধুরী, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী, জসিমউদ্দিন, ধীরেন্দ্র ধর প্রভৃতি বিখ্যাত লেখক ও লেখিকাগণ।

এত বড় সমৃদ্ধ গ্রন্থ, এত কম দামে—বর্ত্তমান জগতের পরম বিস্ময়

নব প্রকাশিত

যাদুসম্রাট—**পি. সি. সরকার**

প্রণীত

ম্যাজিকের খেলা

দাম ১৲

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া বাহির হইতেছে

প্রহেলিকা সিরিজের

(চমকপ্রদ ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী)

১ম গ্রন্থ	মুখোশের অন্তরালে	(সব্যসাচী)	১৲
২য় ,,	মৃত্যুদূত	,,	১৲
৩য় ,,	ব্লাড্ হাউণ্ড	,,	১৲
৪র্থ ,,	কালের কবলে	,,	১৲
৫ম ,,	শেষ বলি	,,	১৲
৬ষ্ঠ ,,	নৈশ অভিযান	,,	১৲
৭ম ,,	কবরের নীচে	,,	১৲

❋

বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজের

অমূল্য গ্রন্থ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

যাদুকর মার্কণী ১৲

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস ১৲

❋

শিহরণের খনি

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন ১।০

দেব-সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

১৭শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
পৌষ,
১৩৫১

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা
মাত্র ১৪ টী ঔষধ } { মূল্য ৮ টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে. চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন.
ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক
১৸৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

Regd. No. C—1641

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ / মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪॥ আনা / মূল্য ৮. টাকা
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

COLOUR PAPER

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
স্মৃতিরঞ্জিত

রামধনু

১৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা
পৌষ, ১৩৫১

পদ্ম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সরোবর আলো ক'রে সহসা প্রভাতে
আজিকে ফুটেছে শতদল,
শুচি স্নিগ্ধ সুরভিতে, বিমল আভাতে
পূর্ণতায় করে ঢল ঢল।

এ যেন রে মূর্খ এক হ'ল মহাকবি
ঋষি হ'লো—চোর রত্নাকর,
শৈবাল জঞ্জাল দাম ঠিক আছে সবই
এ আনিল সুধার খপর!

এই রূপ এই গন্ধ প্রাণ রসায়ন—
এটা কি সহজলভ্য ? শুনি—
কিংবা জন্মার্জ্জিত পুণ্য—যুগের সাধন
বল তুমি—বল মোরে গুণী ?

হীরক অঙ্গার দেহে সহেছে কি তাপ ?
কত দিন ছিল উপেক্ষিত ?
কেমনে পেলে সে দীপ্তি খণ্ডাইয়া পাপ
জানিলে তা হই উল্লসিত।

মোরা ভাবি চিরদিন অবিবেকী ধাতা
অপাত্রেই দেন মহাদান,
হিসাব রাখে না তাঁর খেয়ালের খাতা
কারে কি যে করিছে প্রদান।

রূপ গুণ ধন খ্যাতি ঐশ্বর্য্য অপার
পায় নাকো শুধু ভাগ্যবান্,
সাধনায় শুধু সিদ্ধি এনে দেয় তার,
যোগ্যতারু কেবল সম্মান।

তাল ও বেতাল-সিদ্ধ হইয়াছে যারা,
পৌরুষ তাহারা কিসে পায় ?
তাদের কঠোর শব সাধনার ধারা
ভুলিয়া যেও না অসূয়ায়।

বরষার পুণ্যপুঞ্জ লভিয়াছে রূপ
শরতের নেত্রজলে আহা,
দেখে লও আঁখি ভরে—লাবণ্যের স্তূপ
দেবেরও গ্রহণযোগ্য যাহা।

পূজোর ভোজ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সেদিনের দৈনিকে একটা খবর পাওয়া গেল : শিকাগো হরের জনৈক ইয়াঙ্কি বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য্য এক খাদ্য াবিষ্কার করেছেন। খাবার বটে, তবে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়র কোনটা নয়—কেবল শুধু গেল্‌বার জিনিষ। ানুষের আহার্য্যকে বৈজ্ঞানিক কায়দায় সঙ্কুচিত ক'রে—ংক্ষিপ্ত ক'রে বটিকাকার দেওয়া হয়েছে—তার এক বটি েলেই একজনের একদিনের ক্ষুধার প্রয়োজন মিটে যায়। বং কেবল প্রয়োজনই নয়, খাবার জন্য খাবারের এত কমের আয়োজন—তাও সঙ্গে সঙ্গে মিটে গেল! সেই সর্ব্ব-ক্ষুধা-শান্তি বটি একটু জলের সঙ্গে মিশিয়ে একখানা খাও—আর খানা খেয়ে আরাম ক'রে ঘুমাও—কিংবা তোমার যদি কোন কাজ থাকে তবে তার কাণ্ড কারখানায় গিয়ে লাগো। মন্দ কি ?

আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং পুষ্টিকর যত রকমের বস্তু আছে—মায় ভিটামিন্ এ বি সি থেকে এক্স্ ওয়াই জেড্—সব সেই বটিকাটির মধ্যে নিহিত। সাধারণ খাদ্যের এক তোলার মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ ও পুষ্টিকারিতা থাকে তার একশ' গুণ মাত্রায় তা আছে

ঐ একটি পিলের ভেতর। হোমিওপ্যাথিক গুলির মত এক একটি বড়ি—দাঁতের ফাঁকে থাক্‌ল কি পেটে গেল মুখে ফেল্‌লে বোঝা যায় না—তার মধ্যে এত কেরামতি থাক্‌তে পারে তা কে ভেবেছে? এবং সেই বৈজ্ঞানিক-প্রবর আশা করেন তাঁর এই আবিষ্কারের দ্বারা পৃথিবীর খাদ্যজগতে একদিন বিপ্লব আসবে। এবং সভ্যতার সমৃদ্ধির সাথে সাথে (যেটা অনিবার্য্য ব্যাপার) পার্থিব জীবেরা এই খাদ্যই অবশেষে গ্রহণ করবে।

খবর-কাগজের এই সংবাদটি পড়ে একটা গল্প আমার মনে পড়ল। একটা ঘটনার গল্প। কাণ্ডটা ঘটেছিল—সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—অনিবার্য্য রূপে—মনে করা যাক্‌, আজ থেকে পঞ্চাশ কি একশ' বছর পরে।

এম্‌নি পূজোর দিন। দারুণ পূজোর ভোজ। কত না নিমন্ত্রিত এসেছে! আত্মীয় বন্ধু অনাহূত রবাহূতে বাড়ী বোঝাই। পূজোর পাতা পড়ে গেছে। রান্নাবান্নার কোন হাঙ্গাম নেই। বাড়ীর কর্ত্তার হাতে কেবল এক শিশি বড়ি। তার এক একটি বড়ির মধ্যে লুচি, তরকারি, বেগুন ভাজা, আলুর দম, মাছের কালিয়া, ছোলার ডাল, মাংসের কোর্মা, ভুনি খিচুড়ি, ছানার ডালনা, কোপ্তাকাবাব, বিরিয়ানি পোলাও, পাঁপর ভাজা থেকে সুরু ক'রে দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, রাবড়ি, পায়েস, পিষ্টক—সব কিছু জম্‌জমাট্‌!

পাতা পড়ে গেছে। পাতার ধারে ধারে বসে গেছে নিমন্ত্রিতরা। ছেলেমেয়ে—ছোট বড়—আবালবৃদ্ধবনিতা! উৎসাহে, আগ্রহে সবার মুখ উদ্দীপ্ত! সবাই হাত-মুখ ধুয়ে বসেছে। ভোজের আগে ভোজুয়াদের যেমন চেহারা হয়—তাদের দেহে যে সব চিহ্ন প্রকট হতে থাকে—পুলক, কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ—সে সব ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে। কারণ, কর্ত্তা সেই শিশি হাতে—সেই ভোজবাজি সাথে নিয়ে দেখা দিয়েছেন।

"সবই সেই ইচ্ছাময়ীর লীলা! তাঁর কৃপা! মা জগদম্বা, তুমিই সত্য।" কর্ত্তা মনে মনে আওড়াচ্ছেন। তাঁর একটা চোখ একবার মার উদ্দেশে আকাশের পানে ছুটে যাচ্ছে ফের আবার নিমন্ত্রিতদের উপলক্ষ্যে বটিকা-গুলির দিকে ফিরে আসছে—এইভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য যাতায়াত করছে।

অবশেষে তিনি পরিবেশন করতে এগুলেন। পংক্তির গোড়াতেই বসেছিল তাঁর ছোট ছেলে। ছেলেটা বড় পেটুক।

বাবা আসতেই থাবা মেরে তাঁর হাত থেকে শিশিটা কেড়ে নিয়ে সে ভোঁ দৌড় দিল। আরে আরে, খোকা করে কি! তার মধ্যে যে পাঁচশ' লোকের—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী—চারদিনের ভোজ ভর্ত্তি করা রয়েছে—কত হাঁড়ি পোলাও আর কত কড়াই মাংস—আর কত সহস্র যে রসগোল্লা ইত্যাদি তার ইয়ত্তা হয় না! এ কি কাণ্ড খোকার!

খোকার বাবা পিছন পিছন ছুটলেন। খোকা সমস্ত ভোজটাকে করতলগত ক'রে ছুটেছে আর বাবা ছুটেছেন খালি হাতে। আর নিমন্ত্রিতদের চোখ কপালে উঠে গেছে—খালি পাতার সামনে। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ!

খোকা যা হাতে পেয়েছে তা হাতে রাখার পাত্র নয়—একবার পেয়ে হারাবার জন্যে প্রস্তুত নয় সে মোটে—সঙ্গে সঙ্গে পুরো শিশির সমস্ত পিল্‌ সে পেটের মধ্যে পাচার ক'রে দিয়েছে।

খোকার মা এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন: "সর্ব্বনাশ হ'ল! কি হবে?"

খোকার মামা বলেছে: "জল খাওয়াও, খুব ক'ষে জল খাওয়াও। যাতে বমি ক'রে ফেলে।"

উপদেশের মধ্যে গলদ্‌ আছে—মামাসুলভ প্রত্যেক উপদেশেই যা থাকে। স্থলযোগের সঙ্গে জলযোগ হতে যা একখানা হ'ল তা আর বলবার নয়। বটিকাগুলি ফুলতে আরম্ভ করল। খোকার পেট—এইটুকু একটু পেট—এমন ফাঁপা ফাঁপ্‌লো যে জয়ঢাক কোথায় লাগে!

ফুল্‌তে ফুল্‌তে ফুল্‌তে ফুল্‌তে—যৎপরোনাস্তি ফুলে—খোকা অবশেষে ফেটে পড়ল। ঠিক বোমা ফাটলে যা হয় সেই রকম। বেধড়ক এক আওয়াজ ছেড়ে হাজার টুক্‌রোর ছত্রাকারে খোকা আকাশে উড়ে গেল। তার চিহ্নও পাওয়া গেল না।

কেবল একটি মাত্র চিহ্ন পাওয়া গেল। সেটাকে সেই ভোজের স্মৃতিচিহ্নও বলা যায়। ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত খোকার এক টুক্‌রো মাটিতে ফিরে এসেছিল—তার মুখের একটুখানি। দুটি ঠোঁট মাত্র!

সেই ঠোঁট দু'টি মৃদু হাসিতে বিভক্ত। তার ভাষা অনির্ব্বচনীয়! এত বড় একটা ভোজ এক গ্রাসে একলা খেতে পারার যে আনন্দ তাই সেখানে উদ্ভাসিত।

রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শৈলেন দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠলো—তুমি আমায় কি দেখাবে শশা? তুমি আমার কাছে এখনও শিশু। দেশের কাজে টাকার যোগাড় করার জন্য আমি এক সময় বাইশটি ডাকাতি করেছি। আজ জেল খাটতে খাটতে বুকের ভিতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও শৈলেন বাঁড়ুয্যে আজও সেই শৈলেনই আছে। তুমি বা তোমার ভাড়া করা চারটে ফিরিঙ্গী গুণ্ডার হাত থেকে আমার মেয়েকে রক্ষা করার মত শক্তি এখনও আমার আছে।

—অতি উত্তম!—সোলার বললে—তা হলে এখানেই তার পরীক্ষা হ'য়ে যাক!

—এখানে এবং এখুনি।—বলে শৈলেন উঠে দাঁড়ালো। সোলারের মুখের পানে একবার তাকিয়ে মিনতির সামনে এসে বললে—মিনু-মা, বাইরে আমার মোটর দাঁড়িয়ে আছে, তুমি গিয়ে বসো গে। সত্যেন, তুমিও যাও। আমি এদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে পরে যাচ্ছি…

মিনতি ও সত্যেন দরজার দিকে পা বাড়াতেই সোলার গর্জ্জে উঠলো—খবরদার!

দু'জনেই থমকে দাঁড়ালো।

শৈলেন দৃঢ়স্বরে বললে—থামলে কেন? আমি থাকতে তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা যাও—

সোলার পিস্তল উঁচিয়ে বললে—গুলি চালাবো।

শৈলেন বললে, ব্যঙ্গের সুরেই বললে—পিস্তলের আওয়াজ বাইরে গেলে পুলিশ আসবে।

—আসুক, তবু আমি গুলি চালাবো।

—চালাতে পার। গুলিকে শৈলেন বাঁড়ুয্যে ভয় করে না—বলে শৈলেন নেপোলিয়নের ধরণে জামার বোতাম খুলতে খুলতে সোলারের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো।

শৈলেনের আড়াল দিয়ে মিনু ও সত্যেন এগিয়ে যায় দেখে সোলার শাসালো—সরে দাঁড়াও।

শৈলেনের মুখে উপেক্ষার হাসি ফুটে উঠলো, বললে—আমি থাইসিসের রোগী, গুণ্ডা সাহেব।

—বটে!—সোলারের চোখে খুনের নেশা ফুটে উঠলো, বললে—আমি অনেক খুন করেছি মিষ্টার ব্যানার্জ্জী, আর একটা খুন করতেও ভয় পাব না।

হা-হা করে শৈলেন হেসে উঠলো, কিন্তু সে হাসি শেষ হবার আগেই সোলারের হাতের পিস্তলটা একবার কট্‌ ক'রে উঠলো, বারেক ঘোড়াটা উঠলো পড়লো: আগুনের ঝিলিক্‌ খেলে গেল, আওয়াজ গম্‌গম্‌ করে উঠলো…

শৈলেন টলে পড়লো। কিন্তু পড়ার আগে একখানি চেয়ার ধরে সামলে নিলে। জোরে জোরে কয়েকটা শ্বাস টানলো, তারপর সহসা সোলারকে আক্রমণ করলো। দু'হাতে সোলারের গলা টিপে ধরলো; বললে,—খুন তুমি অনেক করেছ সাহেব, কিন্তু এইটাই তোমার শেষ।…

শৈলেন এক ঝট্‌কায় সোলারকে মাটিতে এনে ফেলল। তাজা রক্তের কয়েকটা গরম ফোঁটা এসে পড়লো সোলারের মুখে, জামায়! সোলার বিভীষিকা-পন্ন হ'য়ে পড়লো, শৈলেনের মৃত্যু-মুষ্টি থেকে মুক্ত হ'বার জন্য ছটফট করে উঠলো।

ঘরের আবহাওয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, কে কি করবে যেন ভেবে পেল না।

পরক্ষণেই শশধর ও গুণ্ডা দু'জন এগিয়ে এল সোলারকে সাহায্য করার জন্য—

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন রমেশ বাবু।

—পুলিশ!

কথাটা কে উচ্চারণ করলো জানি না, কিন্তু চমকে উঠলো সকলেই।

ঘরের মধ্যে বোমা পড়লো যেন।

—হ্যাঁ, পুলিশ!—রমেশবাবু সাড়া দিলেন। তার পিছনে এসে ঢুকলো একদল পুলিশ। ভারি বুটের শব্দে ঘরখানি ভরে গেল।

সোলারকে ছেড়ে দিয়ে শৈলেন এবার টান হয়ে শুয়ে পড়লো মেঝের উপর। মিনুও যেন এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেল, তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে বসে পড়লো, ডাকলো—বাবা! বাবা!

ঘরের এক কোণে একটী কুঁজো বসানো ছিল, সত্যেন তাড়তাড়ি এক গ্লাস জল নিয়ে এলো। মিনু পিতার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলে। শৈলেন কয়েক চুমুক জল পান করলো অতি সন্তর্পণে, তারপর হাঁপাতে লাগলো।

রমেশ বাবু বললেন—আর একটু আগে আসতে পারলে ভাল হ'ত শৈলেন বাবু, বড্ড দেরী করে ফেলেছি।

—ঠিক সময়েই এসেছেন রমেশ বাবু, মিনুকে তো বাঁচালেন। আর আমি তো জেল থেকে পালিয়েছি, তার উপর টি-বি···

শৈলেন ধীরে ধীরে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করতে থাকে, প্রতিটি শ্বাসের টানে সারা দেহটা বেশী করে কেঁপে ওঠে যেন, বুকের জামাটা আর একটু বেশী লাল হয়ে ওঠে।

রমেশ বাবু বললেন—একজন ডাক্তার!

—দরকার নেই। সময় আমার শেষ হয়ে এসেছে, একটু কাছে অসুন, কথা আছে। মিনু-মা, আমার পকেট থেকে কার্ডবোর্ডখানি বের কর তো!

মিনতি পিতার পকেট থেকে ছবি-আঁকা পেষ্টবোর্ড-খানি বের করলো।

রমেশ বাবু বললেন—এটি তা হলে আপনিই নিয়েছিলেন?

—সে অনেক কথা, বলার এখন সময় নেই। এই ছবিওয়ালা কার্ডবোর্ডটার কথাই আগে বলিঃ এটা একখানি খাম, ভিতরটা ফাঁপা। ভিতরে একখানি চিঠি আছে, সেটি পড়লেই সব জানা যাবে···

এই পর্য্যন্ত বলেই শৈলেনের শ্বাসকষ্ট অসহনীয় হয়ে উঠলো। সারা দেহটা কেমন যেন ঝরা পাতার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। মিনু আর তাকিয়ে থাকতে পারছিল না সে দিকে, তার চোখে জল এসে পড়লো, কাতর কণ্ঠে বললে—একজন ডাক্তার, রমেশ বাবু!

কথাটা শৈলেনের কানে গেল, কি যেন সে বলতে গেল কিন্তু ঠোঁট দু'খানি বার কয়েক কাঁপলো শুধু, কোন শব্দ বেরুলো না,—হাসির ভঙ্গীতে একটু কুঁচকে উঠলো। তারপর সে মুখের উপর নেমে এল আকাঙ্ক্ষার প্রশান্তি, অস্তাচলগামী প্রাণের সঙ্কেত-ছায়া দেখা দিল সর্ব্ব দেহে।

(ক্রমশঃ)

কুইনিন! কুইনিন!

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বাংলা দেশ উজাড় হইয়া গেল।

ম্যালেরিয়া—ম্যালেরিয়া—ম্যালেরিয়া! এই সর্ব্বনাশা ব্যাধি সাঁড়াশীর মত সোনার বাংলাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। ছোট ছোট গ্রামের তো কথাই নাই, বড় বড় সহরগুলি শুদ্ধ এই সাঁড়াশীর চাপে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

ম্যালেরিয়া কি জন্য হয়—কি ভাবে এক রকম ছোট্ট প্রাণী—মশার সাহায্যে এর বিষ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে সে সব খবর তোমরা স্বাস্থ্যের বইয়েই পড়িয়াছ! এই ম্যালেরিয়ার একমাত্র ওষুধ হইতেছে কুইনিন। অবশ্য কুইনিন ছাড়া ঐ জাতীয় আরও ২।১টি ম্যালেরিয়ার ওষুধ বাহির হইয়াছে কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন: "ও যাই বল, কুইনিন ছাড়া ম্যালেরিয়ার আর কোন ওষুধ নাই।"

তোমরা হয়তো ভাবিতেছ, ঠিক ঠিক ওষুধ যখন জানা আছে, তখন প্রচুর পরিমাণে তার ব্যবস্থা করিলেই তো গোল চুকিয়া যায়! কথাটা ঠিক, কিন্তু গলদও ঐখানেই। দেশের চাহিদা মত অত কুইনিন আর পাওয়া যাইতেছে না। কুইনিন পাওয়া যায় সিঙ্কোনা গাছ হইতে, কিন্তু এই সিঙ্কোনা গাছ পৃথিবীর সর্ব্বত্র হয় না। এর জন্য চাই বিশেষ এক রকম জমি আর বিশেষ এক রকম আবহাওয়া। কৃষি-বিজ্ঞানীরা নানা জায়গায় এর চাষের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায়ই তেমন ফল পান নাই। অবশ্য আমাদের দেশে কালিম্পংএর কাছে মংপুতে সরকারী তত্ত্বাবধানে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই না। অথচ যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতেও কুইনিন তেমন আমদানী করা যাইতেছে না। কি ভীষণ অবস্থা বল তো!

শুধু যে আমাদের দেশেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আর কুইনিনের অভাব দেখা দিয়াছে তা মনে করিও না, পৃথিবীর আরও নানা অঞ্চলে—এমন কি আমেরিকার মত সমৃদ্ধিশালী দেশেও নাকি ঐ অবস্থা দেখা দিয়াছে। তবে বাংলা দেশের মত এত উৎকট ভাবে নয়। তবুও সে দেশের গভর্ণমেণ্ট এ ব্যাপার লইয়া বেশ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

পৃথিবীর আসল সিঙ্কোনা-ক্ষেত্র হইতেছে জাভা বা যবদ্বীপ। এইখানেই সিঙ্কোনা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ধরিতে গেলে গোটা পৃথিবীর কুইনিন যোগাইবার ভার এই দ্বীপটির উপর। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জান এবারকার যুদ্ধে জাপান এই দ্বীপটি অধিকার করিয়া লইয়াছে,—সেই সঙ্গে তার সিঙ্কোনা-ক্ষেত্রও গিয়াছে জাপানীদের হাতে। ফলে মিত্রপক্ষের আজ এই কুইনিন-সঙ্কট!

কিন্তু আমেরিকান্‌রা আসল বৈজ্ঞানিক জাতি। প্রকৃতির দয়ার উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার লোক তারা মোটেই নয়। কুইনিন সিঙ্কোনা গাছ হইতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু কুইনিনের রাসায়নিক গঠন বিজ্ঞানীদের অজানা নয়। যদিও ব্যাপারটা তাঁদের ভাষায় 'খুবই গোলমেলে'। কিন্তু গোলমেলে বলিয়া ছাড়িয়া দিলেই তো হয় না—প্রয়োজনের বড় বালাই। তাঁরা ঠিক করিলেন পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে কুইনিন তৈরীর ব্যবস্থা তাঁরা করিবেনই। অনেক দিন আগে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, পার্কিন নামে একটি ১৮ বছরের ছেলে লণ্ডনে বসিয়া একবার এই রকম চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁরও সাধ হইয়াছিল—কৃত্রিম উপায়ে তিনি কুইনিন তৈরী করিবেন আলকাৎরা হইতে। পার্কিন অবশ্য কুইনিন তৈরী করিতে পারেন নাই—কিন্তু তার বদলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এমন একটা জিনিষ যার জন্য তাঁর নাম আজ জগদ্বিখ্যাত হইয়া আছে। আলকাৎরা হইতে যে হাজারো রকমের কৃত্রিম রং এবং ওষুধবিষুধ আজ তৈরী হইতেছে তার মূলে রহিয়াছে পার্কিনের সেই আবিষ্কার। পার্কিনের পরে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক হয়তো কৃত্রিম উপায়ে কুইনিন তৈরীর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হন নাই। কিন্তু এবার প্রশ্ন পরম প্রয়োজনের। এবার একটা কিছু করা চাই-ই।

এবার আগাইয়া আসিলেন দুই তরুণ বৈজ্ঞানিক—ডক্টর উড্‌ওয়ার্ড্ এবং উইলিয়াম্ ডোয়েরিং। দু'জনেই আমেরিকার লোক। উড্‌ওয়ার্ডের বয়স ২৭ বছর, ডোয়েরিংএর ২৬। এঁদের প্রধান সহায় হইলেন এড্‌উইন্ ল্যাণ্ড্। ইনি একাধারে বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবসায়ী। এঁরও বয়স ৩৫এর বেশী হইবে না। এঁরই সাহায্যে—এঁরই গবেষণাগারে দুই তরুণ বৈজ্ঞানিক কাজ সুরু করিলেন গত বছর ১লা ফেব্রুয়ারী।

কয়লা বা পেট্রোলিয়াম্ হইতে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, জিনিষটার গঠন-প্রণালী অনেকটা কুই-নিনের মত, অবশ্য অত বেশী গোলমেলে নয়। উড্‌ওয়ার্ড্ এবং ডোয়েরিং এই জিনিষটি লইয়া কাজে লাগিলেন। জিনিষটার বৈজ্ঞানিক নামটা অবশ্য একটু খটমটে—"সেপ্টা-হাইড্রক্সি-আইসোকুইনোলিন্"। যাক্, এই খটমটে নামের জিনিষটি লইয়াই তাঁদের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। দিন নাই, রাত নাই, সর্ব্বক্ষণ ইঁহারা পরীক্ষাগারেই পড়িয়া আছেন। কিম্ভূতকিমাকার কতকগুলি যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাপ বাড়াইয়া কমাইয়া, তাপ বাড়াইয়া কমাইয়া, আরও কত উপায়ে শেষে তাঁরা ঐ খটমটে জিনিষটার শরীরে প্রয়োজন মত অঙ্গার (কার্ব্বন), হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির 'অণু-পরমাণু' যুড়িতে লাগিলেন। ধৈর্য্য যখন প্রায় চরমে পৌঁছিয়াছে তখন দেখা গেল পাত্রে এমন একটি হলদে জিনিষ তৈরী হইয়া আছে যাকে কুইনিনের একেবারে জ্ঞাতিভাই বলা যাইতে পারে। সেই পার্কিনের আমলেই আর একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—লুই পাস্তুর কুইনিনকে এই জিনিষে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং পরে তাকে আবার কুইনিনে পরিবর্ত্তিত করিবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

তার পর? তার পর আর কি, বাকী কি করিতে হইবে তা যখন জানাই আছে তখন আর ভাবনা কি? এইভাবে দু'টি তরুণের হাতে পৃথিবীর একটী মহামূল্য সামগ্রী তৈরী হইয়া গেল। লোকে জানিল কুইনিন শুধু প্রকৃতির দান হিসাবে সিঙ্কোনা গাছেই পাওয়া যায় না, মানুষের সাধনা-বলে ঘরে বসিয়া কৃত্রিম উপায়েও তা তৈরী করা চলে—এবং নকল উপায়ে তৈরী হইলেও আসলে জিনিষটি কিন্তু কুইনিনের নকল নয়—একেবারে খাঁটি কুইনিন।

এখানে আর একটা কথা বলিয়া শেষ করিব। পরীক্ষাগারে কুইনিন তৈরীর প্রক্রিয়া আবিষ্কার হইল বটে কিন্তু সাধারণের মধ্যে বিলাইবার মত প্রচুর পরিমাণে তৈরী করিবার উপায় এখনও বাহির হয় নাই। উড্‌ওয়ার্ড

ও ডোয়েরিংএর আবিষ্কৃত উপায়ে যে কুইনিন পাওয়া গিযাছে তাতে খরচ এত বেশী পড়িয়াছে যে সামান্য কয়েক গেন তৈরী করিতেই হয়তো কয়েক হাজার টাকা লাগিয়া যাইবে। কিন্তু ইঁহারা পথ দেখাইয়াছেন মাত্র; এর পর চাষ না করিয়া সস্তা উপায়ে এবং প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য কুইনিন তৈরী করিবার প্রণালী বাহির করা হয়তো আর বেশী কঠিন হইবে না। বৈজ্ঞানিকের অসাধ্য বোধ হয় কিছুই নাই। কে জানে, সেই শুভদিন হয়তো খুব শীঘ্রই আসিয়া হাজির হইবে!

চিঠিপত্র

শ্রীইন্দিরা দেবী

রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকারা,

আজ তোমাদের একটা খুব ভাল খবর জানাচ্ছি।

বাংলা দেশের বিভিন্ন শিশুসাময়িক-পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, পরিচালক, শিশুসাহিত্যানুরাগী এবং তোমাদের কল্যাণকামী বন্ধুদের নিয়ে সম্প্রতি 'শিশুসাহিত্য পরিষদ' গঠন করা হয়েছে, সে খবর তোমরা রামধনু মারফৎ আগেই পেয়েছ। পরিষদ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই দু'টি কাজে সম্পাদক-মণ্ডলী হাত দিয়েছেন। তার প্রথমটি,—তোমাদের জন্য একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে কলকাতায় একটা শিশুশিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করা।

শিশুশিল্প-প্রদর্শনীর সমস্ত ভার অর্পণ করা হয়েছে একটি বিশেষ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর। এই সমিতির সদস্য হয়েছেন—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বামী প্রেমঘনানন্দ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীইন্দিরা দেবী।

এখন, তোমরা কি করবে বলি শোন। পাঁচ থেকে আঠারো বছর পর্য্যন্ত যাদের বয়স তারা তোমাদের যে রকম শিল্প-কাজ আছে তা পাঠিয়ে দেবে এই প্রদর্শনীর জন্য। মনে রেখো, তোমাদের যা নিজের সৃষ্ট শিল্প—সর্ব্ববিধ হাতের কাজ, চিত্রশিল্প, উলশিল্প, এমব্রয়ডারী, বেতের কাজ, ঘাসের টুকরী, তালপাতার ব্যাগ, বয়ন শিল্পের যা কিছু (সুতো কাটা, কাপড় তৈরী প্রভৃতি), মাটীর মূর্ত্তি, খেলনা, 'ক্রেট্ ওয়ার্ক', কাঠের উপর 'পোকার ওয়ার্ক' চামড়ার কাজ, কাঁথা সেলাই, কাঠ, কাগজ এবং ব[...] উপর পেণ্টিং, জয়পুরী মীনের কাজ, কাঠ এবং কা[...] বোর্ডের খেলনা, পুতুলকে পোষাক পরানো, কাপড় চা[...] রং করা, সুপারি, যব ও ধানের খেলনা, ট্রে প্রভৃ[তি] পুঁতির কাজ, সূচী-শিল্পের যাবতীয় কাজ, সমস্ত তোম[...] এই প্রদর্শনীতে পাঠাতে পার। এ ছাড়া হাতে লে[...] মাসিক পত্রিকাগুলিকেও আমরা স্থান দেব। তোমরা যা[...] পাঠাতে চাও—পাঠিও।

তোমরা যারা শিল্পদ্রব্য পাঠাবে—সম্পূর্ণ নাম, ঠিকা[না] বয়স পরিষ্কার করে লিখে দেবে এবং শিল্পদ্রব্যের স[...] সেটা আটকে দেবে। যদি বিক্রির জন্য পাঠাও তা[...] ঐ সঙ্গে মূল্য নির্দ্ধারণ করে লিখে দেবে। নিয়ে আ[...] নিয়ে যাওয়ার খরচ তোমাদের নিজেদের। পাঠাবার [...] তারিখ ৭ই জানুয়ারী।

তোমরা 'রামধনু' অফিসে পরিষদের অন্যতম সম্পা[দক] তোমাদের সম্পাদক মশাইএর কাছে তোমাদের শিল্প[...] পাঠাতে পার। এ ছাড়া কলকাতার মৌচাক কার্য্যাল[য়—] ১৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কৈশোরক কার্য্যালয়—পি, ৬৫১এ, [...] নির্ব্বাণ রোড, রংমশাল কার্য্যালয়—৩, শম্ভুনাথ প[ণ্ডিত] ষ্ট্রীট, কিশোর বাংলা কার্য্যালয়—২৫, বলরাম দে ষ্ট্রীট C/o ইন্দিরা দেবী, ৪০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—এই ঠিকা[নায়] পাঠালেও চলবে।

যা ছিল সবার মনে—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

তা একদিন সত্যই রূপ ধরে চোখের সামনে [...] দাঁড়ালো। সেদিন আমি ছিলাম না, আরও অনে[কে] ছিলেন না, তোমাদেরও কেউ এসে দাঁড়াও নি।

ছিলেন শিশুভারতীর যোগেনদা', ছিলেন কবি সুনি[...] ও তোমাদের সম্পাদক মশাই ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ। তাঁরা [...] কোথায় যাচ্ছিলেন, বোধ হয় কোন সভায়, অথবা কো[...] ভ্রমণে। মোটর চলছিল তো চলছিলই। কত [...] বেগে জানি না; যত মাইল বেগেই হোক আইন [...] প্রাণ বাঁচিয়ে যে এতে আর ভুল নেই।

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ বললেন, "আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ছি যে একটা সঙ্ঘ গড়ে না তুল্‌লে আর নিস্তার নেই! সঙ্ঘটি দেশের যত সাহিত্যিক আছেন—ছেলেমেয়েদের জন্য যাঁরা সাহিত্য রচনা করছেন—তাঁদের নিয়েই হবে। তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুসাহিত্য পরিষদ, শিশুসাহিত্য সঙ্ঘ বা ঐ রকম একটা কিছু—"

যোগেনদা' বরাবরই কাজের লোক; যেমন শাল-প্রাংশু মূর্ত্তি তেমনি বলিষ্ঠ তাঁর মন, আর সেই রকম অদম্য তাঁর কর্ম্মশক্তি। বয়স অবশ্য ষাটের কিছু ওপরেই হবে তবে তাঁর সঙ্গে মিশলে বয়সটা চোখেই পড়ে না। বল্‌লেন, "ভাই, এ যা বলেছ! ক' বছর ধরে এই কথাই ভাবছি। দেশের অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে আলোচনাও হয়েছে। সকলেই বলেছেন, 'একটা পরিষদ্ গড়ে তুলুন।' আমিও ভাবি, বাংলায় ছেলে-মেয়েদের সাহিত্য মাত্র পঁচিশ বছরে অনেকখানি গড়ে উঠেছে মানি কিন্তু এখন ঠিক যে ভাবে চল্‌ছে ঠিক সে-ভাবে তাকে আর চল্‌তে দেওয়ায় কারোই মঙ্গল নেই—না সাহিত্যিকের, না সাহিত্যের, না যাদের জন্যে রচিত হচ্ছে তাদের—"

তিনি আরও বল্‌লেন অনেকেই অর্থ সাহায্য করতে সম্মত, এবং অন্যান্য বিষয়েও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

না দেবেন কেন? আজ পৃথিবীব্যাপী রণ-তাণ্ডব চল্‌ছে। মানুষই মানুষকে কাটছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে। তবুও এরই মাঝে দেখছি, সব মানুষই অমানুষ হয়ে যায় নি। যা সুন্দর ও কল্যাণের তাকেই আদর্শ করে তার দিকে তারা এগিয়ে চলেছে।

বল্‌তে গেলে, পথে, সেই মোটর-গাড়ীতেই, আমাদের—তোমাদের শিশুসাহিত্য-পরিষদের সেদিন জন্ম হ'ল!

জন্ম তো হ'ল, কিন্তু ভয়, বাঁচবে তো? চারধারে প্রতিকূল অবস্থা। নানা জন, নানা মন, স্বার্থও নানা। কোন কিছু ঘটবার সময় না হ'লে যেমন হাজার চেষ্টায়ও তা ঘটে না—তার জন্যে অনুকূল অবস্থার দরকার, তেমনি তার টিকে থাকবার, বড় হবার মত সুবিধাজনক অবস্থাও চাই। সময় হয়েছে বলে পরিষদের জন্ম হ'ল; কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখবার মত অবস্থা তো গড়ে তুলতে হবে!

এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটল। যুদ্ধের দরুণ দেশে দেখা দিল কাগজের দুর্ভিক্ষ। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এবং সাময়িক পত্র-জগতে এর পরিণাম হ'য়ে উঠল ভয়াবহ। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন খবর-কাগজ খুলে দেখা গেল, গভর্ণমেণ্ট থেকে এক অদ্ভুত আদেশ জারি করা হয়েছে—যার ফলে প্রত্যেক সাময়িক পত্রকে তাদের পৃষ্ঠা-সংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ বাদ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। কাগজের দুর্ভিক্ষে এমনিই পত্রিকাগুলো ক্ষীণকায়া হয়ে ছিল, এই আদেশের ফলে তাদের অস্তিত্বই লোপ পাবার আশঙ্কা দেখা দিল। ছোটদের উপযোগী সাময়িক পত্রগুলোর কথা ভাব। তাদের কাজ তো শুধু সাহিত্য পরিবেষণই নয়, ভবিষ্যতে যারা দেশকে চালাবে তাদের গড়ে তোলারও অনেকটা ভার যে এদের ওপর! কাজেই এখন উপায়? সকলে মিলিত হয়ে কাজ করতে না পারলে এর প্রতিকার হবে কি ক'রে?

সেদিন ২৪শে আষাঢ়, ১৩৫১। বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে হয়তো এ দিনটি একদিন সোনার অক্ষরে লেখ[া] থাকবে। সেদিন রংমশালের কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁর বাড়ীতে সমস্ত শিশুসাময়িক পত্রের সম্পাদকদের আহ্বান করলেন। সেই সঙ্গে এলেন শিশুসাহিত্যিকরা—ছোটদের জন্য যাঁরা সত্যি ভাবেন। সেদিনকার সেই সভায় শুভ মুহূর্ত্তে 'শিশু-সাহিত্য-পরিষদ্' গঠিত হ'ল। নামকরণ হ'ল,—সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতিও নির্ব্বাচিত হলেন।

অবিলম্বেই চারদিকে খবর গেল। 'মৌচাক', 'মাস-পয়লা', 'রামধনু', 'রংমশাল', 'কৈশোরক', 'শিশু-সওগাৎ' 'কিশোর বাংলা' প্রভৃতির সম্পাদকরা, যাঁরা ছিলেন উদ্যোগী তাঁরা এবং অন্যান্য সাহিত্যানুরাগীরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই এক কথা, "পরামর্শ করা যাক্ কি ক'রে এটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।"

তাই এর কয়েক দিন পরেই একদিন অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীত ঘরোয়া ভাবে এবং তারপর অধ্যা[পক] ক্ষেত্রগোপালদাস ঘোষ মহাশয়ের (মিঃ কে, ডি, ঘোষ) বাড়ীতে বড় ক'রে পরামর্শ-সভা বসলো।

সেদিনও আমি ছিলাম না। ছিলাম না বটে কিন্তু যা হ'ল তা শুনলাম। শুনে খুশি হলাম এবং এগিয়ে এলাম।

সে সভায় অনেকেই এসেছিলেন। এঁদের সকলেই প্রায় দেশের নাম-করা ব্যক্তি। আলোচনা ও পরিকল্পনার পর সভা ভাঙলো, কিন্তু ভয় ভাঙলো না; ভাবনাও আরও বেড়ে গেল—"কি করে একে বাঁচানো যায় ?

তারপর একদিন— (ক্রমশঃ)

মান রক্ষা

(কুড়ান গল্প)

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

হরিদাস বাবুর বাড়ীতে আজ কি উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ। গ্রামের অনেকেই আসিয়াছেন। উঠানে বহু লোক একসঙ্গে খাইতে বসিয়াছে,—খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। হরিদাস বাবুর গলায় গামছা, তিনি করযোড়ে অতি দীন ভাবে বলিতেছেন: 'আপনাদের কার কি প্রয়োজন দয়া করে বলবেন ?" একজন বলিলেন, "পান্তুয়াটা বড় সরেস হয়েছে, সেটাই একবার দেখাতে বল।" পান্তুয়া পরিবেশনকারী আসিলে সকলেই তাহার সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। মুখুয্যে মশাই বলিলেন, "আরে, চক্রবর্ত্তী খুড়োর পাতে ও দুটো পান্তুয়া দেওয়ার কর্ম্ম নয়, একবারে গোটা বার চৌদ্দ ঢেলে দাও"—উদ্দেশ্য নিজের পাতেও সেইরূপ পড়ে। সকলেই এইরূপ পরস্পরের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া পান্তুয়া খাইয়া কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তার কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া চক্ষুস্থির। তিনি ভাঁড়ারের খবর জানিতেন। বেগতিক দেখিয়া ভোজন-ভূমি হইতে পলাইয়া বাড়ীর ভিতর ভাঁড়ারের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভাঁড়ারের ভার ছিল গ্রামের সরকারী খুড়ো নিমু খুড়োর উপর। হরিদাস বাবু যাইতেই খুড়ো বলিলেন, "ভায়া, পান্তুয়া কোথায় ? সবাই যে পান্তুয়া পান্তুয়া হাঁকছে!" হরিদাস বাবু কাতর স্বরে পান্তুয়ার অভাবের কথা বলিয়া খুড়োর হাত ধরিয়া বলিলেন, "খুড়ো, তুমি কোন রকমে মান রক্ষা কর।"

"তাই তো—" খুড়ো একটু ভাবিয়া লইলেন, তারপর বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি এক কাজ কর; রামী গরুটার বাঁধন খুলে তাকে দু'ঘা ছিপটি বসিয়ে দাও। রামীর শিং দুটো বিকট বটে কিন্তু আসলে অতি শান্ত গরু, মার না খেলে লাফাবে না। আ বাইরে ব্যবস্থা করছি।" খুড়ো এই বলিয়া এক বি লাঠি লইয়া হন্তদন্তভাবে বাহির বাটিতে উপস্থিত হই সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনারা কেউ উঠবে না, দুষ্টু রামী গরুটা দড়ী খুলে বেরিয়ে পড়েছে। আ তাকে শায়েস্তা করছি।" ইতিমধ্যে লম্ফমান রামীে দেখিয়া কয়েক জন উঠিয়া দৌড় দিল। একটা বিশৃঙ্খল হৈ-চৈ আরম্ভ হইল। অধিকাংশ লোকই পালাইতে ব্যস্ত। খুড়ো যখন রামীকে সংযত করিলেন উঠান তখ প্রায় খালি।

কর্ম্মকর্ত্তার মানরক্ষা হইল।

সন্দেশ

বোম্বাইএ এ বছরের পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ফাইনালে গিয়েছিল হিন্দু ও মুসলিম্ দল হিন্দু দল ছিল খুবই শক্তিশালী, কাজেই মুস্‌লিম্ দল তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে তা কেউ ভাবে নি। কি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু দলকেই এক উইকেটে পরাজয় স্বীকা করতে হয়েছে। খেলাটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল এব প্রায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন্ দল জয়ী হবে তা কেউ বুঝতে পারে নি। মুস্তাক আলি ও বিজয় মার্চেণ্ট যথাক্রমে মুস্‌লিম্ ও হিন্দু দলের অধিনায়ক ছিলেন।

তার পর কলকাতায় রণজী প্রতিযোগিতার ১ম রাউণ্ডে বাংলা বনাম যুক্তপ্রদেশ দলের খেলাও হয়ে গেল প্রত্যেক বারই বাংলাকে বিহার দলের সঙ্গে প্রথম রাউণ্ডে খেলতে হয়, তাই এবার খেলার সূচী একটু বদলে দেওয়া হয়েছিল। খেলায় শেষ পর্য্যন্ত বাংলা দলই ৭৫ রানে জয়লাভ করেছে। বাংলা দলের অধিনায়ক এবারেও ছিলেন কুচবিহারের মহারাজা, আর যুক্তপ্রদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন মহারাজকুমার বালেন্দু শাহ।

ওদিকে বোম্বাইএ মহারষ্ট্র দল নবনগর দলকে ভীষণ ভাবে হারিয়ে ২য় রাউণ্ডে উঠেছে।

বোম্বাইএর একটা প্রদর্শনী ক্রিকেট্ ম্যাচও উল্লেখ-যোগ্য। খেলা হয়েছিল ক্রিকেট্ ক্লাব্ অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে সার্ভিসেস্ দলের। প্রথমোক্ত দল এক ইনিংস্ ও ৩৫ রানে

সার্ভিসেস দলকে হারিয়ে দিয়েছে। এই খেলার বিশেষত্ব হচ্ছে—একই ইনিংস্এ দু'টি ভারতীয় খেলোয়াড়—মার্চেণ্ট ও হাজারী ২০০র ওপর রান্ করেছেন। ভারতে এমন ব্যাপার এই প্রথম।

২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে। এই উপলক্ষ্যে নানারকম নতুন ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এর মধ্যে কবি-সম্মিলনী—অর্থাৎ হিন্দী কবিদের সম্মেলন ও প্রতি-যোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বয়স ৬৬ বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় বাংলার সাহিত্যিকরা মিলে তাঁর অভিনন্দন-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। ছোটদের সাহিত্যেও তাঁর দান কম নয়। ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

পণ্ডিত জওহরলাল ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বয়স যথাক্রমে ৫৫ ও ৬০ পূর্ণ হওয়ায় এঁদেরও জন্মদিন ও হীরক-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু স্বদেশী ও বিদেশী মনীষী এঁদের প্রতিভার উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন।

শীগ্‌গিরই বিলাসপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ২৬শ অধিবেশন হবে। সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মহাত্মা গান্ধীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ৺কস্তুরবাঈ গান্ধীর স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশবাসীর কাছ থেকে যে টাকা সংগৃহীত হয়েছে স্মৃতি-রক্ষা সমিতি ঠিক করেছেন এ থেকে তাঁরা ৮০ লক্ষ টাকা গ্রামের মেয়ে ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করবেন।

জার্ম্মেনীর উপর মিত্র বাহিনীর আক্রমণ তেমনি প্রবল ভাবে চলেছে। রুশরাও সমানে চাপ দিচ্ছে। ১৩ই ডিসেম্বরের খবর—বুডাপেষ্ট্ সহরের ভিতর প্রবেশ করে এখন তারা লড়াই করছে। জাপানের রাজধানী টোকিও সহরেও আমেরিকানরা এখন ক্রমাগত বোমা বর্ষণ সুরু করেছে, জাপ রাজপ্রাসাদ শুদ্ধ আক্রান্ত হয়েছে। অবশ্য চীনে জাপানীরা অনেকটা সুবিধা করে নিয়েছে এবং পর পর সেখানকার অনেকগুলি বিমান-ঘাঁটী তাদের হাতে গেছে।

সম্প্রতি একটা নতুন বৃটীশ ব্যাট্‌ল্‌শিপ্ বা রণপোত জলে ভাসান হয়েছে। এটিই এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাট্‌ল্‌শিপ্।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

আদর্শ জীবন

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী (গ্রাহক)

আপনারে ক'রো উষার মতন সুন্দর নিরমল,
শুভ্র আলোর মতই রাখিও চিত্তেরে প্রোজ্জ্বল।
জীবনেরে ক'রো উদার—যেমন প্রভাতের সমীরণ,
হৃদয়েতে রেখো পুষ্পের মত সৌরভ অনু'খণ।
নিদ্রিত জনে জাগ্রত ক'রো ভোরের পাখীর মত,
সূর্য্যের মত ক'রো বিদূরিত মনের আঁধার যত।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) দরবেশ (২) পাঞ্জাব (৩) প্রয়াগ (উল্টো দিক থেকে দু' অক্ষর নিলে হবে গয়া)।

নতুন ধাঁধা

শ্রীসর্ব্বাণী দেবী

(১) এমন একটি রাশির নাম কর যা একশ'র চেয়ে ছোট কিন্তু তা থেকে যদি তিন বাদ দেওয়া যায় তবে বাকী থাকবে একশ।

(২) মাথা ঘুরলে আমরা পড়ে যাই, সে কিন্তু আরও তেজের সঙ্গে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। কে সে ?

রামধনুর পৃষ্ঠাবৃদ্ধি

তোমরা শুনে সুখী হবে, ভারত-সরকার সম্প্রতি 'রামধনু'কে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নিউজ প্রিণ্ট্ (অর্থাৎ খবরের কাগজ ছাপবার কাগজ) ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলে, আশানুরূপ না হলেও, রামধনুর পৃষ্ঠা-সংখ্যা এখনকার তুলনায় অনেকখানি বাড়ান যাবে। খুব সম্ভব আগামী মাস থেকেই আমরা তোমাদের হাতে বর্দ্ধিত-কলেবরের রামধনু দিতে পারব। —রাঃ

কয়েকখানা ছেলেমেয়েদের গল্পের বই ঃ—

এবারের

পূজা-বার্ষিকী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

বর্ষ-মঙ্গল

বিরাট গ্রন্থ—অসংখ্য ছবি : এক রং, দুই রং ও বহু রং—গল্প ও কবিতার ঝরণা—সুন্দর বাঁধাই—উৎকৃষ্ট ছাপা।

মূল্য ২॥০ মাত্র

ইহাতে লিখিয়াছেন

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, "বনফুল", নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সরোজ রায় চৌধুরী, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী, জসিম-উদ্দিন, ধীরেন্দ্র ধর প্রভৃতি বিখ্যাত লেখক ও লেখিকাগণ।

এত বড় সমৃদ্ধ গ্রন্থ, এত কম দামে—বর্ত্তমান জগতের পরম বিস্ময়

নব প্রকাশিত

যাদুসম্রাট—**পি. সি. সরকার**

প্রণীত

ম্যাজিকের খেলা

দাম ১৲

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া বাহির হইতেছে

প্রহেলিকা সিরিজের

(চমকপ্রদ ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী)

১ম	গ্রন্থ	মুখোশের অন্তরালে	(সব্যসাচী)	১৲
২য়	,,	মৃত্যুদূত	,,	১৲
৩য়	,,	ব্লাড্‌ হাউণ্ড	,,	১৲
৪র্থ	,,	কালের কবলে	,,	১৲
৫ম	,,	শেষ বলি	,,	১৲
৬ষ্ঠ	,,	নৈশ অভিযান	,,	১৲
৭ম	,,	কবরের নীচে	,,	১৲

❋

বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজের

অমূল্য গ্রন্থ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

যাদুকর মার্কণী ১৲

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস ১৲

❋

শিহরণের খনি

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন ১।০

দেব-সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

Regd. No. C-1641

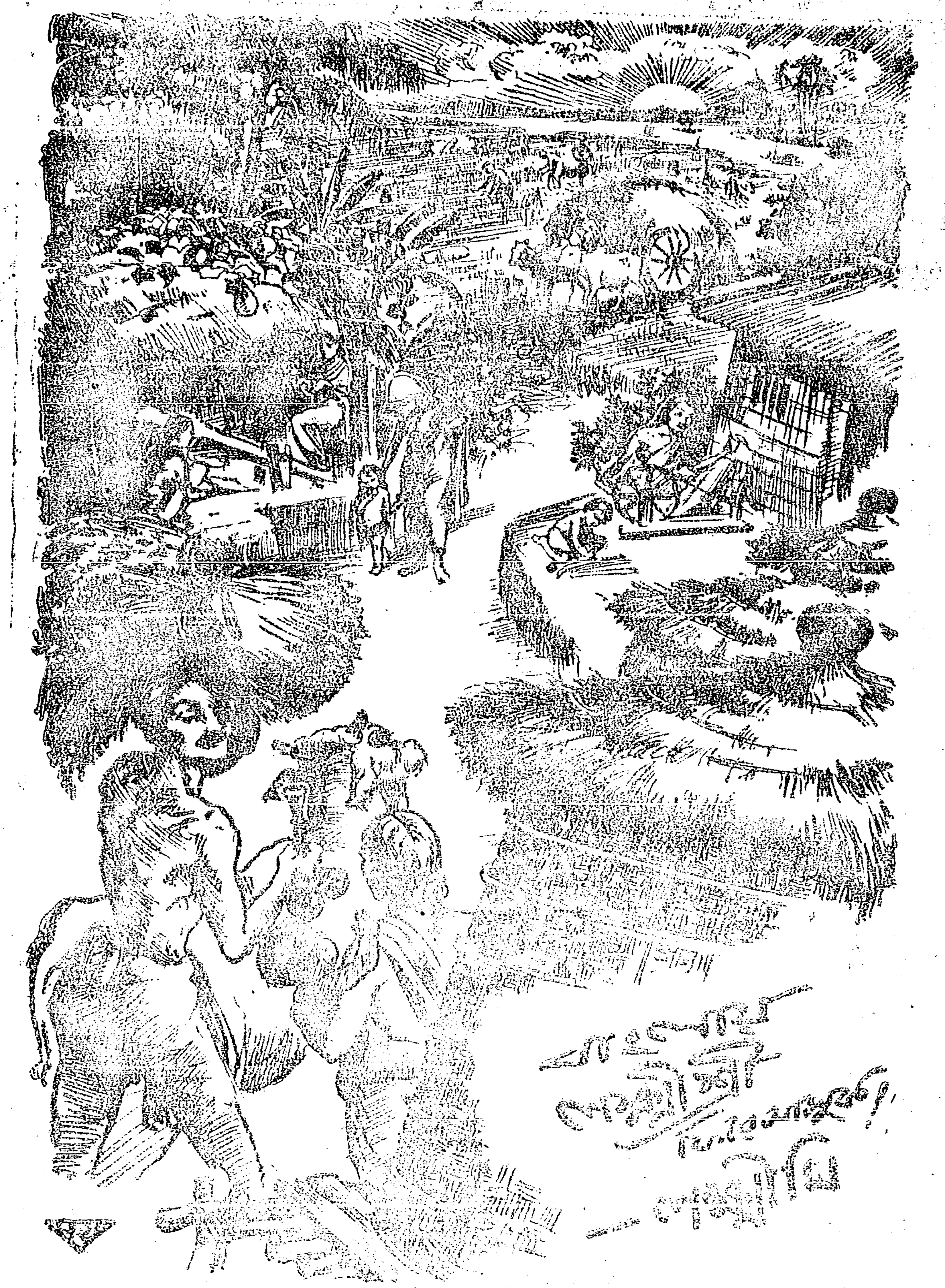

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টী ঔষধ
মাত্র ১৪টী ঔষধ
পকেট কেস ও পুস্তক সহ
মূল্য ৪৲ টাকা
মূল্য ৮৲ টাকা

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে, চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৭শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৫১ | ১০ম সংখ্যা

রামধনুকের দেশে

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রামধনুকের রাজপুরীতে
একটি ছোট মেয়ে
সন্ধ্যাতারা হ'য়ে আসে
ধরার পানে চেয়ে।
পল্লীনদীর বুকে কাঁপে
ওই তারাটীর আলো,
ওই মেয়েকে মোদের খুকু
বাস্‌ল আজি ভালো।

রামধনুকের রাজপুরীতে
একটি চপল ছেলে
নীল গগনে দেছে পাড়ি
মেঘের পাখা মেলে।
প্রথম বাদল-ধারা হয়ে
নাম্‌ল ধরার বনে,
ওই ছেলেটী ভাব করেছে
মোদের খোকার সনে।

আয় রে তোরা কে যাবি রে
রামধনুকের ঘর ?—
আষাঢ়-ভোরে রঙিন সাঁকো
গড়্‌ল যাদুকর।
আকাশের ওই স্নেহের ধারায়
ধরণী যায় ভেসে.
নতুন পড়ার পাঠশালা আজ
রামধনুকের দেশে।

যূঁইরা সেথা নেবে আজি
ফুটে ওঠার পড়া,
ময়নারা আজ শিখবে সেথা
ভোরাই গানের ছড়া।

ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির
গানের সুরের রেশে
নিঝুম রাতে চাঁদ হাসে যে
রামধনুকের দেশে।

রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

চতুর্দ্দশ কাণ্ড

সেই কার্ড্‌বোর্ডখানি খোলা হ'ল তখনই।

ভিতরে লম্বা চিঠি :

কমরেড্‌, আমি ডাকাত।

আমি মানে আমরা—দেবেশ, রবীন, আরো অনেকে।

আমিই ছিলাম দলের সংগঠক আর নায়ক, তাই দলের গোড়াতেও ছিলাম আমি, শেষেও আছি আমি।

আমরা ডাকাত!

জীবনের এত দিক্ থাকতে ডাকাতিটাই পছন্দ করলাম কেন তার কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার, না হলে আমার আদর্শবাদটা পরিপূর্ণভাবে তোমাদের মনের সামনে মেলে ধরতে পারবো না। অর্থনীতির সব ক'টা পরীক্ষা শেষ হবার পর অনেক আলোচনা করে দেখলাম বর্ত্তমান সভ্যতার মূল কথাই হচ্ছে পরস্ব-অপহরণ; অর্থাৎ চুরি আর ডাকাতি ; যে যত বেশী চুরি করতে পারবে তার তত বেশী পয়সা, সমাজে তার প্রতিপত্তিও বেশী। রাজা দিগ্বিজয়ের নামে দেশ লুঠ করে, জমিদার খাজনার নামে প্রজার পয়সা চুরি করে, ব্যবসায়ীরা লাভের নামে সাধারণের পকেট মারে। যাদের সৈন্য নেই, জমিদারী নেই, ব্যবসা নেই, তাদের পক্ষে চক্ষুলজ্জার কোন ভনিতা না করে সোজা ডাকাতি সুরু ক'রে দেওয়াই ভালো। সেই জন্যই আমরা ডাকাতি সুরু করলাম।

ডাকাত মানে সাধারণ নর-ঘাতক আমরা ছিলাম না ; আমাদের আদর্শ ছিল বড়। আমরা ছিলাম রবিন হুডের দল। বড় বড় ধনী জমিদারদের লাখ লাখ টাকা লুঠেছি, কিন্তু কোন দিনই তার একটি পয়সা নিজের জন্য ব্যয় করি নি। এক হাতে লুঠেছি, আর এক হাতে খয়রাতি করেছি। ভারতের যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে অভাব সেইখানেই অনাথ-আতুরদের ঘরে আমাদের টাকা গি[...] পৌঁছেছে। টাকাগুলি সোনার গহনা আর ব্যাঙ্কের পা[...] বই হয়ে সিন্দুকে জমা না থেকে সৎ কাজে খরচ হয়েছে সে জন্য ন্যায় ও নীতির দিক্ থেকে কোন অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

যাক্ সে কথা, সে টাকার সঙ্গে আজকের এই টাকা[...] কোন সম্পর্ক নেই। পূর্ব্বপরিচয় হিসাবে কথাগু[...] বললাম শুধু।

আজ যে টাকার কথা বলছি, এ টাকা ডাকাতির টা[...] নয়, এ টাকা আমরা সংগ্রহ করেছি বিহারের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে। সেখানে মুমূর্ষুর মুখে জল দিয়েছি ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেছি, যাদে[...] সেবা ও সংকারের কোন সুবিধা ছিল তাদের পা[...] গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সেই অবসরে যে সব মূল্যবান্ অলঙ্কা[...] আর টাকাকড়ি বেওয়ারিশ হাতের কাছে এসে পড়ে[...] সংগ্রহ করেছি। আমরা না আনলে সেগুলো আর কে[...] নিয়ে যেত ; অনেক লোক নানা প্রতিষ্ঠানের নামে [...] নিয়েছে এবং নিজেদের ব্যাঙ্কের হিসাব ফাঁপিয়ে তুলে[...] সেই সুযোগে। সেই ধরণের দেশ-সেবা আমরা কখন[...] করি নি। দিনের পর দিন খেটে, রাতের পর রাত জে[...] আমরা তখন যে ভাবে কাজ করেছি তার পিছনে [...] একটা বিরাট্ আদর্শ, আর সেই আদর্শকে কার্য্যকরী ক[...] একান্ত আগ্রহ।

ওখান থেকে আমরা সংগ্রহ করেছিলাম প্রায় [...] লাখ টাকার অলঙ্কার।

আমাদের ইচ্ছা ছিল ওই টাকা দিয়ে একটা আ[...]

[...] দেবেশ বলেছিল তারই বাড়ীতে আশ্রম হবে, [...]ধারা নির্ণয় করেছিল রবীন, আর অর্থ সঞ্চয়ের কৃতিত্ব [...]র। কিন্তু অনেক দিন আমি অন্তরীণ থাকার ফলে [...] শুধু সঙ্কল্প হয়ে পড়ে ছিল, কাজ কিছু এগোয় নি। এখন যুদ্ধের বাজারে সেই সোনার দাম হয়েছে তিন [...]—পাঁচ লাখ আজ পনেরো লাখে দাঁড়িয়েছে। সেই [...]কা দিয়ে স্বচ্ছন্দে এখন একটা অনাথ-আশ্রম চালানো [...]ত পারে।

আশ্রমের খরচ এমন ভাবে সীমাবদ্ধ করবে যেন টাকার [...] কোনদিন কারুর কাছে হাত পাততে না হয়। তবে [...]উ স্বেচ্ছায় টাকা দিলে তা কখনও প্রত্যাখ্যান [...]রবে না।

আশ্রমের নাম দেবে 'সন্তান-সঙ্ঘ'।

দরিদ্র ভারতের বাপ-মা-হারা ছেলেমেয়েদের আর [...]কোন পরিচয় নেই।

আজকের এই মন্বন্তরের দিনে অনাহারে সহরের [...]টপাথে শুয়ে যারা মরছে তাদের মধ্যে বালক-বালিকা [...]সংগ্রহ করা কঠিন হবে না।

আমাদের আশ্রমে শুধু লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলে-মেয়েদের উকিল কি ডাক্তার, মাষ্টার না হ'লে কেরাণী তৈরী করা হবে না। সেখানে চরকা ঘুরবে, তাঁত চলবে, গেঞ্জি বোনা হবে, দেশলাইয়ের কারখানা থাকবে। প্রেস, ফার্ণিচার তৈরী, পারফিউমারী, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীও বাদ যাবে না। আর সবার উপর থাকবে সমাজ ও জাতিকে সেবা করার আদর্শ। স্বামিজীর ধর্ম্মবাদ আর কর্ম্মবাদ দুই এসে মিলবে আমাদের আশ্রমবাসীদের মনে।

কুটীরশিল্প থেকে যা আয় হবে তাতেই আমাদের আশ্রমের সব খরচ সুন্দরভাবেই চলে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। যখন কিছু উপরি হবে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে 'সন্তানদের' দেশ-বিদেশ ঘুরিয়ে আনা চলবে।

আশ্রমে ধর্ম্ম বা জাতির বিচার থাকবে না। সন্তানেরা কোরাণ, বাইবেল, গীতা সবই পড়বে, তারপর নিজেদের সত্য নিজেরাই আহরণ করে নেবে। জন্মবৃত্তান্ত ধরে কারুর উপর কোন ধর্ম্ম বা সংস্কার যেন জোর করে চাপিয়ে না দেওয়া হয়। জাত আর ধর্ম্ম মানুষ সৃষ্টি করেছে নিজেদের সুবিধার জন্য, সেই জাত-ধর্ম্মকে বড় করে মানুষকে ছোট করে দেখা চলবে না। মায়ের চোখে সব ছেলেমেয়েই যে সমান!

এইবার টাকার কথা বলি।

আমার কালীঘাটের বাড়ীর ঠাকুর-ঘরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেটাকে স্থানচ্যুত করবে। [এতে কোন পাপ হবে না ; জীবন্ত নরনারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যে নির্জ্জীব পাষাণ দেবতাকে স্থানচ্যুত করায়, আমার মতে, কোন দোষ নেই।] তারপর সেই বেদীর পাথরখানি সরালেই নীচে দেখতে পাবে একখানি সরা। সরাখানি একটি জালার মুখে ঢাকা দেওয়া আছে। সেই জালাটার মধ্যেই আছে যত সোনার অলঙ্কার। মনে রেখো তার প্রতি কণাটি পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের নিরন্ন জনগণের নামে উৎসর্গ করা, নিজেদের ব্যক্তিগত সুখসুবিধার লোভের বশে যেন তার এক রত্তিও অপব্যয় ক'র না। তা হ'লে আমাদের অভিশাপ তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবে, জীবনে কোথাও কোনদিন শান্তি পাবে না।

তবে আশ্রম যদি গড়ে তুলতে পার, সেই আশ্রমের পরিচালক হিসাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য যেটুকু তোমাদের প্রয়োজন তা খরচ করার অধিকার তোমাদের রইল।

বন্দে মাতরম্। ইতি—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ—

পঞ্চদশ কাণ্ড

তারপর।

কয়েক মাস কেটে গেছে।

সত্যেন ও মিনতির জীবনে দেখা দিয়েছে এক নতুন দিনের আলো। নতুন দিনের নতুন সূর্য্য নতুন আলোয় আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের মনের আকাশে।

দু'জনে সন্তান-সঙ্ঘ গড়ে তুলছে।

বিরাট্ অনুষ্ঠান, দু'জনে সারাদিন কাজ করেও কাজের শেষ পাচ্ছে না। জগন্নাথ দেবের রথ এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে।

শীঘ্রই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এই আশ্রমটার উদ্বোধন করবেন। তোমরা সেদিন সদলে আসতে ভুলো না যেন ঠিকানা?

TIGHT BINDING

শিবরতন মুচকি হেসে বললে, 'পরিষ্কার করে বল ম্যান্ ইটার সাহেব! অভদ্র ভাবে হাসা, ভদ্র ভাবে হাসা, না একেবারেই না হাসা, কোন্‌টা?'

চাপা হাসির শব্দে ঘরটা গম্ গম্ করতে লাগলো। তারিণীর কান ততক্ষণে গরম হয়ে গেছে, সে বললে, 'তোমার নামে হেড মাষ্টার মশাইকে নালিশ করতে আমি বাধ্য হবো।'

'জানি তুমি চিরকালের বাধ্য ছেলে। তা নালিশটা কিসের?'

'বিশ্রী ভাবে হেসেছো তুমি!' তারিণী বললে।

'সভ্য হাসি, অসভ্য হাসি, বিশ্রী হাসি, মোট ক'রকম হাসি আছে হে?'

তারিণী আর অপেক্ষা করতে পারলে না, সোজা গেল হেড মাষ্টার মশাইএর ঘরে।

পাঁচ মিনিট পরেই প্রধান শিক্ষক ক্লাসে ঢুকলেন, পেছনে তারিণী।

সবাই উঠে দাঁড়ালো।

'কে গোলমাল করছিলে?' গম্ভীর গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তারিণী শিবুকে দেখিয়ে দিলে।

'এদিকে এসো।' তিনি ডাকলেন, 'গোলমাল করছিলে?'

'কই স্যর, আমরা কেউই ত একটি কথা পর্য্যন্ত বলি নি!' শিবরতন কাছে এগিয়ে এসে বললে।

বাঘের সঙ্গে এমন শান্ত ভাবে কথা বলতে দেখে অন্যান্য ছেলেরা বিস্মিত হল।

'তুমি গোলমাল কর নি?' তারিণী এবারে জিজ্ঞেস করলে।

'কথাটা স্যর, সত্যি নয়;'—শিবু বললে, 'একা একা কখনও গোলমাল করা যায় না। সবাই চুপ করে ছিলো, আর আমিই শুধু চেঁচাচ্ছিলাম এ কি কখনও সম্ভব?'

হেড মাষ্টার মশাই তারিণীর দিকে তাকালেন। তারিণী নিরুপায় হয়ে বললে, 'সবাইকে জিজ্ঞেস করুন স্যর, হাসছিলো কিনা?'

'সবাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন,' শিবু বললে, হাসছিলামই ত! কিন্তু হাসলেই কি গোলমাল করা হয়? তা হলে ঐ দেওয়ালে রামগোপাল বাবুও খুব গোলমাল করছেন, কেননা ফটোতে তিনি খুব হাসছেন।'

'ছবির হাসা নয়,' তারিণী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঐ শব্দে তুমি হাসো নি?'

'না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে শিবরতন।

'জিজ্ঞেস করুন সবাইকে।'

হেড মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন শিবুর হাসি কেউ শুনেছে কিনা। একবাক্যে সবাই উত্তর দিলে—কেউ শোনে নি। সে আগাগোড়াই বই পড়ছিলো এবং তারিণীই চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ করছিলো।

প্রধান শিক্ষক তারিণীর দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি যেই বাইরে গেলেন অমনি শিবু সেই আগেকার মত বিশ্রীভাবে ভীষণ শব্দে হেসে উঠলো। কিন্তু ব্যাপার আর এগোতে পারলো না বেশী দূর, ততক্ষণে টিচার এসে পড়েছেন।

লিজার পিরিয়ডে হাই জাম্প প্র্যাকটিস্ হচ্ছিলো। তারিণী, ভবতোষ, আশু এবং আরও অনেকে এসে জড় হয়েছে। শিবু চুপ করে দেখছিল, হাতে 'থি মাসকেটিয়াস'।

তারিণী গেল সবাইকে ছাড়িয়ে; শিবুর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললে, 'আরে কায়দা আছে! লাফালেই অমনি হল না; কেমন ক'রে ছুটে আসতে হয়, কেমন করে খেতে হয় জাবুক্, সবই আগে আয়ত্ত করতে হয়।'

'আশু! দড়িটা এক ইঞ্চি উঁচু করে ধর,' শিবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখি একবার, পারি কিনা!' আস্তিনটা আর কাপড়টা গুটিয়ে সে খানিকটা পিছিয়ে এলো।

তারিণী হেসে ফেললে, 'প্র্যাকটিস্ না করেই? জলে না নেমে সাঁতার কাটা নাকি?'

শিবু উত্তর না দিয়ে ছুটে গেল দড়ির দিকে, লাফালে সুন্দর এক ভঙ্গীতে, পার হয়ে গেল। সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো।

তারিণীও প্রস্তুত হ'ল লাফাবার জন্যে। বেশ উঁচু, কিন্তু লাফিয়ে সে যাবেই। সে ছুটে এসে লাফিয়ে গেল। কিন্তু ভঙ্গীটা শিবুর মত অত পরিষ্কার নয়।

'আর এক ইঞ্চি।' শিবু বললে।

অসম্ভব! দড়িটা অবিশ্বাস্য রকম উঁচু দেখাচ্ছে, অতখানি লাফাতে চ্যাম্পিয়ানরাও পারে কিনা সন্দেহ! তারিণীর মনেও খটকা লাগলো—সে নিজে অতখানি পারবে কিনা!

'রেডি?' শিবু পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে।

'ইয়েস্।'

শিবু চমৎকার লাফিয়ে গেল।

তারিণীও প্রস্তুত হ'ল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যে সে ঘাবড়ে গেল। ভাববার আর সময় নেই; জোরে ছুটে সে লাফাতে গেল, কিন্তু দড়ির কাছে এসেই থেমে গেল। আবার পিছিয়ে এসে চেষ্টা করলো, পারলে না, পা আটকে গেল।

ভবতোষ বললে, 'শিবু, তারিণীর কাছ থেকে ওর 'লাফানো-শিক্ষা' বইখানা চেয়ে নিস, তা হলে আরও ভালো পারবি।' ও নাকি বই পড়েই হাই জাম্পের করামতিটা শিখেছে!'

কি একটা উপলক্ষে স্কুলে স্পোর্টস্ হবে।

দৌড়ের প্র্যাকটিস্ হচ্ছিল। শিবু ভালো ষ্টার্ট পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তারিণী ছিলো ঠিক পেছনে। দ্বিতীয় রাউণ্ডএ …ক করে সে পা'টা বাড়িয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে শিবু হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু সে শুধু একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। তৎক্ষণাৎ উঠে সে আবার দৌড়তে লাগলো। তখনও …টা রাউণ্ড, রাগে শিবুর সমস্ত শরীর যাচ্ছে জ্বলে, …গতিতে তার বিদ্যুৎ। দ্বিগুণ উৎসাহে সে ছুটছিল। …ন চারজনকে অতিক্রম করে সে প্রায় তারিণীর কাছা-কাছি এসে পড়েছে। শেষ রাউণ্ড; নিঃশ্বাস তাদের ঘন হয়ে এসেছে। শিবু তারিণীকে দিলে মেরে! তারিণী …কেও। ছেলেরা শিবুকে কাঁধে নিয়ে সমস্ত স্কুলটা …বার প্রদক্ষিণ করে এলো। তারিণী লজ্জায় সেখান …ক আস্তে আস্তে সরে পড়লো যেন কেউ না তাকে …তে পায়।

তারপরে আর এক পর্ব্ব।

বিকেলে বাস্কেট বল খেলা হ'ত। তারিণী পুরোনো খেলোয়াড়, তার সমকক্ষ হতে শিবুর বেশ সময় লাগলো, কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার অসম্ভব উন্নতি দেখে তারিণী নিজেই গেল ঘাবড়ে, বোধ হয় এই শেষ আসনটাও তার গেল।

রোজই স্কুল-গ্রাউণ্ডে বল পড়ে, যারা নিয়মিত খেলোয়াড় তারা বাড়ী ফিরেই আবার আসে খেলতে।

সেদিনও এমনি খেলা আরম্ভ হয়েছে, তারিণী আর শিবু বিপক্ষে খেলছে। বল কাড়বার ভঙ্গী দেখেই শিবু বুঝতে পারলে ওর মতলব সুবিধের নয়। কিন্তু শিবুকে কোন রকমেই আটকাতে পারে না—বার বার চেষ্টা করেও। আগাগোড়া তারিণীর লক্ষ্য ছিলো শিবুকে 'গার্ড' করে তার খেলাটা নষ্ট করে দেওয়া। একবার বল নিয়ে যেই ও এগোতে যাবে—তারিণী গেল ছুটে, বল কাড়বার ছলে শিবুর চিবুকে ঘুঁষি চালিয়ে দিলে, যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে শিবু বসে পড়লো।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হল খেলা। তারিণী শার্ট গায়ে দিয়ে চটিতে পা ঢোকাচ্ছিলো, শিবু বাঁ হাতে তার জামার কলারটা চেপে ধরে বললে, 'খেল্‌তে খেলতে ঘুঁষি চালালে কেন?'

'বেশ করেছি। জামা ছাড়ো।' তারিণী তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে। শিবু হাত ঘুরিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মারলে ওর নাকে, সে ছিট্‌কে পড়লো কয়েক হাত পেছনে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সামলে নিয়ে এগিয়ে এলো শিবুর দিকে। শিবু প্রস্তুত হয়েই ছিলো, তারিণী হাত তোলবার আগেই সে তেমনি জোরে আর একখানা ঘুঁষি কসিয়ে দিলে তার মুখে, নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো রক্ত!

কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াতে পারলো না, কেননা—দু'দিক থেকে সবাই এসে দু'জনকে হটিয়ে দিলে।

আরও কয়েক মাস কেটে গেছে তারপরে।

তারিণী আর শিবুর মধ্যে শুধু যে কথা বন্ধ তা নয়, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ।

কয়েক দিনের মধ্যেই ইনটার স্কুল টুর্ণামেণ্ট আরম্ভ হ'ল। ক্লাস নাইন্ সব ক'টা টিম্‌কেই হারিয়ে দিলে একে একে। কিন্তু তা শুধু শিবুর অসাধারণ খেলার গুণে। সব চাইতে চমৎকার কম্‌বিনেশন্ হয়েছিলো তারিণী আর শিবুর মধ্যে।

কলেজ আর স্কুলের এক্‌জিবিশন্‌ গেম প্রতি বছরেই হয়, এবারেও হবে। খেলোয়াড় বাছাই হতে লাগলো। ক্লাস্‌ টেন্‌ থেকে গেল তিন জন, ক্লাস্‌ এইট্‌ থেকে একজন, আর বাকী থাকে একজন,—তারিণী আর শিবুর মধ্যে শিবুই চান্সটা পেয়ে গেল—যদিও তারিণীকে নেবার যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিলো।

এই গেম্‌টায় খেল্‌তে পারা পরম সৌভাগ্য এবং সম্মান। স্কুল কলেজের সমস্ত ছাত্রেরা তো দর্শক থাকবেই, এমন কি বহু বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করা হবে খেলা দেখবার জন্য! যে পক্ষ জিতবে তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে একখানা করে পদক, আর যে খেলবে সব চাইতে ভালো—তাকে দেওয়া হবে আর একখানা।

শিবু আনন্দে মসগুল। তার ইচ্ছে হল তারিণীর সঙ্গে সে যেচে কথা বলে। আর তারিণী বাইরে কিছু প্রকাশ করলো না বটে, কিন্তু তার মুখ দেখেই অনুমান করা যায় তার মনের অবস্থা।

বিকেল পাঁচটার সময় খেলা আরম্ভ হবে, সকাল থেকেই চলেছে নানা জল্পনা-কল্পনা। আশা এবং আনন্দে, উত্তেজনা আর সম্ভাবনায় যারা খেলবে না তাদেরও অন্তর দুলছে। শিবুকে ঘিরেই যত কলরব আর গুজব, তারিণীর কথা আর কারুর মনে নেই।

ছুটির পর শিবু গেল স্কুল-গ্রাউণ্ডের দিকে, হঠাৎ চোখে পড়লো কৃষ্ণচূড়া গাছটায় ঠেস দিয়ে একাকী বসে আছে তারিণী, বইগুলো তার ছড়ানো ইতস্ততঃ। বিস্মিত হল সে, নিঃশব্দে পা টিপে টিপে তারিণীর পেছনে এসে দাঁড়াল শিবু। তারিণীর গাল বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ছে! কয়েক মুহূর্ত্ত শিবু দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে—নিস্পন্দের মত। তারপর তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এলো।

খেলা আরম্ভ হবার মিনিট দশেক আর দেরী আছে। গ্রাউণ্ডে লোক আর ধরে না। বিশিষ্ট দর্শকরা তাঁদের চেয়ারগুলো দখল করেছেন আগে থেকেই।

কলেজের খেলোয়াড়রা নামলো; চারিদিক থেকে পড়তে লাগলো হাততালি, চীৎকার আর গোলমালে কানের পর্দ্দা বোধ হয় ফেটে যাবে।

স্কুলের খেলোয়াড়রা তৈরী, কিন্তু শিবুর দেখা ... সবাই উঠলো উৎকণ্ঠিত হয়ে, ছুটোছুটি করতে লা... এদিক্‌ সেদিক্‌।

আর পাঁচ মিনিট। রেফারি বাজিয়ে দিলে ... প্রথম হুইসেল। শিবুর পাত্তাই নেই। দু'জন ছু... সাইকেলে তার খোঁজ নিতে। গেটের বাইরে ... দাঁড়ালো কয়েকজন।

দেখা গেল দূরে একখানা রিক্সায় শিবু আসছে, পা... ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সবাই ঘিরে ধরলো তাকে। ছেলে... কাঁধে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে সে নেমে পড়লো রি... থেকে, তার মুখে ফুটে উঠলো যন্ত্রণার কয়েকটি রেখা।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েক পা এগিয়ে এসে সে ... গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'তারিণী আসে নি? আমি খেল... পারবো না। সিঁড়ি থেকে পড়ে ভীষণ পা মচ্‌কে গে... মাথা যে বেঁচেছে এই ঢের! তোরা দেখিস্‌ নি কে... তারিণীকে?'

ছোট্‌, ছোট্‌। খুঁজে বার কর তারিণীকে। ওকে... যদি না পাওয়া যায় তা হলে খেলা না খেলা সমান।

রেফারি বাজিয়ে দিলে শেষ হুইসেল; একজ... খেলোয়াড় দৌড়ে গিয়ে বললে, 'দু'মিনিট স্যর, আমাদে... একজন প্লেয়ার উন্‌ডেড্‌, অন্য একজন খেলোয়াড়কে খুঁ... বার করতে হবে।'

কিন্তু কোথায় তারিণী?

শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল তাকে, ভীড়ের মধ্যে এক... কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

'তারিণী, শীগ্‌গির!'

অবাক্‌ হয়ে গেল সে, খেলতে পাবে! সত্যি?

'আঃ, কি মুস্কিল! হাঁ করে তাকিয়ে আছো কি! শীগ্‌গির এসো, এই নাও প্যাণ্ট, পরে নাও।'

প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে নিতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত লাগলো তারিণীর। দূরে তাকিয়ে দেখলে শিবু খোঁড়াচ্ছে... পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আবার হুইসেল বাজলো; খেলা আরম্ভ হল। তারিণীই প্রথমে বল ধরে এগোতে লাগলো। একজন ছুটে এলো তাকে গার্ড করবার জন্যে, সে বোর্ডের নীচে তাকিয়ে দেখলে তাদের দলের কেউ নেই। খানিক...

...কেই সে থ্রো করলে, ভাগ্যক্রমে 'স্কোর' হয়ে গেল। ...া প্রচণ্ড হাততালি, চারদিক্‌ থেকে অসম্ভব একটা ...-ধ্বনি! তারিণী অবশ্য কখনই আশা করে নি অত ...কে সে ... করতে পারবে। আর—শিবু সেই যে ...থেকেই হাততালি আর চীৎকার আরম্ভ করেছে— ...মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নেই।

খেলা চলতে লাগলো। তারিণী খেল্‌ছে আশ্চর্য্য। ...রওয়ার্ডের প্লেয়ার কিন্তু খেল্‌ছে সমস্ত মাঠটা চষে। প্রতিপক্ষও খেলছে খুব জোর। তারা কলেজের ...লে, তারপর সব ক'টিই সমান জোয়ান, স্কুলের ছেলেরা ...দের সঙ্গে দমে এঁটে উঠতে পারছে না। দেখতে ...খতে কলেজের পয়েণ্ট বাড়তে লাগলো—দুই, চার, ছয়, ...ট, নয়, এগারো। তবু হাফ্‌ টাইমের আগে স্কুল কোন ...নে সাত পয়েণ্ট করতে পারলো, তাও অনেক কষ্টে, ...তে গেলে জান কবুল করে।

হাফ্‌ টাইমে শিবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে সবাইকে ...ব উৎসাহ দিয়ে বললে, 'জেতা চাই কিন্তু!'

আবার আরম্ভ হ'ল খেলা। তারিণী আর একখানা ...ার করলে, স্কুলের নয় হ'ল।

বল কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে হঠাৎ স্কুলের একজন ...ট্‌কে পড়লো মাটিতে, হাঁটুতে লাগলো ভীষণ চোট, ...থায় সে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। দাঁড়াবার শক্তিও ...তার রইল না। রেফারীকে হুইসেল বাজিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ রাখতে হ'ল। আহত 'খেলো-...াড়কে ধরাধরি করে মাঠের বাইরে আনা হল; আর ...সে খেলতে পারবে না।

সর্ব্বনাশ! কি হবে এবারে? রেফারী এদিকে ঘন ...ঘন বাঁশী বাজাচ্ছেন। খেলোয়াড় পাওয়া যায় কোথা? ...ক'জন আছে তাদের দিয়ে খেলানো চলে না। চার...জনেই শেষ কালে খেলতে হবে নাকি?

রেফারী আবার বাঁশী বাজালেন। ভিড়ের মাঝখান ...থেকে শিবু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়লো। পায়ের ব্যাণ্ডেজটা এক টানে দিলে ছিঁড়ে, 'কই, গেঞ্জি কোথা?' ...চেঁচিয়ে উঠলো। শার্ট খুলে গেঞ্জি পরে নিতে তার কয়েক সেকেণ্ড মাত্র লাগলো। ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো সে সেণ্টারে। পা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, খুঁড়িয়ে চলবার চিহ্ন মাত্র নেই! ব্যাপারটা সবাই বুঝে ওঠবার আগেই সে বললে, 'ইয়েস্‌ স্যর্‌, রেডি।'

রেফারী বল ছুঁড়ে দিলেন ওপরে, শিবু প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে বল ধরে ফেললে, পাস্‌ করলে তারিণীকে। তারিণী বিপক্ষের একজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে দিলে শিবুকে, তার পর বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল বোর্ডের নীচে। কাণ্ড দেখে সাবাই গেল হকচকিয়ে। এই ত, এক মিনিট আগেও ছোঁড়া খোঁড়াচ্ছিলো! শিবুকে বল নিতে দেখে তিন জন এক সঙ্গে ছুটে এলো তার দিকে; নিমেষে বলটা নিয়ে পিছিয়ে এলো সে, চোখের নিমেষে ড্রিব্‌ল্‌ করে ফিরে গেল সেণ্টারে। তারিণীও ততক্ষণে সেণ্টারের দিকে পিছিয়ে এসেছে। শিবু ওকে বল পাস্‌ করে বোর্ডের নীচে চলে এলো। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে তারিণী তার দিকে বল ছুঁড়লে; ডিফেন্সের একজন বলটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালে, শিবু চিলের মত ছোঁ মেরে বলটা ধরে ফেল্‌লে, ছুঁড়লে বোর্ড লক্ষ্য করে; স্কোর! হাততালি উঠলো চারদিক্‌ থেকে, রেফারীর বাঁশীর শব্দ শোনাই গেল না।

আবার আরম্ভ হ'ল খেলা।

শিবু আর তারিণীর অদ্ভুত কম্‌বিনেশন্‌, ওরা একেবারে অপরাজেয়। আর শিবু খেলছে মারাত্মক, বিদ্যুতের মত তার গতি, হরিণের মত তার ক্ষিপ্রতা। তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তারিণীকেও হতে হয়েছে অসাধারণ ক্ষিপ্র আর আশ্চর্য্য কুশলী। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে তাদের দু'জনের দিকে।

শিবুর হাতে আবার বল এলো। স্বচ্ছন্দে সে 'ট্রাই' দিতে পারতো কিন্তু দিলে সে তারিণীকে একটা সুযোগ তারিণীও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে। আবার সে... কান-ফাটা চীৎকার আর জয়-ধ্বনি। স্কুলেরও এগারো যাচ্ছে,—সমান সমান।

শিবু নামবার আগে অন্য চারজন খেলোয়াড় এক... ঝিমিয়ে পড়েছিলো, সে গ্রাউণ্ডে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে দেখা দিলো একটা বিদ্যুৎ-প্রেরণা, প্রত্যেকেই ভালো খেলতে আরম্ভ করলে।

খেলা শেষ হবার আর এক মিনিট মাত্র বাকী। শি...

তারিণীর কাছ থেকে বল পেয়ে আর একখানা জোর করলে। রেফারী বাজিয়ে দিলে বাঁশী। খেলা শেষ হয়ে গেল, স্কুল জিতলো।

শিবু ছুটে এসে তারিণীর দিকে তান হাতখানা বাড়িয়ে দিলে; তারিণী তাকে একেবারে টেনে আনলে মধ্যে। আর কারুর কথা তারিণী জানে না—সে বুঝতে পেরেছিলো শিবু কেন পায়ে ব্যাণ্ডেজ অসুস্থতার ভান করেছিলো।

পূর্ণিমা

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার, এম্.এ, বি-এল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অপর দিক হইতে রাধা সহ সখীগণের প্রবেশ।

ললিতা। ছি ছি ছি ছি, কি অপমান, কি অপমান!

বিশাখা। এমনি করে আমাদের মুখ হাসিয়ে গেল গা!

রাধা। (হাসিয়া) এর মধ্যে আবার মান অপমানের কথাটা কি হল বল দেখি?

ললিতা। অপমান নয়! একশ'বার অপমান! আমরা তার জন্তে সব কাজ ফেলে ছুটে এলাম আর সে কিনা কোথাকার কতকগুলো আহ্লাদী মেয়ে জুটিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে চলে গেল! আমাদের কথা একবারও ভাবলে না! আর ঐ মেয়েগুলোও কি তেমনি খোসামুদে! —"প্রভু, তুমি যা আদেশ করবে তাই হবে।"—আহাহাহা, মরে যাই আর কি!

রাধা। আমি তো আগেই বলেছিলাম যে ছলনাময়ের সঙ্গে ছলনায় জেতা সোজা নয়। হেরে গিয়েছিস, এখন হার স্বীকার কর। তা নয়, উল্টে রাগ করলে লোকে আরো বেশী করে হাসবে যে!

বিশাখা। কেন, আমরা হার মানবো কেন? আমরা লুকিয়েছিলাম, যদি খুঁজে বার করতে পারতেন নিশ্চয় হার মানতাম। তা' নয়, কতকগুলো প্যাঁচামুখী মেয়েকে আমাদের মত করে সাজিয়ে এনে আমাদের নাম করে করে তাদের ডাকা। এ কি আবার একটা খেলা? এ তো ইচ্ছে করে আমাদের অপমান করা।

ললিতা। তুমি তো বলবেই রাধা! তোমার তো আর গায়ে লাগে নি। আসত যদি একজন রাধা সেজে আর কৃষ্ণ দাঁড়াতেন তার পাশে বাঁকা হয়ে তা হলে দেখতাম তুমিই বা কি বলতে!

চম্পক। ভাই ললিতা, এ অপমানের শোধ নি[তে] হবে।

ললিতা। নিশ্চয় শোধ নিতে হবে।...উঃ, রা[গে] আমার গা জলছে। যে মেয়েটা ললিতা সেজেছিল তা[র] আস্পর্দ্ধা দেখেছিস্...তবু যদি তার গায়ের রংটা আ[মার] মত হ'ত!

চম্পক। কেন ললিতা, গায়ের রং তো তোরই মত[ই]।

ললিতা। আমারই মত!...তুই বলছিস এ কথা! ওয়ে, মুখময় কদম্বরেণু মেখে এসেছিল যে, তুই তা দেখেছিস। কিন্তু যার চোখ আছে সেই বলবে যে আ[র] রং আমার চেয়ে ঢের ঢের ময়লা।

চম্পক। তা ভাই, তুইও তো মুখে কদম্বরেণু ক[ম] মাখিস নি!

ললিতা। শুনলি? তোরা সবাই শুনলি? আচ্ছা, বল তো বৃন্দা, তুইই বল্। ওই নকল-ললিতার গায়ে[র] রং আমার মত?

বৃন্দা। তা...না...তা...

ললিতা। বল্ না। সত্যি কথা বলবি তার আ[বার] ভয় কিসের?

চম্পক। তুই ওকে যেমন করে শাসাচ্ছিস, তাতে কি আর ওর সত্যি কথা বলবার সাহস আছে?

ললিতা। দেখ চম্পকলতিকা, তোর গায়ের রং এক[টু] কটা বলে মাটিতে আর পা পড়ে না, না?...আচ্ছা, আমি না হয় 'কদম্বরেণু মাখি কিন্তু তোর ঐ বিনুনিটা এই সবা[র] সামনে খোল তো দেখি? সবাই দেখুক, তার মধ্যে কতখানি তোর নিজের চুল আর কতখানি ধার করা।...

বিশাখা। আহাহা, চেপে যাও ললিতা, চেপে যাও। [বে]শী ঘাঁটাঘাঁটি করলে অনেকেরই অনেক কথা বেরিয়ে [পড়]বে।

ললিতা। কিন্তু ভাই, তোমরাও এর একটা বিচার [ক]র।

বিশাখা। তা, আমাকে যদি সত্যি কথাই বলতে হয়, তা হলে বলি, ওর গায়ের রং যা দেখলাম সে ঠিক তোরই মত।

চম্পক। শুধু গায়ের রং কেন, সব দিক দিয়েই অবিকল ললিতা।...কিন্তু যে চম্পকলতিকা সেজেছিলো, তার নাকটা কি রকম দেখেছিস?...ওই রকম চ্যাপ্টা নাক নিয়ে এসেছেন আমাকে নকল করতে!

বৃন্দা। তা হলে আমিও একটা কথা না বলে থাকতে পারলাম না ভাই!...বলি, নিজের নাকটি কি কখনো আরসিতে দেখা হয়?

চম্পক। (রাগিয়া) হয়, খুব দেখা হয়। তোমার না হয় নাকটি আছে ভাল, তাই বলে আমার নাকটিও কিছু বানের জলে ভেসে আসে নি।

বৃন্দা। বালাই, বানের জলে ভেসে আসবে কেন, পুষ্পকরথে চড়ে এসেছিল। তবে কিনা, হঠাৎ একবার রথের চাকার তলায় পড়ে গিয়েছিল, সেই জন্তে এই দশা!

চম্পক। কি, এত বড় কথা! আমার নাক চাকা-চ্যাপ্টা, আর তোর নাক বুঝি মোহন-বাঁশী? অত গরব করিস নে লো করিস নে। তবু যদি মুখখানার মধ্যে নাক ছাড়া আর কোন পদার্থ থাকত!

বিশাখা। বেশ, তোরা যদি এমনি করে নিজেরাই ঝগড়া করবি তবে কৃষ্ণকে জব্দ করবি কি করে?

চম্পক। হাঁ হাঁ, তাই তো, তাই তো। চেহারার কথা এখন থাক। কৃষ্ণের চতুরালির শোধ কি করে দেওয়া যায় সবাই মিলে সেই কথাই ভাব।

বৃন্দা। তোরাই তো বাপু চেহারার কথা তুললি। আমি তো একটি কথাও বলি নি। কিন্তু, কারু চেহারা যদি না মিলে থাকে তবে সে আমার! দাঁতগুলো মূলোর [ম]ত, চোখ দুটো কুতকুতে।

[বিশাখা ও ললিতা কানাকানি করিয়া হাসিতে লাগিল।]

কি তোরা হাসছিস যে বড়?

বিশাখা। হিঃ হিঃ হিঃ, না, কিছু না, হিঃ হিঃ হিঃ।

বৃন্দা। নাঃ, কিছু নয়! আমি কিছু বুঝি না, না? বিশাখা, সাহস যদি থাকে তবে সামনা সামনি বল।

বিশাখা। না, বলছি কি, তোর দাঁতগুলোও তো নেহাৎ ডালিমদানা নয়...আর চোখ দুটোও ঐ যা বললি...

বৃন্দা। বটে? আর তোর নিজের চেহারা...

বিশাখা। আমার ভাই, তোদের মত অত চেহারার গরব নেই। তবে কিনা চেহারা মিলুক আর না মিলুক, ওর হাঁটবার ভঙ্গীটা কি অদ্ভুত! দেখলে গা জ্বালা করে। অনেকটা এই রকম...

[ললিতা সহসা অত্যন্ত হাসিতে লাগিল।]

বৃন্দা। কি রে ললিতা, অত হাসছিস যে?

ললিতা। হিঃ হিঃ হিঃ, আমরা কি বোকা! হিঃ হিঃ হিঃ।

চম্পক। কেন, কেন?

ললিতা। ছি ছি, এই কথাটা এতক্ষণ বুঝতে পারি নি! হিঃ হিঃ হিঃ।

[বি]শাখা। আরে, কি বুঝেছিস্ তাই বল না?

ললিতা। এ ত' সেই চতুরের আর এক চতুরালি!

বিশাখা। কেন কেন, সে কি রকম?

ললিতা। বলছি শোন্।...আমাদের সবারই তো এই মত যে আর সবারই চেহারা মিলেছে শুধু নিজেরটি বাদে, কেমন? আর সেই মনে করে আমরা আশ মিটিয়ে চেহারার খুঁত বের করেছি।...কিন্তু আসল কথা কি জানিস?...চেহারা সবারই ঠিক আছে, শুধু এই কৌশলে আমাদের নিজেদের মুখ থেকে নিজেদের নিন্দে করিয়ে ছাড়লেন। এই হল চতুরালির দ্বিতীয় দফা!

সকলে। তাই তো, তাই তো, বড্ড জব্দ করেছে তো!

ললিতা। না, এ রকম করে হবে না। তোরা সবাই বস্ তো। বসে বসে ভাবতে থাক। একটা উপায় বের করতেই হবে।

[সকলে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকিল।]

চম্পক। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? চল্, আমরা সবাই আজ ঘরে ফিরে যাই। থাকুন উনি একলা পড়ে।

ললিতা। আহাহা, কি কথাই বললে! একা থাকবে কেন? সেই প্যাঁচামুখীর দলকে আবার জুটিয়ে নেবে!

(ক্রমশঃ)

শ্যামের যমজ এং-চ্যাং

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যমজ ভাইবোন হয়তো অনেক আছ। যমজদের মধ্যে চেহারায়, চালচলনে, এমন কি বুদ্ধিশুদ্ধিতেও অনেক সময় আশ্চর্য্য রকম মিল দেখা যায়। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা নানা রকম পরীক্ষা করে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন অনেক বছর আগে রামধনুতে সে সম্বন্ধে কিছু লেখা হয়েছিল। সেই সঙ্গে 'শ্যামদেশের যমজের' কথাও বোধ হয় বলা হয়েছিল। 'শ্যামদেশের যমজ' বলতে কি বোঝায় জান তো? যমজ ভাই বা বোন যদি একে অপরের দেহের সঙ্গে যোড়া থাকে, তবে তাদের ঐ নাম দেওয়া হয়। কলকাতায় শেষ যেবার কংগ্রেস হয় সেবার সেই সঙ্গে একটা একজিবিশনও হয়েছিল। সেই একজিবিশনে এই রকম দু'টি মারাঠি 'শ্যামদেশের যমজ' বোনকে দেখান হয়েছিল। তাদের নাম ছিল গঙ্গাবাঈ আর গৌরীবাঈ। তাদের শরীর একত্র যোড়া থাকায় তাদের একসঙ্গে সব কাজ—হাঁটা-চলা, ওঠা-বসা ইত্যাদি করতে হ'ত। যদিও তারা কথা বলত দু'মুখে। এদের নিয়ে, বেশ মনে পড়ে, তখন কলকাতায় বেশ হৈ-চৈও হয়েছিল।

তোমাদের মনে যে প্রশ্ন উঠছে এবার তার জবাব দেব। 'মারাঠি' হ'লে আবার তারা 'শ্যামদেশের' হবে কি ক'রে? অথবা যোড়া মানুষ হ'লেই তাদের শ্যামদেশের যমজ বলতে হবে এরই বা কি মানে আছে?

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই: আগে এই ধরণের যোড়া মানুষের কথা কেউ কোনদিন শোনে নি। ১৮১৯ সালে একজন আমেরিকান্ নাবিক শ্যামদেশের এক গ্রামে এই ধরণের এক যোড়া মানুষ আবিষ্কার করে। ব্যাপারটা নিয়ে তখন সারা পৃথিবীতে দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যায়। এই যোড়া ভাইকে বলা হ'ত 'সিয়ামিজ্ টুইন্স' বা 'শ্যামদেশের যমজ'। সেই থেকে ঐ রকম যোড়া মানুষ মাত্রকেই 'শ্যামদেশের যমজ' ব'লে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এর পর নানান্ দেশে এই ধরণের যোড়া-মানুষ আরও কিছু কিছু দেখা গেছে, তবে প্রকৃতির রাজ্যে যে এ রকম বৈচিত্র্য খুব বেশী হ'তে পারে না তা তো বুঝতেই পার।

১৮১৯ সালে শ্যামদেশে যে যমজ ভাইদের আবিষ্কার করা হয়েছিল সম্প্রতি তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। সেই কথাই কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে তোমাদের শোনাব।

শ্যামদেশে জন্মালেও আসলে কিন্তু এদের 'সিয়ামিজ' বলা চলে না। কারণ এদের বাপ ছিল চীনা এবং মাও ঠিক পূরোপূরি শ্যামের লোক নয়। বড় হয়ে এরা নিজেরাও আমেরিকাতে গিয়েই ঘর-বাড়ী করে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার নাগরিক বলেই চলে যায়।

দু' ভাই। শরীর একত্র যোড়া থাকলেও আসলে তারা দু'টি মানুষ। কাজেই নামও ছিল তাদের দু'টি—চ্যাং ও এং। সমস্ত শরীরই দু'জনের আলাদা, শুধু বুক থেকে পেট পর্য্যন্ত খানিকটা জায়গা ইঞ্চি ৩।৪ মাংসের ফালি দিয়ে যোড়া। একমাত্র ঐ মাংসপিণ্ডের মাঝখানে আঘাত করলেই তা দু'ভাই একত্র টের পেত। না হ'লে একের শরীরে আঘাত লাগলে অপরে তা অনুভব করতে পারত না। বড় হয়ে আবার এং হয়ে গেল ইঞ্চি খানেক বড়। এতে হাঁটতে অসুবিধা হ'ত বলে চ্যাংকে উঁচু হিলের জুতো পরে নিজেকে ভাইয়ের সমান লম্বা করে নিতে হয়েছিল।

শরীর এমন কিম্ভূত কিমাকার ভাবে যোড়া থাকলে কি হবে, খেলাধূলায়, দৌড়ঝাঁপে দু'ভাই ছিল খুবই ওস্তাদ্। সাঁতার কাটা, দৌড়ান, বল্ খেলা থেকে আরম্ভ করে শিকারে যেতেও তারা কসুর করত না। একবার শিকারে গিয়ে দু'ভাই একটা বড় জাগুয়ারের

সামনে পড়ে। একজনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'লে অপরের গুলিতে সেটি নিহত হয়। এ গল্প তারা অনেকের কাছেই করত। এরা কথা বলত দু'জনে এক সঙ্গেই, তবে সাধারণতঃ একে কথা সুরু করলে অপরে তা শেষ করত। তারা বলত—তারা সর্ব্বদা সব জিনিষ এক ভাবে দেখে, এক ভাবে ভাবে, তাই পরস্পরের মধ্যে কচিৎ কখনও ছাড়া কথা বলার দরকার হয় না। তবে মাঝে মাঝে যে তাদের মনোমালিন্যও হ'ত না তা নয়। বড় হয়ে একবার তারা ভোট দেবার অধিকার পেয়ে দু'ভাই দু'জনকে ভোট দিয়ে এসেছিল।

আমেরিকান্ নাবিক যখন তাদের আবিষ্কার করে তখন তাদের বয়স আঠারো বছর—অর্থাৎ সবে সাবালক হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে প্রায় কিছুই তাদের জানা নেই। নাবিক দেখল এদের নিয়ে তো বেশ দু' পয়সা রোজগার করা যেতে পারে! সে তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এল নিজের দেশে। তার পর সুরু হ'ল তাদের নানা দেশ ভ্রমণ। যেখানে যায়, বিধাতার এই আশ্চর্য্য সৃষ্টি দেখবার জন্য লোক ভেঙ্গে পড়ে—টিকেট বিক্রী করে কুলোনো যায় না। দেখতে দেখতে নাবিকের পকেট বেশ ভারী হয়ে উঠল। তারা আবার আমেরিকায় ফিরে এল।

ভাই দু'টি এত দিনে বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছে, দুনিয়ার আদব-কায়দা, হালচাল জানতে তাদের আর বাকী নেই। বেশ কিছু মোটা রকম টাকা তারাও জমিয়েছে, কাজেই এখন তারা আর কারও অধীন থাকতে রাজী হ'ল না। সেই থেকে দুই ভাই স্বাধীনভাবে নিউ-ইয়র্কেই বসবাস সুরু করল।

এর পর যে ঘটনা ঘটল তা কিন্তু বাস্তবিকই বড় অদ্ভুত। ইংলণ্ডের একটি মেয়ে—ভদ্র ঘরেরই মেয়ে, দু'ভাইকে বিয়ে করবার জন্য উঠল ক্ষেপে। ডাক্তারেরা এবং বড় বড় আইনজ্ঞরা পরীক্ষা করে বললেন,—তা কি করে হবে?—এরা যে দু'টি মানুষ! দুই স্বামীর এক স্ত্রী—একি কোন সভ্য সমাজে চলে?—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের বা আমেরিকার আইনে খৃষ্টানদের মধ্যে তো এ হতেই পারে না! সে মেয়েটি মনের দুঃখে বিদায় নিল, কিন্তু এবার এগিয়ে এল আমেরিকারই দু'টি মেয়ে—দু' বোন—ইয়েট্স্ আর য়্যান্। তারা বলল, 'আমরা দু' বোন দু'ভাইকে করব। এবার তো আইনে আটকাতে পারবে না?'

শেষ পর্য্যন্ত সেই অদ্ভুত কাণ্ডই ঘটল। শুভ শুভক্ষণে যোড়া ভাইএর সঙ্গে দুই বোনের বিয়ে গেল। বলা বাহুল্য বোনেরা অবশ্য যোড়া ছিল না।

বিয়ের সময় বোনে বোনে যে রকম ভাব আর উ দেখা গিয়েছিল বিয়ের কিছু পরেই কিন্তু সেটা আর না। সংসারে দেখা দিল নানা গণ্ডগোল। চ্যাং ব্যাপার দেখে নিজের নিজের স্ত্রী আর শালীকে পৃথক্ তৈরী করে দিল। তাও পাশাপাশি নয়—বেশ দূরে

কিন্তু বৌয়েরা আলাদা থাকলে কি হবে, ভাইয়েরা আর আলাদা হতে পারে না—ভগবান্ই যে সে রাখেন নি! অস্ত্রোপচার করে দু'ভাইকে আলাদা কথাও উঠল—কিন্তু ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে এক বল্লেন তা হ'লে কাউকেই বাঁচান যাবে না। চ্যাং ও এং সপ্তাহে তিন দিন করে এক এক বা থাকবার ব্যবস্থা করে নিল।

দেখতে দেখতে ত্রিশ বছর কেটে গেল। ইা দু'ভাইয়ের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়েছে—বারোটি,—তার মধ্যে সাতটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে; ১০টি, তাদের মধ্যে মেয়েই বেশী,—৭টি, ছেলে এদের মধ্যে চ্যাংএর দুটি ছেলেমেয়ে ছাড়া বাকী কুি সব দিক্ দিয়ে নিখুঁত।

এং-চ্যাংএর শেষ জীবন কিন্তু বড় দুঃখের সময় আমেরিকায় বাধল গৃহযুদ্ধ। তারা যে দলে দিয়েছিল তাদেরই হ'ল হার। সর্ব্বস্ব খুইয়ে গরীবের মত অল্পসল্প চাষবাস নিয়ে তাদের চলতে লাগল।

তারপর একদিন দু'ভাই বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ী দু'জনেরই বয়স হয়েছে ৬৩,—বেশ বুড়োই বল পারে। চ্যাং-এর আগেই বেশ সর্দ্দীকাসি হ যদিও ছেলেবেলা থেকে দু'জনেই সব সময় প্রায় এ এক রকম ব্যারামে ভুগত কিন্তু সময় সময় যে তার হ'ত না তা নয়। এদিনও হ'ল তাই। এং সুস্থ দুপুর রাতে চ্যাং উঠে ছট্‌ফট্ করতে লাগল, ত ভীষণ ব্যথা,—শুতে পরছে না। এং-এর কিন্তু

TIGHT BINDIN

ছে। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত দু'জনেই শুয়ে পড়ল—
ণ একজন শুলে অপরের বসবার উপায় নেই।
রের দিকে এং-এর ছেলে এসে ডাকলে। ভয়চকিত
বল্লে, "এ কি? কাকার গা এত ঠাণ্ডা কেন?"
ত বলতে এং লাফিয়ে উঠল। সত্যিই তাই, চ্যাং
নেই—চ্যাং মারা গেছে।
এং-এর পক্ষে সময়টা কি ভীষণ ভাব দেখি! তার
হের সঙ্গে ঝুলছে এক অসাড় মৃতদেহ। এং বুঝল
কও অল্পক্ষণের মধ্যেই যেতে হবে—কারণ ও রকম
মৃতদেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে
আর অস্ত্রোপচারেরও তো উপায় নেই। আতঙ্কে ও উত্তেজনায় সে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়, ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে তাকেও ভাইএর অনুসরণ করতে হ'ল।

বলা বাহুল্য বিজ্ঞানের খাতিরে জীবিতাবস্থায় পার পেলেও এং-চ্যাংএর মৃতদেহ ডাক্তারের ছুরির হাত থেকে রেহাই পেল না। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দু'ভাইএর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হ'ল। সংগৃহীত হ'ল যমজের দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য। আর সেই সঙ্গে দেখা গেল—চ্যাং ঠাণ্ডা লেগেই মারা গেছে, কিন্তু এং-এর কোন রোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! ডাক্তারেরা অনুমান করলেন আতঙ্কেই বেচারার মৃত্যু হয়েছে।

যা ছিল সবার মনে—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

২

পর সেদিন—
ভার আয়োজন করলেন মৌচাক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত
সরকার মশায় তাঁর বাড়ীতে।
এত সভার কথা শুনে মনে করো না সেখানে
ত্যিক, সম্পাদক ও শিল্পীরা সব যান মনের আশ মিটিয়ে
ছেড়ে, হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা করতে। এ সব সভায়
হয় না আদৌ। যা হয় তা পরামর্শ ও পরিকল্পনা।
একটা প্রতিষ্ঠান, যা বেঁচে থাকলে বাঙালী জাতি
য়ে গর্ব্ব করতে পারবে, তা কি এক কথায়, এক
একটি লোকের চেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে? তার
ই অক্লান্ত শ্রম ও চিন্তা, ঐক্য ও টাকা, আর চাই—
—এই সব কি করে সংগৃহীত হ'তে পারে সভায়
মিলে তারই জল্পনা-কল্পনা করা হয়ে থাকে। আর
জল্পনা ও কল্পনা মনের মাঠেই মারা যায় না, কিছু
ণ সফলও হয় এবং হচ্ছেও।
ভা বসেছিল তে-তলার ঘরে। এবার কিন্তু সভায়
ডাক পড়লো। গেলামও। একতলা থেকে সিঁড়ি
ওপরে উঠ্‌ছি, কিন্তু কাউকেই দেখছি না; সাদা
সিঁড়িগুলো ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। খানিক দূর উঠেই কেমন খটকা লাগলো, মনে হ'ল, ঠিক কলকাতার উপকণ্ঠেই আছি তো? জায়গাটা দিল্লী নয়? আর কুতুব-মিনারেও উঠছি না? আবার উঠতে লাগলাম। পরিশেষে কতকগুলি কণ্ঠস্বর কানে এল; এবং আরও কয়েকটা ধাপ উঠেই দেখি সামনে বাঁ দিকে একটি দরজা; তার বাইরে হরেক রকমের কতকগুলো জুতো,—কাৎ হয়ে, চীৎ হয়ে, দু'একটা উপুড় হয়েও পড়ে আছে,—আর ঘরের ভেতর থেকে আসছে কথাবার্ত্তার ও হাসির আওয়াজ। আর আসছে সিগারেটের ধোঁয়া, চায়ের পেয়ালা ও চামচের টুংটাং ধ্বনি—ঠিক বুল্‌বুলের ডাকের বা মৌমাছির গুঞ্জনের মতো নয়, তবে বেশ রসমাখা।

জুতো খুলে আমিও ভেতরে ঢুকে দেখি, এক ঘর লোক। সকলেই ব্যস্ত—পরামর্শ বা তর্ক-বিতর্কে নয় ডালমুঠ, সন্দেশ ও চা খেতে! মনে হ'ল এই ঠিক মৌচাকের মধু। তবে সে মধু আজ শিশুরা পান করছে না, করছেন শিশুসাহিত্যিকেরা।

সভায় এসেছেন যোগেন দা'; এসেছেন রংমশালের কামাক্ষীপ্রসাদ; সুন্দর চেহারা, অমায়িক ব্যবহার, প্রগাঢ় দৃষ্টি। কথা বলেন অল্প, কাজও করেন অল্প। আর এসেছেন

রামধনুর সম্পাদক মশাই;—ছোটখাট মানুষটি; চোখে চশমা, মুখে হাসি; মাথার চুলগুলো গোল করে ছাটা। দেখলেই মনে হয়, "ভাল ছেলে"; যা বলেন তাই করেন। এবং করছেনও তাই। এই পরিষদের কতক ভার তাঁরই কাঁধে। যিনি "রামধনু" পরিচালনা করতে পারেন তাঁর শক্তি কত বল তো?

আবার দেখতে পেলাম "শিশু সওগাতের" নাসিরুদ্দিন সাহেবকে। যিনি শিশুদের সওগাত অর্থাৎ উপঢৌকন দেন তাঁকে দেখবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই ছিল; কিন্তু আমি শিশু নয় বলেই বোধ হয় দেখবার সুযোগ এতদিন হয় নি। দেখলাম, তিনি পরিষদের আজীবন সদস্য হবার জন্য হাসিভরা মুখে একখানি চেক্ লিখে দিচ্ছেন। খাসা চেহারা। তাঁর সামনে বসে ছিলেন ভূতপূর্ব্ব "মাস-পয়লা" ও "রবিবারের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মশায়;—গৌর কান্তি, জরাজীর্ণ দেহ। দেহের সম্বল মাত্র কঙ্কালটি। তাঁর চলা-ফেরা ও চোখ দু'টি দেখলে এবং কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয়, প্রজ্জলিত যজ্ঞ-কাষ্ঠ। অহরহ জ্বল্‌ছেন, আলো ও তাপ দিচ্ছেন এবং শেষে ভস্মে পরিণত হচ্ছেন। তখন তাঁকে দেখাচ্ছিল "পরিষদ-পাগলা"! অবস্থা এমন হয়েছিল যে একটা একতারা পেলে বোধ হয় পরিষদ-গুণগান ক'রে পথে পথে বেড়াতে পারতেন। তাঁরই পাশে বসেছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়—নধর কান্তি, শান্ত সুশ্রী মূর্ত্তি। তিনি নিজে হাসেন কম কিন্তু গল্পে সকলকে এমন হাসান যে তাঁর কথা লিখতে গিয়ে আমি না হেসে থাকতে পারছি না। তাঁকেও এক ছবিতে ছাড়া রক্ত-মাংসের শরীরে কোন দিন দেখি নি। তাঁর পাশে ছিলেন স্বামী প্রেমঘনানন্দ; কিশোর বাংলার 'অরূপ'। তাঁর রূপের বর্ণনা আর করলাম না, কেবল বলবো, চোখে চশমা, পরিধানে গেরুয়া আর হাতে তখন ছিল চায়ের পেয়ালা। আর ঘুরে ঘুরে সকলকে আপ্যায়িত করছিলেন স্বয়ং গৃহস্বামী—মৌচাক-সম্পাদক। তিনি মানুষটি মোটা-সোটা, মাথায় খাটো, অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও কোমল-মনা; ইনিও সকল কাজেই এগিয়ে যা
কিন্তু পিছিয়ে আসেন না। কেননা তিনি যত
যান সেখান থেকে এক পাও নড়েন না। সেখানে
থাকেন। কাজই তাঁকে ছাড়িয়ে যায়। এঁরা ছা
সে ঘরে ছিল একটি কাঁচের পাত্রে জলের মধ্যে এক
কাছিম-শিশু। শিশুসাহিত্যিকদের আসরে, শি
সাহিত্য পরিষদের পরামর্শ-সভায় কাছিম-শিশুর উপস্থি
অসম্ভব নয়। আর ছিল একটি সরু ও ছোট মনসা গাছ—
যার বনিয়াদী নাম, "ক্যাক্টাস"। 'মনসা' বললে ম
পড়ে সেই 'বেহুলাকে', মনে পড়ে চোখের 'কাজল
মনে পড়ে ছাদের কোণে ভাঙ্গা টবে পত্রহীন 'মন
গাছটাকে'।

যাক্, সভায় তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর স্থির হ'
সামনের দিনে সভা হবে নাসিরুদ্দিন সাহেবের বাড়
তারপর যাওয়া হবে চন্দননগরে চাঁদা আদায় করতে।

তোমরা হয়তো মনে করছো, 'গাঁয়ের সাধু ভিখ্ পা
না' কথাটা আমাদের বেলায় বেশ চমৎকার খেটে গে
কলকাতায় কারো কাছে চাঁদা আদায় না ক
কলকাতা থেকে আমরা যাবো চন্দননগরে?

কিন্তু আমাদের—তোমাদের পরিষদ্ তো দু'চ
জনের নয়, সারা বাঙলার, বাঙালীর—কেবল বাঙাল
কেন, সব দেশের শিশুসাহিত্যের, শিশু-শিল্পের মিলন-
হবে এটা। কাজেই যদি প্রথমেই চন্দননগরে যাই, তা
দোষের কি? তা ছাড়া শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, শ্রীযু
মতিলাল রায়, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক—এঁরা হচ্চে
বাংলার আদর্শ কর্ম্মী। শেঠ মশায় ও রায় মশায়
বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এঁদের অনুপ্রেরণা
সাহায্য পাওয়া কি কম কথা? শ্রীযুক্ত হরিহর
মশায় ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক মশায় আ
শিশুসাহিত্যের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। কাজেই এঁদের কা
ছাড়া প্রথমেই যাবো আর কার কাছে?

তাই একদিন—

(ক্রমশ

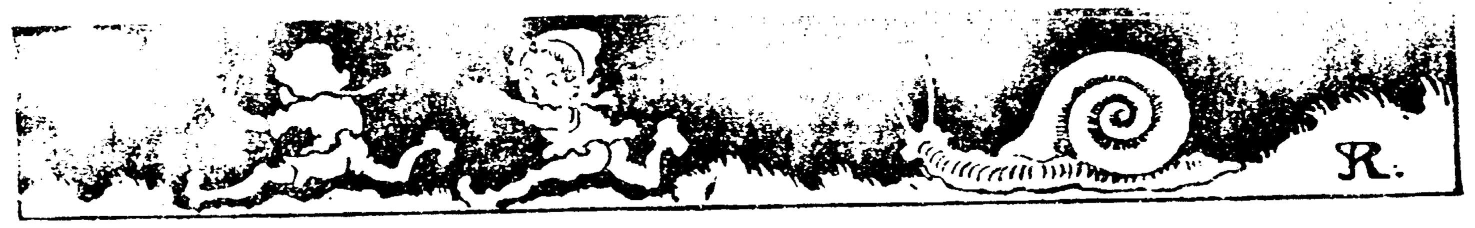

TIGHT BINDING

আসামের ছোট বাঘ

(শিকারের গল্প)

শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত

ছোট বাঘ আসামের অনেক জায়গায়ই দেখেছি, গারো পাহাড়ের দামড়া, ফুলবাড়ী অঞ্চলের বাঘ-ার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছিল। এরা প্রায়ই া এবং হাজংগুলোর গৃহপালিত ছোট পশুপক্ষীর চড়াও হয়ে ঘাড় মট্‌কে নিয়ে চলে যেত। গারো ের লোকালয়-বিহীন কোন একটি অগাধ বনের বৃত্তান্ত বলব, তবেই ওদের স্বভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চারিদিকে দুর্গম বন। মাঝখানে দাঁড়িয়ে কতকগুলো র বড় বড় ফরেষ্ট বাংলো। এটাই হ'ল একটা ফরেষ্ট অফিস। এ ছাড়া চারিদিকে কোথাও লোকের বসতি । তবে গভীর বনের ভিতর দু'-একটা গারো-পল্লী নতার মধ্যে পড়ে আছে। রেঞ্জ অফিস থেকে প্রায় ল তিনেক তফাতে একটা খুব ছোট বাজার। এ ছাড়া অফিসে তিনজন ফরেষ্টার, একজন ডেপুটী রেঞ্জার, জন রেঞ্জ অফিসার, আর জন ছয়েক ফরেষ্ট গার্ড আর রয়েছে। এই হ'ল এখানকার লোকসংখ্যা। তবে ফরেষ্ট অফিসগুলো থেকে মাঝে মাঝে অফিসাররা লে লোকসংখ্যা কিছুটা বাড়ে। এ ছাড়া নূতন লোক থবার যো নেই।

এ রকম যায়গা যে বাঘ-ভালুকের প্রিয় হবে তাতে ব সন্দেহ কি? সন্ধ্যে হ'লেই গভীর বনের ভেতর ক ছোট বাঘগুলোর গভীর গর্জ্জন সুরু হ'ত। সন্ধ্যে লিয়ে এলেই কম্পাউণ্ডের আশেপাশে এসে ওরা চুপ্‌ র বসে থাকত, আর রাত্রি ঘনিয়ে এলেই নিঃশব্দে পাউণ্ডে ঢুকে নিত্য নৈমিত্তিক কাজ সুরু করে দিত। নও আস্তাবলের বা গোয়াল ঘরের বেড়া বা মেঝে ড়তে সুরু করত; কখনও বা বাসন মাজবার যায়গায় য়ে মাছ মাংসের হাড়গুলো কড়্‌মড়্‌ করে চিবুতে আরম্ভ ত, এই রকম আর কি! এদের উপদ্রবে সন্ধ্যের গেই রান্নাবান্না সেরে নিতে হ'ত, আর রাত্রে বাংলোয় স খাওয়া-দাওয়া করতে হ'ত। কম্পাউণ্ডের ভেতর কতদিন এই মুরগী-খেকো বাঘগুলোর সঙ্গে অফিসের াকদের মোলাকাৎ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও তা কে জানে? কত দিন ত' আমিও দেখেছি! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মানুষের সাড়া-শব্দ পেলেই যে ওরা কোথায় চকিতে অন্তর্গোপন করে বসে, তা মোটেই মালুম হয় না। ওদের ঘ্রাণশক্তিটাও বড় প্রবল। এ ছাড়া ওরা, মনে হয়, শেয়ালদের থেকেও অধিক ধূর্ত্ত, আর খুব বড় দরের সিঁদেল চোর। বাবা সেখান থেকে আসবার আগে রান্নাঘর পাকা করিয়ে আসতে বাধ্য হন। ওরা প্রায়ই ধারাল নখের সাহায্যে রান্নঘরের কাঁচা মেঝে খুঁড়ে ভেতরে ঢুকে যেত। তারপর হাঁড়ি-কলসীগুলিতে মুখ দিয়ে চেটে রাখত, ডিমটিমগুলো খেয়ে অন্যান্য জিনিষ সারাটা ঘরে ছড়িয়ে চলে যেত কোন্‌ কোন্‌ দিন হাঁড়িতে মুখ দিতে গিয়ে হয়ত হাঁড়িটাই ওদের মাথা গিলে আঁকড়ে ধরত। তারপর যা কাণ্ড! বেচারারা মাথা বের করতে না পেরে ইতস্ততঃ দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়াত। এ রকম কয়েকবার হয়েছে। এ ছাড়াও যে ওরা আরও কত দিন কত রকম বিপদে পড়েছে, কত গুলি খেয়ে মরেছে! কিন্তু জাতটা নিতান্ত বেহায়া। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কত দিন ঘর থেকে বাছুর, ছাগল-ভেড়া টেনে নিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন বাবা চলে গেছেন, ব্রাঞ্চ অফিসগুলো ইন্‌স-পেক্‌সন কর্‌তে। রাত তখন দুপুর। চারদিক্‌ নিস্তব্ধ। ঘুমের ঘোরে অনেকক্ষণ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ কানে যাচ্ছিল। নিঃশব্দে বিছানার কাছে এসে মা আমাকে উঠিয়ে দিলেন। উঠ্‌তেই আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমাদের একটী পোষা ছাগল ছিল,—থাকত গোয়াল ঘরের ভেতর। একটা ছোট চিতা ওটাকে নিয়ে যাবার জন্য বাইরে থেকে মাটি খুঁড়তে সুরু করে দিয়েছে। ছাগলটা ভয়ে চেঁচাতে সুরু করে দিল। তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে জানালায় গেলাম। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চোখটাকে আরও ঝলসিয়ে দিলে। মা'র বারণ সত্ত্বেও এবার বন্দুকে দু'টো 'এল্‌, জি' ভরে বাংলো থেকে নিঃশব্দে নেমে গেলাম। পাঁচ-ছ' মিনিট চলে গেল। ঘরের জানালা

থেকে টর্চ্চের আলো গিয়ে বাঘের ঠিক মাথায় নিবদ্ধ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আমগাছের ওপর থেকে আমার বন্দুক ডেকে উঠল 'গুড়ুম্‌'। চিতাটাও গর্জ্জন ক'রে দু'টো ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। অমনি আর একটা গুলি গিয়ে ওকে সারা জীবনের মত অচল করে দিল। চিতাটা লম্বায় ছিল দু' হাত।

এই বাঘগুলো সাধারণতঃ মানুষ দেখলে ভয়ই পায়, কিন্তু সময় বিশেষে ওরা ভীষণ হিংস্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বাচ্চাওয়ালা বাঘিনীগুলো;—ঠিক বড় বাঘের মত দুর্দ্দান্ত হ'য়ে ওঠে। ঐ সময়ে যে কোন জীব—এমন কি তার স্বামী—অর্থাৎ জোয়ান বাঘকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। মাতৃস্নেহ এমনই জিনিষ!

এক দিনের কথা বেশ মনে পড়ে। সন্ধ্যার পর আমি আর আমার সাথী ফরেষ্ট গার্ডটা একটা নির্জ্জন পথ ... পথ দিয়ে শিকার থেকে ফিরছিলাম। চলতে চলতে এক প্রকাণ্ড বট গাছের নীচে দিয়ে আসছি। হঠাৎ আমার সাথী থমকে দাঁড়িয়ে ... দেখিয়ে দিল—দু'টো চিতার বাচ্চা। ... ব্যাঘ্র-শিশু দু'টোকে দেখে বাস্তবিক বড় লোভ হ'ল। কিন্তু আবার সন্দেহ আর ভয় সারাটা শরীরকে মাতিয়ে দিলে। অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে ব্যাঘ্রীর উদ্দেশ্যে বন্দুক বাগিয়ে ধরলাম, আর সাথী ভায়া নিমেষের মধ্যে বাচ্চা দু'টোকে গাছ থেকে নামিয়ে, নিজের জামা খুলে জড়িয়ে নিলে। তারপর আমাদের কে পায়? রাত তখন এগারোটা হবে। বহুদূরে বনের ভেতর থেকে বাঘিনীর অস্ফুট গর্জ্জন শুনতে পেলাম! এক একবার মনে হ'ল বাচ্চা দু'টোকে ছেড়ে দি; কিন্তু লোভ বড় ভয়ানক জিনিষ। তা ছাড়া এমন দু'টো বাঘের বাচ্চা পুষে লোককে তাক্‌ লাগিয়ে দেবার দুর্জ্জয় প্রলোভন, অন্যায় হচ্ছে বুঝেও, আমাদের পেয়ে বসল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাঘিনীর গর্জ্জন বাংলোর আশে পাশে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। বাচ্চা দু'টোও বাংলোর বাইরে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্রমে বাঘিনীর গর্জ্জন যেন আকাশ ফাটাতে সুরু করল। সারা কম্পাউণ্ডকে তোলপাড় করে তুলছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে ঠিক জায়গায় এসে গেছে। অনেকেই জানলা দিয়ে বন্দুক বাগিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু কেউ আর সুবিধা পেলেন না। রজনী প্রভাতের তিন চার ঘণ্টা পূর্ব্বে সে ডাকতে ডাক বনের দিকে চলে গেল। তার উন্মত্ত গর্জ্জনও আস্তে বনের গভীরতায় মিলিয়ে গেল।

ভোর পাঁচটা তখন। ফরেষ্টার বাবুর বাসায় হ বাঘিনীর গর্জ্জনের সাথে সাথে একটী লোকের জোর অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফরে বাবুর বাংলোর ওপর থেকে রাইফেলের আও হ'ল 'গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌'। বাঘিনী আবার গর্জ্জে উঠ তার পর আবার সব চুপচাপ। গিয়ে দেখি ফরে বাবুর চাকরটাকে সকলে ধরে বাংলোয় ওঠাচ্ছে। আর বুক থেকে অনবরত রক্ত পড়ছে। আর কূয়োর ধ বাঘিনীর মৃতদেহটা পড়ে আছে। চাকরটাকে চিকিৎ জন্য তুরায় পাঠান হ'ল; কিন্তু বেচারা চার পাঁচদিন বুড়ো বাপকে রেখে মারা গেল। মাঝখান থেকে আমি আর সেই ফরেষ্ট গার্ডটী (সাথী) সকলের কাছে অপ হয়ে রইলাম। সাথী সেইটায় রাগ করে দুটো বাচ্চা লাহাত্তে করে দিল।

যদিও ছোট বাঘগুলো মাঝে মাঝে হিংস্র হয়ে কিন্তু মানুষকে ওরা যথেষ্ট সম্মান করে। মানুষের বুদ্ধি ওরা ভীষণ ভয় করে। একটা জায়গার কাহিনী শোন। অকাই ডিব্রুগড় থেকে ছ' মাইল তফা এখানে ডিব্রু-ফরেষ্টের ভেতর একটা ফরেষ্ট অফিস আ অফিস থেকে প্রায় দু' তিনশ' গজ দূরে বিশ প ঘর নেপালী করাতী বহু বছর ধরে বাস কর যদিও এদের নোংরা বাসস্থান দেখলে তোমরা সিঁটকোবে, কিন্তু এদের সাহসের কথা শুনলে নুয়ে পড়বে। এমনিই ত ছনের ছাউনি দেওয়া মাচাং কোনটার বেড়া আছে, আর কোনটার হয়ত একেবা নেই। আর যেগুলোর বেড়া আছে তাও আবার নরম বেড়া। ভেতর থেকে বাইরে সবই দেখা যায়। মা ঘরগুলোর তলাও আবার কচিৎ ঘেরাও দেওয়া থাকে। ওরা তাতেই পাঁঠা-ছাগল, মোরগ প্রভৃতি রেখে শুধু গরুর ঘরটা যা একটু শক্ত করে বানিয়ে র এমনি ত' চতুর্দ্দিকে ঘন দুর্ভেদ্য বনশ্রেণী, না জানি কত বছরের পুরনো! এ ছাড়া দিনে দুপুরে বাঘ-ভা ভালুকে—এমন কি হাতীকে পর্য্যন্ত কম্পাউণ্ডের চার

বেড়াতে দেখা যায়। আর রাত ঘনিয়ে এলেই ত' ...র পশুর রাজত্ব! কিন্তু আশ্চর্য্য, রাত্রেও এই নেপালীরা ...ক্ত ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছে! বাঘগুলোও ...কতার মধ্যে মাচাংএর নীচ থেকে প্রাণীগুলোকে ধরে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। আর এই আশ্চর্য্য ...কগুলো ঘুমন্ত অবস্থাতে নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে দূর্ করে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। যেন ঠিক ওরা ঘরের ছেলে। বাঘগুলোও হয়ত তাড়া খেয়ে আড়ালে ...রে বসে থাকে, আবার অবস্থা বুঝে কাজ সুরু করে দেয়। শুধু কি এই? এমন কি সময় সময় খোলা মাচাংএর ওপরে উঠে ঘুমন্ত লোকের কাছ থেকে পর্য্যন্ত ছাগল-মুরগী নিয়ে চলে যায়। কিন্তু একটা দিনও কেউ ঘুমন্ত মানুষের ওপর চড়াও হয়েছে বলে শুনি নি! ইচ্ছে করলে কি পারত না? তবে মারে না কেন? আমার মনে হয় এর কারণ ওরা বাঘগুলোকে ভালবাসে ঠিক ওদের ছেলেপিলের মত। দুষ্টুমী করলে শুধু গাল দেয়, বা মারবার ভয় দেখায়, কিন্তু কখনও ওদের অনিষ্ট চিন্তা করে না। তাই বোধ হয় বাঘগুলোও ওদের কিছু বলে না।

বিনুর' বিড়াল

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা

মিণ্টু বিনুর ছোট ভাই। বিনুর বয়স দশ, মিণ্টুর ...। দু' জনের মধ্যে ভাবও যেমন, খুনসুটিও তেমনি। ...ন মিণ্টু বিনুকে বলিল, 'জানিস্ দিদি ভাই, পাশের ...র নতুন ভাড়াটেদের তোর মতন একটা মেয়ে আছে, ... বেরালটা তোর টেবির চাইতে ঢে-র বেশী সুন্দর।'

বিনু প্রথমে কথাটাকে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতে ...ল, কিন্তু পারিল না। হঠাৎ হাত হইতে লজেন্সটা ...তে পড়িয়া গেল। সে সম্বন্ধেও তাহার নিরাসক্তি ... গেল। ভাইকে ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'টেবির চেয়ে ঢের সুন্দর! কে তোকে বললে শুনি?'

মুখ ভেংচিটা বিনুর মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া মিণ্টু ...ল, 'বলবে আবার কে? নিজের চোখে দেখে এলুম। না, তুইও দেখে আসবি, তবেই বুঝবি।'

মিণ্টুর প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণায় বিনু ভড়কাইয়া গেল। এই সময় পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া মিণ্টুর ...ত সন্ধি করিয়া ফেলাই তাহার সঙ্গত মনে হইল। উদারভাবে মিণ্টুর হাতে লাল সাদা দুইটি লজেন্স ...য়া দিল।

সন্ধির সর্ত্তে মিণ্টুও রাজি হইয়া গেল। সে চলিল ...ক সঙ্গে করিয়া পাশের বাড়ীর বেরাল দেখাইতে।

বেরাল দেখিয়া বিনুর চোখ জুড়াইয়া গেল। সাদা ...ব বেরাল, লোমগুলি যেন পশম তাহার বয়সী একটি মেয়ে একটা বল্ ছুঁড়িয়া দিতেছে, বেরালটি লাফাইয়া লাফাইয়া সেটা ধরিতে চেষ্টা করিতেছে!

দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বিজয়-গর্ব্বে মিণ্টু বলিল, 'দেখ্‌লি তো, শুধু সুন্দর নয়, শিকারীও। তোমার টেবির মত রোগা পট্‌কা নয়,'—বলিয়াই সে টেবির রোগা পটকা চেহারার একটা ইঙ্গিত করিল। সাদা লাল দুইটি লজেন্সের এতটুকু মর্য্যাদা রাখিল না।

বিনু মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, দুঃসময়ে শত্রুকেও খোসামোদ করতে হয়, এই বয়সেই সে তাহা বুঝিত।

কয়েকদিন পর মিণ্টু আসিয়া খবর দিল, 'তুই যে জান্‌তে চেয়েছিলি দিদি, কি করলে টেবির ওম্‌নি ধবধবে লোম হয় আমি জেনে এসেছি। বেরালটাকে ওরা রোজ সাবান দিয়ে নাওয়ায়। তাই অমন ধব্‌ধবে লোম হয়েছে।'

'ক্রীম ক্র্যাকার' বিস্কুটের আধখানাই বিনু মিণ্টুকে দিয়া দিল, বিজ্ঞের মত মুখের ভাব করিয়া মিণ্টু বিস্কুট লইয়া সরিয়া পড়িল।

মেজ্‌দি সেদিন ড্রয়ারে তাহার চন্দন সাবানখানা খুঁজিয়া পাইল না।

বিনু তেতলার স্নানের ঘরে ঢুকিয়া চন্দন সাবান দিয়া তিন বেলা টেবিকে ভাল করিয়া স্নান করাইয়া দিল।

কতক্ষণে তাহার অম্‌নি রেশমের মত লোম হইবে সেই আশায় সে অসুখের ছুতায় স্কুলে পর্য্যন্ত গেল না।

সন্ধ্যাবেলা বিনুর ছোটকাকা রবি বলিল, 'ও বাড়ীর বেরালটাকে দেখেছিস্ বিনু? চমৎ-কার বেরালটা! আর তোর টেবিটার দিন দিন কী ছিরি হ'চ্ছে! আজকে আবার ওর গায়ে জল ঢাল্‌লে কে? মাগো! ভিজে বেরালটাকে দেখলে ঘেন্না করে। যা বিনু, খাবার ঘর থেকে ওকে নিয়ে যা।'

দুঃখে বিনুর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। 'আচ্ছা, আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে খাও—' বলিয়াই সে টেবিকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। মাছের কাঁটার বিচ্ছেদ জানাইয়া টেবি 'ম্যাও' 'ম্যাও' করিয়া অনেক আপত্তি করিল কিন্তু কোন ফল হইল না।

দৌত্যকার্য্যে মিণ্টুর অবহেলা দেখা গেল না। আবার সে খবর আনিল, 'জানিস্ দিদি, বেরালটাকে ওরা নিশ্চয়ই ভালো ভালো তেল মাখায়, নইলে অমন পশমের মত লোম— !'

'কি করে জানলি তুই?' বিনুর আগ্রহের সীমা থাকে না।

'বাঃ— ? সেদিন সেই একটা কাগজে বিজ্ঞাপনের ছবি দেখলি নে?—ভালো তেল মাথায় মেখে একটি মেয়ে মুখে হাত বুলিয়েছিল ব'লে মেয়েটার সারা মুখময় দাড়ি গজিয়ে গেল! তুই মাখিয়েই দেখ্ না?'

সত্যি সে বোকা, স্কুলের দিদিমণিরা কি আর মিছে কথা বলেন! এই সহজ কথাটা মনে আসে নাই বলিয়া বিনু নিজেকে তিরস্কার করিল।

সেদিন আল্‌মারী হইতে হারাইল সেজ্‌দার জবাকুসুম তেলের শিশিটা।

বেচারার ইন্‌স্যমনিয়া রোগ, জবাকুসুম না মাখিলে তাহার ঘুমই হয় না। তেলের দামও বাড়িয়াছে ভীষণ—

এক শিশি তেল বিনু টেবির সর্ব্বাঙ্গে চপ্‌চপে করিয়া মাখাইয়া দিল। তাহার চোখের সম্মুখে টেবির সর্ব্বাঙ্গে তুলার ক্ষেত ফুটিয়া উঠিল।

বিকালে বিনুর সেজদা' কানু বলিল, 'টেবির লোমগুলো এমন হ'চ্ছে কেন মা? দেখ্‌লে গা রি-রি করে। বেরালটাকে বস্তায় পুরে একদিন খাল-পারে ছেড়ে ... আসিস রঘুয়া! বেরাল পুষ্‌তে হ'লে ও বাড়ীর বে... মত। বেরাল তো নয়, যেন মোমের দলা। না... তেম্‌নি,—জলি। যেমন বেরাল তেমনি নাম।'

সারা পৃথিবী যেন বিনুর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়... অবশেষে বাবাও যেদিন বলিলেন, 'ও বাড়ীর মে... সঙ্গে ভাব করেছিস বিনু? দেখেছিস তার বেরাল... সেদিন সে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'বয়ে গেছে ... ভাব করতে, বাবা যেন এক আদখে্‌লে!'

দিদির দুঃখে বিগলিত হইয়া মিণ্টু আবার আ... বলিল, 'জলির গায়ে অত জোর কেন, অত শিকার ক... পারে কি করে জানিস্ দিদি? ওকে ওরা জোর ... জন্য ভালো ভালো ওষুধ খাওয়ায়। দেখিস্ নি, ... অনুদির খুকুটা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিল ব'লে ডাক্তাররা টনিক্ খেতে দিয়েছিল? ক'দিন খেতেই জোর ... কেমন গট্ গট্ করে চলে বেড়াতে লাগল!'

অকূলে যেন কূল পায় বিনু। কিন্তু তেমন ওষুধ কোথায় পাইবে? কে তাহাকে আনিয়া দিবে? টে... তো কেউ দুই চোখে দেখিতে পারে না, তাহার কে-ই বা চিন্তা করিবে? সহসা তাহার মনে পড়ে, মাস আগে তাহার বাবার অসুখের সময় বড় বড় ডা... আসিয়া অনেক ওষুধ দিয়াছিল, ও ঘরের আল্‌মারি এখনো কত ওষুধ সাজানো আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনু কালো একশিশি ওষুধ ... করিয়া আনিল; ছাদের উপর উঠিয়া টেবিকে কে... চাপিয়া ধরিয়া সে ওষুধ খাওয়াইতে গেল। নির্ব্বোধ টেবি, শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে এত উদাসীন যে, খাইতে বিস্তর আপত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু বিনু আর পশু নয়, সে তাহার ওজর শুনিবে কেন? ... করিয়া ওষুধটা গলায় ঢালিয়া দিল।

আনন্দে রাত্রে বিনুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জলির শিকারী! এবার ছোটকাকা, সেজ্‌দা, বাবা সকলকে দেখাইয়া দিবে, জলির চেয়েও সুন্দর বেরাল জ... আছে! হ্যাট্ কোট্ পরা বড় বড় ডাক্তার আ... ওষুধ দিয়া গিয়াছে, এ ওষুধের ফল হইবেই।

প্রভাতেই বিনু টেবিকে খুঁজিতে গেল। কো...

াকে খুঁজিয়া না পাইয়া চিন্তিতা হইয়া পড়িল। রাতি শিকারী হইয়া সে সুন্দরবনে বোনপোকে ার করিতে গেল না কি ?

অবশেষে রান্নাঘরে সে টেবিকে আবিষ্কার করিল। র গাদার উপরে একরাশ বমি করিয়া সে দাঁত কাইয়া পড়িয়া আছে। সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে।

বাবা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, 'আমার মালিশের কালো ওষুধটা আলমারীতে নেই কেন? —সেটা যে বিষ—গায়ে ইংরাজীতে 'পয়জন্' লেখা ছিল, কে নিয়েছে সেটা?'

বিনুও কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মনে করো

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

খুব খালি মাঠে চ'লে গেছি মনে করো···
যেখানে রয়েছে শুধু উত্তাল হাওয়া,
শিশিরে কাঁপছে পাতাগুলি থরথরো—
এলোমেলো সুরে যেথা চলে গান গাওয়া।

যেথা নেই কোনো দীপজ্বালা-বাতি পথে···
হুল্লোড় নেই—নেই কোনো গোলমাল,
জ্যোৎস্নার সাথে যেথা চলা কোনমতে,
দেখা যাবে যেথা পলাশ মহুয়া শাল।

হঠাৎ জাগ্‌বে যেখানে নিশির পাখী,
নিদ্ টুটে যাবে আমাদের সাড়া পেয়ে,
পথের প্রান্ত যেখানে অনেক বাকি :
···মনে কর যদি চলি সেথা' গান গেয়ে।

মজা হয় খুব তা' হ'লে কিন্তু ভাই—
তবু একান্ত তোমার সঙ্গ চাই।

সন্দেশ

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী রোমাঁ রোলাঁ আর ইহজগতে । ইতিপূর্ব্বে আর একবার তাঁর মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র ছল কিন্তু সেটা পরে ভুল ব'লে জানা যায়। রে সেই দুঃসংবাদ কঠোর সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

রোমাঁ রোলাঁর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। নিক ও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম চিরকাল অমর থাকবে। সাহিত্যিক হিসাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। তাঁর লেখা 'জাঁ ফ্' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলির অন্যতম। কিন্তু রোমাঁ ার মৃত্যুতে আমরা শুধু একজন বড় লেখক ও তকেই হারাই নি, সেই সঙ্গে হারিয়েছি ভারতের ন অকৃত্রিম বন্ধুকে। ভারতের সংস্কৃতিকে তিনি স্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং এ নিয়ে অনেক ও গেছেন। গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঢ় সৌহার্দ্দ্য ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তিনি ুগের মহামানব ব'লে মনে করতেন। তাঁর লেখা 'রামকৃষ্ণের জীবনী'ও একখানি বিশ্ববিখ্যাত বই। রোমাঁ রোলাঁ জাতিতে ছিলেন ফরাসী।

* * * *

ক্রিকেটে রণজী প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র দল নবনগর দলকে ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়েছিল সে কথা ইতিপূর্ব্বে শুনেছ। এবারে কিন্তু মহারাষ্ট্র দলকেই তেমনি ভাবে ৩৫৪ রানে বরোদা দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। দুর্দ্ধর্ষ ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ হাজারী বরোদা দলের পক্ষে খেলে দুই ইনিংস্‌এই শতাধিক রান্ করেছেন।

* * * *

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কর্ণেল সি. কে. নাইডুর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব্ একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট্ ম্যাচের আয়োজন করেছিলেন। এই খেলাটীতে ভারতের বহু এবং সুদূর সিংহলেরও কয়েক জন নাম-করা খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন। খেলোয়াড়ের জন্ম এ ধরণের জয়ন্তী-উৎসব এ দেশে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ।

বাংলা সাহিত্যকে কেন্দ্র ক'রে প্রতি বছর প্রবাসী ালীরা একবার ক'রে মিলিত হন। এবারেও সে ডদিনটি যথারীতি পালন করা হয়েছে—কানপুরে। মরা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কথা বলছি। সে ধিবেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। এবারে মূল সভাপতি য়েছিলেন সুপণ্ডিত ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

* * * *

ইয়োরোপের যুদ্ধের খবরে আবার একটু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্ম্মানরা নতুন ক'রে প্রচণ্ড রকম আক্রমণ সুরু করেছিল এবং মিত্রপক্ষকে হটিয়ে খানিকটা অগ্রসরও হয়েছিল। সম্প্রতি আবার সেখানে যুদ্ধ মিত্রপক্ষের অনুকূলে চলেছে। ওদিকে রুশরাও বুডাপেষ্ট সহরের অনেকখানি দখল করতে ছাড়ে নি; এখন তারা ভিয়েনার দিকে এগোচ্ছে।

প্রাচ্যের খবরও মিত্রপক্ষেরই অনুকূলে। সম্প্রতি বিনা যুদ্ধে ব্রহ্মের আকিয়াব তাদের দখলে এসে গেছে। এবার তারা সোয়াবো অধিকার ক'রে মান্দালয়ের দিকে চলেছে। খাস জাপানের উপরও বিমান আক্রমণ চলেছে। তা ছাড়া মার্কিন বাহিনী নতুন করে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও সৈন্য নামিয়েছে।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

শান্তিপুর পরিচয়—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্.এ, বি-এল্ প্রণীত এবং ১-১৪ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা অনেক দিন হইল এই পুস্তকের দুই খণ্ড পাইয়াছি। রামধনুর ন্যায় বালকবালিকাদিগের পত্রিকায় এইরূপ গ্রন্থের সম্যক্ সমালোচনা চলে না। তাহাতে আবার কাগজের অভাব। শান্তিপুর বাংলাদেশের একটি গৌরবের স্থান। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের লীলাভূমি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তনে এক সময়ে ইহা "ডুবু ডুবু' হইয়াছিল। আধুনিক সময়েও শুধু অতুলচন্দ্র ও শু আজিজুল হক্ শান্তিপুরকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন পাঠক এই পুস্তক পাঠে শান্তিপুর সম্বন্ধে প্রাচীন আধুনিক অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। আমর ইহার তৃতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ত্রিশ (ত্রিশ—ত্রি=শ) (২) লাটিম।

আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের

নাম :—গায়ত্রী, গীতা, টুলু, খোকন, উমা অর্চ্চনা (নীলফামারী); ননীগোপাল, গীতি, বেবি, করুণা, রেণু, সতী মৈত্র (রাজসাহী); বারিদ ও অসিতবরণ (কালীঘাট); মোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা); সুনীল চট্টোপাধ্যায় বালীগঞ্জ); চণ্ডী, জবা, রেবা, সেবা ও চন্দন (হাজারীবাগ); শ্যামু, মায়া, বিশ্ব, লক্ষ্মী, পারী, লালবিহারী (পাটনা); রেন্দ্রনাথ পাত্র ও নৃপেন্দ্র বারারী (ধানবাদ); ছবি রায় ও ছায়া রায় (নিউ দিল্লী); কর্ম্মিসঙ্ঘ, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার (বালি); গীতা দত্ত, শান্তি ও শম্ভু (কলিকাতা); বিম চন্দ্র দত্ত (জলপাইগুড়ি); জয়ন্ত, জয়া, শচী, বেবু, নে কণা, শ্যামলী ও করুণা (গোবরডাঙ্গা); তরুণ বাগচী নারায়ণ রায় (মাথাভাঙ্গা); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা র (বাঁকিপুর); আহতূষণ চৌধুরী (রাজসাহী); অশো কুমার নাহার (দুমকা); চিন্ময়, জয়ন্ত ও অমিতাভ ঘে (ভবানীপুর); শ্যামেন্দ্র, সতীশ, রামেন্দ্র, হেরম্ব ও মস্তাফা (কাজলধারা); শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, বুবুল, গী (মির্জ্জাপুর)। আষাঢ় মাসের উত্তরদাতাদের তালিক মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথ দত্ত' স্থলে বারীন্দ্রনাথ দত্ত হইবে।

নূতন ধাঁধা

(১) শুধু কথা ব'লে কোন্ জিনিষ ভেঙ্গে ফেলা যায়?
(২) কোন্ বীরকে ধরলে অপমান বোধ হবে?
(৩) হাতে কখন সেলাই হয়?
(৪) পান কখন আনোয়ার হয়?

(সবগুলির উত্তর পাঠাতে হবে—২০শে মাঘের ভিতর।)

কয়েকখানা ছেলেমেয়েদের গল্পের বই ঃ—

এবারের

পূজা-বার্ষিকী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

বর্ষ-মঙ্গল

বিরাট গ্রন্থ—অসংখ্য ছবি : এক রং, দুই রং ও বহু রং—গল্প ও কবিতার ঝরণা—সুন্দর বাঁধাই—উৎকৃষ্ট ছাপা।

মূল্য ২॥ মাত্র

ইহাতে লিখিয়াছেন

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, "বনফুল", নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র-কুমার রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সরোজ রায় চৌধুরী, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী, জসিম-উদ্দিন, ধীরেন্দ্র ধর প্রভৃতি বিখ্যাত লেখক ও লেখিকাগণ।

এত বড় সমৃদ্ধ গ্রন্থ, এত কম দামে—বর্ত্তমান জগতে পরম বিস্ময়

নব প্রকাশিত

যাদুসম্রাট—পি. সি. সরকার

প্রণীত

ম্যাজিকের খেলা

দাম ১৲

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া বাহির হইতেছে

প্রহেলিকা সিরিজের

(চমকপ্রদ ডিটেকটিভ কাহিনী)

১ম গ্রন্থ	মুখোশের অন্তরালে	(সব্যসাচী)	১৲
২য় ,,	মৃত্যুদূত	,,	১৲
৩য় ,,	ব্লাড হাউণ্ড	,,	১৲
৪র্থ ,,	কালের কবলে	,,	১৲
৫ম ,,	শেষ বলি	,,	১৲
৬ষ্ঠ ,,	নৈশ অভিযান	,,	১৲
৭ম ,,	কবরের নীচে	,,	১৲

*

শিশুপ্রতিভা সিরিজের

অমূল্য গ্রন্থ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

যাদুকর মার্কণী ১৲

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস ১৲

*

শিহরণের খনি

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন ১।০

দেব-সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

হলেক্সো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭ টি ঔষধ / মাত্র ১৪ টি ঔষধ | পকেট কেস ও পুস্তক সহ | মূল্য ৪। আনা / মূল্য ৮৲ টাকা

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৭শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৫১ | ১১শ সংখ্যা

অকাল বাদল

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়তে আমি বসেছিলাম
প্রথম ভাগটী হাতে,
পুতুল নিয়ে খেলছে খুকু
তখন ব'সে ছাতে।
উঠানেতে ব'সে তুমি
দিচ্ছিলে মা বড়ি,
গন্ধরাজের গন্ধে গেছে
সারা বাগান ভরি'।
লাফিয়ে ফেরে আম-বাগানে
কাঠবিড়ালির ছানা,
জামের গাছে বাতাস নাচে
পাখী কাঁপায় ডানা।

হঠাৎ এলো আঁধার ক'রে
অকাল মেঘের ছায়া,
বনের কোলে জাগিয়ে তোলে
নতুনতর মায়া।
আলোছায়ার খেলা দেখি
একলা ব'সে ব'সে,
বেলা বেড়ে যায় মা—পুঁথি
হাত থেকে যায় খ'সে।
ঝম্‌ঝমিয়ে চপল বাদল
নামল পুলক ধারে—
বিষ্টি-ঝরা সকালে আজ
পড়তে কি কেউ পারে?

পূর্ণিমা

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার, এম্.এ, বি-এল্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৃন্দা। আচ্ছা, আমরা সবাই মিলে যদি মান করে সে থাকি,—হাজার সাধলেও যদি কিছুতেই কথা না লি ?

ললিতা। আরে দূর, ও ঢের পুরানো হয়ে গিয়েছে। কটু নতুন কিছু বল্।

মঞ্জরী। (সর্ব্বকনিষ্ঠা) আচ্ছা, আমি যদি পেছন থকে এসে কৃষ্ণের দুই কান মলে দিই ?

ললিতা। কে, কে বললে এই কথা ?

মঞ্জরী। (উঠিয়া) আমি।

ললিতা। তুই !…তুই তোর নিজের দু'কান দু'হাতে র। ধর শীগ্‌গির।…আর কখনো বলবি এমন বোকার ত কথা ?

মঞ্জরী। (ভয়ে ভয়ে) না।

ললিতা। আচ্ছা, বস্ তবে। [মঞ্জরী বসিল] কি রে, ার কেউ কিছু ভাবতে পারলি ?

সুচিত্রা। কৃষ্ণের বাঁশীটা যদি লুকিয়ে রাখা যায় ?

সুলেখা। পিঠের ওপরে যদি বড় বড় অক্ষরে লিখে ওয়া যায় "ননীচোর" ?

ললিতা। বাজে, নেহাৎ বাজে।…মাথা ঘামাও, ারো মাথা ঘামাও সবাই।

বিশাখা। (সহসা উঠিয়া) হয়েছে, হয়েছে, এইবার ক হয়েছে।

সকলে। কি, কি ?

বিশাখা। কৃষ্ণ যেমন কতকগুলো গোপিনী সাজিয়ে নেছিলেন, আমরাও তেমনি একজনকে কৃষ্ণ সাজিয়ে ই। আজ আমরা তাকে নিয়েই আনন্দ করব। আর, াসল কৃষ্ণ এলে কাছে ঘেঁষতে দেব না।

সকলে। (উঠিয়া) বাঃ বাঃ, ঠিক হয়েছে, চমৎকার, ক ঠিক, খুব জব্দ হবে এবার ইত্যাদি।

চম্পক। এখন কাকে কৃষ্ণ সাজানো যায় বল্ দেখি ?

বিশাখা। ললিতা। ললিতা কৃষ্ণ সাজবে।

সকলে। হাঁ, হাঁ, ললিতা, ললিতা…

বৃন্দা। ললিতা, আয়। চল্ তোকে কৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে আসি।

বিশাখা। খুব শীগ্‌গির আসবি কিন্তু। এর ভেতরে যতটা সাজ হয়। আসল-নকল চেনা তো আমাদেরই হাতে।

[ললিতা ও বৃন্দার প্রস্থান]

চম্পক। খুব বুদ্ধি বের করেছিস বিশাখা ! আজকে সেই চতুর চূড়ামণি কি জব্দই না হবে !

বিশাখা। রোজ রোজ আমাদের সঙ্গে চতুরালি করে। আজ দেখব তার চতুরালি কোথায় থাকে।

—গান—

সকলে। দেখব কালা এবার কোথা যায়,
হেথা আর ঠাঁই পাবে না শ্যাম রায়।
ললিতা সাজবে কানু
বাজাবে মোহন বেণু,
মোরা সব তুলব তুফান
প্রেমের যমুনায়।
দাঁড়াবে কদমতলে
ফুলহার দেব গলে,
নকলের আদর দেখে
জ্বলবে সে হিংসায়।
ব্রজনারীর সঙ্গে আড়ি
বুঝবে কেমন দায়।

[গান হইতে হইতে কৃষ্ণবেশী ললিতা ও বৃন্দার প্রবেশ]

বিশাখা। আমরা তো সবাই প্রস্তুত, এখন কৃষ্ণ এলেই হয়।

ললিতা। রাধা, আমার এ কৃষ্ণবেশ তোমার বোধ হয় ভাল লাগছে না ? তুমি বোধ হয় মনে মনে আমার ওপর খুব রাগ করছ, না ?

রাধা। না না, রাগ করব কেন ? তোমাকে দেখতে এখন আরো বেশী ভাল লাগছে। তোমার মুখে যে এখন

ামি আমার দেবতার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। জান তো, একটা সামান্ত তৃণকেও কৃষ্ণজ্ঞানে পূজা করলে সে পূজা তিনিই গ্রহণ করেন। আজ আমি তোমাকে উপলক্ষ্য রে আমার কৃষ্ণের পূজা করব।

বৃন্দা। কই, কৃষ্ণ তো এখনো এলেন না !

চম্পক। ললিতা, তুই ভাই বাঁশীটা একটু বাজা তো। াশী শুনলে গুণমণিকে ছুটে আসতেই হবে।

[ললিতা বাঁশী বাজাইল।]

বৃন্দা। ঐরে, আসছেন, আসছেন।

বিশাখা। রাধা, তুমি ভাই এই পাশে এসে দাঁড়াও। ার দেখ, আমাদের বিনা অনুমতিতে তুমি যদি একটিও থা বল তবে ভয়ানক ঝগড়া হবে কিন্তু বলে দিচ্ছি।

[কৃষ্ণের প্রবেশ]

কৃষ্ণ। কে রে, কে বাজায় বাঁশী ?

চম্পক। যে বাজাতে পারে সেই বাজাচ্ছে। তোমার াতে কি ?

কৃষ্ণ। এই বৃন্দাবনের কুসুমকুঞ্জে বাঁশী বাজাতে ারে একমাত্র কৃষ্ণ।

চম্পক। কৃষ্ণই তো বাজাচ্ছে।

কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বাজাচ্ছে কি রকম ? কৃষ্ণ তো আমি !

বিশাখা। কৃষ্ণ তুমি ! হাঃ হাঃ, ওরে শোন্ শোন্। ই লোকটা বলে কি ! ওই নাকি কৃষ্ণ !

সকলে। তাই নাকি, তাই নাকি, দেখি লোকটা ক ? লোকটার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়।

কৃষ্ণ। এ সব কি বলছ তোমরা ? আমি যদি কৃষ্ণ া হই তবে কৃষ্ণ কে ?

চম্পক। ওই তো কৃষ্ণ ওখানে দাঁড়িয়ে !

কৃষ্ণ। (দেখিয়া) ও, ও তো নকল !

ললিতা। নকল ! লোকটার আস্পর্দ্ধা তো কম য়! আমি নকল না তুমি নকল ?… ভাল চাও তো ীগ্‌গির এখান থেকে বিদেয় হও।

কৃষ্ণ। বৃন্দা, বিশাখা, চম্পকলতিকা, তোমরাও কি ামাকে চিনতে পারছ না ?

বৃন্দা। কই, দেখি ? হুঁ, চেহারাটা অনেকটা সেই রকমই বটে।

চম্পক। সেজেছে একেবারে মন্দ নয়।

কৃষ্ণ। সেজেছি !

বিশাখা। হাঁ, সেজেছ বৈকি।…কিন্তু ঐ নাকটি হয় নি।

কৃষ্ণ। (নাকে হাত বুলাইয়া) নাকটা হয় নি ?

বিশাখা। মোটেই না।…দেখ্ তো তোরা, নাকটা কি ঠিক হয়েছে

সকলে। (দেখিয়া) নাঃ, মোটেই না।

বিশাখা। তোমার বিশ্বাস না হয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

[নিজের তর্জ্জনী দ্বারা প্রথমতঃ ললিতার ও পরে কৃষ্ণের নাক মাপিল।]

এই যে দেখ, একেবারে দেড় আঙুল তফাৎ। দেখলে তো নাকটা মিলল না ?

সকলে। উঁহু, নাক মিলল না।

কৃষ্ণ। না মিলল তো কি হ'ল ?

বিশাখা। তাতে প্রমাণ হ'ল যে তুমি নকল।

কৃষ্ণ। বেশ তো কথা ! এমনও তো হতে পারে যে আমিই আসল আর ও-ই নকল, সেই জন্যে নাক মিলল না।

বিশাখা। (গম্ভীর ভাবে) হুঁ। সে কথা তুমি বলতে পার বটে। তাই তো, ভারি সমস্যায় পড়া গেল দেখছি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্, তুমি আসল কি নকল পরীক্ষা দিতে রাজী আছ ?

কৃষ্ণ। হাঁ, নিশ্চয় রাজী।

বিশাখা। (ললিতার প্রতি) কি বল কৃষ্ণ, তুমি পরীক্ষা দিতে রাজী ?

ললিতা। হাঁ, খুব রাজী। (অগ্রসর হইল।)

(ক্রমশঃ)

নদেরচাঁদ

শ্রীশামুক

বিশ্বাস করতে চাইবে না জানি যে একটা লোক পুরস্কার পেতে পারে শ্রেষ্ঠ চালাক ও সেরা বোকা হিসাবে, একসঙ্গে। আর পুরস্কার কি, এক আধ টাকা নয়, একটি লাখ! কিন্তু সত্যি, মাঝে মাঝে ভারি অদ্ভুত ঘটনাও তো ঘটে, নয় কি? ঘটে গেল তাই আমাদের নদের-চাঁদের বেলা। নদেরচাঁদ কারুর সাতে নেই, পাঁচেও নেই। খায় দায়, খুব গম্ভীর মুখ করে ঘুরে বেড়ায়—যেন পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের বোঝা ওর মাথায়। সাবধানে দু' একটি কথা বলেই কথা শেষ করে, আর যখন কোণঠাসা, হাঁ বা না বলতে মুস্কিল, ভারিক্কী চালে অল্প একটু হাসে। তার মানে এও হয় তাও হয়। আর একটি মহা বাতিক আছে বটে! পকেটে খাতা পেন্সিল ও কাঁধে কোদাল নিয়ে হিল্লী দিল্লী ঘুরে বেড়ায়। এক বইয়েতে পড়ল যে পৃথিবীর একেবারে আদিম মানুষের নিদর্শন এখনও মেলে নি বটে কিন্তু একদিন মাটির তলায় নিশ্চয় পাওয়া যাবে, এবং যে মহাপুরুষ আবিষ্কার করবেন তিনি শুধু সৌভাগ্যবান্ ন'ন স্বনামধন্যও হবেন। বাস্, এইটুকু পড়েই নদেরচাঁদের ঘাড়ে আবিষ্কারের ভূত চেপে বসে। খুব পুরানো মনুষ্য-কঙ্কালের কোন্ অংশ কি ভাবে পাওয়া যাবে সে জানে না কিছু, জানবার কথা মনেও হ'ল না। ভাবলে যে মাটি খুঁড়লে কোন না কোন দিন আদিম মানুষের নিদর্শন তার মিলবেই মিলবে।

এই দেখ, পুরস্কারের কথা বলতে বসে নদেরচাঁদের কথা বলে চলেছি। প্রথম পুরস্কার ঘোষণা করলেন সরকার বাহাদুর। পঁচিশ থেকে সুরু করে পৌঁছাল পঞ্চাশ হাজার টাকায়। বিখ্যাত ধড়িবাজ ডাকাত পিলু সর্দারকে ধরে দিতে হবে। পিলু অনেক খুন খারাপি করে, যখন পাপের বোঝায় ধরিত্রী টলমল, উধাও হয়ে গেল। কত পুলিশ, কত চালাক চতুর গোয়েন্দা নাজেহাল, একেবারে সত্যি নাজেহাল। সুতরাং পুরস্কারের মাত্রা না চড়িয়ে উপায় কি? সরকারের যখন গোঁ চাপে তখন গেরী সেনও সর্ব্বস্বান্ত হবার উপক্রম হয়।

দ্বিতীয় পুরস্কারের কথা জানা গেল প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনী শ্রীযুক্ত কুড়েরাম ঢোলের মৃত্যুর পর; তাঁর উইলে। লোকে বলে দু'টো যুদ্ধের কালা বাজারের পয়সা। সে যাই হোক, তিনি শেষ বয়সে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। উইলে ছেলেমেয়েদের দিয়ে, দান করেও টকা ফুরায় না। বাকী থাকে পূরো আধটি লাখ! বড়লোকের কাঁচা পয়সার খেয়াল কিনা, লিখে গেলেন—পৃথিবীর সেরা বোকা যে প্রমাণ হবে সে পাবে ঐ টাকা! দেখছ কাণ্ড? তোমার আমার মত কত শত খালি-পকেট বুদ্ধিমানেরা থাকতে কিনা—?

সেদিন নিয়ম মত নদেরচাঁদ অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। লোকেরা বলে, ওহে, চল না, আজ শ্মশানের ঘাটে এক মহা সাধু এসেছেন তাঁকে মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হবে আর সাত দিন বাদে দেখা যাবে যে সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে বেঁচে আছেন। সমস্ত বড় বড় লোকেরা আসবে, এমন কি পুলিশ সাহেবও। সকলে স্বীকার করেছে যে এই দৈবশক্তি দেখালে মঠ করবার জন্য তাঁকে প্রচুর টাকা দেবে। সময় নেই, কাজের ক্ষতি হবে, এই সব বলে ওদের পাল্লায় নদেরচাঁদ ধরা দেয় না। অন্য চিন্তা আর মনে স্থান পায় না, তাকে পৃথিবীর আদিম মানুষ খুঁজে বার করতে হবে যে!

সাত দিন বাদে নদেরচাঁদ একলা মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও মাঝে মাঝে নানা জায়গায় মাটি পরীক্ষা করে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখছিল। মানুষের বসতি ছাড়িয়ে নিরালা জায়গাতেই তার ঘোরাফেরা। এটা কি! নদেরচাঁদ অল্প ঢেউ খেলানো এক মাটির ঢিপির সামনে এসে দাঁড়ায়। এদিক্ ওদিক্ কোদাল ঠুকে দেখে, খুঁড়তে আরম্ভ করে। খন্ খন্ আওয়াজ ক'রে কোদাল থেমে যায় এক পাকা গাঁথনির উপর। নদেরচাঁদ লাফিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, মিল গিয়া! এ নিশ্চয় খুব পুরানো সহরের অংশ। পুরানো যদি সহর হয় তখনকার মানুষের চিহ্ন যে মিলবে না কে বলতে পারে! সাবধানে গাঁথনি

...যে ভেঙে নীচে নেমে যায়, শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদের ...া মনে হয় না। বেশ খানিকটা নেমে গিয়ে একটি ...াট চারকোণা ঘরের মত! গিয়ে পৌঁচেছে আর ...পাশের একটি নালার মত সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসে ...ক মানুষের হামাগুড়ি দেওয়া দু'টি পা, তারপর ধড়, ...েষে মুণ্ডু! মানুষটি সম্ভব অত ছোট জায়গার ...িতর দিয়ে চোখ বন্ধ করে আসছিল কারণ চোখ খুলে ...দেরচাঁদকে ও অত আলো দেখেই ঠকাস করে চমকে ...ঠে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঘ্যাঁব করে এক বিকট শব্দ! ...ানুষটির তিন হাত কাদামাখা জটা, ও মুখে নোংরা ঘন ...াড়ি-গোঁফ—চোখ ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

—তুমি কে? ভারী গলায় নদেরচাঁদ প্রশ্ন করে।

লোকটি ওর সরল মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়,—আমি সত্যযুগের সাধু, ...তনকাল এখানে তপস্যা করছি!

—তুমি খুব পুরানো মানুষ?

—হ্যাঁ, আমার বয়স আশী হাজার বছর।

—তা হ'লে তুমি কি সেই আদম যে আপেল চুরি করে খেয়েছিল বলে ভগবান্ স্বর্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন?

লোকটি আদমকে জানে না। সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে সাবধানে বলে,—আমি তার চেয়েও পুরানো, আমি আদমের ঠাকুরদাদা!

—ঠাকুরদাদা ছিল নাকি!—কে জানে? কিন্তু তোমার বয়স ঠিক আশী হাজার বছর ত'?

—হ্যাঁ।

নদেরচাঁদ খপ্ করে দু'হাতে তাকে জাপটে ধরে বলে,—চল শীগ্‌গির, তোমায় যাদুঘরে নিয়ে যাই, সেই-খানেই তোমার আসল যায়গা। তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম এতদিন, এইবার পেয়েছি।

—আঃ, কি কর? ছাড় না, আমার তপস্যার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ! তুমি উপরে উঠে যাও ও ঠিক আগের মতন মাটি চাপা দিয়ে দাও। ছাড় ছাড় লক্ষীটি ভাই, আমার অন্য লোকজন একটু পরে এদিকে এসে পড়বে, তখন ভারি মুসকিল হবে আমার। আঃ, ছাড় বলছি, নইলে খুন করে ফেলব!

গজকচ্ছপের যুদ্ধ চলে। নদেরচাঁদ মার খায়, আঁচড়ানি কামড়ানিও সহ্য করতে হয় কিন্তু একেবারে মরিয়া, ছাড়বে না কিছুতে। এমন পুরানো আদিম মানুষকে ধরতে পেরেছে, একে হাত-ছাড়া করা চলে? হঠাৎ কোথা থেকে অনেক লোক এসে গর্ত্তের সামনে হাজির হয়। বড় বড় লোকেরা আছে এবং পুলিশ সাহেবও। দু'জনকে উপরে তুলে সকলে নদেরচাঁদকে এই মারে ত' এই মারে। তাদের প্রিয় অমন দৈবশক্তি-ওয়ালা সাধুকে কিনা অপমান, ওঁর সাত দিনের সমাধি কিনা ভেঙে দিল!

নদেরচাঁদের মুখে আদিম মানুষের কথা শুনে সকলে হাসে, টিটকারি দেয়। এমন বোকা আহাম্মুক কেউ আছে যে একটি জ্যান্ত লোককে ধরে বলে কিনা আদিম মানুষ! আশী হাজার বছর বয়স! নদেরচাঁদ একবার ছাড়া পেয়ে চেষ্টা করে শেষ বারের মতন। সাধুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে,—চল, যাদুঘরে চল। কী আশ্চর্য্য! টানাটানিতে সাধুর অমন জটা—অমন জঙ্গলের মত গোঁফদাড়ি ফস্ করে খসে গিয়ে এ এক অন্য চেহারা! এ যে পিলু! পিলু পুলিশের ভয়ে সাধু সেজে লোক ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে মাটির ভিতর সমাধি হয়ে যায় আর দলের লোকের সুড়ঙ্গ কেটে বার করে নেয়। লোকে বিশ্বাস করে—টাকা পয়সা দিয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ে!

পরের দিন খবরের কাগজে বেরুল যে নদেরচাঁদ বা... শ্রেষ্ঠ চালাক। অত বড় ধড়িবাজ ডাকাতকে ধরতে গোয়েন্দারা হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল কিন্তু তিনি কায়দা ক... ধরে ফেলেছেন। তার পরের পাতায় ছাপা—নদেরচাঁ... বাবু প্রমাণ হয়েছেন পৃথিবীর সেরা বোকা—কেননা একটা জ্যান্ত মানুষকে ধরে টানাটানি—যাদুঘরে চল!

নদেরচাঁদ দু'টী পুরস্কারই একসঙ্গে পেল।

অঙ্গার

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সুধীরঞ্জন একেবারে চমকেই উঠলো। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে যে বিভাসের সঙ্গে দেখা হ'বে, তা সে কল্পনাই করতে পারে নি।

মোহনপুরে ফুটবলের ফাইনাল খেলা। সুধী একটু ভাল ফুটবল খেলতে পারে বলে কলকাতা থেকে তাকে নিয়ে গেছে একটি দল। তাদের হ'য়ে খেলতে নেমেই দেখে বিপক্ষ দলে খেলতে নেমেছে বিভাস।

কত বছর পরে দেখা! ছ'বছর তো নিশ্চয়ই। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। তারপর বিশ্রামের সময় দু'জনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত গল্প করলো। খেলা আবার আরম্ভ হওয়ার আগে দু'জনে ঠিক করলো পরদিন সকালে দু'জনে নদীর ধারে এসে আবার গল্প করবে।

খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'ল। পরদিন আবার খেলা হবে। সুধী বাড়ী ফিরতে ফিরতে একবার অতীতের কথা মনে করল। সত্যিই কি ছেলে মানুষ ছিল তারা! এই বিভাসের সঙ্গে ছেলেবেলায় তার কত ভাব ছিল। দু'জনে একসঙ্গে খেলতে যেত, বেড়াতে যেত, স্কুলে যেত, বাড়ী ফিরতো। কিন্তু তারপর একদিন এই রকমই এক খেলার মাঠে দু'জনে সামান্য কারণে প্রথমে ঝগড়া, তারপর মারামারি, রক্তারক্তি এবং কথা বন্ধ। তারপর—তারপর ছ' বছর পরে দু'জনের আবার এই প্রথম দেখা।

তাদের স্কুল একটা খেলায় জয়লাভ করায় বিভাস জানিয়েছিল সুধীকে অভিনন্দন।

—সত্যিই কি সুন্দর খেলেছিস্ তুই! স্রেফ্ তোর খেলার জন্যই আমরা আজ জিতলাম!

সুধী বলেছিল—দূর্, তোর খেলা আরও ভাল হয়েছিল। কেন, তোর জন্যই আমরা জিতেছি।

—দেখ, সকলে বলাবলি করছে তুই ভাল খেলেছিস।

—বলুক গে, তু-ই অনেক ভাল খেলেছিস।

—সকলে মিথ্যাবাদী, আর তুই-ই একা সত্য কথা বলিস? রাগে বিভাস হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

—নিশ্চয়ই, এলো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সুধী'র উত্তর।

—সকলে মিথ্যা কথা বলে আর তুই?—

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—আমিও মিথ্যাবাদী?—তবে রে! সঙ্গে সঙ্গে বিভাস সুধী'র ঘাড়ে হিংস্র বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল। লেগে গেল একটা খণ্ডযুদ্ধ, কিছুক্ষণ পরে রক্তারক্তি।

—তারপর কেটে গেল এই ছয় বছর।

সুধী পড়তে এল কলকাতায়, বিভাস চলে গেল বোম্বে। ছ'বছর পরে আজ প্রথম দেখা।

পরদিন নদীর ধারে দু'জনের দেখা হ'ল। দু'জনই দু'জনকে আবেগে জড়িয়ে ধরল। তারপর পাশাপাশি বসে দু'জনে গল্প করতে লাগলো। কথায় কথায় বিভা বলল,—সত্যি, তখন কি ছেলেমানুষই ছিলাম!

সুধীও সলজ্জ হেসে বলল—সত্যি! সে কথা মনে পড়লেই হাসি পায়!

—হ্যাঁ, মিছিমিছি এত দিনের জন্য কথা বন্ধ। অতি বিশ্রী ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

—সত্যি ভাই, ছ'বছর যে কি মনের কষ্টে ছিলাম তোকে আর কি বলবো?

দু'জনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলো। দু'টো সিগারেট দু'জনে ধরিয়ে নিল। দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা ছিটকে পড়ল সুধী'র হাত থেকে বিভাসের দামী সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর। দামী পাঞ্জাবীটার একটা কোণ পুড়ে গেল। লজ্জিত এবং শঙ্কিত মুখে সুধী উঠে দাঁড়ালো। বিভা বলল,—তাতে কি হয়েছে? বস, গল্প করা যাক্।

এত সামান্য কারণে আর ছেলেবেলার মত মারামারি করে কথা বন্ধ করতে দু'জনের ইচ্ছা নেই। যাক্ না একটা সিল্কের পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর চেয়ে বন্ধুত্বের দাম অনেক বেশী।

কথায় কথায় হঠাৎ সুধী বলল,—ছেলেবেলার ঘটনা যাই হোক না কেন, কাল কিন্তু তুই সত্যিই ভাল খেলেছিস। তোর খেলা খুব সুন্দর হয়েছিল।

বিভাস বলল,—ও কথা বলে আমায় লজ্জা দিস্ না। তোর খেলা অনেক ভাল হয়েছিল।

প্রশান্ত হেসে সুধী বল্‌ল,—দূর্, কি যে বলিস্? তোর কি সুন্দর ড্রিব্‌ল্ করা, বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া—

বিভাস বল্‌ল,—কিন্তু মনে করে দেখ তো, কি সুন্দর ভাবে তুই বলগুলো আটকাচ্ছিলি—

সুধী একটু বিরক্তিস্বরে বলল,—দেখ, যা তা বলিস না।

—কে যা তা বলছে, তুই না আমি? বিভাসের গলাও শোনা যায়।

—তুই! বল্‌ছি তুই ভাল খেলেছিস, তা না—

—দেখ, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্ না। তোর স্বভাব আর বদলালো না।

—তোর স্বভাবও তো একতিল বদলায় নি! এত দিনের বন্ধুর একটা কথা শুনছিস্ না কেন?

—তুই বা শুনছিস না কেন? বলছি, তুই ভাল খেলেছিস—

—তুই বলবার কে?

—তুই কে?

—কি বললি, আমি কে?—সঙ্গে সঙ্গে সুধী প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিভাসের ঘাড়ে।

বিভাসও উল্টে মারলো এক ঘুঁষি, চীৎকার করে উঠলো,—শয়তান, আর একটু আগে আমাকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলি!

মারামারি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্য বর্ষণ চলতে লাগল। ছয় বছর আগেকার রক্ত আবার গরম হ'য়ে উঠলো। যখন হাতাহাতি নিজেদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন দু'জনেই তুলে নিল দুটো গাছের ডাল। দু'জনের ক্ষতবিক্ষত দেহ সোজা হয়ে উঠলো, দু'জনেরই চোখে পাশবিক উল্লাস ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তারপর দু'জনে দু'জনের দিকে তেড়ে গেল।

আমরা ফাইন্যাল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন দু'দলই খেলতে নামলো, কিন্তু কোন দলেই তাদের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সুধীরঞ্জন কিংবা বিভাসকে দেখতে পেলাম না। শুনলাম, দু'জনকেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। একজনকে কলকাতায় আর একজনকে বোম্বে।

হাসির গান

বন্দে আলী মিয়া

শ্রীরামপুরের দরগা তলায় আছে তালের বন—
রস খায় আর বাঁশীর সুরে গান গায় রাবণ।

* * * *

শোন শোন সর্ব্বজন—কহিতেছি বিবরণ
সগর রাজার ছিল নাকি সোয়া লক্ষ নাতি,—
ইন্দুরে তার গিলেছিল ইন্দ্র রাজার হাতী।

* * * *

শিবহরি দ্বারোয়ান পালোয়ান খুব,
কাঁচা কলা খেয়ে তার পেট টাবটুব;
হুক্কায় কষে কষে সুখটান মারে
তবে তার ব্যায়রাম সারে।

* * * *

আলুর পাতা থালু থালু ভ্যাঁড়লার পাতায় দৈ,
শুঁট্‌কো জামাই চিঁড়ে চিবোয়, মোট্‌কা জামাই খৈ

* * * *

মাণিক পীর মারেন তীর লাগে কলাগাছে
কপাল কেটে রক্ত ঝরছে—কাঁদ্‌ছে পুঁঠি মাছে।

পেনিসিলিন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

আজ হইতে প্রায় ষোল বছর আগেকার কথা। ধ্যাপক আলেক্জাণ্ডার ফ্লেমিং লণ্ডনের সেণ্ট্ মেরি াসপাতালে বসিয়া বসিয়া আপন মনে কাজ করিতে- ছলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জীবাণুতত্ত্ব। রীক্ষাগারে নানা রকম যন্ত্রপাতি ছড়ান। ফ্লেমিং সাহেব তার ভিতর হইতে একটি কাল্চার প্লেট তুলিয়া লইলেন। কছুক্ষণ আগে তিনি এই প্লেটে 'ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস' নামে এক তুরন্ত জীবাণুর চাষ করিয়াছিলেন। আপাততঃ এই জীবাণুটি লইয়াই তিনি পরীক্ষা করিবেন।

হঠাৎ ফ্লেমিং সাহেব লক্ষ্য করিলেন, প্লেটের উপর কেমন এক রকম সবুজ রংএর ছাতা ধরিয়া রহিয়াছে! পরিষ্কার ঘর, পরিষ্কার যন্ত্রপাতি—এখানে আবার ঐ রকম বাজে জিনিষের উৎপাত দেখা দিল কেমন করিয়া? ফ্লেমিং সাহেব বিরক্ত বোধ করিলেও কিছুটা কৌতূহলও তাঁর হইল। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি প্লেটটি লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যা দেখিলেন তা আরও অদ্ভুত। সবুজ ছাতাগুলি শুধু ওখানে আসিয়া গজায়-ই নাই, ছাতার চার দিক্কার ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তবে কি ওই সবুজ ছাতাগুলি তুরন্ত ষ্ট্যাফাইলো-কক্কাস্ জীবাণুগুলিকে খাইয়া ফেলিল?

ফ্লেমিং সাহেবের কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। ব্যাপার-টাকে ঐখানেই শেষ করিয়া না দিয়া তিনি উহা লইয়া রীতিমত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন।

অনুসন্ধানে যে তথ্য আবিষ্কৃত হইল তা আরও অদ্ভুত। ছাতাগুলি আসলে আর কিছুই না, এক রকম অতি সূক্ষ্ম ছত্রাক—ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'ফাঙ্গাস'। উহার বৈজ্ঞানিক নাম পেনিসিলিয়াম নোটাটাম্। এই ফাঙ্গাসের এক অদ্ভুত গুণ,—ইহার ভিতর হইতে এমন এক রকম অদ্ভুত জিনিষ বাহির হয় যেগুলি নানা রকম দূষিত জীবাণু ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। 'ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস্', 'ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্' প্রভৃতি বীজাণুর ইহার পরম শত্রু।

ফ্লেমিং সাহেব ব্যাপারটার ভিতর একটা বড় রকম সম্ভাবনার আভাস পাইলেন। তিনি জানিতেন জীবাণু-জগতে এমন অনেক জীবাণু আছে যারা পরস্পরের শত্রু। একটির উপর আর একটি প্রয়োগ করিয়া অপরকে ধ্বংস করিয়া ফেলা চলে। আর আমাদের যাবতীয় ব্যারাম-পীড়াই তো হয় এই সব দূষিত জীবাণুর কল্যাণে! কাজেই, কে জানে, তাঁর এই নতুন-আবিষ্কৃত জীবাণু দিয়া হয়তো পৃথিবীর অনেক মারাত্মক ব্যাধিকেই ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইবে। এ রকম জীবাণু হয়তো আরো কত আছে, কিন্তু মানুষ আজও তার সন্ধান পায় নাই।

অধ্যাপক ফ্লেমিং ব্যাপারটাকে সহজে ছাড়িয়া দিবার পাত্র ন'ন। তাঁর পরীক্ষাগারে জোর গবেষণা চলিল। কিছু দিন পরে দেখা গেল, পেনিসিলিয়াম্ নোটাটাম্ জিনিষটি বিশেষ ভাবে তৈরী এক রকম ক্বাথের মধ্যেই সব চেয়ে ভাল জন্মায়, এবং জন্মিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের শরীর হইতে এক রকম অদ্ভুত পদার্থ বাহির হইতে থাকে—যা অনেক রকম দূষিত জীবাণুকেই খাইয়া ফেলে। পেনি-সিলিয়াম্ নোটাটাম্ হইতে জন্মায় বলিয়া ঐ জিনিষটির নাম দেওয়া হইল "পেনিসিলিন"। শব্দটি তোমরা ডাক্তারদের মুখে আজকাল হামেশাই শুনিয়া থাকিবে। কারণ এই পেনিসিলিন আজ সত্য সত্যই চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

অধ্যাপক ফ্লেমিং তো পেনিসিলিন আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু তখনও ব্যাপারটা লইয়া বৈজ্ঞানিক-মহলে খুব একটা সোরগোল পড়ে নাই। সেটা আরম্ভ হইল হালে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞান লইয়া খুব জোর গবেষণা চলিতেছে এ কথা তোমরা আগেই রামধনুতে পড়িয়াছ। শুধু অস্ত্রোপচারের দিক্ দিয়া নয়, নানা নতুন নতুন ওষুধের আবিষ্কার হইয়া এই কয় বছরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অদ্ভুত রকম উন্নতি দেখা দিয়াছে। পেনিসিলিনের ব্যবহারও তার মধ্যে একটি। নানা সম্ভাব্য ওষুধের মত পেনিসিলিন লইয়াও এই সময় বিজ্ঞানীর দল নানা রকম পরীক্ষা করিতেছিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল পেনিসিলিনের এমন কয়েকটা আশ্চর্য্য গুণ আছে যা

অনেক ওষুধের নাই। অনেক জীবাণু আছে যা অন্য জীবাণু ধ্বংস করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেরাও শরীরকে আক্রমণ করিয়া বসে। এ রকম ওষুধ দিয়া যে কোন সুবিধা হয় না তা তো বুঝিতেই পার! পেনিসিলিন এ দিক দিয়া একেবারে নির্দ্দোষ শরীরের উপর পেনিসিলিন অতিমাত্রায় প্রয়োগ করিলেও কোন বিষক্রিয়া দেখা যায় না—কোনও পেশী বা দেহকোষও আক্রান্ত হয় না।

কোন কোন জীবাণু আছে যা অন্য কোনও রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে তেমন কাজ করে না। পেনি-সিলিনের সে বালাইও নাই। এমন কি রক্ত-পুঁষের ভিতর প্রয়োগ করিলেও ইহা বেশ কার্য্যকরী হয়। তা ছাড়া ফুসফুস, হৃদ্পিণ্ড বা মগজের মধ্যে পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে পেনিসিলিন ঢুকাইয়া দেওয়া যায়। ম্যানিঞ্জাইটিস্, নিউ-মোনিয়া, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি রোগে পেনিসিলিন ব্যবহার করিয়া ডাক্তারেরা আশ্চর্য্য উপকার পাইয়াছেন। তবে সব রকম ব্যারামের বীজাণু ধ্বংস করিবার ক্ষমতা অবশ্য পেনিসিলিনের নাই। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ব্যারামেই ইহা অব্যর্থ প্রতিষেধক।

পেনিসিলিন ব্যবহারে তুই একটি অসুবিধাও যে নাই তা মনে করিও না। জিনিষটি বড় ক্ষণস্থায়ী, আর বড় চট্ করিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। সে জন্য পেনি-সিলিন বারে বারে প্রয়োগ করিতে হয়। তা ছাড়া রোগীকে পেনিসিলিন মুখ দিয়া খাওয়াইয়া তেমন উপকার পাওয়া যায় না—কারণ পেটের ভিতর গিয়া সেখানকার বিভিন্ন পাচক রসের সংস্পর্শে আসিলে এর আর কোন গুণ থাকে না। এ জন্য সাধারণতঃ ইন্জেক্সন্ করিয়া বা বাহির হইতে গুঁড়ার আকারে বা পেষ্টের মত করিয়া পেনিসিলিন ব্যবহার করিতে হয়। সম্প্রতি নিউমোনিয়া রোগে খুব সূক্ষ্ম পেনিসিলিনের গুঁড়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য আরও নানা ভাবে পেনিসিলিন প্রয়োগের চেষ্টা যে চলিতেছে না তা মনে করিও না। তবে সেগুলি এখনও পরীক্ষামূলক ভাবে আছে।

পেনিসিলিন কিন্তু এখনও বেশ তুর্লভ ওষুধ। বিশুদ্ধ পেনিসিলিন পাওয়া খুবই কষ্টকর। বহু পরিশ্রমে নানা কঠিন প্রক্রিয়ার পর অতি সামান্য মাত্রায় পেনিসিলিন পাওয়া যায়। যে ক্বাথের মধ্যে পেনিসিলিয়াম্ নোটাটাম্ জন্মায় তা হইতেও পেনিসিলিন উদ্ধার করা বেশ কষ্ট-সাধ্য। কম করিয়া লক্ষ ভাগ ক্বাথে হয়তো এক ভাগ মাত্র পেনি-সিলিন থাকে। তবে জিনিষটার গুণ এই—অনেকখানি তরল করিবার পরও এর বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না।

আমেরিকায় আজকাল পেনিসিলিন লইয়া খুব গবেষণা হইতেছে। সেখানে কম করিয়া বড় বড় প্রায় কুড়ি প্রতিষ্ঠান এই পেনিসিলিন তৈরীর কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আমাদের দেশেও বোম্বাই হফ্কিন্স ইন্ষ্টিটিউট্ ও কলিকাতায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে এ বিষয়ে গবেষণার আয়োজন হইয়াছে। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট হইতেও বাংলার বিভিন্ন হাসপাতালে পেনিসিলিন সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কৃপণ

(কুড়ান গল্প)

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

সবজজ্ হরিবাবুর কৃপণ বলিয়া খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। একদিন হরিবাবু কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এক নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন,—বাড়ী হইতে প্রায় তুই মাইল দূরে। নিমন্ত্রণ-বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া মনে পড়িল, বাড়ীতে লণ্ঠনটা বোধ হয় না নিভাইয়াই আসিয়াছেন। সঙ্গীদের বলিলেন, "একটা বড্ড জরুরী কাজ ভুলে এসেছি, আপনারা এগুন, আমি আসছি।"

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন চারিদিকে অন্ধকার। নবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লণ্ঠনটা কি নিভিয়ে রেখেছিস? এই জন্যই আবার এতটা পথ ফিরে এলাম।"

ভৃত্য বলিল, "আপনি যাওয়ার পরই আমি ওটা নিভিয়ে রেখেছি। কিন্তু বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে এতটা পথ আপনি হেঁটে এলেন, তাতে আপনার জুতো যোড়া ক্ষয়ে গিয়ে কি খানিকটা ক্ষতি হ'ল না?"

হরিবাবু উত্তর দিলেন, "না রে, সে হুঁশ আছে। জুতোটা আর পায়ে দিয়ে আসি নি, বগলে করেই এনেছি।"

যা ছিল সবার মনে—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৩

বেলা তখন ন'টা বাজে—

ট্রাম থেকে নামলাম পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে। সম্পাদক-মশায় চিঠিতে জানিয়েছিলেন, দরগা রোডে নাসিরুদ্দিন সাহেবের দৌলৎখানায় আমাদের সকলকে জমায়েৎ হ'তে হবে। হদিস্ দিয়েছিলেন, দরগা রোডটা এই দিকেই।

ট্রাম থেকে তো নামলাম, কিন্তু কোথায় দরগা রোড? চারধারে ঘর-বাড়ির ঘন অরণ্য। তার মাঝে মাঝে ছোট-বড় পথ এদিকে-ওদিকে চলে গেছে। পথ দিয়ে চলেছে নানা রকমের যানবাহন ও পথিকের স্রোত; ডান দিকে দেখা যাচ্ছে মসজিদের সোনালি রৌদ্র-মাখা গুম্বজ, বাঁ দিকে দেখছি আকাশ পানে উঠেছে মিনার। পথের দু'পাশে দোকান-পসার, চা-খানা, হোটেল, তেল ও ডাল্ডা-ভাজা খাবারের দোকান। ক্ষুধার্ত্ত ক্রেতায় সবগুলিই ভরা। তারা মালাই-দেওয়া চা, ডাল্ডা-ভাজা মোগলাই পরোটা ও মাংস ইত্যাদি খাচ্ছে, গল্প করছে, প্রাণ খুলে হাসছে ও সাথীকে প্রচুর হাসাচ্ছে!

এই দৃশ্যের মাঝে কোথায় সেই দরগা রোড? এক-জনকে ডেকে পথটির কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে বললে, 'নেই জান্‌তা।' পকেটে সম্পাদক-মশায়ের চিঠিখানি ছিল; বার করে আবার পড়লাম। লেখা ছিল, পার্ক সার্কাসের শেষে। কাজেই আর কোন পথিককে আমার দুশ্চিন্তায় পীড়িত না করে পার্ক সার্কাসের দিকে এগোতে লাগলাম।

জীবনে সার্কাস দেখেছি অনেক; কিন্তু পার্ক সার্কাসের মত সার্কাস আর একটিও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সাহেব, মেম, তুর্কী, ইরাণী, আরবী, ফারসী, কাবুলী, কাফ্রী—কত রকমের মুখ, কত রকমের পোশাক ও ভাষা যে দেখলাম ও শুনলাম তা বলে শেষ করতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই জায়গাটি দেখেই লিখে-ছিলেন, "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" ইতিহাসের চর্চ্চা করেন পরিষদে এমন দু' একজন লোক আছেন। তাঁরা আমার এই মন্তব্যটি শুনে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ কবিতাটি লেখেন তখন এই সার্কাসটি বসেই নি। বরং বল্‌তে পারো তিনি বড়বাজার দেখে লিখেছিলেন। তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে বোল-পুরে যাবার-আসবার রাস্তা ছিল বড়বাজারের ভেতর দিয়ে।" হয়তো তাই-ই হবে।

যাক্। সার্কাস্ দেখতে দেখতে তো এগোতে লাগলাম। যদিও জায়গাটা বাংলা দেশ, বাংলারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীর এক অংশ তবুও একটি বাঙালি চোখে পড়ল না। কিংবা হয়তো পড়েছিল; তবে তাঁরা পাজামা ও বিদেশী বুলির আড়ালে এমন বেমালুম গা ঢাকা দিয়েছিলেন যে আমি ঠাহর করতে পারি নি। পরিশেষে পথ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সামনে কিছুদূরে দেখা যাচ্ছে, মহীরুহসম বৃক্ষরাজির শ্যামল বিস্তার ও সার্কাসের ছ'মাথা এক প্রাসাদতুল্য গৃহের দরজায় টুলারূঢ় এক চাপরাশিকে। তার কাছে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম। একে সাহেবের চাপরাশি, তার ওপর তার পাশে শুয়ে ছিল বাঘের মতো একটা গ্রেট ডেন কুকুর। কাছে যেতেই তারা দু'টিতে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যে দমে গেলাম। তবুও যখন এসেছি তখন পিছিয়ে যাওয়া বিপদের মনে করে সাহস-ভরে দরগা রোডের কথা জিজ্ঞেস করলাম। দেখলাম, আমার ভয়টা অমূলক। দুটিরই মেজাজ খুব ঠাণ্ডা। চাপরাশি বললে, "জী?" আর কুকুরটি আমার

দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিছু দূরে একটি খুকী মেমের দিকে সোৎসুক্যে তাকিয়ে রইলো। বালিকাটি স্কীপ্ করছিল।

বললাম, "দরগা রোড?"

—"সিধা চলা যাইয়ে।"

তার কথামত "সিধা" চল্‌তে চল্‌তে এমন এক জায়গায় এসে পড়লাম যেখানে পথটি দ্বিধা হয়ে গেছে। এবং সেইখানেই একেবারে খাস বাঙলার দু'টি ভদ্র লোকের দেখা পেলাম। তাঁরা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

রাস্তাটির কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন বললে, "কি কন্? দরগা রোড? এই দিকেই অইব।" বলে আমাকে পশ্চিমের পথটি দেখিয়ে দিলেন। আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়ে তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পথে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। এদিকে অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময় কিছুক্ষণ হ'ল উত্তরে গিয়েছিল।

কিছুদূর গিয়ে একটি মসজিদ চোখে পড়ল। একটি লোক তার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাই, দরগা রোডটা কি এই দিকে?"

"নেহি সাহেব, উধার" বলে সে উত্তর-পূর্ব্বদিক দেখিয়ে দিলে। তারপর আবার বল্‌লে, "হিঁয়া সে দূর।"

তখন হতাশ হয়ে পড়লাম! এতখানি বয়স হ'ল, দরগা দেখেছি অনেক, অনেক রোড দিয়েও হেঁটেছি, আজও হাঁটছি; কিন্তু দরগা আর রোড এই দুটির মিলনে যার উদ্ভব তা দেখা আমার ভাগ্যে আর হ'ল না! ভাবলাম বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু তার পরই মনে পড়ল, "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও—?"

ভাগ্যে কবিরা ছিলেন! না হলে আমার মতো কত পান্থ যে চল্‌তে চল্‌তে দীর্ঘ পথ দেখে পথের পাশে গাছ-তলায় বসে পড়তো তার ঠিক কি?

আবার ফিরে চললাম, মস্‌জিদের লোকটির কথামত পথের দিকে।

এবার যে পথে এসে পড়লাম, সে পথই আমাকে পথ দেখাতে লাগল। কারণ সে পথে না ছিল একটি লোক, না ছিল একখানি গাড়ি, না ছিল স্থলচর কোন পশু। তার এক দিকে জনবিরল পার্ক আর এক দিকে প্রাসাদ-তুল্য নিদ্রিত, নিঝুম পুরী; পুরীর পর পুরী; তারপর মাঠ। এর মাঝে প্রশস্ত পথটি পড়ে পড়ে রোদ পোহাচ্ছিল।

পথটি শেষ করে আবার একটি পথে এসে পড়লাম হঠাৎ যেন এলাম এক ভাঙা-গড়ার দেশে। এ গ্রাম

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

ইনি কলমের খোঁচায় শিশুসাহিত্য-পরিষদের সদস্যদের এক এক ছবি,—ইংরেজীতে যাকে বলে 'পেন্ পিক্‌চার', দিচ্ছেন। কিন্তু এঁর নিজের 'পেন্ পিক্‌চার' কে দেয়? তাই আমরা এঁর আসল 'পিক্‌চার' একখানি দিচ্ছি। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এঁর লেখার সঙ্গে খুব পরিচিত, কারণ শিশুসাহিত্যে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম স্বাক্ষরিত অসংখ্য বই (মৌলিক ও অনুবাদ) আছে তা সবই এঁর লেখা। কেবল শিশুসাহিত্যে নয়, বড়দের সাহিত্যেও এঁর মৌলিক রচনা ও অনুবাদ আছে। কেউ কেউ নামের মিল দেখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে এঁর নামের ভুল করে বসেন। আসলে কিন্তু এঁরা এক লোক ন'ন। —রাঃ

, শহরও নয়, নূতনও নয় পুরাতনও নয়, পরিচ্ছন্নও নয়, লিনও নয়—সব মিলিয়ে এক। তারই মাঝে একখানি র্ণ, পুরাতন পাকা ইমারতের দেওয়ালে লেখা—দরগা াড। বাড়িখানির ওধারে রয়েছে জঙ্গল, গাছ-পালা, ন গ্রামের সবুজ পটভূমির গায়ে শহুরে ছবি আঁকা হচ্ছে। ুষে একদিন সকলে দেখবে কেবল পটই আছে, সেই বুজ ভূমি আর নেই। চল্‌তে চল্‌তে চোখে পড়তে াগল, পুরানো মসজিদ, পুরানো দরগা, পুরানো পুষ্করিণী। চা লাল তার জল। ধোপারা পাটে ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দে কাপড় াচ্‌ছে। আর, চোখে পড়তে লাগল এক ধরণের মানুষ, ারা শহুরে বা গ্রাম্য নয়, অথচ দুইয়েরই ভাব তাদের পাশাক, চেহারা ও কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পাচ্ছে।

যত এগোতে লাগলাম ততই মনে আনন্দ, দেহে শক্তি ও আকাশে বেলা বাড়তে লাগল। অবশেষে পথ হ'ল শেষ। ডাইনে চোখে পড়ল নাসিরুদ্দিন সাহেবের ফটকওলা সামনে বাগান-দেওয়া বাড়ি। ফটকের একটি ামের মাথায় তাঁর নামটি ঝুলছিল, নিরবলম্ব হয়ে নয়, একখানি কাঠের ফলকে লেখা থেকে।

সেখান থেকে চারধার লক্ষ্য করে মনে হ'ল, যদি সেই চাপরাশির কথামত 'সিধা' চলতাম তা হ'লে আমাকে এত ঘুরতে ও কষ্ট পেতে হ'ত না; সহজে ও শীঘ্রই এখানে এসে পড়তাম। ঐ তো সেই 'সিধা' পথটি এসে মিশেছে এই পথটির সঙ্গে। তার কথায় ভরসা পাই নি কেন? স চাপরাশি বলে কি?

ফটক দিয়ে বাগানে ঢুকলাম; বাগান পেরিয়ে বৈঠকখানার দরজার পর্দ্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, শূন্য ঘর; কাউচ, সোফা ও চেয়ারগুলিও শূন্য। তবুও সাহস করে ভেতরে ঢুকতেই কতকগুলি গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু সবগুলো এমনভাবে জড়িয়ে আসছিল যে, কোনটাই চিনতে পারলাম না। আবার এগিয়ে গিয়ে যে চিনে নেব সে সাহসও হ'ল না; কেননা মহলটা ছিল অন্দরের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁক দিতেই স্বয়ং গৃহস্বামী, নাসিরুদ্দিন সাহেব, হাসিভরা মুখে বেরিয়ে এসে সঙ্গে করে অকুস্থলে নিয়ে গেলেন। সেখানে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তাতে মনে পড়লো হ্যান্‌স অ্যাণ্ডারসেনের ও গ্রীমসের গল্পের দৈত্যদের খানার কথা। আমি অ্যাণ্ডারসেন বা গ্রীমস্‌ নই; কাজেই তার বর্ণনা করতে পারব না। সাহেব আয়োজন করেছিলেন পনের জনের। কিন্তু উপস্থিত ছিলেন মাত্র পাঁচ জন (আমাকে নিয়ে)। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সদস্যগণের মনে অনন্ত ক্ষুধা থাকলেও প্রায় সকলেরই জঠরের পরিপাক শক্তি হ্রাস পেয়েছে। তবুও পাঁচ জনে প্রায় আধাআধি শেষ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরে এসে বসে চন্দননগরে যাবার সলা পরামর্শ করে সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং শীঘ্র আর একদিন তাঁর গৃহে এই রকম সভা আহ্বানের অনুরোধ জানিয়ে সকলে বিদায় নিলাম।

কিন্তু সাহেব ছাড়লেন না; বললেন, "চলুন, ওয়াজেদ আলি সাহেবের বাড়ি।"

প্রস্তাবটি চমৎকার। ওয়াজেদ আলি সাহেবের মতো ব্যক্তিকে পরিষদে পেলে শক্তি বৃদ্ধি হবে।

নাসিরুদ্দিন সাহেবের নিজেরই মোটর আছে; গাড়িখানি তিনি নিজেই চালনা করেন। সকলকে গাড়িতে তুলে নিয়ে হাঁকিয়ে দিলেন ওয়াজেদ আলি সাহেবের বাড়ি। এ-পথ, সে-পথ ঘুরে গাড়ী গিয়ে থামলো একখানি প্রকাণ্ড বাড়ির লোহার ফটকের সামনে। বাড়িখানির সামনে উঁচু দেওয়াল; তারপর গাড়ি-বারান্দা। বারান্দার ছাদের নিচে পায়রার ঝাঁক বাসা বেঁধেছে। নিঝুম পল্লী, বিজন পথটি। বেলা তখন দুপুর হ'তে চল্লো। পায়রাগুলো ডাকছিল, 'বকম, বকম।" তাদের গম্ভীর ডাক বাড়িখানার দেওয়ালে দেওয়ালে ঘা খেয়ে যেন গুমরে মরছিল।

সকলে ফটক পেরিয়ে গাড়ি-বারান্দা দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম সাহেবের বৈঠকখানায়। ওয়াজেদ আলি সাহেবের নাম শুনে আসছি, সুমিষ্ট রচনা পড়ছি অনেক দিন থেকে। তাঁকে কখন দেখি নি।

আমাদের সাড়া পেয়ে তিনি পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। ছোটখাটো বলিষ্ঠ মানুষটি; সারা মুখে হাসি মাখানো। দু' হাত বাড়িয়ে সকলকে অভ্যর্থনা করে বসতে দিলেন এবং এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন আমরা অতিথি, তাঁকে যা বলবো তৎক্ষণাৎ তাই করতে প্রস্তুত। তাঁর চলা-ফেরায়, কথায়, চাহনিতে একটা

ল দীপ্ত ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। শুনলাম, তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে; কিন্তু আমার কেমন মনে হ'তে লাগলো তিনি পরিহাস করছেন। তাঁর বয়স খুব বেশি যদি হয় তো পঁয়তাল্লিশের ওদিকে নয়। প্রতি কথাতেই হাসি। হাসি সংক্রামক। তাই যতক্ষণ তাঁর কাছে রইলাম ততক্ষণ আমরাও প্রাণ খুলে হাসলাম। কেবলই মনে হ'ল কোন হাকিমের কাছে আসি নি, এসেছি একজন সাহিত্যিকের কাছে, একটি মানুষের কাছে। তিনিও আমাদের পরিষদের সদস্য হলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলে বাড়ির পথ যখন ধরলাম তখন বেলা দুপুর।

চন্দননগর হ'ল কলকাতা থেকে রেলে মাইল কুড়িক দূরে কিন্তু গল্পে লাগছে আরও অনেক দূরের পথ। তাই নয় কি? জানোই তো কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—ভ্রমণ কমাও। কাজেই এই পথটুকু পার হতে গেলেও তার আয়োজনে বেশি সময় লাগবে বৈ কি! আর একটি বেলার আরো দুটি কথা শোন, তারপর নিয়ে যাব চন্দননগরে।

সেকালে, একালেও অনেক সময়, হাটে-বাজারে সভা হয় বেশি শ্রোতা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সাত দিন পরে, চন্দননগরে যাবার আগের দিন কলেজ ষ্ট্রীটের বাজারে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যে অধিবেশন হ'ল, তার সে উদ্দেশ্য ছিল না। তখন ভূতপূর্ব্ব মাসপয়লার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মশায় বাজারেরই একটি দোকানে থাকতেন। সে দোকানটি অবশ্য কাপড়ের, মুদির বা মশলাপাতির নয়—বইয়ের। তিনি সেখানে চাকরি করতেন। তাঁর শয়ন ছিল সেই 'হাটের মন্দিরে' ও ভোজন ছিল যত্র তত্র। ভট্টাচার্য্য মশায় পরিষদের আজীবন সদস্য এবং এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে আছেন। তিনি সভা আহ্বান করেছিলেন বলেই আমাদের সকলকে সেদিন বাজারে গিয়ে বসতে হল।

সকলে একে একে উপস্থিত হতে লাগলাম। বাজারের ওপর দোতালায় বেশ বড়-সড় একখানি ঘর। সে সভায় এলেন অনেকে—যাঁদের তোমরা আগে দেখেছ, তাঁদের প্রায় সকলেই। আর এলেন শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ভরাট দেহ, ভরাট মুখখানি, দরাজ মন। একটু গায়ে-পড়া, মিষ্টালাপী। কথার মাঝে হাসি উঁকি-ঝুঁকি দেয় কিন্তু কথায় মধু ও হুল দুইই আছে। বেশি করে চোখে পড়ে তাঁর ছোট কিন্তু উজ্জ্বল চোখ দু'টি। তাঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন শিল্পী শ্রীযুক্ত ফণী গুপ্ত। তাঁর দেহ ও প্রকৃতি ফণীভূষণ নামটি সার্থক করেছে। বপুটি গৌরবর্ণ, ও আড়ে বহরে বিশাল। মুখে হাসি জমাট বেঁধে আছে। তিনি কথা বলেন কম কিন্তু হাসতে জানেন বটে। নিস্তব্ধ রাতে যদি হেসে ওঠেন তাহলে সাত পাড়ার লোকও চমকে উঠবে। তাঁরও দৃষ্টি প্রখর। তাঁদের পর দেখা দিলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর। ধীরেনবাবু যুদ্ধের গল্প লেখেন। মূর্ত্তি যোদ্ধার মতো, কথাবার্ত্তাও যোদ্ধাসুলভ, চলা-ফেরা দেখলে মনে হয় সৈনিক। তাই হাসিটা একটু আড়ালেই থাকে। তবে যখন বার হয় তখন বুলেটের মতোই ছোটে। তিনি যে কেন যোদ্ধার পোশাক পরে কোমরে অসি বেঁধে ও বুকে লেখনী গুঁজে বেড়ান না, তিনিই জানেন। তাঁদের পরেই দেখা দিলেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, মৌচাকের "মধুদিদি"। তাঁকে আমি কোন দিনই দেখি নি, সেদিন দেখলাম।

সেদিনের অধিবেশনে সম্প্রতি করপোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের সহযোগিতায় আমাদের পরিষদের যে শিশুশিল্প-প্রদর্শনী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, নানা বিষয় আলোচনার পর তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'ল। শিল্প-প্রদর্শনীর পরিকল্পনাটি স্বামী প্রেমঘনানন্দের। স্বামীজিকে ধন্যবাদ তোমরাই দিও; আমরা দেব না। কেননা তিনি আমাদেরই একজন। আর ঠিক হ'ল, চন্দননগরে কে কে যাবেন। তার তালিকাও প্রস্তুত হয়ে গেল। যাত্রীর সংখ্যা হ'ল আটজন। পরদিন সকাল প্রায় আটটায় গাড়ি। আমরা সকলে শহরের নানা দিকে ছড়িয়ে আছি। কে কোথায় কখন এলে একসঙ্গে মিলতে পারবো তা স্থির করে সভান্তে সন্ধ্যার একটু আগে সকলে হৃষ্টমনে সভাস্থল ত্যাগ করলাম। (ক্রমশঃ)

অভিযাত্রীর পত্র

(হংকং ও ফরমোসা)

শ্রীবিশ্বপতি দাশগুপ্ত

রামধনুর ভাইবোনেরা,

আমি এখন ফরমোসা দ্বীপের বাসিন্দা,—ফরমোসা দ্বীপের রাজধানী তাইহোকুতে বাস করছি। তবে ফরমোসায় আসার আগে আমি হংকং ঘুরে এসেছি। আগে তারই গল্প শোন।

হংকং যদিও চীনেরই একটি বন্দর, তবুও এ বন্দর চীনাদের নয়। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন সেটা ছিল সম্পূর্ণ বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীন। (এখন অবশ্য হংকং জাপানীদের হাতে গেছে।)

১৮৪১ খৃঃঅব্দে ইংরাজদের সঙ্গে চীনাদের এক যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়ী হয়। 'চুয়েন পি' নামক সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে হংকং ইংরাজদের হস্তগত হয়। কিছুদিন পরে নানকিংয়ের সন্ধিতে হংকংয়ের উপর ইংরাজ-কর্ত্তৃত্ব আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ চীনের কোয়ানটুং প্রদেশের উপকূলের কাছে চুকিয়াং নদীর মোহনার প্রবেশ-মুখ হতে মাইল কুড়ি দূরে হংকং দ্বীপ অবস্থিত। চুকিয়াং নদীর সাধারণ নাম ক্যান্টন নদী। এর আরো একটি নাম আছে, পার্ল বা মুক্তা নদী।

হংকং নামের উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল শোন। স্থানীয় জেলেরা এই দ্বীপের নঙ্গর করার জায়গাকে বলতো "হংকং"। হংকং নামের মানে হ'ল "ভাল বন্দর"। কিন্তু বিদেশীয় নাবিকরা সম্পূর্ণ দ্বীপের নামই ধরে নিল 'হংকং'। ম্যাপে দ্বীপের নাম হংকংই উল্লেখিত হতে লাগল। ১৮৩৯ খৃঃঅব্দে কয়েকজন নির্যাতিত বৃটিশ প্রজা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। এর বছর দু'এর ভিতর কৌলুন উপদ্বীপ ও হংকং দ্বীপ বৃটিশ-অধিকারভুক্ত হয়ে গেল।

বৃটিশ অধিকারে আসার পর হতে হংকংয়ের অসাধারণ উন্নতি হয়েছে। আগে যার জনসংখ্যা ছিল হাজার দু'এক এখন তার জনসংখ্যা তিন হতে চার লাখের ভিতরে। জাপানী, চীনা, ভারতবাসী, মালয়বাসী, ইয়োরোপীয়ান, আমেরিকান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জায়গার অধিবাসীদের একত্র সমাবেশ এখানে।

হংকং একটি পার্ব্বত্য দেশ। কৌলুন উপদ্বীপ ও হংকংএর মাঝখানের প্রণালী মাইল পাঁচেক চওড়া। এর ভিতরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসাগর আছে। এখানে স্নান করাও চলতে পারে। নগরে জল সরবরাহ করা হয় পাহাড়ের উপর থেকে।

ভিক্টোরিয়া হংকং দ্বীপের রাজধানী। হংকং বন্দর বলতে ভিক্টোরিয়াকেই বোঝায়। এটা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর। চারিদিকের পাহাড় হ'তে হংকংয়ের দৃশ্য বড় সুন্দর। "পীক্" অঞ্চল দ্বীপের শ্রেষ্ঠ স্থান। এখানকার পার্ব্বত্য রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যে সব প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এখানকার আবহাওয়াও বেশ ঠাণ্ডা। মোটের উপর জায়গাটা আমার খুবই ভাল লাগল। সব চেয়ে আশ্চর্য্য কথা, হংকংএ গাড়ী ঘোড়া চলতে পারে না। রাস্তাগুলি সিঁড়ির মত। তবে সৌখীন পাল্কী চোখে পড়ে।

হংকং বাস্তবিকই খুব চমৎকার উন্নতি লাভ করেছে। প্রাচীন কালের মৎস্যজীবীদের আবাসভূমি ও দুর্দ্দান্ত ডাকাতদের আড্ডা, সেই হংকং হয়েছে এখন পৃথিবীর একটি প্রধান বাণিজ্যপ্রধান নগর। বন্দরের তিনটি ডক্ইয়ার্ড। তাদের নাম যথাক্রমে—অ্যাডমিরালটি ডক্, হংকং অ্যাণ্ড হোয়ামপোয়া ডক্ ও তাইকু ডক্। চীনা নৌবহরের সমস্ত জাহাজ হংকংয়ে নির্ম্মিত হয়।

* * * *

তারপর যাত্রা করা গেল হংকং-কৌলুন লাইনের জাহাজে চড়ে ফরমোসা অভিমুখে। নামলাম ফরমোসার কীলুন বন্দরে। তারপর ট্রেনযোগে পৌছলাম রাজধানী তাইহোকু বা তাইপেহ্ সহরে। ষ্টেশনে নেমেই দেখলাম, সামনেই তাইওয়ান রেলওয়ে হোটেল। অনেক যাত্রীই সেখানে আশ্রয় নেবেন। শুনলাম এখানে থাকলে নাকি নানান্ সুবিধা পাওয়া যায়। তাই এখানেই থেকে গেলাম।

জাপানীরা যখন চীনাদের কাছ থেকে ফরমোসা দখল করেছিল তখন তাইহোকু সহরটি ছিল প্রাচীরে ঘেরা ও অতিশয় নোংরা। কিন্তু বছর দশেকের ভিতর সহরটি অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে। আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আমরা এখানে থেকে পেতে পারি।

তাইহোকু বা তাইপেহ্ সহর তিন ভাগে বিভক্ত: জোনাই, মানকা ও দাইতোতেই। বলতে গেলে আসল সহর হচ্ছে জোনাই। এখানেই প্রধান গভর্ণমেণ্ট অফিস, এখানেই হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, স্কুল, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বড় বড় অফিস, রাজকর্ম্মচারীদের বাসস্থান প্রভৃতি রয়েছে। দাইতোতেই ও মানকা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাইহোকুতে দর্শকদের দেখবার মত অনেক জিনিষ আছে। এখানকার যাদুঘরটা অতি চমৎকার। ফরমোসা দ্বীপের খনিজতত্ত্ব, উদ্ভিদ্তত্ত্ব ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা সংগ্রহই এখানে আছে। যাদুঘরে প্রবেশমূল্য লাগে না। মঙ্গলবার বেলা ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্য্যন্ত যাদুঘর বন্ধ থাকে। আর রোজই খোলা থাকে।

ফরমোসা গভর্ণমেণ্টের একটি কর্পূর ও আফিঙের একচেটিয়া কারখানা আছে। দেখতে হলে অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। দুঃখের বিষয় তখনকার মত অনুমতি সংগ্রহ করা গেল না, আমারও আর এই কারখানা দেখা হ'ল না।

এখানকার বোটানিক্যাল্ গার্ডেনও বেশ সুন্দর। নানা আশ্চর্য্য ও দুষ্প্রাপ্য গাছ এখানে আছে।

বেটানিক্যাল গার্ডেন হ'তে "কোতেইসো" খুব কাছে। কোতেইসো হচ্ছে তাইহোকুর অধিবাসীদের অতি প্রিয় স্থান। কোতেইসো তামসুই নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর বাঁধের উপর অনেক চায়ের দোকান। বাঁধের উপর হ'তে নদীর আশপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর। নদীর উত্তাল তরঙ্গের খেলা দেখতে আমার এত ভাল লাগত! গ্রীষ্মকালে সাঁতারের জন্য এখানে অসংখ্য লোকের ভিড় হয়।

তাইহোকু ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে "গভর্ণমেণ্ট এক্সপেরিমেণ্টাল এগ্রিকালচারাল ষ্টেশন" স্থাপিত।

এবার তোমাদের ফরমোসা দ্বীপের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলছি।

যোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ নাবিকেরা প্রথম এই দ্বীপে অবতরণ করে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তারা তাদের ম্যাপে এই দ্বীপের নাম লিখেছিল, "ইল্লা ফরমোসা"। আবার প্রাচীন কাল হ'তে এই দ্বীপের জাপানী নাম "তাকাসাগো"। "ইল্লা ফরমোসা" মানে "সুন্দর দ্বীপ", আর তাকাসাগোর"ও সেই একই অর্থ কাজেই বোঝা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশবাসীদেরই মুগ্ধ করেছিল এই ফরমোসা।

উত্তর হ'তে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী ফরমোসাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। দ্বীপের পার্ব্বত্য অঞ্চল পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার একটি 'পর্ব্বতচূড় ৭০০ ফুট উঁচু, এবং এটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতঃ সামুদ্রিক পর্ব্বতচূড়া

ফরমোসার আদিম নিবাসীরা বোধ হয় ফিলিপাই দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসেছিল। যত দূর সম্ভব এরা ছিল মাল জাতীয় লাক। পরে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীনার এখানে আসে। তারা এই দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্যের কথা জানাল চীন গভর্ণমেণ্টকে কিন্তু চীন গভর্ণমেণ্ট এদিকে তেমন মনোযোগ দেন নি। এর প

কয়েক শতাব্দী ধরে চীনা ও জাপানী দস্যুরা এখানে দস্যুতা করতে আসতো। অবশেষে 'হাক্কাস' নামে এক সমাজচ্যুত চীনা সম্প্রদায় এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তখন থেকেই চীনা ও জাপানী ব্যবসাদারেরা এখানে আসতে লাগল ব্যবসা করতে।

এর পর চীন-সরকারের সাথে বন্দোবস্ত করে ওলন্দাজরা ফরমোসার দক্ষিণ পশ্চিম অংশটি দখল করল। এখানে তারা দুর্গ নির্ম্মাণ করল ও ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নতিলাভ করল।

কিন্তু তোমরা জান, যেখানেই কোন জাতি বেশ সুবিধালাভ করে তৎক্ষণাৎ অপর কোন জাতির দৃষ্টি সেদিকে পড়বেই। এখানেও তাই ঘটলো। স্পেনিয়ার্ড-দের দৃষ্টি পড়ল এদিকে। তারাও দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে উপনিবেশ স্থাপন করল ও কয়েক বছর পরে কীলুন ও তামসুই অধিকার করে বসলো। ওলন্দাজদের সাথে স্পেনিয়ার্ডদের বাধল লড়াই। স্পেনিয়ার্ডরা দ্বীপ হ'তে বিতাড়িত হ'ল। কিন্তু বেশী দিন দ্বীপ দখল করা ওলন্দাজদের অদৃষ্টেও ছিল না। শীঘ্রই চীনা বোম্বেটে কোক্সিঙ্গা তার দুর্দ্ধর্ষ সঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের দিল তাড়িয়ে। তারপর কোক্সিঙ্গা হয়ে বসলো ফরমোসার রাজা। এ কোক্সিঙ্গা ছিল চীনের মাঞ্চু রাজবংশের প্রতিদ্বন্দ্বী। পরে কোক্সিঙ্গার পৌত্র পিকিং গভর্ণমেণ্টের হাতে ফরমোসা ছেড়ে দিয়েছিল। এই ভাবে ফরমোসা পুনরায় চীনের অধিকারভুক্ত হ'ল।

শেষ পর্য্যন্ত চীনাদের হাতেও এই দ্বীপ রইল না। জাপানের সাথে এক যুদ্ধসন্ধিতে এই দ্বীপ জাপানের হস্তগত হ'ল। এই সন্ধিকে 'সিমো-নো-সেকি' সন্ধি বলা হয়। সেই অবধি এই দ্বীপ জাপানের হাতেই আছে। জাপানীরা এ দ্বীপের নাম বদলে নূতন নাম রেখেছে 'তাইওয়ান'।

শিশুসাহিত্যিক সুবিনয়

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

গত ১৭ই মাঘ মঙ্গলবার বাংলা শিশুসাহিত্যের পক্ষে একটা বড় দুর্দ্দিন গেছে। ঐ দিন বাংলা শিশুসাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, প্রতিভাবান্ শিশুসাহিত্যিক সুবিনয় রায়-চৌধুরী মহাশয় ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন।

সুবিনয় বাবুর নাম সারা বাংলা দেশে এবং তোমাদের কাছে—বিশেষ ক'রে রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। দীর্ঘ দিন ধরে অসংখ্য লেখা—গল্প, প্রবন্ধ, ধাঁধা, ছবি—কত কি দিয়ে তিনি রামধনুর পৃষ্ঠা সাজিয়েছেন, তাঁর রচনা বুকে করে রামধনু বাংলার কিশোর-চিত্ত জয়ের অভিযানে বেরিয়েছে—সে কথা, তোমরা যারা নিয়মিত রামধনু পড় তারা, সবাই জান। ইদানীং কঠিন রোগে শয্যাগত থাকায় তিনি আগের মত প্রায় প্রতি মাসেই তোমাদের জন্য লেখা পাঠাতে পারতেন না, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি তোমাদের কথা ভোলেন নি। এই সেদিনও তাঁর লেখা তোমরা পড়েছ। কি সুন্দর, সরস এবং কৌতূহলোদ্দীপক সে লেখা!

আজ থেকে প্রায় ৫৪ বছর আগে বাংলা ১২৯৭ সালে কলকাতারই এক অংশে সুবিনয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আসল বাড়ী ছিল ময়মনসিংহ জেলায়। তাঁর পিতামহ কালীনাথ বাবু ছিলেন কিশোরগঞ্জের জমীদার। মাতৃকুলও তাঁর ছিল খুব নামকরা। তাঁর মাতামহ ছিলেন বিখ্যাত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, আর মাতামহী ছিলেন ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলি—বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ-করা প্রথম মহিলা ডাক্তার।

যে পরিবারে সুবিনয় জন্মগ্রহণ করলেন শিশুসাহিত্য-চর্চ্চায় সে পরিবারের যুড়ি বোধ হয় এ দেশে আর কখনও হয় নি। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দান যেমন অসামান্য তেমনি বাংলা শিশুসাহিত্যেও এই রায়চৌধুরী পরিবারের দান অসামান্য বলা যেতে পারে। সুবিনয় বাবুর বাবা ছিলেন 'সন্দেশ' প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী। ভাইদের মধ্যে সুকুমার রায়ের নাম জানে না

...ন ছেলেমেয়ে বাংলা দেশে নিশ্চয় কেউ নেই। ছোট ভাই সুবিমল রায়ও, অল্প লিখলেও, ছোটদের রচনায় সিদ্ধহস্ত। ...লতা রাওএর রচনার সঙ্গে বাংলার ছেলেমেয়েরা খুবই পরিচিত। ইনি সুবিনয় বাবুর বোন। অপর বোন পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তীও ছোটদের জন্য লিখে থাকেন। সুবিনয় বাবুর স্ত্রী পুষ্পলতা রায়ও ছোটদের জন্য লেখেন। তার পর আরও শোন। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক কুলদারঞ্জন রায়, প্রমদারঞ্জন রায়—এঁরাও সুবিনয় বাবুর পরিবারেরই লোক—উপেন্দ্রকিশোরের ভাই। রামধনুতে যে লীলা মজুমদারের মজার হাসির গল্প তোমরা প্রায়ই পড় তিনিও এই পরিবারের মেয়ে—প্রমদারঞ্জনের কন্যা। তাই বলছিলাম—শিশুসাহিত্যে এই এক পরিবারের দানের তুলনা নেই।

স্বর্গীয় সুবিনয় রায়চৌধুরী

কাজেই, ধরতে গেলে সাহিত্যিক আওতার মধ্যেই, সুবিনয় বাবু মানুষ হয়েছেন। কলকাতার সিটি কলিজিয়েট্ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। যথাসময়ে আই.এস্-সি পাশ করে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে তিনি বি.এস্-সি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগেই হয়ে পড়লেন অসুস্থ, ফলে সেবার আর পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না।

সুবিনয়ের দাদা সুকুমার বাবু তখন ফটোগ্রাফী, ছাপা ইত্যাদির কাজে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য বিলেত গেছেন। কথা ছিল সুবিনয়ও বি.এস্-সি পাশ করেই বিলেত রওনা হবেন। কিন্তু একটা বছর নষ্ট হওয়ায় সব ব্যবস্থা গোল-মাল হ'য়ে গেল, সুবিনয় তাঁর বাবার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। তোমরা বিখ্যাত ইউ. রায় এণ্ড সন্স প্রতিষ্ঠানের নাম শুনে থাকবে। উপেন্দ্রকিশোরই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা, এবং এ দেশে উচ্চাঙ্গের ছবির ব্লক ও ছাপাখানা সংক্রান্ত ব্যাপারে ধরতে গেলে তিনি ছিলেন একজন পথ প্রদর্শক। ইউ. রায় এণ্ড সন্স-এ ঢুকে সুবিনয় এই সব বিদ্যার খুঁটিনাটি হাতে-কলমে শিখলেন। এ সব ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান এত গভীর ছিল যে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয়ের পর আমাদের নিজেদের ছাপাখানায় কলকব্জার কোন গোলমাল বাধলে অনেক বার তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি, এবং এ সব বিষয়ের অনেক খুঁটি-নাটি ব্যাপারেও তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে বিস্মিত হয়েছি।

বাংলা ১৩২০ সালে উপেন্দ্রকিশোর ছেলেদের জন্য "সন্দেশ" মাসিক পত্রিকা বার করলেন। বাংলা শিশু-সাহিত্যে সেও একটা স্মরণীয় ঘটনা। উপেন্দ্রকিশোরের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর দুই ছেলে সুকুমার ও সুবিনয়। তার পর উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সুকুমার রায় হলেন সম্পাদক। সুবিনয় তখনও জ্যেষ্ঠের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কাজ করে যাচ্ছেন। সন্দেশ যে অত ভাল কাগজ হতে পেরেছিল তার মূলে অনেকখানি ছিল সুবিনয়ের পরিশ্রম। তার পর সুকুমার বাবু যখন দুরন্ত রোগে দীর্ঘদিন শয্যাগত তখন সুবিনয়ই পরোক্ষভাবে সন্দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, এবং ১৩৩০ সালে সুকুমারের অকাল-বিয়োগের পর সুবিনয়ই সন্দেশ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন।

সন্দেশের সম্পাদনায় সুবিনয় বাবু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও এই সময়ে তাঁদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়। 'সন্দেশ'ও বন্ধ হয়ে যায়। এর পর নানা অসুবিধার মধ্যে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি সরকারী ভূতত্ত্ব-বিভাগে যোগদান করেন। ব্লক-

সংক্রান্ত খুঁটিনাটি জ্ঞানের জন্যই তিনি এ পদে বহাল হ'ন। এর পর তিনি অপরের সহযোগিতায় আর একবার 'সন্দেশ' প্রকাশ করেন কিন্তু কয়েক বছর পরে আবার তা বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু সন্দেশ উঠে গেলেও সুবিনয় বাবু শিশুসাহিত্য-জগৎ থেকে অবসর নেন নি। বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েদের তিনি সত্যিকারের ভালো বাসতেন। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। হাসির গল্প, হাসির কবিতা লেখায় তাঁর চমৎকার হাত ছিল—কিন্তু আরও ভাল লিখতেন তিনি ছেলেদের উপযোগী সরস প্রবন্ধ—বাংলা শিশুসাহিত্যে যা প্রায় দুর্ল্লভ বলা যেতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানের রকমারি উন্নতি, জীব-জগতের লোভনীয় খবর—এ সব বিষয়ে তাঁর ছিল প্রগাঢ় আগ্রহ—আর ছোটদের কাছে এমন সহজ, সরল, সরস ভাবে তা তিনি পরিবেষণ করতেন যে বয়স্করাও তা থেকে সমান রস গ্রহণ করতে পারত।

দ্বিতীয় বার সন্দেশ বার করার আগে থেকেই সুবিনয় বাবু বিভিন্ন শিশু-সাময়িক পত্রে নিয়মিত লিখতে সুরু করেন। আমাদের—তোমাদের রামধনুতেও এই সময় থেকে তাঁর রচনা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়। সে দিনটা আমার বেশ মনে পড়ে। সুবিনয় বাবু সম্বন্ধে আমাদের ছেলেবেলা থেকেই একটা প্রচণ্ড ঔৎসুক্য ছিল। কারণ খুব ছেলেবেলা থেকে আমি সন্দেশের গ্রাহক ছিলাম, এবং সুকুমার ও সুবিনয় রায়ের প্রায় প্রত্যেকটি লেখাই এত বার পড়েছিলাম যে মনের মধ্যে তা গভীর ভাবে গাঁথা হয়ে ছিল। কবিতাগুলি তো মুখস্থই ছিল (এবং বলতে কি, এখনও আছে)। সেই সুবিনয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সহজ কথা নয় তো! যাক্, যা বলছিলাম; হঠাৎ একদিন ছোড়দা' (তোমাদের পরলোকগত সম্পাদক মশাই—মনোরঞ্জন বাবু) এসে বললেন, "জানিস্, আজ নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কার সঙ্গে আলাপ হ'ল?—সুবিনয় রায়। কাল তিনি আসবেন আমাদের বাড়ী,—ভাল ক'রে আলাপ করতে। এ পাড়ায় বাড়ী নিয়েছেন যে!" আমি তখনও ছাত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি ধাপ পার হই নি। বড় বড় নাম-করা লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলাপ করতে তখনও তেমন অভ্যস্ত হই নি। ছোড়দা'র দেওয়া খবরে সারা রাত কৌতূহল ও উত্তেজনার মধ্যে কাটালাম। পর দিন সকাল বেলায় সুবিনয় বাবু এলেন। গৌরবর্ণ স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ দেহ—অতি অমায়িক ভদ্রলোক। বয়স চল্লিশের ওপর হয়েছে কিন্তু দেখলে অনেক কম মনে হয়। চা খেতে খেতে গল্পের পর গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরও পেলাম না। তিনি বাঁ হাতে লিখতেন, ডান হাতে হাতঘড়ি পরতেন। সেই ব্যাপার নিয়েই কত মজার মজার গল্প শোনালেন। মনেও হ'ল না আজই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ।

তার পর তাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছি। কত সময় কত গল্প হয়েছে—কখনও তাঁর বাড়ীতে বসে, কখনও আমাদের বাড়ীতে বসে,—কখনও পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, কখনও হয়তো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুবিনয় গল্প করে চলেছেন। বয়সের পার্থক্য কোথায় ভেসে গেছে! অমন সদালাপী মানুষ কমই দেখেছি।

রামধনুর জন্য তাঁর কাছে কত দিন কত রকম ভাবে সাহায্য পেয়েছি তার হিসাব কে দেবে? মলাটের ছবি কি রকম করা যায়? ভেবে পাচ্ছ না? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কর সুবিনয় বাবুকে। ডিজাইনের সঙ্গে ব্লকের রং মিলছে না? কি করা যায়? চল সুবিনয় বাবুর কাছে। অমুক বিষয়ের ওপর একটা প্রবন্ধ যাচ্ছে, তার জন্য অমুকের একটা ছবি চাই? কোথায় পাওয়া যাবে?—কেন, সুবিনয় বাবুর কাছে! ছাপার কলে হাঙ্গামা বেধেছে, মেশিন্‌ম্যান্ কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না!—ডাক সুবিনয় বাবুকে। নতুন মেশিন্ কেনা হবে, কে কলকব্জা পরীক্ষা করে দেখে দেবেন?—কেন, সুবিনয় বাবু! এই রকম অসংখ্য স্নেহের উৎপাতে সময়ে অসময়ে তাঁকে বিব্রত করেছি, তিনি হাসিমুখে—সদাপ্রফুল্লচিত্তে তখনই ছুটে এসেছেন। এ যেন তাঁর নিজেরই গরজ! রামধনুতে যেন প্রতি সংখ্যায়ই সব রকম বৈচিত্র্য থাকে এ চেষ্টা আমরা বরাবরই করি। কিন্তু অনেক সময় মনের মত লেখা হাতের কাছে থাকে না। কোন বার হয়তো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল না, কোন বার পাওয়া গেল না ভাল গল্প, কোন বার

বা ধাঁধা। এ সব ক্ষেত্রে অগতির গতি ছিলেন সুবিনয়। গিয়ে একবার বল্লেই হ'ল গল্প চাইলে বড় জোর হয়তো বলতেন, "তাই তো, গল্প তো বানানো নাই, আচ্ছা বানিয়ে দেব!" 'লেখা'র বদলে তিনি বানানো কথাটি ব্যবহার করতেন। ধাঁধা তৈরীতে তাঁর অদ্ভুত মাথা খুলত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রকমারি মজার ধাঁধা তৈরী করে দিতেন। তাঁর লেখা "বল তো" বইটায়ই বোধ হয় তোমরা সে পরিচয় পেয়েছ। রামধনুতেও স্বনামে ও অনামে তাঁর বহু ধাঁধা বেরিয়েছে।

কথাবার্ত্তায়, গল্পগুজবে সুবিনয় ছিলেন যেমন শিশুর মত সরল, চালচলনেও ছিলেন তেমনি। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় দেখেছি রাত জেগে স্বামীস্ত্রী মিলে 'মন্দির' সাজাবার জন্য কাগজের ফুল তৈরী করছেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে।

শেষ যেদিন দেখা হ'ল তিনি তখন রোগে শয্যাগত। তখন ভাবতে পারি নি সেই তাঁর শেষ শয্যা। সামনে বসিয়ে গল্প করতে লাগলেন—কত দিনের কত কথা! তখনও তাঁর গায়ে বেশ জ্বর রয়েছে, বল্‌লাম, বেশী উত্তেজনায় হয় তো জ্বর বাড়বে। কে শোনে সে কথা? শিশুর মত স্নিগ্ধ মধুর হেসে সুবিনয় সমানে গল্প করে চললেন।

তার পর আর দেখা হয় নি। কয়েক দিন থেকেই ভাবছি, এইবার একদিন যাব; হঠাৎ কাগজ খুলে দেখি তিনি নেই। শিশু-জগতের অকৃত্রিম বন্ধু, শিশুর মতই সরলপ্রাণ সুবিনয় চলে গেছেন কোন্ দূর দেবলোকে—বোধ হয় দেবশিশুদেরই গল্প শোনাতে।

ব্যাধের পূজা

(পুরাণের গল্প)

শ্রীগৌরী দেবী

নদীর ধারে বনের ভিতর বিশাল বটগাছ, তারই ধারে মহাদেবের মন্দির। এক ব্রাহ্মণ এসে রোজ সেখানে পূজো করেন। ফুল-বেলপাতা, ভোগের ফল-মূল—পূজোর কোন ত্রুটীই ব্রাহ্মণ রাখেন না।

কিন্তু আশ্চর্য্য কাণ্ড! রোজই দেখেন তাঁর পূজোর সামগ্রী কে এসে তছ্‌নছ্ করে দিয়ে গেছে! মহাদেব কি তবে পূজো নেন নি!

এখন হয়েছে কি, সেই বনে এক ব্যাধ রোজ শিকার করতে আসে। জাতে ব্যাধ হলে কি হয়, আসলে লোকটি ছিল ভারী সাধু। মহাদেবের প্রতি তারও ছিল অসীম ভক্তি, এবং তাঁর জন্য সে না করতে পারত, এমন কাজ নেই। ব্রাহ্মণের পূজোর পর ব্যাধও রোজই এসে মন্দিরে মহাদেবের পূজো করত। কিন্তু অসভ্য ব্যাধ তো, তার পূজোর প্রণালীও ছিল সেই রকম। ঘরে ঢুকেই সে ব্রাহ্মণের পূজোর আয়োজন পা দিয়ে ঠেলে দিত। তারপর মুখে করে গঙ্গাজল এনে তাই কুলকুচো করে সে মহাদেবকে স্নান করাত আর ভোগ দিত তারই শিকার-করা নানা জন্তুর মাংস। মন্ত্রতন্ত্রের সে ধার ধারত না—নিজে যা মনে করত অকপটে দেবতাকে জানাত। মহাদেব এই সরল-চিত্ত ব্যাধকে খুব পছন্দ করতেন এবং হাসিমুখে তার পূজা গ্রহণ করতেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ রোজ রোজ তাঁর পূজোর আয়োজনের অনাদর দেখে ঠিক করলেন ব্যাপারটা কি হয় লুকিয়ে থেকে দেখবেন। সেদিন তাই আর তিনি পূজোর পর চলে গেলেন না, মন্দিরেরই সামনে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। একটু পরেই ব্যাধ এসে তার অদ্ভুত পূজো সুরু করল। ব্রাহ্মণ শুন্‌তে পেলেন, মহাদেব বলছেন, "কিহে ব্যাধ, আজ তোমার এত দেরী? আমি সেই কখন থেকে তোমার পথ চেয়ে আছি!" ব্যাধ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। তারপর পূজো সেরে চলে গেল।

ব্রাহ্মণের হ'ল ভীষণ রাগ। তিনি তখনই বেরিয়ে এসে মন্দিরে ঢুকলেন, তারপর মহাদেবকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "ঠাকুর, তুমি তো ভারী একচোখো! আমি এত ক'রে শাস্ত্রমতে তোমার পূজো করি, আমার দিকে কোন দিন ফিরেও দেখ না, আর ওই মূর্খ অসভ্য ব্যাধকে দিব্যি দেখা দিয়ে তার পূজো যেচে নিলে। এমন দেবতার পূজো আমি করতে চাই না। এই পাথর দিয়ে তোমার ও পাষাণ মাথা আমি এখনই গুঁড়ো করে দেব।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহাদেব বল্লেন, "আরে বাপু, অত ব্যস্ত কেন? আচ্ছা, কাল এসে একটু অপেক্ষা ক'র, তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে।"

পর দিন ব্রাহ্মণ পূজো করতে এসে দেখেন মহাদেবের মাথায় এক ভীষণ ক্ষত—টপ্ টপ্ করে তা থেকে রক্ত পড়ছে। ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হয়ে নদী থেকে জল এনে সে ঘা ধুয়ে দিলেন, তার পর যথারীতি পূজো শেষ করলেন।

একটু পরেই ব্যাধ এল—পিঠে মৃত পশু, হাতে তীর-ধনুক। মন্দিরে ঢুকেই মহাদেবের মাথায় ঐ ভীষণ ক্ষত দেখে ব্যাধ মাটীতে আছড়ে পড়ল। অস্ত্র দিয়ে নিজের শরীর ক্ষত বিক্ষত করতে করতে বল্‌ল, "না জানি আমার কোন্ পাপে আমার আরাধ্য দেবতার এ দশা হয়েছে! এ প্রাণ আমি রাখব না—এখনই দেবতার সামনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।" এই ব'লে ব্যাধ মন্দিরের পাষাণ দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল।

মহাদেব আর থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে এসে তাকে ঠাণ্ডা করলেন। তার পর ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন, "এখন বুঝতে পেরেছ কেন আমি এর পূজো পাবার জন্য এত ব্যস্ত হ'তাম? শুধু শাস্ত্রাচার পালন করলেই তো পূজো করা হয় না—আসল পূজো হয় ভক্তিতে। এ ব্যাধ আর কিছু বুঝুক না বুঝুক এর চেয়ে বড় ভক্ত আমার কে আছে?"

ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরে মাথা নীচু করলেন।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

রাশিয়ার রাজদূত: শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী অনূদিত। প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী, সি. ১৮-১৯, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। দাম ২৷৷০। বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুলে ভার্ণের লেখা এই বিশ্ববিখ্যাত বইখানির অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট দান। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর নানা ভাষায় বইখানি রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদও বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। ছাপা-বাঁধাই মনোজ্ঞ।

'টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্: জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৲। রূপকথায় শেয়াল পণ্ডিতের সেই 'টাক ডুমাডুম ডুম' গল্প আমরা সকলে জানি, এই বইখানি তারই নাট্যরূপ। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্যা পত্নী ৺জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর নাতির মনোরঞ্জনের জন্য এই নাটকখানি রচনা করেছিলেন। বিশ্বভারতী বইখানি প্রকাশ ক'রে বাংলার সমস্ত শিশুদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু বইখানিকে চিত্রিত ক'রে আরও লোভনীয় ক'রে তুলেছেন। রচনাভঙ্গী যেমন সুন্দর ছবিগুলিও তেমনি। আমরা এই গ্রন্থমালার পরবর্ত্তী গ্রন্থ এই লেখিকারই লেখা 'সাত ভাই চম্পা'র জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম।

রবিবারের দেশে—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক। ২৫, মোহিনীমোহন রোড থেকে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান: ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা। দাম ১৷৷০।

উপেন্দ্র বাবুর কবিতার সঙ্গে রামধনুর পাঠকপাঠিকারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই জোর করে বলা যায়—তাঁর 'রবিবারের দেশে' বাংলার ছেলেমেয়েদের হাসির খোরাক

ল তাবেই মেটাতে পারবে। এর কতকগুলি কবিতা এক কথায় 'অনবদ্য' বলা যেতে পারে। তোমরা যারা আবৃত্তির জন্য মনের মত নতুন নতুন কবিতা খুঁজে পাও না তারা 'রবিবারের দেশে' একখানি সংগ্রহ করতে ভুল না।

সোভিয়েট বীরত্বের দশটি কাহিনী: শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। অগ্রণী বুক ক্লাব. ১৬, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা। দাম ৸০।

বর্ত্তমান যুদ্ধে রুশদের বীরত্বের কাহিনী তোমরা অনেক শুনেছ। তাই অবলম্বন ক'রে এই বইখানি লেখা হয়েছে। এর বেশীর ভাগই বাস্তব ঘটনা, বাকিগুলিও বাস্তবের ভিত্তিতে রচিত। কাহিনীগুলির কতক ইতিপূর্ব্বে রামধনু, কৈশোরক, পাঠশালা প্রভৃতি পত্রিকায় বেরিয়েছিল। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীটি সুন্দর; কি করলে তা ছোটদের কাছে লোভনীয় হবে তাও তাঁর জানা আছে। তোমরা বইটা অবশ্য পড়ে দেখবে।

এ মাসে তোমাদের কয়েকটি দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে। সম্প্রতি আমরা রামধনুর কয়েক জন কল্যাণকামী বন্ধুকে হারিয়েছি। সন্দেশ-সম্পাদক সুবিনয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ তোমরা শুনেছ। অধ্যাপক ডক্টর সুশীলচন্দ্র মিত্রও আর ইহলোকে নেই। ডাঃ মিত্র সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক ছিলেন, বিখ্যাত 'বিচিত্রা' পত্রিকাখানি তিনিই পরিচালনা করতেন। ছোটদের লেখাতেও তাঁর বেশ হাত ছিল। এক সময়ে রামধনুতে তাঁর অনেক লেখা বেরিয়েছে। তাঁর 'বৈজ্ঞানিক ভোজ' নামে বইখানিও ছেলে-মহলে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। মানুষটি ছিলেন তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও মিষ্টস্বভাব। রামধনুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

আর হারিয়েছি আমরা শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত লেখক রমেশচন্দ্র দাসকে। তাঁর লেখা তোমাদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। এই সেদিন পর্য্যন্ত তাঁর উপন্যাস 'নিরুদ্দিষ্টের দল' ধারাবাহিক ভাবে রামধনুতে বেরিয়েছে। কবিতা, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ সবই তিনি চমৎকার লিখতেন। তাঁর সাগরিকা, ভূগর্ভে ভ্রমণ, চম্পাদ্বীপ, আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে প্রভৃতি বইগুলিও উল্লেখযোগ্য।

শিশুসাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে কলকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে মহা সমারোহের সঙ্গে শিশুশিল্প-প্রদর্শনী হয়ে গেল। তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাক তারা নিশ্চয়ই দেখতে গিয়েছিলে। প্রদর্শনীতে ছোট ছেলে-মেয়েদের আঁকা ছবি, তাদের তৈরী নানা রকম হাতের কাজ, শিল্পদ্রব্য, হাতে লেখা মাসিক পত্র ইত্যাদি দেখান হয়েছিল। অধুনালুপ্ত এবং প্রচলিত নানা শিশু-সাময়িক পত্র এবং স্বর্গত শিশুসাহিত্যিকদের হস্তাক্ষরও কিছু কিছু দেখান হয়েছিল। তা ছাড়া প্রদর্শনীতে দীর্ঘ ন' দিন ধরে প্রত্যহ নানা রকম বক্তৃতা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র, ম্যাজিক গান, আবৃত্তি ইত্যাদিরও আয়োজন করা হয়েছিল বড় বড় শিক্ষাবিদ্ ও শিশুসাহিত্যিকেরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রদর্শনীর শেষে শিল্পীদের পুরস্কার' ও পদক দিয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। এবারে যারা যোগ দেও নি, আসছে বছর তারা চেষ্টা করবে তো?

* * * *

ক্রিকেটে রণজি প্রতিযোগিতায় উত্তর ভারত দল দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে ৩৬২ রানে হারিয়ে দিয়েছে: উত্তর ভারতের রান্ হয়েছিল ১ম ইনিংস্এ ৪৪৯, ২য় ইনিংস্এ ৭ উইকেটে ২৯৭। দক্ষিণ পাঞ্জাবের হয়েছিল:

১ম ইনিংসএ ২৯৩, ২য় ইনিংসএ ৯২। ওদিকে বোম্বাই দল বরোদা দলকে ৭ উইকেটে পরাজিত করেছে। বোম্বাই—১ম ইনিংস্‌এ ৪৬৮, ২য় ইনিংসএ ৩ উইকেটে ৭৪; বরোদা—১ম ইনিংস্‌এ ১৫১, ২য় ইনিংস্‌এ ৩৯০। বোম্বাই দলে মোদী ১ম ইনিংস্‌এ নট্‌ আউট্‌ থেকে ২৪৫ রান্‌ করেন।

*   *   *   *

যুদ্ধের খবর এখন জার্ম্মেনীর পক্ষে খুবই সঙ্কটজনক। সেনাপতি জুকভের নেতৃত্বে রুশ সৈন্যবাহিনী জার্ম্মেনী আক্রমণ করেছে, এবং শুধু আক্রমণ করা নয়, অগ্রসর হ'তে হ'তে খাস বার্লিন সহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। সম্ভবতঃ খুব শীগ্‌গিরই জার্ম্মান্‌ রাজধানীতে ষ্টালিনের কথামত রুশ পতাকা উড়তে দেখা যাবে। এ খবর যখন লিখছি তখন রুশরা জার্ম্মেনী থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে। যে জার্ম্মান্‌রা বছর দু'য়েক আগে রাশিয়ার অনেকখানি দখল করে নিয়েছিল আজ তারাই নিজের দেশে সেই রুশের অমিত বিক্রমকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না!

প্রাচ্যে মার্কিন বাহিনীও ফিলিপাইন্‌স্‌-এর রাজধানী ম্যানিলা সহরে পুনঃ প্রবেশ করেছে। জাপানও এখন আর এদিকে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারছে না।

*   *   *   *

গত ২৯শে পৌষ বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-উৎসব তাঁরই জন্মভূমি ফুলিয়া গ্রামে সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা শুনে সুখী হবে, 'শিশু-সাহিত্য পরিষদের' পক্ষ থেকে সুলেখক শ্রীচণ্ডীচরণ দে মহাকবির স্মৃতি-স্তম্ভে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

ফাগুন এসেছে

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

রঙ্‌মহলের দুয়ার খুলে ফাগুন এসেছে,
অশোক-পলাশ ঘোমটা ফেলে তাইতে হেসেছে।
হরষ জাগে শিমুল-কলির রক্ত আননে,
উতল হ'ল দোয়েল কোয়েল কুঞ্জ-কাননে।
গুন্‌গুনিয়ে গান গেয়ে ওই ছুট্‌লো অলিরা,
সে গান শুনে লুটায় হেসে বকুল-কলিরা।
ফুলবনে আজ কে এলো ভাই,—জাগলো দোপাটি?
কার স্মরণে টগর তাহার বাঁধ্‌লো খোঁপাটি?
ঝুম্‌কো কানে ঝুম্‌কো লতার ঘুম কে ভাঙালো?
হোলির রঙে কৃষ্ণচূড়ায় আজ কে রাঙালো?
প্রজাপতির পুলক-নাচন জাগ্‌লো বনেতে,
ভোমরা এসে সেতার বাজায় তাহার সনেতে।
সুবাস-মদির উদাস বায়ে সুপ্তি জড়ানো,
আম্রবনের মাথায় যেন মুকুট পরানো।
কামিনী আজ অঞ্জলি দেয় কাহার চরণে?
পড়্‌লো সাড়া বিশ্বেতে আজ কাহার স্মরণে?
তালীবন ঐ হাততালি দেয় অথৈ পুলকে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ফাগুন নাম্‌লো ভূলোকে।
আনন্দেরই জোয়ারে আজ বিশ্ব ভেসেছে,
রঙ্‌মহলের দুয়ার খুলে ফাগুন এসেছে।

শূন্য ঝুলি

শ্রীঅঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

আমারই এ শূন্য ঝুলিখানি
বারেক খুলি—বারেক আমি ঢাকি;
কথার পিঠে শুধুই কথার ফাঁকি,
পান্থ জনে শুনাই মনের বাণী।
আধো আধো সুরে যখন ছেলে
ডাকে তাহার প্রথম-চেনা মাকে
তখন সেথা যে সুর গোপন থাকে
সে সুর আমার ঝুলির মাঝে মেলে।
বার্ত্তা আমার শেষ হয়েছে বলে
দ্বারে দ্বারে বেড়াই নাকো আর;
কাহার কাছে নামাই মনের ভার—
বাসা আমার অসীম শূন্যতলে।
কাঁচা সোনার রোদের মালা পরা
শরৎ দিনের অলস দ্বিপ্রহর,
ঘুঘু ডাকে শিউলি-ঝোপের পর
ক্লান্ত মেঘে সুনীল আকাশ ভরা।
এমন দিনে ঝুলি আমার ফাঁকা,
কারে কি বা দেব উপহার,
শরৎ দিনে পূজার উপচার
তাইতে যেন উঠেছে চাঁদ বাঁকা।
শ্লেষ করেছে আমারে আজ চাঁদ
হেসে যেন বলছে মোরে সে,
'তোর কাছেতে নাইকো কিছু রে,
আমার আছে আকাশ-ছোঁয়া ফাঁদ।'
'ফাঁদে আমার নাইকো প্রয়োজন'
হেসে আমি বলি চাঁদেরে,
'থাকুক আমার শূন্য ঝুলিতে
শূন্য কথা, কথার আয়োজন।'
কথা তো নাই—আছে শুধু স্মৃতি,
ধূপ নিভেছে, গন্ধ আছে পড়ে;
দীপ নাইকো, আলোর শিখা নড়ে—
অতীত দিনের অনেক দুঃখ-প্রীতি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) নিস্তব্ধতা (২) কর্ণ (৩) যখন হাতে তালি পড়ে। (৪) যখন গান গাই।

উত্তরদাতাদের নাম

মনীষা সেন, নীপা, শঙ্কর, শিবাজী, রতন, শান্তু, দাদা, মণিদি (খুলনা); সত্যজিৎ রায় (ঢাকা); মহেন্দ্র বসু (কলিকাতা); সুচরিতা দেবী (নিউ দিল্লী); সোমা সেন (এলাহাবাদ); গীতা ও সীতা (কলিকাতা); বন্দনা ও মনোজ (লক্ষ্ণৌ); সিতাংশু রায় (বোম্বাই); নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় (পাটনা); শরৎ ও অমিতা (কলিকাতা); ভুটু, তুলু ও বৌদি (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

(১) মালবাহী গাড়ীও নয়, জন্তুও নয় কিন্তু তবু মাল বয়। বেতার নয়, সেতার নয় তবু গানের সুর ধরে। অথচ লাভের আশায় কেউ যদি তাকে ধরতে যায় তাকে হ'তে হবে সকলকার উপহাসের পাত্র। চিনতে পার?

(২) কোন্‌ শব্দের মাথা বাদ দিলে বাকীটুকু হবে তারই ইংরেজী প্রতিশব্দ?

কয়েকখানা ছেলেমেয়েদের গল্পের বই ঃ—

এবারের

পূজা-বার্ষিকী
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বর্ষ-মঙ্গল

বিরাট গ্রন্থ—অসংখ্য ছবি : এক রং, দুই রং ও বহু রং—গল্প ও কবিতার ঝরণা—সুন্দর বাঁধাই—উৎকৃষ্ট ছাপা।

মূল্য ২৷৷০ মাত্র

ইহাতে লিখিয়াছেন

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, "বনফুল", নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সরোজ রায় চৌধুরী, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী, জসিমউদ্দিন, ধীরেন্দ্র ধর প্রভৃতি বিখ্যাত লেখক ও লেখিকাগণ।

এত বড় সমৃদ্ধ গ্রন্থ, এত কম দামে—বর্ত্তমান জগতে পরম বিস্ময়

নব প্রকাশিত
যাদুসম্রাট—পি. সি. সরকার
প্রণীত

ম্যাজিকের খেলা

দাম ১৲

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া বাহির হইতেছে

প্রহেলিকা সিরিজের

(চমকপ্রদ ডিটেক্‌টিভ কাহিনী)

১ম গ্রন্থ	মুখোশের অন্তরালে	(সব্যসাচী)	১৲
২য় ,,	মৃত্যুদূত	,,	১৲
৩য় ,,	ব্লাড হাউণ্ড	,,	১৲
৪র্থ ,,	কালের কবলে	,,	১৲
৫ম ,,	শেষ বলি	,,	১৲
৬ষ্ঠ ,,	নৈশ অভিযান	,,	১৲
৭ম ,,	কবরের নীচে	,,	১৲

*

বিশ্বপ্রতিভা সিরিজের

অমূল্য গ্রন্থ
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

যাদুকর মার্কণী ১৲

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস ১৲

*

শিহরণের খনি

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন ১।০

দেব-সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

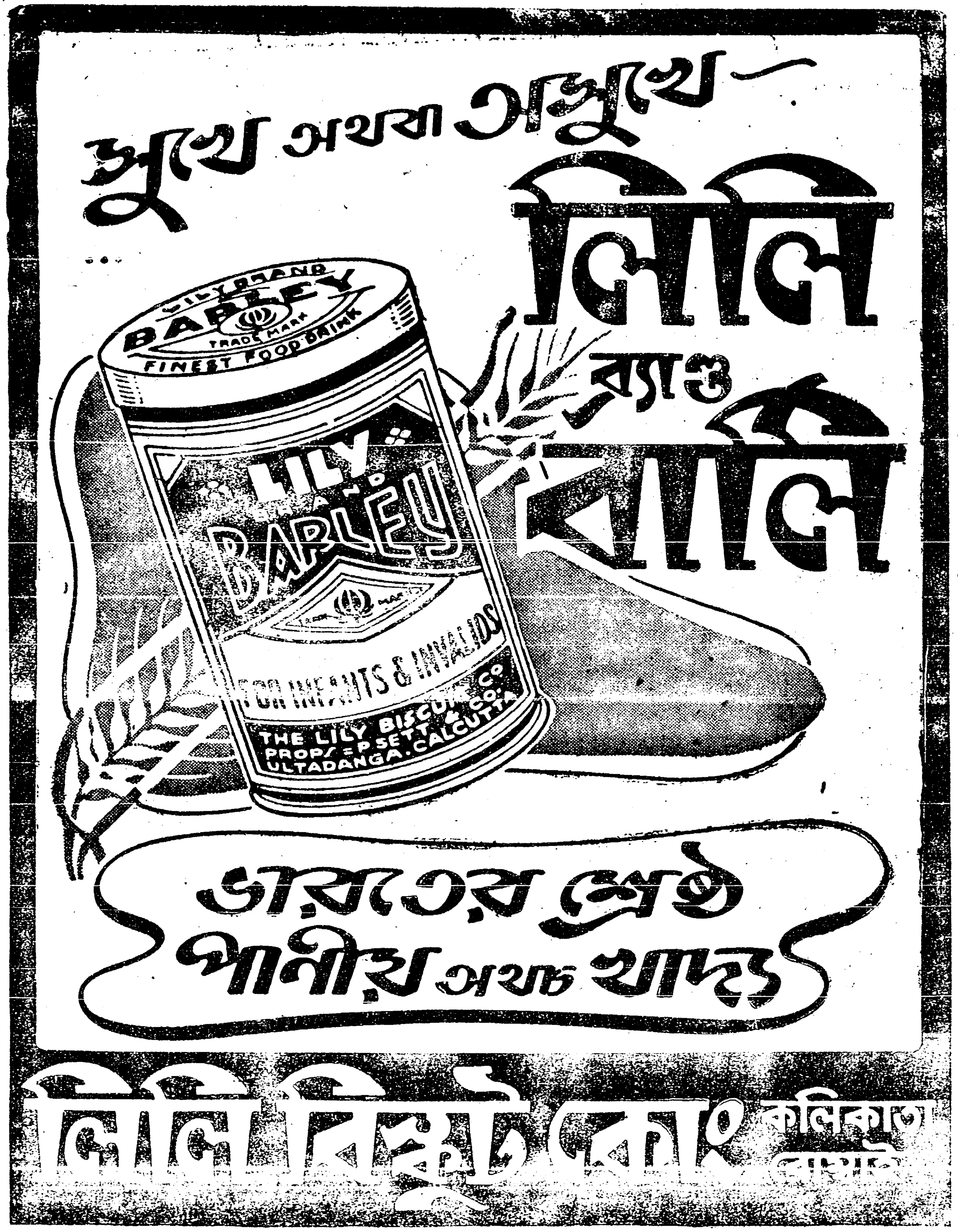

Regd. No. C—1641

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

মাত্র ৭ টী ঔষধ
মাত্র ১৪ টী ঔষধ
পকেট কেস ও পুস্তক সহ
মূল্য ৪৷০ আনা
মূল্য ৮৲ টাকা

Regd. No. C—1641

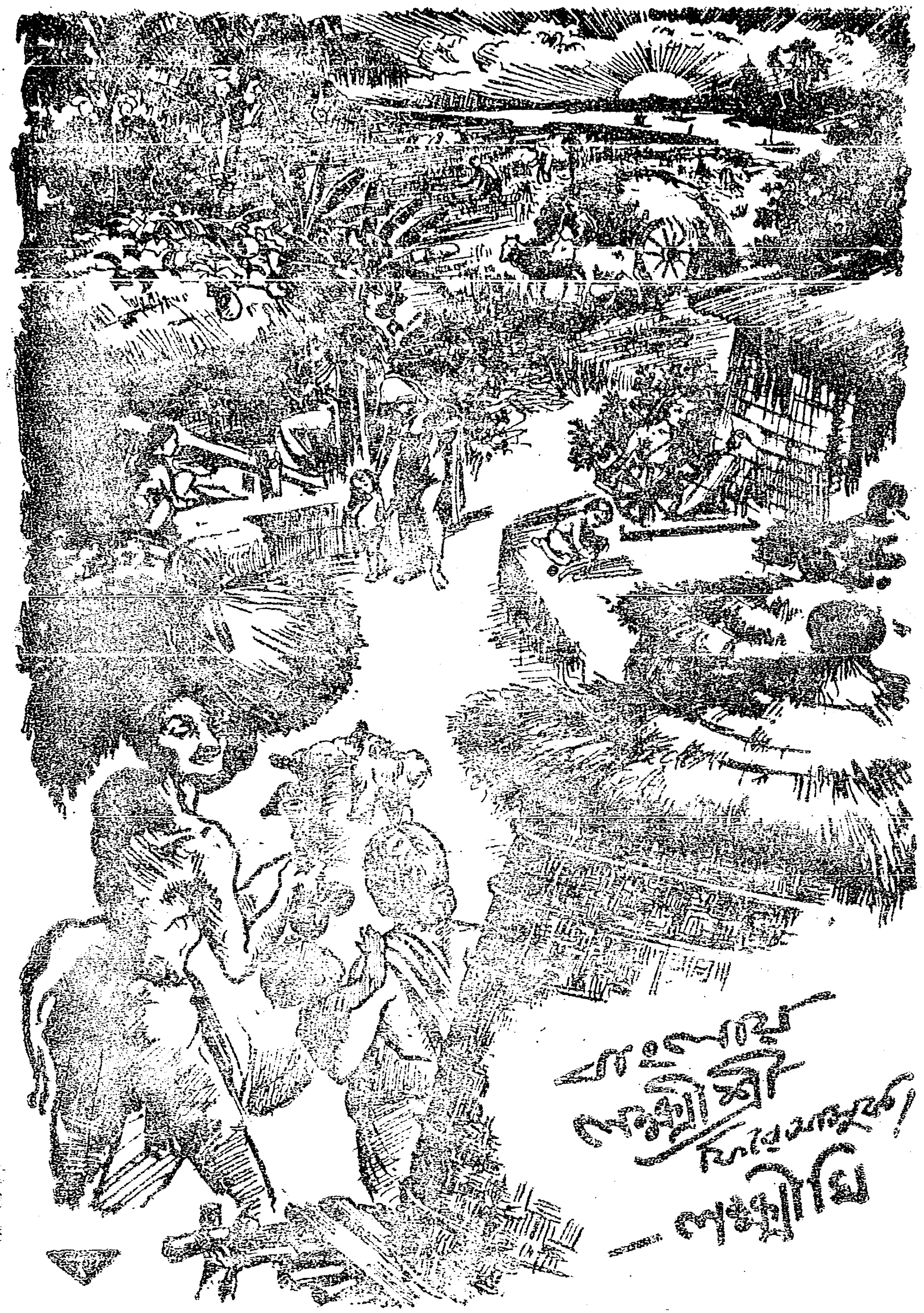

রামধনু

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্.এস-সি.

লক্ষ্ণৌ আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭ টী ঔষধ / মাত্র ১৪ টী ঔষধ } পকেট কেস ও পুস্তক সহ { মূল্য ৪৷ আনা / মূল্য ৮ টাকা

COLOUR PAP

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৭শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৫১ | ১২শ সংখ্যা

মহাপুরুষের বাণী

(হজরত আলী)

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

থাকতে প্রচুর নেহাৎ গরিব
বখিল দুনিয়ায়,
জড়সড় দৈন্য আশঙ্কাতে,
কিন্তু তারে হিসাব দাখিল
করতে যে হয় হায়,
মরার পরে দাতা ধনীর সাথে।
কৃপা কারেও করে নি সে,
পায় না কৃপাকণা,
ইহলোক আর পরলোক তার
দুই-ই বিড়ম্বনা।

কণিকা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম.এ, বি.টি.

মুখের কথার মূল্য কি —যদি
সঙ্গতি তার না থাকে কাজে?
পূর্ণ কুম্ভ—নীরবকর্ম্মী,
শূন্য কুম্ভ শুধুই বাজে।

* * *

গুণ নাই যার রূপের তাহার
গরবটা কি?
বাকল ছাড়ালে মাকাল ফলের
বেবাক ফাঁকি।

"নাড়ি-ছেঁড়া গল্প"

৺সুবিনয় রায়চৌধুরী

সবাই তাঁকে পণ্ডিত মশাই ব'লে ডাক্‌ত; তিনি "নাড়ি-ছেঁড়া গল্প" বল্‌তে বড্ড ভালবাসতেন। যেখানে আমরা যাব, পণ্ডিত মশাই এসে তাঁর 'গল্প' সুরু করবেন। হয়তো সে গল্প আমরা পঁচিশ বার শুনেছি; তবু তিনি জোর ক'রে আবার শোনাবেনই শোনাবেন। কি আপদ্! আচ্ছা বিপদে পড়া গেছে তো! আমরা একেবারে তেতো-বিরক্ত হয়ে গেছি।

সেদিন ঘোষেদের বাড়ী নেমন্তন্ন—এলাহি কাণ্ড। খাওয়ার আয়োজনটা ভালই। আমাদের সকলেরই নেমন্তন্ন হয়েছে—ন্যাড়া, টেঁপি, ভোলা, হরি, গজু—সবাই যাবে। খুব মজা!

সকালবেলা আমরা ক'জন ব'সে গল্প করছি, এমন সময় হরি এসে বল্‌ল, "কিরে! তোরা কখন যাবি? মণিদা'ও যাবে, বেশ গল্প-গুজব করা যাবে'।"

ন্যাড়া বল্‌ল, "হ্যাঁ,—গল্প-গুজব! এদিকে যে পণ্ডিত-মশায়েরও নেমন্তন্ন হয়েছে, তা'র বেলা কি?"

"বলিস্ কি! তুই কি ক'রে জান্‌লি?"

"এইমাত্র পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বল্লেন, 'বিকেলে ঘোষেদের খ্যাটে যাচ্ছিস তো? বেশ, বেশ! আজ অনেকগুলো নাড়ি-ছেঁড়া গল্প বলা যাবে'।"

"এই সেরেছে! এখন উপায়?"

গজু বলল, "উপায় ঢের আছে। তোরা যদি রাজি থাকিস, আর সব ঠিক ক'রে করতে পারিস, তা' হ'লে নাড়ি-ছেঁড়া গল্পর' দফা আজই শেষ করে দিতে পারি।"

সকলেই উৎসাহ ক'রে গজুর কাছে এগিয়ে গেল, তার পাঁচ মিনিট ধরে ফিস্‌ফিস্ পরামর্শ আর হাসি চল্‌ল। শেষটায় সকলেই "বেশ—বেশ—এই ঠিক" ব'লে মুচ্‌কি হেসে যে-যা'র বাড়ী চ'লে গেলাম।

সন্ধ্যায় সবাই ঘোষেদের বাড়ীর বৈঠকখানায় ফরাসের উপর ব'সে গল্প-গুজব করছি, এমন সময় ন্যাড়া এক গাল হেসে এসে বল্‌ল, "পণ্ডিত মশাই বোধ হয় আর এলেন না; সাতটা তো বাজে।"

আমরা তো মণিদা'কে ধরেছি গল্প বল্‌বার জন্য; সেও রাজি। কাজেই, আমরাও খুসী হলাম, যে পণ্ডিত মশাই হয়তো নাও আস্‌তে পারেন।

'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়'—ন্যাড়ার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই পণ্ডিত মশাই ঘট্ ঘট্ ক'রে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই,—আর কথা নেই বার্ত্তা নেই—ছাতাটি রেখে আমাদের মাঝখানেই ধপ ক'রে বসে পড়্‌লেন।

ব'সেই—আর কোন রকম ভূমিকা না ক'রে বললেন, "হ্যাঁ! আসরটি বেশ জমেছে! নাড়ি-ছেঁড়া গল্প বলা যাক্ এখন!"

পণ্ডিত মশায়ের গল্প কিছু মন্দ নয়—হাসির গল্পও বটে! কিন্তু একই গল্প একশ'বার শোনালে তার আর "হাসিত্ব" কিছু থাকে কি? আমাদেরও সেই অবস্থা হয়েছে।

যাক্, পণ্ডিত মশাই তো গল্প আরম্ভ করলেন, আর নিজেই হেসে কুটিপাটি। আমরা সকলে এমন গম্ভীর মুখ ক'রে ব'সে আছি যে, দেখে মনে হয় কি যেন বিপদ্ ঘটেছে। গল্প বলা প্রায় শেষ হয়েছে, পণ্ডিত মশাইও ততক্ষণে সকলের একঘেয়ে গম্ভীর মুখ দেখে ঘাবড়ে গেছেন।

ঠিক এই সময়ে গজু টেঁপিকে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে, তোর হাসি পাচ্ছে নাকি?"

টেঁপি বল্‌ল, "এটা হাসির গল্প নাকি? ও! আমি জান্‌তাম না।"

ন্যাড়া বলল, "কই, আমার তো হাসি-টাসি কিছু পাচ্ছে না!"

পণ্ডিত মশাই ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর ন্যাকামি করতে হবে না;—যেন জানেন না হাসির গল্প কিনা! বল্ না দেখি একটা হাসির গল্প?—"

অমনি গজু ব'লে উঠ্‌ল, "হাসির গল্প যদি বলা যায়—আপনা থেকে ভসভসিয়ে সোডার মত হাসি, সকলের পেট থেকে বেরিয়ে আসবে। বল্ না ভোলা, তোর সেই রাজার গল্পটা!"

সকলে এক সঙ্গে বলে উঠল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রাজার গল্পটা—"

ভোলা কোনও উচ্চবাচ্য না ক'রে, একটু মুচকি হেসে এগিয়ে এল। অমনি ন্যাড়াটা "ফ-ফ" ক'রে হেসে ব'লে উঠল, "দাঁড়া—একটু হাসিটা সাম্‌লে নিই।"

ভোলা গল্প আরম্ভ করল,—"এক রাজা ছিল।"

অমনি সকলে হেসে গড়াগড়ি—'রাজা ছিল রে—রাজা ছিল—"

ভোলা বল্‌ল, "তার এক মন্ত্রী ছিল।"

সকলে আবার হেসে গড়াগড়ি—

"ম — — — ন্ত্রী ছিল—"

ভোলা আবার বলল, "তার একটা ভাইও ছিল।"

এবার সকলে একেবারে এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে গেল—"আবার, ভাইও ছিল!—"

এবার পণ্ডিত মশাই চটে গেলেন। বল্লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের যত চালাকি! 'রাজা ছিল', 'ভাই ছিল' 'মন্ত্রী ছিল' এ সব হ'লো তোদের নাড়ি-ছেঁড়া গল্প!"

এই ব'লে তিনি ঘট্ ঘট্ ক'রে আসর থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে গেলেন—আমরাও আপাততঃ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেদিন থেকে পণ্ডিত মশায়ের 'নাড়ি-ছেঁড়া গল্প' আর শোনা যায় নি;—অন্ততঃ, আমরা তো শুনি নি।*

* এটি ৺সুবিনয় রায়ের অপ্রকাশিত রচনা। কিছুদিন আগে তিনি রামধনুর জন্য এটি পাঠিয়েছিলেন। গল্পটি তাঁদেরই বাড়ীর একটি পুরোনো সত্যি ঘটনার উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। এই ঘটনাটি নিয়ে তিনি বহুদিন আগে (১৩২৪) সন্দেশেও একটি গল্প লিখেছিলেন, তা তাঁর খেয়াল ছিল না। কিন্তু সে সাতাশ বছর আগেকার কথা; তাই এটি এখন অনায়াসে প্রকাশ করা যেতে পারে। —রাঃ নঃ

পূর্ণিমা

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার, এম্.এ, বি-এল্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশাখা। আচ্ছা বেশ, আমরা দু'জনাকেই পরীক্ষা করব। কারো ওপরে আমাদের কোন পক্ষপাত নেই। পরীক্ষায় কে আসল আর কে নকল সবই ধরা পড়বে। (কৃষ্ণের প্রতি) আচ্ছা, তুমি বল দেখি আয়ান ঘোষ কৃষ্ণের কে হয়?

কৃষ্ণ। কে আবার হবে, মামা হয়।

সকলে। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হ'ল না—হ'ল না।

বিশাখা। (ললিতার প্রতি) ওহে, তুমি বল দেখি, আয়ান ঘোষ কৃষ্ণের কে হয়?

ললিতা। পিসতুতো খুড়ির মামাতো দেওর হয়।

সকলে। ঠিক বলেছ, ঠিক, ঠিক।

বিশাখা। (কৃষ্ণের প্রতি) একটা প্রশ্নে তো তুমি হেরে গেলে। আচ্ছা, এবার আর একটা।...তুমি যদি সত্যি সত্যি কৃষ্ণ হও, তবে তো তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলে; বল তো দেখি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ওজন কত?

কৃষ্ণ। আমি তো আর দাঁড়িপাল্লা হাতে ক'রে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতটা ওজন করি নি।

সকলে। হাঃ, হাঃ, পারলে না—পারলে না।

বিশাখা। (ললিতার প্রতি) আচ্ছা, তুমি বল দেখি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ওজন কত?

ললিতা। তিন শ' পঁয়ষট্টি কোটি মণ, ত্রিশ সের তের ছটাক, তিন কাঁচ্চা।

সকলে। ঠিক বলেছ, ঠিক ঠিক।

বিশাখা। আচ্ছা, এইবার শেষ প্রশ্ন। তুমি যদি সত্যিই কৃষ্ণ তবে বল দেখি কালীয় নাগের কয়টি নাগিনী?

কৃষ্ণ। তা কি করে বলব? আমি কালীয়কে দমন করেছিলাম, নাগিনীদের তো দমন করি নি'!

সকলে। হাঃ, হাঃ, হাঃ, পারলে না—পারলে না।

বিশাখা। (ললিতার প্রতি) আচ্ছা, তুমি বল তো কালীয় নাগের কয়টা নাগিনী?

ললিতা। কালীয় দমনের সময় ছিল এগারটা। কিন্তু ার একাদশ পক্ষের নাগিনীটী গত পরশু গরুড় পক্ষীর পটে গিয়েছে—এখন আছে দশটা।

সকলে। ঠিক বলেছ, ঠিক ঠিক।

বিশাখা। যাক, বিচারে সাব্যস্ত হয়ে গেল, যে তুমি কৃ নও। ও-ই হচ্ছে আসল কৃষ্ণ। এখন তুমি বাপু, পথ থ।

কৃষ্ণ। যেমন বৃন্দাবনের গোয়ালিনী তেমনি তাদের বচার!

বৃন্দা। দেখ, জাত তুলে কথা বল না। ভাল হবে । বলছি।

ললিতা। ওহে নকল কৃষ্ণ, শীগ্‌গির এখান থেকে রে পড়, নইলে রাজার কোটাল ডেকে ধরিয়ে দেব।

বিশাখা। মানুষ জাল করা ভয়ানক অপরাধ, তা ান? কোটালের হাতে পড়লে এর মজাটা টের পাবে।

চম্পক। জাল ধরা পড়ে গিয়েছে, এখন মানে মানে বিদেয় হও।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমিও এর শোধ না নিয়ে ছাড়ব না। (প্রস্থান)

সকলে। হাঃ, হাঃ, হাঃ, কেমন জব্দ, বেশ হয়েছে, কেমন জব্দ ইত্যাদি···।

চম্পক। বিশাখা, ঢের হয়েছে ভাই। এবার তাঁকে ডেকে ফিরিয়ে আন।

বিশাখা। ইস্, এত শীগগির! দেখাই যাক্ না আর একটু।

চম্পক। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি রাগ করেন?

বিশাখা। রাগ করলেন ত আমাদের বয়েই গেল।

চম্পক। যদি আর না ফিরে আসেন।

রাধা। তুমি মিছিমিছি কেন ব্যস্ত হচ্ছ চম্পকলতিকা! তিনি ইচ্ছে করে হার না মানলে কি কেউ তাঁকে হারাতে পারত? ভক্তের কাছে এমনি করে হার মানাই তো তাঁর লীলা।

বিশাখা। আর যদিই বা তিনি রাগ করে আর না আসেন তবে আমাদের এই কৃষ্ণকে নিয়েই আজ আমরা পূর্ণিমা কাটাব। কি বলিস ললিতা, তুই রাজি তো?

ললিতা। হাঁ, খুব রাজি।

বিশাখা। তবে আয়, আমরা তোকে নিয়ে আনন্দ উৎসব করি, আর কৃষ্ণ দূর থেকে শুনে হিংসেয় জ্বলতে থাকুন।

সকলে।

— গান —

তোমার বাঁশী দেবে কি বাজাতে (ও কালাচাঁদ!)
কোন্ মোহিনী ধরে বাঁশী
দেখব আমি আজ রাতে।
যে সুরে বাজলে বাঁশী
মন আমার হয় উদাসী
সেই সুরে পারি কিনা
তোমারো মন মজাতে।

[সহসা নেপথ্যে জটিলা ও কুটিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সকলের সন্ত্রস্ত ভাবে অবস্থিতি।]

জটিলা। (নেপথ্যে) ও কুটিলে, বলি আর কত দূর?

কুটিলা। (নেপথ্যে) আর বেশী দূর নেই। এস এস, শীগ্‌গির চলে এস।

বিশাখা। সর্ব্বনাশ! ঐ যে জটিলা আর কুটিলা আসছে। এখন কি করি?

চম্পক। কি সর্ব্বনাশ! এই নিবিড় বনের ভেতরে ওরা পথ চিনে এল কি করে?

বিশাখা। ওরা যদি আমাদের এখানে দেখতে পায়, তা হলে গোকুলে গিয়ে কি রকম নিন্দে ছড়াবে তা ভাবতেও পারা যায় না।

বৃন্দা। শীগ্‌গির চল কোথাও লুকোই গে।

(ক্রমশঃ)

যা ছিল সবার মনে—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৪

আজ দক্ষিণের দরজাটি খুলে ছুটে আসছে খোলা সাগরের হাওয়া; আমের বনে এসেছে মউলের জোয়ার। কিন্তু সেদিন এসেছিল উত্তরের পথ ধরে হিমের দেশ থেকে শীত।

কথা ছিল, নাসিরুদ্দিন সাহেব যাবেন এখান থেকে মোটরে। কিন্তু শেষ অবধি কথাটাই রয়ে গেল, তিনি আর গেলেন না। কাজ এসে তাঁকে অক্টোপাসের মতো অষ্টপাশে এমন জড়িয়ে ধরল যে তারপর থেকে অনেকদিন তাঁর সাড়া-শব্দই পেলাম না। তখন "পরিষদের আটটি যাত্রীর রইলো বাকি সাত।"

ঠিক হয়ে ছিল আমরা সকলে গিয়ে জড় হব হাওড়া ষ্টেশনে। আমরা চারজনে—ফণীবাবু, ক্ষিতীশবাবু, ধীরেনবাবু ও আমি—এক পাড়ার লোক। ঠিক করে ছিলাম, প্রথমে জড় হব ক্ষিতীশবাবুর শয়ন-মন্দিরে। ক্ষিতীশবাবু শুতে যান রাত বারোটায়; ওঠেন রাত চারটেয়। এই চার ঘণ্টা তিনি গড়ান কি ঘুমোন তা আমাদের কাছে কোনদিন প্রকাশ করেন নি। তাঁর প্রকৃতি কতকটা বৈদিক যুগের বনবাসী তপস্বীর মতো। তাই ধরে নিয়েছি, তিনি ওই সময়টা যোগাভ্যাস করে থাকেন। কাজেই ভরসা ছিল, শয্যাত্যাগে আমাদের আলস্য ঘট্‌লেও এবং প্রস্তুত হ'তে বিলম্ব হলেও তিনি এসে সকলের দরজায় যষ্ট্যাঘাত করবেন। কিন্তু পরিশেষে রাতের বেলা চারজনে আবার দেখা হলে এই কাষটির ভার পড়লো আমার ওপর। অবশ্য ডাকবার, যষ্ট্যাঘাতের নয়।

ঘুম ভাঙলো সকালেই; প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গেলাম ধীরেনবাবুর বাড়ি। ধীরেনবাবু আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে ছোট; চাল-চলন সৈনিক-সুলভ। কাজেই ভয় হতে লাগলো তিনি বোধ হয় ততক্ষণে সেজে-গুজে বেরিয়ে গেছেন। অথবা বাড়ির বারান্দায় আমার জন্যে অস্থির পায়ে পায়চারি করছেন, মাঝে মাঝে হাত-ঘড়িটা দেখছেন আর জ্বলন্ত চোখে পথের দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখি, তিনি (নিজের) পেটে মারছেন ঘুষি! কাপড়-চোপড় তখনও পরা হয় নি। বললেন, "ফণীবাবুর বাড়ি যান। পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।"

চললাম ফণীবাবুর বাড়ি। তিনি বলেছিলেন, তৈরী হয়ে থাকবেন। কিন্তু পৌঁছে দেখলাম, তিনি নেই; ডাকলাম, সাড়া পেলাম না; খোঁজ নিলাম, কেউ জানে না।

পূর্ণচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, আমাদের সঙ্গী হবেন। দুই বন্ধুতে এক বাড়িতেই থাকেন। কিন্তু তিনিও কাজের বেড়ি পায়ে পরে যেতে পারছিলেন না, ছট্‌ফট্ করছিলেন। যেমন তোমাদের হয়। সাথীদের ছুটি হয়ে গেল, তারা চল্‌লো খেল্‌তে আর তোমরা রইলে ক্লাসে বন্দী হয়ে। তিনিও ফণীবাবুর উদ্দেশে হাঁকাহাকি লাগিয়ে দিলেন। তবুও ফণীবাবুর সাড়া পেলাম না! দু'জনেই দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাই, ঘর-বার করি, নিরুদ্দিষ্ট লোকটির উদ্দেশে পাঁচ কথা বলি। রাগ হয়, হাসি পায়, বিরক্তি ধরে; অবশেষে ফণীভূষণ শীতভূষণ গায়ে শান্তভাবে নেমে এলেন ওপর থেকে। শুনলাম, আমাদের হাঁক-ডাক কিছুই তাঁর কানে পৌঁছয় নি। পৌঁছলেও যে কোন ফল হ'ত এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু ধীরেনবাবু কই? এদিকে পাঁচ মিনিট বেড়ে যে পনেরো মিনিট হতে চললো! বল্‌লাম, "চল: সে না যায় কি আর করা যাবে!"

দুজনে পথে বার হতেই এলেন ধীরেনবাবু বীরের মতো পা ফেলে। তিনি হাত-ঘড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'এনাফ টাইম্!"

তবুও তিনজনে পা চালিয়ে চললাম, ক্ষিতীশবাবুর আস্তানায়। জানতাম, তিনি তৈরী হয়েই আছেন, যাওয়ামাত্রই পাওয়া যাবে।

এবং যখন বাজারে পৌঁছলাম, তখন সবে দোকান-পসার খুল্‌ছে, ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে, দোকানিরা কেউ কেউ ধুনো দিচ্ছে, গঙ্গাজল ছড়াচ্ছে। তিনজনে নিচে দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধমুখ হয়ে ক্ষিতীশবাবুর নাম ধরে হাঁক দিলাম। তিনি সাড়াও দিলেন, কিন্তু বললেন, "একটু দেরি আছে।"

আর সেখান থেকেই জানালেন তিনি ইতিমধ্যে বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ প্রভৃতি বহু গঞ্জ ঘুরে এসেছেন। এবং ঘুম তাঁর ভেঙেছে ঠিক রাত চারটেতেই। তারপর থেকে কেবলই কাজ করছেন। তাঁর কথা শুনে মনে ধিক্কার এল! কি নিষ্কর্ম্মা আমরা! "এমন রবিবারটা রইলো পতিত কাজ করলে ফলত সোনা।"

কিন্তু এখন তো আর ফিরে যাওয়া যায় না। মিনিট কতক পরে তাড়াতাড়ি নেমে এসে তিনি আফশোষ করতে লাগলেন, এখনও কত কাজ পড়ে রইলো, বড় জরুরী ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু আমরা সেদিন বেরিয়েছি কাজ ভাঙতেই।

চারজনে ছুটলাম, ট্রাম ধরতে। ট্রামের রাস্তায় পড়েই ক্ষিতীশবাবু বলে উঠলেন, "থামো থামো। আগে এক পেয়ালা চা খেতে হবে।"

চা? ওদিকে যে চন্দননগরের গাড়ি, পরিষদ্-সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ, কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য স্বামী প্রেমঘনানন্দ ও সভাপতি যোগেন্দ্রবাবু ষ্টেশনে আমাদের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন! এমন সময় এক পেয়ালা চা! না—হাঁ—চা—। শেষে ঐ ছোট একটি পেয়ালার রসের টানই হয়ে উঠলো প্রবল, তার ভরই হল গুরুতর, আর সব গেল তলিয়ে। চারজনে ঢুকে পড়লাম, সমন্নের চায়ের দোকানে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। এমন সময় যে-পানীয় "তাতায় কিন্তু মাতায় না" লাগবে অতি আরামের। বিদ্যুৎ-চুমুকে পেয়ালার রস নিঃশেষ করে দোকান থেকে বেরিয়ে চারজনে উঠে পড়লাম একখানা চলতি ট্রামে।

ট্রাম চললো, মন দুললো, মুখ খুললো; মনের কোন কোণে যে এত হাসি জমা হয়ে ছিল কে জানে! গাড়ি বড়বাজার ছাড়িয়ে উঠলো গিয়ে হাওড়ার পোলের ওপর। নিচে নেচে চলেছে গঙ্গা। তারপর পোল পেরিয়ে গেল হাওড়ায়। চারজনে তাড়াতড়ি নেমে প্রায় ছুটেই পৌছলাম ষ্টেশনে। কিন্তু কোথায় বা সম্পাদক, কোথায় বা সদস্য আর কোথায়ই বা সভাপতি! যেন আমরা এসে পড়লাম অকূল সমুদ্রে। চারধারে কেবল জল থৈ থৈ করছে, একটি দ্বীপ বা একখানা জাহাজও চোখে পড়ছে না।

চারজনে হতাশ মনে এগিয়ে চললাম টিকিটঘরের দিকে যদি সেখানে কেউ থাকেন। সেখানে পৌছেও এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমরা কাউকে দেখতে পেলাম না বটে কিন্তু সম্পাদক মহাশয় হাসিমুখে এসে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই যে।" এ যেন ভোজবাজি! আমরা চারজনের একজনও তো সেই খোলা ও জনবিরল জায়গাটিতে তাঁকে দেখতে পাই নি! তিনি কি মাটি ফুঁড়ে উঠলেন না হাওয়ায় ভেসে এলেন? বললেন, কিছুক্ষণ এসেছেন এবং সেখানেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। বুঝলাম ছোট্ট মানুষটি এককোণে পাক খাচ্ছিলেন বলেই নজরে পড়েন নি।

এদিকে তখনও আরও দুজন বাকি—সদস্য ও সভাপতি। এবার পাঁচজনে তাঁদের খুঁজতে লাগলাম। সভাপতি মহাশয়কে না পেলে যাত্রাই হবে নিষ্ফল। কারণ যাঁর বাড়িতে সকলে অতিথি হবার কথা তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন তিনিই। একে শীত, তার ওপর ভোর না হতে ওঠা—বৃদ্ধের কথা বলছি না—বয়স্ক লোকের পক্ষে কঠিন। তিনি হয়তো—বার্দ্ধক্যে নয়—বয়োধর্ম্মে—এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়লো সভাপতির সাদা আলোয়ান-ঘেরা ও যষ্টিধারী দীর্ঘ মূর্ত্তি। প্রতি ধাপে বোধ হয় চার হাত জমি পার হচ্ছেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

তিনি এসে বললেন, "স্বামীজি কৈ? আমি তোমাদের সকলকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

বললাম, "সকলে হারিয়ে গিয়েছিলাম বলে, আমরাও আপনাকে খুঁজছি।"

কিন্তু স্বামীজি? সত্যই তো আমাদের স্বামীজি কোথায়? এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিচর পাঠালাম; যদি চোখে ধরা পড়ে কারো অঙ্গে গৈরিক বসন। এমন সময় এল এক অচেনা যুবক। তার হাতে একখানি লেখন। স্বামীজি সভাপতিকে অতি দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, কাজে তাঁকে আটকে ফেলেছে; যেতে পারবেন না। আবার সেই কাজ! করুন সবাই কাজ ঘুরুন সকলে কাজের পাকে। আমরা ততক্ষণ দেখে বেড়াই; দেখি মানুষকে, দেখি ধরণীকে, দেখি আকাশখানা! মনে রঙ লাগুক, কণ্ঠে গান জাগুক, চোখে ভাসুক স্বপ্ন—অন্ততঃ একটি দিনের জন্যেও। ধরণীতে ...জ না করে কি মানুষের বাঁচবার যো আছে? এরই ...কে যদি একবেলা—!

তারপর শোন! পরিষদের ছ'টি যাত্রী টিকিট কেটে ঢুকলাম প্ল্যাটফরমে। চললাম গাড়ির দিকে এগিয়ে। যেতে যেতে যোগেন্দ্রবাবু বললেন, "চন্দননগরে যদি সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গে সকলে দেখা করবে। অমন লোক আর হয় না। তিনি আমার বন্ধু। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে চাঁদা আদায়, আজকের আতিথ্য—কিছুর জন্যেই ভাবতে হবে না।"

তাঁর কথাগুলো কিছু বেসুর ঠেক্‌লেও তখন সকলে আনন্দে এমন চঞ্চল হয়ে ছিলাম যে, তার অর্থ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম না! কথা ছিল শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মশায়ের ওখানে উঠবো। কিন্তু গৃহস্বামীর পত্র যে তখনও পাওয়া যায় নি, সে কথাটা সভাপতিমশায় অন্ততঃ আমাদের কাছে অপ্রকাশ রেখেছিলেন।

প্ল্যাটফরমে ঢুকে পছন্দমতো একখানি প্রায় খালি কামরায় উঠে নিজেদের খেয়াল মাফিক জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম। গল্প চললো, সিগারেট পুড়তে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ প্ল্যাটফরমের ধার থেকে উচ্চকণ্ঠে শোনা গেল, "গুড্ মর্নিং স্যার!"

সভাপতি মশায় জানালা দিয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন, "এই যে সিধু ভাই! এস, এস, একটু আগে তোমার কথাই হচ্ছিল।"

মাথার টুপিটি খুলে সহাস্যমুখে কামরায় প্রবেশ করলেন এক সৈনিক পুরুষ! তাঁর এক হাতে একখানি সংবাদপত্র, পাশে ঝুলছে চামড়ার কিটব্যাগ। মানুষটি মধ্যমাকার, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, চোখ দুটিও উজ্জ্বল। চলা-ফেরা, কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিল তিনি বন্ধনহীন মানুষ, জীবনটাকে অতি সহজ করে নিয়েছেন; যে-কোন অবস্থার জন্য সদা প্রস্তুত। পরে তার প্রমাণও পেলাম প্রচুর। গত ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে তিনি ছিলেন ফরাসী চন্দননগরের প্রথম বাঙালি সৈনিক। আবার এই মহাযুদ্ধেও হয়েছেন ফরাসীবাহিনীর একজন পদস্থ সৈনিক—অফিসার।

জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

যোগেন্দ্রবাবু বললেন, "তোমাদেরই দেশে চন্দননগরে।" এবং যাবার উদ্দেশ্যও তাঁর কাছে ব্যক্ত করে আমাদের বললেন, "তোমাদের আর ভয় নেই! এবার পরম সহায় পেলে।" অবশ্য তখনও সকলে ভরসাহীন হবার কোন কারণ পাই নি।

তিনি হেসে বললেন, "তার আর ভাবনা কি?"

এবং ক্রমে দুজনের কথোপকথনে প্রকাশ পেল, আমরা যাঁর বাড়িতে যাচ্ছি তাঁর কোন পত্র তখনও পাওয়া যায় নি!

তখন সকলেরই মনে চিন্তার উদয় হল, মাধ্যাহ্নিক আহারের ব্যবস্থা হবে কোথায়? যাত্রার পূর্ব্বে যেটুকু রসদ জঠরে দিয়েছি তাতে চলবে বেলা দুপুর অবধি। তারপর? একাবেলী? সরকারী ব্যবস্থায় আজকাল অতিথি-সেবা সহজসাধ্য নয়। তার ওপর আক্রা-গণ্ডার দিন। এই ছ'টি বুভুক্ষু নাতিক্ষুদ্র মানুষের মাধ্যাহ্নিক আহারের ব্যবস্থা করবেন এমন দুঃসাহসী গৃহস্থ কোথায় পাওয়া যাবে? নিজের কথা বলবো না, সকলেরই নাকি ট্রেনে চড়লে ক্ষিদে বাড়ে! অবস্থা যখন এমন তখন দারুণ দুশ্চিন্তার কারণ আছে বৈকি!

কিন্তু চিন্তাটা বেশিক্ষণ কাউকে পীড়া দেবার পূর্ব্বেই কামরায় প্রবেশ করলেন চোখে চষমা, পরিধানে শ্বেত খদ্দর, কাঁধে গেরুয়া রঙের চাদরখানি পাট করা, তৈল-মসৃণ, শান্তমূর্ত্তি এক ভদ্রলোক। তিনিও যাচ্ছিলেন চন্দননগর। মল্লিক মশায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ, তিনি আমাদেরই কাছে এসে বসলেন।

মল্লিক মশায় বললেন, "আপনাদের আর ভাবনা নেই! ইনি প্রবর্ত্তক আশ্রমের লোক। কলকাতার প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।"

এবং আমাদের অবস্থাটা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন।

ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ আমাদের সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন; বললেন, "আপনারা আজ মধ্যাহ্নে আমাদের আশ্রমেই আহার করবেন। আপনারা সকলেই গুণী। একসঙ্গে এতগুলি গুণীর সমাবেশ সচরাচর হয় না। আপনাদের নিয়েই সেখানে আজ সভা হবে।"

দুর্ভাবনা ঘুচলো; গাড়িও ছেড়ে দিল। (ক্রমশঃ

শ্রীযুক্ত বনাম স্বর্গীয়

শ্রীমলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্. এ.

১৯৪২ সালে, যখন চারিদিকে দারুণ ইভ্যাকুয়েশান-এর হিড়িক সুরু হইল, তখন নিরাপত্তা ও নিম্নতম দূরত্বের হিসাবে আমরা তিন-চারিটি পরিবার, আসামের নানাদিক্ হইতে, গোয়ালপাড়া গিয়া একত্র জমায়েৎ হইলাম। পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া রেণুদের মস্ত বড় বাড়ী; ওরা তিন চারিটি প্রাণী তাহার এককোণে পড়িয়া থাকিত। আমরা গিয়া সহসা সমস্ত বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিলাম। রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরী যেন সহসা কোনো যাদুমন্ত্রে জীবিত হইয়া উঠিল। ছেলেতে মেয়েতে ঝিতে-বৌতে তিরিশ চল্লিশ জন লোকের সর্ব্বক্ষণ সোরগোল একটা বাড়ী কেন, সারাটি পাড়া জাঁকাইয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট।

এদিকে পরীক্ষার খাতা লইয়া আমি তখন রীতিমত নাস্তানাবুদ! এত হৈ-হুল্লোড় আমার পোষায় না। সকাল-দুপুর-বিকেল সরাদিন একটানা প্রশ্নপত্রের একই উত্তর পাঠ করিয়া করিয়া আমার মাথা ভারী হইয়া উঠিত। তাই সন্ধ্যার মুখে সকলের সঙ্গ এড়াইয়া আমি রোজ চলিয়া যাইতাম—উপরে পাহাড়ের পথে। যেদিন যত দূর, যেদিকে পা চালানো যাইত, ঘুরিয়া আসিতাম। এমনি একদিনকার চরণিক অভিযান ব্যপদেশেই আমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়া গেল—স্বয়ং গোবর্দ্ধন গণের সঙ্গে।

হঁ্যা! সেই স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গ্রন্থকার গোবর্দ্ধন গণ!

আমি জানি, বাংলা সাহিত্যের অগণিত পাঠকপাঠিকা এই কথা পাঠ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। হঁ্যা, উঠিবার কথাই বটে! আমি যে আমি, আমাকেও সন্ধ্যার মুখে, সেদিন তাঁহার সহিত অতর্কিত সাক্ষাৎকার লাভে, অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল বৈকি! উঁচু পাহাড়ের ঢালু পথে পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে, সেদিন গাছের গুঁড়ি আঁকড়াইয়া টাল সামলাইতে হইয়াছিল আমাকেও!...

কিন্তু যাহা সত্য তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পাহাড়ের অত উপরে একখানি অতি পরিপাটী কুটির দেখিয়া প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। কুটিরের সামনেই একটি লোক পায়চারী করিতেছেন। মাথায় জটাজাল, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, পরিধানে গেরুয়া বাস, পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা! সৌম্যশান্ত মূর্ত্তি—ঈষৎ বিষণ্ণ; কিন্তু প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

"আপনাকে দেখে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে"—আমি সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম। "আপনি কি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন বাবুর কোন আত্মীয় টাত্—"

"আমি তার আত্মার আত্মীয়—" আমার কথাটা লুফিয়া লইলেন ভদ্রলোক, "আমি সেই—সেই আমি—" হেঁয়ালীর সুরে ডান হাতে তর্জনী বুকের উপর ঠুকিয়া বলিলেন তিনি।

আমি অলক্ষিতে আঁৎকাইয়া উঠিলাম!

"কিন্তু—কিন্তু—সাহিত্যিক গোবর্দ্ধন বাবু তো..."

"মারা গেছেন!" ঈষৎ হাসিয়া ভদ্রলোক আমার বাক্যটি পূরণ করিলেন।

কী রহস্যময় হাসি!—বিশেষতঃ ঐ স্থান কাল পাত্র হিসাবে—আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল!

"ঘাবড়াবেন না"—আমার অসহায় বেপথুভাব ওঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। "হঁ্যা, লোকচক্ষে আমি—অর্থাৎ শ্রীগোবর্দ্ধন গণ—মৃত বলেই পরিচিত বটে; কিন্তু আমার সব কথা শুনলে হয়তো আমাকে অপ্রকৃতিস্থ বলেও ভুল হবে না অপনার।" এই বলিয়া তিনি আমাকে কুটিরের বারান্দায় উঠিয়া বসিতে আহ্বান করিলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, অদূরে ব্রহ্মপুত্রের বুকে তারি স্নিগ্ধ আলোক পড়িয়া ঝিক্‌মিক করিতেছে। স্থানে স্থানে বড় বড় গাছের ফাঁকে চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া একটা স্বপ্নময় আবছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে...

আদেশ পালন না করিয়া উপায় ছিল না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভদ্রলোক সুরু করিলেন:

"বলা বোধ হয় উচিত হচ্ছে না, তবুও কাউকে না বলতে পারলে তৃপ্তিও পাই না। আশা করি কথাটা আপাততঃ গোপনই রাখবেন। হঁ্যা, ইদানীং সাহিত্যিক বলে গোবর্দ্ধন গণের খুব খ্যাতি হয়েছে বটে। এই তো সেদিনই তার 'বজ্রপাণি' নাটকের কত যেন—হঁ্যা,

পঞ্চাশৎতম—পঞ্চাশৎতম অভিনয়-রজনী কলকাতায় মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তা ছাড়া তার লেখা "বিশ্বমুকুর", "আলোর লিখন", "অভিভাবক" ইত্যাদি কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির এক একটা সংস্করণ নাকি আজকাল একটা মাসও পার হতে পায় না! স্মৃতিসভা আর জন্মোৎসবের দৌলতে গোবর্দ্ধন-সাহিত্য-কথা আজ বাংলার শিক্ষিত সমাজের মুখে মুখে!...কিন্তু দশটি বছর আগে অর্থাৎ এই গোবর্দ্ধন গণ যখন 'জীবিত' ছিল তখনকার খবর আপনি নিশ্চয়ই জানেন না। দিনের পর দিন রাশি রাশি লিখেও তার একটা রচনা সম্পাদক বা প্রকাশকদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হয় নি। এই 'বিশ্বমুকুর" কাব্য সমালোচনার নিষ্ঠুর কশাঘাতে এমনি জর্জ্জরিত হয়েছিল যে, বাজারে তার মুখ দেখানো বন্ধ করতে হয়েছিল। এই "বজ্রপাণি" বই নিয়ে রঙ্গালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হয়রাণ হতে হয়েছিল!

"হতাশায়, দুঃখে, ক্রোধে আর ক্ষোভে শেষটা স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনে চলে এলাম আসামের এই পাহাড়ের চূড়ায়। ছদ্মবেশে এখানে এসে ডেরা বাঁধলাম। সেই থেকে চলেছে আমার নীরব সাহিত্যসাধনা!...

"দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়।

"ইতিমধ্যে একদিন এমনি এক ব্যাপার ঘটলো যার ফলে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ ভেসে উঠলো এক নূতন আলোকপাতে!—কলকাতার এক অতি সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—আমার, অর্থাৎ গোবর্দ্ধন গণের, হয়েছে মৃত্যু! বরিশাল-দুলার-হাটের পথে 'রুদ্র' বলে যে জাহাজ ঝড়ের মুখে টাল সামলাতে না পেরে মারা পড়লো, আমার নাকি তারি সঙ্গে হয়েছে সলিল-সমাধি!...

"হঠাৎ খবরটা পড়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন হ'ল। কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে এই সংবাদদাতার, আমার মত এমন এক নগণ্য লেখকের এমন অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়ে? অনেক মাথা ঘামিয়েও এ সমস্যার মীমাংসা হ'ল না কিছু...কিন্তু সে যাই হোক, এই অদ্ভুত সংঘটনই আমার পরবর্ত্তী জীবনে নিয়ে এলো এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন!...

"প্রথমটা ভাবলাম, এখনই এর প্রতিবাদ ক'রে 'তার' পাঠাই। কিন্তু হঠাৎ পাহাড়ের এই চূড়া থেকে অদূর ব্রহ্মপুত্রের পানে দৃষ্টি পড়তেই একটা কথা মনের কালো আকাশে বিদ্যুতের মত ঝিলিক মারলো!...আচ্ছা, দেখা যাক না—গোবর্দ্ধন গণের এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদটা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কোন আলোড়ন আনে কিনা!

"আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন—আমার এই মৃত্যু সংবাদ আমাকে সত্যিই রাতারাতি 'স্বর্গে' তুলে ধরলো!...পরদিনই স্তম্ভিত হ'য়ে দেখি—যে গোবর্দ্ধন গণকে বেঁচে থাকতে কেউ পুঁছতও না, প্রত্যেকটি বড় বড় কাগজ আজ তারই অক্লান্ত সাধনা আর অদ্ভুত প্রতিভার বিশ্লেষণে মুখর হ'য়ে উঠেছে! তার জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনার উপর হয়েছে অভিনব আলোকপাত; প্রত্যেকটি নগণ্য মন্তব্য হয়ে উঠেছে মনীষীর বাণী!...দশের কাছে নামী হবার লোভেই অবশ্য আমার দু'চারজন পরিচিত বন্ধু মৃত (!) গোবর্দ্ধন বাবুর ব্যক্তিগত জীবনে কলঙ্ক আরোপ ক'রে দু'চারটে ঘটনা প্রকাশিত করতে দ্বিধাবোধ করলেন না; কিন্তু ঠিক সেইগুলিই মিথ্যা প্রমাণ করতে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত আর পাঁচজন গুণমুগ্ধ বাস্তবাগীশ পাঠকপাঠিকা আরো আমার প্রশংসায় হয়ে উঠলেন পঞ্চমুখ। মোট কথা, মৃত গোবর্দ্ধন গণের মত সাহিত্যিক যে বাংলা দেশে শীগ্‌গির হয় নি এ কথা রাতারাতি প্রমাণিত হ'য়ে গেল। এমন কি কোন কোন পত্রিকা বিশেষ 'গোবর্দ্ধন-সংখ্যা' বার করতেও বাকী রাখল না।

"আমি তখন এই সুদূর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ভাবছি—এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম! বলা বাহুল্য, সত্য প্রকাশিত করে এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সফলতার জলস্রোত রোধ করবার মত দুর্ব্বুদ্ধি আর আমার হ'ল না। জীবিতের চাইতে যে মৃতের মর্য্যাদা বহুগুণে বেশী, এ সত্যটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম।

"সেই দিনই মনে মনে নূতন পন্থা আবিষ্কার করলাম। বনমালী বলে আমার এক বাউণ্ডুলে ভাগনে-রত্ন আছে দেশে। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানই তার নেশা এবং পেশা। দিব্যি বেপরোয়া—নীতিধর্ম্মের বালাই নেই। একদিন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে কলকাতা গিয়ে তারই শরণাপন্ন হ'লাম। দু'জনে অনেক শলাপরামর্শ হ'ল। স্থির হ'ল ব্যাপারটা এইভাবে সাজাতে হবে:

ামার একমাত্র আইনসম্মত ওয়ারিশ হিসেবে ভাগনে বে আমার মৃত্যু সম্পর্কে শেষ কথা বলবার অধিকারী। রিশাল থেকে রওনা হ'বার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি যে বস্তারিত চিঠি লিখে থাকবো তাতেই আমার যৎসামান্য াবর অস্থাবর সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা নির্দ্দেশ দেওয়া াছে। আমার সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি একটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক—াও আমি কলকাতা ত্যাগের আগেই তারই জিম্মায় রখে গিয়েছিলাম—এবং তারই মধ্যে মজুদ ছিল আমার াজন্ম সাহিত্যসাধনার ফল স্বরূপ অসংখ্য পুস্তকের াণ্ডুলিপি !...

"আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে আমার াবতীয় পাণ্ডুলিপির সমস্ত স্বত্বই অবশ্য ভাগনে বনমালীর াপ্য। আমাদের মধ্যে বন্দোবস্ত হ'ল—প্রকাশিত সমস্ত ুস্তকের লভ্যাংশের তিন ভাগের দু'ভাগ হবে আমার াওনা।..."

এই অবধি বলিয়া ভদ্রলোক সহসা চুপ করিলেন। ক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তত্ক্ষণে চন্দ্রালোক সুস্পষ্ট হইয়া নের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কুটিরপ্রাঙ্গণ জ্যোৎস্না-লাকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ—একটা অদ্ভুত রহস্যময়তায় থম্‌থম্ করিতেছে। সেই হস্যময়তার প্রতীকস্বরূপ গোবর্দ্ধন বাবুর দুইটি চক্ষু আমার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া জল্ জল্ করিতেছে।

"জানেন ?"—হঠাৎ ক্রূর হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক আবার সুরু করিলেন, "সেই থেকে আজ দশ বছরে আমার পনের-খানা নাটক, সাতখানা কাব্য ও তেরখানি উপন্যাসের পাণ্ডু-লিপি অসম্ভব উঁচু দরে কলকাতার বড় বড় প্রকাশকেরা লুফে নিয়েছেন! থিয়েটারের ম্যানেজার আর মাসিক পত্রিকার সম্পাদকেরা স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন গণের অপ্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বছরের পর বছর অদম্য উৎসাহে সংগ্রহ করেই চলেছে!...সত্যি, একজন মানুষ কি করে যে এত অল্প বয়সের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত বিচিত্র ধরণের পাণ্ডুলিপি তৈরী করে রেখে যেতে পারে—না জানি কত বড় সে প্রতিভা! কি বলেন ?"

ভদ্রলোক এবার মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "জানেন, আজকাল আমি মাসে গড়ে ৪।৫ খানি সদ্‌গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে যাচ্ছি। দুঃখু এই যে মরে আছি। তা আমি মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার সাধের বইগুলি এই সুযোগে অমর হয়েই বর্ত্তমান!"

"হ্যাঁ, বর্ত্তমান এবং ক্রমবর্দ্ধমান—" আমি হাসিয়া টিপ্পনী কাটিলাম। মনে মনে আওড়াইলাম—'ফেম্ ইজ্ এ ফুড্ ত্যাট্ ডেড্ মেন্ ইট্'—কথাটা খাঁটি বটে! *

* একটি ফরাসী গল্পের ছায়ায়।

অভিযাত্রীর পত্র

(ইয়াকোহামা ও কামাকুরা)

শ্রীবিশ্বপতি দাশগুপ্ত

রামধনুর ভাইবোনেরা, এ চিঠি আসছে বিখ্যাত জাপানী ন্দর ইয়াকোহামা থেকে। এবার সত্যই অনেক দূরে সে পড়েছি। মুণ্ডিতমস্তক, ক্ষুদ্রকায় জাপানীদের াঝখানে বসে বসে চিঠি লিখছি বাংলায়। (বলা বাহুল্য, াপানের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হবার অনেক আগেকার ঘটনা এ।)

বলতে গেলে ইয়াকোহামাকেই টোকিও বন্দর বলা ায়। তাইহোকু থেকে কীলুন পর্য্যন্ত ট্রেনে ও কীলুন থকে ইয়াকোহামা পর্য্যন্ত জাহাজে কাটাতে হয়েছে। খানেই বিদেশীরা প্রথম জাপানের মাটি স্পর্শ করেন। বন্দরে বিদেশীদের বসবাস খুব বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা মস্ত বড় কেন্দ্র এই ইয়াকোহামা বন্দর। কিন্তু প্রায় আশি বছর আগে এই ইয়াকোহামাই ছিল সামান্য একটা গ্রাম মাত্র। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান ব্যবসা ছিল মাছ ধরা। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সামান্য সময়ের ভিতর ইয়াকোহামা কি আশ্চর্য্য উন্নতিই না লাভ করেছে!

ইয়াকোহামা হ'তে কামাকুরা বেশী দূর নয়, ট্রেনে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে আসতে। কামাকুরা সাগর-পারে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। কিন্তু প্রাচীনকালে এই কামাকুরাই

ছিল জাপানের রাজধানী। এখন এ জায়গাটি একটি স্বাস্থ্য-নিবাস হিসাবে বিখ্যাত। এখানকার প্রধান দেখবার জিনিষ কাওয়ান্নন দেবীর বিরাট মূর্ত্তি, হাচিমানের মন্দির ও দাইবুৎসু। এখানে যে ক'দিন ছিলাম, বাস করেছিলাম কাইহিম-ইম হোটেলে। ঐ তিনটি বিখ্যাত দেখবার জিনিষই এর খুব কাছে পড়ে।

কাওয়ান্নন দেবীর মন্দির একটা উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখান থেকে কামাকুরার সমতলভূমির ও সমুদ্রতীরের সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে। 'কাওয়ান্নন' করুণার দেবী। মূর্ত্তিটি বিরাট,—ত্রিশ ফুট উঁচু। মূর্ত্তির উপর গিল্টি করা। বাদামী রং করা। মন্দিরের কাছেই 'ইনামুরাগা সাকি' পাহাড়। নামগুলো কেমন লাগছে ? অদ্ভুত নয় ?

হাচিমানের মূর্ত্তিটা প্রাচীন। দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি তৈরী হ'য়েছিল। 'হাচিমান' হচ্ছেন যুদ্ধের দেবতা! সমুদ্রতীর হ'তে মন্দির পর্য্যন্ত দেবদারু গাছের সুন্দর বীথিকা। কালের অবিরাম প্রবাহ যদিও এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তবুও এর ছবির মত সুন্দর দৃশ্য এখনও সেই প্রবাহতলে লুপ্ত হ'য়ে যায় নি। দর্শক এখানে এসে মুগ্ধ হয়ে যান। এর ভিতর একটি গাছ বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। লোকে বলে এর বয়স হয়েছে এক হাজার বছর। প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করবার পথে কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির পড়ে। বর্ত্তমানের প্রধান মন্দিরটা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। আগের মন্দিরটা অগ্নিদেবের করালগ্রাসে আত্মোৎসর্গ করেছে। মন্দিরটা অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত। ভিতরের আস্তর দেখবার জিনিষ। এখানে পুরাকালের বহু স্মরণ-চিহ্নাদি বর্ত্তমান।

তোমরা এতক্ষণ ভাবছ 'দাইবুৎসু' বস্তুটা কি ? এটা আর কিছুই নয়, একটা ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তির বিশালতার কাছে আমরা নেহাৎ পুতুল ছাড়া কিছুই নই। মূর্ত্তিটার মাপ নেওয়া হয়েছে। তার হিসাব শুনলে তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে।

মূর্ত্তিটা উঁচুতে উনপঞ্চাশ ফুট সাত ইঞ্চি। মুখ আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি চওড়া। চোখের দৈর্ঘ্য তিন ফুট এগারো ইঞ্চি! কানের দৈর্ঘ্য ছ' ফুট ছ' ইঞ্চি। বুড়ো আঙ্গুলের বেড় তিন ফুট। তবেই বোঝ মূর্ত্তিটি কি বিরাট! মূর্ত্তির চোখ দু'টি নাকি খাঁটি সোনার এবং ভিতরটা ফাঁপা। সামনে একটা ছোট বেদী। মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়েছিল পঞ্চ বর্গ গজ স্থান নিয়ে। কয়েক শ' বছর আগে জোয়া সময়ে ঢেউএর পর ঢেউ এসে আঘাত করতে লাগলো মন্দিরকে। মন্দির ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গে এখন শুধু মাটীর উপর মূর্ত্তিটা স্থাপিত রয়েছে। চা দিকে কোন আবরণ নেই। দূর থেকে বেলাভূমির উ এই বিরাট 'দাইবুৎসু' মনে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং কিছু ভীতিও সঞ্চার করে।

কামাকুরা হ'তে খুব কাছে ওফুনা ষ্টেশন। বিখ্য তোৎসুকার গুহা এখান থেকে খুব কাছে। বালি-পাথ কাটা কতকগুলি গুহাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে গুহাগুলি প্রায় ষাট বছর আগে তৈরী হয়েছিল। বি তা হ'লেও প্রমাণিত হ'য়েছে, যে গুহাগুলি মধ্যযুগে বর্ত্তমান ছিল, অবশ্য ক্ষুদ্রাবস্থায়। কিম্বদন্তী আছে সৈন্যদের ট্রেঞ্চ হিসাবে এগুলো ব্যবহৃত হ'ত। কে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ধনী প্রায় চল্লিশ বছর ধরে অর্থ ব্যয় ক' গুহাগুলিকে মন্দিরে পরিণত ক'রেছিলেন। মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বেণ্টন। অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবী পূজাও এখানে হ'য়ে থাকে। এখানে জাপানীদের আশ্চ শিল্পের চমৎকার নিদর্শন পেলাম।

কামাকুরা হ'তে ট্রামযোগে 'ফুজিসাওয়া পৌছলা এর খুব কাছেই 'এনোসিমা'। জায়গাটি যেন ছবির সুন্দর। এখানে অনেকে সমুদ্রস্নান করতে এসে থাকে এখানে ভাল সরাইখানা আছে। সমুদ্রোপকূল হ' সংগৃহীত নানারকম শঙ্খ, প্রবাল ও নানা দুষ্প্রাপ্য জি দোকানে বিক্রী হয়। দ্বীপের অপর দিকে একটা গহ্ আছে। গহ্বরটাকে পবিত্র ব'লে গণ্য করা হয়। এ একশ' চব্বিশ ফুট গভীর, আর এর প্রবেশপথ হচ্ছে ত্রি ফুট উঁচু। আগে নাকি সৌভাগ্যদেবী বেণ্টন এখা বাস করতেন! সাধারণের বিশ্বাস, এখন তিনজ শিণ্টো দেবী বেণ্টনকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা এখা বসবাস করছেন। এর খুব কাছেই 'রিউকোজি' মন্দির।

ওয়ামা পর্ব্বতের মন্দিরটা তীর্থযাত্রীদের কাছে অ প্রিয় স্থান। সাধারণের বিশ্বাস শিণ্টো দেবদেবী এখানকার বৌদ্ধ পূজার উপকরণ সমূলে ধ্বংস ক'

...লেছেন। জাপানে আজকাল শিন্টোধর্ম্মের প্রভাবও ...খুব। স্বয়ং রাজারাণীও শিন্টোধর্ম্মাবলম্বী। পাহাড়ের ...পর ওঠা বড় কষ্টকর। অতিকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে ...ঠলাম। পথে অনেক বিশ্রামভবন আছে। কয়েক বার ...বশ্রাম নিতে হ'ল। প্রধান মন্দিরে পৌঁছবার পথে ...নেক ছোটখাট মন্দির পড়ে। বছরের বিভিন্ন দিনে ...খানে মহোৎসব হয়ে থাকে।

আর একটী দেখবার জিনিষ তাকাওজ্বান পাহাড়। ...াহাড়ের চূড়ার উপর সুন্দর উপবনের ভিতর একটি ...ন্দির। এর অধিকাংশ গাছই 'ক্রিপ্টোমারিয়া'। যাতে ...পবনটী নষ্ট না হয় তার জন্য প্রায় একশ'টী নূতন গাছ ...াগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের আর এক জায়গায় একটী সুন্দর প্যাগোডা। প্যাগোডার কিছু উপরেই প্রধান মন্দির অবস্থিত। পাহাড়ের চূড়া হ'তে দৃশ্যটা বড় সুন্দর।

আর একদিন গিয়েছিলাম 'সাগামিগাওয়া' জলপ্রপাত দেখতে। সেখানে যেতেই প্রায় সারাদিন ব্যয় হ'য়ে গেল। বেলা এগারোটার সময় নামলাম 'য়োস্'। তারপর অল্প হেঁটে ধরলাম নৌকো। প্রায় পাঁচটার সময় পৌঁছলাম 'আট্সুগী; কাছেই সেই বিখ্যাত জলপ্রপাত।

এখানকার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে যে শুধু আনন্দলাভ করলাম তা নয়, এমন একটী উত্তেজনা লাভ করলাম যা আর কোথাও পাই নি।

নানা প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্.এস্-সি

অজন্তার আবিষ্কার

অজন্তা গুহা আর তার দেয়ালে আঁকা আশ্চর্য্য ছবিগুলির কথা জান না এমন কেউ তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই নেই। আমাদের সভ্যতার যে যে জিনিষ নিয়ে আমরা অন্যান্য দেশের কাছে গর্ব্ব ক'রে বেড়াই অজন্তার ছবিগুলিও তার মধ্যে পড়ে।

অজন্তা কোথায় তাও তোমরা নিশ্চয়ই জান। দাক্ষিণাত্যে নিজাম রাজ্যের সীমান্তে একটি ছোট গ্রামের নাম অজন্তা বা অজণ্টা। গ্রামটি ঘিরে রয়েছে ছোট বড় কতকগুলি পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের গায়ে রয়েছে কতকগুলি গুহা।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যেরা ভারতের নানা জায়গায় তাঁর ধর্ম্ম ও উপদেশ প্রচার করতে সুরু করেন। এই সব ভিক্ষু শিষ্যেরা সাধারণতঃ লোকালয়ের বাইরে নির্জ্জন গিরিগহ্বরে বাস করতেন। এই রকম একদল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অজন্তার পাহাড়ে গিয়ে আশ্রম বা সঙ্ঘ স্থাপনা করলেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মোপদেশ তখন সারা ভারতে এক আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও তাই সম্মান খুব বেশী; রাজরাজড়ারা সবাই তাঁদের শ্রদ্ধা করেন,—সুখসুবিধার ব্যবস্থা করে দেন। তাঁদেরই চেষ্টায় অজন্তার গুহাগুলি আরও ভাল করে খোদাই ক'রে দেওয়া হ'ল। শুধু তাই নয়, বড় বড় শিল্পীদের ডেকে আনা হ'ল গুহার দেয়াল চিত্রিত করতে। তাঁরা বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও অনুরূপ উপদেশপূর্ণ নানা রঙিন ছবি দিয়ে গুহার দেয়াল ভরে দিলেন। তখনকার ভারতীয় শিল্পীরা যে কত দূর উঠেছিলেন—তাঁদের তূলির হাত যে কি অপূর্ব্ব ছিল তার পরিচয় গাঁথা রইল সেই গুহার পাষাণ দেয়ালে।

তারপর কালের সঙ্গে সঙ্গে গুহাগুলি পরিত্যক্ত হ'ল। শেষে আস্তে আস্তে একদিন অজন্তার কথা লোকে ভুলে গেল। গুহার মুখ ঢেকে গেল ঘন জঙ্গলে; হিংস্র বাঘ-ভালুক এসে সেখানে আড্ডা গাড়ল। কেউ জানলও না ওর আড়ালে আমাদের সংস্কৃতির কত বড় একটা নিদর্শন লুকানো রয়েছে।

এই রকম করে কেটে গেল প্রায় দু' হাজার বছর। তার পর একদিন দৈবাৎ ঘটল এক কাণ্ড। আজ থেকে প্রায় সওয়া শ' বছর আগে এক ইংরেজ শিকারী গেলেন ঐ বনে শিকার করতে। সারা দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তিনি ফেল্লেন পথ হারিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটাছুটি ক'রে যখন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল এক রাখাল ছেলের। সাহেবের হাতে বন্দুক দেখে সে বুঝল সাহেব বাঘের খোঁজ করছেন। সে তাঁকে সঙ্গে করে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি গুহা দেখিয়ে দিল। সেই গুহাগুলিই বাঘের আড্ডা। সাহেব কাছে গিয়ে বাঘের খোঁজ পেলেন কিনা জানি না কিন্তু যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন পাহাড়ের গায়ে চমৎকার কারুকার্য্য করা বড় বড় স্তম্ভ, গবাক্ষ, মূর্ত্তি আর—আর সেই অদ্ভুত ছবি। নিপুণ শিল্পীর তূলির রং কালের রোষদৃষ্টিতে তখনও একেবারে ম্লান হয়ে যায় নি; পড়ন্ত রৌদ্রের আলোয় তখনও তা ঝলমল করছে।

সাহেব বুঝতে পারলেন, এ নিশ্চয়ই কোন প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের ধ্বংসাবশেষ। তিনি ফিরে গিয়ে তখনই লোকজন ডেকে আনলেন। তারপর জঙ্গল পরিষ্কার করা হ'ল। ঠিক যেন যাদুকরের মায়া-কাঠির স্পর্শে হিংস্র বাঘ-ভালুকের রাজ্য ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কতকগুলি আশ্চর্য্য গুহা আর তার চেয়েও আশ্চর্য্য ছবি।

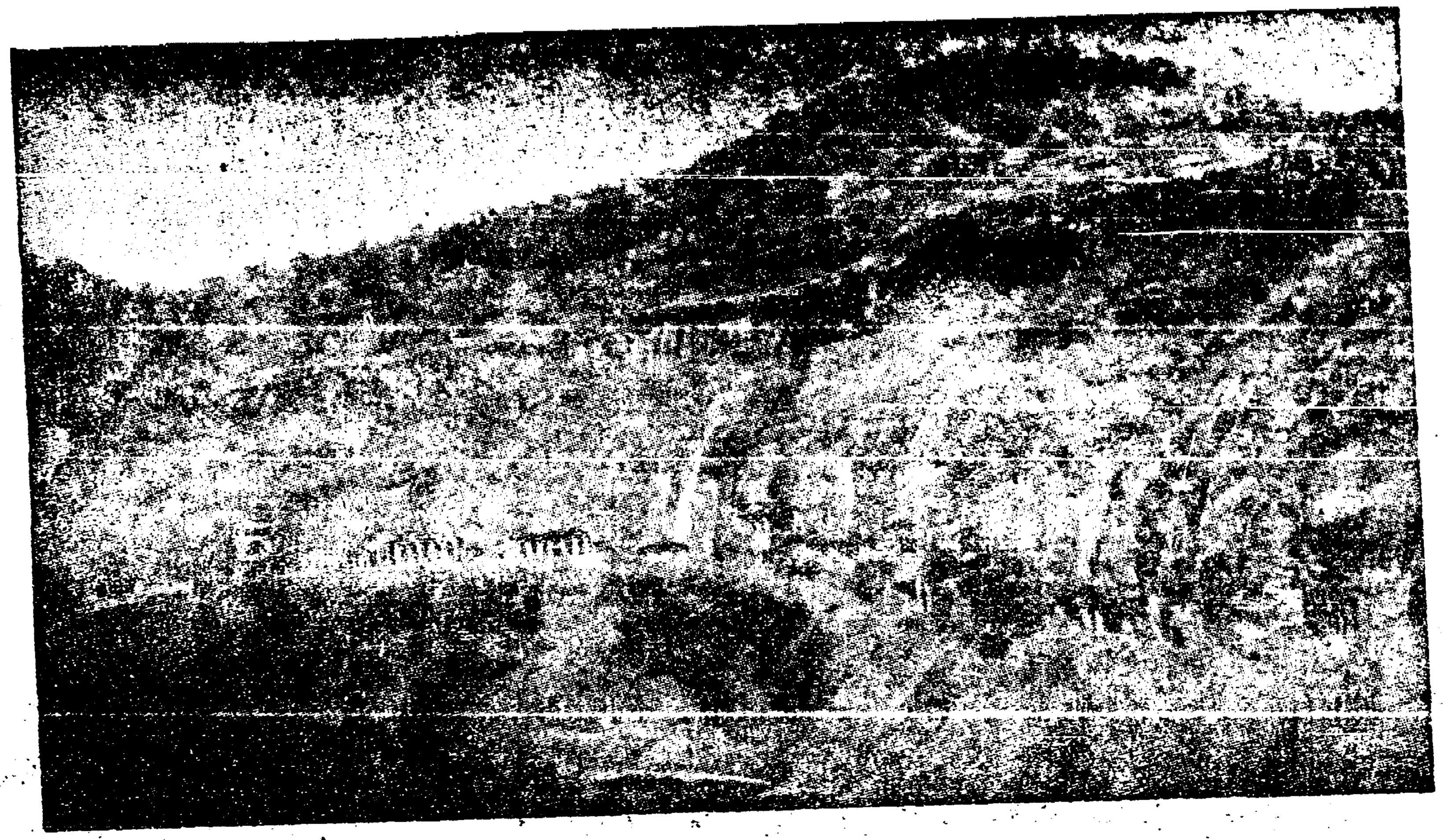

দূর থেকে অজন্তা-গুহার দৃশ্য

আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অজন্তার প্রাচীর-চিত্র দেখে সম্ভ্রমে মাথা নীচু করেন। আর ভারতীয় শিল্পীরা এরই অনুসরণ ক'রে চিত্র-জগতে এক নতুন ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন।

ভারতের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এফ্.আর.এস্

গত অগ্রহায়ণ মাসের রামধনুতে তোমাদের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান রয়্যাল্ সোসাইটির গল্প বলেছিলাম; সেই সঙ্গে জানিয়েছিলাম এ পর্য্যন্ত দশ জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকও এই সভার সদস্য (ফেলো, রয়াল্ সোসাইটি—সংক্ষেপে এফ্. আর. এস্) হবার গৌরব লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম ও শেষ অর্থাৎ দশম জনের নাম হয়তো সকলের কাছে তেমন সুপরিচিত নয়।

ভারতের প্রথম এফ্. আর. এস্ আর্দেশীর কুরশেটজী জন্মেছিলেন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে। ইনি জাতিতে ছিলেন পার্শী। মাত্র পনেরো বছর বয়সে কুরশেটজী জহাজ তৈরীর কারখানায় যোগ দেন; তাঁর বাবাও ঐখানে কাজ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই কলকব্জা

ম্বন্ধে কুরশেটজীর ছিল অদ্ভুত রকম কৌতূহল। জাহাজের কারখানায় গিয়ে তা আরও বাড়ল। তাঁর বয়স যখন ৬ বছর তখন তিনি নিজেই "ইণ্ডাস্" নামে একটি ছোট্ট ষ্টীমার তৈরী করে ফেল্লেন। এই ষ্টীমারের সমস্ত কলকব্জা তিনি নিজের হাতে বসিয়েছিলেন।

এর পর কুরশেটজী গ্যাসের আলো নিয়ে পড়লেন। তখনকার দিনে গ্যাসের আলোর এত উন্নতি হয় নি—অনেক কিছু সংস্কার করবার ছিল। কুরশেটজী এ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ গবেষণা করেন এবং তখন থেকেই আস্তে আস্তে তাঁর খ্যাতি ছড়াতে আরম্ভ করে। তাঁর নিজের বাংলোয় তিনি নিজের চেষ্টায় গ্যাসের সাহায্যে এমন চমৎকার আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন যে স্বয়ং লাটসাহেব এসে তাঁকে তারিফ করে যান।

এর কিছুদিন পরেই কুরশেটজী এঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে আরও ভাল ক'রে গবেষণা করবার জন্য বিলেত চলে যান এবং ফিরে এসে "ষ্টীম্ ফ্যাক্টরী ও ফাউণ্ড্রির" প্রধান এঞ্জিনীয়ারের পদ গ্রহণ করেন। এর পর তিনি আরও কয়েকবার বিলেত গিয়েছিলেন এবং ইণ্ডাস ফ্লোটিলা কোম্পানীর প্রধান রেসিডেণ্ট এঞ্জিনীয়ারের কাজও করেছিলেন। এই সময়ে তিনি আরও কয়েকখানা ষ্টীমার তৈরী করেন—এবং তার ফলে তাঁর খ্যাতি খুবই বেড়ে যায়।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কুরশেটজী এফ্. আর. এস্ ন'ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন একটা খবর দেশের লোক ভুলেই বসেছিল। রয়্যাল্ সোসাইটির বর্ত্তমান সম্পাদক হিল্ সাহেব পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে এ তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

১৮৭৭ সনে সত্তর বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডেই এই প্রতিভাবান্ ভারতীয় বিজ্ঞানীর জীবনান্ত ঘটে।

এবার ভারতের কনিষ্ঠতম এফ্. আর. এস্-এর কথা শোন। এঁর নাম অধ্যাপক সুব্রহ্মণ্য চন্দ্রশেখর। ইনি স্যর্ সি. ভি. রামনের ভাইপো। বাড়ী মাদ্রাজে হ'লেও ইনি এখন আমেরিকায় সিকাগো সহরেই থাকেন। ইনিও মাত্র ৩৩ বছর বয়সে এই সম্মান লাভ করেছেন।

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে—জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান। নক্ষত্রের ভিতরকার রহস্য সম্বন্ধে এঁর একখানি গবেষণাপূর্ণ বই পণ্ডিতমহলে প্রচুর সমাদর পেয়েছে। সম্প্রতি ঐ ধরণের আরও একখানি বই ইনি লিখেছেন এবং সেখানিও বিশেষজ্ঞদের কাছে কম আদর পায় নি।

কেম্ব্রিজে গবেষণা শেষ করে চন্দ্রশেখর সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্ক্স্ মানমন্দিরে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের গবেষণাও সমানে চলতে থাকে এবং দেখতে দেখতে নানা পণ্ডিত-সভা থেকে নানা রকম সম্মান এই তরুণ বিজ্ঞানীর ওপর বর্ষিত হ'তে থাকে। এর মধ্যে কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের সদস্য পদ (ফেলো) ও নিউইয়র্ক্ একাডেমী অব্ সায়ান্সের পুরস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একবার হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গেলে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে আর ছাড়তে চান না—তাঁদের মানমন্দিরে থেকে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। অধ্যাপক চন্দ্রশেখর অবশ্য নিজের প্রিয় ইয়ার্ক্স্ মানমন্দির ছেড়ে যেতে রাজী হন নি।

অধ্যাপক চন্দ্রশেখরের বয়স খুবই কম, ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল। আরও নতুন নতুন আবিষ্কার ক'রে তিনি ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করুন এ তোমরা নিশ্চয়ই চাইবে।

ব্লাড্ ব্যাঙ্ক জিনিষটা কি

আজকাল কাগজে এবং লোকের মুখে মুখে "ব্লাড্ ব্যাঙ্ক" কথাটা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক বলতে তো যেখানে লোকে টাকা পয়সা জমা রাখে এবং খরচের জন্য দরকার মত তুলে নিতে পারে তা-ই বোঝায়। ব্লাড্ ব্যাঙ্ক আবার কি? ব্লাড্ ব্যাঙ্কও অনেকটা সেই রকমেরই ব্যাপার তবে তফাৎ,—এখানে টাকা পয়সা জমান হয় না—জমান হয় রক্ত, এবং সে রক্ত দরকারের সময় যে কোন লোককে দেওয়া যেতে পারে—এ জন্য সাধারণ ব্যাঙ্কের মত তার নিজের কোন 'একাউণ্ট' রাখার প্রয়োজন হয় না।

রক্ত আমাদের শরীরের একটি অপরিহার্য্য অংশ। শরীরের বিভিন্ন শিরা ও ধমনী দিয়ে সর্ব্বক্ষণ তা বয়ে চলেছে। একজন সুস্থ মানুষের দেহে সাধারণতঃ প্রায় ১২০ আউন্স রক্ত থাকে। এর তিন ভাগের দু' ভাগই হচ্ছে তরল—বৈজ্ঞানিকেরা তাকে বলেন 'প্লাজ্মা'। বাকী এক ভাগ হচ্ছে ঘন,—তাকে আমরা বলি রক্ত-কণিকা। রক্তকণিকা আবার দু' রকম আছে—লাল আর সাদা। প্লাজ্মার রং ঈষৎ ফিকে হলদে, কিন্তু লাল রক্তকণিকাগুলির জন্য সমস্ত রক্তটাকেই লাল দেখায়। এ সব তথ্য তোমরা আগেই হয়তো স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বইতে পড়েছ।

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের শরীরের এই যে রক্ত, এর যেমন একটা বাঁধাধরা পরিমাণ আছে তেমনি এর চাপেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ আছে। কোন কারণে তার ব্যতিক্রম হওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কথা নয় এবং বেশী তফাৎ হ'লে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। অনেক সময় দেখা যায় আঘাতের ফলে অতিমাত্রায় রক্তপাত হয়ে বা রোগে রক্তহীন হ'য়ে লোকে মারা যায়। এর প্রতিকার কি? ডাক্তারেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন অনেক সময় ঐ রকম রক্তশূন্য মানুষের দেহে সুস্থ মানুষের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে ঢুকিয়ে দিলে তাকে রক্ষা করা যেতে পারে।

একের শরীরে অপরের রক্ত সঞ্চালনের প্রথা আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় শ' তিনেক বছর আগেই কিন্তু ব্যাপারটায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করা যায় নি অনেক দিন। এর কারণ আর কিছু নয়, সব মানুষের রক্ত ঠিক এক ধরণের নয়। বিভিন্ন ধরণের রক্ত যদি একত্র মেশান যায় তবে উপকারের চাইতে অপকারই হয়। কিন্তু রক্তদাতা আর রক্তগ্রহীতার রক্ত যদি এক ধরণের হয় তবে সুফল পাওয়া যাবেই। আগেকার দিনে রোগীকে রক্ত দেবার আগে দু' পক্ষের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে তবে তা দেওয়া হ'ত। এতে অনেক সময় কাজটা চট্‌পট্ করা সম্ভব হ'ত না—এবং দেরীর জন্য রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ত। শেষে চেষ্টা ক'রে তাড়াতাড়ি রক্ত পরীক্ষার একটা উপায় বার করা হ'ল কিন্তু গোল তা'তেও মিটল না। তোমরা জান, রক্ত একবার বেরোলে বেশীক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না, কিছু পরেই জমে যায়। সুতরাং রোগীকে রক্ত দিতে হলে রক্তদাতাকে তার কাছে হাজির হয়ে তবেই তা দিতে হ'ত। সাধারণ অবস্থায় হয়তো ব্যাপারটা কষ্টকর নয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কাজটা অত সহজ নয়। হয়তো রক্ত দিতে গিয়ে রক্তদাতাই প্রাণে মারা পড়বে। ... আবার ও রকম রক্তের দরকার

ব প্রস্তুত আপনি অ.

গিয়ে সেগুলো...বাদী ই.

এরও একটা উপায় শেষ পর্য্যন্ত বেরোল। ডাক্তার লুই য়্যাগট্ নামে এক বিজ্ঞানী রক্তকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখবার এক উপায় আবিষ্কার করলেন—রক্তের সঙ্গে সোডিয়াম্ সাইট্রেট্ নামে একরকম ওষুধ মিশিয়ে।

ব্যাপারটা ঐ ভাবেই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ এক নতুন আবিষ্কার হ'ল। জন্ ইলিয়ট্ নামে এক বৈজ্ঞানিক দেখালেন যে রক্ত সঞ্চালনের সময় রক্তের সবটুকু অংশ দেবার দরকার নেই, রক্তের তরল অংশটুকু অর্থাৎ রক্তকণিকা বাদ দিয়ে শুধু প্লাজ্মাটুকু দিলেই চলে—ফল পাওয়া যায় একই। শুধু তাই নয়, এতে একটা মস্ত সুবিধাও আছে। রক্তদাতার রক্তে যদি কোন রোগের বীজাণু থাকে তবে তা সাধারণতঃ রক্তকণিকার সঙ্গেই বেরিয়ে আসে; কাজেই শুধু প্লাজ্মা ধার নিলে রোগের বীজাণু সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কাও অনেক কমে যায়।

তখন থেকে রক্ত দেবার সময় গোটা রক্তটুকু না নিয়ে শুধু প্লাজ্মাটুকু নেবার ব্যবস্থা হ'ল। ঐ প্লাজ্মাকে বোতলে পূরে বিশেষভাবে ঠাণ্ডা-করা ঘরের মধ্যে রেখে দিলে দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখা চলে।

এর পর একজন বৈজ্ঞানিক দেখালেন প্লাজ্মাকে তরল না রেখে ঘন করে নিয়ে একেবারে শুকনো গুঁড়োর আকারে পরিণত করা কিছু কষ্টকর নয়। আর এতে মস্ত সুবিধা, ঠাণ্ডা-করা ঘরের কোন দরকার হয় না, যেখানে খুসী সে রক্ত নিয়ে যাওয়া চলে, এবং যত দিন খুসী তা অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। ব্যবহারের সময় প্রয়োজন মত জল মিশিয়ে নিলেই হ'ল—অবশ্য সে জল পরিশোধিত হওয়া চাই।

সেই থেকে রক্তকে শুকনো গুঁড়োর আকারে জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কি ভাবে তা করা হয় মোটামুটি বলছি: প্রথমে সুস্থ লোকের শরীর থেকে নলের সাহায্যে রক্ত বার করে এনে একটা শিশির (বীজাণুশূন্য) মধ্যে ভরা হয়। এইবার সে রক্ত দূষিত কিনা পরীক্ষা ক'রে—যদি ভাল হয় তবে তা শিশি শুদ্ধ নিয়ে বসান হয় 'সেণ্ট্রিফিউজ্' যন্ত্রে। এই যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের প্লাজ্মা ও রক্তকণিকা পৃথক্ হয়ে পড়ে—রক্তকণিকাগুলো থিতিয়ে শিশির নীচে গিয়ে জমা হয়। এইবার প্লাজ্মাটুকু বার

করে নিয়ে ভ্যাকুয়াম্ বা বায়ুশূন্য যন্ত্রের মধ্যে আস্তে আস্তে জমিয়ে এবং শেষে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তার পর তা তেমনি বায়ু ও বীজাণুশূন্য শিশিতে ভরে ছিপি এঁটে দিলেই হ'ল। বলা বাহুল্য এ সমস্ত কাজই যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিখুঁত ভাবে করা যায়। ব্লাড্ ব্যাঙ্কে গেলে দেখবে এই রকম বায়ুশূন্য অসংখ্য শিশির মধ্যে রক্তের গুঁড়ো জমা করে রাখা হয়েছে, এবং দরকার মত তা রোগীকে দেওয়া হচ্ছে। সে সময়ে রক্তদাতার হাজির থাকার কোনই প্রয়োজন নেই।

যুদ্ধের সময় এই ব্লাড্ ব্যাঙ্কের উপকারিতা যে কত বেশী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। স্বাভাবিক অবস্থায়ও এর প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই আজকাল ব্লাড্ ব্যাঙ্ক হয়েছে—আমাদের কলকাতাতেও আছে।

সুলতান হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কে ওই গৌরাঙ্গ সুন্দর পুরুষ, যাঁহার পশ্চাতে চলিয়াছে সহস্র সহস্র নরনারী!

সুলতানের কথায় সনাতন বলিলেন: ইনি একজন সাধুপুরুষ, ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান, তাই তাঁহার পেছনে সহস্র সহস্র লোক চলিয়াছে—তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া। সনাতন ছিলেন গৌড়েশ্বরের দবীর খাস বা খাস কেরাণী (প্রাইভেট্ সেক্রেটারী)।

সুলতান হোসেন শাহ যখন গৌড়ের নবাব, স্বাধীন বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্ত্তা, সে সময়ে একদিন সুলতান দরবারে বসিয়াছেন। বিচারপ্রার্থী প্রজারা, রাজকর্ম্মচারীরা সকলে উপস্থিত। এমন সময় সুলতানের কানে আসিল খোল করতালের ধ্বনি আর কীর্ত্তনের সুমধুর রব। সুলতান মুগ্ধ হইলেন—তাই দবীর খাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গঙ্গার তীর দিয়া কে এই মহাপুরুষ চলিয়াছেন? কেনই বা এত লোক তাঁহার অনুসরণ করিতেছে?

সনাতন বলিলেন: সুলতান, ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সর্ব্বত্যাগী, সাধু সন্ন্যাসী—মানুষ, পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ সকলেই তাঁহার প্রিয়। অহিংসাই তাঁহার ধর্ম্ম, জীবে প্রেম ও ভালবাসাই তাঁহার প্রাণের কথা। পাপী, তাপী সকলেই তাঁহার আপনার।

সুলতান বলিলেন: চমৎকার! এমন কথা ত' কখনও শুনি নাই!

সনাতন বলিলেন: শ্রীচৈতন্যদেব রায়কেলী গ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করার পর সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। আজ এই মহাপ্রেমিক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন এই গঙ্গাতীরের পথে।

গৌড়েশ্বর কহিলেন: আমি যখন রাজধানীর পথে বাহির হই তখন ত' এত লোকসমাগম হয় না! এমন উন্মত্তের মত পিছু পিছু লোক চলে না!—

বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেই ত' গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

সনাতন বিনীত ভাবে বলিলেন: সুলতান, যে ঈশ্বরের কৃপায় আপনি বিশাল শান্তিপূর্ণ রাজ্য লাভ করিয়াছেন, সেই কৃপাময় ঈশ্বর আপনার প্রতি প্রসন্ন, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে—তাঁহারই কৃপায় আপনার এই রাজ্যে এই মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে।

যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিঞা॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥

সুলতান সনাতনের কথায় বলিলেন: তোমার কথা সত্য। সন্ন্যাসী, ভিখারী যাহারা তীর্থ পর্য্যটনের জন্য যায়—তাহাদের দেখার জন্য দু'চার জনের বেশী লোক আসে না—কিন্তু এ সন্ন্যাসীর সঙ্গ লোক ছাড়িতে চায় না! নিশ্চয়ই ইনি মহাপুরুষ। একবার তাঁহাকে আনিতে পারো আমার এ দরবারে?

নে 'প্লাজ্‌মা'। বাকী

বলি রক্ত-কণিকা। রক্ত-

সনাতন কহিলেন: আপ...

মহাপ্রভুর নিকট পাঠান তবে হয়ত তিনি আপনাকে দর্শন দিতে পারেন।

নবাব তখনই কেশব ছত্রীকে মন্ত্রণা-গৃহে আহ্বান করিলেন। কেশব ছত্রী ছিলেন শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শার শরীররক্ষী রাজপুত সেনাদলের অধিনায়ক।

কেশব ছত্রীর কাছে বাদশাহ তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। সুলতানের আদেশে ছত্রী শ্রীচৈতন্য-দেবের নিকট গমন করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার অনুরোধ জানাইলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন: সাধু এই সুলতান—হিন্দু মুসলমান সকলের প্রতিই তাঁহার পুত্রবৎ বাৎসল্য। চল, আমি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রভু দরবার সমীপে আসিলে পর সুলতান স্বয়ং পরম সমাদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন: আপনার ধর্ম্ম কি?

প্রভু কহিলেন: জাতিকুল কিছুই নহে—প্রেম ও ভালবাসাই আমার ধর্ম্ম।

তবে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে কেন?

সে মানুষের অপরাধ। ঈশ্বর মানুষকে মানুষ হিসাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি রাজা, তুমি বাদশাহ, তোমার কাছে যেমন প্রজামাত্র পুত্রতুল্য তেমনি আমি সর্ব্বত্যাগী ভিখারী সন্ন্যাসী, আমার কাছে—

জাতিকুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না মিলে কৃষ্ণেরে॥

হোসেন শাহ কহিলেন: আপনি মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ। আপনার কি কিছু প্রার্থনা আছে?

মহাপ্রভু কহিলেন: না বাদশাহ, তবে শুধু এইটুকু আমার অনুরোধ আমি যেন তোমার রাজ্যের সর্ব্বত্র নিরাপদে আমার এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি।

হোসেন শাহ কহিলেন: আপনি ঈশ্বরের কৃপালব্ধ সব প্রস্তুত—আপনি আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচার গিয়ে সেগুলো সাম্যবাদী ইস্‌লামের ধর্ম্ম ও আপনার এই প্রেমের ধর্ম্মে কোন পার্থক্যই নাই। কাজেই আপনি নির্ব্বিঘ্নে আমার রাজ্যে পরিভ্রমণ করুন।

ভক্তগণ-পরিবৃত শ্রীচৈতন্যদেব

সুলতান পরম সমাদরে পুনরায় মহাপ্রভুকে বিদায় দিলেন। শ্রীচৈতন্যের মধুময় প্রেমতরঙ্গে দেশের আকাশ বাতাস মধুময় হইয়া উঠিল।

বৈষ্ণব কবি এই ঘটনার কথা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন:

বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় চলুন যাহা ঞিহার মন॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হোসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের বাদশাহ। তাঁহার রাজত্বে হিন্দু মুসলমান সর্ব্ব জাতির মধ্যে ছিল প্রীতি, ঐক্য ও পরস্পরের মিলন ও ভালবাসা।

তাঁহার দরবারে—তাঁহার রাজ সরকারে অনেক হিন্দু ছিলেন উচ্চ রাজকার্য্যে অধিষ্ঠিত—দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থ গোপীনাথ বাবু—পুরন্দর খাঁ উপাধিধারী ছিলেন সুলতানের উজীর। তাঁহার দুই ভাই গোবিন্দ ও প্রাণবল্লভ—গন্ধর্ব্ব খাঁ এবং সুন্দরবর খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন এবং উচ্চ রাজকার্য্য করিতেন। সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী এই দুই ভাই—দবির খাস ও সাকর মল্লিক নামে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রয়াল বেঙ্গল টাইগার

শ্রীবিকাশ রায়

'টিফিন পিরিয়ডে' টিফিন খেয়ে ক' বন্ধুতে মিলে গল্পের আসর যখন বেশ গুলজার করে তুলেছিল এমন সময় হঠাৎ যূথিকা বল্ল: 'আচ্ছা ইলাদি, আমাদের একদিন 'চড়িভাত্তি' করলে কেমন হয়?'

যূথিকার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই, নিয়তি বল্ল: 'বেশ হয়। এবং আমাদের তা' করতেই হবে।'

বাসন্তী বলল: 'কিন্তু কারো ছাদের ওপরে নয়, অনেক দূরে—দমদম, ডায়মণ্ড হারবার কিংবা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে।'

ইলা বল্ল: 'বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই; তোমরা জায়গা ঠিক কর কোথায় করবে।'

চিন্ময়ী বল্ল: 'দমদমে করা যাক্। আমার মেসোমশায়ের একটা বেশ সুন্দর বাগান আছে—সেখানে করা যাবে। আমি মেসোমশায়কে বলে সব ঠিক ক'রে নেব।'

উমা বল্ল: 'দমদম এখনকার যুগে অচল,—পুরানো হয়ে গেছে। শিবপুরে যাওয়া যাক্। চড়িভাতি খাওয়া যাবে, বাগান দেখাও হবে। একসঙ্গে দুটো কাজ—রথ দেখা এবং কলা বেচা।'

জ্যোৎস্না বলল: 'তার চেয়ে আরো ভালো ডায়মণ্ড হারবারে। নদী তো নয় যেন সমুদ্র! তার পাড়ে বসে রান্না করা যাবে এবং জাহাজ দেখাও চলবে।

রমা বলল: 'ডায়মণ্ড হারবারের কাছে 'বাঘমারা' বলে বেশ একটা সুন্দর জায়গা আছে—কেবল আমগাছের ঝাড়। সেবার মেজদা'র সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছি। গাছের ছায়ার নীচে বেশ হবে সেখানে।'

গৌরী রহস্য করে বলল: 'বাঘমারায় বাঘ নেই ত'? কাছেই কিন্তু সুন্দরবন—রয়াল বেঙ্গল টাইগার।'

গৌরীর কথা শুনে উমা গেয়ে উঠল:

'বাংলার মেয়ে নহি ভীরু মোরা—
বীরনারী সবে সুসন্তান,
আসে যদি বাঘ, বেজি, আরশুলা,—
পালিয়ে বাঁচাব আপন প্রাণ।'

উমার গান শুনে মেয়েরা সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে প্রেসিডেণ্ট ইলা সেন 'রায়' দিলেন "ডায়মণ্ড হারবার"।...

যূথিকা বাড়ীতে এসে চড়িভাতির কথা মাকে বলতেই ছোট ভাই অজয় বল্ল: 'ছোড়দি, অরুণ ও আমাকে তোদের দলে নিবি ভাই?'

যূথিকা ভারিক্কি চালে উত্তর দিল: 'বিজাতীয়ের নো য়্যাডমিশন! তোমাদের ইচ্ছা হয় আলাদা করতে পার না?'

অরুণ অজয়ের বন্ধু এবং চিন্ময়ীর ভাই। তাদের বাড়ী খুব পাশাপাশি—একসঙ্গে লাগানো। চিন্ময়ীর সঙ্গে যূথিকার এবং অরুণের সঙ্গে অজয়ের খুব বন্ধুত্ব—যাকে বলে গলায় গলায় ভাব। যূথিকার কথা শেষ হতে না হতে চিন্ময়ী বল্ল, 'এটা স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ, আমরা পুরুষদের সঙ্গে নন্-কো-অপারেশন! সুতরাং ভাগো হিঁয়াসে।'

চিন্ময়ীর কথা শুনে অরুণ ভ্রূকুটী কেটে বল্ল: মুখে ত' তোমরা খুব বড়াই করছ কিন্তু পুরুষের সাহায্য ছাড়া এক পাও চলবার ক্ষমতা আছে তোমাদের? এই যে তোমরা ডায়মণ্ড হারবারে যাবে, কি ক'রে যাবে শুনি—হেঁটে? মোটর ড্রাইভ করবার সময় পুরুষের ... নিতে হবে না?'

চিন্ময়ী উত্তর করল: 'সে ত চাকরের কাজ। ...। বাকী ...

দের আমরা চাকর হিসাবে খাটাব অর্থাৎ তোমরা যে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট সেইটে জানাতে চাই।'

চিন্ময়ীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যূথিকা বল্ল: 'তোমাদের আমরা 'বয়' হিসাবে সঙ্গে নিতে পারি,—হুকুম করলেই জিনিষপত্র সব এগিয়ে দেবে। যাবে তোমরা বয় হয়ে?'

যূথিকার কথা শুনে অজয় ও অরুণ রেগে একসঙ্গে বলে উঠল: 'আচ্ছা, দেখে নেব তোমরা কেমন চড়িভাতি খাও! তোমরা সব রান্না করবে, আমরা মাননীয় অতিথির ন্যায় গিয়ে আহার করব।'

তাদের কথা শুনে যূথিকা ও চিন্ময়ী একটু হাসল মাত্র।...

পরদিন অজয় এবং অরুণ স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের জানাল তাদের বোনেরা স্কুলের আরো কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারে চড়িভাত্তি করবে—আর তাদের সকলকে ...রা নেমন্তন্ন করেছে।

...তাদের কথা শুনে বন্ধুর দল আনন্দে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল: 'থ্রী চীয়াস্ ফর্ চড়িভাত্তি—হিপ্ হিপ্ হুরে...'

চীৎকার থামলে অশোক বল্ল: 'কবে চড়িভাতি ভাই?'

অজয় জবাব দিল: 'আগামী শনিবার।'

অরুণ বল্ল: 'আমাদের কিন্তু এক কাজ করতে হবে। আমরা তাদের সঙ্গে না গিয়ে ষ্টীমারে যাব। ষ্টীমার পার্টিও হবে—চড়িভাতি খাওয়াও চলবে।'

অজয় বল্ল: 'বেশ তাই হবে; দিলীপ, তুমি তোমার বন্দুকটা সঙ্গে নিও—রাস্তায় হাঁস শিকার করা যাবে।'

অজয়ের কথা শেষ হ'লে অরুণ বল্ল: 'সবচেয়ে মজা হবে আমরা যদি একটু দেরী করে যাই। আমাদের দেরী দেখে তারা ভাববে—আমরা বোধ হয় আর গেলাম না। তারপর জিনিষপত্র সব নষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে মনে যখন খুব রাগতে থাকবে, এমন সময় আমরা আচমকা উপস্থিত হ'য়ে তাদের খুব আশ্চর্য্য করে দেব।'

অজয় বল্ল: 'এ বেশ মন্দ যুক্তি নয়। ওরা রেঁধে বেড়ে সব প্রস্তুত করে রাখবে আর আমরা মাননীয় অতিথির ন্যায় গিয়ে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করব।...'

আজ চড়িভাত্তি। যূথিকা এবং চিন্ময়ীর আ... ব্যস্ততার সীমা নেই। ঠিক হয়েছে তাদের ওখানে এ... একত্রিত হয়ে তারপর সকলে এক সঙ্গে যাত্রা করবে।

এক এক করে সকলে এসে উপস্থিত হ'ল। ড্রাইভা... মহাবুব মিঞা মোটর নিয়ে প্রস্তুত। সঙ্গে তাদের পুরাে... চাকর জগড়নাথ। চিন্ময়ী ঠিকই বলেছে, এটা স্ত্রী স্বাধীনতার যুগ;—পুরুষের সাহায্য না নিয়েই তারা সব কা... করতে পারে।...

বাঘমারায় যখন উপস্থিত হ'ল তখন ৯টা বেজে ৭ মিনিট। জায়গা দেখে সকলেরই পছন্দ হয়ে গেল রমলির 'চয়েস' আছে বলতে হবে। বড় বড় আমগাছে... ঝাড়—সামনে নদী, দেখতে প্রায় সমুদ্রের মতই! এ... একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে বড় বড় জাহাজের উপর আছড়ে পড়ছে আর খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। না, সত্যি এ স্থা... চড়িভাতির উপযুক্ত!

কালক্ষেপ না করে তারা হাতাহাতি করে রান্না... যোগাড়যন্ত্র করতে লাগল। তাদের উৎসাহ দেখে কে... কে বলবে এই মেয়েরা বাড়ীতে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত—একটুখানি ঘর-সংসারের কাজ করতে বল্লেই অমনি তাদের মাথায় বাজ পড়ে! এরা যেন আদ্যি কালের গিন্নী! সকলে মিলে টপ্ টপ্ ক'রে কাজ করতে লাগল।

কিন্তু এদিকে এক মহা বিভ্রাট! উনুন ধরাতে গিয়ে দেখে দেশলাই নেই। দেশলাই যে একটা অত্যন্ত দরকারী জিনিষ আসবার সময় সে কথা কারো মনে হয় নি। বাজার এখান থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে। এখন উপায়! সকলে ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল। কিন্তু না, তাদের আর বেশী ভাবতে হ'ল না, জগন্নাথ 'বটুয়া' থেকে দেশলাই বার করে দিয়ে তাদের মুস্কিল আসান করে দিল।

রান্না প্রায় একরকম শেষ হয়ে এসেছে। বাকী কেবল মাংস। মাংস রান্না শেষ হ'লে তাদের সাধের চড়িভাতি খাওয়া হয়। কিন্তু মাংস রান্না করতে গিয়ে দেখে এ বিষয়ে তারা প্রত্যেকে এক একজন মহামহোপাধ্যায়।

যূথিকা বল্ল: 'মা'র কাছে দেখেছি—মাংস, নূন, তেল, মসল্লা এবং হলুদ সব একসঙ্গে মেখে তারপর হাঁড়িতে চাপাতে হয়!'

বাসন্তী বল্ল: 'পাকপ্রণালী বলে একখানা বইয়ে

ড়েছি এক সের মাংসে তিন সের জল, আধ পো তেল, দেড় ছটাক ঘি, এক ছটাক করে নূন ও হলুদ প্রভৃতি দিতে হয়।'

রমা বল্ল: 'আগে মাংসটা জলে বেশ করে সেদ্ধ করে নিতে হবে,—নইলে কাঁচা থাকবে যে!'

উমা বল্ল: 'আমরা সকলে যখন এ বিষয়ে মহা পণ্ডিত তখন গবেষণা করে বিশেষ কিছু লাভ হবে ব'লে মনে হয় না। তার চেয়ে চল মহাবুব মিঞার শরণ নেওয়া যাক্। স নিশ্চয়ই কোন বাদশাহ কিংবা নব্যাবের বংশধর।' র হাতে খেতে আপত্তি থাকলে ও অন্ততঃ দেখিয়ে ক্—যদিও স্পর্শদোষ জিনিষটা এই বিংশ শতাব্দীর ভ্যতার যুগে একেবারে অচল।...

মাংস হাঁড়িতে টগবগ করে ফুটছে। মেয়েরা হাঁড়ির রিদিকে। সকলের জিভে জল। প্রেসিডেণ্ট ইলা সেন ার লোভ সামলাতে পারল না। 'কেমন হয়েছে টেষ্ট রে দেখি'—বলে এক টুকরো মাংস হাঁড়ি থেকে বের করে নয়ে চিবোতে চিবোতে বল্ল—'ঝা বেড়ে লাগছে ভাই!'

বাসন্তীও দেখি দেখি করে এক টুকরো মাংস হাতে নিয়ে ফুঁ দিতে দিতে বল্ল: 'ক্ষিদের সময় টকও অমৃত হয়।'

যূথিকা বল্ল: 'তা' নয়, চড়িভাতির রান্না কিনা,—ালো না হয়েই পারে না।'

এদিকে মেয়েরা যখন সকলে মাংস টেষ্ট করতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে একটু দূরে কলকাতার কয়েকজন ছেলে দু'জন গ্রাম্য লোককে ধরে বলছে: 'ওহে, তোমরা যদি একটা কাজ কর তা'হলে আমরা দু'জনকে দু'টাকা পুরস্কার দেব।'

লোক দু'টী টাকার লোভে ছেলেদের লম্বা সেলাম দিয়ে বল্ল: 'কি বাবু, কি কাজ করতে হবেক মোদের?'

একটি ছেলে আঙ্গুল দিয়ে একটা জায়গা নির্দ্দেশ করে দিয়ে বল্ল: 'ঐখানে ক'জন মেয়ে রান্না করছে। তোমরা তাদের সামনে দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে যাবে আর বলবে,—দিদিমণিরা পালান, পালান! বাঘ—রয়াল বেঙ্গল টাইগার!'

লোক দুটো চলে যেতেই অজয় বল্ল: 'দিলীপ! অরুণ ও আমি ঘটী মুখে দিয়ে যেই অদ্ভুত আওয়াজ করব অমনি তুই দু'টো ফাঁকা আওয়াজ করবি—বুঝলি?'

দিলীপ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

চড়িভাতির রান্না সব প্রস্তুত, সকলে খাবার যোগাড় করতে ব্যস্ত। এমন সময় দু'জন গ্রাম্য লোক—'দিদিমণিরা, পালান, পালান! বাঘ বেরিয়েছে—রয়াল বেঙ্গল টাইগার' ব'লে চীৎকার করতে করতে তাদের পাশ কেটে দৌড়ে চলে গেল।

বাঘের কথা শুনে এবং লোক দু'টোকে ছুটতে দেখে সকলে বিস্ময়ে হতভম্ব। কি করবে কিছুই বুঝতে না পেরে সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু তাদের বেশীক্ষণ আর ভাবতে হ'ল না। হঠাৎ দূরে বাঘের ডাক এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ এসে তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করল।

চড়িভাতি গেল চুলোয়। রান্না সব রইলো পড়ে। প্রাণের ভয়ে সকলে দৌড়ে মোটরে উঠে বল্ল: 'মহাবুব, জলদি জলদি ...'

* * * *

অশোক খেতে খেতে বল্ল: 'এই বুঝি আমাদেরই নেমন্তন্ন খাওয়া? এ কিন্তু তোমাদের ভীষণ অন্যায়! কত আশা ক'রে বেচারীরা—'

প্রণব বাধা দিয়ে বল্ল: 'এখন আর ভেবে লাভ কি? তারা এতক্ষণ কলকাতার কাছাকাছি। আর পাপ যদি হয় হবে অজয় এবং অরুণের।'

দিলীপ বল্ল: 'আমাদের উচিত তাদের জন্য কিছু নিয়ে যাওয়া।'

অজয় বল্ল: 'তোমরা এখন চট্‌পট্ খাও দিকিনি? সে সম্বন্ধে তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। কিছু রাঁধা মাংস টিফিন ক্যারিয়ারে করে নেব এখন।'

সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে অশোক প্রভৃতি 'থ্রী চীয়ার্স ফর্ অজয় গুঁই হিপ্ হিপ্ হুরে; থ্রী চীয়ার্স ফর্ অরুণ চ্যাটার্জ্জী হিপ্ হিপ্ হুরে'—প্রভৃতি ধ্বনি করতে করতে সকলে কলকাতার দিকে রওনা হ'ল।

অজয় ও অরুণ বাড়ি এসে দেখে মেয়েরা সকলে তাদের ওখানে খেতে বসেছে। তারা যেন কিছুই জানে না এমনি ভাব দেখিয়ে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে মা জানালেন—তাদের চড়িভাতি খাওয়া হয় নি। খেতে বসবে

এমন সময় একটা প্রকাণ্ড রয়াল বেঙ্গল টাইগার এসে তাদের তাড়া করেছে।

যূথিকা মা'র ভুল সংশোধন ক'রে বল্ল, 'একটা নয়, দু'টো।'

অরুণ যূথিকার কথা শুনে গম্ভীর ভাবে বল্ল: 'দু'টো নয়, পাঁচটা; এবং তারা হচ্ছে শ্রীমান্ অজয় গুঁই, অরুণ চ্যাটার্জ্জী, দিলীপ রায়, অশোক বসু এবং প্রণব বাগচি।' ব'লে তাদের কীর্ত্তির সব কথা সকলের সম্মুখে প্রকাশ করে দিল।

অরুণের কথা শুনে বাড়ীশুদ্ধ সকলে ত' অবাক্। মা রেগে বল্লেন: 'এ কিন্তু তোমাদের ভীষণ অন্যায়। বেচারীরা কত কষ্ট ক'রে যোগাড়যন্ত্র করলে আর তোমরা কিনা—'

অরুণ চিন্ময়ী এবং যূথিকার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটী কেটে বল্ল: 'এটা স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ কিনা—ত

অজয় বল্ল: 'না, ওরা একেবারে বাদ পড়ে মাংস আমরা নিয়ে এসেছি। মা, তুমি ওদে দাও।'

অজয়ের কথা শুনে,—'চাই নে আমরা তোমাদে এর সাজা তোমাদের একদিন পেতে হ'বে'—ব'লে রাগ ক'রে শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল।

চিন্ময়ী মনে মনে ভাবতে লাগল—হায় রে, যদি অজয় আর অরুণকে তাদের দলে নিত, ত আজকে তাদের এত সাধের চড়িভাতি পণ্ড হ'ত না

অন্যান্য মেয়েরা কিন্তু দিব্যি মাংসের হাড় চিবুতে বলাবলি করতে লাগল—'উঃ, ছেলেরা কি দু ভাই! ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা দায়! কি জব্দ আজ করেছে তারা!

রাজা হওয়া সুখের নয়

(প্রাচীন গ্রীসের গল্প)

শ্রীসীতা দেবী

ডায়োনিসিউস ছিলেন গ্রীসের রাজা। ডেমোক্লিস্ ছিলেন তাঁরই অনুচর এবং বিশেষ বন্ধু। ডেমোক্লিস্ ভাবতেন, ডায়োনিসিউসের মত সুখী বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। যখন যা খুসী করছেন, যা খুসী খাচ্ছেন, যা খুসী পরছেন; রাজ্যশুদ্ধ লোক তাঁর হুকুম তামিল করতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত—তাঁর ভয়ে সবাই সব সময়ে তটস্থ। এর চাইতে সুখ আর কি হ'তে পারে?

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ডেমোক্লিস্‌কে ডেকে বললন, 'কি হে, তোমার নাকি রাজা হবার ভারি সখ? এ সুখটাই শুধু দেখছ! হবে একদিনের জন্য ?'

ডেমোক্লিস্ ভাবলেন রাজা বুঝি তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা ছেন কিন্তু ডায়োনিসিউস্ যে ঠাট্টা করছেন না তা পরের দিনই জানা গেল—যখন তিনি ঘোষণা করলেন, আজকে দিনের জন্য ডেমোক্লিস হবেন রাজা।

ডেমোক্লিসের তো স্ফূর্ত্তি আর ধরে না। হোক একদিনের জন্য, তাই বলে এতটা সুখ, এতটা সম্মান—এ কি সহজ কথা!

ডেমোক্লিস্ খেতে বসলেন। তাঁর সামনে অতি উপাদেয় সব খাবার। এত উৎকৃষ্ট খাবার রোজ রোজ যে খেতে পায় তার সুখ নয় ত' কি? দাসদাসী সমস্ত কাজ করে দেবার জন্য এগিয়ে আছে, ডেমোক্লিস্‌কে নিজের হাতে কিছুই করতে হ'ল না।

বিকেলে ডায়োনিসিউস্ এসে খবর নিলেন, 'কি হে সব ঠিক মত হচ্ছে তো? খুব ভাল লাগছে, না?'

ডেমোক্লিস্ হাসিমুখে বল্লেন, 'না লাগার কি আছে!

একটি কাজও তো আমায় নিজে হাতে করতে হয় নি।'

'সেটা সুখের কথা না দুঃখের কথা বলা কঠিন। যাক্ গে, কোন্ রকম বিপদ্-আপদ্ ঘটে নি তো?'

'বিপদ্!'—ডেমোক্লিস্ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। —চারিদিকে প্রহরী, শরীররক্ষী সব গিস্‌গিস্ করছে—এর মধ্যে রাজার বিপদ্!

ডায়োনিসিউস্ হেসে ডেমোক্লিসের মাথার ওপর কড়িকাঠের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। দেখা গেল, ঠিক তাঁর মাথার ওপর এক গাছা সরু চুলের সঙ্গে বাঁধা একটা খাঁড়া ঝুলছে। যে কোন মুহূর্ত্তে খাঁড়াখানি সেই চুলের বাঁধন কেটে বা ছিঁড়ে ডেমোক্লিসের মাথার ওপর পড়তে পারে।

ডেমোক্লিস ভীষণভাবে আঁৎকে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ডায়োনিসিউস্ হেসে বল্লেন, 'এত ঘাবড়ালে চলবে কেন বন্ধু? রাজা হ'তে হ'লে ও রকম একটি খাঁড়া সর্ব্বদা মাথার উপর ঝুলছে এই জেনেই দিন কাটাতে হবে। লক্ষ লক্ষ লোককে নিয়ে রাজার কারবার। সবাইকে তো আর এক সঙ্গে খুসী করা সম্ভব নয়—কাজেই আশেপাশে কিছু কিছু শত্রু থাকবেই; এবং প্রাণটাও যে কোন মুহূর্ত্তে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই রাজত্ব করতে হবে।'

ডেমোক্লিস মুকুট খুলে রেখে বল্লেন, 'এই রইল রাজমুকুট। দরকার নেই আমার রাজত্বে। সুখের চেয়ে সোয়াস্তিই আমার ঢের ভাল।'

রামধনুর প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর বয়স ১৭ বছর পূর্ণ হ'ল, আসছে বৈশাখে তার ১৮ বছর সুরু হবে। আমাদের এক বন্ধু বলছিলেন, আইনের চোখে লোকে ১৮ বছরে সাবালক হয়—কাজেই আসছে বছর থেকে 'রামধনু'ও সাবালক হ'তে চলল। কথাটা হাসির হ'লেও এর মধ্যে খানিকটা গৌরবও মেশান আছে বৈকি!

যুদ্ধের দরুণ বাধাবিপত্তির আর অন্ত নেই। এ বছরও রামধনুকে অনেকগুলি দিন প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। আগে ছিল কাগজের দুর্ভিক্ষ, সেটার যদিও বা কিছু পরিমাণ ব্যবস্থা করা গিয়েছিল কিন্তু তারপরেই দেখা দিল সরকারী আদেশ। সরকার থেকে হুকুম এল, সমস্ত সাময়িক পত্রিকাকে তাদের পৃষ্ঠাসংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ কমাতে হবে। এই অদ্ভুত আদেশে রামধনুর পৃষ্ঠাসংখ্যা এসে দাঁড়াল ১০এ। কিন্তু এতে আমাদের যে কোন হাত ছিল না—ভারত রক্ষা আইনে সরকারী আদেশ না মেনে যে উপায় নেই তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ। যদিও আমরা নানা ভাবে—যেমন ছোট অক্ষর ব্যবহার করে, লাইন ঘেঁষাঘেঁষি করে, তার মাপ বাড়িয়ে ... ২ কলমে ভাগ করে এখনকার এক পৃষ্ঠায় আগেকার প্রায় দেড় পৃষ্ঠা মত লেখা পরিবেশন ... ব্যবস্থা করলাম তবুও ঐ ক্ষুদ্র পরিসরে সব কিছুর স্থানকে সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ছবি দেওয়া চেষ্টা বন্ধ করতেই হ'ল, বড় প্রবন্ধ বা গল্প,—এমন কি ... বিভিন্ন বৈচিত্র্য এবং নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস প্রভৃতি সুরু করা সম্ভব হ'ল না। ইতিমধ্যে ভারত সরকার থেকে

আদেশ প্রত্যাহারের বা অন্ততঃ রামধনুর প্রতি বিশেষ কোন সুবিধা দানের জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে দীর্ঘ ৬ মাস (শ্রাবণ—পৌষ) ক্ষীণ কলেবরে কাটাবার পর ভারত সরকার রামধনুকে 'নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খবরের কাগজ ছাপবার বিশেষ ধরণের কাগজ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। ফলে পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠা সঙ্কোচের আইন থেকে রেহাই পেয়ে রামধনু খবরের কাগজ ব্যবহারের বিশেষ আইনের গণ্ডীতে এসে দাঁড়াল।

আশানুরূপ কাগজ যদিও আমরা পাই নি, তবুও গত মাঘ থেকে পৃষ্ঠা-সংখ্যা আমরা অনেক বাড়াতে পেরেছি, এবং সম্প্রতি এ সংখ্যা থেকে আরও কয়েক পৃষ্ঠা বাড়াবার অনুমতি পাওয়া গেছে। আশা করি এবার থেকে রামধনুকে অমরা কতকটা মনের মত করে সাজাবার সুযোগ পাব।

শিশুসাহিত্যের যে সব সুপরিচিত ... সাজাতে সাহায্য করতেন আসছে ... সহযোগিতা নিয়মিত পাওয়া যাবে। ... লেখকের লেখা দু'খানি উৎকৃষ্ট ধারাবা... আমরা আসছে বছর থেকে দিতে পারব; ... বৈচিত্র্যও থাকবে।

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের এই সু... আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পৃষ্ঠা-হ্রাসে ... সকলেই রামধনুর প্রতি বিরক্ত হবেন ব'লে ... করেছিলাম কিন্তু তার বদলে তাঁ... সহানুভূতির পরিচয় আমরা পেয়েছি তা অ... মনে থাকবে।

রণজি ক্রিকেট-প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছে। ফাইনালে বোম্বাই দল হোলকার দলকে ৩৭৪ রানে হারিয়ে দিয়েছে। এই খেলায় ...ই রান্ উঠেছিল প্রচুর। বোম্বাই দলের ১ম ...য় ৪৬২ রান্, ২য় ইনিংস্‌এ ৭৬৪ রান্। ... দলের হয় ১ম ইনিংস্‌এ ৩৬০, ২য় ইনিংস্‌এ ...। বোম্বাইএর হয়ে বিজয় মার্চ্চেণ্ট ২য় ইনিংস্‌এ ...৭৮ রান্ করেন। মোদী করেন ১ম ইনিংস্‌এ ৯৮, ...স্‌এ ১৫... কুপার করেন ২য় ইনিংস্‌এ ১০৪। ... মার্চ্চেণ্টও দুই ইনিংস্‌এ যথাক্রমে ৭৯ ও ৭৩ রান। হোলকার দলের কপ্টেনের ২য় ইনিংস্‌এ ...হয়ে ২৪৯ রান্ এবং মুস্তাক আলির দুই ইনিংস্‌এ ...মে ১০৯ ও ১৩০ রান্ উল্লেখযোগ্য। বোলিংএ বোম্বাই- কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রেই হোলকারের সি. এস. নাইডুর নাম করা সব চেয়ে বেশী। যেতে পারে। বোম্বাই দল এই নিয়ে চার... ১৯৩৬, ১৯৪২, ১৯৪৫) রণজি প্রতিযোগিতা... আর কোন দলই এত বার এ গৌরব লাভ... নি। বোম্বাই ছাড়া নিম্নলিখিত দলগুলি বিজয়ী হয়েছে: মহারাষ্ট্র (১৯৪০, ১৯৪১) ন... হায়দারাবাদ (১৯৩৮), বাংলা (১৯৩৯), ব... পশ্চিম ভারত (১৯৪৪)।

* * *

সম্প্রতি বর্দ্ধমানের এক পল্লীতে পল্লীক... মল্লিককে দেশবাসী তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানি... কুমুদরঞ্জন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি... খাঁটী বাংলাদেশের কবি তিনি। তাঁর ক... পল্লী-জীবনের যে সহজ সুরটির পরিচয় প... সাহিত্যে বিরল। তোমরা রামধনুতে তাঁর

পড়েছ—কি সহজ, সরল এবং অপূর্ব্ব সে সব কবিতা! রামধনুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন। রামধনুর পক্ষ থেকে আমরাও তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কবির বয়স বর্ত্তমানে ৬২ বছর হয়েছে। দীর্ঘায়ু হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করুন এই প্রার্থনা করি।

* * * *

যুদ্ধের অবস্থা এখন জার্ম্মেনীর পক্ষে ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। পশ্চিম দিক্ থেকে মার্কিন ও ইংরেজ পক্ষের সম্মিলিত আক্রমণ এবং পূব দিক্ থেকে সোভিয়েট রুশ বাহিনীর প্রচণ্ড গতি তাকে প্রায় কোণ-ঠাসা ক'রে এনেছে। খাস জার্ম্মেনীর অনেকখানি অংশ এখন মিত্রপক্ষের দখলে গেছে। পূবে ওডার এবং পশ্চিমে রাইনের তীর পর্য্যন্ত তারা এগিয়ে এসেছে। জার্ম্মেনী 'মরিয়া' হয়ে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু আর কত দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলা কঠিন। সম্প্রতি তাদের বিখ্যা[ত] কোলোন সহর মিত্রপক্ষের দখলে গেছে। তার ওপ[র] তুরস্ক, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রাচ্যে জাপানের অবস্থাও বেশী সুবিধের নয়। ফিলি[পাইনের] ... পাইনের পরাজয়ের পর সম্প্রতি তারা নিজেদের দেশে[ই] বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। জাপান থেকে ৭৫০ মাইল দূরে ইয়োজিমা দ্বীপে মার্কিন বাহিনী সৈন্য নামিয়ে তা প্রা[য়] দখল করে নিয়েছে। টোকিও অঞ্চলেও ক্রমাগত বোম[া] বর্ষণ চলেছে; শীঘ্রই খাস জাপানে আমেরিকান্‌দের আক্রমণ সুরু হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। ব্রহ্মদেশেও মিত্র[-] পক্ষের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ২৬শে ফাল্গুনের খবর— সম্প্রতি মান্দালয় সহরের এক তৃতীয়াংশ তারা অধিকা[র] করে নিয়েছে। এ অভিযানে ভারতীয় বাহিনীর কৃতি[ত্ব] অসাধারণ।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

জন্মদিন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক কুলজা সাহিত্যমন্দির। দাম ॥০

এটি একখানি ছোটদের নাটক। ছোটদের ভাল নাটক বাংলায় খুব বেশী নেই, এ নাটকটি সেই অভাব অনেকটা পূর্ণ করবে। 'জন্মদিনের' কথাবার্ত্তা বা সংলাপ (নাটকের যা আসল প্রাণ) উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তুও সময়োপযোগী। তোমরা এই বই পড়ে তো আনন্দ পাবেই, অভিনয় করেও সকলকে আনন্দ দিতে পারবে।

হিমাচলের স্বপ্ন—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক কুলজা সাহিত্যমন্দির। দাম এক টাকা।

ছোটদের জন্য লেখা এই উপন্যাসটির নায়ক একটি ভালু[ক] —'ভাল্লু'। চিড়িয়াখানায় বসে বসে সে তার জন্মভূ[মি] হিমাচলের স্বপ্ন দেখে,—তার পর একদিন সুযোগ বু[ঝে] চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে যায়। তার পর সুরু হ[য়] নানান্ অভিজ্ঞতা। য়্যাডভেঞ্চারের গল্পে গ্রন্থকার অ[দ্বি]দ্বন্দ্বী, কিন্তু তাঁর এই নতুন ধরণের বইখা[নি] ... উপভোগ্য হয় নি।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

মঞ্জু পিসীর ছেলের বিয়ে

শ্রীমতী বুলি চৌধুরী

সেদিন রাতে দেখতে গেলাম মঞ্জু পিসীর ছেলের বিয়ে,
শঙ্খ বাজায় গুবরে পোকা, সানাই শোনায় ময়না টিয়ে।
ছাতনা-তলায় হট্টগোলে বিয়ের আসর উঠল জমে,
হচ্ছে যে এক বিরাট ব্যাপার পড়শীরা তা জানলো ক্র[মে]

বরের পিসী সেই খুকু গো, পাচ্ছ না কি চিনতে তারে?
কনের বাড়ীর খ্যাঁট খেয়ে কি ভুল্‌লে বেবাক্ একেবারে?
ঐ যে খুকু দাঁড়িয়ে হোথায় কাটছে কেবল ভেংচি খালি,
যোগ দিয়েছেন আবার তা'তে আরশুলা আর কাঠবেড়ালী।
গোমড়া মুখে অমন ক'রে ছুটছে কে সে—কনের পিসী?
ও মা, এ যে গীতুদি ভাই! দেখেই বেজায় পাচ্ছে
বাসর-ঘরে কাঁসর বাজায় কে রে হাঁদা?—কাদের
অমু দাদা? তাকে যে হায় মারছে চাঁটি সবাই মি[লে]
মণ্টু, খ্যাপা, অন্তু, রেবা সব জুটেছে সেথায় গিয়ে,
সেদিন রাতে হচ্ছে যখন মঞ্জু পিসীর ছেলের বিয়ে

কিড্‌ন্যাপ্‌ড্

(রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন)

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১৭৫১ খৃষ্টাব্দের এক সুন্দর সকাল থেকেই এই কাহিনী সুরু করি। সেদিন এসেনডিনে আমার বাবার বাড়ীতে শেষ বারের মত চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওখানকার ধর্ম্মযাজক আমাকে বাবার লেখা একটা চিঠি দিয়ে বেলফুরে শ'দের বাড়ীতে যেতে বলে বিদায় নিলেন। বাবা মৃত্যুর আগে বলে গেছেন। মা তারও আগে মারা গেছেন। বেলফুরে শ'দের বাড়ীতে আমার কি কাজ [থা]কতে পারে!

[দী]র্ঘ দুইদিনের পথশ্রমের পর বেলফুরের কাছাকাছি [এলা]ম। কিন্তু শ'দের বাড়ীর কথা যাকে জিজ্ঞাসা করি তারই [...]বহার দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। এ কি! শ'রা এখানে [...]ত ঘৃণিত কে[ন?] ... লাম অত বড় বাড়ীতে এব্‌নেজার ... [থা]কেন না। দূর থেকে সেই [বে]লফুর ছা[...] ... ম্‌ছম্ করতে লাগল। [...]বাতন [...] ... [অনে]কক্ষণ ধাক্কাধাক্কির ... প্র[...] ... নাম ডেভিড ...

ছোট অন্ধকার কুঠরির মত একটি ঘর। ... এক ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে চিঠিটা ... জানলাম তিনিই আমার বাবার একমাত্র ভা[ই] ... সন্দেহাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে আমি শিউ[রে] ... সে রাতটা কাটলো একরকম। কিন্তু কা[কার দিকে] তাকিয়ে একটুও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

প্রকাণ্ড নির্জ্জন বাড়ীতে একা বসে বসে ... কথাই মনে হচ্ছিল, বাবা কাকার চেয়ে ব[ড়] নিশ্চয়ই—কিন্তু বাবা এত বড় সম্পত্তির কিছুই ... কেন? এই ধরণের প্রশ্ন করার মুখেই ... দু'হাতে আমার গলা টিপে ধরলেন, কিন্তু পরম[ুহূর্ত্তে] ... হয়ে ছেড়ে দিলেন। কাকাকে এবার আম[ার] বিশেষ ভয় করতে লাগল।

হঠাৎ তিনি বললেন—'ডেভিড, তুমিই আ[মার] উত্তরাধিকারী। তোমাকে আমার সব সম্পত্তি ... যাব। তুমি শুধু কাগজপত্রগুলো ছাদের ঘর [থেকে নিয়ে] এস।'

সম্মত হয়ে আনতে গেলাম, কিন্তু আলো সঙ্গে নিতে পারলেন না। দৈত্যপুরীর মত বিশাল অন্ধকার বাড়ী, তার উপর চন্দ্রহীন রাতের কালো আকাশ মেঘে ঢাকা। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, আমি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছি—তার পরেই সিঁড়ি ভাঙা। আর একটু হলেই আমি অত উঁচু থেকে নীচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতাম। আর সেই আলোতে দেখলাম কাকা অধীর আগ্রহে আমার উপরে ওঠা দেখছেন। মেঘ গর্জ্জন করে ওঠার শব্দকে আমার পড়ে যাওয়ার শব্দ মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন। সত্যি! আমাকে তিনি হত্যা করতে চান? নীচে নেমে এসে কাকার কাছে যাওয়া মাত্র তিনি আর্ত্তনাদ করে উঠলেন—'ও ডেভিড, তুমি এখনো বেঁচে আছ!' তারপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

পরদিন আমাকে বাবার এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন বলে কুইন্স ফেরিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে 'কভেন্যান্ট' জাহাজে দাঁড়িয়ে তার ক্যাপ্টেন হোসিয়াস্‌নের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় জাহাজ ছেড়ে দিল। পালানোর চেষ্টা করার আগেই মাথায় এক লৌহদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। জ্ঞান হারানোর আগে ক্ষণিকের জন্য কাকার হর্ষোচ্ছল মুখটা দেখতে পেয়েছিলাম।

এখানে এক কুঠরীতে আমি অনেক দিন বন্ধ হয়ে ছিলাম। র‍্যান্সম্‌ বলে একটি ছোট ছেলের সঙ্গে আলাপও হ'ল। একদিন হোসিয়াস্‌ন হঠাৎ আমাকে মুক্তি দিয়ে বললেন—'তুমি র‍্যান্সমের কাজ আজ থেকে করবে।'

মুক্তির আনন্দ নিয়ে যেতে যেতে দেখি মৃত্যু-বিবর্ণ র‍্যান্সম্‌কে সকলে নিয়ে যাচ্ছে। জাহাজের ভাইস্‌ ক্যাপ্টেন মিঃ সুয়ান্‌ সখ করে র‍্যান্সম্‌কে গুলি ছুড়ে মেরেছেন। র‍্যান্সমের অবস্থা দেখে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে হোসিয়াস্‌ন, সুয়ান ও রিয়াকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হলাম।

সেই রাতে যখন সকলে খাচ্ছে সেই সময়ে হঠাৎ জাহাজের ধাক্কায় একটি নৌকো ডুবে গেল এবং একজন ছাড়া আর কোন আরোহীর প্রাণরক্ষা হল না। লোকটি জাহাজে উঠে এল। তার কাছে অনেক টাকার তোড়া দেখে ক্যাপ্টেনের চোখ জ্বলে উঠলো।

হঠাৎ এক সময় আমি হোসিয়াস্‌ন, রিয়াক ও সুয়ানের আলাপ শুনতে পেলাম। তারা সেই লোকটাকে হত্যা করে টাকাগুলো নিতে চায়। আমি সেই লোকটিকে গোপনে তার বিপদের কথা জানিয়ে দিলাম।

সেই লোকটির নাম য়্যালান ব্রেক ষ্টুয়ার্ট। য়্যালান তখন রসদ-ঘরে ছিল। সে এই খবর পেয়েই দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে ঘরটিকে সুরক্ষিত করলো এবং আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। হোসিয়াস্‌নের আক্রমণ কয়েকবার প্রতিহত হ'ল, তারপর য়্যালানের হঠাৎ আক্রমণের ফলে মিঃ সুয়ান ও কয়েকজন নাবিক নিহত হলো। বাধ্য হ'য়ে হোসিয়াস্‌ন য়্যালানের সঙ্গে মিটমাট করে ফেললো।

তার পর য়্যালানের কাছে তার জীবন-কাহিনী শুনলাম। ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে স্কটল্যাণ্ডের রাজা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফ্রান্সে আছেন। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড অধিকৃত হলেও স্কটল্যাণ্ডের লোকের পূর্ব্ব রাজভক্তি আজও যায় নি। তারা লুকিয়ে অর্থ সংগ্রহ ক'রে ফ্রান্সে তাদের ভূতপূর্ব্ব রাজার কাছে পাঠায়। য়্যালানই সেই অর্থবাহক। ইংল্যাণ্ডের রাজা এই খবর পেয়ে কলিন রয় নামে একজন শাসনকর্ত্তাকে স্কটল্যাণ্ডে পাঠিয়েছেন। তিনি সেখানে সকলের উপর এত অত্যাচার আরম্ভ করেছেন যে সকলে উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছে। তাঁকে সকলে 'রেড ফক্স' বলে। স্কটল্যাণ্ডে দল অনেক থাকলেও রাজাকে সকলেই ভালবাসে।

অন্ধকারে বসে বসে গল্প করছি, হঠাৎ হোসিয়… এসে খবর দিল অন্ধকার সমুদ্রে পথ খুঁজে পাওয়া… না। আমরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ডেকে … ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের গর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই … পারলাম না। হঠাৎ ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে … ভয়ঙ্কর কেঁপে উঠলো। আমি… জলে পড়লা…

জ্ঞান হয়ে দেখে আমি … প। য়্যা… কাছাকাছি কোথ… অনেক… ক'রে চারদি… । অনেক …

ছাতনা-তলায় হট্টগোলে বিয়ের আসর উঠল জমে,
হচ্ছে যে এক বিরাট ব্যাপার পড়শীরা তা জানলো ক্র…

সেই … প্রধান করে দিল—স্কটল্যাণ্ডে ওর … নেওয়া … বিপজ্জনক।

… …নের পথে যেতে যেতে অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে … জন অশ্বারোহীকে আসতে দেখলাম। একজনকে দেখে … মনে যেন-মনে হ'ল, তিনিই 'রেড ফক্স' হবেন। তাঁর … সবে কথা বলছি, হঠাৎ কোথা হ'তে এক গুলি ছুটে … লো এবং 'রেড ফক্স' আর্ত্তনাদ করে মাটিতে পড়ে … লেন।

আমি যেন হত্যাকারীকে দেখতে পেলাম। হত্যাকারীর পিছু ছোটামাত্র দেখি সমস্ত সৈন্য আমাকে ধরবার … ন্য ছুটে আসছে। আমিই নাকি গুলি করার সুবিধার … ন্য কলিন রয়কে কথা বলিয়ে আটকিয়ে রেখেছিলাম।

প্রাণের ভয়ে পাহাড় বেয়ে দৌড়চ্ছি, হঠাৎ দেখি য়্যালান আমার হাত ধরে বললে, 'এদিকে ছোট।' তারপর আমরা দু'জন মাথা নীচু ক'রে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পালাতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে যে পথে এসেছিলাম আবার সেই পথে ফিরে গেলাম। একটা জায়গায় বসে আমি য়্যালানকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কলিন রয়কে মেরেছে কিনা। সে অস্বীকার করলো এবং যে মেরেছে তাকেও নাকি সে জানে না।

তারপর আবার কয়দিন ধ'রে লুকিয়ে পালাতে হ'ল। অনেক ঘুরে 'গ্লেন' বংশীয় জেম্‌সের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে দেখলাম ভয়াবহ অবস্থা। জেমস্‌ য়্যালানকে দেখেই বলে উঠলো—'রেড ফক্স' মারা গেছে, এবারে নির্ম্মম অত্যাচার হবে। কেউ একজন ধরা না দিলে … না।'

… বললাম—'আপনারা হত্যাকারীকে যখন জানেন, … য়ে দিচ্ছেন না কেন?'

…রা দু'জনেই চমকে উঠলো, য়্যালান বলে উঠলো—… ক্যামেরন বংশী… ভাববে?'

…মিই সমস্ত … …ড় নিতে রাজি হলাম … মার ন … অনুমতি দিয়ে … র হ … পালালাম। … কলকে …

আমাকে ও য়্যালানকে ধরতে পারলে পুরস্কার দেওয়া ঘোষণা করা হয়েছে।

সেখান থেকে বন-জঙ্গল ঠেলে, নানা পাহাড় পে… আমরা ছুটতে লাগলাম। কত বার ধরা পড়তে প… বেঁচে গেছি, কত বার পাহাড় থেকে পড়ে মরতে ম… বেঁচে গেছি, ঠিক নেই। একদিন সামান্য কারণে ত… য়্যালানের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল। য়্যালান ত… কয়েকবার কথা বলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি বলি নি। হঠাৎ আমি আর থাকতে পারলাম … তরোয়াল নিয়ে য়্যালানকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হ… যদিও জানি য়্যালান তরোয়াল ধরলে আমার … অবধারিত। য়্যালানও তার তরোয়াল ধরলে; … আমার দিকে একটু এগিয়ে এসেই কেঁদে ফেললো—' … তোমাকে আঘাত করব, ডেভিড!'

আর রাগ করে থাকতে পারলাম না।

তারপর অবসন্ন দেহে মৃতপ্রায় অবস্থায় ম্যাক… বংশের এক বাড়ীতে আমরা আশ্রয় নিলাম। প্রা… মাস কাটলো আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হতে। তারপর … পলায়ন। দীর্ঘ বাইশ দিন ঘোরার পর য়্যালান বল… 'ডেভিড, এবারে তোমার দেশ ইংল্যাণ্ডে আমরা এ…

সামনে প্রকাণ্ড এক নদী। নদী পার হতে না … চলবে না। ও পাশে বাবার বন্ধু মিঃ র‍্যানক… থাকেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাকার কাছ … আমার সম্পত্তি উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু নদীর … পোল সুরক্ষিত, পার হতে গেলেই ধরা পড়তে … কিন্তু য়্যালানের বুদ্ধির বলে একটি নৌকোয় ক'রে রাত্রির অন্ধকারে ওপারে যেতে পারলাম।

মিঃ র‍্যানকাইলারের সঙ্গে আমি একাই দেখা … পেলাম, কারণ য়্যালানের ধরা পড়ে যাওয়ার … আছে। সেখানে শুনলাম হোসিয়াস্‌ন প্রচার … আমি নাকি জাহাজ-ডুবি হ'য়ে মারা গেছি। আর … কথা শুনলাম। আমার বাবা আর কাকা একটি মে… বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। পরে তাঁরা স্থির … একজন নেবেন সম্পত্তি, অপর জন সেই মেয়েটিকে … করবেন। তবে ভবিষ্যতে সম্পত্তিতে ওই … ছেলের অধিকার থাকবে। আমার কাকা সম্পত্তি

নিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর এখন আমার ওই সম্পত্তির অর্দ্ধেকের উপর দাবী আছে।

একটু কৌশল করে ও ভয় দেখিয়ে র‍্যালান ও মিঃ র‍্যানকাইলারের সাহায্যে কাকার কাছ থেকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি আদায় করলাম। মিঃ র‍্যানকাইলার চলে গেলেন। আমি আর র‍্যালান -

র‍্যালানের জন্য একজন ... করতে হবে। যতদিন না তার ব্যবস্থা ... তত দিন লুকিয়ে থাকবে এবং প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা ক... তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর বিদায় নিলাম।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ধামা (২) দেওয়াল।

উত্তরদাতাদের নাম

শান্তি সেন, শোভা, অনিল, নীলিমা, নেণ্ট, মিনি, বিশু (খুলনা); বিমলচন্দ্র দত্ত (শিলং); রামরতি চক্রবর্ত্তী, সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বালীগঞ্জ); মনীষা সেন, অ... গোপাল, নীপা, শঙ্কর, শিবাজী, পুটু (খুলনা); স... মায়া, লছমী, বিশ্ব, বীরু, প্রতিমা, অর্চ্চনা, আরতি, ছো... শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় (পাটনা)।

নূতন ধাঁধা

আমি রাবণ নই কিন্তু আমারও মাথা কাটলে মাথা থাকবেই। এমন কি আমার পেটে অস্ত্রোপচার করলেও মাথা ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাকে মা... পারেন শুধু সূর্যদেব। বল তো কে আমি?

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়ে
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি র...
বিশ...

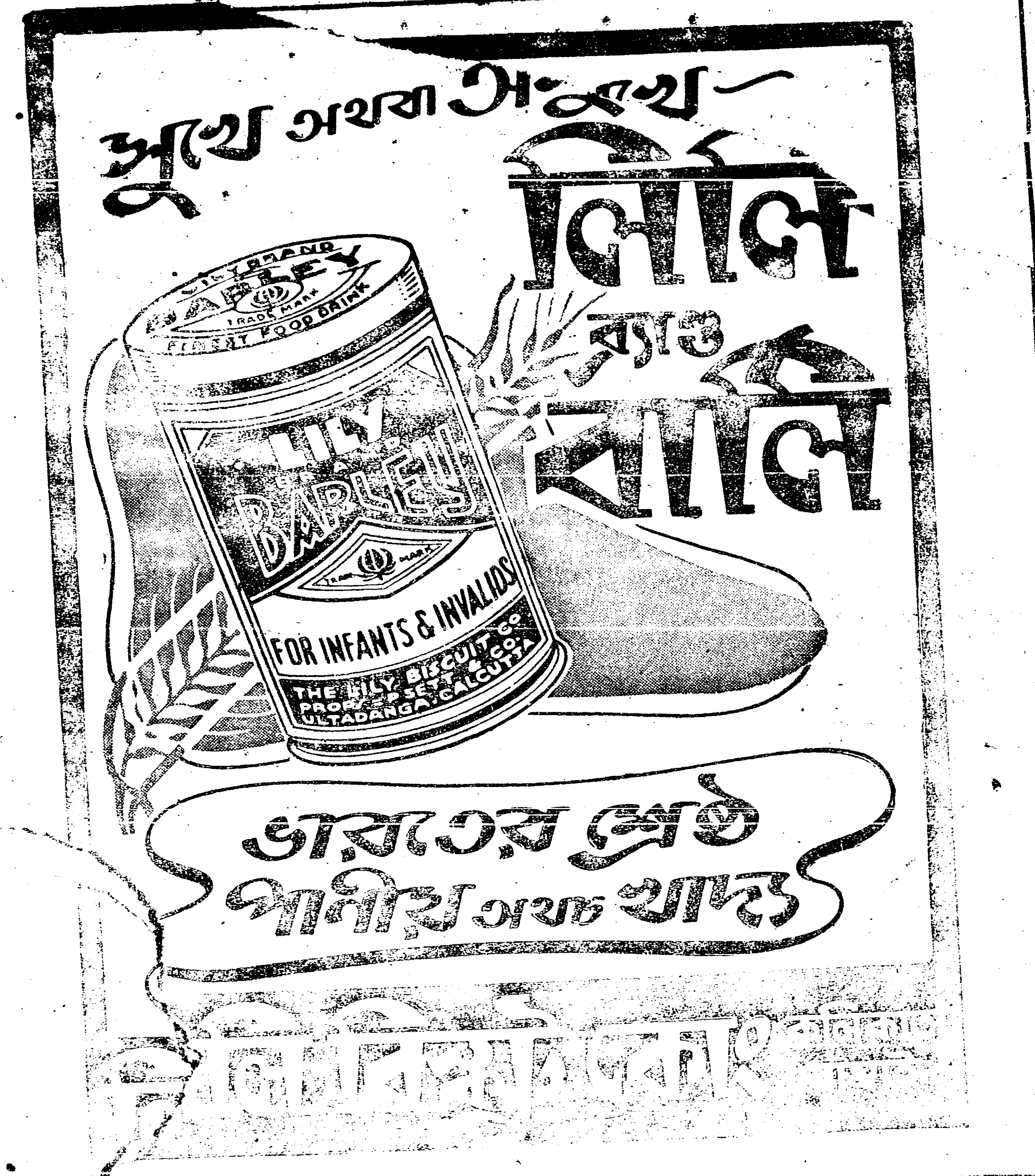

...হোক, অনেক
মহাপুরুষ—দর
করিবেন।

নিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর এখন আমার ওই সম্পত্তির অর্দ্ধেকের উপর দাবী আছে।

একটু কৌশল করে ও ভয় দেখিয়ে য়্যালান ও মিঃ র‍্যানকাইলারের সাহায্যে কাকার কাছ থেকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি আদায় করলাম। মিঃ র‍্যানকাইলার চলে গেলেন।

আমি আর য়্যালান ... য়্যালানের জন্য একজন ... করতে হবে। যতদিন না তার ব্যবস্থা ... তত দি... লুকিয়ে থাকবে এবং প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা ... তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর ... বিদায় নিলাম।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ধামা (২) দেওয়াল।

উত্তরদাতাদের নাম

শান্তি সেন, শোভা, অনিল, নীলিমা, নেন্ট, মিনি, বিশু (খুলনা); বিমলচন্দ্র দত্ত (শিলং); রামরতি চক্রবর্ত্তী, সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বালীগঞ্জ); মনীষা সেন, আ... গোপাল, নীপা, শঙ্কর, শিবাজী, পুটু (খুলনা); স... মায়া, লছমী, বিশ্ব, বীরু, প্রতিমা, অর্চ্চনা, আরতি, ছে... শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় (পাটনা)।

নূতন ধাঁধা

আমি রাবণ নই কিন্তু আমারও মাথা কাটলে মাথা থাকবেই। এমন কি আমার পেটে অস্ত্রোপচার করলেও মাথা ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাকে ... পারেন শুধু সূর্যদেব। বল তো কে আমি?

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়...
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি র...
বিশ...

...ও ছিটকে...
...এক অজানা দ্বীপে...
...ও দেখলাম না। তারপর...
...ন পরে পৌঁছলাম স্কটল্যাণ্ডের তীরে...
...বিপদের মধ্য দিয়ে নিল বয় নামে একটি ...দিন পরে
...ঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাকে য়্যালানের কথা ...দিয়েছে।